দ্বিতীয় খণ্ড।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

—:*:—

ভারতবর্ষ।

(প্রাচীন ভারতবর্ষ।)

—:*:—

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

—*:○:*—

প্রকাশক,—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

পৃথিবীর ইতিহাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২ নং, অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জ্জীর লেন, হাওড়া হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী দ্বারা
মুদ্রিত।

২৩২ ; উৎকলের রাজগণ ২৩৪ ; হুয়েন-সাং-দৃষ্ট ওড্র ২৩৭ ; বঙ্গদেশ— প্রাচীনত্ব ও পুরাবৃত্ত ২৩৯ ; পাল ও সেনরাজগণ ২৪৩; বঙ্গের অবস্থান্তর ২৪৬—২৪৮ ; হুয়েন-সাং-দৃষ্ট বঙ্গ ১৪৮ ; গৌড় ও বঙ্গ ২৫০ ; প্রাচীন তাম্রলিপ্ত ২৫২—২৫৪ ; কর্ণসুবর্ণ-রাজ্য ১৫৫ ; সমতট বা পূর্ব্ববঙ্গ ২৫৭ ; অঙ্গদেশ ২৫৯।

১৬শ। কলিঙ্গ-রাজ্য ২৬০

কলিঙ্গ-সম্বন্ধে বিবিধ বক্তব্য ২৬০ ; ত্রিকলিঙ্গ বা ত্রৈলঙ্গ ২৬৩।

১৭শ। দাক্ষিণাত্যের জনপদ-সমূহ ২৬৪

প্রাচীন দাক্ষিণাত্য ২৬৪ ; কোশল ও অন্ধ্র ২৬৬ ; চোল ও পাণ্ড্যরাজ্য ২৬৮ ; দ্রাবীড় রাজ্য ২৭০ ; কেরল, চেরা ও কঙ্কণ রাজ্য ২৭২ ; হুয়েন সাং প্রভৃতির বিবরণ ২৭৩, মহারাষ্ট্র রাজ্য ২৭৪—২৭৮ ; কর্ণাট-রাজ্য ২৭৮ ; কচ্ছ প্রভৃতি ২৮০ ; দাক্ষিণাত্যের ভাষা প্রভৃতি।

১৮শ। কাশ্মীর-রাজ্য ২৮৪

কাশ্মীর প্রতিষ্ঠা ২৮৪ ; কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত ২৮৬ ; কাশ্মীরের রাজন্যবর্গ ২৮৭—২৯৭ ; কাশ্মীরের প্রাচীন কীর্ত্তি-স্মৃতি ২৯৭—২৯৯।

১৯শ। সিন্ধুদেশ ৩০০

সিন্ধুদেশের ইতিবৃত্ত ৩০০—৩০২ ; উত্তর-সিন্ধু ৩০২ ; মধ্য-সিন্ধু ৩০৪ ; দক্ষিণ-সিন্ধু ৩০৬ ; সিন্ধু ও হিন্দু-শব্দ-তত্ত্ব ৩০৮।

২০শ। অন্যান্য প্রাচীন জনপদ ৩০৯

চেদিরাজ্য ৩০৯ ; ত্রিগর্ত্তদেশ ৩১০ ; ভোজরাজ্য ৩১২ ; দশার্ণ ও মদ্রদেশ ৩১৪ ; উত্তর-কুরু ৩১৫ ; খশ, হূণ, চীন প্রভৃতি দেশ ৩১৮—৩২০।

২১শ। ভারতের জাতি-বিভাগ ৩২১

জাতি-বিভাগে ত্রিবিধ তত্ত্ব ৩২১ ; জন্মগত জাতি ৩২২ ; আচার ও ধর্ম্মগত জাতি ৩২৬ ; দেশগত জাতি ৩২৭ ; পুরাণাদি শাস্ত্রে জাতির পরিচয় ৩২৯ ; শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন কালে অযোধ্যার জাতি-সমূহ ৩৩০ ; যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি জাতি-সম্বন্ধে বক্তব্য ৩৩১।

২২শ। জাতি ও সম্প্রদায় ৩৩৭

আধুনিক জাতি-সমূহ ৩৫৩ ; বিভিন্ন জাতির নাম, লোক-সংখ্যা ও বসতি-স্থান ৩৩৭—৩৩৯ ; ব্রাহ্মণ বংশ—তাঁহাদিগের উৎপত্তি ও বিভাগ-সমূহের পরিচয় ৩৩৯—৩৪২, সারস্বত ব্রাহ্মণ ৩৪৩, কনোজীয় ব্রাহ্মণ ৩৪৫, মৈথিল ও উৎকলীয় ব্রাহ্মণ ৩৪৭, গৌড়ীয় বা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ ৩৪৮, মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ ৩৫০, আন্ধ্র ব্রাহ্মণ ৩৫২, দ্রাবিড়ী ও কার্ণাটিক ব্রাহ্মণ ৩৫৩, গুর্জ্জর ব্রাহ্মণ ৩৫৪, বিবিধ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ৩৫৫, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি ৩৫৬, অন্যান্য বিবিধ জাতির পরিচয় প্রসঙ্গ ৩৫৭।

২৩। ভারতের ভাষা ৩৬১

ভাষা কত কাল ৩৬১, ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে দার্শনিকগণের মত ৩৬৩, ভাষার সংখ্যা ৩৬৪, ভারতবর্ষের ভাষা ৩৬৫, ভাষা-সমূহের উৎপত্তি-সম্বন্ধে সাদৃশ্য-তত্ত্ব ২৬৬, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার সাদৃশ্য-প্রসঙ্গ ৩৬৮—৩৭২, পঞ্চ-গৌড় ও পঞ্চ-দ্রাবিড় ৩৭৩, দ্রাবিড়ী ভাষার শাখা ৩৭৪, ভারতের

বর্ত্তমান ভাষা-সমূহ ৪৭৫ ; পাশ্চাত্য-মতে ভারতীয় ভাষা-সমূহের বিভাগ ৩৭৫ ; কথিত ভাষার ও ভাষাভাষী জনগণের সংখ্যা ৩৭৬ ; কোন্ বিভাগীয় ভাষা কোন্ দেশে প্রধানতঃ প্রচলিত, তাহার পরিচয় ৩৭৭—৩৮৪, ভাষা-উপভাষা ৩৮৪—৩৮৭, বিবিধ ভাষার সাদৃশ্য ৩৮৭—৩৯১, একই বাক্য ভারতের বিভিন্ন ভাষায় কিরূপ কথিত হয়, তাহার নমুনা ৩৮৯—৩৯১, ভাষা ও সভ্যতা ৩৯২, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ভাষার বংশ-পরিচয় ৩৯৩, সাদৃশ্যে মৌলিক ভাষার অনুসন্ধান ৩৯৪—৩৯৭, সংস্কৃত ভাষার একছত্র প্রভাবে ভারতবাসীর আদি সভ্যতার নিদর্শন ৩৯৮—৪০০।

২৪শ। ভারতের বর্ণমালা ৪০১

বর্ণমালার আদিতত্ত্ব ৪০১, শাস্ত্রে বর্ণমালার প্রসঙ্গ ৪০২, পাশ্চাত্য-মতে লিপি-সৃষ্টি ৪০৪, বর্ণমালা কোন্ দেশে প্রথম সৃষ্ট (পাশ্চাত্য মতে) ৪১১, পাশ্চাত্য-মতে বর্ণমালার আদর্শ-বিভাগ ৪১৩, পাশ্চাত্য-মতে ভারতবর্ষে বর্ণমালার বিদ্যমানতার প্রসঙ্গ ৪১৩, অশোকের লিপি ও সেই লিপি আবিষ্কারের ইতিহাস ৪১৫, পাশ্চাত্য-মতে লিপির আদি ৪১৮—৪২১, ভারতীয় বর্ণমালাই সকল বর্ণমালার আদিভূত ৪২১—৪২৯, তদ্বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ৪২৯—৪৩২, ভারতে কত প্রকার বর্ণমালা কি নামে প্রচলিত, তাহার পরিচয় ৪৩২, বর্ণমালার আকৃতিগত পার্থক্য ৪৩৫, মুদ্রাযন্ত্রের ইতিবৃত্ত ৪৩৮।

২৫শ। ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ৪৪২

ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ ৪৪২, ধর্ম্ম ও রিলিজিয়ন ৪৪২—৪৪৪, পরস্পর-বিরোধী ভাবেও ধর্ম্ম ৪৪২—৪৪৫ ; শাস্ত্রমতে ধর্ম্মের লক্ষণাদি ৪৪৬ ; ধর্ম্মে ঈশ্বরের প্রয়োজন ৪৪৮ ; পাশ্চাত্য-মতে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ৪৪৯ ; উপাসনার প্রাচুর্য্য ও অসম্ভব ৪৪৫ ; বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মূল-তত্ত্ব ৪৫৩ ; ধর্ম্মের মূল ভারতবর্ষে ৪৫৪ ; হিন্দু-ধর্ম্মের সম্প্রদায়-ভেদ ৪৫৭।

২৬শ। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ৪৫৮

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সমূহ ৪৫৯ ; রামানুজ-সম্প্রদায় ৪৫৯—৪৬৪ ; রামানন্দী বা রামাৎ সম্প্রদায় ৪৬৪ ; কবীরপন্থী সম্প্রদায় ৪৬৬ ; রামানন্দী সম্প্রদায়ের শাখা-উপশাখা ৪৭০ ; মধ্বাচারী বা ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ৪৭১ ; বল্লভাচারী বা রুদ্র-সম্প্রদায় ৪৭৩ ; সনকাদি বা নিমাবৎ-সম্প্রদায় ৪৭৬ ; চৈতন্য-সম্প্রদায় ৪৭৭ ; চৈতন্য-সম্প্রদায় এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শাখা-উপশাখা ৪৮০।

২৭শ। শাক্ত ও শৈব ৪৮২

শাক্ত—শক্তি উপাসনার তাৎপর্য্য ৪৮২ ; শাক্তগণের উপাস্য দেবতা ৪৮৩ ; শৈব—শিব উপাসনার তাৎপর্য্য ৪৮৬ ; শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য ৪৯৭ ; বিবিধ শৈব-সম্প্রদায় ৪৯০ ; পীঠস্থান-সমূহ ৪৯৩।

২৮শ। সৌর ও গাণপত্য ৪৯৫

সৌর ও গাণপত্যগণের মূল লক্ষ্য ৪৯৫ ; সৌর ও গাণপত্যগণের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা ও উপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতি ৪৯৬।

২৯শ। বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ৪৯৮

জৈন-ধর্ম্ম ৪৯৭ ; বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ৫০১ ; খৃষ্ট-ধর্ম্ম ৫০২ ; ইসলাম-ধর্ম্ম ৫০৩ ; অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ৫০৪ ; উপসংহার ৫০৬।

HIS HIGHNESS THE HON'BLE

MAHARAJA SIR RAMESWAR SINGH BAHADUR, K. C. I. E, G. C. I. E.

দ্বারবঙ্গাধিপতি অনারেবল মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ

শ্রীশ্রীদুর্গা—শরণং।

উৎসর্গ।

—:•:—

অশেষগুণসম্পন্ন মহামহিমান্বিত দ্বারবঙ্গাধিপতি

মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ

বাহাদুর, কে-সি-আই-ই, মহোদয় সমীপে।

মহারাজ,

দেশের সকল সদনুষ্ঠানেই আপনার কীর্ত্তি-স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া আছে। মিথিলা—স্মরণাতীত কাল হইতে সাহিত্য-সেবিগণের উৎসাহ-দানে প্রতিষ্ঠান্বিত। মিথিলা প্রদেশের আধিপত্য লাভ করিয়া, আপনিও সাধ্যানুসারে মিথিলার সেই প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আমার "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণয়নে পৃষ্ঠপোষণে—এই গ্রন্থের এক খণ্ডের মুদ্রণ-ব্যয়-বহনে—সম্মত হইয়া, আপনি সেই পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন। আমি ক্ষুদ্র হইলেও, ভরসা করি, আপনার ন্যায় মহানুভব-গণের আনুকূল্যে আমার এই বিরাট্ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। আমার এই "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণয়নে উৎসাহ-দান-রূপ আপনার অনুগ্রহ কথনই বিস্মৃত হইবার নহে। সেই কৃতজ্ঞতার কণামাত্র প্রকাশ-জন্য, এই খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাস" আপনার চিরস্মরণীয় নামে উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি—

হাওড়া,
২৪এ চৈত্র, ১৩১৭।

বিনীত
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

মহারাজের পত্র

——ေ:(*):ေ——

IN ACCEPTING the dedication of the SECOND volume of "PRITHIBIR ITIHASHA" His Highness The Hon'ble Moharaja Sir Rameshwara Singh Bahadur, K. C. I. E., writes :—

DARBHANGA,
18th April, 1911

Dear Durgadas Babu,

I have much pleasure in accepting the dedication of your valuable work, "Prithibir Itihasha", Vol. II, and thank your for the kind and appreciative expression in which it is made. Writing a World's History is surely a gigantic enterprise and I find that you have creditably acquitted yourself of it. The book under reference, like its first volume, is the result of wide and extensive researches with various fields and bears marks of vast studies. I am sure that the book will be hailed with delight by the learned public and will throw much light upon some of the vexed historical questions. Your reasonings regarding India being the original abode of Aryan race and not Central Asia, and Indian Alphabet being the origin of all other alphabets of the World are very interesting and useful.

In conclusion I again thank you for your book.

Yours sincerely,

(Sd.) RAMESHWARA SINGH.

সূচনা।

গ্রন্থ-সূচনায় প্রথমেই ভগবৎ-পাদপদ্মে কোটী কোটী নমস্কার করিতেছি। ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র হইয়াও যাঁহার আশীর্ব্বাদ-ভরসায় এই মহান্ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি; যাঁহার অশ্রুত অভয়বাণী এই শুষ্ক-হৃদয়-মরুভূমি-মাঝে উৎসাহের অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে; যাঁহার অদৃষ্ট-প্রেরণায় বঙ্গের বহু মহাজন নানারূপে আমার পৃষ্ঠপোষণে অগ্রসর হইয়াছেন; গ্রন্থ-সূচনায় প্রার্থনা করিতেছি,—সেই সকল-মঙ্গল-নিদান ভগবান এই দীন-জনের গৃহীত ব্রতের উদ্যাপনে সহায় হউন।

প্রার্থনা।

"পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই দ্বিতীয় খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসও"—এক হিসাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভূমিকা-মাত্র। 'ইতিহাসের' ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহাই হউক না কেন, আমরা যে প্রণালীতে "পৃথিবীর ইতিহাস" লিপিবদ্ধ করিব মনস্থ করিয়াছি, তাহাতে এরূপ ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের সঙ্কল্প,—আমরা যখনই যে দেশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিব, তখনই সেই দেশের সর্ব্ববিধ জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনার চেষ্টা পাইব। ইতিহাস কেবল রাজা ও রাজ্যের ধারাবাহিক বিবরণে পর্য্যবসিত নহে; ইতিহাস পাঠে দেশের সর্ব্ববিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে কিছু-না-কিছু অভিজ্ঞতা লাভ আবশ্যক। সেইরূপ-ভাবেই 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রণয়ন-পক্ষে আমরা প্রয়াসী হইয়াছি। আমাদের সে উদ্দেশ্য অনুভূত হইলে, এক এক খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসের" উপযোগিতা নিশ্চয়ই উপলব্ধি হইবে।

এই খণ্ডের উপযোগিতা।

কোনও দেশের ইতিহাস লিখিতে হইলে, সে দেশের ভৌগোলিক বিবরণ, সে দেশের সমাজ-তত্ত্ব, সে দেশের জাতি-ধর্ম্ম, সে দেশের সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন প্রভৃতির বিষয় প্রথমে স্থূলভাবে বর্ণন করা আবশ্যক। সুতরাং এই খণ্ডে, সংক্ষেপে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, ধর্ম্ম-তত্ত্ব, ভাষা-তত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব প্রভৃতি নানা তত্ত্বের আলোচনায় প্রয়াস পাইয়াছি। ভবিষ্যতে, এক এক সময়ের ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে, বিষয়-বিশেষের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিবার ইচ্ছা আছে। কিরূপ পদ্ধতিতে এই গ্রন্থ (অন্ততঃ "পৃথিবীর ইতিহাসের" অন্তর্গত ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অংশ) সম্পূর্ণ হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য এতদন্তর্গত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারি। এই খণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মের এবং বুদ্ধদেবের কথা অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যখন আমরা অশোকাদি বৌদ্ধ-নৃপতিগণের রাজত্ব-কাহিনী বর্ণন করিব, অথবা যখন কপিলাবস্তুর রাজবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যক হইবে, তখন বুদ্ধদেবের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃত আলোচনার অবসর পাইব। সুতরাং এই খণ্ডে কোনও বিষয় অসম্পূর্ণ আছে বলিয়া মনে হইলেও, অপরাপর খণ্ডে তাহার সম্পূর্ণতা দৃষ্ট হইবে।

বর্ণিতব্য বিষয়।

এই দ্বিতীয় খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাস" এক হিসাবে একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ; আবার অন্য হিসাবে, ইহা ভারতবর্ষের ইতিহাসের অংশ-মাত্র। প্রথম খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাস" পাঠ করিয়া, কেহ কেহ বলিয়াছিলেন,—"মহাভারতাদি যে প্রণালীতে লিখিত, এই গ্রন্থ-রচনায় অনেকটা সেই প্রণালীর অনুসরণ করা হইয়াছে। মহাভারতে, আদি-পর্ব্বে, যেমন স্থূলভাবে অন্যান্য পর্ব্বের মর্ম্ম প্রকটিত আছে; এক হিসাবে সেই আদি-পর্ব্ব যেমন সম্পূর্ণ এবং এক হিসাবে সেই পর্ব্ব যেমন মহাভারতের অংশ মাত্র; 'পৃথিবীর ইতিহাসের' সহিত এই গ্রন্থ-খণ্ড সেইরূপভাবে সম্বন্ধযুক্ত।" যিনি যে ভাবেই গ্রন্থ-খণ্ড গ্রহণ করুন না কেন, যে পদ্ধতিতে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এক এক খণ্ড পাঠ করিলে, সেই খণ্ডকেই সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইবে। তবে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়-বিশেষে নানা মতান্তর আছে। সুতরাং কোনও বিষয়ে কোনও প্রসঙ্গ এক স্থলে উত্থাপিত হইলে, সেখানেই যে তাহার আলোচনার শেষ হইয়াছে, কেহ যেন সেরূপ মনে করিবেন না। ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত গ্রন্থ-কয়েক-খণ্ড প্রকাশিত হইলে এতদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বিষয়-সমাবেশ পদ্ধতি।

যাঁহারা এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমার সহায়তা করিতেছেন, এক এক খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই, তাঁহাদের সহায়তার পরিচয় প্রস্ফুট হইয়া পড়িবে। "পৃথিবীর ইতিহাস" যে ভাবে সম্পূর্ণ করিব মনস্থ করিয়াছি, তাহাতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় পড়িবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের গ্রাহকগণের নিকট হইতে সে ব্যয় সংকুলান হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই বুঝিয়াই বাঙ্গালার মহাজনগণ কেহ কেহ এই গ্রন্থ-প্রকাশে পৃষ্ঠ-পোষণে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। ভগবান তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন, আমাদের পরিশ্রম সফল হউক। উপসংহারে, এই গ্রন্থ প্রণয়ন পক্ষে আমার সহায়তার জন্য শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যালের নাম এই গ্রন্থের সহিত চির-সম্বন্ধযুক্ত রহিল। এই গ্রন্থের রচনায়, শৃঙ্খলারক্ষায় এবং প্রকাশ-পক্ষে তাঁহার যত্ন ও অধ্যবসায় অতুলনীয়। কোনও কোনও অংশ তাঁহার রচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব-সম্পাদনে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্জাব চিফ্-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনারেবল কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম-এ এবং হাজারিবাগ কলম্বস্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, এফ্-আর-এস, প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ অনুগৃহীত আছি। আর আর যাঁহারা এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রচার-কল্পে আমায় উৎসাহ দিতেছেন, এই সূত্রে তাঁহাদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি—

উপসংহার।

হাওড়া,
১৩ই চৈত্র, ১৩২১।

নিবেদক।
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

ভারতবর্ষ।

——:*:——

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।

পরিচ্ছেদ বিষয় পৃষ্ঠা।

১ম। প্রাচীন আর্য্য-নিবাস ৯

পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতের প্রভাব ৯; ঋগ্বেদোক্ত নদ-নদীর ও জনপদাদির আলোচনায় আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান নির্ণয় ১০; বৈদিক-সূক্তের অর্থান্তরে আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান সম্বন্ধে বিপরীত যুক্তি,—সে মতে মধ্য-এসিয়া হইতে নানা স্থানে তাঁহাদের বিস্তৃতি ১২—১৩; মধ্য-এসিয়ায় বাসের সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা ১৪—১৬; প্রত্নৌক, ইন্দ্রালয়, স্বর্গ প্রভৃতির প্রসঙ্গ, ১৭—১৯; রক্ষু, রুশম প্রভৃতির আলোচনায় আদি-বাসের কথা ২০; ভারতে আর্য্যগণের আদিবাস-সম্বন্ধে বিবিধ যুক্তি—ভাষাতত্ত্ব আলোচনা প্রভৃতিতে ২১—২৪।

২য়। আর্য্যগণের আধিপত্য-বিস্তার ২৫

আর্য্যগণের সর্ব্বত্র গতিবিধি,—শক, যবন, চীন প্রভৃতির প্রসঙ্গ ২৫; ভারতের প্রভাব—মিশরে ২৭, ইথিওপীয়ায় ২৮, পারস্যে ৩০, ফিনিসীয়ায় ৩২, বাবিলোনীয়ায় ও কোলচিসে ৩৪, মিডিয়ায় ও আসিরীয়ায় ৩৫, ব্যাকৃত্রিয়ায় ৩৬, গ্রীসে ৩৭, রোমে ৩৯, জর্ম্মণী প্রভৃতিতে ৪০, চীনে ৪২, তুর্কিস্থানে ও সিরীয়ায় ৪৪, সিদীয়ায় ও সেমিটিক রাজ্যে ৪৫, অন্যান্য স্থানে ৪৬।

৩য়। প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক-তত্ত্ব ৪৮

জম্বুদ্বীপ ও ভারতবর্ষ ৪৮; শাস্ত্রমতে পৃথিবীর গোলত্ব-তত্ত্ব ৫০; ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ ৫০; ভাগ-বিষয়ে মতান্তর ৫২; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাগ ৫৫; ভারতবর্ষের নদ-নদী-পর্ব্বত ৫৭; ভারতবর্ষের জনপদ ৬২; তীর্থস্থান-সমূহ ৬৫; প্রাদেশিক নদ-নদী ৬৪; পৃথিবীর অবস্থান ও বিভাগ ৬৮।

৪র্থ। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ভারত-প্রসঙ্গ ৭১

আলেকজাণ্ডার, হুয়েন-সাং, মেগাস্থিনীস প্রভৃতির বর্ণিত বিবরণ ৭১; হুয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ ৭৬; প্রাচীন ভারতের আকৃতি—মহাভারতাদির বর্ণনায় ৮১, আলেকজাণ্ডার ও টলেমি প্রভৃতির বর্ণনায় ৮৪—৮৬; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ভৌগোলিক-তত্ত্বে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা ৮৮।

৫ম। কোশল-রাজ্য ৯১

অযোধ্যানগরী ৯১; সাকেত ও অযোধ্যা ৯৩; চীন-পরিব্রাজকগণের পরিদৃষ্ট অযোধ্যা ৯৪; দক্ষিণ কোশল ৯৭; পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় ৯৮; কুশস্থলী ও শ্রাবস্তী ১০০; পুষ্কলাবতী প্রভৃতি ১০৩; তক্ষশীলা ১০৬; গিরিব্রজ, কেকয়-রাজ্য, রাজগৃহ প্রভৃতি ১০৯।

৬ষ্ঠ। বিদেহ-রাজ্য ১১৩

মিথিলা, বৈশালী, জনকপুর, লিচ্ছবি, উজ্জিহান, ব্রিজি ১১৩; সাংকাশ্য ১১৬।

৭ম। কাশী-রাজ্য ১১৮

শাস্ত্রে কাশীর প্রসঙ্গ ও কাশী রাজ্যের বিস্তৃতির পরিচয় ১১৮; বৌদ্ধ-ধর্মের আবির্ভাব-কালে কাশীর অবস্থা ১২১; হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট কাশী ১২২; কাশী-রাজ্যের ইতিবৃত্ত ১২৩।

৮ম। প্রয়াগ-রাজ্য ১২৪

প্রতিষ্ঠান ও প্রয়াগ,—প্রাগবট ও অক্ষয়বট ১২৪; প্রয়াগে বৌদ্ধ-প্রাধান্য ১২৫; হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট প্রয়াগ ১২৬; এলাহাবাদ প্রতিষ্ঠা ১২৮; কৌশাম্বী নগরী ১২৯।

৯ম। কুরু-পাঞ্চাল-বিরাট-রাজ্য ১৩২

কুরু ও কুরুক্ষেত্র ১৩২; হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ ১৩৪; স্থাণ্বীশ্বর (প্রাচীন ও আধুনিক) ১৩৫; কুরুক্ষেত্রের অবস্থিতি ১৩৭; পাঞ্চাল-রাজ্য ১৩৯; অহিচ্ছত্র ও কাম্পিল্য ১৪০; হরিদ্বার প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদ ১৪২; মহাভারতে বিরাট প্রসঙ্গ ১৪৪; বিরাট-রাজ্যের অবস্থিতি সম্বন্ধে মতান্তর ১৪৫; বিরাট-রাজ্য-সম্বন্ধে হুয়েন-সাং প্রভৃতির মত ১৪৭।

১০ম। মথুরা-রাজ্য ১৫০

মথুরার অবস্থান্তর ১৫১; মথুরার পুরাবৃত্ত ১৫৩; মথুরার শেষ অবস্থা ১৫৪; ব্রজধাম ও বৃন্দাবন ১৫৬; দ্বারকা ১৫৮; বল্লভী, গুর্জ্জর, সৌরাষ্ট্র ১৫৯।

১১শ। মগধ-রাজ্য ১৬১

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ভারতে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অভ্যুদয় ১৬১; মগধের রাজন্যবর্গ ১৬২; ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে মগধের রাজ-বংশ ১৬৪; মগধ ও অন্যান্য রাজ্য ১৬৬; বিম্বিসারের সম-সময়ে ১৬৭; অজাতশত্রু ১৬৯; পরিব্রাজকের বর্ণনায় মগধ ও পাটলিপুত্র ১৭০; পাটলিপুত্রের অবস্থান বিষয়ক আলোচনা ১৭২; গয়াক্ষেত্র ১৭৩; হুয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট গয়া ১৭৫; গিরিব্রজ, রাজগৃহ ১৭৭—১৮২; নালন্দা ১৮২; বিহার ও হিরণ্যপ্রভাত ১৮৫; চম্পা-রাজ্য ১৮৬।

১২শ। কনোজ-রাজ্য ১৮৮

কনোজের পুরাবৃত্ত ১৮৮; কনোজের অবস্থানাদি—প্রাচীন ও আধুনিক ১৯১; নেপাল, কপিলাবস্তু, রামগ্রাম, পিপ্পলবন, অনোমা প্রভৃতি ১৯৩—২০২।

১৩শ। অবন্তী, উজ্জয়িনী ও মালব-রাজ্য ২০৩

অবন্তী-রাজ্য ২০৩—২০৫; উজ্জয়িনী ২০৫—২০৯; মালব-রাজ্য ২০৯—২১১; মালব-প্রসঙ্গে অন্যান্য জনপদ—জজহোতি, মহোবা প্রভৃতি ২১২—২১৮।

১৪শ। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ২১৯

শাস্ত্রোক্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধন ২১৯; পরিব্রাজক-দৃষ্ট পুণ্ড্রবর্দ্ধন ২২০; পুণ্ড্রবর্দ্ধনের আধুনিক অবস্থান ২২১।

১৫শ। প্রাচ্য-জনপদ-সমূহ ২২২

প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপ ২২২—২২৫; কামরূপের ইতিবৃত্ত ২২৬; চৈন পরিব্রাজক-পরিদৃষ্ট কামরূপ ২২৯; কামরূপের তীর্থাদি ২৩০; উৎকল-রাজ্য

প্রাচীন ভারতবর্ষ।
(পৃথিবীর ইতিহাসের জন্য অঙ্কিত)
উদয়ন
তক্ষশীলা
স্থানেশ্বর
মথুরা
মহেশ্বর
ব্রহ্মপুত্র
মহেন্দ্রী
মহাসাগর
কুমারিকা

প্রাচীন আর্য্য-নিবাস।
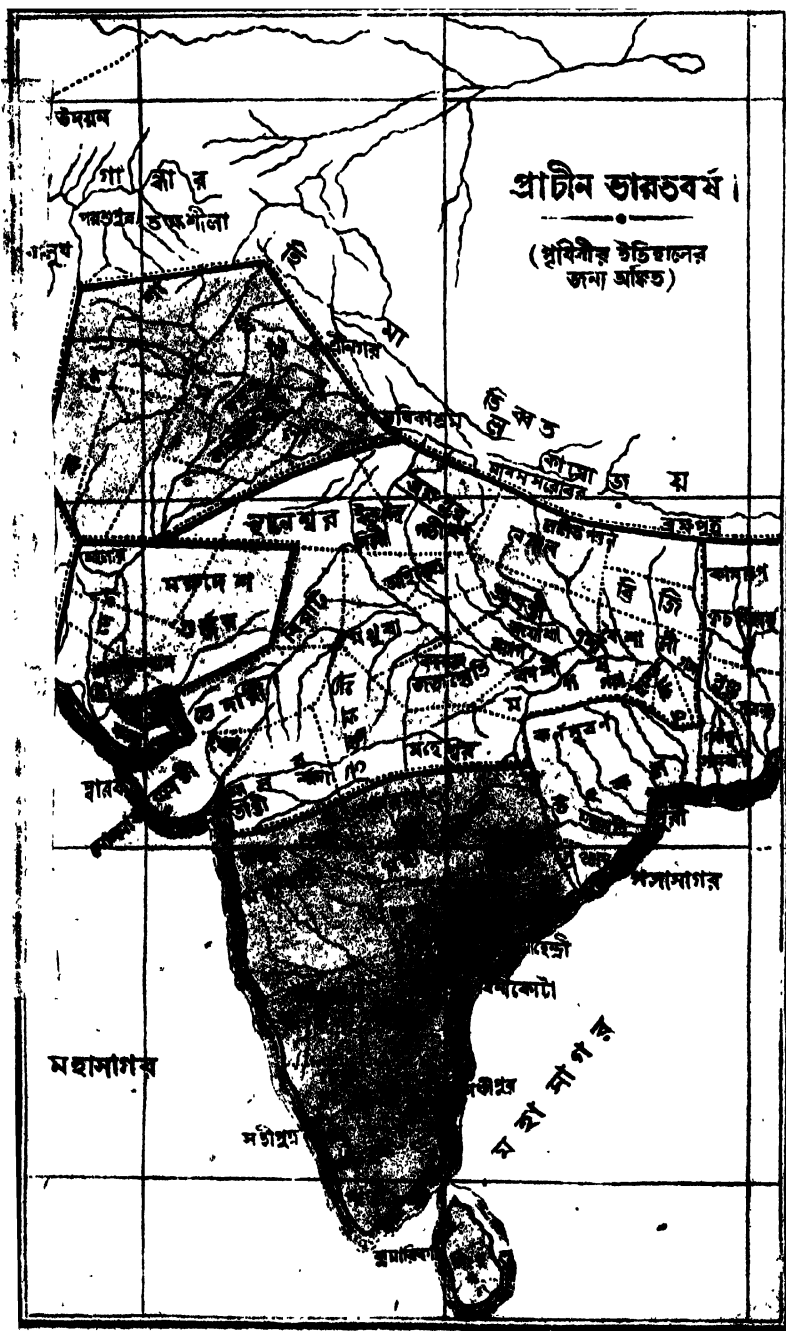
[পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতের প্রভাব ;—ঋগ্বেদোক্ত নদ-নদী ও জনপদাদির আলোচনায় আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান-নির্ণয় ;—বৈদিক সূক্তের অর্থান্তর ঘটাইয়া আর্য্যগণের আদি বাসস্থান-সম্বন্ধে বিপরীত যুক্তি,—সে মতে মধ্য-এসিয়া হইতে নানা স্থানে তাঁহাদের বিস্তৃতি ;—সে যুক্তির অসারত্ব,—প্রত্নোক, ইন্দ্রালয় ও স্বর্গ প্রভৃতির প্রসঙ্গ,—সূক্তের প্রকৃত ও প্রচলিত অর্থ ;—প্রত্নোক শব্দে ভারতবর্ষকেই বুঝাইয়া থাকে ;—সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতির প্রসঙ্গে পুরাতন আবাস-স্থান "প্রত্নোক"-তত্ত্ব নির্ণয় ;—মরুদ্গণের উপাসনায় পুরাতন বাস-স্থানের প্রসঙ্গ ও তাহার তাৎপর্য্যার্থ ;—রঙ্কু, রুশম, হরিযূপীয়া প্রভৃতি নাম দৃষ্টে আর্য্য-গণের মধ্য-এসিয়া বাসের যুক্তি—তৎসমুদায়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য ;—উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য।]

সর্ব্বত্র ভারতের প্রভাব।

দ্বাপরের শেষভাগে, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে, ভারতের জীবন-নাট্যে এক নূতন পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইতিহাসে ভারতের গৌরব-গরিমার সে যেন এক বিরাম-স্থান। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগত্রয়ে ভারতবর্ষ সৌভাগ্য-সম্পদের উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল,—আপন প্রাধান্য-প্রতিপত্তি-বিস্তারে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল;—সে গর্ব্ব এই সময়ে অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তি-কালে, বহু শতাব্দী পরে, মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষের যে সৌভাগ্য বিকাশ দেখিতে পাই, অতীতের তুলনায়, সে কেবল নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখার অস্তিত্ব-বিকাশ মাত্র। ফলতঃ, প্রাচীন ভারতের গৌরবের, সৌভাগ্যের, শৌর্য্য-বীর্য্যের, বিবিধ-বিষয়িণী উন্নতির যে কিছু প্রকৃষ্ট পরিচয় অধুনা বিদ্যমান আছে,—সকলই কুরুক্ষেত্র মহা-সমরের পূর্ব্ববর্ত্তি-কালের নিদর্শন। প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণের পরিচয়-চিহ্ন—শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহ। শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহ আলোড়ন করিলে, আমরা ভারতীয় পূর্ব্বাবৃত্তের যে আভাস পাই,

তাহাতে ভারতবর্ষ সর্ব্ব-বিষয়ে যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিল, বিশেষরূপেই বুঝিতে পারা যায়। তখন, ভারতবর্ষ সকল সম্পদের কেন্দ্রভূমি ছিল। তখন, ভারতবর্ষের জ্ঞান-গরিমার উজ্জ্বল আলোকে পৃথিবীর অপরাপর দেশ আলোকিত হইয়াছিল। তখন, ভারতবর্ষের প্রাধান্য-প্রতিপত্তির নিকট পৃথিবীর সকল দেশই মস্তক অবনত করিয়া ছিল। পৃথিবীর যে দেশের যে সময়েরই ইতিহাস আলোচনা করি না কেন, সকল দেশই সর্ব্ব বিষয়ে ভারতবর্ষের নিকট ঋণী। পৃথিবীর যে কোনও দেশের প্রাচীন সভ্যতার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবেন, মূলে ভারতীয় সভ্যতার রশ্মি-রেখা তাহার মধ্যে সঞ্চারিত দেখিতে পাইবেন। প্রাচীন কালের যে সকল প্রসিদ্ধ জনপদ পুরাবৃত্তে উচ্চ-স্থান লাভ করিয়া আছে, সকলেরই আদিতে ভারতের প্রভাব পূর্ণ বিদ্যমান।

আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান

সভ্যতার আদি স্থান, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ভারতবর্ষ। আর্য্যগণের আদি বাস-স্থান,—আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ভারতবর্ষ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র-ক্ষেত্র, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ভারতবর্ষ। * সকল সভ্যজাতি, সকল প্রত্নতত্ত্ববিৎ, বেদকেই পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। † এ বিষয়ে প্রায়ই মতদ্বৈধ নাই। সেই বেদে যে জনপদ, নগর ও নদ-নদীর উল্লেখ দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ের অবস্থান-স্থান অনুসন্ধান করিতে গেলে, ভারতবর্ষেই তাহাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। বেদোক্ত সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, সিন্ধু প্রভৃতি নদ-নদী আজিও ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারত ভিন্ন অন্য কোথাও যদি আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান হইত, তাহা হইলে, সেই দেশের নদ-নদীরই পরিচয় বেদে উল্লেখ থাকা সম্ভবপর ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল যুক্তির সাহায্যে মধ্য-এসিয়া প্রভৃতিতে আর্য্য-গণের আদি-বাসস্থান নির্ণয় পক্ষে চেষ্টা পান, একটী স্থূল কথায় সেই সকল যুক্তি খণ্ডন করা যাইতে পারে। সকলেই যখন স্বীকার করেন,—পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ বেদ ভারতবর্ষেই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, আর আমরা যখন দেখিতে পাই,—বেদোক্ত নদ-নদী-জনপদাদির অস্তিত্ব এই ভারতবর্ষেই বিদ্যমান; তখন ভারত ভিন্ন অন্য স্থানে আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান সম্ভবপর হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্থলে, ঋগ্বেদ হইতে কয়েকটী ঋকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; এবং সেই সকল ঋকোক্ত নদ-নদী প্রভৃতির নাম ও অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও দেখাইতেছি। তাহাতে এ বিষয় বিশদীকৃত হইবে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পঞ্চসপ্ততি সংখ্যক সূক্তের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ঋকের এইরূপ অনুবাদ দেখিতে পাই,—"হে সিন্ধু! যেমন শিশু বৎসের নিকট তাহাদিগের জননী গাভীরা দুগ্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ আর আর নদী শব্দ করিতে করিতে জল লইয়া তোমার চতুর্দ্দিকে আসিতেছে। যেমন যুদ্ধ করিবার সময় রাজসৈন্য লইয়া যায়, তদ্রূপ তোমার সহগামিনী

---

* "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

† ম্যাক্সমুলার, হিরেণ, উইলসন, হাণ্টার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সকলেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। ম্যাক্সমুলার বলেন,—"They are the oldest books in the library of mankind."—*India: What can it teach us.* অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অভিমত উদ্ধৃত করিলেও এই উক্তিরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

নদী-শ্রেণীকে লইয়া তুমি অগ্রে অগ্রে চলিতেছ। হে গঙ্গা! হে যমুনা ও সরস্বতী ও শতদ্রু ও পরুষ্ণী! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী-সঙ্গত মরুৎবৃধ। নদী! হে বিতস্তা ও সুসোমা-সঙ্গত আর্জ্জিকিয়া নদী! তোমরা শ্রবণ কর! হে সিন্ধু! তুমি তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। পরে সুসর্ত্তু ও রসা ও শ্বেতীর সহিত মিলিবে। তুমি ক্রমু ও গোমতীকে কুভা ও মেহৎনুর সহিত মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্র যাইয়া থাক।" ঋকোক্ত এই সকল নদীর পরিচয়ে পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন,—'ইরাবতী (রাভী) নদীর নাম পরুষ্ণী। অসিক্নী—চন্দ্রভাগ (চিনাব); চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মিলন-স্থান মরুৎবৃধা নামে অভিহিত। আর্জ্জিকিয়া—বিপাশা নদীরই নামান্তর মাত্র; সুসোমা—সিন্ধু।' ফলতঃ, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এবং শাখা-সংযুক্ত সিন্ধু নদের বিষয়ই এই সকল ঋকে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। * তৃষ্টামা সুসর্ত্তু, রসা, শ্বেতী, ক্রমু, গোমতী, কুভা ও মেহৎনু প্রভৃতি অপর যে কয়েকটি নদীর নাম উদ্ধৃত ঋকে দৃষ্ট হয়, তাহাও সিন্ধু-নদের শাখা বলিয়া পরিচয় পাই। প্রথমোক্ত শাখা কয়েকটি, অর্থাৎ শতদ্রু, পরুষ্ণী, অসিক্নী, বিতস্তা, সুসোমা, আর্জ্জিকিয়া প্রভৃতি,—পঞ্জাব প্রদেশে; এবং শেষোক্ত শাখা-কয়েকটী, অর্থাৎ তৃষ্টামা, সুসর্ত্তু, রসা, শ্বেতী, ক্রমু, গোমতী, কুভা ও মেহৎনু প্রভৃতি,—কাবুল প্রদেশে অবস্থিত। † এই সকল নদ-নদী ভিন্ন, অশ্মনবতী (দশম মণ্ডলের ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তে), অঞ্জসী, কুলিশী, বীরপত্নী ও শিফা নদী (প্রথম মণ্ডলের চতুরধিক শততম সূক্তে), শ্বেতয়াবরী (অষ্টম মণ্ডলের ষড়বিংশতি সূক্তে), আপয়া (তৃতীয় মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তে), শর্য্যনাবৎ (নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশাধিক শততম সূক্তে), যব্যাবতী (ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তে), সুনৃতা (প্রথম মণ্ডলের চত্বারিংশ সূক্তে), অজ্ঞ, শিগ্রু, যক্ষু (সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে), সীরা (প্রথম মণ্ডলের চতুঃসপ্তত্যধিক শততম সূক্তে), সীতা (চতুর্থ মণ্ডলের অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তে), গৌরী (প্রথম মণ্ডলের চতুঃষষ্ট্যধিক শততম সূক্তে), জহ্নাবী (তৃতীয় মণ্ডলের অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তে), গোতমী (পঞ্চম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তে) প্রভৃতি নদীসমূহ এখন যে কোথায় কোন্ নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বা কিরূপভাবে লোপ পাইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, সরস্বতী,

---

* "Satudri (Sutlej), Parush (Iravati, Ravi), Asikni, which means black. It is the modern Chenab. Marudvridha, a general name for river. According to Roth the combined course of Akesines and Hydaspes. Vitasta, the last of the rivers of the Punjab, changed in Greek into Hydaspes. It is the modern Behat or Jilem. According to Yaska the Arjikiya is the Vipasa; its modern name is Bias or Bejah. According to Yaska the Sushoma is the Indus."—Max Muller's *India: What can it teach us.*

† পঞ্চম ঋকে সিন্ধু নদের পূর্ব্বদিকের অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। ষষ্ঠ ঋকে পশ্চিম দিকের অর্থাৎ কাবুল প্রদেশের শাখাগুলির নাম দৃষ্ট হয়। মাক্সমূলার কৃত ষষ্ঠ ঋকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"First thou goest with the Trishtama on this journey, with the Susartu, the Rasa (Ramha Araxes ?) and the Sveti,—O Sindhu, with the Kubha (Kophen, Cabul river) to the Gomoti (Gomal), with the Mehatnu to the Krumu (Kurum)—with whom thou proceedest together."—রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদ-সংহিতার টীকা।

গোমতী, দৃষদ্বতী প্রভৃতির বিদ্যমানতা—আজিও অতীত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এই সকল নদ-নদীর মধ্যে সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা ও সিন্ধু প্রভৃতির নাম বহু স্থলে বহু বার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে গন্ধার-দেশ (প্রথম মণ্ডলের ষড়বিংশত্যধিক শততম সূক্তে), চেদী-দেশ (অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তে) এবং কীকট-দেশ (তৃতীয় মণ্ডলের ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তে) প্রভৃতির * উল্লেখ দৃষ্টে, কান্দাহার হইতে উত্তর বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদে আর্য্যগণের আদি-বাস ছিল বলিয়াও অনেকে অনুমান করেন। ফলতঃ, ঐ সকল নদ-নদী ও জনপদাদির উল্লেখ দেখিয়া, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মীমাংসা করিয়াছেন,—ভারতবর্ষেরই অংশ-বিশেষে আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান ছিল। তাঁহাদের মতে,—উত্তরে তুষারাবৃত হিমালয় পর্ব্বত-শ্রেণী, পশ্চিমে সিন্ধুনদ ও সুলেমান পর্ব্বত-শ্রেণী, দক্ষিণে সিন্ধুনদ ও সমুদ্র, পূর্ব্বে গঙ্গা ও যমুনার উপত্যকা,—এতৎসীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশই আর্য্যগণের আদিম নিবাস-স্থান। † এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, উত্তর মেরুতে বা মধ্য-এসিয়ায় আর্য্যগণের আদি-বাস সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। অপিচ, এতৎসমুদায় দৃষ্টে, ভারতবর্ষই যে আর্য্যগণের-আদি বাসস্থান ছিল, তৎসম্বন্ধে কেহই সন্দিহান হইতে পারেন না।

মতান্তরে আর্য্যনিবাস।

ঋগ্বেদের দুই একটী ঋকের অর্থান্তর ঘটাইয়াও কেহ কেহ আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের ষোড়শ এবং ত্রিংশ সূক্তের নবম ঋক আলোচনা করিলে আর্য্যগণের আদি-বাসস্থানের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। মূল ঋক দুইটী এই;—"অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ॥ ১।২২।১৬॥ অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবি প্রতিং নরং। যং তে পূর্ব্বং পিতা হুবে॥ ১।৩০।৯॥" পণ্ডিতগণ বলেন,—"এই দুই ঋকে আর্য্যদিগের পুরাতন নিবাস-স্থানের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম ঋক অনুসারে বুঝা যায়,—আর্য্যগণ সপ্ত-পরিবারে বিভক্ত ছিলেন, তাহা 'সপ্তধাম' শব্দের দ্বারা প্রতীত হইতেছে। অতঃপর কোনও কারণ বশতঃ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, আর্য্যকুল-দেবতা বিষ্ণুর আশ্রয়ে আর্য্যগণ ভারতবর্ষের অভিমুখে আগমন করেন। পথি-মধ্যে বোধ হয়, তিন স্থানে আর্য্যগণ বিশ্রাম করিয়া-

---

* গন্ধার (গান্ধার দেশ) বর্ত্তমানে কান্দাহার-প্রদেশ। চেদীদেশ বর্ত্তমানে বুন্দেলখণ্ড প্রদেশ। কীকট-দেশ—উত্তর মগধ অর্থাৎ গঙ্গার উত্তর-দিকস্থিত প্রদেশ।

† অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রকারান্তরে এই কথাই স্বীকার করিয়াছেন বটে; তবে তিনি বলিয়াছেন,—"বৈদিক ঋষিগণ এই সীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশের পরিচয়ই অবগত ছিলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এই ভৌগোলিক তত্ত্বে সীমা-বদ্ধ ছিল। ইহার অতিরিক্ত বিশাল পৃথিবীর বিষয় তাঁহারা কিছুই অবগত ছিলেন না। তাঁহার ভাষাতেই তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছি।—"It shows the widest geographical horizon of the Vedic poets, confined by the snowy mountains in the North, the Indus and the range of Suleiman mountains in the West, the Indus or the sea in the South, and the valley of the Jumna and the Ganges in the East. Beyond that the world, though open, was unknown to the Vedic poets." এই উক্তি অনুসারে আর্য্য-ঋষিগণের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহাদের আদি-বাস যে ভারতবর্ষে ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ছিলেন, এবং তাহাই পর ঋকে (ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রিধা নিদধে পদং। সমূলহমস্য পাংসুরে॥১।২২।১৭॥)—বিষ্ণুর তিন পাদ বিক্ষেপ রূপে উক্ত হইয়াছে। আর্য্যগণ স্বধর্ম্ম-পালন পূর্ব্বক নানাবিধ অত্যাচার অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। (ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥ ১।২২।১৮॥) সুতরাং বিষ্ণুকে 'গোপা' রক্ষক এবং 'অদাভ্যঃ' অদমনীয় বলা হইয়াছে। যেহেতু বিষ্ণুর সাহায্যেই আর্য্যগণ শত্রুদিগের উপদ্রব হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। সেই সমস্ত উপদ্রবের কথা তাঁহাদের মনে এতদূর জাগরূক ছিল যে, তাঁহারা দেবগণকে পুরাতন আবাস হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। (যোড়শ ঋক) বিষ্ণুদেব অনুগ্রহপূর্ব্বক আর্য্যদিগের নেতা না হইলে, তাঁহাদের স্ব-ব্রত রক্ষা করা ভার হইত। (বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যতে যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। ১।২২।১৯॥) বিষ্ণুর অধীনে আর্য্য-দিগের 'প্রত্নোক' (প্রাচীন নিবাস) হইতে ভারতবর্ষে আগমন ঋষিরা অনেক ঋক্ মন্ত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এবং বিদ্বান ব্যক্তিরাই তাহা জানেন। (তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং॥ ১।২২।২০॥ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥ ১।২২।২১॥)—এই আদিম নিবাস (প্রত্নোক) 'সপ্তর্ষীণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী। রাজর্ষি চরিতং রম্যং যত্রচৈত্ররথং মহৎ॥' এবম্ভূত উত্তর কুরুবর্ষ। ইহা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম মধ্য-এসিয়া প্রদেশে অবস্থিত। ইহা শীতপ্রধান দেশ ছিল, তাহা ঋগেদে দেখিতে পাওয়া যায়। উপরি উক্ত শ্লোকে যে সপ্ত ঋষির উল্লেখ আছে, তাঁহারা বোধ হয় আর্য্যদিগের সপ্ত-ধামের নেতৃগণ। পরে সপ্ত ঋষির পৌরাণিক নামান্তর রচিত হয়। আধুনিক ঔপমিক ভাষা-তত্ত্বের প্রভাবে জানা গিয়াছে যে, প্রাচীন কালে আর্য্যবংশের বর্ত্তমান সপ্তবিভাগ একত্র বাস করিত। সপ্তবিভাগ যথা,—১ ভারতীয় আর্য্যগণ; ২ পারস্যবাসীরা; ৩ ইংরাজ এবং জর্ম্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ টিউটন (Tutons) জাতি; ৪ রুশিয়া প্রদেশ (Russia) বাসী, শ্লাভনিয়ান (Slavonian) জাতি; ৫ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশবাসী, কেল্ট (Kelt) জাতি; ৬ গ্রীশদেশবাসী পিলাসজী (Pelasgii)। এবং ৭ ইটালি (Italy) প্রদেশবাসী রোমান (Roman) জাতি। বাহ্লীক-প্রদেশ (Balkh) এবং গান্ধার দেশ (Candahar) এক কালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বাসস্থান ছিল। যোড়শ হইতে একবিংশতি পর্য্যন্ত ছয় ঋকে আর্য্যদিগের আদিম নিবাস, তথা হইতে বিষ্ণুর অধীনে প্রস্থান, তিন স্থানে আসন (বিশ্রাম) এবং স্বধর্ম্ম-রক্ষা পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রবেশ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। বিষ্ণু—ইন্দ্রের সখা এবং আর্য্যদিগের একজন সাহায্যকারী রক্ষক।...এই 'প্রত্নোক'-বাস-কালীনই ইন্দ্রদেবের পূজা আরম্ভ হয়; এবং এক মূল হইতে গ্রীকদিগের জুপিতর (Jupiter) এবং আর্য্যদিগের দ্যুপিতর (ইন্দ্র) এবং পারসীকদিগের 'বেরেত্রঘ্ন' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।... হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে 'ইন্দরালয়' নামে একটী স্থান আছে। অমরকোষে, শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। জনষ্টন সাহেব কৃত আসিয়া-মহাদেশের বৃহৎ মানচিত্রে ইন্দরালয় দৃষ্ট হয়। ইন্দরালয়ের সংস্কৃত নাম—ইন্দ্রালয়। ইহাই আর্য্যদিগের

আদি-বাসস্থান। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ত্রিংশ সূক্তের নবম ঋকে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রদেব আর্য্যদিগের পুরাতন বাসস্থানে সর্ব্বরক্ষক প্রভু ও বহুজনপালক ছিলেন। এই ঋকেরই ঋষি শুনঃশেফ বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ইন্দ্রদেবকে পুরাতন নিবাস-স্থানের প্রার্থনা করিতেন। বাইশ সূক্তের ষোল ঋকের টিপ্পনীতে উত্তর কুরু প্রদেশ 'প্রত্নৌক' বলিয়া অনুমান করা গিয়াছে। কিন্তু ত্রিংশ সূক্তের নবম ঋক অনুসারে ইন্দ্রা-লয়ই প্রত্নৌক। ইন্দ্রালয় নামই প্রতিপন্ন করিতেছে যে, ইহা ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত আর্য্যদিগের আদিভূমি। ইন্দ্রদেব আর্য্যগণের রক্ষক বলিয়া, আর্য্যগণ তাঁহাদের আদি বাস-ভূমির ইন্দ্রালয় নাম রাখিয়াছিলেন। আধুনিক ইন্দ্রালয় প্রাচীন ইন্দ্রালয়ের প্রায় দুই শত ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া অনুমান হয়। ইন্দ্রালয় অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশ ছিল। ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায় যে, আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে হিমপ্রধান প্রদেশে বাস করিতেন। আর্য্যদিগের আচার-ব্যবহার হিমপ্রধান দেশবাসীদিগের ন্যায় ছিল। তাঁহারা হিম ঋতু (Winter) লইয়া বৎসর গণনা করিতেন। (১।৮০।৫, ১।৬৪।১৪ ঋক) তাঁহারা মাংসভক্ষণ, উষ্ণ পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। উত্তর কুরু, উত্তর মদ্র, কম্বোজ , বাহ্লীক প্রভৃতি আর্য্য-উপনিবেশ সকল ইন্দ্রালয়ের সন্নিহিত। ইন্দ্রালয়ে তাঁহারা সপ্ত পরিবারে বিভক্ত ছিলেন, এবং কোনও কারণে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। এই ইন্দ্রালয়ে অবস্থিতিকালে আর্য্যদিগের যে ভাষা ছিল, তাহার নাম ব্রহ্মভাষা। ব্রহ্মভাষার ও ব্রহ্মবিদ্যার উল্লেখ, উপনিষদাদিতে বহুত্র দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে উপনিবেশানন্তর আর্য্যগণ এই ব্রহ্মভাষার সংস্কার পূর্ব্বক উহাকে সংস্কৃতে পরিণত করিয়াছেন।" * পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী বহু পণ্ডিত এবম্বিধ যুক্তিবলেই মধ্য-এসিয়ায় আর্য্য-গণের আদি-বাসস্থান নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইয়াছেন।

যে যুক্তিবলে আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান সম্বন্ধে এবম্বিধ মতান্তর ঘটিয়াছে, বৈদিক সূক্ত সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া দেখিলে, তাহা কখনই সমীচীন বলিয়া প্রতীত হয় না।

সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা।

প্রথমতঃ, যে 'প্রত্নৌক' শব্দের উপর নির্ভর করিয়া, পণ্ডিতগণ প্রাচীন বাসস্থান' † নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, সেই শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধেই ভ্রম-ধারণার স্থান পাইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ ঐ শব্দের যেরূপ অর্থোৎপত্তি করিতেছেন, প্রাচীন মনীষিগণ কখনই সেরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করেন নাই। সায়ণাচার্য্য 'প্রত্নস্যৌকসঃ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—'প্রত্নস্য পুরাতনস্য ওকসঃ স্থানস্য স্বর্গরূপস্য সকাশাৎ' অর্থাৎ সায়ণাচার্য্যের মতে 'প্রত্নৌকসঃ'—স্বর্গভূমি। 'সপ্তধামভিঃ' শব্দে সায়ণাচার্য্য 'সপ্তছন্দের সহিত' অর্থ নিষ্পত্তি করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'ত্রীণিপদা বিচক্রমে' বাক্যে আর্য্যগণ বিষ্ণুর আশ্রয়ে তিন স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু প্রাচীন মনীষিগণ উহার অর্থ অন্যরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। শাকপুণি, ঔর্ণনাভ প্রভৃতি সায়ণাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী নিরুক্তকারগণ ঐ বাক্যের অর্থ নির্দ্দেশে

---

* রমানাথ সরস্বতী কর্ত্তৃক অনূদিত ঋগ্বেদ-সংহিতা দ্রষ্টব্য।

† রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থ করিয়াছেন,—"From the site of our ancient home." পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ সেই অর্থ ই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন।

স্থির করিয়াছেন,—"পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে এবং স্বর্গলোকে।' তাঁহারা বলেন,—'সমারোহণে অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়কালে পূর্ব্বদিকে, বিষ্ণুপদে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সময়ে আকাশে, এবং গয়শিরে অর্থাৎ অস্তকালে পশ্চিম প্রান্তে, বিষ্ণুর তিন পদ; 'ত্রীণিপদা বিচক্রমে' বাক্যে সেই অর্থই সূচিত হইতেছে। এ হিসাবে, "অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে' পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ ॥"(১।২২।১৬॥)—এই ঋকের অর্থ হয়,—'বিষ্ণু সপ্তকিরণের সহিত যে ভূ-প্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।' ফলতঃ, 'সপ্তধামভিঃ' শব্দে 'সপ্তপরিবারের নিবাসস্থান-বিশিষ্ট ভূ-প্রদেশ' অর্থ কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। আমরা নিম্নে যাস্ক কৃত নিরুক্ত এবং দুর্গাচার্য্য কৃত তাহার ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে বিষয়টী অধিকতর বিশদীকৃত হইতে পারে। যাস্কের নিরুক্ত,—

"যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং। ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং
অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসি ইতি ঔর্ণনাভঃ।"

খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম শতাব্দীতে যাস্ক বিদ্যমান ছিলেন। শাকপূণি ও ঔর্ণনাভ, যাস্কের কতকাল পূর্ব্বে বেদালোচনা করিয়াছিলেন, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। দুর্গাচার্য্যও প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। যাস্ক-কৃত নিরুক্তের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিত যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ।
ক তৎ তাবৎ পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং
যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা।
যদুক্তং তমু অক্রিণ্বন ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয় গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে।
বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণনাভ আচার্য্যোমন্যতে।"

এই ব্যখ্যায় প্রতীত হয়,—আর্য্যগণ সূর্য্য ও বিষ্ণুকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর জগতে পদ-বিক্ষেপই ঐ সূক্তের মর্ম্ম। * প্রথম মণ্ডলের ত্রিংশ সূক্তের নবম ঋকের অর্থ নিষ্পত্তিতেও বুঝিতে পারা যায়, ইন্দ্রকে আহ্বান করা হইতেছে;—'ইন্দ্র বহুলোকের নিকট গমন করেন। পুরাতন আবাস অর্থাৎ স্বর্গ হইতে আমি তাঁহাকে আগমনের জন্য আহ্বান করি। পিতা তাঁহাকে পূর্ব্বে আহ্বান করিয়াছিলেন।' ইহাতে আর্য্যগণের মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতে আগমনের প্রসঙ্গ কোনক্রমেই উত্থাপিত হইতে পারে না। ইন্দ্র স্বর্গলোকে অবস্থিতি করিতেছিলেন; তাঁহার অনুগ্রহলাভের জন্য ঋষি তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। ইহা ভিন্ন অন্য অর্থ উহাতে কোনমতেই সূচিত হয় না। এক্ষণে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—স্বর্গকে প্রত্নৌক (পুরাতন নিবাসস্থান) বলা হইল কেন? ইহার দ্বিবিধ কারণ উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর। প্রথমতঃ, যাঁহা হইতে উৎপত্তি, যাঁহাতে স্থিতি এবং যাঁহার অঙ্গে লয় হয়, তাঁহার সন্নিধানই স্বর্গ। তাঁহা হইতে যখন উৎপত্তি, তখন তিনিই পুরাতন আবাস-স্থান নহেন কি? এ অর্থেও প্রত্নৌক বা পুরাতন আবাস-স্থান হইতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, বলিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রে দেখিতে পাই, যুগে যুগে অসংখ্য ইন্দ্র-উপেন্দ্রের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। তাহাতে অনেকের মনে হইতে পারে,—ইন্দ্র হয় তো কোনও উপাধি বিশেষ। এখন যেমন রাজচক্রবর্ত্তী

---

* ঋগ্বেদের অনুবাদে ম্যাক্সমুলারও এই অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মত,—"The stepping of Vishnu is emblamatic of the rising, the culminating and setting of the sun."—Max Muller's *Translation of Rig Veda.*

সম্রাট্ বিভিন্ন জনপদের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। পুরাকালেও ইন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া, হয় তো কোনও মহাপুরুষ ধরণীমণ্ডলে একচ্ছত্র-প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। বেদে, পুরাণে, প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই,—কোনও এক নৃপতির পৃষ্ঠপোষণে অগ্রসর হইয়া, ইন্দ্র কোথাও অপর নৃপতিকে পরাজিত করিতেছেন, কখনও বা দস্যুদলেকে দমন করিয়া দেশে শান্তি-স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। রূপক বলিয়া মনে না হইলে, 'ইন্দ্র' শব্দে সেই সকল স্থলে, দেশপতি সম্রাট অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না কি? বিশেষতঃ, যখন পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া, ইন্দ্র-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, পৃথিবী-পালন করিতেছেন, তখন এরূপ সিদ্ধান্ত কখনও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সেই ইন্দ্রের রাজধানী 'স্বর্গ' বা ইন্দ্রালয় নামে অভিহিত হইত। বিপন্নের বিপদোদ্ধারে, শিষ্টের পালনে ও দুষ্টের দমনে রাজাই একমাত্র আশ্রয়-ভরসা ছিলেন। সুতরাং তাঁহার স্তুতিবাদে ঐ মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে,—এমন কথাও কেহ বলিতে পারেন। কিন্তু "ইন্দরালয়"—সেই ইন্দ্রালয় কিনা, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যদি তাহাই মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে 'ইন্দরালয়' ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বলিলেও বলা যাইতে পারে। এক সময়ে, যখন ভারতবর্ষের সীমানা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ঐ 'ইন্দরালয়' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অথবা 'ইন্দ্রালয়' (ইন্দ্রের রাজধানী) রূপে আপনার রাজধানীকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য কেহ ঐ নগর-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আর্য্যগণের আদি-বাসস্থানের প্রসঙ্গ কোনক্রমেই আসিতে পারে না। আরও এক কথা;—অধুনা যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ মানব-দৃষ্টির অন্তরালে, আমাদের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বহির্ভাগে, অবস্থিত; পুরাকালেও সাধারণের দৃষ্টিতে হয় তো দেবগণ সেই-ভাবেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। এখন যেমন মন্ত্রোচ্চারণে, পূজার প্রক্রিয়ায়, তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকি, তখনও হয় তো সাধারণের মধ্যে সেই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। এখন যেমন তাঁহাদের আবাস-স্থান স্বর্গ হইতে তাঁহাদের আনয়ন জন্য আহ্বান করিয়া থাকি, তখনও হয় তো সেইরূপভাবেই তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইত। কাজেই প্রত্নোক বা পুরাতন আবাস-স্থান স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন,—সূক্তে এইরূপ অর্থ উপলব্ধি হইতে পারে। তাহাই সঙ্গত। যাহা হউক, যিনিই যেরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করুন না কেন, প্রাচীন নিরুক্তকারগণ যেরূপ অর্থ-নিষ্পত্তি করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমান্য করিবার কোনই উপায় নাই। টীকা বা ব্যাখ্যা যতই প্রাচীন হইবে, ততই মূলের অনুগত থাকিবে,—এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। পুরাকালে শিষ্য-পরম্পরাক্রমে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ক্রমপর্য্যায়-অনুসারে পর পর চলিয়া আসিত। অধস্তন বংশ, পূর্ব্বতন বংশের নিকট সে ব্যাখ্যা শিক্ষা পাইতেন। সুতরাং প্রাচীন ব্যাখ্যাই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,—আর্য্য-হিন্দুগণ ভারতবর্ষেরই প্রাচীন অধিবাসী; তাঁহারা অন্য দেশ হইতে কখনই ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি-স্থাপন করেন নাই।

'প্রত্নোক' শব্দে পূর্ব্ব-বাসস্থান অর্থ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহাতে ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর কোনও দেশ বুঝাইতে পারে না। পণ্ডিতগণ বলেন,—'সরস্বতী নদীর নাম ঋগ্বেদে অধিক সংখ্যক বার উল্লিখিত হইয়াছে। সরস্বতী এবং গঙ্গার নাম ঋগ্বেদের প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ দুই নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশেই আর্য্যগণের আদি-বাস হওয়া সম্ভবপর।' যদি হিম-প্রধান দেশ বা উত্তর দেশ হইতেই তাঁহাদের ভারত-আগমনের যুক্তি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে গঙ্গা ও সরস্বতীর উৎপত্তি-স্থানে—হিমালয়-প্রদেশে, তাঁহাদের আদি-বাসস্থান ছিল বলিতে পারা যায়। মনু ও জলপ্লাবনের প্রসঙ্গেও এ যুক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। শতপথ-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,—"স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপেদে তং স মৎস্য উপন্যা-পুপ্লুবে তস্য শৃঙ্গে নাবঃ পাশং প্রতিমুমোচ তেনৈতমুত্তরং গিরিমতিদুদ্রাব।" অর্থাৎ,—'জলপ্লাবনে পৃথিবী জলমগ্ন হইলে, মনু নৌকারোহণ-পূর্ব্বক দ্রুতবেগে উত্তর গিরিতে উপনীত হইয়াছিলেন। নৌকারোহণের সময় মৎস্য তাঁহার নিকটে আগমন করে এবং তাহারই শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া তিনি দ্রুতগতিতে হিমালয়ে গমন করেন।' মনু হইতেই মন্বন্তরের সৃষ্টি আরম্ভ। তিনিই মানবগণের আদি পুরুষ। জলপ্লাবনের সময় হিমাচলে অবস্থান-পূর্ব্বক তিনি ভূতলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, জলপ্লাবন-কালে তাঁহার পূর্ব্বাবাস হিমালয়ের প্রসঙ্গও ঐ ঋকের লক্ষ্য হইতে পারে। শতপথ-ব্রাহ্মণোক্ত অংশের 'অতিদুদ্রাব' শব্দে কেহ কেহ 'অতিক্রম' অর্থ সিদ্ধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—'জলপ্লাবনের সময় হিমালয় অতিক্রম করিয়া মনু মধ্য-এসিয়ায় উপনীত হইয়াছিলেন। সেখান হইতেই তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আগমন করেন।' এ বিষয়ে দুইটী আপত্তির কথা উত্থাপিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ—'অতিদুদ্রাব' শব্দে 'অতি দ্রুতগতি' অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। নিরুক্তে 'অতি' শব্দ—'অতিশয়' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। * অর্থাৎ, অতি দ্রুতবেগে হিমালয়াভিমুখে মনুর নৌকা সংবাহিত হইয়াছিল,—শতপথ-ব্রাহ্মণের উক্তিতে তাহাই উপলব্ধি হয়। তার পর, ব্রাহ্মণে ঐ বিষয়ে আরও লিখিত আছে,—"স হোবাচ অপি পরঃ বৈ ত্বা বৃক্ষে নাবং প্রতিবধ্নীষ তন্তু ত্বা মা গিরৌ সন্তমুদকমন্তশ্চেৎ-সীৎ। যাবদুদকং সমবায়াৎ তাবদন্ববসর্পাসীতি স হ তাবত্তাবদেবান্বব সসর্প।" অর্থাৎ, মৎস্য বলিল,—'আপনাকে জলপ্লাবন হইতে পরিত্রাণ করিলাম। এক্ষণে বৃক্ষে নৌকা-বন্ধন করিয়া আপনি অবস্থান করুন। পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে জল যেমন ক্রমশঃ কমিয়া নীচের দিকে নামিবে, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পর্ব্বত-শৃঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, নৌকা সহ নিম্নে অবতরণ করিবেন।' মৎস্যের এই উক্তিতেই বা কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি না কি—যে দিক হইতে নৌকা হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, হিমালয় হইতে পুনরায় সেই দিকেই তাহা ফিরিয়া গিয়াছিল? ইহাতে ভারতবর্ষই আদি-স্থান, ভারতবর্ষ হইতেই মনুর নৌকা হিমালয় প্রদেশে গমন করিয়াছিল এবং হিমালয় হইতেই তাহা প্রত্যাবৃত্ত হয়,

'প্রত্নোক' শব্দ-তত্ত্ব।

* "অতি সু ইতি অভিপূজিতার্থে।" টীকাকার দুর্গাচার্য্য উদাহরণ স্থলে 'অতিধন', 'সুব্রাহ্মণ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

—বেশ বুঝিতে পারা যায়। এ হিসাবেও, 'প্রত্নোক' শব্দে হিমালয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানবিশেষ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—যদি 'অতিদ্রুদ্রাব' শব্দে 'অতিক্রম' অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করা যায়, তাহাতেই বা আদি-স্থান কোথায় ছিল, বুঝিতে পারি? মনু নৌকাযোগে হিমালয় অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন,—এ বাক্যে তাঁহার (মনুর) আদি-বাসস্থান ভারত-বর্ষেই সূচিত হয়। সুতরাং 'প্রত্নোক' শব্দে পুরাতন বাসস্থান ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথাও হওয়া সম্ভবপর নহে।

সরস্বতী গঙ্গা প্রভৃতির উপকূলে বাস-প্রসঙ্গেও আর্য্যগণের পুরাতন আবাস-স্থানের আভাস পাইতে পারি। আর্য্য-ঋষিগণ—তপঃসিদ্ধ যোগমগ্ন মহাপুরুষগণ—হিমালয়-প্রদেশে বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিতেন। কাশ্মীরের মনোহর উপত্যকায় তাঁহাদের বসবাসের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু প্রভৃতির উৎপত্তি-ক্ষেত্র। পুরাতন আবাস-স্থান শব্দে ঐ সকল পুণ্যপূত প্রদেশকেও বুঝাইতে পারে না কি? যাঁহারা বৈদিক সূক্ত-সমূহকে ঋষি-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের প্রত্যয়ের জন্য বলিতে পারি না কি,—যে ঋষি 'প্রত্নোক' শব্দ-যুক্ত ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন, হয় তো তাঁহার কোনও পিতৃপুরুষ হিমালয়-প্রদেশে যোগ-সাধনায় জীবনযাপন করিয়াছিলেন? ফলতঃ, সরস্বতী, গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতির নাম দৃষ্টে ভারতের বহির্ভূত কোনও স্থানকে আর্য্যগণের আদি-নিবাস বলিয়া কোনক্রমেই মনে করা যাইতে পারে না। বৈদিক সূক্ত-সমূহে সরস্বতীর সহিত দৃষদ্বতী, আপয়া, সরযূ, সিন্ধু প্রভৃতির নাম উল্লেখ আছে। তাহাতে প্রতীত হয়,—ঐ সকল নদী পরস্পর কোনও-না-কোনরূপ সংশ্রবযুক্ত ছিল। সরস্বতী নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কত কাল হইতে এই প্রবাদ এ দেশে প্রচলিত আছে। এখনও প্রয়াগে, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে, স্নান করিতে গিয়া হিন্দুগণ তন্নিকটে সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লন। সাধারণের বিশ্বাস,—কালে সরস্বতী অন্তর্হিতা হইয়াছেন। প্রাকৃতিক নিয়মে এ পরিবর্ত্তন—এ অন্তর্দ্ধান—অসম্ভব নহে। ফলতঃ, সরস্বতী নাম্নী নদীর অস্তিত্ব ভারতবর্ষেই প্রমাণিত হয়; গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতিও পৃথিবীর অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান 'স্বাত'—প্রাচীন 'সু-অস্তিন'—প্রদেশকে কেহ কেহ সরস্বতীর স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। স্বাত-প্রদেশ পূর্ব্বে কাশ্মীর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং কাশ্মীর-দেশ আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, সে হিসাবেও ভারতবর্ষই আর্য্যগণের আদিম নিবাসস্থান বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে কাশ্মীরেই আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ভারতের উত্তর শীতপ্রধান দেশ অথচ রমণীয়তার আধার—এবম্বিধ নানা কারণে কহ্লণ মিশ্র কাশ্মীরকেই সেই পুণ্যভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"ত্রিভুবন মধ্যে রত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমি, ভারতের উত্তর দিক, উত্তর দিকে হিমালয় এবং হিমালয়ে কাশ্মীর শ্লাঘনীয়।"* গঙ্গার উৎপত্তিস্থান, সরস্বতীর লীলা-

সরস্বতী প্রভৃতির প্রসঙ্গে।

* রাজ-তরঙ্গিণী, প্রথম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

নিকেতন, গ্রীষ্মকালেও সূর্য্য-তাপ অতীব্র-ভাবাপন্ন, ত্রিদিবদুর্ল্লভ দ্রব্য অনায়াস-লভ্য,—কাশ্মীরের বিচিত্রতা সম্বন্ধে কহ্লণ মিশ্র এইরূপ কত কথাই কহিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রবর্ণিত আদিম আর্য্য-নিবাসের সহিত রাজ-তরঙ্গিণী-প্রণেতার উক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়,—কাশ্মীর হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মহিমাই পুনঃপুনঃ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ প্রদেশকেই আদি-আর্য্যনিবাস বলা যাইতে পারে।

মরুদ্গণের উপাসনা প্রসঙ্গে।

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের প্রথম ঋকের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশেও কেহ কেহ আর্য্যগণের পুরাতন বাসস্থানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া থাকেন। সেই ঋকটী এই,—"কে ষ্ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য়। পরমস্যাঃ পরাবতঃ ॥" অর্থাৎ, 'হে শ্রেষ্ঠ নেতৃগণ! কে তোমরা সুদূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে একে একে উপস্থিত হইয়াছ?' এই ঋক হইতে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—কোনও এক দূরবর্ত্তী প্রদেশে উচ্চ ভূমিখণ্ডে (অর্থাৎ মধ্য-এসিয়ায়) আর্য্যগণের আদিম নিবাস ছিল। দূরবর্ত্তী প্রদেশ বা উচ্চস্থান হইলেই যে মধ্য-এসিয়া বলিয়া বুঝিতে হইবে, তাহাই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ, সূক্তে দেখিতে পাই, শ্যাবাশ্ব ঋষি মরুদ্গণের উপাসনায় ঐরূপ উক্তি করিতেছেন। 'মরুদ্গণ' শব্দে কি বুঝিতে পারি? মরুদ্গণই কি আর্য্যগণ? কৈ,—কোথায়ও তো সে পরিচয় সন্ধান করিয়া পাই না। মরুদ্গণ—বায়ু-দেবতার নামান্তর। 'মরুৎ' শব্দ 'মৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন; ধাত্বর্থ—'হনন করা বা আঘাত করা।' 'মরুৎ' শব্দে আঘাতকারী বা ধ্বংসকারী বায়ুপ্রবাহ। * ঋগ্বেদের মতে, রুদ্র মরুদ্গণের পিতা; পৃশ্নি † তাঁহাদের মাতা। এতৎসম্বন্ধে নানা পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাণের মতে,—দেবরোষে দিতির পুত্রগণ নিধন-প্রাপ্ত হইলে, পতির নিকট দিতি অজেয় পুত্র-লাভের বর কামনা করেন। পতি কশ্যপের বরে দিতির গর্ভে মরুতের জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় ইন্দ্র বজ্রাঘাতে মরুৎকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন। তাহাতে উনপঞ্চাশ অংশে বিভক্ত হইয়া মরুৎ উনপঞ্চাশ বায়ু নামে পৃথিবীতে পরিচিত হয়। মরুদ্গণ—সেই বায়ু-সমূহেরই নামান্তর। যাহা হউক, মরুদ্গণ শব্দে বায়ুদেবতাকেই বুঝাইয়া থাকে; তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া কল্পনা করিয়া লইবার কোনই কারণ দেখিতে পাই না। তাঁহারা যখন দেবতা; দেবতার আবাস-স্থান যখন স্বর্গভূমি; শ্যাবাশ্ব ঋষি তখন তাঁহাদিগকে দূরদেশ (স্বর্গ) হইতে আসিয়াছেন—বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং প্রোক্ত ঋকে আর্য্যগণের আদি-বাস সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না।

* 'মৃ' ধাতু হইতেই মার্স (Mars) অর্থাৎ লাটিনদিগের যুদ্ধ-দেবতার উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর। গ্রীকদিগের আর্স (Ares) দেবতা—মাক্সমুলারের মতে—মৃ ধাতুর 'ম'কারের লোপেই সিদ্ধ হইয়াছে।

† "পৃশ্নেঃ নানাবর্ণযুক্তায়াভূর্মেঃ ইতি সায়ণঃ।" সায়ণের মতে নানা-বর্ণ-যুক্তা পৃথিবীই পৃশ্নি নামে অভিহিতা। পৃথিবীই মরুদ্গণের জননী। 'নির্ঘণ্ট' নামক প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে পৃশ্নি শব্দে 'আকাশ' অর্থ দৃষ্ট হয়। আধুনিক অভিধান সমূহে 'রশ্মি, কিরণ, স্পর্শ' প্রভৃতি অর্থেও 'পৃশ্নি' পদের ব্যবহার দেখা যায়। মরুদ্গণ শব্দ বায়ু দেবতার দ্যোতক হইলে, নানাবর্ণযুক্ত আকাশকে তাঁহাদের মাতা বলা অযৌক্তিক নহে। রোথ (Roth), লংলয় (Longlois), অধ্যাপক মাক্সমুলার (Max Muller) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, পৃশ্নি শব্দে 'মেঘ' অর্থ সিদ্ধ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদে যক্ষু, রুশম, হরিয়ুপীয়া প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ আর্য্য-নিবাস সম্বন্ধে আর এক গভীর সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন,—"যক্ষু, যক্ষুস—অক্ষস (Oxus) শব্দের নামান্তর। রুশম শব্দে রুশ-রাজ্যকে বুঝাইয়া থাকে। হরিয়ুপীয়া—ইউরোপের আদি নাম। 'অক্ষস' নদ—মধ্য-এসিয়ায় বিদ্যমান। রুশ-রাজ্যের এবং ইউরোপের সীমান্ত প্রদেশ মধ্য-এসিয়ায় অবস্থিত।" সুতরাং মধ্য-এসিয়ায় আর্য্যগণের আদিম নিবাস বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি সূত্রে ঐ সকল নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা করিলে, এবম্বিধ সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। ঋগ্বেদের যে সূক্তে (সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের উনবিংশ ঋকে) অজ, শীগ্রু, যক্ষু (যক্ষু) প্রভৃতি জনপদের বা নদীর নাম উল্লেখ আছে, সেই ঋকটীর বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; তাহা পাঠ করিলে, বিষয়টী কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঋকের বঙ্গানুবাদ,—"এই যুদ্ধে ইন্দ্র ভেদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যমুনা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। অজ, শীগ্রু, যক্ষু এই তিনটী জনপদ ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার দিয়াছিল।" এই অনুবাদ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায়,—ইন্দ্র দেশান্তরে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে ভেদ নামক নৃপতি বা যোদ্ধৃপুরুষ নিহত হন ; এবং অজ, শীগ্রু, যক্ষু—এই তিনটী জনপদের অধিবাসীরা ইন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে উপহার-প্রদান করিতে বাধ্য হয়। আরও বুঝা যায়,—ঐ সকল জনপদ যমুনার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। মধ্য-এসিয়ায় অধুনা অক্ষস নামে একটী নদীর পরিচয় পাওয়া যায়—সত্য ; কিন্তু তাহাই যে বেদোক্ত যক্ষু বা যক্ষু তাহা কোনক্রমেই বলিতে পারা যায় না। কারণ, যমুনা নাম্নী নদীর অস্তিত্ব ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। রুশম জনপদের উল্লেখ যে ঋকে দৃষ্ট হয় (পঞ্চম মণ্ডলের ত্রিংশ সূক্তের দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ ঋকে), তাহাতেও সেই স্থানে আর্য্য-গণের আদি-বাস ছিল বলিয়া কোনক্রমেই বুঝা যায় না। সূক্ত কয়েকটির অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ;—"হে অগ্নি! রুশমগণ আমাকে চারি সহস্র ধেনু প্রদান করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছে ; নেতৃগণের অধিনায়ক ঋণঞ্চয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত ধেনুরূপ ধন সকল আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ১২ ॥ হে অগ্নি! রুশমগণ আমাকে একটী সুন্দর গৃহ এবং সহস্র সহস্র ধেনু প্রদান করিয়াছে ; তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি শেষ হইলে, উগ্র সোমরস ইন্দ্রকে উল্লসিত করিয়াছিল। ১৩ ॥ রুশমগণের অধিপতি ঋণঞ্চয় (উপস্থিত হইবামাত্র) তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি অতিবাহিত হইল ; বভ্রু আহূত হইয়া বেগগামী অশ্বের ন্যায় গমন পূর্ব্বক চারি সহস্র ধেনু লাভ করিলেন। ১৪ ॥ হে অগ্নি ! আমরা রুশমগণের নিকট চারি সহস্র ধেনু লাভ করিয়াছি এবং জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া যাগার্থ-প্রস্তুত উজ্জ্বল লৌহ-কলস (সায়ণের মতে হিরণ্ময় কলস) গ্রহণ করিয়াছি। ১৫ ॥" অগ্নি-দেবতার উপাসনায় বভ্রু ঋষি এই ঋঙ্‌মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া টীকাকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আর্য্যগণের আদি-বাসস্থানের বিষয় যে কি আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। হইতে পারে,—ঋণঞ্চয়-নামা কোনও আর্য্য-বংশীয় নৃপতি এককালে রুশ-রাজ্যে আপন আধিপত্য বিস্তার

যক্ষু, রুশম প্রভৃতির প্রসঙ্গে।

করিয়াছিলেন; হইতে পারে—তিনি যজ্ঞোপলক্ষে চারি সহস্র ধেনু ও সুবর্ণ কলস সকল দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনক্রমেই বুঝিতে পারা যায় না যে, রুশ-রাজ্যে বা মধ্য-এসিয়ায় আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান ছিল। হরিয়ূপীয়া সম্বন্ধেও একই ব্যক্তব্য। ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তবিংশতি সূক্তে পঞ্চম ঋকে হরিয়ূপীয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই, হরিয়ূপীয়ার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত (বরশীখের পুত্র) বৃচীবানের বংশধরদিগকে ইন্দ্র বধ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন হরিয়ূপীয়া সম্বন্ধে অপর কোনও প্রসঙ্গ ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় না। হরিয়ূপীয়া—ইউরোপের আদি-নাম হইলেও, উহা যে আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান ছিল, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা কোন প্রকারেই প্রমাণিত হয় না। এইরূপ বেদোক্ত অন্যান্য জনপদের এবং নদ-নদীর আলোচনায় আমরা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথাও আর্য্যগণের আদি-নিবাস নির্দ্দেশ করিতে পারি না। আরও এক কথা, যক্ষু রুশম, হরিয়ূপীয়া প্রভৃতি নাম,—বৈদিক সূক্তের দুই এক স্থলে মাত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতির নাম,—কত স্থানে, কত প্রকারেই উল্লিখিত আছে! তদ্দ্বারাও এই ভারতবর্ষেই আর্য্যাদিগের আদি-বাসস্থান ছিল বলিয়া বুঝা যায়। তার পর, মন্বাদি প্রণীত শাস্ত্রের আলোচনায় আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান আর্য্যাবর্ত্তের যে সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়াছি, আমাদের সিদ্ধান্তের পক্ষে সে প্রমাণ যে বিশেষ বলবৎ প্রমাণ, তাহা বলাই বাহুল্য। *

আদি-বাস প্রসঙ্গ বিবিধ বক্তব্য।

মধ্য-এসিয়ায় বা উত্তর-মেরু-বাস সম্বন্ধে আরও যে কয়েকটী যুক্তি আছে, সে গুলিও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। উত্তর দেশে ভাষা শিক্ষার জন্য আর্য্যগণ গমন করিতেন,—কৌষীতকী ব্রাহ্মণে তাহার উল্লেখ আছে। সে দেশ হিমপ্রধান ছিল; আর্য্যগণ হিম ঋতু ধরিয়া বৎসর গণনা করিতেন (পুষ্যমে তনয়ং শতং হিমাঃ।১।৬৪।১৪॥ তরেম তরসা শতং হিমাঃ। ৫।৫৪।১৫॥ মদেম শত হিমাঃ সুবীরাঃ। ৬।১০।৭॥ ইত্যাদি)। তাঁহাদের প্রার্থনায় প্রায়ই প্রকাশ পাইত,—"আমরা যেন পুত্রপৌত্র সহ শত-হিম-ঋতু সুখে অতিবাহিত করি।" আর্য্যগণ, উত্তর-দেশকে পবিত্র দেশ বলিয়া মনে করিতেন; তাই দাক্ষিণাত্যের কোনও প্রসঙ্গই বেদে দৃষ্ট হয় না।—এবম্বিধ যুক্তি-পরম্পরার দ্বারা এক শ্রেণীর পণ্ডিতমণ্ডলী ভারত ভিন্ন অন্য দেশকে আর্য্যগণের আদি-নিবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে, এ সকল যুক্তির কোনও সারবত্তা নাই বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। উত্তর দেশ পবিত্র দেশ বা উত্তর দেশে আর্য্যগণ ভাষা-শিক্ষা করিতে যাইতেন, এতদুক্তিতে হিমালয়-পর্ব্বতস্থিত মহর্ষিগণের তপোবন প্রভৃতির প্রসঙ্গই মনে আসিতে পারে। কৈলাসে, বদরিকাশ্রমে ঋষি-তপস্বিগণ যোগ-সাধনায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদিগের নিকট শাস্ত্র-তত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য বিদ্যার্থিগণ গমন করিতেন,—ইহাতে তাহাই মনে হয়। সেই সকল স্থান আজিও পুণ্যময় পবিত্র তীর্থ মধ্যে পরিগণিত; তৎকালেও পুণ্যস্থান মধ্যে গণ্য ছিল। সুতরাং উত্তর-দেশ অর্থে হিমগিরি-সন্নিহিত সেই পুণ্যাশ্রম-সমূহকেই বুঝাইত। আর্য্যগণ উত্তর

* "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

দেশে গমন করিতেন বলিলেই যে তাঁহারা উত্তর দেশ হইতে আসিয়া এতদ্দেশে বসবাস করিয়াছিলেন, তাহা কোনক্রমে ধারণা করিতে পারা যায় না। হিম ঋতুর বা 'হিমাঃ' শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়াই যে মধ্য-এসিয়ায় আর্য্যগণের বাস হইবে, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর! বেদে যেমন হিম ঋতুর কথা আছে, তেমনি শরৎ ঋতুর, হেমন্ত ঋতুর প্রসঙ্গও বেদে দেখিতে পাই। যথা,—"তিস্রো যদগ্নে শরদস্ত্বামিচ্ছুচিং। ১।৭২।৩॥ দদাশিম শরত্ত্রির্মরুতো বয়ং। ১৮৬।৬॥ চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিন্দৎ। ২।১২।১১॥ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং। ৭।৬৬।১৬॥" অর্থাৎ,—'মরুদ্গণ তিনটী শরৎকাল-ব্যাপী যজ্ঞে পূজা করিয়াছিলেন। মরুদ্গণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া বহু শরৎকালে অর্থাৎ বহু বৎসর হব্য প্রদান করিতেছি। যেন শত শরৎ দেখিতে পাই, শত শরৎ ঋতু জীবিত থাকি।' যদি 'হিম' শব্দ দেখিয়া হিমপ্রধান দেশেই আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে, 'শরৎ' শব্দ দেখিয়া শরৎ-ঋতু-প্রধান দেশেই আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান ছিল, বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে ষড় ঋতু বিদ্যমান। যে ঋতুতে যে দেবতার উপাসনা বা যে কার্য্য সমাহিত হইয়াছিল, ঋকে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। ফলতঃ, হিমালয় হইতে মধ্য-ভারত পর্য্যন্ত জনপদ-সমূহেই যে প্রাচীন আর্য্যগণের আদি-নিবাস ছিল, তাহার বিরুদ্ধ যুক্তি-সমূহ কদাচ বলবৎ বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলারের মত পূর্ব্বেই আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় পণ্ডিত-প্রবর মুইর সেই মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। কর্জ্জন সাহেবও এতদ্বিষয়ের আলোচনায় আর্য্যগণের আদি-বাস ভারতেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্জ্জনের সিদ্ধান্তেরই পোষকতা করিয়া মিঃ মুইর বলিয়াছেন,—"আর্য্যগণ কথনই পশ্চিম প্রদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করেন নাই। বরং সেই সকল প্রদেশের সভ্য-জাতিরা ভারতীয় আর্য্যগণের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্যগণ উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম হইতে কথনই ভারতে আগমন করেন নাই। যেহেতু, সেই প্রাচীন কালে পৃথিবীতে আর যে কোনও সভ্য জাতি বিদ্যমান ছিল, এবং তাঁহাদের হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণের সভ্যতার এবং ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল,—ভাষাতত্ত্ব বা ইতিহাস হইতে তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।" মিঃ মুইর আরও বলেন,—'আমি যতদূর জানি, তাহাতে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি,—কোনও প্রাচীনতম সংস্কৃত গ্রন্থে কোথাও দৃষ্ট হয় না যে, বিদেশীয় কোনও জাতি হইতে ভারতীয় হিন্দুগণের উৎপত্তি হইয়াছে।··· হিন্দুগণ এই দেশ (ভারতবর্ষ) ভিন্ন যে পূর্ব্বে অন্য কোনও দেশে কথনও বাস করিতেন, তাহার কোনই প্রমাণ নাই।'* কর্জ্জন সাহেবের মতের আলোচনায় আর একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বের অবতারণা করা যাইতে পারে। সে তত্ত্ব—আর্য্যগণের ভাষা-তত্ত্ব। সংস্কৃতই আর্য্য-

---

* "They could not have entered from the west, because it is clear that the people who lived in that direction were descended from these very Arians of India...nor could the Arians had entered India from the north or north-west, because we have no proof from history or philosophy that there existed any civilised nation with a language and religion resembling theirs which could have issued from either of those quarters at that early period and have created Indo-Arian civilization."—Muir's *Sanskrit Texts.*

গণের আদি-ভাষা। ভারতবর্ষ আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান বলিয়া ভারতবর্ষের সেই আদি ভাষা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে আর্য্যগণ পৃথিবীর অন্যত্র আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই সেই দেশের ভাষার সহিত আর্য্যগণের ভাষার অনেক শব্দ মিশিয়া আছে। এ বিষয়ে কর্জ্জনের মত,—'সংস্কৃত সাহিত্যের ভিত্তির উপর অধিকাংশ আর্য্যজাতির ভাষা-সৌধ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। সেই সকল জাতির ভাষায় যে সংস্কৃত-বহুল পদ দৃষ্ট হয়, তাহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম,—কতকগুলি আর্য্য-সন্তান রাজনৈতিক বা ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লবে বিধ্বস্ত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে যে স্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করেন, সেই সেই স্থানের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়,—আর্য্যগণ ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রদেশ সমূহ আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। সেই সকল দেশে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইলে, তাঁহাদের শিক্ষার ও ভাষার প্রভাব সেই সেই দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।'*

ভাষাতত্ত্ব আলোচনায়।

ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলে, এতদ্বিষয় বিশদীকৃত হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষা—পৃথিবীর আদি ভাষা। সংস্কৃত ভাষা—পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন ভাষা। সংস্কৃত ভাষা—বিজ্ঞান-সম্মত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা—মৌলিক ভাষা। সংস্কৃত ভাষা হইতেই পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। এ সকল কথা যে কেবল আমরাই বলিতেছি, তাহা নহে; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও যাঁহারা বিবিধ ভাষার আলোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে ইহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের: মধ্যে, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার, সার উইলিয়ম জোন্‌স্, অধ্যাপক বোপ, অধ্যাপক উইলসন্, সমালোচক শ্লেজেল, সার উইলিয়ম হাণ্টার, মিঃ পোকক, প্রফেসর হীরেণ, মুসে ডুবো, মিঃ ওয়েবার প্রভৃতি যাঁহারাই এই সংস্কৃত ভাষার বিষয় আলেচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষার মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছেন। ম্যাক্সমূলার বলেন,—'পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে সংস্কৃতই শ্রেষ্ঠ ভাষা। গণিত-শাস্ত্র যেমন জ্যোতির্ব্বিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ, সংস্কৃত ভাষাও সেইরূপ ভাষা-বিজ্ঞানের মূলীভূত।' † প্রফেসর বোপ বলেন,—'গ্রীক এবং লাটিন ভাষা অপেক্ষাও সংস্কৃত ভাষা পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন, অধিকতর ভাবদ্যোতক, সৌন্দর্য্যশালী এবং শব্দচাতুর্য্যময়।' ‡ সমালোচক শ্লেজেল বলেন,—'সম্পূর্ণ এবং বিশুদ্ধ বলিয়াই উহার নাম সংস্কৃত।' § সার

* "The nations whose speech is derived from Sanskrit have sprung from the gradual dispersion of the ancient Arian race of India, such dispersion being occasioned by political or religious causes, issuing in the expulsion from India of the defeated parties, and their settlement in different unoccupied countries chiefly to the westward, or, that the Arians invaded the countries to the west and north-west of India, and conquered the various tribes inferior to themselves who were there in possession, imposing upon thom their own institutions and language."—*Muir's Sanscrit Texts.*

† Max Muller's *Science of Language.*

‡ "Sanskrit is more perfect and copious than the Greek and Latin and more exquisite and eloquent than either."—Prof Bopp, *Edinburgh Review.*

§ শ্লেজেল—জর্ম্মণদেশীয় প্রসিদ্ধ সমালোচক। তিনি সত্যই বলিয়াছেন,—"Justly it is called Sanskrit, *i.e.* perfect, finished."—Schelegel's *History of Literature.*

উইলিয়ম হাণ্টার বলেন,—'ইউরোপীয়গণ যে সময় হইতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই তাঁহাদের ভাষা-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে।'* মিঃ পোকক বলেন,—গ্রীক ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন।' † অধ্যাপক হীরেণ বলেন,—'সংস্কৃত ভাষাই প্রাচীন জেন্দ ভাষার আদিভূত।' ‡ মুসে ডুবোর মতে,—বর্ত্তমান ইউরোপের সকল ভাষারই আদিভূত—সংস্কৃত ভাষা।' § ডাঃ ব্যালাণ্টাইন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন,—"সকল 'এরিয়ান' বা 'ইন্দো-ইউরোপীয়ান' ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন।" ব্যালাণ্টাইনের এতদুক্তির সমর্থনে, অধ্যাপক বোপ বলেন,—'এককালে সংস্কৃত ভাষাই পৃথিবীর একমাত্র ভাষা ছিল।' সংস্কৃত ভাষার পূর্ণতার আর এক প্রধান পরিচয়—একই অর্থ-বাচক শব্দ সংস্কৃত ভাষায় যত অধিক আছে, পৃথিবীর অপর কোনও ভাষায় তাহা দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই এতৎসম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়া সংস্কৃত ভাষার নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফরাসীদেশীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ 'লে পেরে পাওলিনো' বলিয়াছেন,—'লাটিন ভাষা অপেক্ষাও সংস্কৃত ভাষা অধিকতর শব্দসম্পন্ন। একই বস্তু বুঝাইতে সংস্কৃতে বহু দৃষ্ট হয়। সূর্য্যের ত্রিংশাধিক নাম এবং চন্দ্রের বিংশাধিক নাম দেখা যায়। গৃহ বুঝাইতে বিশটী শব্দ, প্রস্তর বুঝাইতে ছয়টী বা সাতটী শব্দ, বৃক্ষ-পত্র বুঝাইতে পাঁচটী শব্দ, বানর বুঝাইতে দশটী এবং কাক বুঝাইতে নয়টী শব্দ সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যমান।' ** এই উক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া মিঃ জেম্‌স্ মিল লিখিয়া গিয়াছেন,—'একটী শব্দে একটী ভাব ব্যক্ত করিবে,—এক বস্তুর একটি ভিন্ন অধিক নাম থাকিবে না,—ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের ইহাই লক্ষণ।' অধ্যাপক উইলসন, মিলের এই উক্তির অতি যুক্তিসঙ্গত উত্তর প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—'ভাষার যাহা সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও অভিনবত্ব, তাহাই যদি না থাকিল, তবে কাব্য, বাগ্মিতা, সাহিত্য ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ কিরূপে সম্ভবপর!' এই উত্তর-প্রত্যুত্তরে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যের বিষয় স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এতৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যখন সংস্কৃত-ভাষা—পূর্ণ ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষা হইতেই অন্যান্য জাতীর ভাষার উদ্ভব হইয়াছে; বিশেষতঃ, যখন সংস্কৃত ভাষার আদি-স্থান ভারতবর্ষ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়;—তখন ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথায় আর আর্য্যগণের আদি-নিবাস হইতে পারে? ফলতঃ, বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয়,—ভারতবর্ষেই আর্য্যগণের আদি-নিবাস, এবং ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহারা উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে ও অন্যান্য দেশে গমন করিয়া আপনাদের আধিপত্য বিস্তারে—দিকে দিকে আপনাদের যশঃপ্রভা বিকীরণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

---

*"The modern philology dates from the study of Sanskrit by the Europeans."—Sir. W.W. Hun er, *Imperial Ga etteer : India.*

† The Greek language is a derivation from the Sanskrit."—Pocoke, *India in Greece.*

‡ "In point of fact, the Zind is derived from the Sanskrit."—Prof Heeren's *Historical Researches.* § Mons. Dubois, *Bible in India.*

** লে পেরে পাওলিনো (Le Pere Paolino) একই বস্তু বুঝাইবার জন্য কয়েকটী মাত্র শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত-ভাষায় এইরূপ বস্তু বুঝাইবার আরও বহু শব্দ বিদ্যমান। তিনি সূর্য্যের ত্রিশটির অধিক নামের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যে সূর্য্যের সহস্রাধিক নাম অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। পৃথিবীর [illegible] হাবভাবকে উল্লেখের চেষ্টা পাইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আর্য্যগণের আধিপত্য-বিস্তার।

[সভ্যতার কেন্দ্রভূমি,—আর্য্যগণের সর্ব্বত্র গতি-বিধি,—মনু-সংহিতায় শক, জবন, চীন, পারদ প্রভৃতির উল্লেখে আর্য্যগণের বিস্তৃতি-নির্ণয় ;—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের নানা স্থানে প্রভাব-প্রতিপত্তি ;—মিশরে ভারতের প্রাধান্য ;—ইথিওপিয়া ও ভারতবর্ষ ;—পারস্য ও ভারতবর্ষ,—ইরাণ প্রসঙ্গ,—জেন্দ আভেস্তার উপাখ্যানে ভারতের অনুস্মৃতি,—জোরওয়াষ্টার ও বেদব্যাস,—জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ ;—ফিনিসীয়া প্রভৃতিতে ভারতের প্রভাব ;—বাবিলোনিয়া ও কালডিয়ার প্রসঙ্গ ;—কোলচিস ও ভারতবর্ষ ;—মিডিয়ায় ভারতের প্রভাব,—আসিরীয়ায় ভারতের প্রাধান্য ;—ব্যাক্‌ট্রিয়ায় আর্য্য-উপনিবেশ ;—বাহ্লিক প্রসঙ্গ,—ডাইওনিসাস, সান্দ্রাকোটস প্রভৃতির কথা ;—গ্রীসে প্রাচীন-ভারতের প্রভাব,—গ্রীসের দেবদেবীর ও পৌরাণিক উপাখ্যানের আলোচনা,—হেলেন ও হেলাস নামের কারণ ;—রোমে ভারতবর্ষের আধিপত্য,—নামের উৎপত্তি,—দেবদেবী ও প্রাচীন রীতি-নীতির প্রসঙ্গ ;—জর্ম্মণী প্রভৃতি জনপদে আর্য্য-হিন্দুগণের প্রভাব,—জর্ম্মণ-শব্দের উৎপত্তি,—'এদ' ও 'বেদ' প্রসঙ্গ ;—স্কাণ্ডেনেভিয়া, উত্তরমেরু (হাইপারবোরিয়া) এবং বৃটিশ-দ্বীপের আদি-ইতিবৃত্ত আলোচনায় ভারতের প্রসঙ্গ ;—চীনরাজ্যে ভারতের প্রাধান্য,—চীনাদের পুরাবৃত্তে ভারতের অনুস্মৃতি,—চীনের প্রাচীন ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারে ভারতের অনুকরণ ;—বিবিধ দেশের বিবিধ তত্ত্বের আলোচনায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব।]

ভারতবর্ষই আর্য্য-সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। ভারতবর্ষ হইতেই আর্য্য-সভ্যতা দিকে-দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বেদ, সংহিতা ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ অবলম্বনে আর্য্য-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। বেদে আর্য্যগণের সহিত আর্য্যেতর (অনার্য্য) জাতিগণের যুদ্ধ বিগ্রহের বিষয় পরিবর্ণিত আছে। তাহাতে আদিম আর্য্য-নিবাস হইতে দিকে দিকে আর্য্যদিগের প্রাধান্য-বিস্তৃতির আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে সুদাস নৃপতির পরিচয় পাই; তিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং পুরাণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার উল্লেখ আছে। মহারাজ সগর সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করেন। তিনি কতকগুলি ক্রিয়াহীন জাতিকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন; তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেশান্তরে বসতি করিতে বাধ্য হইয়াছিল।* বুধ-পুত্র পুরুরবা সমুদ্র-মধ্যস্থিত ত্রয়োদশটী দ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে; এবং তাহাতে সপ্রমাণ হয়,—ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গতি-বিধি ছিল। মহর্ষি মনু স্বদীয় সংহিতা-শাস্ত্রে কয়েকটী ক্রিয়াহীন পতিত-জাতির নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন

সভ্যতার কেন্দ্র-ভূমি।

> "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥
> পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ। পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥
> মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ। ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥"
>
> —মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৪৩শ—৪৫শ শ্লোক

'উপনয়নাদি ক্রিয়া-লোপে কতকগুলি ক্ষত্রিয় জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। পৌণ্ড্র, ঔড্র, দ্রবিড়,

---

* বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, তৃতীয় অধ্যায় এবং মহাভারত প্রভৃতিতে এতদ্বিবরণ বর্ণিত আছে। "পৃথিবীঃ

[illegible] অথব ব

কম্বোজ, যবন, শক, পারদ পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ প্রভৃতি দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরাও কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ক্রিয়া-লোপ-হেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় বহির্জাতি মধ্যে মধ্যে পরিগণিত হয়। আর্য্যভাষাভাষীই হউক, আর ম্লেচ্ছ-ভাষাভাষীই হউক, তাহারা দস্যু-নামে পরিচিত হইয়া থাকে।' মন্বাদি সংহিতার প্রবর্ত্তনার সময়ে কোন্ কোন্ দেশে আর্য্যগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, উপরোদ্ধৃত শ্লোকত্রয় তাহারই নিদর্শন। বর্ত্তমানে যে যে দেশ কাম্বোডিয়া নামে পরিচিত, প্রাচীনকালে তাহাই কম্বোজ নামে অভিহিত হইত। পারস্যের পূর্ব্ব নাম—পারদ। জবন শব্দে প্রাচীন গ্রীক-দিগকে বুঝাইত। খশগণ—চীন ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বসবাস করিত। চীনদেশ এখনও পর্য্যন্ত চীন-নামেই পরিচিত আছে। ভারতের উত্তর-প্রান্তে শক-জাতির বাস ছিল। ওড্র দেশকে অনেকে উড়িষ্যা বলিয়া অনুমান করেন। পৌণ্ড্র, পহ্লব ও কিরাত প্রভৃতি সম্বন্ধে যদিও বিবিধ মত প্রচলিত আছে, কিন্তু ঐ সকল দেশ ভারতের বহির্ভূত দেশ বলিয়াই মনে হয়। ঐ সকল জাতি ব্রাহ্মণ-দর্শনে বঞ্চিত ছিল, অর্থাৎ সে সকল দেশে ব্রাহ্মণের বসতি ছিল না,—এতদ্দ্বারাও তাহাদের বসতি-স্থান ভারত ভিন্ন অন্য দেশ বলিয়াই অনুমান করা যায়।

ভারতবর্ষ হইতেই আর্য্যগণ পশ্চিমাভিমুখে, পূর্ব্বাভিমুখে ও উত্তরাভিমুখে—আপনা-দিগের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিক দিয়াই তাঁহারা চীনে, মালয় উপদ্বীপে, ভারত মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জে এবং আমেরিকা অভিমুখে গমনাগমন করিতেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে তুরস্ক, রুশিয়া, জর্ম্মণী, পারস্য, গ্রীস, রোম, এট্রুরিয়া,—এমন কি, বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জে পর্য্যন্ত, তাঁহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পশ্চিমাভিমুখে, আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হইয়া, তাঁহারাই প্রথমে ইথিওপিয়ায়, মিশরে এবং ফিনিসীয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। মিশরের, গ্রীসের, আসিরীয়ার, জর্ম্মণীর এবং স্কান্দেনেভিয়ার বহু পৌরাণিক উপাখ্যান, ভারতবর্ষের পৌরাণিক আখ্যায়িকা-সমূহের অনুস্মৃতি,—তাহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। কাউণ্ট জোর্ণস্-জারণা বলেন,—'আর্য্যাবর্ত্তেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রথম বিকাশ। কেবল ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম বলিয়া নহে; আর্য্যা-বর্ত্ত—হিন্দু-সভ্যতার আদি স্থান। আর্য্যাবর্ত্ত হইতেই সভ্যতা-স্রোত পশ্চিমে ইথিওপিয়া, মিশর ও ফিনিসীয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; পূর্ব্বদিকে, শ্যাম, চীন ও জাপান পর্য্যন্ত; দক্ষিণ দিকে, সিংহল, যবদ্বীপ ও সুমাত্রা পর্য্যন্ত; উত্তর দিকে, পারস্য হইতে কালডিয়া ও কোল্‌চিস্ এবং সেখান হইতে গ্রীসে ও রোমে, অবশেষে হিপারবোরিয়ানদিগের সুদূর আবাস-ভূমেও আর্য্য-সভ্যতা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"* ঐ সকল প্রাচীন

ভারতবর্ষই আদিভূত।

* "It is there (India) we must seek not only for the cradle of the Brahmin religion, but for the cradle of the high civilization of the Hindus, which gradually extended itself in the West to Ethiopiato Egypt, to Phoenicia ; in the East, to Siam, to China and to Japan, in the South, to Ceylon, to Java and to Sumatra ; in the North, to Persia, to Caldaea and to Colchis, whence it came to Greece and to Rome and at length to the remote abode of the Hyperboreans,"—Count Bjornstjerna, *Theogony of the Hindus.*

জাতির আচার-ব্যবহার, ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিলে, ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের আচার-ব্যবহার, ভাষা ও ধর্ম্ম প্রভৃতির সহিত এক অভিনব সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়! তাহাতে ঐ সকল দেশে এক সময়ে ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হইয়া থাকে। সভ্যতার—এমন কি মনুষ্য-সৃষ্টির আদি-স্থান যে ভারতবর্ষ, অনেক পাশ্চাত্য-পণ্ডিত তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সার ওয়াল্টার র‍্যলে—ইংরাজি ভাষায় সর্ব্বপ্রথম 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রণয়নে যশস্বী হন। তাঁহার মতে, ভারতবর্ষই মনুষ্যের আদি-নিবাসস্থান। ভাষার সাদৃশ্য, ভাবের সাদৃশ্য, চিন্তার সাদৃশ্য, আকৃতি-প্রকৃতির সাদৃশ্য প্রভৃতিতেও তাহাই মনে হয়। * কর্ণেল অল্‌কট বলেন,—'সংস্কৃত ভাষার সহিত অন্যান্য ভাষায় তুলনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ভারতবর্ষ হইতেই ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে সভ্যতার রশ্মি-রেখা সঞ্চারিত হইয়াছিল।' সার উইলিয়ম জোন্‌স বলেন,—প্রাচীন হিন্দুগণের সহিত প্রাচীন পারসীকগণের, ইথিওপিয়দিগের, মিশরবাসিগণের, ফিনিসীয়দিগের, গ্রীকগণের, টাস্‌কান্ জাতির, সিদিয়ান কিম্বা গথদিগের, কেল্টগণের, চীনাদিগের, জাপানী ও পেরুভীয়গণের আচ্ছেদ্য সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়।' †

মিশর দেশকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই সভ্যতার আদি-স্থান বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,—ভারতবর্ষই মিশরের গৌরব-গরিমার ও প্রতিষ্ঠার মূলীভূত। ‡ অনেকে মনে করেন, ভারতীয় ঔপনিবেশিক-গণ মিশরের নীল-নদের নামকরণ করিয়াছিলেন।.: পুরাণাদি শাস্ত্রের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই,—'চন্দ্রবংশীয় অজমীঢ়ের এক পুত্র নীল নামে বিখ্যাত। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন।' তাঁহারই নামানু-সারে নীল-নদের নামকরণ হইয়াছিল,—ইহাও অসম্ভব নহে। অনেক সমালোচকের মতে,—'নীল-নদের নীলবর্ণ জল দেখিয়াই ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ উহার ঐরূপ নাম প্রদান করিয়া থাকিবেন।' তিনি বলেন,—'আটক হইতে দশ মাইল দক্ষিণে সিন্ধু-নদের জল স্বচ্ছ, গভীর ও বেগবান।' তাহার পর, কালাবাগ পর্য্যন্ত প্রায় এক শত মাইল সিন্ধুনদ প্রবল স্রোতোবেগ-পূর্ণ। সেখানকার জল গাঢ় সীসক-বর্ণাভ; তজ্জন্য সিন্ধুনদের সেই অংশ 'নীলাব' বা নীলবর্ণ নামে অভিহিত। সেখানে সিন্ধুনদের তীরে, আটক হইতে বার মাইল দক্ষিণে, ঐ নামে এক নগরও আছে।' সিন্ধু-নদের উপকূল হইতে ঔপনিবেশিকগণ মিশরে গমন করিয়া নীল-নদের তীরে আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং সিন্ধু-নদের 'নীলাব' নামের অনুকরণে নীল-নদের নামকরণ হইয়াছিল,—এরূপ অনুমানও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ কূটদর্শী সমালোচকের এই মত। ভারতীয় হিন্দুগণের সহিত মিশরের আদিম অধিবাসীদিগের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল।

মিশরে ভারতের প্রাধান্য।

* Sir Walter Raleigh—*History of the World.*

† Sir William Jones.—*Asiatic Researches.*

‡ "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, প্রথম ও সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

প্রফেসর হীরেণ বলেন,—'প্রাচীন মিশর-বাসীর বর্ণ ও মস্তকের গঠন ভারতীয় হিন্দুগণের অনুরূপ ছিল। এম, ব্লুমেনবাক প্রাচীন মিশর-বাসীর করোটী (মাথার খুলি) সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর করোটীর (মাথার খুলির) সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিয়াছিলেন। ঐ দুই করোটীর অপূর্ব্ব সাদৃশ্য দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ইহাতে কেহ হয় তো বলিতে পারেন,—মিশরীয়গণ হইতেই হিন্দুগণের উৎপত্তি। কিন্তু পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে,—গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী প্রদেশই হিন্দু-সভ্যতার আদি-স্থান।' * প্রাচীন-কালের ভারতবাসিগণ যে মিশরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন,—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনেকেরই ইহাই সিদ্ধান্ত। পোককেরও সেই মত। কর্ণেল অলকট স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—'প্রাচীন মিশর বা ঈজিপ্টের অধিবাসিগণ ভারতবর্ষ হইতেই মিশরে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। দর্শন সম্বন্ধে মিশরের অভিজ্ঞতা ভারত হইতেই উৎপন্ন। ইহুদী মোজেস হইতে গ্রীসের প্লেটো প্রভৃতি সকলেই মিশরের নিকট জ্ঞান-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।' † পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিতে গেলে, ভারতের সহিত মিশরের সাদৃশ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এতৎপ্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

ঈজিপ্ত বা মিশরের সঙ্গে সঙ্গে ইথিওপিয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। এখন অবশ্য ইথিওপিয়া নামে কোনও জনপদের অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। অতি দূর প্রাচীন কালে পৃথিবীর দক্ষিণদেশের অধিবাসিগণকে গ্রীকগণ ইথিওপীয়ান (Ethiopia—Gr. *Aithcops*, sun-burned) বা সূর্য্য-দগ্ধ কৃষ্ণকায় জাতি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অবশেষে লিবিয়া এবং ঈজিপ্তের (মিশরের) দক্ষিণবর্ত্তী অর্থাৎ নীল-নদের উৎপত্তি-স্থানের সন্নিকটস্থ দেশ ইথিওপিয়া নামে অভিহিত হইত। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—ইথিওপিয়া ১০°—২৫° ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখায় (10°—25° North Latitude) এবং ৪৫°—৫৮° ডিগ্রী পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় (45°—58° East Longitude) মধ্যে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে আফ্রিকা মহাদেশে নিউবিয়া, আবিসিনিয়া, সেনার, কোরডোফন, ডঙ্গোলা, দারফুর প্রভৃতি যে জনপদ দৃষ্ট হয়, প্রাচীন কালে তাহা ইথিওপিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। খৃষ্ট-জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইথিওপিয়া অতি ক্ষমতাশালী রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। ৭৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়া মিশরের করদ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হয়। অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় হিন্দুগণ প্রথমে যে ইথিওপিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা-প্রভাবেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এককালে ভারতবর্ষে যাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, ইথিওপিয়া তাঁহাদেরই শাসনাধীন

ইথিওপিয়া ও ভারতবর্ষ।

* "It is hardly possible to maintain the opposite side of the question that the Hindus were derived from the Egyptians, for it has been already ascertained that the country bordering on the Ganges was the cradle of Hindu civilization."—Heeren's *Historical Researches*. এ কথা তো আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি।

† Col. Olcott in the *Theosphist*.

ছিল,—সার উইলিয়ম জোন্‌স্ প্রভৃতি তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।* সার উইলিয়ম জোন্‌সের বহুকাল পূর্ব্বে (১৭০ হইতে ১৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) গ্রীস-দেশের তার্কিক ও অলঙ্কার-শাস্ত্রবিৎ ফিলষ্ট্রেটাস এই ইথিওপিয়ার প্রসঙ্গে বলিয়া গিয়াছেন,—'ইথিওপিয়া-বাসীরা ভারতবাসীদেরই বংশধর। তাহারা পূর্ব্বে ভারতবর্ষেই বসবাস করিত। তাহারা আপনাদিগের দেশের সম্মানার্হ নৃপতিকে হত্যা করিয়া পাতকগ্রস্ত হইয়াছিল। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহারা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এবং ইথিওপিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক তথায় বসবাস করিতে থাকে।'† কনষ্টান্টিনোপল রাজ্যের অন্যতম ধর্ম্মাধ্যক্ষ কুলপতি 'ইউসেবিয়াস'—পূর্ব্বোক্ত মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। ৩২৪ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলে তাঁহার জন্ম হয়।‡ তিনি বলেন,—'সিন্ধু-নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে আগমন করিয়া যাঁহারা মিশরের সন্নিকটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইথিওপীয়গণ তাঁহাদেরই শাখাবিশেষ।' ফিলষ্ট্রেটাসের গ্রন্থে একজন মিশরবাসীর পরিচয় প্রসঙ্গে ইথিওপিয়ার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। সেই মিশরবাসী তাহার পিতার নিকট শুনিয়াছিল,—'ভারতবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানবান ও ধী-শক্তিসম্পন্ন। ইথিওপিয়গণ ভারতবাসীদিগেরই শাখা;—তাহারা ভারতবর্ষ হইতে ইথিওপিয়ায় আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছিল। তাহারা ভারতীয় পিতৃপুরুষের ন্যায় জ্ঞানবান ছিল এবং তাঁহাদেরই আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করিত। তাহারা যে ভারতবাসী হইতে উৎপন্ন পরন্তু অভিন্ন নহে—সে কথা মুক্তকণ্ঠে তাহারা স্বীকার করিত।' তৃতীয় শতাব্দীর অন্যতম প্রধান রোমীয় ঐতিহাসিক জুলিয়স আফ্রিকেনাস§ পূর্ব্বোক্ত মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। ইউসেবিয়াস এবং সিন্‌সেলাস প্রমুখ পরবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ জুলিয়স আফ্রিকেনাসের মত উদ্ধৃত করিয়াই আপনাদের যুক্তির সমর্থন করেন। আবিসিনিয়ার নামও, অধ্যাপক হীরেণের মতে ভারতবর্ষের প্রাধান্য-দ্যোতক। সিন্ধুনদের একটী প্রাচীন নাম—'আবুইসীন। অধ্যাপক হীরেণ বলেন,—'সেই আবুইসীন বা সিন্ধু-নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে আফ্রিকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভারতীয় হিন্দুগণ সেই স্থানকে আবিসিনীয়া নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।'

---

* "Ethiopia and Hindusthan were possessed or colonized by the same extraordinary race."—Sir william Jones, *Asiatic Researches.*

† Philostratus, the Elder of Lemons, a famous Greek sophist and rhetorician, was born probably about 170-180 A. D. &c.

"The Ethiopians were originally an India race compelled to leave India for the impurity contracted by slaying a certain monarch to whom they owed allegiance."—*Hindu Superiority.*

‡ Eusebius of Nicomedia, Patriarch of Constantinople, was born about 324 A. D. He was first tutor to the Emperor Julian to whom he was related by his mother's side.

§ Julius Africanus, an excellent historian of the third century, the author of a Chronicle which was greatly esteemed, and in which he reckons five thousand five hundred years from the creation of the world to Julius Çaesar.

যাহা হউক, এতৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ইথিওপিয়ায় যে আর্য্য-হিন্দুগণের প্রাধান্য এককালে বিস্তৃত হইয়াছিল, প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় অনায়াসেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

পারস্য ও ভারতবর্ষ।

প্রাচীন পারসীকগণ যে পূর্ব্বে ভারতবর্ষেরই অধিবাসী ছিলেন, তাহা নানা প্রকারে প্রতিপন্ন হয়। পারস্যের প্রাচীন নাম—ইরাণ। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন,—'ইড়ার (ইলা) বংশধরগণ কর্ত্তৃক ঐ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তদনুসারে উহা 'ইরাণ' নামে পরিচিত। চন্দ্রবংশের সহিত সূর্য্যবংশের বিরোধ ব্যপদেশে কোনও চন্দ্রবংশীয় নৃপতি ঐ প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পারস্যের প্রাচীন ইতিহাসে ইরাণ ও তুরাণদিগের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে তাহার আভাস পাওয়া যায়।' পণ্ডিতগণের মতে,—'সুরাণ' শব্দের অপভ্রংশে 'তুরাণ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'সুরাণ'—সুর (সূর্য্য) হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ সূর্য্যবংশীয়। ইরাণ—ইড়া (ইলা—বুধপত্নী) হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ চন্দ্রবংশীয়। পারস্যে তাইগ্রীস নদীর তীরে 'কাশাই' নামক যে জাতি দৃষ্ট হয়, তাহারা কাশীর পূর্ব্বতন অধিবাসী বলিয়াই অনেকে মনে করেন। ইরাণের প্রাচীন অধিবাসিগণ অগ্নির উপাসক ছিলেন। সেই অগ্নি-উপাসনায় আর্য্যগণের যজ্ঞানুষ্ঠানের আভাষ পাওয়া যায়। ইন্দ্র, বৃত্র প্রভৃতির উপাখ্যানের সহিত পারসিকগণের পৌরাণিক উপাখ্যানের বহু সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। মিত্র, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি দেবতা—ইরাণে নামান্তরে সম্পূজিত। ইরাণীয়দিগের মতে,—অগ্নি সৃষ্টিকর্ত্তা 'অহুর মজদের' পুত্র এবং অতর নামে প্রসিদ্ধ। বৃত্রের উপাখ্যান ইরাণীয়দিগের মধ্যে নানারূপে প্রচলিত আছে। বেরেথ্রঘ্ন (বৃত্রঘ্ন ইন্দ্র)—ইরাণীয়দিগের নিকট কিরূপভাবে পূজা পাইতেন, জেন্দ-আভেস্তা গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। জেন্দ আভেস্তার সেই অংশের একটু বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। জারাথস্ত্র অহুর-মজদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে সদয়চিত্ত অহুর-মজ্‌দ্! হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পবিত্রাত্মা! স্বর্গীয় উপাস্যদিগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী?' অহুর মজ্‌দ্ উত্তর করিলেন,—'হে স্পিতিমা জারাথস্ত্র! অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী।" * এইরূপ বিবিধ উক্তিতে ইরাণে ইন্দ্রের প্রাধান্যের পরিচয় পাই। জেন্দ আভেস্তায় 'ইন্দ্র ভিন্ন সৌরু ও নঙ্ঘত্যের নাম আছে। নঙ্ঘত্য বেদের নাসত্যদ্বয় অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়। অতএব বোধ হয়, তাঁহারা অশ্বিদ্বয়ের উপাসনা করিতেন।' ইরাণের সকল সম্প্রদায়ই যে একমতাবলম্বী ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। জেন্দআভেস্তায় অপর অংশে আবার—ইন্দ্রকে, সৌরুকে ও দেব নঙ্ঘত্যকে পবিত্র জগৎ হইতে দূর করিয়া দিবার কথা লিখিত আছে। যাহা হউক, ভারতবর্ষের সহিত ইরাণের যে অতি প্রাচীনকাল হইতে সম্বন্ধ ছিল, তাহা নানাপ্রকারে বুঝিতে পারা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পোকক বলেন,—"পরশুরাম হইতেই 'পারস্য' নামের উৎপত্তি। কুঠারধারী পরশুরাম যখন পারস্য-জয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন,

* ইন্দ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে 'জেন্দ আভেস্তা' গ্রন্থের মতের আলোচনা রমেশ চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত ঋগ্বেদে এবং রমানাথ সরস্বতী কর্ত্তৃক অনুবাদিত ঋগ্বেদ-সংহিতার টীকায় দ্রষ্টব্য।

সেই সময় হইতেই পারস্ত নামের সৃষ্টি। প্রাচীন পারসীকেরা ভারতের আদিম অধিবাসী। পারস্যের যে সর্ব্বপ্রধান নদী ইউফ্রেতেজ—পারস্ত উপসাগরে পতিত হইতেছে, 'ইউ (Ger. Eu—Well, আগচ্ছ) ফ্রেতেজ' (ভারতেশ) শব্দে ভারতের অধিপতির সম্বর্দ্ধনা-সূচক ভাব প্রকাশ পাইতেছে। নদীর নামেই ভারতপতিতে আহ্বান করা হইতেছে, ইহাই বুঝা যায়।' * এখন যাহা পারস্ত নামে অভিহিত, ঠিক সেই সীমানার মধ্যেই যে ইরাণ দেশের অবস্থিতি ছিল, তাহা কোনক্রমেই নির্দ্ধারণ করা যায় না। পূর্ব্বকালে ইরাণ রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, একদিকে ইউফ্রেতেজ, অন্য দিকে ভারতবর্ষ,—ইরাণের সীমানা এক সময়ে এত অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ ইরাণকে আর্য্যভূমি বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন,—'ইরাণের (Iran) অধিবাসিগণ—ঐরাণ (Airan)। ঐড় (Aira)—ইড়ার বংশধর; ঐড় শব্দের বহুবচনে—ঐড়ান পদ নিষ্পন্ন হয়। সেই ঐড়ান হইতে 'এরিয়ান' (Aryan) বা আর্য্য শব্দের উৎপত্তি।' † পারস্যের প্রাচীন 'জিন্দ' অভিধানের শব্দাবলীর সহিত সংস্কৃত শব্দের তুলনা করিলে, তদন্তর্গত দশটী শব্দের মধ্যে ছয় সাতটি শব্দ সংস্কৃত-মূলক বলিয়া প্রতীত হয়। শব্দের এইরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া সার উইলিয়ম জোন্স বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। ‡ পারস্যের জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মের উৎপত্তি-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াও অনেকে আর্য্য-হিন্দুগণের সহিত পারস্যের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপণ করেন। যখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সহিত পারসিকগণের সংস্রব সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়, সেই সময়ই জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। মিঃ হগ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ও জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মের সম্বন্ধ-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন,—'এতদ্দেশের দেবদেবীর নাম, পূজা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি প্রভৃতির সহিত জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মের কি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধই বিদ্যমান ছিল!' তিনি বলেন,—'প্রাচীন-কালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সহিত বিষয়-বিশেষে মতান্তর ঘটনায় জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। বেদ এবং জেন্দ-আভেস্তা আলোচনায় উহা প্রতিপন্ন হইতে পারে।' § জোরওয়াষ্টার কোন্ সময়ে কোন্ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। জোরওয়াষ্টার নামে কত মহাপুরুষেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন,—'জোরওয়াষ্টার এক জন এবং তিনি পারস্যবাসী।' অন্যে আবার বলেন,—'জোরওয়াষ্টার নামে ছয় জন প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—'নোয়ার পুত্র হাম, মোজেস, ওসিরিস, মিথ্রাস এবং অন্যান্য মনুষ্য ও দেবতাগণ জোরওয়াষ্টার নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।' জোরওয়া-

"* The Parasoos, the people of Parasoo Ram, those warriors of Axe, have penetrated into and given a name to Persia; they are the people of Bharata; and to the principal stream that pours its waters into the Persian Gulf they have given the name of Eu-Bharat-es (Euphrat-es), the Bharat Chief."—Mr. Pococke, *Iudia in Greece.*

† বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এইরূপ কূটার্থ নিষ্পন্ন করেন। তাঁহাদের মতে,—'Aryan is pural ef Aria.'

‡ "I was not little surprised to find that out of ten words in Du Persgu Zind Dictionary six or seven were plure Sanskrit."—Sir Willam Jones.

§ Haug's *Essays on the Parsees.*

ষ্টারের আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধেও এইরূপ বহু মত প্রচলিত আছে। প্লিনি ও আরিষ্টটল * নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—'প্লেটোর মৃত্যুর ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জোরওয়াষ্টারের আবির্ভাব হয়।' গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাই,—বাহ্লীক দেশে মহর্ষি বেদব্যাসের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল।' † ডাইওনিসাস লেয়ারটাস বলেন,—'ট্রয় যুদ্ধের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে (সুইদাসের মতে—পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে) জোরওয়াষ্টার বিদ্যমান ছিলেন।' যাহা হউক, পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই,—দরিয়াস হিষ্টাস্পেসের ‡ সম-সময়ে পারস্যে একজন জোরওয়াষ্টারের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে আর একজন জোরওয়াষ্টার বাবিলোনিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া তদ্দেশবাসীকে জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। গ্রীস-দেশের ও আরব-দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ পারস্যের জোরওয়াষ্টারের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ পারস্যের জোরওয়াষ্টারের পূর্ব্ববর্ত্তিকালেও অপর জোরোয়াষ্টার বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। তাঁহারা বলেন,—'সেই প্রাচীনতম জোরওয়াষ্টার হইতে কালডীয়-দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই জোরওয়াষ্টার—হিষ্টাসপেসের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বিদ্যমান ছিলেন।' এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এই সকল আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, কালডীয়-দেশেও জোরওয়াষ্টার নামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং পারস্যের জোরওয়াষ্টার ও তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। যাহা হউক, জোরওয়াষ্টার যিনিই হউন, পারস্যের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক জোরওয়াষ্টার যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান, ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মের সংঘর্ষে তাহা যে উৎপন্ন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। জোরওয়াষ্টারের ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তনার সঙ্গে সঙ্গে পারস্য হইতে ভারতের প্রভাব ক্রমে ক্রমে অপসৃত হয়। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের বহু পূর্ব্বে পারস্যে আর্য্য-হিন্দুগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। পারদ নাম পুরাণে ও সংহিতায়—নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। উহা পারস্যেরই নামান্তর বলিয়া অনেকে মনে করেন।

ফিনিসীয়া, বাবিলোনিয়া, কালডিয়া, কোলচিস, মিডিয়া প্রভৃতি প্রাচীন জনপদসমূহের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেও তত্তৎপ্রদেশে অতি পুরাকালে ভারতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল,—বুঝিতে পারা যায়। গ্রীক ও রোমানদিগের গ্রন্থে ফিনিসিয়ার যে পরিচয় পাই, তাহাতে ৩৪°—৩৬° ডিগ্রী উত্তর অক্ষ-রেখায় (34°—36° North Latitude) ঐ রাজ্য অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। পশ্চিমে ভূমধ্য-সাগর, উত্তর-পূর্ব্বে সিরিয়া এবং দক্ষিণে জুডিয়া—এতৎসীমান্তর্ব্বর্ত্তী দেশ তৎকালে ফিনিসিয়া নামে পরিচিত ছিল। সময় সময় উত্তরে,

ফিনিসিয়া প্রভৃতি ও ভারতবর্ষ।

---

* Pliny: *Historia Naturralis.* প্লিনি—ইতালির উত্তরাংশে, সম্ভবতঃ ভেরোনায়, ২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক বলিয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ। আরিষ্টটল (Aristotle) গ্রীস দেশের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। ৩৮৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ষ্টেজিরায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

† "Vyasa held a religious discussion with Zoroaaster at Balkh."—*Hindu Superiority.*

‡ দরিয়স হিষ্টাসপেস (Darius Hystaspes) পারস্যের অধিপতি। ৫২১—৪৮৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

দক্ষিণে ও পূর্ব্বাভিমুখে ফিনিসীয়া রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই রাজ্যের দৈর্ঘ্য দুই শত মাইল এবং প্রস্থ কুড়ি মাইল—মোট পরিমণ-ফল দুই সহস্র বর্গ মাইল দাঁড়াইয়াছিল। হেরোডোটাস * ফিনিসীয়দিগের যে পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায়,—ফিনিসীয়গণ পূর্ব্বে ইরিথ্রা (Erythra) সমুদ্রের উপকূলে বাস করিত। সেখান হইতে তাহারা এই নূতন রাজ্যে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। মিশরের পূর্ব্বোপকূল হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত যে সমুদ্র অধুনা আরব-সমুদ্র নাম পরিগ্রহ করিয়া আছে, 'ইরিথ্রা' সমুদ্র অর্থে পুরাকালে তাহাকেই বুঝাইত। সেই সমুদ্র-পথে ভারতবর্ষ হইতে মিশরে এবং মিশর হইতে ফিনিসীয়ায় উপনিবেশ-স্থাপন হইয়াছিল। মতান্তরে আবার জানিতে পারা যায়,—পারস্য উপসাগর অথবা আরব উপসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে কতকগুলি যোদ্ধৃজাতি আসিয়া ফিনিসীয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহা হইলেও ফিনিসীয়ার সভ্যতার আদিভূত ভারতবর্ষ বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন ফিনিসীয় জাতির গ্রন্থ-পত্রাদি সমস্তই এখন বিলুপ্ত হইয়াছে; গ্রীক এবং রোমক ঐতিহাসিকগণের লিখিত গ্রন্থাদি হইতে অধুনা তাহাদের পরিচয়ের আভাষ মাত্র পাওয়া যায়। প্রাচীন ফিনিসীয়গণের ধর্ম্ম ও দেবদেবীর বিষয় আলোচনা করিলে, হিন্দুগণের সহিত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন,—'ফিনিসীয়ার প্রথম রাজার নাম—আজেনর; তিনি ১৪৯৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।' প্রায় দুই সহস্র বৎসর কাল ফিনিসীয়গণের প্রতিপত্তি দিকে দিকে বিস্তৃত ছিল। উহারা অনেক স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করে। ফিনিসীয়ার রাণী ডিডো আফ্রিকা মহাদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সমৃদ্ধিশালী কার্থেজ-নগরী † তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বাঞ্চলে চীন পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমাঞ্চলে গ্রেট-ব্রিটেন পর্য্যন্ত ফিনিসীয় বণিকগণের বাণিজ্য-পোত প্রতিনিয়ত গতিবিধি করিত। ফিনিসীয়ার ভাষা সেই সময়ে বহু দেশে প্রচলিত হইয়াছিল; এমন কি, গ্রীক ও লাটিন ভিন্ন প্রতীচ্যের অপর কোনও ভাষাই তখন ফিনিসীয় ভাষার ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। ফিনিসীয়া এক সময়ে উন্নতির এতই উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল! কিন্তু কালক্রমে এক্ষণে ফিনিসীয়ার পরিচয়-চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্তপ্রায়। ধর্ম্মভ্রষ্ট ও আচারভ্রষ্ট হওয়াতেই ফিনিসীয়গণের অধঃপতন ঘটে। খৃষ্ট-জন্মের প্রায় দুই হাজার আট শত বৎসর পূর্ব্বে আনক-বংশধরগণ কর্ত্তৃক ঐ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—ফিনিসীয়ার পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে ইহা প্রতিপন্ন হয়। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তে, চন্দ্র-বংশে, আনক বা আনকদুন্দুভি নাম দেখিতে পাই। সেই আনক বা আনকদুন্দুভির বংশধরগণের কেহ ফিনিসীয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হইতে পারে।

---

* Herodotus, the oldest Greek historian and for this reason usually styled the "Father of History," was born at Halicarrassus, in Caria, 448 B. C.

† ভূমধ্য-সাগরের অন্তর্গত আফ্রিকার যে উপদ্বীপ এক্ষণে টিউনিস রাজ্য, উহাই পুরাকালে 'কার্থেজ' রাজ্য ছিল। খৃষ্ট জন্মের ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে পতির হত্যাকাণ্ডের পর, ফিনিসীয়ার রাণী ডিডো, টায়ার হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া ঐ নগর স্থাপন করেন।

বাবিলন বা বাবিলোনিয়া পুরাবৃত্তে সুপ্রসিদ্ধ। ইউফ্রেতেজ নদীর মোহনার সন্নিকট দেশ—'বাবিলোনিয়া' নামে পরিচিত ছিল। বাবিলোনিয়াকে—'ইরাক আরাবি'ও বলিয়া থাকে। 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' খৃষ্ট-ধর্ম্মপুস্তকে, শিনার, বাবেল এবং কাল্ডিজদিগের বাসস্থান নামেও উহা পরিচিত। গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণ উহাকে 'কাল্‌ডিয়া' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। উত্তরে মেসোপোটেমিয়া, ইউফ্রেতেজ নদী এবং মিডিয়া দেশের প্রাচীর; পূর্ব্বে আসিরীয়া এবং সুসিয়ানা দিকস্থিত তাইগ্রীস নদী; দক্ষিণে পারস্য উপসাগর; পশ্চিমে আরবের মরুভূমি;—এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী দেশ প্রধানতঃ বাবিলন বা কাল্‌ডিয়া নামে অভিহিত হইত। সময় সময় আসিরীয়া ও মেসোপোটেমিয়া উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাবিলোনিয়ার ইতিহাসে কাল্‌ডীয়দিগের উল্লেখ পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়। বাবিলোনিয়ার দক্ষিণাংশ 'কাল্‌ডিয়া' দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। 'কাল্‌ডীয়' শব্দে বাবিলোনিয়ার অধিবাসী বা প্রজামাত্রকেও বুঝাইত; অধিকন্তু কাল্‌ডীয়গণ বাবিলোনিয়ার ধর্ম্মযাজক বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিল। খৃষ্ট-জন্মের অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাবিলোনিয়া রাজ্যের কাল্‌ডীয়গণ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল। ১২৭৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বাবিলোনিয়ার কালডীয়গণের প্রাধান্য লোপ পইয়া আসে। ঐ রাজ্য তখন আসিরীয়ার অধীনতা স্বীকার করে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ অনুসারে জানা যায়,—জল-প্লাবনের পর বাবিলনই প্রথম নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং নোয়ার প্রপৌত্র 'নিমরড' ঐ নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বাবিলন-রাজ্যের কাল্‌ডীয় জাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে, তাহাদিগকে ভারতীয় ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। কাল্‌ডীয় শব্দ 'কুলদেও' অর্থাৎ 'কুলদেবতা' শব্দের অপভ্রংশ। বাবিলোনিয়ার ইতিহাসে দেখিতে পাই,—কাল্‌ডীয়গণ ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ বা দেব-বংশাবতংস, ভারতবর্ষ হইতে ঐ দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন,—ইহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পরিব্রাজক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ কাউণ্ট জোরন্‌স্‌-জারণা বলেন,—'কাল্‌ডীয়গণ, বাবিলোনীয়গণ এবং কোল্‌চিসগণ ভারতবর্ষ হইতেই সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল।' *

বাবিলোনিয়া ও ভারতবর্ষ।

কোল্‌চিস রাজ্য—আর্ম্মেণিয়ার উত্তরে, আইবেরিয়ার পশ্চিমে, ইউসাইনের পূর্ব্বে এবং ককেসাসের দক্ষিণে কৃষ্ণ-সাগরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ইহা রুষ-রাজ্যের 'ইমারেথিয়া' প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। কোল্‌চিসগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে এক কালে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল। মিশর হইতে একদল লোক কোলচিসে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল,—এইরূপ কিম্বদন্তী আছে। মিসরের রাণী সেসোট্রিস্‌ ভারত-জয়ে বহির্গত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। তাঁহারই দলভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রথমে কোলচিসে বসবাস আরম্ভ করে। ৪০৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে কোলচিসগণ গ্রীকরাজ জেনোফনের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়। হেরোডোটাসের অভ্যুদয়-

কোলচিস ও ভারতবর্ষ।

* "The Chaldeans, the Babylonians, and the inhabitants of Colchis derived their civilisa ion from India."—Count Bjornstjerna, *Theogony of the Hindus.*

কালে কোলচিসগণ পারস্যের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি,—ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণ মিশরে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। কোলচিসের ইতিহাসে দেখা যায়,—মিসরের অধিবাসিগণ ঐ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং মূলে ভারতীয় প্রাধান্য-প্রতিপত্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মিঃ পোকক বলেন,—'পারস্য, কোলচিস এবং আর্ম্মেনিয়ার প্রাচীন মানচিত্র পর্য্যালোচনা করিলে, ঐ সকল জনপদ ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়।' *

পাশ্চাত্য দেশের পুরাবৃত্তে মিডিয়ার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইরাণের (পারস্যের) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পুরাকালে মিডিয়া-রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। উত্তরে কাস্পিয়ান

মিডিয়া ও ভারতবর্ষ।

সাগর, দক্ষিণে পারস্য, পূর্ব্বে পার্থিয়া এবং পশ্চিমে আসিরীয়া,—এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ এক সময়ে 'মিডিয়া' রাজ্য নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমান পারস্যের অন্তর্গত আজার-বিজান, ঘিলান, মাজাণ্ডারাণ, ইরাক, আজোমি এবং খুরিস্তানের উত্তরাংশ—মিডিয়া-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন মিডীয়-গণ তীর-ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিত। অশ্ব-পরিচালনায় তাহাদের বিশেষ পটুতার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বিলাস-ব্যসনই ঐ জাতির অধঃপতনের মূল। পুরাবৃত্তে প্রকাশ—মেধা বা মেধাই কর্ত্তৃক ঐ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। চন্দ্রবংশ-সম্ভূত অজমীঢ়ের বহু পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল পুত্রের মধ্যে মেধ নামক কোনও পুত্র ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া, পারস্যের সন্নিকটে আপন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে মেধ-রাজ্য বা 'মিডিয়া' নামকরণ হইয়া থাকিবে। কর্ণেল টড রাজস্থানের ইতিহাসে সেই আভাসই প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মিডিয়ার অধিবাসিগণের ভাষা, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার—পারসীকদিগের সমতুল্য ছিল। বহু পরিবর্ত্তনাদির পর, ৭০৮ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে, কৈকোবাদ (ডি জোসেস) মিডিয়ার সর্ব্বরূপ কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। এগ্‌বাটানা নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়। পরিশেষে সাসানিয়া-বংশের আধিপত্যকালে এই রাজ্য পারস্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তখন মিডিয়া রাজধানী এগ্‌বার্টানা পারসীকগণের গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হয়। ইরাণের সহিত মিডিয়ার সম্বন্ধ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, যে নামেই উহা পরিচিত হউক, ঐ জনপদে যে ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল,—তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আসিরীয়-দেশের পুরাবৃত্তেও ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ 'বাইবেলে' লিখিত আছে,—'আসিরীয়া' রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী নিনিভে

আসিরীয়া ও ভারতবর্ষ।

(নিসাস বা নাইনাস) অসুর (Asshur) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এদিকে বলি, বোল বা বেল নামে আসিরীয়ার এক আদিম রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত কোনও 'অসুর' কর্ত্তৃক ঐ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়,—'অসুরিয়া' বা 'আসিরীয়া' নামে তাহাই বুঝা যায়।

* "The ancient map of Persia, Colchis, and Armenia is absolutely full of the most distinct and startling evidences of Indian colonization,"—Mr. Pococke, *India in Greece*.

দৈত্যরাজ বলি যদি আসিরীয়ার আদিম রাজা বলি বা বোল বা বেল হন, তাহা হইলে অসুর কর্ত্তৃক ঐ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না। বলি বা বেল প্রাচীন ভারতের এক জন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন; তিনি কাম্বোডিয়া হইতে গ্রীস পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। * আসিরীয়া রাজ্য পুরাকালে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল,—তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—উহার উত্তরে আর্ম্মেনিয়ার অন্তর্গত নিকেট্‌স্ গিরিশ্রেণী, দক্ষিণে সুসিয়ানা ও বাবিলোনিয়া দেশ, পূর্ব্বে মিডিয়া এবং পশ্চিমে তাইগ্রীস বা ইউফ্রেতেজ নদী বিদ্যমান ছিল। তাইগ্রীস নদীর পশ্চিম দিকে আসিরীয়া রাজ্যের বহু ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। উত্তর-দক্ষিণে দুই শত আশী মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে দেড় শত মাইল আসিরীয়া-রাজ্যের বিস্তৃতির নিদর্শন আজিও বিদ্যমান আছে।

ব্যাক্‌ট্রিয়া নামে আর এক প্রাচীনতম রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—ঐ রাজ্য হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত ছিল। উহার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে অক্ষাস (আমু বা জি-হোন) নদ, 'সোর্কডিয়ানা' হইতে উহার পার্থক্য সাধন করিয়াছিল। তাঁহাদের মতে,—ব্যাক্‌ট্রিয়া আর্য্যগণের বা ইন্দু-য়ুরোপীয়ান-গণের আদিভূত; সেখান হইতে পৃথিবীর অন্যত্র আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। † ইতিহাসে যে ব্যাক্‌ট্রিয়-গণের পরিচয় পাওয়া যায়, মিডীয় ও পারসীকগণের সহিত তাহাদের সম্পূর্ণরূপ সাদৃশ্য ছিল; এবং 'জেন্দ' ভাষাই তাহাদের মাতৃভাষা ছিল। পুরাকালে ব্যাক্‌ট্রিয়া অতি পরাক্রমশালী জনপদ মধ্যে পরিগণিত হইত। তখন পারস্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহার সীমানা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন ব্যাক্‌ট্রিয়ার বিশেষ কোনই পরিচয় পুরাবৃত্তে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। আসিরীয় দেশের রাজা নাইনস বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, ব্যাক্‌ট্রিয়া অধিকার করিতে গিয়া, বড়ই বিপদে পতিত হইয়াছিলেন,—প্রাচীন ইতিহাসে ব্যাক্‌ট্রিয়ার বিষয় ইহাই প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। আসিরীয় দেশের শেষ রাজা সার্ডানাপালস যখন আরবাসেস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় বহুসংখ্যক ব্যাক্‌ট্রিয় সৈন্য তাঁহার রাজধানী-রক্ষায় সহায়তা করিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন,—ব্যাক্‌ট্রিয়ার রাজধানী 'বাক্‌ট্রা' বা 'জারিয়াস্‌পা' নগর হইতেই পারসীক-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। ঐ নগর বহু দিন পর্য্যন্ত 'মেজি' (Magi) নামক মিডীয়দিগের একটী সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। ঐ নগর এসিয়া মহাদেশে স্থলপথে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইত। ব্যাক্‌ট্রিয়া রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর বর্ত্তমান-কালে বাল্‌খ্ (Balkh) নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই,—পরবর্ত্তি-কালের ব্যাকট্রিয়া নামক জনপদই পুরাণ-বর্ণিত প্রাচীন বাহ্লিক রাজ্য। বাহ্লিক রাজ্যই

ব্যাকট্রিয়া ও ভারতবর্ষ।

* Mr. Pococke, *India in Greece.*

† "Bactria is supposed to have been the seat of the parent people from which the Aryan or Indo-European family of nations branched off."

পরিশেষে ব্যাক্‌ট্রিয়া এবং ক্রমশঃ বাল্‌খ্ (Balkh) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। পারস্য জয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সমভিব্যাহারী প্রায় চৌদ্দ শত সৈন্য ব্যাক্‌ট্রিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনে বসবাস করিয়াছিল। গ্রীকদিগের আধিপত্যকালে ব্যাক্‌ট্রিয়ার নৃপতিগণের প্রবর্ত্তিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া যায়। সেই সকল মুদ্রায় পুরাকালের বহু পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। বহু পূর্ব্বে ব্যাক্‌ট্রিয়ায় সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, ঐ সকল মুদ্রায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। * সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি-স্থান—ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের প্রভাব, ব্যাক্‌ট্রিয়া বা বাহ্লিক রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহাতে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাবের প্রায় ৬০৪২ বৎসর পূর্ব্বে ব্যাক্‌ট্রিয়ায় 'ডাইওনিসাস' (Dionysius) নামক নৃপতির পরিচয় প্রাপ্ত হই। পাশ্চাত্য-দেশের ইতিহাসে ডাইওনিসাস নামক বহু নৃপতির উল্লেখ আছে। কিন্তু ব্যাক্‌ট্রিয়ার ডাইওনিসাসের প্রকৃত নাম যে কি ছিল,—তাহা কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। দীনেশ বা দানবেশ নামক কোনও হিন্দু-নৃপতির নাম বা বিশেষণ যে ডাইওনিসাস-রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে,—ইহাও অসম্ভব নহে। সাণ্ড্রোকোট্টাস (Sandrocottus) বা ক্যাণ্ড্রেগুপ্‌স (Kandragupso) যদি চন্দ্রগুপ্ত নামের দ্যোতক হইতে পারে ; তাহা হইলে ডাইওনিসাস (Dionysius) শব্দে কি নাম হওয়া সম্ভবপর ? যাহা হউক, প্রাচীন বাহ্লিক প্রদেশের সহিত ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, প্রতীয়মান হয়,—ভারতবর্ষ হইতে বাহ্লিক প্রদেশে যাঁহারা রাজ্য-বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদেরই শাখা-প্রশাখা ইউরোপে ও এসিয়ার নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্য-এসিয়াকে আদিম আর্য্য-নিবাস-স্থান প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে যাঁহারা প্রয়াস পান, বাহ্লিক রাজ্যের আদি-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, তাঁহারা প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারেন।

গ্রীসের পুরাবৃত্তে ভারতের প্রাধান্য নানা আকারে প্রকটিত। 'ইণ্ডিয়া ইন গ্রীস' অর্থাৎ গ্রীসে ভারতের প্রভাব নামক গ্রন্থে মিঃ পোকক এই বিষয়ই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

গ্রীসে ভারতব।

গ্রীসের ভাষা, গ্রীসের সাহিত্য, গ্রীসের দেব-দেবী, এমন কি 'গ্রীস' এই নামটী পর্য্যন্ত গ্রীসের সহিত ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের সম্বন্ধ-সংস্রবের পূর্ণ পরিচায়ক। যদি শব্দ-তত্ত্বের আলোচনা করি, আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন গ্রীসের বহু শব্দ সংস্কৃতের অনুসারী। সংস্কৃতে 'পিতর'—গ্রীকে 'পেতর' (Pater), সংস্কৃতে 'অস্তি'—গ্রীকে 'এস্তি' (Esti), সংস্কৃতে 'তৃতীয়'—গ্রীকে 'ত্রিত' (Trita), সংস্কৃতে 'ত্রি'—গ্রীকে 'ত্রি' (Tri), ইত্যাদি বহু শব্দে সে পরিচয় বিদ্যমান। † গ্রীসের পৌরাণিক

---

* "The coins (Graco-Ba·rian oins found in the topes of bu ia' place of Afganistan) bear in lications of th circums an es of the Greek kingdom of Ba·tria. On those of Eu:ratides, a monarch who flourished in the age of Mithi ida es, .hre are found, beside the Greek characters, o'hers which have been proved to belong to a dai'ect of the Sanscrit, and have been de iphered by Mr. Princep."—*Chamber's Encyclopoedia.*

† কোন্ কোন্ দেশের কোন্ কোন্ শব্দ সংস্কৃত ভাষার অনুসারী, স্থানান্তরে তাহার বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আখ্যান-সমূহ ভারতবর্ষের পুরাণ-পরম্পরার অনুকরণে রচিত হইয়াছে বলিয়া নানারূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল নামের বা উচ্চারণের পার্থক্য; নচেৎ, গ্রীকদিগের বহু দেব-দেবী প্রাচীন ভারতের দেব-দেবীগণের প্রতিকৃতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুর সূর্য্য গ্রীকদিগের হেলিয়স (Helios), হিন্দুর বিশ্বকর্ম্মা গ্রীকদিগের হেফাইস্টো (Hephaisto), হিন্দুদিগের অগ্নি (ভরণ্যু) গ্রীকদিগের ফোরোনিস (Phroneus), হিন্দুদিগের অরুস (সূর্য্যের একটী অশ্বের নাম) গ্রীকদিগের এরোস (Eros), হিন্দুদিগের মরুদ্গণ গ্রীক-দিগের এরেস (Ares), হিন্দুদিগের দ্যু (দেব) গ্রীকদিগের জিয়স (Zeus), হিন্দুর ঋভু গ্রীকদিগের অর্ফিয়াস (Orpheus), হিন্দুদিগের শরণ্যু গ্রীক দেবী এরিনিজ (Erinys), হিন্দুগণের উষা গ্রীকদিগের এয়স (Eos), প্রভৃতির সাদৃশ্য-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, গ্রীস-দেশে আর্য্য-হিন্দুগণের প্রাধান্য পদে পদে লক্ষিত হয়। হিন্দুগণের ন্যায় গ্রীকেরাও আপনাদের দেবতাগণকে অমানুষিকী শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। হিন্দুগণ যেমন হিমালয় পর্ব্বতকে দেবতাগণের আবাস-স্থান বলিয়া মনে করেন, গ্রীকগণও, সম্ভবতঃ সেই আদর্শেরই অনুসরণে, 'ওলিম্পস' গিরিশৃঙ্গকে দেবাবাস বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ইন্দ্রের হস্তে যেমন বজ্র আছে, গ্রীকদিগের সেইরূপ জিয়সও বজ্রধারী ছিলেন। কুবেরের বাসস্থান যেমন কৈলাস, গ্রীসেও সেইরূপ কিলাস (Cilas) নামক পর্ব্বত তাঁহাদের ধন-দেবতার আবাসস্থান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রাচীন গ্রীসের প্রায় সকল বিষয়েই ভারতের আদর্শ পূর্ণ প্রতিভাত। গ্রীসের পৌরাণিক উপাখ্যান-সমূহের মধ্যেও অশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। ঋগ্বেদের ঋকের (প্রথম মণ্ডল, ১১৫শ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক) অনুবাদে দেখিতে পাই,—'মনুষ্য যেরূপ নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সূর্য্য সেইরূপ দীপ্তিমান উষার পশ্চাতে আসিতেছেন।' এই উপমা গ্রীকদিগের আপোলো (Apollo) ও ডাফনের (Daphne) উপাখ্যানেও প্রচলিত। * গ্রীসেও প্রচার,—ডাফনের পশ্চাতে আপোলো ধাবমান হইয়াছিলেন। তাহাতে ডাফনে বিনাশ-প্রাপ্ত হন। পণ্ডিতগণ বলেন,—'সূর্য্যের উদয়ে উষার অবসান, এই উপমায় উভয়ত্র তাহারই প্রকাশ পাইতেছে।' গ্রীস এই নামেও—পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, ভারতের প্রাধান্যের পরিচয় সম্পূর্ণ বিদ্যমান। তাঁহারা বলেন,—মগধের রাজধানী রাজগৃহের নামানুসারেই গ্রীস-দেশের নামকরণ হইয়াছিল। যে 'গ্রহ' ধাতু হইতে 'গৃহ' শব্দের উৎপত্তি, সেই 'গ্রহ' ধাতু হইতেই 'গ্রাহক' এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ গ্রাহকো, গ্রেকো, গ্রেকস, অথবা 'গ্রীক' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। † প্রাচীন মগধ-রাজগণ কর্তৃক গ্রীসে প্রথম-উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া-

* বেদোক্ত উষার প্রসঙ্গে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'ইণ্ডো এরিয়ান' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"The heroine of the stories must be Dawn aptly represented as a charming maiden, and her names in the Rig Veda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Sarama and Saranyu ; and all these names reapper among the Greeks as Argynoris, Briseis, Daphne, Eos, Helen, and Erinys."—*Indo-Aryan*.

† "The people or clans of Griha were, according to the regular patronymic from of their language, styled Graihka whence the ordinary derivative Graihaka (Graikos) Graecus or Greek."—Mr. Pococke, *India in Greece*.

ছিল। গ্রীসের নামকরণ উপলক্ষে এবং গ্রীসের আদিম জাতিগণের সম্বন্ধ-তত্ত্ব আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। গ্রীসের প্রাচীন অধিবাসিগণ 'পেলাসজি' (Palasgii) নামে পরিচিত। ইতিহাসে প্রকাশ—'হেলেনিজ' জাতি যখন গ্রীস-দেশ অধিকার করিতে গিয়াছিল, তখন গ্রীস দেশে 'পেলাসজি' জাতি বাস করিত। মগধ বা বিহারের অন্যতম প্রাচীন একটী নাম—'পোলাস' বা 'পলাশ'। তাহা হইতে 'পেলাসজি' বা 'পেলাসগো' জাতির নামকরণ হইয়া থাকিবে। এসিয়স নামক গ্রীসের একজন প্রাচীন কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—'পিলাসগাস রাজা গৈয়া-বংশোদ্ভব।' গৈয়া (Gaia) ও গয়া (Gya) একই শব্দ প্রতিপন্ন হইতে পারে। অতএব পলাশ বা প্রাচীন বিহারের অন্তর্গত গয়া প্রদেশের কোনও নৃপতি প্রাচীন কালে এক সময়ে গ্রীসে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন,—এতদ্দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। মাকিদন (Macedon)—মগধের নামান্তর বলিয়াও অনেকে মনে করেন। আফগানিস্থান, কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজপুতনা প্রভৃতি বহু স্থানের, বহু জনপদের, নামের সহিত গ্রীসের বহু প্রাচীন স্থানের ও বহু প্রাচীন জনপদের নামের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তাহাতেও ভারতের প্রাধান্য—গ্রীসে বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। গ্রীসের প্রাচীন অধিবাসীদিগের একটি প্রধান সংজ্ঞা—হেলেনিস্ (Hellenese); তদনুসারে গ্রীসের নাম—'হেলাস' (Hellas)। গান্ধার প্রদেশের—বর্ত্তমান বেলুচিস্থানের—মধ্যে প্রাচীন কালে 'হেলাস' নামে এক অতি-বিস্তৃত গিরিশ্রেণী বিদ্যমান ছিল। সেই গিরি-প্রদেশের অধিবাসিগণ গ্রীসে আধিপত্য বিস্তার করিয়া গ্রীসের নাম 'হেলা' (Hellas) এবং আপনাদিগকে হেলার অধিবাসী 'হেলেনিজ' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিল। ফলতঃ, গ্রীসের আদিম ইতিহাসকে ভারতবর্ষের আদিম ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। * গ্রীকদিগের—এমন কি ইউরোপের, আদি-কবি হোমার স্বদীয় 'ইলিয়ড' কাব্যে ট্রয়-যুদ্ধের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে রামায়ণ বর্ণিত লঙ্কা-সমরের ছায়া-চিত্র দেখিতে পাই। † পেলাসজি বা হেলেনিজ জাতির ইতিহাস, সে হিসাবে ঔপনিবেশিকগণের ইতিবৃত্ত বলা যাইতে পারে। তাহাদের সময় হইতেই আধুনিক ইতিহাসে গ্রীসের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির পরিচয়।

রোমে ভারতবর্ষ।

পাশ্চাত্য ইতিহাসে গ্রীসের পরই রোমের অভ্যুদয়। প্রাচীন রোমকগণ ট্রোজান-দিগের বংশসম্ভূত। ট্রোজান-গণ এসিয়া-মাইনর হইতে রোমে আধিপত্য বিস্তার করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহারা আর্য্যগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। সুতরাং মূলে ভারতীয় হিন্দুগণের প্রভাব রোম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান আছে,—তাহা বলাই বাহুল্য। 'রোম'—এই নামেও সে পরিচয় প্রকটিত। প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ বেবর বলেন,—'রোম লাটিন নাম নহে।' মিঃ পোকক

---

* "The primitive history of Greece is the primitive history of India."—Mr. Pococke, *India in Greece.*

† পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠায় রামায়ণের সহিত ইলিয়ডের সাদৃশ্যের বিষয় লিখিত আছে।

বলেন,—'রাম নাম হইতেই রোম নামের উৎপত্তি।' অনুসন্ধিৎসুগণ বলেন,—'ইংরেজী 'আ' স্থলে 'ও' সংযুক্ত হওয়ায়, 'রাম' স্থলে 'রোম' হইয়াছে।' * ভারতবর্ষের দেবদেবীগণ যেমন গ্রীসে তেমনি রোমেও রূপান্তরে প্রতিষ্ঠাপিত। বিশ্বকর্ম্মা—ভলবান (Vulcan), ইন্দ্র—জুপিটর (Jupiter), সূর্য্য—সোলস (Solis), উষা—অরোরা (Aurora) প্রভৃতি বিবরণ আলোচনা করিলে, এ তত্ত্ব বিশদীকৃত হইতে পারে। রোমের লাটিন ভাষা—সংস্কৃত ভাষার সহিত নানাপ্রকারে সাদৃশ্যযুক্ত; বিশেষতঃ, কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ লাটিনে অভিন্নভাবে বিদ্যমান। সংস্কৃত পিতর—লাটিনে পেতর (Pater), সংস্কৃত মাতর—লাটিনে মাতর (Mater), সংস্কৃত তৃতীয়া—লাটিনে তেরতিয়া (Tertia), সংস্কৃতে নবন—লাটিনে নব (Nava), ইত্যাদি। কতকগুলি বাক্য পর্য্যন্ত সংস্কৃতের সহিত লাটিনের সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন রোমের শাসন-প্রণালী, পুলিশ-প্রহরীর ব্যবস্থা, সমর-নীতি প্রভৃতি যেন ভারতের সংহিতা-শাস্ত্রের অনুসরণে পরিচালিত হইত। মন্বাদি সংহিতায় যেমন দেশপতি, গ্রামপতি, নগরপতির পরিচয় পাই, প্রাচীন রোমেও সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। রোম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানা মত বিদ্যমান। কোনও কোনও মতের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—৭৫৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৭২৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে রোমনগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের পুরাবৃত্তের তুলনায় সে মাত্র সে দিনের ইতিহাস। তাহার বহু পূর্ব্বেও ঐ দেশে আর্য্য-হিন্দুগণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল, প্রাচীন ইতিবৃত্তের আলোচনায় তাহা বুঝিতে পারা যায়।

জর্ম্মনী, স্কাণ্ডেনভিয়া, উত্তর-মেরু প্রদেশ এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখন জর্ম্মণ-রাজ্যের যেরূপ সীমা-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, পুরাকালে তাহা সেরূপ ছিল না। 'জার্ম্মণীয়া' (Germania) শব্দে রোমীয়গণ এক বিস্তৃত ভূ-খণ্ডকে নির্দ্দেশ করিতেন। সেই রাজ্য এক প্রবল-পরাক্রান্ত যোদ্ধৃজাতির অধিকারভুক্ত ছিল। জর্ম্মণী শব্দের প্রশস্ত অর্থে প্রতিপন্ন হয়,—ইউরোপ মহাদেশের যে যে অংশে জর্ম্মণ-ভাষার ও জর্ম্মণ-জাতির প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল, সেই সকল দেশকে একত্র জার্ম্মাণীয়া বা জর্ম্মণ-দেশ বলিত। তাহাতে, বর্ত্তমান জর্ম্মণ-রাজ্য, অষ্ট্রীয়া, সুইজরলণ্ড এবং নেদারল্যাণ্ড (হলন্দ ও বেলজিয়ম) এমন কি বৃটিশ-দ্বীপ-পর্য্যন্ত তখন জর্ম্মণ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাঁহাদের নামানুসারে 'জর্ম্মণ' রাজ্যের নামকরণ হয়, সেই জর্ম্মণ কাহারা? জর্ম্মণ রাজ্যের আদি সভ্যজাতি টিউটন-গণ তাঁহাদের পুরাবৃত্তে মনু-বংশসম্ভূত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের আদি-পুরুষ—মনু জর্ম্মণদিগেরও আদি-পুরুষ মনু; অর্থাৎ, মনু-বংশে তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাতে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ-তত্ত্ব আপনিই প্রকাশ পায়। সংস্কৃতের 'মনু' এবং 'মানুষ'—জর্ম্মণীর 'ম্যান' (Mann) এবং 'মেনেস' (Mensch) শব্দের আদিভূত, স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় না কি? অনেকেই বলেন,—"জর্ম্মণ শব্দ 'ব্রাহ্মণ' বা 'শর্ম্মণ' শব্দেরই

জর্ম্মণী প্রভৃতি ও ভারতবর্ষ।

* "The Sanskrit long 'a' is replaced by 'o' or 'w' of the Greeks, as Poseidon and Poseidan."—Mr. Pococke, *India in Greece*.

স্থানান্তর দাঁড়ায়। সংস্কৃত 'শ'—'জ' রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে।" * দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহারা 'আর্য্য' ও 'আর্ষ' শব্দের উল্লেখ করেন। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন— প্রাচীন জর্ম্মণদিগের একটি প্রচলিত রীতি; রোমীয় ঐতিহাসিক 'টাসিটস' এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। জর্ম্মণীর ন্যায় শীত-প্রধান দেশে এবম্বিধ প্রথার প্রচলন ছিল অবগত হইয়া, কর্ণেল টড্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,—'প্রাচীন জর্ম্মণগণ প্রাচ্য-দেশের অধিবাসী ছিলেন। জর্ম্মণীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াও তাঁহারা পূর্ব্ব-প্রথা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।' প্রাচীন জর্ম্মণগণের বেশভূষা—মস্তকে শিখার আকারে কেশরাশি-বন্ধন প্রভৃতির পরিচয়েও ভারতীয় ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। জর্ম্মণগণ 'স্যাক্সন' নামে এবং জর্ম্মণ-রাজ্যের কিয়দংশ 'স্যাক্সনি' নামে অভিহিত হইত। তাহাতেও জর্ম্মণ-রাজ্যে ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 'স্যাক্সন' শব্দ (Saxon)—শাক (Saca) এবং সানু (Sanu) শব্দের যোগে উৎপন্ন হইতে পারে। 'শক' জাতির অপভ্রংশে 'শাক' এবং তাহাদের অপত্য—'সানু' বা 'সন' (Sanu বা Son) শব্দে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিপন্ন হয়,—ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া, শক-সন্ততিগণ জর্ম্মণ দেশে বসবাস করিয়াছিল, এবং তাহাদের নামানুসারেই ঐ দেশ 'স্যাক্সন' নামে পরিচিত হয়। স্কান্দেনেভিয়া (Scandanavia)—স্কন্দের (কার্ত্তিকেয়ের) নামানুসারে অভিহিত হইয়াছিল; অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। প্রাচীন স্কান্দেনেভিয়া-বাসীদিগের ধর্ম্মপুস্তকের নাম—'এদ' (Edda)। আর্য্য-হিন্দুগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র 'বেদ' নামের অনুসরণে তাঁহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। † পরিব্রাজক পিঙ্কার্টন বলেন,—"খৃষ্ট জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, 'দরিয়স হিষ্টাসপেসের' সমসময়ে, অদিন (Odin) স্কান্দেনেভিয়ায় আসিয়া বসতি-স্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী বংশধরের নাম—গোতম (Gotama)। ইতিহাসে সেই সময় শেষ বুদ্ধের (মহাবীরের) আবির্ভাবের পরিচয় পাই। বিক্রম শতাব্দীর ৪৭৭ বৎসরে (খৃষ্ট জন্মের ৫৩৩ বৎসর পূর্ব্বে) 'মহাবীর বুদ্ধ' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌতম তাঁহার উত্তরাধিকারী।' পিঙ্কার্টনের এবম্প্রকার উক্তিতে বুঝিতে পারা যায়, ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়-কালে কোনও নৃপতি স্কান্দেনেভিয়া রাজ্যে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রাচীন স্কান্দেনেভিয়া রাজ্য অধুনা নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ঐ সকল দেশ উত্তর-কুরু প্রদেশের অংশ বিশেষ বলিলেও বলা যাইতে পারে। পুরুরবার বংশে 'অদিন' নামক জনৈক নৃপতির পরিচয় পাই। তিনি অবশ্য গৌতম বুদ্ধের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি বা তাঁহার বংশধর কেহ যদি স্কান্দেনেভিয়া-

* "It has been remarked by various authors (as Kuhn and Zeitschrift, IV. 94 ff.) that analogy with Manu or Manus as the father of mankind or of the Aryas. German mythology recognises Manus as the ancestors of Teutons."—Muir, *Sanskrit Texts.*

† কাউণ্ট জোরণস্-জারণার এই মত. —"We can scarcely question the derivation of Edda from the Vadas."—Count Bjnrostjerna, *Theogony of the Hindus.*

রাজ্যের প্রতিষ্ঠিতা হন, তাহা হইলে অনেক আদি-কথা আসিতে পারে। 'হাইপারবোরিয়ান্' অর্থাৎ এসিয়া ও ইউরোপের উত্তরাংশে (উত্তর-মেরু প্রদেশে) অনেক পূর্ব্বে আর্য্য-হিন্দু-গণের গতিবিধি ছিল,—তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। * প্রাচীন বৃটিশ-দ্বীপ-পুঞ্জে 'ড্রুইদ' (Druid) বা পুরোহিত-বংশের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। রোমীয়গণের উপদ্রবে ড্রুইদ ধর্ম্মযাজকেরা একটী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই দ্বীপের নাম—মোনা। মোনা—'মুনি' শব্দের অপভ্রংশ বলিলেও বলা যায়। বহু পূর্ব্বে গ্রেট ব্রিটেন—শক-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহারও নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। 'কেল্টিক-ড্রুইদ' প্রসঙ্গে 'গড্‌ফ্রে হিগিন্স' প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—বৃটিশ-দ্বীপে যখন হিন্দুগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, তখন ঔপনিবেশিকগণের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণও ঐ দেশে আসিয়াছিলেন। দেশভেদে কালভেদে তাঁহাদের বংশধরগণ ক্রমে ড্রুইদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। টিউটন-গণের ন্যায় কেল্ট-গণও আর্য্য-হিন্দুগণের শাখা-প্রশাখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। † সকল জাতিই 'এরিয়ান' (Aryan) অর্থাৎ আর্য্য-বংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন বটে; কিন্তু ভারতবর্ষ যে তাঁহাদের আদিভূত, তাহা প্রায়ই কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না। এরূপ হইবার কারণ—কোন জাতিরই অতি-দূর অতীতের আদি-ইতিহাস সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না; অপিচ, ভারতবর্ষ হইতে মধ্য-এসিয়ায় যাঁহারা প্রথমে বসবাস করিয়াছিলেন, ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহাদের বংশধরগণের গতিবিধি ঘটিয়াছিল; আর, তাহা হইতেই সকলে মধ্য-এসিয়াকে আপনাদের সভ্যতার আদিভূত বলিয়া মনে করেন।

চীনে ভারতবর্ষ।

চীন অতি প্রাচীন রাজ্য। খৃষ্ট জন্মের ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বেও চীন-রাজ্যের অস্তিত্বের পরিচয় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ-পত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতে চীনদেশ ভারতের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। ভারত-যুদ্ধের সমসময়ে চীন-দেশের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ-উপলক্ষে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, কামরূপের অধিপতি ভগদত্তের সহিত অর্জ্জুন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে চীনাগণ ভগদত্তের পক্ষাবলম্বন করেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে, ষড়বিংশ অধ্যায়ে, লিখিত আছে,—'প্রাগজ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত, কিরাত, চীন এবং সাগর-তীরস্থ অন্যান্য অনুপদেশবাসী বহুসংখ্যক যোধগণের সহিত সমবেত ছিলেন।' ইতিপূর্ব্বে আমরা মনুসংহিতার যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের পূর্ব্বেও চীন-জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ‡ এদিকে আবার, চীন ও তাতার দেশের

* "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

† টিউটন ও কেল্ট—ইউরোপের দুইটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন জাতি। তাঁহাদের ভাষা 'টিউটনিক' ও 'কেল্টিক' নামে অভিহিত। টিউটন-গণের প্রভাব ইউরোপের উত্তরাংশে জর্ম্মণী, স্কান্দেনেভিয়া, সুইজর্লণ্ড, নেদারলণ্ড প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। কেল্টগণ—ইউরোপের পশ্চিমাংশে, গল (ফ্রান্স), স্পেন এবং পরিশেষে রোম ও গ্রীসে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ইউরোপের সভ্য-জাতি-সমূহ টিউটন বা কেল্ট বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

‡ এই পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ, ২৫শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কুলজ্ঞগণ (বংশলতা-সংগ্রাহকগণ) নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চীনাগণ আয়ুর বা য়ুর বংশোদ্ভব ছিলেন। * পুরুরবার পুত্রের নাম—আয়ু। তাঁহার বহু পুত্র-সন্তান ছিল। সেই আয়ু-পুত্রগণের কেহ হয় তো চীন-দেশে বাস করিয়াছিলেন; সেই কথা স্মরণ করিয়াই বংশলতা-সংগ্রাহকগণ চীনাদিগকে আয়ুর বংশ-সম্ভূত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। † চীনারাও আপনাদিগকে হিন্দু-বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন। চীনাদিগের সুকিং (Schuking) গ্রন্থে চীনাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তীর বিষয় লিখিত আছে। তাহাতে প্রকাশ,—খৃষ্ট-জন্মের উনত্রিংশ শত বৎসর পূর্ব্বে চীনের পশ্চিমস্থিত অত্যুচ্চ পার্ব্বত্য-প্রদেশ হইতে চীনাদিগের আদি-পুরুষগণ চীনে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। চীনের পশ্চিমস্থিত সেই অত্যুচ্চ পর্ব্বত—হিমালয় ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? ভারতবর্ষ হইতেই হিমালয় অতিক্রম করিয়া অথবা হিমালয়-গিরিশ্রেণী হইতে আর্য্যবংশধরগণ চীনে গমন করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তার পর, চীন—এই নামটী ভারতবাসীরই প্রদত্ত। কেহ কেহ বলেন,—বাইবেলের 'সিনিম' (Sinim) শব্দ হইতে চীন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে; কারণ, বাইবেলের অনেক পূর্ব্বে হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-গ্রন্থে চীন-নামের উল্লেখ আছে। সুতরাং বাইবেলের 'সিনিম' শব্দ হইতে যে চীন নামের উৎপত্তি হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। অধ্যাপক হীরেণ তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন,—'চীন এই নামের উৎপত্তি-স্থানই ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষ হইতেই এই নাম পাশ্চাত্য-দেশে প্রচারিত হইয়াছে।' ‡ চীন-দেশের আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অনেকেই এই কথা স্বীকার করেন। চীন-দেশে এক সময়ে সংস্কৃত ভাষা—দেবভাষা বলিয়া সমাদৃত হইত। চীন-দেশে দশ দিক ও দ্বাদশ রাশিচক্রের বিষয় প্রচলিত আছে। সূর্য্যার্ঘ্য-দানে ও সূর্য্যোপাসনায় প্রাচীন চীনাগণ বিশেষরূপ অভ্যস্থ ছিল। চীন-দেশে শ্রাদ্ধাদির প্রথা রূপান্তরে আজি পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। এই সকল নানা কারণে পুরাকালে চীন-দেশে ভারতবর্ষের প্রভাব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। পুরাকালে চীনের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল; ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ চীনে গমন করিতেন; চীন-দেশীয় পরিব্রাজকগণের সর্ব্বদা ভারতে গতিবিধি ছিল;—বহু প্রাচীন কাল হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। চীনাদিগের ধর্ম্মমত চিরদিনই ভারতবর্ষের ধর্ম্মমতের অনুসারী। ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়-কালে চীন যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে ভাসমান হইয়াছিল, সে নিদর্শন চীনে প্রকট পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। তন্ত্রের 'চীনাচার'—চীন-দেশের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ-তত্ত্বের পরিচায়ক নহে কি? ফলতঃ, চীনের সহিত ভারতের বহু দিনের বহু প্রকারের সম্বন্ধ। চীন-দেশের সভ্যতা প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণের সভ্যতারই অনুসারী।

---

* "The genealogists of China and Tartary declare themselves to be the descendants of Awar, son of the Hindu King Pururawa."—Tod's *Rajasthan*.

† কেহ কেহ বলেন,—চীনারা মঙ্গোলীয় বংশসম্ভূত; তাঁহারা আর্য্যবংশোদ্ভব নহেন। কিন্তু মঙ্গোলীয় প্রভৃতি বর্ণবিভাগ আধুনিক কালের।

‡ "The name China is of Hindu origin and came to us from India."—Prof. Heeren's *Historical Researches*.

তুর্কিস্থানের পুরাবৃত্ত আলোচনায়ও ভারতের সহিত তাহার প্রাচীন সম্বন্ধের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তুরস্ক বা ইংরাজীতে 'টার্কি ইন এসিয়া' নামে যাহা অভিহিত, তাহার উল্লেখ পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়। এখন যাহা তুর্কিস্থান এবং তুরস্ক, পূর্ব্বে সেই উভয় দেশই তুবস্ক নামে পরিচিত থাকা সম্ভবপর। এমন কি, ইউরোপীয় তুরস্কও—সুলতানের রাজ্য—তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

তুর্কিস্থান, সিরীয়া প্রভৃতি।

কর্ণেল টড্ রাজস্থানের ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—'পুরাণোল্লিখিত তুরিস্ককে আবদুল গাজী 'তার্কের' পুত্র 'তমাক' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার বংশধরগণের নামানুসারেই তোকারিস্থান বা তুর্কিস্থান নামকরণ হইয়া থাকিবে।' অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বলেন,—'তুর্ব্বস এবং তাঁহার বংশধরগণ তুরাণীয় (Turanians) সংজ্ঞা লাভ করেন।' তুর্ব্বসু-প্রমুখ যযাতির পুত্রগণ পিতা-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হন। * সেই তুর্ব্বসুর বংশধরগণ 'তুর্ব্বসুস্থান' বা 'তুর্কিস্থান' রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সিদ্ধান্তে তাহারই আভাষ পাওয়া যায়। রাজস্থানে আরও প্রকাশ,—'চন্দ্রবংশীয় যদুর ও কুরুর বংশধরগণ মধ্য ও উত্তর এসিয়ার বহু স্থানে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। উত্তর-কুরু নামেই কুরুবংশীয়গণের রাজত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যদুবংশীয়গণ এক সময়ে খোরাশান প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন,—যশল্মীরের ইতিহাসে তাহা বিবৃত রহিয়াছে। গজনী হইতে সমরখন্দ পর্য্যন্ত এক সময়ে যশল্মীরের যাদবগণের অধিকারভুক্ত ছিল। যশল্মীরের যাদবগণ 'জাবলীস্থান' শাসন করিয়াছিলেন এবং গজনী নগরী তাঁহাদিগেরই কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।' তুর্কিস্থান এক সময়ে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমদিকে কাস্পিয়ান সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব দিকে চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত লবনর (Lobnor) হ্রদ (১১০° পূর্ব্ব দ্রাঘিমা) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এদিকে উত্তরে সাইবেরিয়া ও জুঙ্গারিয়া হইতে দক্ষিণে পারস্য, আফগানিস্থান ও তিব্বত পর্য্যন্ত, তুর্কিস্থানের সীমানার পরিচয় পাওয়া যায়। পারসীকগণ ঐ দেশকে 'তুরাণ' নামে অভিহিত করিতেন। 'তুরাণ' শব্দে সূর্য্যবংশীয়দিগকে বুঝাইতে পারে, এ আভাষ পূর্ব্বেই আমরা প্রদান করিয়াছি। † সুতরাং ঐ দেশ কখনও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের, কখনও বা সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তুর্কিস্থানের ন্যায় তুরস্কের প্রসঙ্গেও ভারতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তুরস্কের অন্তর্গত প্রাচীন সিরীয়া—'সুর-রাজ্য' ছিল, মনে হইতে পারে। প্রাচীন সিরীয়ার সীমানা বিষয়ে পণ্ডিতগণ এখন এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন;—উত্তরে এসিয়া মাইনরের কতকাংশ, পশ্চিমে লেভাণ্ট উপসাগর, দক্ষিণে আরব, পূর্ব্বে এবং পূর্ব্বদক্ষিণে বিশাল মরুভূমি। কেহ কেহ বলেন,—সিরীয়া ও আসিরীয়া, একই রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্য যখন অসুরগণের অধিকার-ভুক্ত ছিল, তখন উহা 'অসুরিয়া' বা 'আসিরীয়া' নামে পরিচিত হইয়াছিল; আবার উহা যখন সুরগণের

* "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† এই পরিচ্ছেদের ৩০শ পৃষ্ঠায় এতদালোচনা দ্রষ্টব্য।

অধিকার-ভুক্ত ছিল, তখন উহা 'সুরিয়া' বা 'সিরীয়া' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক, সে প্রাচীন তথ্য নির্ণয় করা এখন দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে খৃষ্ট জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, এব্রাহামের সম-সময়ে, 'দামাস্কস' (ডামাস্কাস—Damuscas) সিরিয়ার প্রধান নগর-মধ্যে গণ্য ছিল। দানব-দেশ শব্দের অপভ্রংশে 'দামাস্কস' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। গ্রীস-দেশের প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাই,—এক সময়ে 'সিডন' ঐ সমৃদ্ধিশালী জনপদের রাজধানী ছিল। হিব্রুগণের ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে,— 'কানান বা পালেস্তিন (Canan or Palestine) যখন জোসুয়া কর্তৃক আক্রান্ত হয়, ঐ প্রদেশে তখন অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী নগর বিদ্যমান ছিল। সেই প্রাচীন-কালে সিরীয়ার সমগ্র অংশ একই বংশোদ্ভব নৃপতিগণের ভিন্ন ভিন্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল।' গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেন,—'সিরীয়া' আসিরীয়ারই সংক্ষিপ্ত নাম। আসিরীয়ার প্রসঙ্গে ভারতের প্রভাবের বিষয় পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং সিরীয়া সম্বন্ধেও আমাদের একই মত।

সিদীয়া নামে আর এক প্রাচীন জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। সিদীয়া (Scythia) বলিতে এক সময়ে কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর এবং আরল সাগরের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে বুঝাইত। সেই বিস্তৃত জনপদে যে জাতি বসবাস করিত, তাহাদের নামানুসারেই উহার নামকরণ হইয়াছিল; নচেৎ, ভৌগোলিক সীমানা বুঝাইবার উপযোগী সিদীয়া রাজ্যের বিশেষ কোনই নিদর্শন নাই। ভারতীয় শকগণের রাজ্য—'সিদীয়া' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই অনুমান হয়। লাথাম (Latham) প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—'সিদীয়ান-গণ বর্ত্তমান তুর্কমানদিগের আদি পুরুষ। তাতার দেশে তাঁহাদের আদি-বাস ছিল। সেখান হইতে, কাস্পিয়ান-সমুদ্রের পশ্চিম হইয়া, রুশিয়া, ত্রান্সিল্‌-ভেনিয়া এবং সম্ভবতঃ হাঙ্গারি পর্য্যন্ত, সেই সিদীয়া রাজ্য বিস্তৃত ছিল।' নেবর এবং নিউম্যান বলেন,—'সিদীয়ানগণই' মোগল-বংশ। মতান্তরে আবার দেখিতে পাই,—'ফিন্স বা সার্কোসিয়ান-গণই সেই সিদীয়জাতি। সিদীয়গণের এই বিস্তৃতির বিষয় আলোচনা করিলে, ভারতের দিক হইতেই তাহারা বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, প্রতিপন্ন হয়। ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত শকজাতি ক্রমশঃ দেশান্তরে গমন করিয়া, এইরূপ ভত্তদ্দেশে আপনাদের অস্তিত্ব মিশাইয়া ফেলিয়াছিল।'

সিদীয় ও সেমিটিক সম্প্রদায়।

প্রাচীন কালে আর এক প্রসিদ্ধ মানব-সম্প্রদায়ের পরিচয় পাই,—তাহাদের নাম 'সেমিটিক' (Shemetic) সম্প্রদায়। সেমের (Shem) বংশধরগণই সেমিটিক বা সেমাইট (Semitic) আখ্যা লাভ করে। খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রন্থে সেম—নোয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া উল্লিখিত। তিনি আবার হাম (Ham) নামেও পরিচিত হইয়া থাকেন। হিব্রুগণ (Hebrews)—সেমিটিক-গণের একটী বংশ বলিয়া কথিত হয়। সেমের প্রপৌত্র 'এবার' (Eber) অর্থাৎ এব্রাহামের পূর্ব্ব-পুরুষের নামানুসরণে হিব্রুগণের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেমিটিক জাতির সম্প্রদায়-বিশেষ মেসোপোটেমিয়া হইতে পালেস্তাইনে এবং সেখান হইতে মিশরে গমন করিয়াছিলেন। মিশর হইতে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক বহুকাল পরে পালেস্তাইন

পুনরধিকার করিয়া তথায় বসতি-স্থাপন করেন। তাঁহারাই 'হিব্রু' নামে অভিহিত হন। সেমেটিক ভাষা বলিতে হিব্রু, ফিনিসীয়, আরবীয়, আবিসিনীয়, কাল্‌ডীয়, আসিরীয় ও বাবিলোনীয় প্রভৃতি ভাষা বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়,—এক সময়ে ঐ সকল জাতি, সেমিটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেমিটিক সম্প্রদায়ের আদিভূত সেম (Shem)—'শ্যাম' শব্দেরই রূপান্তর। পণ্ডিতগণ ইহাই বলিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম—শ্যাম। সেই শ্যামের বা শ্রীকৃষ্ণের কোনও বংশধর হইতে সেমেটিক-গণের উৎপত্তি হইয়াছিল,—এরূপও মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি,—যদুবংশ দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই বংশেরই কোনও শাখা হইতে সেমিটিকগণের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে।

অন্যান্য স্থানে ভারতের প্রভাব।

আমেরিকা মহাদেশে ভারতবর্ষের আর্য্য-হিন্দুগণ বহু পূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন,—অতি প্রাচীন কালে সেই মহাদেশে ভারতীয় হিন্দু-নৃপতিগণের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল,—এ প্রসঙ্গ আমরা পূর্ব্ব-খণ্ডেই উল্লেখ করিয়াছি। * এস্থলে সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখন যাহা জলময়—বেরিং-প্রণালী নামে অভিহিত, ভূ-তত্ত্ববিদ্গণ নির্ণয় করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা স্থলময় যোজক ছিল। ভারতবর্ষ হইতে যাঁহাদের আমেরিকা মহাদেশে গতিবিধি ছিল, তাঁহারা প্রায়ই তখন চীন ও রুশ-রাজ্য অতিক্রম করিয়া, সেই পথে আমেরিকায় গমনাগমন করিতেন। এদিকে ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতবর্ষের প্রাধান্য যে বিস্তৃত হইয়াছিল ;—যবদ্বীপে, বলীদ্বীপে, সুমাত্রা, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি স্থানে আজিও তাহার নানা নিদর্শন বিদ্যমান। কর্ণেল টড বলেন,—'ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপ-পুঞ্জে বহু পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের আধিপত্য ছিল। ঐ দ্বীপপুঞ্জে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি এবং খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়, তাহাতে সূর্য্য-বংশীয় নৃপতিগণের বীরত্বের পৌরাণিক ইতিহাস প্রকটিত আছে।' † এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের ইতিহাসে প্রকাশ,—'খৃষ্ট-জন্মের ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশের বহু সংখ্যক হিন্দু যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন,—সেই দেশের প্রাচীন ইতিহাসে তাহার বর্ণনা আছে।' ‡ চতুর্থ শতাব্দীতে কয়েক জন চীন-পরিব্রাজক যবদ্বীপ পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা দেখিতে পান,—সেই দ্বীপের সকল অধিবাসীই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। বলী-দ্বীপের তো কথাই নাই। বলী-দ্বীপে এখনও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি-সমূহ বিরাজমান রহিয়াছে। বোর্ণিয়ো দ্বীপ যদিও অধুনা সর্ব্বপ্রকারে হিন্দুগণের সংশ্রব-শূন্য ; কিন্তু ঐ দ্বীপের নানা স্থানে এবং পর্ব্বতের উপরিভাগে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-মন্দির ও বৌদ্ধদিগের মঠের ভগ্নাবশেষ-সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বীপের মধ্যস্থলে, তীরভূমি হইতে চারি শত মাইল দূরবর্ত্তী 'ওয়াহু' প্রদেশে এখনও বহু প্রাচীন কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়। সে সমুদায় হিন্দুদিগের উপাসনালয় মন্দিরাদির

* "পৃথিবীর ইতিহাস," প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ এবং একত্রিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

† "The isles of the Archipelago were colonized by the Suryas whose mythological and heroic history is sculptured in their edifices maintained in their writings."—Col. Tods, *Rajasthan*.

‡ Elphinstone's *History of India*.

লক্ষণ-সমন্বিত। সুমাত্রা-দ্বীপেও হিন্দুদিগের প্রাধান্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দ্বীপ পরিভ্রমণ কালে এণ্ডারসন নামক জনৈক খৃষ্টধর্ম্ম-যাজক ঐ দ্বীপের অন্তর্গত জাম্বীতে একটি প্রকাণ্ড মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মন্দিরের সন্নিকটে কতকগুলি দেব-দেবীর ভগ্ন-মূর্ত্তিও পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সেই সকল দেখিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন,—ভারতে বেদান্ত-দর্শনের প্রাধান্য-সময়ে ঐ দ্বীপে হিন্দুগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। * সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জে এবং অষ্ট্রেলিয়ায়ও হিন্দুদিগের প্রাধান্যের নিদর্শন-পরম্পরা বিদ্যমান আছে। তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া প্রভৃতির প্রাচীন ইতিবৃত্ত একই পরিচয়-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কশ্যপের নামানুসারে কাস্পিয়ান সাগরের নাম-করণ হইয়াছে, অসিরয়ের নাম হইতে এসিয়া মহাদেশের নামকরণ হইয়াছে,—এ সকল কথাও কেহ কেহ কহিয়া থাকেন। যাহা হউক, অতীতের অনন্ত ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, পৃথিবীর সকল দেশের সহিত ভারতবর্ষ যে কোন-না-কোনও প্রকারে সম্বন্ধযুক্ত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। জলপথে, ব্যোমপথে, স্থলপথে,—নানা পথে নানা প্রকারে তখন দেশ-বিদেশে তাঁহাদের গতিবিধি ছিল; এদিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে জনসাধারণ ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক তথন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন;—তাহারও নিদর্শন মন্বাদি সংহিতা-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবঃ॥"

—মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২০ শ্লোক।

অর্থাৎ,—'এই ভারতবর্ষের অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট পৃথিবীর সকল দেশের সকল মনুষ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করুক।' যাঁহারা বলেন,—মধ্য-এসিয়ায় গিয়া আর্য্যগণ বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া আসিতেন, মহর্ষি মনুর এই উক্তিতে তাঁহাদের সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর। ফলতঃ, ভারতবর্ষই সর্ব্ব-বিষয়ে আদিভূত। শাস্ত্রাদির আলোচনায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়। যাঁহারা একটু পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়াছেন, প্রাচ্য-দেশোদ্ভবই হউন, আর প্রতীচ্য-দেশোদ্ভবই হউন, তাঁহারা কেহই এ বিষয়ে অন্যমত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 'ভারতে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ইতিহাস' লেখক থরণ্টন ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন,—'নীল-নদের উপত্যকায় মিশরের পীরামিড স্তম্ভসমূহ বিনির্ম্মিত হইবার বহু পূর্ব্বে, ইউরোপের সভ্যতার আদি-স্থান ইতালি ও গ্রীস যখন অসভ্য বর্ব্বর বন্যজাতির লীলা-ক্ষেত্র ছিল, সেই সময়ে ভারতবর্ষ ধনৈশ্বর্য্যে ও সভ্যতা-গৌরবে গরীয়ান ছিল।' †

---

* M. Coleman's *Hindu Mythology*.

† "Ere yet the Pyramids looked down upon the valley of the Nile, when Greece and Italy, those cradles of European civilisation nursed only the tenants of the wilderness India was the seat of wealth and grandeur."—E. Thornton, *History of the British Empire in India*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক তত্ত্ব।

[প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য ;—জম্বুদ্বীপ ও ভারতবর্ষ,—জম্বুদ্বীপের অবস্থান ও আকার,—পৃথিবীর গোলত্ব-তত্ত্ব ;—ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ,—সপ্ত-কুলাচল,—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান, তাম্রবর্ণ প্রভৃতি নয়টী বিভাগের পরিচয় ;—নয় বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের আলোচনা ;—ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাগের প্রসঙ্গ ;—ভারতবর্ষের সীমানা-তত্ত্ব ;—ভারতবর্ষের নদ-নদী, পর্ব্বত ও জনপদাদি ;—নদ-নদীসমূহের অবস্থান ও উৎপত্তি-স্থান ;—ভারতবর্ষের প্রাচীন জনপদসমূহ,—পৌরাণিক মতে জনপদাদির অবস্থান ;—ভারতবর্ষের তীর্থস্থান ;—প্রাদেশিক নদ-নদী প্রভৃতি ;—পৃথিবীর অবস্থান ও বিভাগ-তত্ত্ব।]

এক সময়ে পৃথিবীর সকল দেশে ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, আমরা পুনঃপুনঃ সেই কথার অবতারণা করিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে এতদ্বিষয়ক আমাদের সমুদায় যুক্তি-তর্ক হয় তো ভাসিয়া যাইতে পারে। এখনকার দিনে এবম্বিধ বিষয়ে জনসাধারণের আস্থা-স্থাপনের আশা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। বিড়ম্বনা বলিয়াই, অশেষ শাস্ত্র-প্রমাণ-সত্বেও, আমাদের যুক্তি-তর্কের সমর্থনে, সময়ে সময়ে আমাদিগকে আধুনিক পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতামত প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন-পূর্ব্বক আমরা পৃথিবীর এবং ভারতবর্ষের অবস্থানাদির বিষয় যাহা অবগত হই, এস্থলে সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। তাহাতে, পুরাকালে আর্য্য-হিন্দুগণের প্রভাব-প্রতিপত্তির অনেকটা আভাষ পাওয়া সম্ভবপর। স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বের ঘটনাবলী ; পরিবর্ত্তনের প্রবল প্রবাহের মধ্যে পড়িয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া আসিতেছে ; ভাষায়, ভাবে, উপমায়, রূপকে—কতই অবস্থান্তর ঘটিয়াছে ; সুতরাং প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা একান্ত দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। তথাপি, ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে ক্ষুদ্র-শক্তিতে যতটুকু আয়ত্ত করা সম্ভবপর,—পুরাণ-পরম্পরার আলোচনায় যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। স্থির চিত্তে আলোচনা করিলে, বিচার-বিতর্কে তাহা হইতে এখনও যে কিছু-না-কিছু সত্য তথ্য নির্ণীত হইতে পারে,—তাহা বলাই বাহুল্য।

সূচনা।

পুরাণে দেখিতে পাই, পুরাকালে পৃথিবী সপ্তধা বিভক্ত হইয়াছিল। রাজা প্রিয়ব্রত আপন সাত পুত্রকে সেই সাত অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্নিধ্র (আগ্নীধ্র) জম্বুদ্বীপের অধিপতি হন। সুতরাং দেখা আবশ্যক,—জম্বুদ্বীপ বলিতে পৃথিবীর কোন্ অংশ নির্দ্দিষ্ট হয়? শ্রীমদ্ভাগবতে, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে, যোগিশ্রেষ্ঠ শুকদেব জম্বুদ্বীপের বর্ণনায় বলিতেছেন,—"হে রাজন্! এই ধরামণ্ডল এক প্রকাণ্ড কমল-সদৃশ। সপ্তদ্বীপ ইহার কোষ। ঐ সপ্তদ্বীপ-কোষ-মধ্যে অভ্যন্তর কোষ—এই জম্বুদ্বীপ। ঐ দ্বীপই প্রথম। উহার দৈর্ঘ্য নিযুত যোজন এবং বিস্তার

জম্বুদ্বীপ ও ভারতবর্ষ।

লক্ষ যোজন। উক্ত জম্বু-দ্বীপ চারিদিক সমান বর্ত্তুলাকার। এই দ্বীপে নয়টি বর্ষ আছে।" সেই নয়টী বর্ষ বা বিভাগের মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সকল পুরাণেই জম্বুদ্বীপের ও ভারতবর্ষের অবস্থান বিষয়ে প্রায় একইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বরাহ-পুরাণে লিখিত আছে,—"জম্বুদ্বীপ অতি বিশাল, অতি সুশ্রী ও ইহার চারিদিকে গোলাকার। ইহাতে নয়টি বর্ষ আছে। আমরা যেখানে অবস্থান করিতেছি, ইহার নাম ভারতবর্ষ।" ইহার উত্তরে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে অন্যান্য বর্ষ-সমূহ অবস্থিত আছে। গরুড়পুরাণের বর্ণনায় দেখিতে পাই,—"জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে ইলাবৃত বর্ষ। এই বর্ষেই সুমেরু-পর্ব্বত অবস্থিত আছে। সুমেরুর পূর্ব্বভাগে ভদ্রাশ্ব বর্ষ, পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভাগে হিরণ্বান বর্ষ, দক্ষিণে কিম্পুরুষ বর্ষ ও ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-পশ্চিমে হরিবর্ষ, পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ, পশ্চিমোত্তরে রম্যক বর্ষ ও উত্তরে কুরু বর্ষ।" এবম্বিধ বর্ণনা হইতে জম্বুদ্বীপ অর্থে আমরা কি বুঝিতে পারি? আমাদের মনে হয়,—জম্বুদ্বীপ অর্থে তখন এই সসাগরা পৃথিবী-কেই বুঝাইত; অন্ততঃ, এখন আমরা যাহাকে পুরাতন মহাদেশ বলি, জম্বুদ্বীপ তখন তাহাই ছিল। তবে, তাহা হইলে, প্রিয়ব্রত কর্ত্তৃক বিভাগীকৃত অবশিষ্ট ছয়টী দ্বীপ এখনও আমাদের অজানিত আছে, স্বীকার করিয়া লইতে হয়। শাস্ত্রে সপ্তদ্বীপের অবস্থান-সম্বন্ধে লিখিত আছে,—'লবণ সমুদ্রে জম্বু-দ্বীপ, ইক্ষু সমুদ্রে প্লক্ষ-দ্বীপ, সুরা সমুদ্রে শাল্মলী-দ্বীপ, সর্পি-সমুদ্রে কুশ-দ্বীপ, দধি সমুদ্রে ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ, দুগ্ধ সমুদ্রে শাক-দ্বীপ এবং জল সমুদ্রে পুষ্কর-দ্বীপ পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। জম্বুদ্বীপ পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় গোলাকারে অবস্থিত। আর অন্যান্য দ্বীপ পদ্মের দলের ন্যায় স্তরে স্তরে তাহাকে ঘেরিয়া আছে।' সে হিসাবে, জম্বু-দ্বীপের অবস্থিতি নানা জনে নানা প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সে হিসাবে, প্লক্ষাদি দ্বীপের আধুনিক পরিচয় কিছুই নির্দ্দেশ করা যায় না। সেই সকল দ্বীপ এবং তদন্তর্গত বর্ষ-সমূহ এখন কোথায়, কে নির্ণয় করিবে? যেমন জম্বুদ্বীপ নয় বর্ষে বিভক্ত, তেমনি অন্যান্য দ্বীপও নানা বর্ষে বিভক্ত ছিল। সেই সকল দ্বীপ এবং তদন্তর্গত বর্ষ-সমূহ জম্বুদ্বীপ ও ভারত-বর্ষের অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃতি-সম্পন্ন। যাহা হউক, পুরাণাদির বর্ণনা মিলাইয়া প্লক্ষাদি দ্বীপের অবস্থিতির বিষয় এখন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঐ সকল দ্বীপের বর্ত্তমান নাম নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বটে; * কিন্তু তাহাতে মূলতঃ বড়ই অসামঞ্জস্য রহিয়া যাইতেছে। পুরাণের বর্ণনায় আছে,—'জম্বুদ্বীপ বর্ত্তুলাকার।' কিন্তু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষ। ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? বিশেষতঃ, জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই প্রধান,—এ কথা যখন পুনঃপুনঃ উল্লিখিত রহিয়াছে, তখন কি করিয়া জম্বুদ্বীপকে ভারতবর্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি? জম্বুদ্বীপকে বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষ এবং জৈনগণ ভারতবর্ষের অন্তর্গত একটি বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সকলেরই বা কারণ কি? শাস্ত্রে যখন দেখিতে পাই,—জম্বুদ্বীপের বর্ণনায় লিখিত আছে,—"যো বা অয়ং দ্বীপঃ কুবলয়কমলকোশাভ্যন্তরকোশো নিযুতযোজনবিশালঃ সম-বর্ত্তুলো যথা পুষ্করপত্রম।" শাস্ত্রে যখন দেখিতে পাই,—"পর্ব্বতপ্রভবাভিশ্চ নদীভিঃ

* "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, ১৫শ পৃষ্ঠায় জম্বু-প্লক্ষাদি দ্বীপের বর্ত্তমান নাম দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বশ্চিতম। জম্বুদ্বীপং পৃথু শ্রীমৎ সর্ব্বতং পরিমণ্ডলম্॥" শাস্ত্রে যখন দেখিতে পাই,—"জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেষাং মধ্য সংস্থিতঃ। তস্যাপি মেরুর্মৈত্রেয় মধ্যে কনক পর্ব্বতঃ॥" * তখন জম্বুদ্বীপকে ভূগোলার্দ্ধ বা বর্ত্তমান পৃথিবী ভিন্ন অন্য কিছুই বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। যাঁহারা জম্বু-দ্বীপে এসিয়া, ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের কোনও অংশ-বিশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তদ্রূপ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা অবশ্য আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে তাঁহারা কি সূত্রে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা জম্বুদ্বীপ অর্থে ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেইরূপ অর্থের হয় তো কোনও কারণ থাকিতে পারে। এক সময়ে যখন সমগ্র পৃথিবী বা ভূ-গোলার্দ্ধ ভারতীয় নৃপতি-গণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তখন সমগ্র জম্বুদ্বীপকে ভারত-সাম্রাজ্যভুক্ত বা ভারতবর্ষ বলা অসম্ভব নহে। ভারতবর্ষের মধ্যেও জম্বুদ্বীপ নামে অপর কোনও প্রদেশ হয় তো এক সময়ে বিদ্যমান ছিল, এবং তাহা হইতেই জৈনগণ, পুরাণাদি শাস্ত্রের বর্ণনায় উপেক্ষা করিয়া, জম্বুদ্বীপ শব্দে ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোনও প্রদেশ অর্থই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক, পুরাণাদির বর্ণনায় লবণ-সমুদ্র-বেষ্টিত এই পৃথিবীকেই পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপ বলিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অন্যান্য দ্বীপ হয় তো এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; অথবা, কাল-প্রভাবে রূপান্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। পুরাণাদি শাস্ত্রের আলোচনায় এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। †

জম্বুদ্বীপান্তর্গত এই ভারতবর্ষ, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পরিচয়-প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে (দ্বিতীয় অংশ, তৃতীয় অধ্যায়) মহর্ষি পরাশর কহিতেছেন,—"যাহা সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ, তাহার নাম—ভারতবর্ষ। এখানে ভরতের বংশ বাস করেন। ইহার বিস্তার সহস্রযোজন। ইহা স্বর্গগামী ও মোক্ষগামী পুরুষদিগের কর্ম্মভূমি। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র (গরুড়পুরাণের মতে—পারিভাদ্র এবং ব্রহ্মপুরাণের মতে—পারিযাত্র) এই সপ্ত কুলাচল এখানে বিদ্যমান।...এই ভারতবর্ষ নয় ভাগে বিভক্ত; তাহার নাম,—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, ছাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বরুণ এবং এই সাগর-সংবৃত দ্বীপ।" ভারতবর্ষের এই ভাগ-সম্বন্ধে গরুড়-পুরাণে লিখিত আছে,—"ভারতবর্ষ নয় ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম,—'ইন্দ্র-দ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, কটাহ, সিংহল ও বরুণ; নবম ভাগের

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ।

* পৃথিবীর গোলত্ব-বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের অভিজ্ঞতার বিষয় এই সকল শ্লোকে প্রমাণিত হয়। "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ডের ৪৬২শ—৪৬৩শ পৃষ্ঠায়ও এতদালোচনা দ্রষ্টব্য। ভাষায় ব্রহ্মাণ্ড, ভূমণ্ডল প্রভৃতি শব্দের অস্তিত্ব-বিধায়ও পৃথিবীর গোলত্ব-তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে।

† জম্বু প্রভৃতি দ্বীপের প্রসঙ্গ প্রথম খণ্ডের ৩৩২শ-৩৩৩শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বিষ্ণু-পুরাণ, ২য় অংশ ২য় অধ্যায়; বরাহপুরাণ, ৭৬শ অধ্যায়; শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ১৬শ অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ, ১১৩শ অধ্যায়; গরুড়পুরাণ, পূর্ব্ব খণ্ড, ৫৪শ অধ্যায়; বায়ুপুরাণ, ৩৪শ অধ্যায়; শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ৩৩শ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ২য় অধ্যায়; ব্রহ্মপুরাণ, ১৮শ অধ্যায়; দেবী-ভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়; অগ্নিপুরাণ, ১১৯শ অধ্যায়; মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৫৪শ অধ্যায়; মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়; কূর্ম্মপুরাণ, ৪৫শ অধ্যায় এবং হরিবংশ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

নাম—সাগর দ্বীপ; ইহা প্রায়শঃ সাগর দ্বারা বেষ্টিত।" ব্রহ্মপুরাণেও ভারতবর্ষের এই ভাগের বিষয় ঐ একই ভাবে উক্ত আছে,—"এই ভারতবর্ষে নয়টী বিভিন্ন দ্বীপ বিদ্যমান। তাহাদের নাম—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব ও বরুণ। এতদ্ভিন্ন নবম দ্বীপ সাগর-সংবৃত। এই দ্বীপের পরিমাণ দক্ষিণ ও উত্তর দিক ক্রমে সহস্র যোজন।" মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে,—"ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগ আছে। ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রপর্ণি, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণ এবং এই সাগরাবৃত ভারত-দ্বীপ নবম। এই দ্বীপ দক্ষিণোত্তরে সহস্র-যোজন বিস্তীর্ণ এবং কুমারী অবধি গঙ্গা প্রবাহ পর্য্যন্ত আয়ত। এই দ্বীপের প্রান্তভাগে সর্ব্বত্র ম্লেচ্ছগণ অবস্থান করে। এই দ্বীপের পূর্ব্ব-পশ্চিমে যবন ও কিরাত-গণের বাস; মধ্যভাগ বিভাগক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—ইহারা বাস করিয়া যজ্ঞ-বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।" বায়ুপুরাণেও এই উক্তি একটু পরিবর্ত্তিত ভাবে দেখিতে পাই,—"এই ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগ বা দ্বীপ উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঐ সকল দ্বীপ সমুদ্র দ্বারা অন্তরিত; সুতরাং পরস্পর অগম্য। ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্র-বর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, গন্ধর্ব্ব, বারুণ এবং এই সাগর-সংবৃত দ্বীপ। এই দ্বীপ বা বর্ষ দক্ষিণোত্তরে সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহা কুমারিকা হইতে গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান হিমালয় পর্য্যন্ত আয়ত এবং নব সহস্র যোজন পর্য্যন্ত উত্তর দিকে তির্য্যগ্‌ভাবে বিস্তীর্ণ। ইহার অন্তঃসীমায় নিয়ত ম্লেচ্ছ জাতি উপনিবিষ্ট। এই বর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাতগণের এবং পশ্চিম প্রান্তে যবনগণের বাস। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি ইহার মধ্যে বিভাগ ক্রমে অবস্থিত।" ইত্যাদি। এইরূপ বিভাগ-বর্ণনায় বড়ই গোলে পড়িতে হয়। প্রাচীনকালে এক সময়ে ভারতবর্ষ এই যে নয় ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহাতে ভারতের কোন্ কোন্ অংশ বুঝাইত, তাহা এখন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষের মধ্যেই ভারত-দ্বীপ অবস্থিত,—এ আবার কি সমস্যা! এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করা বড়ই কঠিন। ইহাতে মনে হয়,—ভারতবর্ষ নামে যে ভারত-সাম্রাজ্য বুঝাইত, সে ভারত-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এই ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া এসিয়া মহাদেশের দূর-দূরান্তর প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভারতবর্ষ তখন ভারতদ্বীপ নামে অভিহিত হইত এবং ভারতবর্ষ বলিতে প্রাচীন মহাদেশের অন্যান্য নানা স্থান বুঝা যাইত। পুরাণ-সমূহে ভারতবর্ষের যে নয় ভাগের উল্লেখ হইয়াছে, এই যুক্তির অনুসরণ করিলে, সেই নয়টি ভাগের কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। কসেরুমান বলিতে খোরাসান প্রদেশকে বুঝায় না কি? হরিবংশে (ষোড়শ অধ্যায়ে) দেখিতে পাই,—কসেরুমান নামক যবন-রাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের হস্তে নিহত হন। তিনি করদ-রাজ ছিলেন; তাঁহারই নামানুসারে কসেরুমান প্রদেশের নামকরণ হইয়াছিল এবং সেই কসেরুমান শব্দের অপভ্রংশে কালক্রমে খোরাসান শব্দের উৎপত্তি হয়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, খোরাসান-রাজ্য—আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, আরব ও পারস্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরাণোক্ত কসেরুমানের বিস্তৃতি আরও অধিক পরিমাণ হওয়া অসম্ভব নহে। তাম্রবর্ণ

(তাম্রপর্ণ) বলিতে চীন-জাপানকে বুঝাইতে পারে। ঐ দুই দেশের অধিবাসীর বর্ণ অনেকটা তাম্রের ন্যায়। সুতরাং তাম্রবর্ণ জাতিদিগের বাসস্থান বলিয়া ঐ সকল দেশ তাম্রবর্ণ নামে অভিহিত হইত, এরূপ মনে করা যায়। গভস্তিমান শব্দে—গোবি-মরুভূমি-সমন্বিত রুশাদি রাজ্য বুঝাইতে পারে। গভস্তিমান অর্থে—সূর্য্য। সূর্য্য প্রখর কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া যে প্রদেশকে মরু-মধ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছেন, সেই প্রদেশের গভস্তিমান আখ্যা হওয়া অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ গোবি-মরুভূমির বিদ্যমানতা গভস্তিমান প্রদেশের অস্তিত্বের ক্ষীণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গবি বলিতে—মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, শ্যাম এবং রুশিয়ার কিয়দংশ বুঝাইয়া থাকে। আমরা মনে করি,—গভস্তিমান প্রদেশ পুরাকালে এসিয়া-মহাদেশের প্রোক্ত অংশকেই বুঝাইত। সিংহল—বর্ত্তমানে (সিলোন) বা লঙ্কা-দ্বীপ; বারুণ—তাৎকালিক বোর্ণিয়ো দ্বীপ। নাগদ্বীপ বা নাগ-রাজ্য—আসাম-প্রান্তে ব্রহ্মদেশ। গন্ধর্ব্ব—তিব্বতকে বুঝায়। ইন্দ্রদ্বীপ—মধ্য-এসিয়ার ইন্দ্ররালয় হউক, বা হিমালয়ের কোনও অংশ-বিশেষ হউক, তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে সুকঠিন। ফলতঃ, এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, ভারত-সাম্রাজ্যের (ভারতবর্ষের) সীমানা এক সময়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত—এমন কি, উত্তর দক্ষিণে মেরু-প্রদেশ পর্য্যন্ত, বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বোক্ত নয়টী বিভাগ সম্বন্ধে পরবর্ত্তিকালে বড়ই মতান্তর ঘটিয়াছে। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে ভারতবর্ষের নয় ভাগের এবং সেই নয় ভাগের কোথায় কোন্ দেশ আছে,—নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তদীয় 'বৃহৎ-সংহিতার' চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের সেই নয় ভাগের বিবরণ তিনি এইরূপভাবে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন;—"তিন তিনটী নক্ষত্রে এক একটী বর্গ হয়। এইরূপে নয়টী বর্গ। এই সকল বর্গের কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ। ভারতবর্ষের মধ্যদেশ হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্ব্বাদি দেশ সকল ইহা দ্বারা বিভাজিত হইয়াছে। (১) মধ্যদেশ,—ভদ্র, অরিমেধ, মাণ্ডব্য, সাল্ব, নীপ, উজ্জীহান, সঙ্খ্যাত, মরু, বৎস, ঘোষ, যামুন, সারস্বত, মৎস্য, মাধ্যমিক, মাথুর, উপজ্যোতিষ, ধর্ম্মারণ্য, শূরসেন, গৌরগ্রীব, উদ্দেহীক, পাণ্ডু, গুড়, অশ্বত্থ, পাঞ্চাল, সাকেত, কঙ্ক, কুরু, কালকোটী, কুকুর, পারিযাত্র-নগ, ঔদুম্বর, কাপিষ্ঠল, এবং হস্তিনাদেশ। ইহারা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অর্থাৎ কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরা নক্ষত্রে অবস্থিত। (২) পূর্ব্বদেশে,—অঞ্জন, বৃষভধ্বজ, পদ্ম, মাল্যবদ্গিরি, ব্যাঘ্রমুখ, সুহ্ম, কর্ব্বট, চান্দ্রপুর, শূর্পকর্ণ, খস, মগধ, শিবির, গিরি, মিথিলা, সমতট, উড্র, অশ্ববদন, দন্তুরক, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, লোহিত্য, ক্ষীরোদ সমুদ্র, পুরুষাদ, উদয়গিরি, ভদ্রগৌরক, পৌণ্ড্র, উৎকল, কাশী, মেকল, অম্বষ্ঠ, একপদ, তাম্রলিপ্তিক, কোশলক, এবং বর্দ্ধমান। এই সকল দেশ, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম নক্ষত্রে অর্থাৎ আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা নক্ষত্রে অবস্থিতি। (৩) অগ্নিকোণে,—কোশল, কলিঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, জঠর, অঙ্গ, শৌলিক, বিদর্ভ, বৎস্য, অন্ধ্র, চেদিক, ঊর্দ্ধকণ্ঠ, বৃষ, নালীকের, চর্ম্মদ্বীপ, বিন্ধ্যান্তবাসী, ত্রিপুরী, শ্মশ্রুধর, হেমকূটা, ব্যালগ্রীব, মহাগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা, কণ্টকস্থল, নিষাদ-রাষ্ট্র, পুরিক, দশার্ণ, নগ্নপর্ণ এবং শবর। এই সকল দেশে, নবম, দশম ও একাদশ নক্ষত্রে

বিভাগ বিষয়ে মতান্তর।

অর্থাৎ অশ্লেষা, মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থিত। (৪) দক্ষিণে,—লঙ্কা, কালাজিন, শৌরিকীর্ণ, তালিকট, গিরিনগর, মলয়, দর্দ্দুর, মহেন্দ্র, মালিন্দ্য, ভরুকচ্ছ, কঙ্কট, টঙ্কন, বনবাসী, শিবিক, ফণিকার, কোঙ্কণ, আভীর, আকর, বেণ, আবন্তক, দশপুর, গোনর্দ্দ, কেরলক, কর্ণাট, মবাটবী, চিত্রকূট, নাসিক্য, কোল্লগিরি, চোল, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, জটাধর, কাবেরী, ঋষ্যমূক, বৈদূর্য্য-শঙ্খ-মুক্তাকর দেশ, বারিচর, ধর্ম্মপট্টন দ্বীপ, গণরাজ্য, কৃষ্ণবেল্লুর, পিশিক, শূর্পাদি, কুসুমনগ, তুম্ববন, কার্ম্মনেয়ক, দক্ষিণ সমুদ্র, তাপসাশ্রম, ঋষিক, কাঞ্চী, মরুচীপট্টন, চের্য্য, আর্য্যক, সিংহল, ঋষভ, বলদেবপত্তন, দণ্ডকারণ্য, তিমিঙ্গিলাসন, ভদ্র, কচ্ছ, কুঞ্জরো-দরী ও তাম্রপর্ণি। এই সকল দেশ দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ নক্ষত্রে অর্থাৎ উত্তর-ফল্গুনী, হস্তা ও চিত্রা নক্ষত্রে অবস্থিত। (৫) নৈর্ঋত দেশ,—পহ্লব, কম্বোজ, সিন্ধু, সৌবীর, বড়বামুখ, অরব, অম্বষ্ঠ, কপিল, নারীমুখ, আনর্ত্ত, ফেণগিরি, যবন, মাকর, কর্ণপ্রাবেয়, পারশব, শূদ্র, বর্ব্বর, কিরাতখণ্ড, ক্রব্যাশ্য, আভীর, চঞ্চুক, হেমগিরি, সিন্ধু, কালক, রৈবতক, সুরাষ্ট্র, বাদর, দ্রাবিড় এবং মহাসমুদ্র। ইহারা পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ নক্ষত্রে অর্থাৎ স্বাতি, বিশাখা ও অনুরাধা নক্ষত্রে অবস্থিত। (৬) পশ্চিম-দেশ,—মণিমান, মেঘবান, বণৌঘ, ক্ষুরার্পণ, অস্তগিরি, অপরান্তক, শান্তিক, হৈহয়, প্রশস্তাদ্রি, বোক্কাণ, পঞ্চনদ, রমঠ, পারদ, তারক্ষিতি, জৃঙ্গ, বৈশ্য, কনক, শক এবং পশ্চিম-দিকস্থিত নির্ম্মর্য্যাদি ম্লেচ্ছদেশ। এই সকল দেশ অষ্টাবিংশতি, ঊনবিংশতি ও বিংশতি নক্ষত্রে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা, মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে অবস্থিত। (৭) পশ্চিমোত্তর দেশ,—মাণ্ডব্য, তুষার, তাল, হল, মদ্র, অশ্মক, কুলুত, লহড়, স্ত্রীরাজ্য, নৃসিংহবন, খস্থ, বেণুমতী, ফল্গুলুকা, গুরুহা, মরুকুৎস, চর্ম্মরঙ্গ, একবিলোচন, শুলিক, দীর্ঘগ্রীব, আস্যকেশ। এই সকল দেশ একবিংশ, দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ নক্ষত্রে অর্থাৎ উত্তরাষাঢ়া (অভিজিৎ) শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে অবস্থিত। (৮) উত্তর দেশ,—কৈলাস, হিমবান, বসুমান, ধনুষ্মান্, ক্রৌঞ্চ, মেরু, উত্তর কুরু, ক্ষুদ্রমীন, কৈকয়, বসাতি, যামুন, ভোগপ্রস্থ, আর্জ্জুনায়ন, অগ্নীধ্র, আদর্শ, অন্তর্দ্বীপী, ত্রিগর্ত্ত, তুরগানন, অশ্বমুখ, কেশধর, চিপিটনাসিক, দাসেরক, বাটধান, শরধান, তক্ষশীল, পুষ্কলাবৎ, কৈলাবত, কণ্ঠধান, অম্বর, মদ্রক, মালব, পৌরব, কচ্ছার, দণ্ড, পিঙ্গলক, মাণ, হল, হূন, কোহল, শীতক, মাণ্ডব্য, ভূতপুর, গান্ধার, যশোবতী, হেমতাল, রাজন্য, খচর, গব্য, যৌধেয়, দাশমেয়, শ্যামাক ও ক্ষেমধূর্ত্ত। এই সকল দেশ চতুর্ব্বিংশ, পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ নক্ষত্রে অর্থাৎ শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। (৯) ঈশান-কোণস্থিত দেশ,—মেরুক, নষ্টরাজ্য, পশুপাল, কীর, কাশ্মীর, অভিসার, দরদ, তঙ্গণ, কুলুত, সৈরিন্ধ্র, বনরাষ্ট্র, [illegible]পুর, দার্ব্বডামর, বনরাজ্য, কিরাত, চীন, কৌণিন্দ, ভল্লাপ, লোল, জটা, শূর, কুনঠ, খশ, ঘোষ, কুচিক, [illegible], অম্বুবিশ, সুবর্ণভূ, বসুবন, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], মুঞ্জাদ্রি এবং [illegible]। এই সকল দেশ সপ্তবিংশ, [illegible] ও দ্বিতীয় নক্ষত্রে অর্থাৎ রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী [illegible] অবস্থিত।" [illegible]

[illegible]

কালিঙ্গ, আবন্ত্য, আনর্ত্ত, সিন্ধুসৌবীর, হারহৌর, মদ্র এবং কৌণিন্দ দেশীয় রাজা সকল নষ্ট হইয়া থাকে।” * বরাহমিহিরাচার্য্য বৃহৎসংহিতায় যে সকল জনপদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পুরাণাদি শাস্ত্রের বর্ণিত-কালের তুলনায় তাঁহার বিদ্যমানতা সে-দিনের ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের একজন সভাসদ ছিলেন। † তিনি নবরত্নের অন্যতম। কাহারও কাহারও মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। কেহ কেহ আবার বলেন,—‘বৃহৎসংহিতা-প্রণেতা এবং বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ বরাহমিহির স্বতন্ত্র ব্যক্তি।’ কিন্তু সে মীমাংসার স্থান ইহা নহে। এখানে কেবল এই মাত্র বুঝা যাইতেছে যে, বৃহৎ-সংহিতায় ভারতবর্ষকে নয় ভাগে ও ভিন্ন ভিন্ন জনপদে বিভক্ত করা হইয়াছিল। সে বিভাগের সহিত পুরাণ বর্ণিত নববিধ বিভাগের কোনই সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়,—বৃহৎসংহিতার এই নববিভাগকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিয়া, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের আকৃতির ও পৌরাণিক নব-বিভাগের এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য (?) বিধান করিয়া গিয়াছেন। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, ভারতের প্রাচীন ভৌগোলিক-তত্ত্ব আবিষ্কারে, অশেষ আয়াস-স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা ও সত্য-তথ্য-নির্ণয়ের চেষ্টা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। দুই এক স্থলে তাঁহার অনুসন্ধানে ভ্রম-প্রমাদ থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা বহুদিন বিদ্যমান থাকিবে। যাহা হউক, ভারতবর্ষের এই নববিভাগ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—পুরাণে এবং মহাভারতে ভারতবর্ষের যেরূপ নয়টী বিভাগের কথা আছে, জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্যের ‡ বর্ণনার সহিত তাহার অনৈক্য নাই। কিন্তু বরাহমিহিরের বর্ণনার সহিত তাহার ঐক্য দেখিতে পাই না। বরাহমিহিরের বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায়,—মধ্যদেশে পাঞ্চাল প্রধান-স্থান অধিকার করিয়া ছিল; পূর্ব্বে মগধ, পূর্ব্ব-দক্ষিণে কলিঙ্গ, দক্ষিণে আবন্ত্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে আনর্ত্ত, পশ্চিমে সিন্ধু-সৌবীর, উত্তর-পশ্চিমে হারহৌর, উত্তরে মদ্র এবং উত্তর-পূর্ব্বে কৌণিন্দ।’ বরাহমিহিরের বর্ণনায় সিন্ধুসৌবীর দেশ নৈর্ঋতে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণেও আনর্ত্ত ও সিন্ধু-সৌবীর দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত জনপদ বলিয়া উল্লিখিত। কিন্তু কানিংহাম বলেন,—ঐ মত ভ্রমসঙ্কুল। তাঁহার মতে সিন্ধু-সৌবীর পশ্চিমে এবং আনর্ত্ত দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। যাহা হউক, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কানিংহাম বরাহ-মিহিরের সমসাময়িক ভারতবর্ষের একখানি কল্পিত মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে ভারতবর্ষকে পদ্মের আকারে কল্পনা করিয়া, পাঞ্চালকে কর্ণিকা-রূপে বিন্যস্ত রাখিয়া,

* মার্কণ্ডেয়পুরাণের অষ্ট-পঞ্চাশত অধ্যায়ে যে দেশ যে নক্ষত্রে অবস্থিত তাহা লিখিত আছে।

† বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের নাম,—
“ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥”

‡ সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্য অনুমান ১০৩৬ শকে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ‘পৃথিবীর ইতিহাস’ প্রথম খণ্ডের ৪৬৩শ ও ৪৭শ পৃষ্ঠায় তাঁহার বিষয় কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার ‘গোলাধ্যায়’ নামক গ্রন্থে পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

মগধাদি অপরাপর দেশকে পদ্মের পাপড়ির ন্যায় পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার মতে,—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান প্রভৃতি বিভাগ—কালে ঐরূপ নয় ভাগে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু কি কারণে তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কি কারণেই বা তিনি ভারতবর্ষকে পদ্মের ন্যায় মনন করিয়া লইয়া পঞ্চালাদি দেশের অবস্থান-স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। কানিংহাম বলিয়াছেন,—"আমি বৃহৎ-সংহিতার সহিত ব্রহ্মাণ্ড, মার্কণ্ডেয়, বিষ্ণু, বায়ু এবং মৎস্যপুরাণ মিলাইয়া দেখিয়াছি। একের বর্ণিত জনপদাদির নামের সহিত অন্যের বর্ণিত নামের প্রায়ই মিল আছে। স্থানে স্থানে পুনরুক্তি এবং পাঠান্তর মাত্র দৃষ্ট হয়। সকল পুরাণেই নব-বিভাগের বিষয় লিখিত আছে। ব্রহ্মাণ্ড ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ সেই নয় বিভাগের অন্তর্গত জনপদাদির নাম-সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্যপুরাণ, মহাভারতের ন্যায় পাঁচটী বিভাগের পরিচয় দিয়াছেন। বায়ুপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের তালিকা আলোচনা করিলে, ইন্দ্রদ্বীপ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকে, বারুণ পশ্চিমে, কুমারিকা মধ্যস্থলে এবং কসেরু উত্তর দিকে অবস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।" * কানিংহামের শেষোক্ত সিদ্ধান্তের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বায়ুপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতিতে মধ্যদেশাদি ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগের জনপদাদির উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান প্রভৃতির সহিত তৎসমুদায়ের সামঞ্জস্য-বিধানের কোনই উপায় পাই না। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ও মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ভারতবর্ষের ইন্দ্রদ্বীপাদি নয়টী বিভাগের কথা বলিয়া তাহার কিছু পরে পুরাণকার মধ্যদেশাদি ভাগের বিভিন্ন জনপদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেই যদি ইন্দ্রদ্বীপাদির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে মধ্যদেশ শব্দে ইন্দ্রদ্বীপ অর্থ ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু সে ভাব কোনক্রমেই মনে আসিতে পারে না। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের একোনপঞ্চাশৎ অধ্যায় এবং মৎস্যপুরাণের সপ্ত-পঞ্চাশৎ অধ্যায় বিদ্বন্মণ্ডলীকে মিলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করিতে পারি। ভারতবর্ষকে পদ্মের কর্ণিকা মনে করিয়া, বৃহৎ-সংহিতার মতের অনুসরণে কানিংহাম যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই মানচিত্রই বা কি প্রকারে যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহাও বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, ইন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নববিধ বিভাগ, প্রমাণাভাবে, কাজেই এখন কল্পনার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কানিংহাম সাহেব বোধ হয় জম্বুদ্বীপ শব্দে ভারতবর্ষ অর্থ গ্রহণ করিয়াই জম্বুদ্বীপের আকৃতির সহিত ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগের সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া, ঐরূপ মানচিত্র কল্পনা করিয়া থাকিবেন।

পূর্ব্বে যেমন ভারতবর্ষ নয় ভাগে বিভক্ত ছিল পরিচয় পাইয়াছি, সেইরূপ আবার ভারতবর্ষ এক সময়ে সপ্ত ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়াও পরিচয় পাই। বায়ুপুরাণেরই ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"নাভির বংশে শতজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। শতজিতের শত পুত্র; তাঁহারা সকলেই রাজা ছিলেন। তাঁহারা এই ভারতবর্ষকে সপ্ত-খণ্ডে বিভক্ত করেন।" সেই সপ্তখণ্ডের পরিচয় এমন কি তাহাদের নাম পর্য্যন্ত এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। পরিচয় অপর আর কিছুই

ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ।

* Alexander Cunningham, *The Ancient Geogrphy of India*, Vol. I.

পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষ যে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও বিভাগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহাতে তাহাই বুঝা যায়। মনুসংহিতায় ভারতবর্ষের যে সকল বিভাগের বিষয় লিখিত আছে, তৎসমুদায়ও এখন নামান্তরে পরিবর্ত্তিত। মনু বলিয়াছেন,—সরস্বতী ও দৃষদ্বতী, এই দুই দেব-নদীর মধ্যে যে প্রদেশ আছে, পণ্ডিতেরা সেই দেব-নির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহেন। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন এই কয়টী দেশকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, এই উভয় পর্ব্বতের মধ্য-স্থলে বিনশন দেশের পূর্ব্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ তাহাকে মধ্যদেশ কহে। পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমুদ্রদ্বয়, উত্তর দক্ষিণে হিমগিরি ও বিন্ধ্যগিরি,—ইহার মধ্যস্থিত স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন। যথায় কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, সেই দেশকে যজ্ঞীয় দেশ বলে। তদ্ভিন্ন স্থানকে ম্লেচ্ছদেশ বলা যায়।" কালক্রমে ঐ সকল স্থানের পরিচয়-চিহ্ন এখন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন আর মৎস্য' পাঞ্চাল বা শূরসেন নামধেয় কোনও বিভাগ ভারতবর্ষের বা আর্য্যাবর্ত্তের নাই। কালপ্রভাবে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে ভারতবর্ষের পাঁচ ভাগের বিষয়ই সাধারণ্যে প্রচারিত ছিল। চীন-দেশীয় পরিব্রাজকগণ এদেশে আগমন করিয়া সেইরূপ পরিচয়ই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চীন-দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ-পত্রেও সেই কথাই লিখিত আছে। বিষ্ণু-পুরাণের একটী বর্ণনা হইতেও সেই আভাষ পাওয়া যায়। কয়েকটী নদীর যাহারা জল-পান করে, তাহাদের কয়েকটী জাতির নামোল্লেখ ব্যপদেশে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,—

"আসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশঃ। তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালা মধ্যদেশাদয়োজনাঃ॥
পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ। পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ব্বশঃ॥
তথাপরান্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূরাভীরাস্তথার্ব্বুদাঃ। কারূষা মালবাশ্চৈব পারিপাত্রনিবাসিনঃ॥
সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ। মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা।" *

অর্থাৎ,—'মধ্যদেশে কুরু ও পাঞ্চাল, পূর্ব্বে কামরূপ, দক্ষিণে পুণ্ড্র, কলিঙ্গ ও মগধ, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র, শূর, আভীর, অর্ব্বুদ, পারিপাত্র-নিবাসী কারূষ ও মালব এবং সৌবীর, সৈন্ধব, (উত্তর-দেশে) হূণ ও শাল্ব, মদ্র, আরাম, শাকলবাসী, অম্বষ্ঠ ও পারসীক প্রভৃতি জাতি ঐ সকল নদীর তীরে বসতি করিয়া উহার জল পান করে।' উদ্ধৃত অংশে উত্তর-দেশ শব্দ মূলে লিখিত নাই। ভাবে বোধ হয়, লিপিকার-প্রমাদে উহা বাদ পড়িয়াছে। নচেৎ, সকল দিকের জনপদ সমূহ নির্দ্দেশ করা হইল; আর উত্তর দিকের জনপদ নির্দ্দিষ্ট

* কোনও কোনও পণ্ডিত বিষ্ণুপুরাণোদ্ধৃত অংশের এইরূপ-ভাবে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন,—"কুরুপাঞ্চাল-বাসিগণ, মধ্যদেশাদি স্থানবাসিগণ, পূর্ব্বদেশবাসিগণ, কামরূপ-বাসিগণ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসিগণ এবং অপরান্ত সৌরাষ্ট্র শূর, ভীর, অর্ব্বুদ, কারূষ, মালব ও সমস্ত পারিপাত্র-নিবাসিগণ; সৌবীর, সৈন্ধব, হূণ, শাল্ব ও শালকবাসিগণ; মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ, পারসীকাদি,—এই সমস্ত লোক সেই সকল নদীর তীরে বাস করেন এবং তাহাদের জল পান করেন।" এই অনুবাদে অনেক সংশয়ের বিষয় আছে। মধ্যদেশবাসীই বা কাহারা, আর কুরুপাঞ্চালবাসীই বা কাহারা,—নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আবার পূর্ব্বদেশবাসী এবং কামরূপবাসী বলিবারই বা তাৎপর্য্য কি? সুতরাং এ সম্বন্ধে উপরে যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তাহাই সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি।

হইল না,—ইহারই বা কারণ কি? ফলতঃ বিষ্ণুপুরাণে ভারতবর্ষের নয় ভাগের বিষয় লিখিত থাকিলেও, এ হিসাবে পাঁচ ভাগের প্রাধান্য অনুভূত হয়। * যাহা হউক, ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল, এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। তবে এখন একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—একই বেদব্যাসের প্রবর্ত্তিত পুরাণে কেন এরূপ পরিচয়-বিভিন্নতা ঘটিয়াছে? সে কথার আভাষ পূর্ব্বেই এরূপ দেওয়া হইয়াছে। † এক এক মন্বন্তরে এক পুরাণের প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতবর্ষ যেরূপ-ভাবে বিভক্ত ছিল, সেই পুরাণে তাহারই বিষয় উল্লেখ থাকা সম্ভবপর। অধিকন্তু, পুরাণে যিনি যে সময়ের যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, সেই সেই সময়ের বিষয়ই তিনি বর্ণন করিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। তাই পরাশরের উক্তিতে যে বিভাগ-সমূহের পরিচয় পাই, শুকদেবের উক্তিতে তাহাতে একটু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। রাম-রাজত্বের বর্ণনায় যে সকল দেশ-জনপদের উল্লেখ আছে, যুধিষ্ঠিরাদির রাজ্য-কাল বর্ণনায় তৎসম্বন্ধে নামান্তর ঘটিয়াছে বা তাহা অন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, যতই যাহা পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন হউক, আর্য্যাবর্ত্ত-সমন্বিত প্রকৃত ভারত বলিতে যাহা বুঝাইত, তাহার সীমানা চিরকালই প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। সে কথা শাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃই বলিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় প্রকাশ,—"সমুদ্রের উত্তরে হিমাচলের দক্ষিণে যে বর্ষ বিদ্যমান, তাহার নাম ভারতবর্ষ।" যথা,—

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্। বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি॥"

—বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয়াংশ, ৩য় অধ্যায়, ১ম শ্লোক।

ব্রহ্মপুরাণে প্রকাশ,—

"উত্তরেণ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণে। বর্ষং তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি॥"

ব্রহ্মপুরাণ, ১৯শ অধ্যায়, ১ম শ্লোক।

ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ ভারতবর্ষের এইরূপ সীমানার বিষয় উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমের সীমানার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—'ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে কিরাতগণ এবং পশ্চিমে যবনেরা বাস করে।' ইহাতে পশ্চিমাংশে গ্রীস প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইউরোপীয় জাতি এবং চীন-শ্যাম-ব্রহ্মাদি দেশের প্রান্তস্থিত জাতিকে বুঝাইতে পারে। গরুড়পুরাণে ভারতবর্ষের এক সময়ের চতুঃসীমার পরিচয় দেওয়া আছে। তাহাতে পূর্ব্বভাগে কিরাত, পশ্চিমে যবন, দক্ষিণে অন্ধ্র, এবং উত্তরে তুরস্ক জাতি বাস করিত,—জানিতে পারি। সময় সময় ভারতবর্ষের সীমানা কিরূপ-ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এই সকল আলোচনায় তাহাই বুঝা যায়।

ভারতবর্ষের নদ-নদী-পর্ব্বত।

ভারতবর্ষে যে সকল নদ-নদী, পর্ব্বত ও জনপদাদি বিদ্যমান ছিল, পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের ভীষ্ম-পর্ব্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ভারতের জনপদাদির বিবরণ বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"এই ভারতবর্ষে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষবান, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র,—এই সপ্ত কুল-পর্ব্বত আছে। এই সমস্ত পর্ব্বতের সমীপে অপরিজ্ঞাত সহস্র সহস্র বিপুল সারবান বিচিত্র সানুমান পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে।

* বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয়াংশ, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, পুরাণ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

তদ্ব্যতীতও নীচ-লোকাশ্রিত অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র পর্ব্বত পরিজ্ঞাত আছে।" সপ্ত-কুলাচল ভিন্ন অন্যান্য পর্ব্বতগুলিরও অনেকের নামোল্লেখ পুরাণে দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ও বায়ু-পুরাণে কয়েকটী পর্ব্বতের নাম এইরূপ ভাবে লিখিত আছে। যথা,—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—মন্দর, বৈভার, দর্দ্দুর, কোলাহল, সুরস, মৈনাক, বৈদ্যুত, বাতন্ধম্, পাণ্ডুর, গণ্ডপ্রস্থ, কৃষ্ণগিরি, গোধন, পুষ্পগিরি, উজ্জয়ন্ত, রৈবতক, শ্রীপর্ব্বত, কারু ও কূটশৈল। এ বিষয়ে উভয় পুরাণে অনৈক্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বায়ুপুরাণে বৈভার স্থলে বৈহার এবং বাতন্ধম স্থলে পাতন্ধম নাম দৃষ্ট হয়। নচেৎ, উভয় পুরাণে এ বিষয় আর কোনই অনৈক্য নাই। কোনও কোনও পুরাণে কৈলাস, তুঙ্গপ্রস্থ, ঋষ্যমুখ, শারদ্দুর, চিত্রকূট, চকোরকূট, কৃতস্মর, কৃতস্থল, কোর, বাতমন্, জয়ন্তী, বারন্ধন, বৈভ্রাজ প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। ইহার কয়েকটী নূতন, কয়েকটী পাঠান্তরে রূপান্তর প্রাপ্ত। রামায়ণে ঋষভ, কুঞ্জর, মানস, সুবেল, ক্রৌঞ্চ, মাল, ওষধি, পদ্মাচল, ধূম্রাচল, গন্ধমাদন, কলিন্দগিরি, চন্দন, সুদর্শন, উশীরবীজ প্রভৃতি আরও কতকগুলি নূতন পর্ব্বতের নাম দৃষ্ট হয়। সেই সকল পর্ব্বতের অবস্থান-স্থান সম্বন্ধেও রামায়ণে কিছু-না-কিছু আভাস দেওয়া আছে। পর্ব্বতের পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করিয়া সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ভারতের নদ-নদীসমূহের নাম উল্লেখ করেন। সঞ্জয় বলিতেছেন,— "আর্য্য, ম্লেচ্ছ ও মিশ্র জাতি সকলে এই সকল নদীর জল ব্যবহার করিয়া থাকে। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, বাহুদা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, বিপাপা, স্থূলবালুকা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণ্না, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়ষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতি, বেদশিরা, ত্রিদিবা, ইক্ষুলা, ক্রিমি, করীষিণী, চিত্রবহা, চিত্রসেনা, গোমতী, ধূতপাপা, চন্দনা, কৌষিকী, কৃত্যা, নীচিতা, লোহতারণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতি, বেত্রবতী, হস্তিসমা দিশ, শরাবতী, বেণ্বা, ভীমরথি, কাবেরী, চুলুকা, বাপী, শতবলী, নিবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, রাজিনী, পুরমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী, পলাশিনী, পাপহরা, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, অসিক্লী, কুশবীরা, মরুত্বী, প্রবরা, হেমা, মেনা, ঘৃতবতী, পুনাবতী, অনুষ্ণা, সেব্যা, কাপী, সদানীরা, অধৃষ্যা, কুশধারা, সদাকান্তা, শিবা, বীরবতী, বস্ত্র, সুবর্ণা, গৌরী, কিম্পুনা, সহিরণ্বতী, বরা, বীরবরা, পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুবরা, অম্বুবাহিনী, বৈনন্দী, পিঞ্জলা, তুঙ্গবেণ্বা, বিদিশা, তাম্রা, কপিলা, শলু, সুবামা, দেবাশ্বা, হরিস্রাবা, মহাপগা, শীঘ্রা, পিচ্ছিলা, ভারদ্বাজী, শোণা, চন্দ্রমা, দুর্গামন্ত্রশীলা, ব্রহ্মমেধ্যা, বৃহদ্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনদী, সুরসা, দাসী, সামান্যা, বরণা, অসি, নীলা, ধৃতিকরী, পর্ণাসা, মানবী, বৃষভা, বসা, ভাসা। এই সকল ও অন্যান্য অনেক মহানদী আছে—সদানিরাময়া, কৃষ্ণা, মন্দবাহিনী, ব্রহ্মাণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোৎপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কোষা, মুক্তিমতী, অনঙ্গা, বৃষসাহ্বয়া, লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকাহ্বয়া, কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা, মন্দাকিনী, সুপুণ্যা ও সর্ব্বগঙ্গা। এই প্রকার অন্যান্য সহস্র সহস্র শত শত নদী জনগণের নিকট অপ্রকাশিত আছে। যেমন স্মরণ হইল, তদনুসারে এই সকল নদী কীর্ত্তন করিলাম।" ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় যে সকল নদ-নদীর নাম উল্লেখ করেন,

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডে ঋষিগণের নিকট সূত প্রায় সেই সকল নামই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সঞ্জয়োক্ত ও সূতোক্ত নদী-সমূহের নামগুলি মিলাইতে হইলে, স্থানে স্থানে বড়ই গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। পর পর নদীগুলির নাম উভয় পুরাণেই উল্লিখিত হইয়াছে, বুঝিতে পারি বটে; কিন্তু স্থানে স্থানে বড়ই পাঠান্তর ও রূপান্তর ঘটিয়াছে। মহাভারতোক্ত দুই চারিটী নদীর নাম পদ্মপুরাণে নাই। আবার মহাভারত অপেক্ষা পদ্মপুরাণে দুই চারিটী নদী বেশী আছে। রূপান্তর কিরূপ ঘটিয়াছে, সামান্য আলোচনাতেই তাহা প্রতীত হইবে। মহাভারতে,—স্থূলবালুকা, পদ্মপুরাণে আছে—স্বচ্ছবালুকা; মহাভারতে ইক্ষুলা, পদ্মপুরাণে সিন্ধুলা; মহাভারতে চিত্রসেনা, পদ্মপুরাণে ত্রিসেনা; মহাভারতে কৃত্যা, পদ্মপুরাণে হৃদ্যা; ইত্যাদি। এইরূপ মহাভারতে,—নিচিতা, চুলুকা, শতবলী, কুণ্ডলা, রাজিনী, ওঘবতী, কুশচিরা, মরুহী, পুণ্যবতী, অনুষ্ণা, সদানীরা, কুশধারা, সদাকান্তা; পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ডে,—নাচিতা, বালুকা, শতমলী, কুণ্ডলা, রাজিনী, মালাবতী, করীষিণী, কুশবীরা, মরুত্বা, অণুষ্ণী, সদাবীরা, কুশবীরা, রথচিত্রা; প্রভৃতি। এই সকল নামে পাঠান্তরে রূপান্তর ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কতকগুলি নামে মহাভারতের সহিত পদ্মপুরাণের একেবারেই মিল নাই। সুনাশা, তাপসা, ধেনু, সকামা, বেদস্বা, কোকা প্রভৃতি নাম মহাভারতে দৃষ্ট হয় না। মহাভারত (ভীষ্মপর্ব্ব, নবম অধ্যায়) এবং পদ্মপুরাণ (স্বর্গখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়) মিলাইয়া দেখিলেই এ বিষয় বুঝা যাইবে। পাঠান্তরে নামের কিরূপ রূপান্তর ঘটিয়াছে, ভীষ্মপর্ব্বের নবম অধ্যায়ের 'দুর্গামন্ত্রশীলা' এবং পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের 'দুর্গমা অন্তঃশীলা' শব্দদ্বয় মিলাইয়া দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। এতদ্ভিন্ন রামায়ণে আমরা কতকগুলি নূতন নদীর নাম দেখিতে পাই,—পম্পা, মাল্যবতী, মাগধী, মহী, কালমহী, শৈলোদা, সন্দিকা, শরদণ্ডা, ইক্ষুমতী, আকুর্ব্বতী, কেশিনী, কোপিবতী, স্থাণুমতী, বালুকিনী, বরুবী, পর্ণশার, হৈমবতী, বেণা প্রভৃতি। * কেবল নামোল্লেখ নহে; পুরাণে নদ-নদী-সমূহের উৎপত্তি ও অবস্থানাদির বিবরণও বর্ণিত আছে। সে সম্বন্ধে স্থানে স্থানে মতান্তর ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু সকল পুরাণেই তত্ত্বদ্বিষয় কিছু-না-কিছু আলোচনা হইয়াছে দেখিতে পাই। বায়ুপুরাণের মতে,—'গঙ্গা, সিন্ধু, শতদ্রু, বিপাশা, সরস্বতী, বিতস্তা, সরযু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, ইরাবতী, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুকা, দৃষদ্বতী, কোষিকী, নিস্বিরা, গণ্ডকী, চক্ষুষ্মতী ও লোহিতা—হিমালয়-পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। দেবস্মৃতি, বেদতী, সিন্ধুপর্ণা, চন্দ্রনাভা, নাশদাচরা, রোহিপারা, চর্ম্মণ্বতী, বিদিশা, বেদত্রয়ী ও বপন্তী—পারিপাত্র-পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত। শোণী, যতিরথা, নর্ম্মদা, সুরমা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূট, তমসা, পিপ্পলা, করতোয়া, পিশাচিকা,

নদনদীসমূহের উৎপত্তি-স্থান।

* ভারতবর্ষের পর্ব্বত, নদী ও জনপদাদির বিবরণ,—বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয়াংশ, ৩য় অধ্যায়; ব্রহ্মপুরাণ, ১৯শ অধ্যায়; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৪৯শ অধ্যায়; বায়ুপুরাণ, ৪৫শ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৩য় অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ, ১১৪শ অধ্যায়; বরাহপুরাণ, ৭৫শ—৮৫ অধ্যায়; গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ৫৫শ অধ্যায়; মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৫৭শ অধ্যায়; মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, চতুর্থ অধ্যায়; শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ৩৪শ অধ্যায়; প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

চিত্রোৎপলা, বিশালা, চঞ্চুকা, বালুবাহিনী, শুক্তিমতী, বীরজা, পঙ্কিনী ও রাত্রি—ঋক্ষবান-পর্ব্বত হইতে নির্গত। মুনিজালা, শুভাতাপী, পয়ষ্ণী, শীঘ্রদা, বেন্নপাশা, বৈতরণী, বেদিপালা, কুমুদ্বতী, তোয়া, দুর্গা, অন্তা ও গিরা,—ইহারা বিন্ধ্যাচল হইতে নির্গত। গোদাবরী, ভীমরথী, মরণী, কৃষ্ণা, বেণা, বঞ্জুলা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা ও বাহ্য-কাবেরী,—ইহারা সহ্য-পর্ব্বত হইতে বিনিঃসৃত। শতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পাবতী ও উৎপলাবতী,—ইহারা মলয় পর্ব্বত হইতে বিনির্গত। ত্রিযামা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুলা, ত্রিবিন্দবালা, মুলিনী ও বংগবালা,—ইহারা মহেন্দ্র-পর্ব্বতের তনয়া। ঋষিকা, নৃমতী, মন্দগামিনী, পলাশিনী,—ইহারা শুক্তিমান পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা।” বায়ুপুরাণোক্ত এই সকল নদীর বিবরণে মৎস্যপুরাণে একটু রূপান্তর ঘটিয়াছে। মৎস্যপুরাণে এই সকল নদীর বিবরণ এইরূপভাবে লিখিত হইয়াছে,—“গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, সরযূ, ঐরাবতী, বিতস্তা, বিশালা, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধৌতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌষিকী, তৃতীয়া, নিশ্চলা, গণ্ডকী, ইক্ষু ও লোহিত—এই সকল নদী হিমবানের পার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়াছে। দেবস্মৃতি, বেত্রবতী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, পর্ণাশা, নর্ম্মদা, কারেবী, মহতী, পারা, ধন্বতী, রূপা, বিদূষা, বেণুমতী, শিপ্রা, অবন্তী, কুন্তী—ইহারা পারিযাত্র গিরি আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত। মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, তমসা, পিপ্পলী, শ্যেনী, চিত্রোৎপলা, বিমলা, চঞ্চুলা, ধূতবাহিনী, শুক্তিমতী, শুনি, লজ্জা, মুকুটা, হ্রদিকা—এই সকল অমল-জলশালিনী সরিৎ ঋষ্যবন্ত পর্ব্বত হইতে প্রসূত। তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, ক্ষিপ্রা, ঋষভা, বেণা, বৈতরণী, বিশ্বমালা, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহাগৌরী, দুর্গমা, শীলা—এই সকল শীতল-জলা শুভদায়িনী নদী বিন্ধ্যগিরির পাদদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণী, মঞ্জুলা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা, বাহ্যা ও কাবেরী—এই সকল দক্ষিণাপথ-প্রবাহিণী নদী সহ্যগিরির পাদভাগ হইতে প্রবাহিত। কেতুমালা, তাম্রপর্ণী, মূলী, সগরা ও বিমলা-মহেন্দ্র-পর্ব্বত-জাত এই সকল নদী বিখ্যাত ও শুভফলপ্রদ। কাশিকা, সুকুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা ও পাশিনী—ইহারা শুক্তিমান হইতে উদ্ভূত।” বিষ্ণুপুরাণে এ বিষয়ে আর এক মত দৃষ্ট হয়। ঐ দুই পুরাণে লিখিত আছে,—“শতদ্রু, চন্দ্রভাগাদি হিমালয়ের পাদদেশ হইতে; বেদস্মৃতি প্রভৃতি নদী-নিচয় পারিযাত্র (পারিপাত্র) পর্ব্বত হইতে; নর্ম্মদা ও সুরসাদি (সুরমা) বিন্ধ্যাচল হইতে; তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা ও কাবেরী প্রভৃতি ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে; গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণী (কৃষ্ণবেণ্বা) প্রভৃতি সহ্যাদ্রি হইতে; কৃতমালা, তাম্রপর্ণী প্রভৃতি মলয়াদি হইতে; ত্রিসান্ধ্য ও ঋষিকুল্যাদি মহেন্দ্রাচল হইতে; এবং ঋষিকুল্যা ও কুমারাদি শুক্তিমান পর্ব্বত হইতে বিনির্গত হইয়াছে। কোন্ কোন্ নদী কোন্ কোন্ দেশ দিয়া প্রবাহিত, অথবা কোন্ কোন্ দেশের কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের লোক কোন্ কোন্ নদীর জল ব্যবহার করে, পুরাণে তাহারও পরিচয় পাই। মৎস্যপুরাণে দেখিতে পাই,—“গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর, উরগ, কলাপগ্রামক, কিম্পুরুষ, নর, কিরাত, পুলিন্দ, কুরু, ভারত, পাঞ্চাল, কৈষিক, মগধ, ব্রহ্মোত্তর, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত—এই সকল আর্য্যজন-পদ পবিত্র করিয়া, গঙ্গা দক্ষিণ-সাগরে গিয়া

সম্মিলিত হইয়াছেন। সিন্ধু নাম্নী স্রোতোধারা দরদ, পূর্জ্জ, গুড়, গান্ধার, ঔরস, কুহু, শিবপুর, ইন্দ্রমরু, বসতি, সৈন্ধব, উর্ব্বস, বর্ব্ব, কুলথা, ভীম, রোমক, সুনামুক ও উদ্ধমরু— এই সকল দেশ প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।” ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতেও গঙ্গা ঐ সকল দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন। অধিকন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে গঙ্গার গতিপথে কৈমিক, পারদ, সীগণ, খশ এবং কিন্নর এই কয়েকটী অতিরিক্ত জনপদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে দেখিতে পাই,—“নলিনী, হ্লাদিনী ও পাবনী নাম্নী তিনটী স্রোতধারা প্রাচ্যগামিনী এবং সীতা, চক্ষু ও সিন্ধু নাম্নী তিনটী স্রোতধারা প্রতীচ্যগামিনী। গঙ্গার স্রোতোরাশি সপ্তধারায় বিভক্ত। গঙ্গার যে সপ্তমী স্রোতধারা, তাহা দক্ষিণ-পথে ভগীরথের অনুগামিনী হয়। এই জন্যই স্রোতোধারার নাম ভাগীরথী। এই ভাগীরথী দক্ষিণ সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। ভাগীরথীর সপ্তধারাই হিমবর্ষকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত। উহারা বিন্দুসর হইতে উদ্ভূত হইয়া, সপ্ত-শুভনদীরূপে পরিণত। এই সকল নদী শৈল-সহ কুকুর, রৌধ্র, বর্ব্বর, যবন, খশ, পুলিক, কুলথ্য ও অঙ্গলোক্য প্রভৃতি ম্লেচ্ছপ্রায় দেশ-সকল সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। গঙ্গা হিমবানকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দক্ষিণার্ণবে প্রবেশ করিয়াছে। চক্ষু নাম্নী স্রোতধারা—চীন, অরু, কালীক, চুলক, তুষার, বর্ব্বর, পহ্নব, পারদ ও শক এই সকল জনপদ প্লাবিত করিয়া সাগরে সম্মিলিত হইয়াছে। সিন্ধু নাম্নী স্রোতধারা—দরদ, পূর্ণা, গুড়, গান্ধার, উরস, কুহু, শিবপৌর, ইন্দ্রমরু, বসতি, সৈন্ধব, উর্ব্বশ, বর্ব্ব, কুলথা, ভীমরোমক, সুনামুক ও উর্দ্ধমরু এই সকল দেশ প্লাবিত করিতেছে। পবিত্র হ্লাদিনী-ধারা পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত। এই ধারা—কুপক, নিষাদ, ধীবর, ঋষক, নীলমুক, কেকয়, একবর্ণ, কিরাত, কালঞ্জর, দিকর্ণ, কুশিক ও স্বর্গভৌমক প্রভৃতি দেশ প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নলিনী-ধারা প্রাচী-দিকে প্রবাহিত। এই ধারা—কুপথ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, বেত্রশঙ্কুপথ, খরপথ, অরু, উজ্জানক ও কুথপ্রাবরণ প্রভৃতি দেশ প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে; পরে ইন্দ্রদ্বীপ-সমীপে গিয়া লবণ-সাগরে পতিত হইয়াছে। পাবনী ধারা—প্রাচীদিকে তোমার, হংসমার্গ ও সমহক প্রভৃতি জনপদ প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহা পূর্ব্বপ্রদেশ প্লাবিত করিয়া, বহুধা গিরি ভেদ করিয়া, কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি জনপদে উপস্থিত হইয়া, অশ্ব-মুখাদি জনপদে উপগত হইয়াছে। এই ধারাই মেরুপর্ব্বত প্লাবিত করিয়া, বিদ্যাধরা-ধ্যুসিত দেশ-সমূহে উপস্থিত হইয়া, শৈমীমণ্ডলাক্ষ্য মহা-সরোবরে প্রবেশ করিয়াছে। উল্লিখিত সপ্ত-স্রোতোধারা হইতে অন্যান্য সহস্র সহস্র শত শত নদী ও উপনদী প্রবাহিত হইতেছে। হেমকূট গিরির পৃষ্ঠে সর্পগণের এক মহা-সরোবর প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সরোবর হইতে সরস্বতী ও জ্যোতিষ্মতী নদী প্রবাহিত। এই উভয় নদী পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকস্থ উভয় সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে।” এই সকল নদীর উৎপত্তির বিষয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত আছে; তবে মৎস্যপুরাণে সীতা নদীর গন্তব্য-স্থান বিশেষরূপ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তাহা হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে,— “সীতা নদী—সিরিন্ধ্র, ককুর, চীন, বর্ব্বর, যবন, দ্রুহ, রুষ, পুলিন্দ, অঙ্গলোকবর এই সকল

দেশে প্রবাহিত ও সিন্ধু মরুকে প্লাবিত করিয়া পশ্চিম সাগরে পতিত হইয়াছে।" চক্ষু নদী ও সিন্ধুনদ সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"চক্ষু নদী—চীন, মরু, তঙ্কণ, সর্ব্ব-মূলিক, সাধ্র, তুষার, লম্পক, পহ্লব, দরদ ও শক, এই সকল জনপদ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সিন্ধু মহানদ,—দরদ, কাশ্মীর, গান্ধার, বরপ, হ্রদ, শিবপৌর, ইন্দ্রহাস, বসাতি, বিসর্জ্জয়, সৈন্ধব, বন্ধকরক, ভ্রমর, আভির, রোমক, গুনামুখ ও ঊর্দ্ধমরুতে প্রবাহিত হইয়াছে।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে,—"হ্লাদিনী নদী পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া নিষাদ, ধীবর, ঋষিক, নীলমুখ, কেরল, উষ্ট্রকর্ণ, কিরাত, কালোদর, স্বর্ণভূষিত কুমার দেশ প্লাবিত করিয়া মণ্ডলাকারে পূর্ব্বসাগরে পতিত হন। পাবনী নদী প্রথমে পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া অপথ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, খরপথ, ইন্দ্রশঙ্কুপথ, উদ্যান, মস্কারের মধ্যভাগ ও কুথপ্রবারণ প্লাবিত করতঃ ইন্দ্র-দ্বীপের নিকটে লবণ সাগরে পতিত হইতেছে। এইরূপে পূর্ব্বোল্লিখিত নলিনী নদী পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া তোমর, বহুদক, হংসমার্গ প্রভৃতি পূর্ব্ব-দেশগুলি প্লাবিত করিয়া বহুবিধ ভূধর ভেদ করতঃ, কর্ণপ্রাবরণ, অশ্বমুখ বালুকাময় শৈল মরু ও বিদ্যাধর দেশ প্লাবনান্তে নেমিমণ্ডলের মধ্য দিয়া মহাসাগরে পতিত হইয়াছে।" *

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় ভারতবর্ষের তাৎকালিক জনপদাদির নাম উল্লেখ করেন। সঞ্জয়-কথিত সেই জনপদসমূহের নাম মহাভারতে এইরূপ উল্লিখিত আছে ;—

ভারতবর্ষের প্রাচীন জনপদ সমূহ।

"কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মদ্রজাঙ্গল, শূরসেন, পুলিন্দ, বোধ, মাল, মৎস্য, কুশট, কৌশল্য, কুন্তী, কাশী, কোশল, চেদী, মৎস্য, করূষ, ভোজ, সিন্ধু, দাশার্ণ, মেকল, উৎকল, পঞ্চাল, কোশল, নৈকপৃষ্ঠ, যুগন্ধর, মদ্র, কলিঙ্গ, কাশী, অপরকাশী, জঠর, দশার্ণ, কুকুর, অবন্তী, কুন্তি, অপরকুন্তি, গোমন্ত, মল্লক, পাণ্ড্য, বিদর্ভ, অনুপবাহিক, অশ্মক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করিতি, অধিরাজ্য, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, বারবাখ, আপবাহ, বক্র, বক্রাতি, শক, বিদেহ, মগধ, স্বহ্ম, মলয়, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, চক্রল্লোমা, মল্ল, সুদেষ্ণ, প্রহ্লাদ, মাহিষ, শশিক, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরান্ত, পরান্ত, পহ্লব, চর্ম্মচাণ্ডক, অটবিশিখর, মেরুভূত, উপাবৃতা, অনুপাবৃতা, সুরাষ্ট্র, কেকয়, কুট্ট, মাহেয়, পক্ষ, সামুদ্রনিস্কুট, বহু, অন্ধ্রদেশ, অন্তর্গির্য্যা, বহির্গির্য্যা, অঙ্গমলদ, মালবাজ্জট, মহত্তর, প্রাবৃষেয়, ভার্গব, পুণ্ড্রক, ভার্গ, কিরাত, জামুন, নিষাধ, নিষধ, আনর্ত্ত, নৈঋত, দুর্গল, পূতিমৎস্য, কুণ্ডল, কুশল, তীরগ্রহ, শূরসেন, ঈজিক, কন্যকাগণ, তিলভার, মসীর, মধুমত্ত, সুকন্দুক, কাশ্মীর, সিন্ধু, সৌবীর, গান্ধার, দর্শক, অভীসার, উলুত, শৈবাল, বাহ্লীক, দর্ব্বীচর, নব, দর্ব্ব, বাতজ, আমরথ, উরগ, বাহুবট্ট, সুদামা, সুমল্লিক, বদর, করীষক, কুলিন্দ, উপত্যক, বানায়ু, দশ, পার্শ্ব, রোষা, কুশবিন্দ, কচ্ছ, গোপালকচ্ছ, জঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্ব্বর, সিদ্ধ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্ত, ওড্র, ম্লেচ্ছ, সৈরিন্ধ্র, ও পার্ব্বতীয়।" এইগুলি উত্তর ভারতের জনপদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পর সঞ্জয় দক্ষিণ-ভারতের জনপদ-সমূহের নাম উল্লেখ করেন। সেগুলি এই ;—"দ্রবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মূষিক,

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৫১শ অধ্যায় এবং মৎস্যপুরাণ, ১২১শ অধ্যায় প্রভৃতিতে এই সকল বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বনবাসিক, কর্ণাটক, বাহিষক, বিকল্প, মূষক, ঝিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নলকানন কোকুট্টক, চোল, কোঙ্কন, মালব, নর, সমঙ্গ, কনক, কুকুর, অঙ্গার, মারিষ, ধ্বজিনী, উৎসব, সঙ্কেত, ত্রিগর্ত্ত, শাম্বসেনি, ব্যূঢ়ক, কোরক, প্রোষ্ঠ, সমবেগবশ, বিন্ধ্য, পুলিক, পুলিন্দ, বল্কল, মালব, বল্লব, অপর, বর্ণক, কুলিন্দ, কালদ, দণ্ডক, করট, মষুক, স্তনবাল, সনীয়, অঘট, হৃঞ্জয়, অলিদায়, শিবাট, স্তনপ, সুনয়, ঋষিক, বিদর্ভ, কাক, তঙ্গন ও পরতঙ্গন।” এইরূপে দক্ষিণ-ভারতের জনপদসমূহের উল্লেখ করিয়া সঞ্জয় ভারতের উত্তর ও পূর্ব্বে যে যে সকল দেশ ছিল, তাহার আভাস প্রদান করেন। তিনি বলেন,—“মহারাজ! অপর উত্তর দেশ সকলের কথা শ্রবণ করুন,—যবন, কম্বোজ সকৃদ্গ্রহ, কুলত্থ, হূণ, পারসিক, রমণ, চীন ও দশমালিক; এই সকল দেশে দারুণ ম্লেচ্ছ-জাতি বাস করে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির বসতি প্রদেশ—আভির, দরদ, কাশ্মীর, পশু, খাশিক, অন্তচার, পহ্লব, গিরিগহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ্য স্তনপোষিক, দ্রশক ও কলিঙ্গ। কিরাত জাতিদিগের বাস প্রদেশ,—তোমার, হন্তমান, করভঞ্জক।” সঞ্জয়-কথিত এই সকল দেশ ভিন্ন মহাভারতে আরও নানা দেশের কথা লিখিত আছে। রামায়ণের অযোধ্যা, লঙ্কা প্রভৃতির বৃত্তান্তও মহাভারতে দেখিতে পাই। বিরাট, উপপ্লব্য, শালিভবন, বৃকস্থল, বিদেহ, পাঞ্চাল প্রভৃতি আরও কত দেশের কথাই মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতোক্ত জনপদ-সমূহ ভারতের কোন্ কোন্ অংশে অবস্থিত ছিল, মৎস্যপুরাণ ও গরুড়পুরাণ প্রভৃতিতে তাহার অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে,—“কুরু, পাঞ্চাল, শাম্ব, জাঙ্গল, শূরসেন, ভদ্রকার, বাহ্য, পট্টচর, মৎস্য, কিরাত, কুল্য, কুন্তল, কাশী, কোশল, অবন্তী, কলিঙ্গ, মূক ও অন্ধক—এই সকল জনপদ মধ্য-দেশবর্ত্তী। বাহ্লিক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, পুরন্ধ্র, শূদ্র, পল্লব, আত্তখণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীড়, মদ্রক, শক, দ্রুহ্য, পুলিন্দ, পারদ, হারমূর্ত্তিকা, রামঠ, কণ্টকা, কৈকেয়, দশনামঠ, প্রস্থল, দশেরক, লম্পক, তলনাগ, সৈনিক, জাঙ্গল এবং ভরদ্বাজ-বংশীয় বিবিধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জনগণের বাসস্থান,—এই সকল দেশে উত্তরদিকবর্ত্তী। অঙ্গ, বঙ্গ, মদ্গুরক, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, সুহ্ম, প্রবিজয়, উত্তর মার্গ, বাগেয়, মালব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুণ্ড্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, শাম্ব, মাগধ, গোনর্দ্দ,—এই সকল প্রাচ্য জনপদ। পাণ্ড্য, কেরল, চোল, কুল্য, সেতুক, স্থতিক, কুপথ, বাজিবাসিক, নবরাষ্ট্র, মাহিষিক, কলিঙ্গ, কারুষ, ঐষীক, আটব্য, শবর, পুলিন্দ, বিন্ধ্য, বিন্ধ্যকুশিক, বৈদর্ভ, দণ্ডক, কুলীয়, সিরাল, রূপস, তাপস, তৈত্তিরীক, কারস্কর, বাসিক এবং নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী দেশ-সকল দাক্ষিণাত্য। ভালুকচ্ছ, মাহেয়, সারস্বত, কাচ্ছীক, সৌরাষ্ট্র, আনর্ত্ত, অর্ব্বুদ,—এই সকল পশ্চিম-দেশীয় জনপদ। মালব, করূষ, মেকল, উৎকল, ঔড্র, মাষ, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধ্যা, তোশল, কোসল, ত্রৈপুর, বৈদিশ, তুমুর, তম্বর, পদগম, নৈষধ, অরূপ, শৌণ্ডিকের, বীতিহোত্র, অবন্তী,—এই সমস্ত জনপদ বিন্ধ্যপৃষ্ঠে অবস্থিত। নীরাহার, সর্ব্বগ, কুপথ, অপস, কুথ, প্রবারণ, উর্ণা, দর্ব্বা, সমুদ্গক, ত্রিগর্ত্ত, মণ্ডল, কিরাত, চামর ইত্যাদি দেশ-সমূহ নানা পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া আছে।” ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে,—“কুরু, পাঞ্চাল, শাম্ব, জাঙ্গল, শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শতপথেশ্বর, বৎস্য, কসট্ট, কুল্য, কুন্তল, কাশী, কোশল, কলিঙ্গ, মগধ ও

বৃক,—এই কয়টী মধ্য-দেশীয় জনপদ। বাহ্লিক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপবীত, শূদ্র, পল্লব, চর্ম্মখণ্ডীক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শক, হূণ, কলিন্দ, পারদ, হারহূণ, রমণ, রুদ্ধ, কটক, কেকয় ও দশমালিক—এইগুলি ক্ষত্রিয় জনপদ। এই সকল জনপদে ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্যগণের উপনিবেশ আছে। কম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর, আঙ্গলৌকিক, চীন, তুষার, পহ্লব, ক্ষতোদর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, প্রস্থল, কসেরুক, লম্পাক, স্তনপ, পীড়ক, জুহুড়, অপথ ও অলিমদ্র, কিরাত প্রভৃতি এবং তোমর, হংসমার্গ, কাশ্মীর, তঙ্গন, চুলিক, আহুক, ঊর্ণা, দর্ব্ব,—এই দেশগুলি পূর্ব্বোল্লিখিত দেশের ন্যায় ক্ষত্রিয় দেশ। এই সকলই ভারতবর্ষের উত্তরাংশে অবস্থিত। অন্ধ্রবাক, সুজরক, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্রবঙ্গ, বঙ্গ, মলদ, মালবর্ণিক, ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পৌণ্ড্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, মালমগধ ও গোনন্দ—এই সকল দেশ ভারতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। পাণ্ড্য, কেরল, চোল, কুল্য, সেতুক, মূষিক, কুনাপা, বাণবাসক, মহারাষ্ট্র, মাহিষক, কলিঙ্গ, আভীর, ঐষীক, আটব্য, বর, পুলিন্দ, বিন্ধ্যমূলক, বৈদর্ভ, দণ্ডক, শৌলিক, মৌলিক, অশ্মক, ভোগবর্দ্ধন, মৈন্দিক, কুন্তল, অন্ধ্র, উদ্ভিদ, নলকালি—এই দেশগুলি ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক অবস্থিত। এই সকল দেশকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়। সূর্পারক, কোলবন, দুর্গ, তালিকট, পুলেয়, সুরাল, রূপস, তাপস ও তুরসুত—এই সকল দেশ পাশ্চাত্য নামে প্রসিদ্ধি নর্ম্মদা-নদীর তীরস্থিত নাসিক্যাদি দেশ। ভারুকচ্ছ মাহের, শাশ্বত, কচ্ছীয়, সুরাষ্ট্র, আনর্ত্ত ও অর্ব্বুদ—এই দেশগুলি সম্পরীক নামে পরিচিত। মালব, করূষ, মেকল, উৎকল উত্তমর্ণ, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধ্যক, তোসল, কোশল, ত্রৈপুর, বিদিশ, তুমুর, ভুম্বুর, ষট্‌শূর, নিষধ, অনূপ, তণ্ডিকের, বীতহোত্র অবন্তী—এই সকল জনপদ বিন্ধ্যাচলের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। নিগর্হর, হংসমার্গ, কুপথ, তঙ্গণ, খশ, কর্ণপ্রাবরণ, হূণ, বহুদক, ত্রিগর্ত্ত, মালব, কিরাত ও তামস—এইগুলি পর্ব্বতাশ্রিত দেশ।” গরুড়পুরাণে ভারতবর্ষের জনপদ-সমূহের অবস্থিতির পরিচয় যাহা লিখিত আছে, তাহাতে আবার দেখিতে পাই,—“পাঞ্চাল, কুরু, মৎস্য, যৌধেয় পটচ্চর, কুন্তী, শূরসেন—এই সকল দেশ ভারতবর্ষের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহাদের একটী সাধারণ নাম—মধ্যদেশ। পদ্ম, সূত, মাগধ, চেদী, কাশায়, বিদেহ ও কোশল—এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। কলিঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, অঙ্গ, বিদর্ভ ও মূলক—এই সকল দেশ আর বিন্ধ্য-পর্ব্বতের অন্তর্গত দেশ সকল ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-দক্ষিণ-ভাগে অবস্থিত। পুলিন্দ, অশ্মক, জীমূত, নবরাষ্ট্র, কর্ণাট, কম্বোজ, ঘাট, দক্ষিণাপথ, অম্বষ্ঠ, দ্রবিড়, লাট, কম্বোজ, স্ত্রীমুখ, শক, আনর্ত্ত,—এই সকল দেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। স্ত্রী-রাজ্য সিন্ধু এবং ম্লেচ্ছ ও যবনদিগের দেশ, আর মাথুর ও নিষধ এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে অবস্থিত আছে। মাণ্ডব্য, তুষার, মূলিক, মুষ, খশ, মহাকেশ, মহানাদ—এই সকল দেশ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। লম্বক, স্তন, নাগ, মদ্র, গান্ধার ও বাহ্লিক—এই সকল দেশ আর হিমালয়বাসী ম্লেচ্ছগণের দেশ ভারতবর্ষের উত্তর-ভাগে অবস্থিত। ত্রিগর্ত্ত, নীল, কোলাভ, ব্রহ্মপুত্রের সন্নিহিত দেশ, কঙ্কণ ও অভীষাহ এবং কাশ্মীর—এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর-ভাগে অবস্থিত।” মহাভারতে, মৎস্যপুরাণে

এবং গরুড়পুরাণে ভারতবর্ষের যে সকল জনপদের নাম দৃষ্ট হয়, তাহাতে ভারতের সীমানা সম্বন্ধে মনোমধ্যে স্বতঃই সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে। বিষ্ণুপুরাণের ও ব্রহ্মপুরাণের বর্ণনায় সেই সংশয়-প্রশ্ন আরও ঘনীভূত হইয়া আসে। মহাভারতের ও গরুড়পুরাণের বর্ণনায় কম্বোজ, বাহ্লিক, পারদ, কিরাত, যবন প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণে ও ব্রহ্মপুরাণে আবার পারসীকগণের নাম স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে। ইহার কারণ কি? ঐ সকল দেশ তখন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অথবা ঐ সকল দেশের অধিবাসীরা এদেশে আসিয়া বসবাস করিতেন,—কোন্ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে? এতদ্বিষয়ে দুই মতই প্রচলিত। কখনও বা ভারতবর্ষের সীমানা ঐ সকল দেশ ব্যাপিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; কখনও আবার ঐ সকল দেশের অধিবাসীরা এদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপনে বসবাস করিতেছিল; অথবা, এই দেশেই ঐ সকল জাতির উৎপত্তি হয় এবং এদেশ হইতেই দুরদুরান্তরে গমন করিয়া তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যাহাই হউক, ভারতবর্ষের সহিত তখন যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতির সম্বন্ধ ছিল, এই সকল বর্ণনায় তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। পুরাণে যে সকল দেশের নাম দেখিতে পাই, রামায়ণে তদপেক্ষা কয়েকটী নূতন জনপদের নাম দৃষ্ট হয়। যথা;—অশ্মনগর, উত্তর-কুরু, অংশুধান, উজ্জিহান, একশাল, অপরতাল, অধিকাল, কালঞ্জর, অঙ্গ, লেপাপুর, বিশালা, বিদিশা, অঙ্গদিয়া, কারুপদ, পুষ্কলাবৎ, মহাগ্রাম, সাঙ্কাশ্যা, দক্ষিণাপথ, নিষাদ-দেশ, প্রতিষ্ঠান, মধুমন্ত, বৎসদেশ, কৌশাম্বী, শৃঙ্গবেরপুর ইত্যাদি। কোন্ জনপদ কোন্ দিকে অবস্থিত ছিল, রামায়ণেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

নদ-নদী, পর্ব্বত ও নগর ভিন্ন, কত তীর্থ-স্থানের বিষয়, কত কানন-সরোবরের বিবরণ, কত হ্রদ-তড়াগাদির পরিচয়, কত ঋষি-তপস্বীর আশ্রমের বর্ণনা, শাস্ত্র-সমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। কোথায় কোন্ দেবতা কিরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহার বর্ণন-প্রসঙ্গেও কত কত দেশ-জনপদাদির বিবরণ শাস্ত্রগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে তীর্থস্থান অসংখ্য। তন্মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান তীর্থের বিবরণ গরুড়পুরাণে এইরূপ-ভাবে লিখিত আছে,—"গঙ্গা সর্ব্বতীর্থের প্রধানভূতা। হরিদ্বার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তিন স্থান দুর্লভ। প্রয়াগ অতি পরম তীর্থ; এই মহাতীর্থে স্নানপূর্ব্বক পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলে, সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়—সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। বারাণসী অতি পরম তীর্থ; এই তীর্থে বিশ্বেশ্বর ও কেশব সদা বিরাজমান। কুরুক্ষেত্র অতি মহাতীর্থ; এই তীর্থে দানাদি করিলে, সাধক ভুক্তি-মুক্তি উভয়ই লাভ করেন। প্রভাস অতি পুণ্যস্থান; এই তীর্থে সোমনাথ দেব বিরাজমান আছেন। দ্বারকাপুরী বিখ্যাত পুণ্যভূমি। এই পুরী দর্শনে সাধক ইহকালে বিবিধ সুখভোগ করিয়া অন্তে মুক্তিলাভ করেন। সরস্বতী অতি পুণ্যপ্রদ তীর্থ; এই তীর্থে স্নানাদি করিলে, সর্ব্ববিধ বিদ্যা লাভ হয়। শম্ভল-গ্রামে সর্ব্বপাপ-বিনাশক কেদার তীর্থ বিদ্যমান আছেন। বদরিকাশ্রম—নারায়ণ তীর্থ। এই তীর্থ-দর্শনে মুক্তিলাভ হয়। শ্বেতদ্বীপ, মায়াপুরী, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, অযোধ্যা, চিত্রকূট, গোমতী, বিনায়ক-তীর্থ, রামগিরি, কাঞ্চিপুরী, তুঙ্গভদ্রা,

ভারতবর্ষের তীর্থস্থান-সমূহ।

শ্রীশৈল, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, কার্ত্তিকেয় তীর্থ, ভৃগুতুঙ্গ, কামতীর্থ, অমরকণ্টক, উজ্জয়িনীস্থ মহাকালতীর্থ, কুব্জকে শ্রীধর তীর্থ, হরিতীর্থ, কুব্জাম্রক তীর্থ, কালসর্পী, মহাকেশী, কাবেরী, চন্দ্রভাগা, বিপাশা, একাম্রকানন, ব্রহ্মেশক্ষেত্র, দেবকোটিক, মথুরাপুরী, সোমনাথ, মহানদ ও জম্বুসর—এই সমস্ত মহাতীর্থ। এই সকল তীর্থে সর্ব্বদা সূর্য্য, শিব, গণপতি, দেবী পার্ব্বতী ও হরি অবস্থিত করেন। এই সকল তীর্থে স্নান, দান, জপ, তপ, পূজা, শ্রাদ্ধ, ও পিণ্ডদানাদি কার্য্য করিলে, সেই সকল অক্ষয় ফল লাভ হয়। শালগ্রাম তীর্থ ও পাশুপত তীর্থ—এই উভয় তীর্থই সর্ব্বফলপ্রদ। কোকামুখ, বরাহ, ভাণ্ডীর, স্বামিতীর্থ—এই সকল মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত। মোহদণ্ড নামক মহাতীর্থে মহাবিষ্ণু ও মন্দার তীর্থে মধুসূদন অবস্থিত আছেন। কামরূপ অতীব প্রধান তীর্থ। এই স্থানে কামাখ্যা দেবী সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। পুণ্যবর্দ্ধন মহাতীর্থে কার্ত্তিকেয়-দেব সতত অবস্থিতি করিতেছেন। বিরাজ-তীর্থ, শ্রীপুরুষোত্তম, মহেন্দ্র-পর্ব্বত, কাবেরী, গোদাবরী, পয়স্বী এবং বরদা নদী—এই সমস্ত মহাতীর্থ। বিন্ধ্য নামক যে মহাতীর্থ আছে, তাহা সর্ব্বপাপহর। গোকর্ণ, মাহেষ্মতী, কালঞ্জর; শুক্রতীর্থ, কৃতশৌচ—এই সমস্ত মহাতীর্থে স্নানাদি করিয়া শুদ্ধদেহ হইলে বিষ্ণু তাহাদিগকে অন্তকালে মুক্তি প্রদান করেন। বিন্দ ও স্বর্ণাক্ষ—এই মহাতীর্থ-যুগল, সর্ব্বফলপ্রদ ও সর্ব্বতীর্থোত্তম। নন্দী-তীর্থ মুক্তিপ্রদ। নাসিকা, গোবর্দ্ধন, কৃষ্ণবেণী, ভীমরথা, গণ্ডকী, ইরাবতী ও বিষ্ণুর পাদোদক-স্বরূপ বিন্দুসর—এই সকল মহাপুণ্যজনক তীর্থ। শ্রীরঙ্গপত্তন একটী মহাতীর্থ; এই স্থানে হরি অবস্থিতি করেন। তাপী, মহানদী, সপ্তগোদাবর তীর্থ এবং কোণ-গিরি—এই সকলই মহাতীর্থ স্থান। কোণ-গিরি তীর্থে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী নদীরূপে বিরাজমানা আছেন। সহ্য-পর্ব্বতে একবীর নামক মহাতীর্থ আছে। সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন। গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, বিন্ধ্যপর্ব্বত, কনখল ও নীলগিরি—এই সকল মহাতীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহার আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। গয়া-তীর্থ ব্রহ্মলোক-প্রদ;—সর্ব্ব-তীর্থের সারভূত।" এতদ্ভিন্ন আরও অনেক তীর্থ আছে; সেই সকল তীর্থে স্নান-দানাদি করিলেও সর্ব্বপ্রকার শুভফল লাভ হয়। গয়া, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ-ক্ষেত্রের মধ্যস্থলেও আরও কত কত তীর্থ বিদ্যমান। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অসংখ্য তীর্থের সমাবেশ। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, সতীদেহ স্কন্ধে ধারণ করিয়া মহাদেব উন্মত্তবৎ তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন। সুদর্শন-চক্রে বিষ্ণু সেই সতীদেহ খণ্ড খণ্ড ছেদন করেন। সতীর সেই দেহাংশ-সমূহ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তত্তৎস্থান পীঠস্থান মধ্যে পরিগণিত হয়। তদনুসারে ভারতবর্ষীয় একান্নটী স্থান এক্ষণে একান্ন পীঠ বা তীর্থক্ষেত্র নামে অভিহিত। তন্ত্রশাস্ত্রে এই পীঠস্থান-সমূহের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। * তন্ত্রচূড়ামণি-গ্রন্থে শিবপার্ব্বতী-সংবাদে

* পীঠস্থান-সমূহের উৎপত্তি-বিষয়ে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। তন্ত্রের মত এবং প্রচলিত মত,—বিষ্ণু চক্রের দ্বারা সতীদেহ ছেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু কালিকাপুরাণে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি শবদেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সতীদেহ খণ্ডে খণ্ডে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কালিকাপুরাণ অষ্টাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সেই একান্ন পীঠের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণে ও ভবিষ্যপুরাণে কতকগুলি পীঠস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল পীঠস্থানের মধ্যেও প্রয়াগ, কর্ণাট, মিথিলা, কাশ্মীর, বৃন্দাবন, কাঞ্চী, চিত্রকূট, বারাণসী, লঙ্কা, বিরাট, কামরূপ, জয়ন্তী, উৎকল প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। ভরদ্বাজাশ্রম, আনন্দাশ্রম, নিকুম্ভিলা যজ্ঞক্ষেত্র, পরশুরাম তীর্থ, গোকর্ণ তীর্থ, সিদ্ধাশ্রম, মেধাশ্রম প্রভৃতি কতকগুলি আশ্রম-তীর্থের বিষয়ও রামায়ণে বর্ণিত আছে।

প্রাদেশিক নদ-নদীর পরিচয়।

পুরাণাদি শাস্ত্র আলোড়ন করিলে, ভারতবর্ষের নদ-নদী-পর্ব্বত-জনপদাদির যেরূপ পরিচয় পাই, তীর্থস্থানসমূহের যেরূপ প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারি; সরোবর, হ্রদ প্রভৃতির বিষয়ও শাস্ত্রে সেইরূপ-ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। মানস-সরোবর, বিন্দু-সরোবর, সুদর্শন-সরঃ, পম্পা-সরোবর প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণও পুরাণাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও পুরাণে সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষের নদ-নদী জনপদ ও তীর্থ-স্থানাদির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; কোনও পুরাণে আবার বিশেষ-ভাবে তত্তদ্বিষয় আলোচিত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে কালিকা-পুরাণের অষ্টসপ্ততিতমাধ্যায়ে বর্ণিত নদী ও পর্ব্বত সমূহের নাম উল্লেখ করিতে পারি। তাহাতে দেখিতে পাই,—কামরূপের প্রায় সমস্ত নদী ও পর্ব্বতগুলির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েক ছত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি;—"বহুরোকা ও করতোয়া নাম্নী উত্তরস্রাবিনী নদী কামরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সুরস-পর্ব্বত কামরূপের অন্তর্গত। ধর্ম্মপ্রদা বহুরোকা নামে নদী সেই পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত। সুরসের পূর্ব্বদিকে কৃত্তিবাস নামে এক পর্ব্বত আছে। সেখানে চন্দ্রিকা নামে একটী নদী প্রবাহিতা। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীতে চন্দ্রিকা নদীতে স্নান করিয়া কৃত্তিবাস মহাদেবকে পূজা করিলে, মানুষ কলঙ্ক-শূন্য হয়। সরিৎ-শ্রেষ্ঠা চন্দ্রিকা সর্ব্বদা উত্তর-স্রাবিনী। চন্দ্রিকার অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে শতানন্দ নামে একটী নদী আছে। ঐ নদী ব্রহ্মার দুহিতা এবং গঙ্গা-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। নিকটেই ফেণিলা; ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় সেখানে স্নান করিলে নরক-জয় হয়। তাহার পূর্ব্ব-দিকে সীতা নাম্নী নদী। চৈত্র পূর্ণিমাতে সেই নদীর জলে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়। তাহার পূর্ব্বে যোজন-দ্বয়ের মধ্যে সুমদনা নদী। মহারাজ জনক বৃষভধ্বজের আরাধনা করিয়া ভৈরবের হিতের নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ পর্ব্বত হইতে এই নদীকে অবতারিত করিয়াছিলেন। মাঘ মাসে শুক্লা-চতুর্থীর দিন সুতীক্ষ্ণ পর্ব্বতে আরোহণ এবং সুমদনার জলে স্নান করিলে মানুষের সর্ব্ব-কামনা সিদ্ধ হয়। কামরূপের নৈঋত কোণে এই সকল উত্তর-বাহিনী নদী আছে।" এইরূপে উত্তর-বাহিনী নদী-সমূহের বর্ণনা করিয়া পুরাণে দক্ষিণ-বাহিনী নদী-সমূহের বিষয় অবতারণা করা হইয়াছে। "অগদ নামক নদের ঊর্দ্ধে ভদ্রা নামে একটী মহানদী আছে। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে সেই নদীতে স্নান করিলে মানুষ স্বর্গে গমন করে। তাহার পূর্ব্বদিকে সদাপুণ্যময়ী সুভদ্রা নদী। বৈশাখ মাসের শুক্ল তৃতীয়াতে সেই নদীতে স্নান করিলে মানুষ অক্ষয়-স্বর্গ লাভ করে। তার পর মানসা নদী। তৃণবিন্দু ঋষি মানস-সরোবর হইতে ঐ নদী অবতারিত করেন। সমস্ত বৈশাখ

মাস ঐ নদীতে স্নান করিলে স্বর্গলাভ হয়। হিমালয় পর্ব্বতের নিকট বিভ্রাট নামে একটী গিরিশৃঙ্গ আছে। সেই পর্ব্বত হইতে ভৈরবী-নাম্নী নদী মানসার পূর্ব্বদিকে প্রবাহিতা। উহা গঙ্গার ন্যায় ফলপ্রদা। বসন্তকালে ঐ নদীতে স্নান করিলে স্বর্গলাভ হয়।" ইহার পর ত্রিস্রোতা, কপোত, বরুণ, নীলা, চণ্ডিকা প্রভৃতি আরও কত নদীর কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণ-সমূহে প্রদেশ-বিশেষের এমনই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভূ-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে! কতকাল পূর্ব্বে ভূ-বৃত্তান্তে ভারতবাসীর কিরূপ অভিজ্ঞতা ছিল,—ইহা তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পাশ্চাত্য-দৃষ্টিতে পুরাণ-সমূহ যতই আধুনিক বলিয়া বিবেচিত হউক, যতই আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হউক, পাশ্চাত্য-দেশীয় ভূগোল-সমূহ প্রচারিত হইবার বহু পূর্ব্বে পুরাণ-পরম্পরার বিদ্যমানতা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়; সুতরাং ভূ-বৃত্তান্তে ভারতবর্ষ অতি পুরাকালেই যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে কোনও সংশয় নাই।

যাহা হউক, একমাত্র জম্বুদ্বীপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াই পুরাণ-শাস্ত্র নীরব নহেন। জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে যেমন বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সেইরূপ প্লক্ষাদি

পৃথিবীর অবস্থান ও বিভাগ।

অবশিষ্ট ছয় দ্বীপের এবং তদন্তর্গত বর্ষসমূহের বিষয়ও পুরাণ-সমূহে লিখিত আছে। সংক্ষেপে সে পরিচয় এস্থলে প্রদান করিতেছি। পুরাণানুসারে জম্বুদ্বীপ সাতটী বর্ষে বিভক্ত। সেই বর্ষসমূহের নাম;—(১) হৈমবত; উহা ভারতবর্ষ নামে বিশ্রুত। (২) হেমকূট; উহা কিম্পুরুষ বর্ষ। (৩) নিষধ; উহা হরিবর্ষ। (৪) মেরুপর্ব্বতাধারভূমি; উহা ইলাবৃত বর্ষ। (৫) নীলশৈল; উহা রম্যক বর্ষ। (৬) শ্বেত; উহা হিরণ্যক বর্ষ। (৭) শৃঙ্গশাক; উহা কুরু বর্ষ। এতদ্ভিন্ন মেরুর দক্ষিণে ও উত্তরে ধনুর আকারে দুইটী বর্ষ আছে।' বলা বাহুল্য, এই বর্ষ-সমূহের পরিচয় পাঠ করিলে, জম্বুদ্বীপকে ভূগোল বা ভূগোলার্দ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না। পুরাণ-সমূহের আলোচনায় আরও বুঝিতে পারি,—জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে মেরুপর্ব্বত বিরাজমান। মেরুর দক্ষিণে যথাক্রমে ভারতবর্ষ, কিম্পুরুষ বর্ষ ও হরিবর্ষ। তাহার উত্তরে রম্যক, হিরণ্যক ও কুরু বর্ষ। মেরুর পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল বর্ষ। এ হিসাবে, জম্বুদ্বীপ নয় ভাগে বা বর্ষে বিভক্ত; ভারতবর্ষ তাহারই অন্যতম। যেমন জম্বুদ্বীপ, পৃথিবীতে সেইরূপ প্লক্ষ-দ্বীপ আছে, শাল্মলী-দ্বীপ আছে, কুশ-দ্বীপ আছে, ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ আছে, শাক-দ্বীপ আছে এবং পুষ্কর-দ্বীপ আছে। সেই সকল দ্বীপের প্রত্যেকটিও ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে বিভক্ত। জম্বুদ্বীপের পর প্লক্ষ-দ্বীপ। জম্বু-দ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন, প্লক্ষ-দ্বীপের বিস্তার তাহার দ্বিগুণ। প্লক্ষ-দ্বীপ সাত বর্ষে বিভক্ত। প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব নামে সাত পুত্র ছিলেন। তাঁহাদেরই নামানুসারে প্লক্ষ-দ্বীপ শান্তভয়-বর্ষ প্রভৃতি সপ্তবর্ষে বিভক্ত হয়। জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতবর্ষে যেরূপ নদ-নদী-পর্ব্বতাদি বিরাজমান, প্লক্ষদ্বীপান্তর্গত বর্ষ-সমূহেও সেইরূপ নদ-নদী-পর্ব্বতাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। জম্বু-দ্বীপ লবণ-সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত; প্লক্ষ-দ্বীপ—এক দিকে লবণ-সমুদ্র, অন্য দিকে ইক্ষু-সমুদ্র দ্বারা সমাবৃত। প্লক্ষ-দ্বীপের পর শাল্মলী-দ্বীপ। রাজা বপুষ্মানের সাত পুত্রের নামানুসারে ঐ দ্বীপও শ্বেত, হারীত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুৎ, মানস ও সুপ্রভ প্রভৃতি সাত ভাগে বা

সপ্তদ্বীপের অবস্থান।

পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ যে ভাবে অবস্থিত আছে, নিম্ন-প্রকটিত চিত্রে তাহার আভাষ প্রদত্ত হইয়া থাকে।
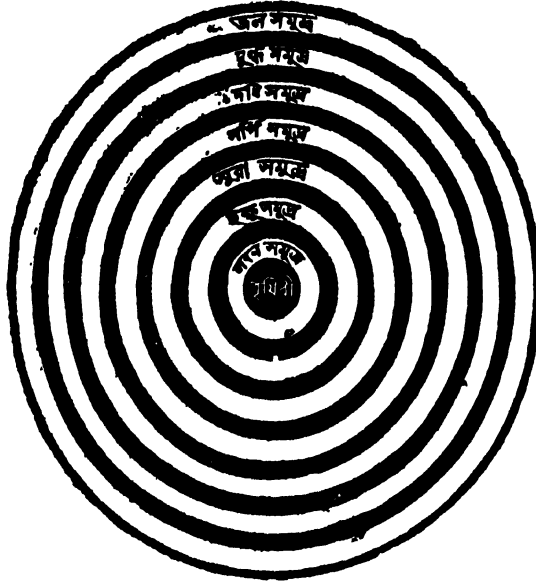
কিন্তু অধুনা জ্যোতির্ব্বিদ্গণ পৃথিবীর অবস্থানাদির বিষয় যেরূপ-ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাতে এ চিত্রের মর্ম্মোদ্ধার করা বড়ই সুকঠিন। এখন ইহা রূপক বলিয়া মনে হইতে পারে। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ অধুনা পৃথিবীর এবং তৎসন্নিহিত বা তৎসংশ্লিষ্ট গ্রহাদির অবস্থানের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাহাতে উল্লিখিত চিত্রে সেই সকল গ্রহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বর্ষে বিভক্ত হয়। ইহা প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ; এক দিকে ইক্ষু-সমুদ্র ও অন্য দিকে সুরা-সমুদ্র দ্বারা শাল্মলী-দ্বীপ পরিবৃত। অতঃপর কুশ-দ্বীপ; রাজা জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্র—উদ্ভিদ, বেণুমান, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর এবং কপিল। তাঁহাদের নামানুসারে কুশ-দ্বীপ সপ্ত বর্ষে বিভক্ত হয়। এই দ্বীপ এক দিকে সুরা-সমুদ্র ও অন্য দিকে ঘৃত-সমুদ্র দ্বারা সংবৃত। ইহা শাল্মলী দ্বীপের দ্বিগুণ। অতঃপর ক্রৌঞ্চদ্বীপ। বিস্তার—কুশদ্বীপের দ্বিগুণ। দ্যুতিমানের সাত পুত্রের নামানুসারে ক্রৌঞ্চ-দ্বীপও সাত বর্ষে বিভক্ত হয়। সেই সাত পুত্রের নাম—কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকার, মণি ও দুন্দুভি। এক দিকে ঘৃত-সমুদ্র ও অন্য দিকে দধি-সমুদ্র দ্বারা ক্রৌঞ্চদ্বীপ পরিবেষ্টিত। তৎপরে শাকদ্বীপ। উহার বিস্তৃতি ক্রৌঞ্চ-দ্বীপের দ্বিগুণ। মহাত্মা ভব্যের সাত পুত্রের নামানুসারে ঐ দ্বীপও সাত বর্ষে বিভক্ত হয়। সেই সাত পুত্রের নাম—জলদ, কুমার, সুকুমার, মণিচক, কুসুমোদ, মোদাকি ও মহাদ্রুম। এক দিকে দধি-সমুদ্র ও অন্য দিকে ক্ষীরোদ-সমুদ্র দ্বারা শাকদ্বীপ পরিবেষ্টিত। অবশেষে পুষ্কর-দ্বীপ। বিস্তৃতিতে উহা শাকদ্বীপের দ্বিগুণ। পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি সবলের দুই পুত্র—মহাবীর ও ধাতকি। তাঁহাদের নামানুসারে ঐ দ্বীপ মহাবীর-বর্ষ ও ধাতকি-খণ্ডে বিভক্ত। পুষ্করের সমান বিস্তৃত স্বাদূদক সমুদ্র পুষ্কর-দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে। জম্বুদ্বীপের ন্যায় প্রত্যেক দ্বীপের নদী, পর্ব্বত ও অধিবাসীদিগের বিবরণ—সকল পুরাণেই সংক্ষেপে লিখিত আছে। কোনও কোনও বিষয়ে এক পুরাণের সহিত অন্য পুরাণের মতান্তর ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু পৃথিবীর অবস্থান ও ঐ প্রকার বিভাগ সম্বন্ধে প্রায় সর্ব্বত্রই ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়। তবে সে বর্ণনানুসারে ভূমণ্ডলকে সাধারণতঃ যে সামগ্রী বলিয়া প্রতীত হয়, অধুনা তাহার অস্তিত্ব কোনও প্রকারেই নির্ণয় করা যায় না। তাহাতে মনে হয়,—সপ্ত-দ্বীপ যেন পর পর সাতটী ক্ষুদ্র-বৃহৎ চক্রাকারে সজ্জিত রহিয়াছে এবং সেই সকল চক্রের কেন্দ্রস্থল—জম্বুদ্বীপ। পুরাণের বর্ণনা অবলম্বন করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ চক্রমধ্যবর্ত্তী চক্ররূপে জম্বুপ্লক্ষাদি দ্বীপের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। তাহাতে মনে হয়,—গোলাকার জম্বুদ্বীপের পর বৃত্তাকারে জলরাশি তাহাকে ঘেরিয়া আছে; তাহার পর বৃত্তাকারে আবার স্থলভূমি; তাহার পর বৃত্তাকারে আবার জলরাশি; তাহার পর আবার সেইভাবেই স্থলভূমি। এইরূপে জম্বুদ্বীপ লইয়া সপ্ত প্রস্ত জল ও স্থল বিদ্যমান রহিয়াছে। জম্বুদ্বীপকে যদি আধুনিক পৃথিবী বলিয়াই মনে করি, তাহা হইলেই বা শাস্ত্রের বর্ণনার সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? গোলাকার স্থলভূমি এবং তাহাকে ঘেরিয়া বৃত্তাকারে জলরাশি,—তাহাই বা এখন কোথায়? এ সমস্যার মীমাংসা বড়ই দুরূহ। বিজ্ঞান-মতে প্রথম সৃষ্টির সময় সকল সামগ্রীই অণ্ডাকারে অবস্থিতি করে। পরিশেষে সেই অণ্ড হইতে নানা প্রকারের অবয়বাদি বহির্গত হয়। মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ—এমন কি উদ্ভিদ পর্য্যন্তের উৎপত্তির বিষয় অনুসন্ধান করিলে, অণ্ডাকারে অবস্থিত তাহার একটী অবস্থার পরিচয় পাই। অণ্ড হইতে পদ-চঞ্চু-পক্ষ-সমন্বিত দেহ-বিশিষ্ট পক্ষী এবং হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রাণি-সমূহ বহির্গত হইয়া থাকে। ইহা সকলেই সচরাচর দেখিতে পান। পৃথিবীও সেই অবস্থা হইতে সেই

ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শাস্ত্রে যে সময়ে পৃথিবীর ঐরূপ গোলাকার সপ্তভাগের বিষয় লিখিত হইয়াছে,—সে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা; অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পর পৃথিবীর সেই প্রথম বিকাশ। সুতরাং প্রথমাবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পৃথিবী পুরাণ-বর্ণিত অণ্ডাকারে অবস্থিত ছিল, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। কালের নিয়ত পরিবর্ত্তনে পৃথিবীর এখন সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত। অণ্ডাকার ভূ-খণ্ডের পার্শ্বে বৃত্তাকারে যে জলরাশি অবস্থিত ছিল, কাল-প্রবাহে—বিবর্ত্তনের প্রবল অভিঘাতে—ভূ-খণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, সেই জলরাশি তাহার মধ্যে সাগরোপসাগর-প্রণালী-ক্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছে,—এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ফলতঃ রাজা প্রিয়ব্রতের অধিকার-কালে পৃথিবী যেরূপ সপ্ত-ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, এখন তাহাতে সম্যক্ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সঞ্জয় যখন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট জম্বুদ্বীপের আকারাদির বিষয় বর্ণন করিতেছেন, জম্বুদ্বীপ তখন সুদর্শন-দ্বীপ নামে পরিচিত। তাহার আকৃতিও, বর্ণনায় উপলব্ধি হয়, অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত। এমন কি, সে বর্ণনা পাঠ করিলে, জম্বুদ্বীপ বা সুদর্শনকে তখন এই বর্ত্তমান পৃথিবী ভিন্ন অন্য কিছুই বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। সঞ্জয় বলিতেছেন,—"হে কুরুবর্দ্ধন! সুদর্শন নামে জম্বু-বৃক্ষ-বিশেষ, তন্নামে বিশ্রুত সুদর্শন-দ্বীপ, আপনার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। উহা গোলাকার চক্রের ন্যায় সংস্থিত এবং নদী, অপরাপর জলাশয়, মেঘসন্নিভ পর্ব্বত, বিবিধাকার নগর ও জনপদ-সমূহে সমাচ্ছন্ন; পুষ্প-ফলান্বিত বৃক্ষবৃন্দে সমুপেত; ধন-ধান্য-সম্পন্ন; চতুর্দ্দিকে লবণ-সমুদ্র দ্বারা উহা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। যে প্রকার পুরুষ দর্পণে আপন আনন দর্শন করেন, তদ্রূপ চন্দ্রমণ্ডলে উক্ত সুদর্শন-দ্বীপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।" এতদুক্তিতে আমরা কি বুঝিতে পারি? সুদর্শন-দ্বীপের আকার গোল, তাহার ছায়া চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্ট হয়,—সঞ্জয়ের এই উক্তিতে একটী অভিনব তথ্যের আবিষ্কার হয় না কি? আজকাল পৃথিবীর গোলত্ব-বিষয়ে আধুনিক ভূগোল-গ্রন্থ-সমূহে একটী প্রমাণ-স্বরূপ লিখিত হইয়া থাকে,—'গ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হইলে, সেই ছায়া বৃত্তাকারে দৃষ্ট হয়; পৃথিবী গোল না হইলে, কখনই এরূপ ছায়াপাত সম্ভবপর হইত না।' সঞ্জয়ের উল্লিখিত উক্তিতেও পুরাকালে এতদ্বিষয়ে আর্য্যগণের অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া মনে হয় না কি? * জম্বুদ্বীপ এবং তদন্তর্গত ভারতবর্ষের উক্ত পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া, সঞ্জয় অন্যান্য সপ্তদ্বীপের প্রসঙ্গও উত্থাপন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন,—সে সকল দ্বীপের বিষয়ে যাহা "শ্রুত" হইয়াছি, তাহাই নিবেদন করিতেছি। এতদুক্তিতে জম্বুদ্বীপ ভিন্ন অপরাপর দ্বীপের বিষয়ে সঞ্জয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়াই বুঝা যায়। এখন যেমন আমরা জম্বু-প্লক্ষাদি সপ্তদ্বীপের কথা শুনিয়া থাকি,—শাস্ত্রাদিতে পরিচয় পাই, তিনিও হয় তো সেইরূপ শুনিয়া—সেইরূপ পরিচয় পাইয়াই, ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয়—তখন অনেক পরিবর্ত্তনই সাধিত হইয়াছে।

* পৃথিবীর গোলত্ব-বিষয়ে এরূপ আর আর প্রমাণ এই পরিচ্ছেদের ৫০ পৃষ্ঠায় ও প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ভারত-প্রসঙ্গ

[পাশ্চাত্য-দেশে ভারতের ভৌগোলিক তত্ত্ব;—আলেকজাণ্ডার, সেলিউকাস, মেগাস্থিনীস, টলেমি, হুয়েন-সাং, ফা-হিয়ান, সুং-উং প্রভৃতির প্রসঙ্গ;—হুয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ,—এক স্থান হইতে তাঁহার অন্য স্থানে গতি-বিধির বিবরণ,—তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারতের তাৎকালিক জনপদাদির পরিচয়;—হুয়েন-সাং প্রভৃতির ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারতের এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব-নির্দ্ধারণ;—প্রাচীন ভারতের আকৃতি আলোচনা,—মহাভারতে ও বায়ুপুরাণে 'ধনুরাকার' ও 'আয়তাকার' শব্দ দৃষ্টে ভারতের আকৃতির ভাবোপলব্ধি,—কানিংহামের, গ্রীক-প্রত্নতত্ত্ববিদগণের এবং মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতের আলোচনা;—এরাটোস্থেনিস, ষ্ট্রাবো, সেলিউকাস নিকাটর, এণ্টিওকাস সোটর প্রভৃতির মতালোচনা এবং তাঁহাদের পরিচয়;—ভৌগোলিক-তত্ত্বে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন-প্রসঙ্গ;—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চীন-দেশীয় ভৌগোলিকগণের মতামত;—ভৌগোলিক-তত্ত্বে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন,—ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায় গ্রন্থে দিবারাত্রির পরিচয়-প্রসঙ্গে পৃথিবীর গোলত্ব ও গতির বিষয়ে পূর্ণ-জ্ঞানের পরিচয়।]

রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে ভারতবর্ষের নদ-নদী-পর্ব্বত ও জনপদ প্রভৃতির যে সকল বিবরণ প্রকটিত আছে, পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা সঙ্ক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছি। সেই সকল স্থান এখন রূপান্তরে নামান্তরে কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা অনুসন্ধান করা—পুরাবৃত্তের আলোচনায় একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বে কোন্ জনপদ কি নামে পরিচিত ছিল, পরবর্ত্তি-কালে কিরূপ-ভাবে তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এবং পরিবর্ত্তন-প্রবাহের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া এখন তাহা কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বুঝিতে হইলে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভ অবশ্য আবশ্যক। কিন্তু সে আলোচনায়, দূর অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে, প্রতি বিষয়ের প্রাচীন-কালের কি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরবর্ত্তিকালেরই বা কি পরিচয় বিদ্যমান আছে এবং এখনই বা তাহাদের কি পরিচয় দেখিতে পাই,—তাহা মিলাইয়া দেখার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মিলাইয়া সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই প্রাচীনের কোন্ ভিত্তির উপর অধুনা কিরূপ সৌধ বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সুতরাং পুরাণাদি গ্রন্থে কোন্ জনপদের কিরূপ পরিচয় আছে, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিয়া তৎসম্বন্ধে প্রাচীনকালের পরিব্রাজকগণের বা পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতামতের আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

ভৌগোলিক-তত্ত্বের সামঞ্জস্য-বিধান।

পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে ভারতের যে ভৌগোলিক-তত্ত্ব বিবৃত আছে, পাশ্চাত্য-দেশবাসীর নিকট বহু দিন পর্য্যন্ত তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল। ভারত-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-দেশবাসীর অভিজ্ঞতা-লাভের প্রথম সূত্রপাত—গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সময়ে। তাহার পূর্ব্বে, বহু কাল পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ-বন্ধন প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এককালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে ভারতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, লোকে সে কথা তখন প্রায়ই বিস্মৃত হইতেছিল। ভারতের ধনৈশ্বর্য্যের বিষয় তখন উপকথার ন্যায় নানা স্থানে প্রচারিত ছিল

পাশ্চাত্য-দেশে ভারতের ভৌগোলিক তত্ত্ব।

বটে; কিন্তু ভারত-সম্বন্ধে প্রকৃত অভিজ্ঞতা-লাভ কাহারও ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে নাই। ভারতের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের পথ সকলের পক্ষেই তখন কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছিল। মহাবীর আলেকজাণ্ডার সে পথ অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দেন। যদিও তিনি পঞ্চনদ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু পঞ্চনদ প্রদেশে অবস্থিতি-কালে তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ ভারত-সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। খৃষ্টজন্মের তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার পর, তাঁহার সেনাপতি সেলিউকাস ভারতবর্ষে আধিপত্য-বিস্তারে প্রয়াস পান। সেলিউকাসের দূতরূপে মেগাস্থিনীস (Megasthenes) ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর (৩১৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৩১২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) অবস্থিতি করেন। সেই সময় ভারতবর্ষের বহু স্থানের বিবরণ তিনি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। অবশেষে, সেলিউকাসের বংশধর সিরীয়া দেশের নৃপতিগণ উত্তর ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডারের অনুসন্ধান—সিন্ধুনদ ও তাহার শাখা-সমূহের অন্তর্গত সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সিরীয়ার 'সেলিউকাইড' (সেলিউকাস-বংশীয়) রাজগণ গঙ্গার উত্তরস্থিত অধিকাংশ জনপদের এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের বহু বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মধ্য-ভারতের কোনও কোনও স্থানের বৃত্তান্তও তাঁহাদের কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। সেই সকল বিবরণ অবলম্বন করিয়া মিশর-দেশের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ও ভৌগোলিক টলেমি (Ptolemy) * যে গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, ভারতের ভৌগোলিক-তত্ত্ব-আবিষ্কারে তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। টলেমির পর চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের (Hwen Thsang) অনুসন্ধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ—৩৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক ঘটনা। টলেমি ভূগোল-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—১৫০ খৃষ্টাব্দে। হুয়েন-সাং ভারতে প্রবেশ করেন—৬৩০ খৃষ্টাব্দে। তবেই বুঝা যায়—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় হইতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের ভারত-প্রবেশের মধ্যবর্ত্তিকালে টলেমির ভূগোল-গ্রন্থ প্রণীত হয়। সে হিসাবে, আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনের ৪৮০ বৎসর পরে টলেমির গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; এবং টলেমির গ্রন্থ-রচনার ৪৮০ বৎসর পরে হুয়েন-সাং ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন। হুয়েন-সাঙের পূর্ব্বে চীন-দেশ হইতে আরও দুইজন বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজক ভারতবর্ষে

* টলেমি নামে মিশর-দেশীয় তের জন নৃপতির এবং একজন ভৌগোলিকের ও জ্যোতির্ব্বিদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম টলেমি—ঐতিহাসিক বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে বিদ্বজ্জনের বিশেষ সমাদর ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া সহরের বিখ্যাত যাদুঘর ও পাঠাগার তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। জ্যামিতি-তত্ত্ববিৎ ইউক্লিড তাঁহারই আশ্রয় পাইয়া প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। প্রথম টলেমি আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ-যাত্রার ইতিহাস বর্ণনা করেন। গ্রীসদেশীয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আরিয়ান আপন গ্রন্থ রচনায় সেই ইতিহাস-কেই ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সপ্তম টলেমিও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ভৌগোলিক ও জ্যোতির্ব্বিদ টলেমি (Claudius Ptolemaeus) মিশরের 'থেবেত' প্রদেশের 'পেলুসিয়ম' বা 'টলেমেস' নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৯ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া সহরে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তির বিষয় প্রচারিত হয়। ১৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম—ফা-হিয়ান (Fa-Hian); অপর জনের নাম সুং-উং (Sung-Yun)। ফা-হিয়ান—৩৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধু-নদের উৎপত্তি-প্রদেশ হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মধ্যে যদিও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক-তত্ত্বের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না; কিন্তু তিনি যে সকল তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবরণীতে সেই সকল স্থানের এবং তাহাদের পরস্পর দূরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সে সকল বিবরণ, সংক্ষিপ্ত হইলেও, ভারতের পুরাতত্ত্ব আলোচনায় বিশেষ উপযোগী। সুং-উং ৫০২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তিনি কেবল পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং কাবুল উপত্যকায় অবস্থান করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বর্ণনার মধ্যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক-তত্ত্ব অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চীন-পরিব্রাজকগণের ভারতে আগমনের বহু পূর্ব্বে, পাটলিপুত্র নগরে অবস্থান-পূর্ব্বক মেগাস্থিনীস ভারতবর্ষের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—

মেগাস্থিনীসের বিবরণ।

ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র-বৃহৎ এক শত আঠারটী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই রাজ্যগুলির মধ্যে 'প্রাচ্য' বা মগধ-রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। যে সকল রাজ্যে মগধের প্রতাপ বিস্তৃত হয় নাই, তাহার অধিকাংশ রাজ্যেই একরূপ স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধিকাংশ রাজ্যের অধিবাসীরাই তখন আপনাদের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা আপনারা পাঁচ জনে পরামর্শ করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইত। মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র তখন সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ছিল। নগরটি সর্ব্বদা জনকোলাহলে পূর্ণ থাকিত। নগরের চারি পার্শ্বে কাষ্ঠের প্রাচীর—নগরটীকে সমান্তরাল ক্ষেত্র-রূপে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল। নগরের দৈর্ঘ্য আশী 'ষ্টেডিয়া'—প্রায় নয় মাইল; বিস্তৃতি পনের 'ষ্টেডিয়া'—অর্থাৎ প্রায় দুই মাইল। সেই আয়ত ক্ষেত্রের সমান্তরাল প্রাচীর-গাত্রে স্থানে স্থানে গবাক্ষ ছিল। শত্রুর অক্রমণ হইতে নগর-রক্ষার জন্য তীর-নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে সেই গবাক্ষ-পথগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাষ্ঠ-প্রাচীরকে ঘেরিয়া বিস্তৃত পরিখা নগরটী রক্ষা করিতেছিল। * মগধ-রাজ চন্দ্রগুপ্তের ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী এবং নয় সহস্র গজারোহী সৈন্য ছিল। দক্ষিণ-বঙ্গ প্রসঙ্গে মেগাস্থিনীস বলিয়াছেন,—'কলিঙ্গগণ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেন। মুণ্ডাগণ ও মল্লগণ গঙ্গা-নদীর মোহানার কিছু উত্তরাংশে বাস করিত। মদ-কলিঙ্গ-গণ (মধ্য-কলিঙ্গ?) গঙ্গার মোহানা-মধ্যস্থিত একটী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।' মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় দৃষ্ট হয়—তৎকালে কলিঙ্গ-দেশের রাজধানী 'পার্থলিস' নামে অভিহিত হইত। কলিঙ্গ-দেশের নৃপতিও প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি যাট হাজার পদাতিক, এক সহস্র অশ্বারোহী এবং সাত শত গজারোহী সৈন্য পোষণ করিতেন। মধ্য-কলিঙ্গের দক্ষিণে কতকগুলি শক্তিশালী জাতির বসতি ছিল। তাহাদের রাজার অধীনে

* পরবর্ত্তিকালে, পঞ্চম খৃষ্ট-শতাব্দীতে, চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এই প্রাচীর দর্শন করিয়াছিলেন। কত কালের প্রাচীর, কত কাল বিদ্যমান ছিল,—কে নির্ণয় করিবে?

পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, চারি হাজার অশ্বারোহী এবং চারি শত গজারোহী সৈন্য পরিচালিত হইত। তাহাদের দক্ষিণে অন্ধ্র-বংশীয়গণের রাজত্ব ছিল। অন্ধ্রগণ পূর্ব্বে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু মেগাস্থিনীসের ভারত-আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উত্তরে নর্ম্মদা-নদী পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। মেগাস্থিনীস লিখিয়া গিয়াছেন,—'অন্ধ্রগণ ঐ সময়ে বড়ই ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। অসংখ্য গ্রাম এবং ত্রিশটী প্রাকার-বেষ্টিত নগরী তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহাদের রাজার আবশ্যকানুসারে তাঁহারা লক্ষ পদাতিক, দুই সহস্র অশ্বারোহী এবং এক সহস্র গজারোহী সৈন্য সরবরাহ করিতে পারিতেন।' উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে সকল জাতি ঐ সময় প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মেগাস্থিনীস 'ইসারি' ও 'কসিয়ারি' জাতি-দ্বয়ের এবং কাশ্মীরের নিকটস্থ কয়েকটী জাতির নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মেগাস্থিনীসের হিসাবে, সিন্ধু-নদের পূর্ব্বোপকূল পর্য্যন্ত তখন মগধের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় উপলব্ধি হয়,—রাজপুতানার অধিকাংশ প্রদেশেই তখন অসভ্য বন্য-জাতি বসবাস করিত। রাজপুতানা প্রদেশের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—'ক্যাপিটালিয়া' (Capitalia) নামক এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে কতকগুলি জাতি বাস করে। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মেগাস্থিনীস-কথিত সেই পর্ব্বতকে আবু-পর্ব্বত এবং তৎপ্রদেশের অধিবাসিগণকে রাজপুত-জাতি বলিয়া অনুমান করেন। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় 'হোরাটো' (Horatoe) নামক এক প্রাচীন জনপদের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ সৌরাষ্ট্র-দেশ মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় ঐ নামে অভিহিত হইয়াছে। সমুদ্রের তীরে সেই 'হোরাটো' বা সৌরাষ্ট্র-দেশের রাজধানী ছিল। দিগ্দেশ হইতে বণিকগণ সেখানে বাণিজ্য করিতে আসিত। সে দেশের রাজার দেড় লক্ষ পদাতিক, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং ষোল শত গজারোহী সৈন্য ছিল। দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্য-জাতির বর্ণনা-প্রসঙ্গে মেগাস্থিনীস লিখিয়াছেন,—'ভারতবর্ষের মধ্যে এই রাজ্য স্ত্রীলোক-কর্ত্তৃক শাসিত হয়। হারকিউলিস * (Hercules) নামে ঐ দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা। হারকিউলিস সেই কন্যাকে বড়ই ভালবাসিতেন; তাই তিনি সেই কন্যাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কন্যার বংশধরগণ তিন শত সমৃদ্ধিশালী নগরের অধিপতি। তাঁহাদের পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা—দেড় লক্ষ; গজারোহী সৈন্যের সংখ্যা—পাঁচ শত।' পাণ্ড্য-রাজ্য প্রসঙ্গে হারকিউলিসের নাম উল্লেখ করিয়া মেগাস্থিনীস অনেককেই ধাঁধায়

* হারকিউলিস গ্রীক-দেশের সর্ব্ব-প্রধান বলশালী ও বীরপুরুষ। তাঁহার পিতার নাম—জিয়স (Zeus) এবং তাঁহার মাতার নাম—আল্‌কমেন (Alcmene)। হেরা (Hera) নামে তাঁহার এক পরম শত্রু ছিল। বালক-বয়স হইতেই হেরা হারকিউলিসকে হত্যা করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু হারকিউলিস সকল বিপদে পরিত্রাণ পাইয়া আপন বাহুবলের পরিচয় দেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি পশুচারণা করিতেন। রাজা থেস্পিয়সের রাজ্য সিংহ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে, হারকিউলিস সেই সিংহকে নিহত করিয়াছিলেন। থিব্‌স নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীসের ইতিহাসে তাঁহার দ্বাদশটি অলৌকিক কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বাল্য-জীবনের এবং বার্দ্ধক্যের অনেক ঘটনা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলীর সহিত মিলিয়া যায়। বাল্যে শ্রীকৃষ্ণের হত্যার জন্য পুতনাদি রাক্ষসীকে প্রেরণের ন্যায়, তাঁহার সংহার-সাধনোদ্দেশ্যে হেরা দুইটী সর্প প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কেলিয়াছেন। গ্রীসের পৌরাণিক উপাখ্যানে—হারকিউলিস বলবীর্য্যের অবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী, সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্রবান উন্নত-মনা ব্যক্তির আদর্শে গ্রীসে হারকিউলিসের সৃষ্টি। ভারতবর্ষে মহাভারতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ, গ্রীকগণ অনেকটা সেই আদর্শে হারকিউলিসের কল্পনা করিয়াছিলেন—অনুমান হয়। দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য-রাজ্য শ্রীকৃষ্ণের কোনও বংশধর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনীস হয় তো শ্রীকৃষ্ণের বলবীর্য্য ও গুণগ্রামের কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে 'হারকিউলিস' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। পাণ্ড্য-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইতিহাসে প্রকাশ,—শ্রীকৃষ্ণের অধিনায়কত্বে যাদবগণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া, গুজরাটের অন্তর্গত দ্বারকা-নগরে বসবাস আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহারা অধিক দিন সেখানে অবস্থান করিতে পারেন নাই। তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকা-নগরী সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। সেই অন্তর্বিপ্লবে যাঁহারা প্রাণ বাঁচাইয়া দ্বারকা হইতে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন, পরবর্ত্তিকালে দক্ষিণ-ভারতে তাঁহাদেরই কর্ত্তৃক পাণ্ড্য-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পাণ্ডবগণও যে বংশ-সম্ভূত, যাদবগণও সেই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—সুতরাং পাণ্ডবগণের সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা আপনাদের নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের 'পাণ্ড্য'-রাজ্য নাম রাখিয়াছিলেন। পাণ্ড্য-রাজ্যের রাজধানী "মাদুরা" নগর তাঁহাদের আদি-বাসস্থান মথুরার নামানুসারেই কল্পিত হওয়া সম্ভবপর। তাঁহাদের নবরাজধানী 'মথুরা'—কালে 'মাদুরা' নাম লাভ করিয়া থাকিবে। পাণ্ড্য-রাজ্যের স্ত্রী-রাজ্য নামকরণ হওয়ারও কারণ এই বলিয়া মনে হয়—যদুবংশ ধ্বংস হইলে, তদ্বংশীয় কোনও কন্যা বা শ্রীকৃষ্ণের কোনও দৌহিত্র কর্ত্তৃক ঐ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাহা হউক, পাণ্ড্যরাজ্যের বিবরণ প্রদান করিয়া পরে মেগাস্থিনীস লঙ্কা-দ্বীপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। মেগাস্থিনীস যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, লঙ্কাদ্বীপ তখন মগধ-বংশীয় কোনও হিন্দু-রাজার শাসনাধীন ছিল। মেগাস্থিনীস জানিতে পারিয়াছিলেন,—খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মগধের যুবরাজ বিজয়, আপন পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া, সিংহল-দ্বীপে গমন করিয়া, ঐ দ্বীপ অধিকার করিয়া বসেন। গ্রীকগণ সিংহল-দ্বীপকে 'তাপ্রোবেন' (Taprobane) নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। পালি-ভাষায় ঐ দ্বীপ 'তাম্বপন্নি' নামে পরিচিত; সংস্কৃতে উহার নাম—তাম্রপর্ণি। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় প্রকাশ,—তিনি যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন ঐ দ্বীপের এবং ভারতবর্ষের মধ্যে একটি নদী মাত্র ব্যবধান ছিল; ঐ দ্বীপে তখন সুবর্ণ ও বহু-মূল্য মুক্তাদি পাওয়া যাইত; ঐ দ্বীপের হস্তী ভারত-জাত সকল হস্তীর অপেক্ষা অনেক বড়। মেগাস্থিনীসের ভারত-আগমনের বহুকাল পরে 'ইলিয়ন' নামক আর একজন গ্রীক ঐতিহাসিক 'তাপ্রোবেন' বা লঙ্কা-দ্বীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন,—'পর্ব্বত-সমাকুল ঐ দ্বীপ তালবৃক্ষে পূর্ণ ছিল। দ্বীপের অধিবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরে বাস করিত। ঐ দ্বীপে তখন হস্তীর ব্যবসায় পূর্ণ-মাত্রায় চলিতেছিল। দ্বীপবাসীরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকা প্রস্তুত করিয়া সেই নৌকার সাহায্যে দ্বীপ-জাত হস্তিসমূহকে কলিঙ্গ-দেশের রাজার নিকট লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত।'

হুয়েন-সাংঙের ভারত-ভ্রমণ-কাহিনীতে প্রাচীন ভারতের বহু ভৌগোলিক বিবরণ ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। সুতরাং প্রাচীন নগর-জনপদের সহিত আধুনিক নগর-জনপদাদির সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে, হুয়েন-সাঙের ভ্রমণ-কাহিনী বড়ই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। হুয়েন-সাং—চীন-দেশীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজক। তিনি চীনদেশীয় তৃতীয় পরিব্রাজক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি প্রায় পনের বৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ভারতে অবস্থিতি-কালে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান গ্রন্থসমূহ প্রায়ই তিনি অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধদিগের পবিত্র তীর্থস্থান-সমূহ তিনি প্রায় সকলই দর্শন করিয়াছিলেন। ৬২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি কাবুল ও কাশ্মীর হইতে সিন্ধু-নদের ও গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত এবং নেপাল হইতে মাদ্রাজের সন্নিকটস্থ কাঞ্চীপুর পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করেন। উত্তর-পশ্চিম হইতে কাবুলের পথে, বামিয়ান দিয়া, ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মে মাসের শেষভাগে তিনি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পর বৎসর এপ্রেল মাসে 'অহিন্দ' নামক স্থানে তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন। কয়েক মাস তক্ষশীলায় (Taxila) অবস্থিতি করিয়া তিনি বৌদ্ধতীর্থ-সমূহ সন্দর্শন মানসে বহির্গত হন। অতঃপর কাশ্মীরে গমন পূর্ব্বক দুই বৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিষয়ক বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রাকালে প্রথমে সঙ্গোলার (Sangala) ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যান। আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-বিজয়ের ইতিহাসে সঙ্গোলা সুপ্রসিদ্ধ। চৌদ্দ মাস চীনাপটিতে (Chinapati) এবং চারি মাস জলন্ধরে অবস্থান পূর্ব্বক, ধর্ম্মশাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহ অধ্যয়ন মানসে, ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে, তিনি শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করেন। এই সময়ে কখনও তিনি পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আবার কখনও বা স্থানে স্থানে তীর্থ-দর্শনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে মথুরায় উপনীত হইয়া, তিনি উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। মথুরার দুই শত মাইল উত্তর-পশ্চিমে থানেশ্বর তীর্থক্ষেত্র; সেখান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যমুনা-তীরবর্ত্তী শ্রুঘ্ন (Srughna) নামক স্থানে, তৎপরে গঙ্গাতীরস্থিত গঙ্গাধর নামক তীর্থক্ষেত্রে গমন করেন। সেখান হইতে উত্তর-পাঞ্চাল (রোহিলখণ্ড) রাজ্যের রাজধানী অহিচ্ছত্রা নগরে উপনীত হন। সেখান হইতে পুনরায় গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পঞ্জাবের দোয়াব (Doab) বা বদ্বীপ প্রদেশে, সাঙ্কিশা (Sankisa) বা সাঙ্কাশ্যা, কনৌজ এবং কুশাম্বী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগর দর্শন করেন। অতঃপর উত্তরাভিমুখে অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইয়া, দুইটী পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন করিয়া, তিনি অযোধ্যা ও শ্রাবস্তী নগরীতে উপনীত হন। সেখান হইতে পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া, বুদ্ধের জন্মক্ষেত্র কপিলাবস্তু এবং তাঁহার তিরোভাব-স্থান কুশীনগর দর্শন করেন। আবার সেখান হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পবিত্র বারাণসী ধামে, যেখানে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথম আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন—সেই স্থানে, উপনীত হন। সেখান হইতে পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া, ত্রিহুত-প্রদেশস্থিত প্রসিদ্ধ বৈশালী নগরী দর্শন করিতে যান। বৈশালী হইতে নেপাল, নেপাল হইতে পুনরায় বৈশালীর পথে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গঙ্গা পার হইয়া পালিবোথ্‌রা

হুয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ।

(প্রাচীন পাটলিপুত্র) নগরীতে উপনীত হন। পাটলিপুত্র হইতে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র গয়া অভিমুখে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুদ্ধ-গয়ার সেই বটবৃক্ষমূলে, বুদ্ধদেব পাঁচ বৎসর কাল যেখানে যোগমগ্ন ছিলেন— সেখানে, হুয়েন-সাং কয়েক দিন অবস্থান করেন। অবশেষে গিরিয়ক (Giriyak) গিরিচূড়ায়, যেখানে বসিয়া বুদ্ধদেব ইন্দ্রদেবতার নিকট আপনার ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন—সেখানে, উপনীত হন। কয়েক দিন তথায় অবস্থানানন্তর, হুয়েন সাং গঙ্গা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী তীর্থস্থান-সমূহ দর্শন করিয়া, কুশাগরপুর (Kusagarapura) ও রাজগৃহ নামক মগধের প্রাচীন রাজধানীদ্বয় এবং নালন্দার সুপ্রসিদ্ধ মঠ পরিদর্শন করেন। নালন্দার মঠ—বৌদ্ধগণের শিক্ষার কেন্দ্র-স্থান বা বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে পরিগণিত ছিল। সেখানে পনের মাস অবস্থান করিয়া হুয়েন-সাং সংস্কৃত-সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। ৬৮৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, গঙ্গার তীরভূমি অবলম্বন করিয়া, তিনি মোদজিভি (Modagivi) ও চম্পা নগরে গমন করেন। গঙ্গা পার হইনা হুয়েন-সাং উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হন। অতঃপর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (মতান্তরে—পাবনা) এবং কামরূপ (আসাম) দর্শন করেন। এইরূপে ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তে উপনীত হইয়া, হুয়েন-সাং দক্ষিণাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। সামাতাতা (সমতট মতান্তরে যশোহর), তাম্রলিপ্ত (তমলুক) প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া, ৬৩৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তিনি দক্ষিণে ওড্র (উড়িষ্যা) দেশে উপনীত হন। এইরূপে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া, গঞ্জাম ও কলিঙ্গ দর্শন পূর্ব্বক, তিনি কোশল (মতান্তরে —বেরার) প্রদেশ দশন করেন। সেখান হইতে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, অন্ধ্র (তেলিঙ্গনা) এবং কৃষ্ণা নদীর তীরস্থিত ধানাকাকাতা (Dhanakakata, মতান্তরে—অমরাবতী) নগরে প্রবেশ করেন। অমরাবতীতে কয়েক মাস অবস্থান পূর্ব্বক তিনি বৌদ্ধ-সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছিলেন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে তিনি কাঞ্চীপুর (কাঞ্জেভরম) নগরে গমন করেন। সেই নগর 'দ্রাবিড়' (Dravida) প্রদেশের রাজধানী ছিল। কাঞ্চীপুর হইতে হুয়েন-সাং সিংহল-দ্বীপে গমন করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে সিংহল-দ্বীপের অধিপতি রাজা বুনামুগালান (Bunamugalan) ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে নিহত হন;—সিংহল-দ্বীপ অন্তর্ব্বিপ্লবে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং পরিব্রাজক সিংহল-যাত্রার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। দ্রাবিড় হইতে হুয়েন-সাং উত্তরাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। কঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র-দেশ অতিক্রম করিয়া তিনি নর্ম্মদা-তীরস্থিত বরোচ (Vharach) নগরে প্রবেশ করেন। সেখান হইতে উজ্জয়নী, বল্লভী এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ দর্শন করিয়া, ৬৪১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি সিন্ধুদেশের ও মুলতানের দিকে অগ্রসর হন। এই সময় সহসা তাঁহাকে মগধে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। নালন্দা এবং তিলোদকের মঠে অবস্থিতি করিয়া, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কয়েকটী প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইবেন—ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তৎকালে নালান্দায় 'প্রজ্ঞাভদ্র' নামক অতি-যশস্বী জনৈক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন। তাঁহার সহিত পরিব্রাজকের মতান্তর ঘটায়, তন্মীমাংসায় দুই মাস কাল সেই মঠে তিনি অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখান হইতে হুয়েন-সাং দ্বিতীয় বার এক

মাসের জন্ম কামরূপে গমন করেন। কামরূপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, ৬৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে, তিনি পুনরায় পাটলিপুত্র-নগরে উপনীত হন। তখন হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মগধাধিপতি বলিয়াও অভিহিত হইতেন। উত্তর-ভারতের অধিকাংশ দেশ তখন তাঁহার প্রাধান্ত স্বীকার করিত। প্রতি পঞ্চম বৎসরে তাঁহার রাজধানীতে একটা ধর্ম্মোৎসব হইত। সেই ধর্ম্মোৎসবের শোভা-যাত্রায় আঠার জন করদ-রাজা, হর্ষবর্দ্ধনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সহিত মিলিত হইয়া, উৎসবের শোভা-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে, পরিব্রাজক হুয়েন-সাং, প্রয়াগ, কুশাম্বী ও কনোজে গমন করিয়াছিলেন। কনোজে হর্ষবর্দ্ধনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, জলন্ধরাধিপতি রাজা ভাঁদভের সহিত তিনি উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন। এক মাস জলন্ধরে অবাস্থান-পূর্ব্বক, বহু-সংখ্যক ধর্ম্মগ্রন্থ ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি লইয়া, গজারোহণে হুয়েন-সাং স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। সিন্ধু-নদের তীরবর্ত্তী উটখণ্ডের বা অহিন্দের (Utakhanda or Ohind) নিকট সিন্ধুনদ পার হইবার সময় তাঁহার প্রায় পঞ্চাশ-খানি হস্ত-লিখিত পুঁথি জলমগ্ন হয়। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে হুয়েন-সাং সিন্ধু-নদ অতিক্রম করিয়াছিলেন। উটখণ্ডে পঞ্চাশ দিন অবস্থান করিয়া, জলমগ্ন পুঁথিগুলির পুনরায় নকল আনাইয়া, কপিসার রাজার সহিত তিনি প্রথমে লামঘানে (Lamghan) গমন করেন। সেখান হইতে প্রথমে ফালানা (Falana) বা বান্নু জেলার দক্ষিণ-ভাগে, পরিশেষে কাবুল ও গজনীর পথে, ৬৪৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথমে, তিনি কপিশায় (Kapisa) উপনীত হন। এইরূপে নানা স্থান অতিক্রম করিয়া, ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে হুয়েন-সাং পশ্চিম-চীনের রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন-সাং যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, ভারতবর্ষ তখন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্য,—এই পাঁচ বিভাগে এবং বিরাশীটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সকল রাজ্যই যে স্বাধীন রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহা নহে। কয়েক-জন প্রধান নৃপতির বশ্যতা স্বীকার করিয়া অপর সকলে আপন-আপন রাজ্য শাসন করিতেন। তখন উত্তরদিকস্থিত কাবুল, জেলালাবাদ, পেশোয়ার ও বান্নু প্রভৃতি স্থান, কপিশার রাজার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ছিল। পঞ্জাবের তক্ষশিলা, সিংহপুর উরষা, পুনাখ, রাজাওরি প্রভৃতি পার্ব্বত্য-প্রদেশ কাশ্মীরাধিপতির প্রাধান্ত স্বীকার করিত। মূলতান এবং শোরকোট (শিয়ালকোট) প্রভৃতি পঞ্জাবের সমগ্র সমতল প্রদেশ লাহোরের সন্নিকটস্থ সঙ্গোলার বা টাকীর রাজার অধিকার-ভুক্ত ছিল। পশ্চিম-ভারতের প্রদেশ-সমূহ—সিন্ধু, বল্লভী ও গুর্জ্জরের অধিপতি-ত্রয় বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। মধ্য ও পূর্ব্ব-ভারতে থানেশ্বর হইতে গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত এবং হিমালয় পর্ব্বত হইতে নর্ম্মদা ও মহানদীর তীর-দেশ পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ কনোজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। পঞ্জাবের পূর্ব্ববর্ত্তী জলন্ধর-প্রদেশ হর্ষবর্দ্ধনেরই আনুগত্য স্বীকার করিত। টাকী বা সঙ্গোলার নৃপতিও কনোজাধিপতির প্রাধান্ত স্বীকার করিতেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—কনোজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন, সঙ্গোলা-দেশের মধ্য দিয়া এক বার কাশ্মীর পর্ব্বতের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত সৈন্ত পরিচালনা করেন। তদ্দেশীয়

নৃপতির নিকট হইতে বুদ্ধদেবের অতি-পবিত্র দন্ত গ্রহণ করাই তাঁহার এই যুদ্ধ-যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। সঙ্গোলা-রাজ্যের মধ্য দিয়া সৈন্যদল পরিচালনা করিতে সমর্থ হওয়ায়, তৎপ্রদেশেও কনোজাধিপতির প্রাধান্য প্রতিপন্ন হয়। দক্ষিণ-ভারতের মহারাষ্ট্র-দেশের রাজপুত-নৃপতিগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। কনোজাধিপতির আক্রমণে বাধা-প্রদানে তাঁহাদের সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র-দেশীয় চৌলুক্য-নৃপতিগণের নিকট হর্ষবর্দ্ধনের পরাজয়-বিবরণ বহু খোদিত প্রস্তর-লিপিতে লিখিত আছে। যাহা হউক, কনোজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে যে প্রবলপ্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। ভারতের অন্যূন ছত্রিশ জন নৃপতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, অর্দ্ধ-ভারত তাঁহার করতলগত হইয়াছিল, সমধিক উর্ব্বর ও ধন-ধান্য-শালী প্রদেশ তাঁহার অধিকার-ভুক্ত ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। হুয়েন-সাঙের ভারতে অবস্থিতি-কালে, ধর্ম্মোৎসব সময়ে, পাটলিপুত্র হইতে শোভা-যাত্রা করিয়া তিনি কনোজে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় অষ্টাদশ জন নৃপতি তাঁহার অনুগমন করেন। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর, দক্ষিণ-পশ্চিমে মহারাষ্ট্র-দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে গঞ্জাম পর্য্যন্ত—রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ নয় জন প্রধান নৃপতির শাসনাধীন ছিল। দাক্ষিণাত্যের উত্তর-ভাগে মহারাষ্ট্র ও কোশল, মধ্য-ভাগে কলিঙ্গ, অন্ধ্র, কঙ্কণ ও ধানকাকাতা, দক্ষিণে গোরিয়া (Goria), দ্রাবিড় এবং মালাকুতা প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। হুয়েন-সাঙের ভারত-আগমন-কালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে, ভারতবর্ষের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ফা-হিয়ান ও হুয়েন-সাং প্রমুখ চীন-দেশীয় পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতি-বিধির সময়ে সেই সেই স্থানের দূরত্বের বিবরও যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়ান দূরত্বের পরিচয়-প্রসঙ্গে 'যোজন' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সুং-উং এবং হুয়েন-সাং চীন-দেশের পরিমাণ 'লি' শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে এতদ্দেশে 'ক্রোশ' শব্দ ও তাহার পরিমাণ প্রচলিত থাকিলেও তাঁহারা সে শব্দ বা পরিমাপ ব্যবহার করেন নাই। হুয়েন-সাং সাধারণতঃ চীন-দেশীয় চল্লিশ 'লি'তে এক যোজন ধরিয়া লইয়াছেন; তাঁহার বর্ণনায় সেইরূপ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ফা-হিয়ানের পরিগৃহীত 'যোজন' এবং হুয়েন-সাঙের 'লি'—পরিমাপ-দ্বয়ের সামঞ্জস্য-সাধন করিতে চেষ্টা পাইলে, লি ও যোজনের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। মোটামুটি তাহার আভাস দিবার জন্য আমরা নিম্নে ফা-হিয়ান এবং হুয়েন-সাঙের বর্ণিত কয়েকটী প্রসিদ্ধ স্থানের দূরত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দূরত্ব-পরিচয়।

স্থান।	ফা-হিয়ানের মতে দূরত্ব।	হুয়েন-সাঙের মতে দূরত্ব।
১। শ্রাবস্তী হইতে কপিল	১৩ যোজন	৫০০ লি
২। কপিল হইতে কুশীনগর	১২ যোজন	৪৮৫ লি
৩। নালন্দ হইতে গিরিয়ক	১ যোজন	৫৮ লি
৪। বৈশালী হইতে গঙ্গাতীর	৪ যোজন	১০৫ লি
	মোট ৩০ যোজন =	১১৪৮ লি

ত্রিশ যোজনে ১১৭৮ লি হইলে, এক যোজনে ৩৯।॰ লি হয়। সুতরাং হুয়েন-সাং ও ফা-হিয়ানের হিসাব মিলাইলে মোটামুটি প্রায় ৪॰ চল্লিশ 'লি'-তেই এক যোজন দাঁড়াইতেছে। তবে যে এক এক স্থানের দূরত্বে সামান্য ইতর-বিশেষ দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ—একজন হয় তো সোজা পথে সেই স্থানে পৌছিয়াছিলেন, আর অপর জনকে হয় তো বক্রপথে সেই স্থানে যাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কয় ক্রোশে এক যোজন এবং কত ফিটে বা কয় মাইলে এক ক্রোশ হয়, তদ্বিষয়ে তখনও মত-বিরোধ ছিল, এখনও মত-বিরোধ রহিয়াছে। প্রদেশ-ভেদে ক্রোশের ও যোজনের নানারূপ পরিমাপের বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে। কোনও মতে আট ক্রোশে, কোনও মতে সাড়ে চারি মাইলে (২৪,০০০ ফিটে), কোনও মতে বা চারি ক্রোশে, এক যোজন হয়। ক্রোশ সম্বন্ধেও এইরূপ মতান্তর। মেগাস্থিনীসের হিসাব অনুসারে ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন,—'এক ক্রোশ, ছয় হাজার ফিটের কিছু উপর।' মেগাস্থিনীস দেখিয়াছিলেন,—'পালিবোথ্‌রা' হইতে প্রতি দশ 'ষ্টেডিয়া' * অন্তরে রাজপথে সর্ব্বত্র এক একটী স্তম্ভ প্রোথিত রহিয়াছে। ফিটের মাপে স্তম্ভ-সমূহের পরস্পর দূরত্ব—৬,০৬৭॥॰ ফিট হয়। ভারতবর্ষের সাধারণ মাপ অনুসারে, চারি সহস্র 'হস্তে' অর্থাৎ ৬০৫২ ফিটে এক ক্রোশ। মোটামুটি এই মাপ ধরিলে, প্রতি ক্রোশে এক একটী স্তম্ভ ছিল, বলিতে পারা যায়; আর তাহা হইলে, ২৪ হাজার ফিটে বা ৪॥॰ মাইলে এক যোজন হয়। কিন্তু চীন-পরিব্রাজকগণের প্রদত্ত দূরত্বের হিসাব করিতে গেলে ৬॥॰ হইতে ৮॥॰ মাইলের মধ্যে যোজন দাঁড়াইতে পারে। যাহা হউক, ফা-হিয়ান এবং হুয়েন-সাঙের প্রদত্ত যোজন এবং 'লি'-র আলোচনায় কানিংহাম কতকগুলি স্থানের যে দূরত্ব-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েকটী স্থানের বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

স্থান।	ফা-হিয়ানের মতে দূরত্ব।	বৃটিশ মাইলে তাহার হিসাব।
ভেড়া হইতে মথুরা	৮০ যোজন	৫০৬ মাইল
মথুরা হইতে সাঙ্কাশ্য	১৮ যোজন	১১৫৫৮০ মাইল
সাঙ্কাশ্য হইতে কনোজ	৭ যোজন	৫০ মাইল
বারাণসী হইতে পাটনা	২২ যোজন	১৫২ মাইল
পাটনা হইতে চম্পা	১৮ যোজন	১৩৬।॰ মাইল
চম্পা হইতে কামরূপ	৫০ যোজন	৩১৬ মাইল
নালন্দা হইতে গিরিয়ক	১ যোজন	৯ মাইল

ঐ সকল স্থানের মোট দূরত্ব—১৯৬ যোজন অথবা ১৩১৪।॰ মাইল হয়। ইহাতে ফা-হিয়ানের যোজন—৬.৭১ মাইলে গিয়া দাঁড়াইতেছে। বলা বাহুল্য, ফা-হিয়ান কোন্ পথে কি ভাবে পরিমাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পরবর্ত্তিকালে ঐ সকল স্থানের দূরত্বের যে মাপ লওয়া হয়, তাহার সহিত তুলনা করিয়াই ঐরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে। এদিকে আবার হুয়েন-সাং কতকগুলি স্থানের যেরূপ দূরত্বের বিষয়

* ষ্টেডিয়া—গ্রীস-দেশের মাপ বিশেষ। ইংরাজী হিসাবে ৬০৬ ফিট ৯ ইঞ্চিতে এক 'ষ্টেডিয়ম' (Stadium) হয়। এক মাইলে ১৭৬০ গজ বা ৫২৮০ ফিটে এক ইংরাজী মাইল হয়। ষ্টেডিয়মের বহুবচনে ষ্টেডিয়া।

ভারতবর্ষের আকৃতি।

(পৃথিবীর ইতিহাসের জন্য অঙ্কিত)

আলেকজেণ্ডারের বর্ণনায়

মহাভারতের বর্ণনানুসারে

বরাহমিহিরের বর্ণনায়।
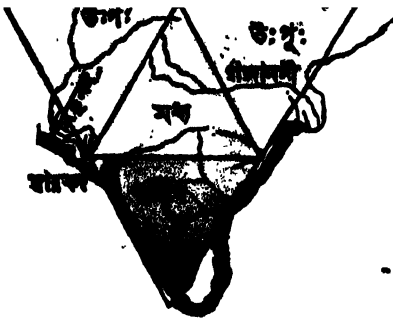
টলেমির বর্ণনায়।
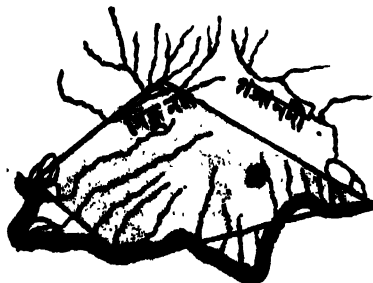
করিয়াছেন, তাহাতে প্রায় ছয় 'লি'-তে এক মাইল দাঁড়াইতে পারে। সে কয়েকটী হুয়েন-সাং-প্রদত্ত দূরত্বের এবং পরবর্ত্তি-কালের পরিমাপের পরিচয় এইরূপ,—

স্থান।	হুয়েন সাঙের মতে দূরত্ব	বৃটিশ মাইলে তাহার হিসাব।
মাদাওয়ার হইতে গবিষণ	৪০০ লি	৬৬ মাইল
কুশাম্বী হইতে কুশপুর	৭০০ লি	১১৪ মাইল
শ্রাবস্তী হইতে কপিল	৫০০ লি	৮৫ মাইল
কুশীনগর হইতে বারাণসী	৭০০ লি	১২০ মাইল
বারাণসী হইতে গাজীপুর	৩০০ লি	৪৮ মাইল
গাজীপুর হইতে বৈশালী	৫৮০ লি	১০৩ মাইল

ইহাতে ৩,৩৬০ লি এবং ৫৬৭ মাইল দাঁড়াইতেছে। এ হিসাবে, এক মাইলে ৫·২৫ লি অর্থাৎ প্রায় ৬-লি দাঁড়াইতে পারে। কোন্ পথে কি ভাবে কখন মাপ লওয়া হইয়াছিল, তাহার কোনও নিদর্শন নাই। সুতরাং মাপের হিসাবে ইতর-বিশেষ হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রাচীন ভারতের আকৃতি বিষয়ে অধুনা কতই বিচার-বিতর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। পুরাকালে কোন্ সময়ে ভারতের কিরূপ আকার নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

প্রাচীন ভারতের আকার।

কেহ বলেন,—এক গোলাকার ভূ-খণ্ড ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইত। কেহ বলেন,—এক চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্রকে ভারতবর্ষ বলিত। কেহ বলেন,—ভারতবর্ষ ত্রিভুজাকারে বিদ্যমান ছিল। পুরাণাদি গ্রন্থে ভারতবর্ষের ত্রিবিধ আকারেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন,—"জম্বু-খণ্ডের সর্ব্বোত্তর দিকে অবস্থিত ঐরাবতবর্ষ এবং সর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ভারতবর্ষ। এই দুই বর্ষের আকৃতি ধনুকের আকার।" কিন্তু ধনু আকারে অবস্থিত বলিলে, অনেক কথাই বুঝাইতে পারে। হিমালয় পর্ব্বতকে জ্যা বা ধনুর ছিলা স্বরূপ কল্পনা করিয়া লইলে, দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে কিছু দূরে সীমানা শেষ হইয়া যায়। কিন্তু সিংহল, যব-দ্বীপ প্রভৃতি যদি সেই ধনুর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে বিষুব-রেখা পার হইয়া দক্ষিণ-মেরু পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিস্তৃতি অসম্ভব হয় না। মহাভারতে ভারতবর্ষের এই ধনুর আকৃতির পরিচয় পাইয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সমবাহু ত্রিভুজের কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম লিখিয়াছেন,—'এক সময়ে ভারতবর্ষের আকৃতি সমবাহু ত্রিভুজের ন্যায় ছিল এবং সেই ত্রিভুজ আবার সমভাগে বিভক্ত হইয়াছিল,—মহাভারতে এরূপ বর্ণিত আছে।' * অবশ্য কানিংহাম স্বয়ং মহাভারত পাঠ করিয়া এ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—কোলব্রুক সাহেব মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্ব হইতে ঐ মর্ম্মের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া উইলফোর্ডকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার উপর নির্ভর করিয়া "এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে" উইলফোর্ড এক প্রবন্ধ লেখেন।

* "At a somewhat later date the shape of India is described in the 'Mahabharata' as an equilateral triangle, which was divided into four smaller equal triangles. The apex of the triangle is Cape Comorin, and the base is formed by the line of the Himalaya mountains."—Maj.-Gen. Alexander Cunningham, *The Ancient Geography of India, Vol. I.*

সেই প্রবন্ধই কানিংহামের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি। যাহা হউক, কানিংহাম বলেন,—'মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বের যে অংশে ভারতবর্ষকে সমবাহু ত্রিভুজরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেখানে ভারতবর্ষের সীমানার কোনও পরিমাপ উল্লিখিত হয় নাই অথবা ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোনও জনপদাদির নামও লিখিত নাই।' আমরা কিন্তু মহাভারতের ভীষ্ম-পর্ব্বের মূলে কোথাও কানিংহাম-কথিত ভারতবর্ষের আকৃতির পরিচয় পাইলাম না। 'ভারতবর্ষ ধনুরাকারে অবস্থিত'—ভীষ্ম-পর্ব্বে এইমাত্র লিখিত আছে। তাহা হইতেই বোধ হয় পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সমবাহু ত্রিভুজের কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য সে অর্থ যে তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, তাহা মনে করি না। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ অনেকটা সেই অর্থই সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূলে আছে,—

"ধনুঃসংস্থে মহারাজ দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে। ইলাবৃতং মধ্যমং তু পঞ্চবর্ষাণি চৈব হি॥
উত্তরোত্তরমেতেভ্যো বর্ষমুদ্রিচ্যতে গুণৈঃ। আয়ুঃ প্রমাণমারোগ্যং ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের টীকায় মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"ধনুঃসংস্থে ধনুষ্কোটী, সংস্থাশব্দঃ সমাপ্তি-বচনঃ। সন্তিষ্ঠতেঽগ্নিহোত্রমিত্যাদি প্রয়োগদর্শনাৎ। তেন মিশ্রিতধনুষ্কোটিদ্বয়াকারে ইত্যর্থঃ। শার্ঙ্গস্য হি ধনুষো দ্বে কোটী একীকৃতে ভবতস্তদা মধ্যে কিঞ্চিন্নতং ত্রিকোণং ভবতি অতএব রামসেতৌ ধনুষ্কোটিশব্দেনৈব রত্নাকরমহোদধ্যাখ্য সমুদ্রদ্বয়সঙ্গমপ্রদেশো ব্যবহ্রিয়তে। এবমাকারং দক্ষিণে ভারতবর্ষমুত্তরে ঐরাবতং চ মধ্যে পঞ্চেতি সপ্তবর্ষাণি॥"—মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৩৮শ-৩৯শ শ্লোকের টীকা।

ধনু আকর্ষণ করিলে তাহার অগ্রভাগদ্বয় নিকটস্থ হয় এবং জ্যা (ছিলা) নত হইয়া ত্রিকোণাকার ধারণ করে। "ধনুঃসংস্থে" শব্দে সেই ভাব উপলব্ধি হইতে পারে এবং তাহা হইলে, ভারতবর্ষের ত্রিকোণত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে না। তবে ইহাতে সমবাহু ত্রিভুজের কল্পনা কি প্রকারে করা যায়, বুঝিতে পারি না। এইরূপ ধনুরাকারে অবস্থিতির বিষয় দেবী-ভাগবতেও (অষ্টম স্কন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়) বর্ণিত আছে। সেখানে নারদের নিকট শ্রীনারায়ণ বলিতেছেন,—"জম্বুদ্বীপের নয়টী বর্ষের মধ্যে দুইটী বর্ষ দক্ষিণ ও উত্তর সীমায় ধনুরাকারে রহিয়াছে।" এখানে অবশ্য ভারতবর্ষের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অধ্যায়টী পাঠ করিলে, উহাতেও ভারতবর্ষেরই কথা বলা হইয়াছে, বুঝা যায়। মহাভারতের আর এক স্থলে এবং বায়ুপুরাণে ভারতবর্ষের আকৃতির অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে প্রোক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই লিখিত আছে,—"প্রাগায়তাঃ" অর্থাৎ ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে আয়ত-ক্ষেত্র। বায়ুপুরাণের (পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের) দুইটী শ্লোকে ঐরূপ আয়ত আকারেরই পরিচয় পাই। তাহাতে লিখিত আছে,—"ভারতবর্ষ দক্ষিণোত্তরে সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহা কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত আয়ত এবং নবসহস্র যোজন পর্য্যন্ত উত্তর দিকে তীর্য্যক্‌ভাবে বিস্তীর্ণ। এই নবম দ্বীপ ভারত তীর্য্যক্‌ভাবে আয়ত এবং ইহা সম্রাটের ন্যায় সর্ব্বপ্রকর্ষে বর্ত্তমান।"

* শ্লোক দুইটী এই,—

"আয়তো হ্যাকুমারিক্যাদাগঙ্গাপ্রভবাচ্চ বৈ। তির্য্যগুত্তরবিস্তীর্ণঃ সহস্রাণি নবৈব তু॥"
"দ্বীপো হ্যুপনিবিষ্টোঽয়ং নবমো দ্বীপস্তির্য্যগায়াত উচ্যতে। কৃৎস্নং জয়তি যো হ্যেনং স সম্রাড়িহ কীর্ত্ততে॥"

'আয়ত' শব্দ দৃষ্টে ভারতবর্ষের আকার এক সময়ে চতুর্ভুজের ন্যায় ছিল, ইহাই উপলব্ধি হয়। 'আয়ত' শব্দের অর্থ,—'সমকোণ-বিশিষ্ট বিষম বাহু চতুর্ভুজ-ক্ষেত্র।' ইহাতে ভারতবর্ষের আকৃতির বিষয় কি বুঝিতে পারি? কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সকল স্থান ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত, অথচ ভারতবর্ষ আয়ত,—এরূপ বর্ণনায় বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, আনাম এবং মালয় উপদ্বীপ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আকারে আয়ত-ক্ষেত্রের কল্পনা করা সুকঠিন। তবে মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এই 'আয়ত' শব্দের আলোচনায়ও ভারতবর্ষের ত্রিকোণত্বের ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন।

"প্রাগায়তাঃ পূর্ব্বপশ্চিমসমুদ্রস্পর্শিনঃ। অত্রেয়ং শাস্ত্রানুভবয়োরবিরোধেন ভূকল্পনা প্রতিভাতি। যথা হস্তমাত্রস্য চতুরস্রস্য চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলানি পরিণাহঃ ষণ্নবত্যঙ্গুলানি পরিধিঃ কিঞ্চিন্ন্যূনানি চতুস্ত্রিংশদঙ্গুলানি কর্ণো ভবতি। এবম্ অষ্টাদশ সহস্রানি ষট্-শতানি চ জম্বুপঞ্চস্রাজিতায়া ভুবঃ প্রমাণমুক্তং তদেবাত্র পরিধিত্বেন কল্পিতং তচ্চতুর্থাং-শত্বেন চত্বারি সহস্রাণি ষট্‌শতানি পঞ্চাশচ্চ যোজনান্যেকৈকো ভুজ ইতি তদেব সমচতুরস্রস্য বিষ্কম্ভপ্রমাণম, অস্য কর্ণঃ শুল্বশাস্ত্রোক্তরীত্যা ষট্‌সহস্রাণি পঞ্চশতানি ষট্‌সপ্ততিশ্চ যোজনানি তস্যাস্য ভূচতুরস্রস্য চতুর্ভিঃ সমুদ্রৈর্ব্বেষ্টিতস্য কোণা দিক্ষু বর্ত্তন্তে তেন দক্ষিণস্যাং দিশি রামসেতৌ দ্বয়োঃ সমুদ্রয়োঃ সন্ধিঃ এবমিতরাস্বপি দিক্ষু সমুদ্র-সঙ্গমো জ্ঞেয়াঃ। যত্তত্র জ্যোতির্ব্বিদাং ভূপরিধিঃ সপ্তাঙ্গনন্দাব্ধিযোজন-(৪৯৬৭)-সম্মিতোহত্তিনতঃ স এবাস্মাকং চতুরস্রবিষ্কম্ভঃ খবাণরসবেদমিতঃ (৪৬৫০)। যত্ত্ এতয়োরন্তরং সপ্তেন্দুরামাঃ (৩১৭) তদপি যজমানেনোর্দ্ধবাহুনা প্রপদোচ্ছ্রিতেন সমপাদস্থিতেন বা উন্মিতস্য সূত্রস্য যঃ পঞ্চমোহংশঃ স হস্ত ইতি বিকল্পস্য কাত্যায়নাদিভিরুক্তত্বাদ্ধস্তপ্রমাণভেদকল্পনয়া যোজনবহুত্বাল্পত্ববচনেন সমাধেয়ম্। তথা ভূমেশ্চতুরস্রত্বেহপি তন্মধ্যস্থমত্যুচ্ছ্রিতং মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বতঃ সূর্য্যস্য মার্গো মণ্ডলাকারোহস্তীতি ন বৌদ্ধাভিমতং সূর্য্যদ্বয়ং কল্প্যং ভবতি। অন্যৎ সর্ব্বং যুক্ত্যবিরুদ্ধং জ্যোতির্ব্বিন্মতমেবাত্রানুসর্ত্তব্যম্। যত্ত্ পুরাণে পঞ্চাশৎকোটি যোজনং ভূগোলপ্রমাণমিত্যুক্তং তদপ্যচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ সাধয়েদিত্যানেনৈব প্রত্যুক্তম। অবস্থিতত্বাম্মতানামনির্ব্বচনীয়বাদ এব শরণীকরণীয় ইত্যেব বরম্। যথা সর্ব্বত্র যৎপ্রমাণং দৃষ্টং তদ্বিংশাংশেন তদ্বোধ্যং তেন পঞ্চাশৎকোটিস্থানে সার্দ্ধকোটিদ্বয়বিস্তারা ভূমিঃ। লক্ষস্থানে পঞ্চসহস্র বিস্তারো জম্বুদ্বীপঃ। নবসহস্রস্থানে সার্দ্ধচতুঃশতযোজনায়ামং ভরতখণ্ড-মিতি। অস্মিন্ পক্ষে উদাহরিষ্যমাণবৈষ্ণবাদিবাক্যেভ্যো জম্বুদ্বীপশ্চতুর্দলকমলাকার তস্যাস্রান্তঃ পরিধিঃ ষট্‌শতাধিকাগুষ্টাদশযোজনসহস্রানি। ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি মধ্যব্যাসঃ। তেন ফলতঃ পঞ্চসহস্রব্যাসতা জ্ঞেয়া। এবং সতি যদা প্রাগায়তো হিমাচলঃ পূর্ব্বপশ্চিম সমুদ্রৌ স্পৃষ্টাস্তি তদায়ং ভারতবর্ষস্ত্রিকোণো ভবতি তেন পৃথিবী ত্রিকোণেতি লোকপ্রবাদোহপ্যনুভবশ্চানুগৃহীতো ভবতি। অন্যথা ভারতবর্ষস্য ধনুরাকারত্বে ভূমধ্যরেখায়াঃ লঙ্কাতঃ সেতুমার্গেণ প্রস্থিতায়াঃ পুরী রক্ষসাং দেবকন্যাথ কাঞ্চী সিতঃ পর্ব্বতঃ পর্য্যালী বৎসগুল্মম্। পুরী চোজ্জয়িনাহ্বয়া গর্গরাটং কুরুক্ষেত্রমেবা ভুবো মধ্যরেখেতি স্মর্য্যমাণয়া মধ্যরেখয়া কুরুক্ষেত্রস্য রামসেতুঃ সন্নিহিতো দ্বারকা চ দূরে স্যাৎ। দ্বারকাসমীপে সেতুশ্চ দূরে ইতি প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে। ভারতবর্ষস্য ত্রিকোণত্বমিত্যেবৈব কল্পনা সাধীয়সীতি দিক্।" ভীষ্মপর্ব্ব, ৬ষ্ঠ অঃ, টীকা।

উপরি-উদ্ধৃত টীকায় নীলকণ্ঠ 'আয়ত' শব্দে ভারতের ত্রিকোণত্ব-প্রমাণের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-দেশের ভৌগোলিকগণের কেহ কেহ ভারতবর্ষকে আয়ত চতুর্ভুজ-

ক্ষেত্ররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গ্রীস-দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কাহারও কাহারও বর্ণনায় ভারতবর্ষকে আয়ত-ক্ষেত্র বলা হইয়াছে, দেখিতে পাই। এরাটোস্থেন্স (Eratosthenes) * এবং অন্যান্য গ্রীক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ লিখিয়া গিয়াছেন,—'ভারতবর্ষের আকার আয়ত—অসমবাহু চতুর্ভুজের ন্যায়।' পশ্চিমে সিন্ধু-নদ, উত্তরে গিরিশ্রেণী, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সমুদ্র,—এরাটোস্থেন্স এতৎসীমান্তর্ব্বর্ত্তী বিভাগকে ভারতবর্ষ বলিয়া প্রথম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতবর্ষের যে সকল ভৌগোলিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেনাপতি ও উত্তরাধিকারিগণ যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া যান, এরাটোস্থেন্স এবং ষ্ট্রাবো † তৎসমুদায় আলোচনা করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো-প্রণীত 'জিয়োগ্রাফিয়া' গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—ভারতবর্ষের ভৌগোলিক-তত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের সকল দেশের সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলিউকাস নিকাটর (Seleukus Nikator) ‡ এবং তৎপুত্র এণ্টিওকাস সোটর (Antiochus Soter) § যখন সিরীয়া-সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের অধীনে সিরীয়ার উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশ পেট্রোক্লস (Patrokles) নামক জনৈক শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন ছিল। জেনোক্লস

---

* এরাটোস্থেন্স—গ্রীস-দেশের এক জন বিখ্যাত গ্রন্থকার। তিনি ভাষাবিজ্ঞানবিৎ বলিয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ২৭৬ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে সাইরিনে তাঁহার জন্ম হয়। মিশর-রাজ 'টলেমি ইউয়ার জেটেস' আলেকজান্দ্রিয়া নগরীস্থ পাঠাগারের তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহাকে সেখানে লইয়া যান। জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া এরাটোস্থেন্স ৮০ বৎসর বয়সে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ে এবং ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর সীমা-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহার গণনাক্রমে পৃথিবীর পরিধি—২৫২,০০০ ষ্টেডিয়া। প্লিনির মতানুসারে উহাতে ৩১, ৫০০ রোমান মাইল হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগারে যত কিছু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং জনপদাদির বিবরণ-সম্বলিত পুস্তক ছিল, সেই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া, এরাটোস্থেন্স তৎসমুদায়ের এক ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

† ষ্ট্রাবো—খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভৌগোলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মাতা গ্রীসদেশীয় এবং মিথ্‌রেডেটিসের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার পিতৃপরিচয় অপরিজ্ঞাত। ২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূগোল-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। সতের খণ্ডে তাঁহার গ্রন্থ বিভক্ত। তাহার প্রথম দুই খণ্ডে ভূমিকা; তৎপরবর্ত্তী আট খণ্ডে ইউরোপের বিবরণ, ছয় খণ্ডে এসিয়া মহাদেশের প্রসঙ্গ, এবং অবশিষ্ট কয়েক খণ্ডে আফ্রিকার বিষয় লিখিত হয়।

‡ সেলিউকাস (প্রথম)—'নিকাটর' নামেও পরিচিত। তিনি ৩৫৮ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি বলিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ। আলেকজাণ্ডারের পরিত্যক্ত বিস্তৃত রাজ্যের তিনি অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ব্যাবিলনে তাঁহার প্রথম রাজ্য স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ সুসিয়ানা ও মিডিয়া অধিকার করিয়া, তিনি উত্তরে অক্সাস এবং দক্ষিণে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে তাঁহার ভারত-আগমনের বিষয় প্রাচীন ইতিহাসে বিশেষ-ভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ২৮০ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে টলেমি সারানস তাঁহাকে হত্যা করেন।

§ এণ্টিওকাস সোটর—সেলিউকাসের পুত্র। পারস্যের রাজ-কন্যার সহিত আলেকজাণ্ডার আপন সেনাপতি সেলিউকাসের বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই পারসীক-রাজ-কন্যার গর্ভে সোটর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার হত্যার পর তিনি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। গল-গণ কর্তৃক এক সময়ে এসিয়া-মাইনর

(Xenokles) সেই সময়ে সিরীয়-নৃপতিগণের ধনাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলেকজাণ্ডার এবং তাঁহার পরিবর্ত্তিকালের ভারতবর্ষের বিবরণাবলী জেনোক্লসের নিকট হইতেই পেট্রোক্লস প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্বদেশ-সম্বন্ধে এইরূপে পেট্রোক্লস যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এরাটোস্থেনিস এবং ষ্ট্রাবো তাহা মিলাইয়া, তৎসমুদায় নির্ভুল বলিয়া স্বীকার করেন। প্রাচীন গ্রীসে ভারতবর্ষের বিবরণ সম্বন্ধে আর এক গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই গ্রন্থের নাম "ষ্টাথ্মি" (Stathmi) অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সৈন্য-পরিচালনার বিবরণ। 'আমিণ্টাস' (Amyntas) নামা জনৈক মাকিদন-বাসী ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। কথিত হয়, আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ অভিমুখে সৈন্য-পরিচালনা করেন, সেই সময়ে ডায়গনেটাস (Diognetus) এবং বেটন (Baiton) তাঁহার পরিদৃষ্ট দেশ-জনপদাদির দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতির পরিমাণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পরিমাণ অবলম্বন করিয়াই 'ষ্টাথ্মি' গ্রন্থ বিরচিত হয়। সেলিউকাস নিকাটরের দূতরূপে মেগাস্থিনীস যখন পালিব্রোথ্রা (মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র) নগরে আগমন করেন, তিনিও 'ষ্টাথমির' বিবরণীর পোষকতা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই সকল ব্যাপারে এরাটোস্থেনিস এবং অন্যান্য গ্রীক প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষকে আয়তক্ষেত্র বা রম্বেড (Rhombiod) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। সেই আয়ত-ক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বাহু অর্থাৎ পশ্চিম সীমানার পরিমাণ—পেট্রোক্লসের মতে, দ্বাদশ সহস্র ষ্টেডিয়া (Stadia), এরাটোস্থেন্সের মতে, ত্রয়োদশ সহস্র ষ্টেডিয়া। সিন্ধু-নদ পার হইবার সময় মহাবীর অলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদের উপর একটি সেতু প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার নাম—'আলেকজাণ্ডার ব্রিজ' (Alexander's Bridge)। সেখান হইতে সমুদ্রের দূরত্ব—দশ সহস্র 'ষ্টেডিয়া' অর্থাৎ ১১৪৯ ইংরাজী মাইল। সকল বিবরণীতেই দূরত্বের এইরূপ হিসাব দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তুষারাবৃত ককেশাস (Caucasus) কিম্বা পারোপামিশাস (Paropamisus) হইতে আলেকজাণ্ডারের ঐ সেতুর দূরত্বের বিষয় যাহা লিখিত আছে, তাহার সহিত প্রোক্ত হিসাবের কিঞ্চিৎ অনৈক্য দেখা যায়। তৎকালে ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে গণনা করা হইত। সিন্ধু-নদ হইতে পালিবোথ্রা পর্য্যন্ত একটি রাজ-পথ ছিল। সেই রাজপথের দৈর্ঘ্য দশ সহস্র ষ্টেডিয়া। পাটলিপুত্র (পালিবোথ্রা) হইতে সমুদ্রের দূরত্ব ছয় সহস্র ষ্টেডিয়া অর্থাৎ ৬৮৯ বৃটিশ মাইল। এইরূপে সিন্ধু-নদ হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্তের দূরত্ব ষোল হাজার ষ্টেডিয়া অর্থাৎ ১৮৩৮ বৃটিশ মাইল। * গঙ্গার মোহানা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোপকূলের দৈর্ঘ্য ষোল হাজার ষ্টেডিয়া এবং কুমারিকা অন্তরীপ হইতে সিন্ধু-নদ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের দৈর্ঘ্য

আক্রান্ত হয়। আপনার হস্তি-সমূহের সাহায্যে তিন গল-দিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। কথিত হয়, সেই হইতেই তিনি সোটর অর্থাৎ 'সেভিয়ার' বা পরিত্রাতা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ২৬১ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে গল-দিগের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

* রোমক মাইলে ও বৃটিশ মাইলে একটু তারতম্য আছে। রোমীয় এক ফুটের মাপ—১১·৬৫ বৃটিশ ইঞ্চি হইতে ১১·৬২ বৃটিশ ইঞ্চির মধ্যে। তাহা হইলে রোমীয় মাইল, বৃটিশ মাইলের ১৪২ গজ হইতে ১৪৪ গজ মাপে কম হয়।

উনিশ হাজার ষ্টেডিয়া অর্থাৎ ২১৮৩ বৃটিশ মাইল। এইরূপ পরিমাপে ভারতবর্ষের যে মানচিত্র হওয়া সম্ভবপর, কানিংহাম তাহাও আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। মোটামুটি এইরূপ-ভাবেই চতুঃসীমানার পরিমাপ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিমাপে দৈর্ঘ্য-বিস্তৃতির সামান্য কিছু ইতর-বিশেষ ঘটিলেও ঘটিতে পারে। ফলে, খৃষ্টজন্মের অন্যূন তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের নিকট হইতে গ্রীস-দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ভৌগোলিকগণ ভারতবর্ষের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আলেকজাণ্ডার যে সকল ভারতবাসীর নিকট ভারতবর্ষের এইরূপ আকৃতি ও বিস্তৃতির পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাতে সেই দূর অতীতেও ভারতবাসীরা আপনাদের দেশের ভৌগলিক-তত্ত্বে সম্পূর্ণ-রূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, বেশ বুঝিতে পারা যায়। এ কথা কেবল আমরা বলিতেছি না; ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই তারস্বরে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।*

ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে প্রাচীন চীন।

গ্রীস-দেশীয় প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণ ভারতবর্ষের যেরূপ আকৃতির ও সীমানার পরিচয় দিয়াছেন, মিশর-দেশীয় ভৌগোলিক টলেমির বিবরণের সহিত তাহার সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ বলেন,—তিনি এক দিকের মাপের ভুল করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার হিসাবে ভারতবর্ষের আকার অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তিনি ভারত-বর্ষের দক্ষিণ-দিকের যে মাপ ধরিয়াছেন, তাহাতে গঙ্গার মোহানা হইতে একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিলে, সিন্ধু-নদের মোহানায় আসিয়া তাহা মিলিয়া যায়। গঙ্গার মোহানা হইতে রেখা টানিয়া, কুমারিকা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া, সিন্ধু-নদের মোহানা পর্য্যন্ত লইয়া গেলে, কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিকটে একটি কোণ অঙ্কিত হয়। কিন্তু টলেমির মাপে রেখার পরিমাপ কম হওয়ায় সে রেখা কুমারিকা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া, সিন্ধু-নদের মোহানা পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া অসম্ভব। যাহা হউক, গ্রীসে ও মিশরে প্রাচীন ভারতের আকৃতি-পরিমাণ বিষয়ে যেরূপ কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, চীন-দেশের গ্রন্থ-পত্রেও তদ্রূপ পরিচয় দৃষ্ট হয়। পুরাণাদি শাস্ত্রে স্মরণাতীত-কাল হইতেই চীনের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের কেহ কেহ তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন,—খৃষ্ট-জন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে, 'হান'-বংশের রাজত্ব-কালে, চীন-সম্রাট 'উটির' শাসন-সময়ে, চীনারা ভারতের বিষয় প্রথম জানিতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষকে তখন তাহারা 'জুয়াণ্টু' (Yuan-tu) অথবা 'জিণ্টু' (Yin-tu) বা 'সিণ্টু' (Shin-tu) নামে অভিহিত করিত। হিন্দু এবং সিন্ধু নাম—তাহাদের নিকট যথাক্রমে ঐরূপভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, বলিতে পারা যায়। পরবর্ত্তিকালে চীনারা ভারতবর্ষকে 'থিয়াংটু (Thian-tu) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। চীন-দেশের ঐতিহাসিক মাতোয়াং-লিং ঐরূপ নামই লিখিয়া গিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীতে, চীনের 'থাং'-বংশের

* আলেকজাণ্ডার কানিংহাম প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক তত্ত্ব আবিষ্কারে অশেষ অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে এই কথাই মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন,—"The close agreement of these dimensions, given by Alexander's informants, with the actual size of the country is very remarkable, and shows that the Indians, even at that early date in their history, had a very accurate knowledge of the form and extent of their native land."

শাসনকালে, সরকারী কাগজ-পত্রে, ভারতবর্ষের পাঁচটী বিভাগের নির্দ্দেশ হয়। সেই পাঁচ বিভাগের নাম, যথাক্রমে,—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য। ভারতবর্ষ কোন্ সময়ে ঐরূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে ৪৭৭ খৃষ্টাব্দে এবং ৫০৩ ও ৫০৪ খৃষ্টাব্দে চীনে এতদ্বিষয়ক উল্লেখ দৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথমোক্ত খৃষ্টাব্দে পশ্চিম-ভারতের জনৈক নৃপতি চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত দুই অব্দে উত্তর-ভারতের এবং দক্ষিণ-ভারতের কয়েক জন নৃপতির প্রতিনিধিগণ চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ই ভারতবর্ষ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া উক্ত আছে। তাহাতে বুঝা যায়,—(১) পঞ্জাব ও তদন্তর্গত কাশ্মীর এবং সিন্ধুর পশ্চিম পারস্থিত আফগান-প্রদেশের পূর্ব্বভাগ, সরস্বতী নদীর পশ্চিম তীরস্থিত ভূভাগ-সমূহ এবং সরস্বতী-নদীর পশ্চিম ও শতদ্রু নদীর পূর্ব্বদিকস্থিত দেশ, 'উত্তর ভারতের' অন্তর্ভুক্ত ছিল। (২) সিন্ধুদেশ, কচ্ছ, গুজরাট এবং নর্ম্মদা-নদীর মোহনার দিকের প্রদেশ-সমূহ, 'পশ্চিম ভারতের' অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কথিত হইত। (৩) থানেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশের উত্তর সীমানা পর্য্যন্ত সমস্ত গাঙ্গেয়-প্রদেশ, 'মধ্যভারতের' অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৪) বঙ্গদেশ, আসাম, গঙ্গার ব-দ্বীপ, সম্বলপুর, উড়িষ্যা ও গঞ্জাম, 'পূর্ব্ব-ভারতের' অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কথিত হইত। (৫) পশ্চিমে নাসিক, পূর্ব্বে গঞ্জাম, দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ—এতৎসীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ, তখন 'দক্ষিণ-ভারতের' অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেরার, তেলিঙ্গন, মহারাষ্ট্র, কঙ্কণ, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অর্থাৎ নর্ম্মদা ও মহানদীর দক্ষিণ সমস্ত উপদ্বীপ এই দক্ষিণ ভারতেরই অংশ মধ্যে পরিগণিত হইত। * চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ভারতবর্ষের ঐরূপ পঞ্চ-বিভাগের কথাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি ভারতবর্ষের আকৃতির বিষয় বলিতে গিয়া অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত তাহার তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই অর্দ্ধ-বৃত্তাকার ভারত-বর্ষের ব্যাস উত্তরের দিকে এবং পরিধি দক্ষিণের দিকে। † হুয়েন-সাঙের এই উপমা পাঠ করিয়া মহাভারতোক্ত ধনুকের উপমাই মনে হয় না কি? বোধ হয়, হুয়েন-সাং মহা-ভারতোক্ত আকৃতির বিষয় শুনিয়া থাকিবেন এবং তদনুসারে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। চীনদেশের জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার "ফা-কাই-লি-টো" নামক গ্রন্থে, ভারতবর্ষের আকৃতির প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—'ভারতবর্ষের আকৃতি উত্তরের দিকে বিস্তৃত এবং দক্ষিণের দিকে সঙ্কীর্ণ।' এইরূপ নানা সময়ে নানা জনের বর্ণনায় ভারতবর্ষের নানারূপ আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন দেশের প্রাচীন গৌরবের ইহাও এক নিদর্শন। প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের সীমানায়ও এইরূপ বিবিধ পরিবর্ত্তনের নিদর্শন আছে।

---

* চীনাদিগের গ্রন্থে ঐরূপ পাঁচ বিভাগের উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু চীনাগণ তাহার সীমানা নির্দ্ধারণ করেন নাই। প্রত্নতত্ত্ববিৎ আলেকজাণ্ডার কানিংহাম উহার সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া এক মানচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

† "He (Hwen-Thsang) compares the shape of the country to a half moon with the diameter or the broad side to the north and the narrow end to the south"—Maj. Gen. Alexander Cunningham, *Ancient Geography of India*, Vol. 1.

ভারতের ভৌগোলিক-তত্ত্ব বিষয়ে যে প্রকারেই আলোচনা করি না কেন, ভারতবাসিগণের তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তথাপি কোনও কোনও ইউরোপীপ পণ্ডিত প্রাচীন ভারতবাসীর ভৌগোলিক-জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহের কথা প্রকাশ করেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন ও বিভারিজ প্রমুখ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখকগণ এ কথা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেও সঙ্কোচ করেন নাই। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন,—'ভৌগোলিক-তত্ত্বে হিন্দুদের জ্ঞান বড়ই অল্প ছিল। পশ্চিমে সিন্ধু-নদীর পরপারের কোনও স্থানই হিন্দুগণ প্রায় অবগত ছিলেন না। প্রাচীন কাল হইতেই তাঁহারা বিদেশ-ভ্রমণে বিদ্বেষী ছিলেন। সুতরাং অন্যান্য দেশের মানব জাতির সহিত তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধই ছিল না।" * এই কথার প্রমাণ-স্বরূপ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ সিন্ধু নদের পশ্চিম-পারস্থিত যে সকল জনপদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার একটী নামও সংস্কৃত-মূলক নহে। ভারতবর্ষের জনপদাদির অনেক নাম সংস্কৃত-মূলক। হিন্দুদিগের পুরাণাদি গ্রন্থে যে সকল নাম দেখা যায়, সিন্ধু-নদের এবং হিমালয়ের পরপারে সে নামের কোনও জনপদ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।···পারিপার্শ্বিক জাতি-সমূহের বিবরণও হিন্দুগণের গ্রন্থ-পত্রে কচিৎ দেখিতে পাই। ভারতবাসীরা কেবল গ্রীকদিগকেই জানিতেন এবং 'যবন' নামে তাহাদিগকে অভিহিত করিয়াছিলেন,—এইমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক-জাতি ভিন্ন অন্য জাতিকে তাঁহারা যে জানিতেন না, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পরবর্ত্তিকালে যে-কোনও জাতিই উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, হিন্দুগণের নিকট তাহারা সকলেই 'যবন' নামে অভিহিত হইয়াছে। সিদীয়গণকে তাঁহারা জানিতেন বলিয়া মনে হয়। 'শক' নামেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ, বুঝা যায়,—ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁহারা প্রবেশ করে নাই, তাঁহাদের বিষয় হিন্দুরা কিছুই জানিতেন না।" এল্‌ফিন্‌ষ্টোন এইরূপে নানা কথার অবতারণা করিয়া, ভারতবাসীর ভৌগোলিক-জ্ঞানের অভাব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারই গ্রন্থ হইতে এ কথার প্রতিবাদ করা যাইতে পারে। তাঁহারই গ্রন্থে প্রকাশ,—খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর কোনও রচনার মধ্যে পারসীক, যাবনিক এবং রোমক ভাষাকে অসভ্য অসংস্কৃত ভাষা বলিয়া উল্লেখ আছে। মিঃ কোলব্রুক তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। ইহাতে গ্রীস, রোম এবং পারস্যের বিষয়ে ভারতবাসীদিগের অভিজ্ঞতা ছিল, প্রতিপন্ন হয়। কোলব্রুক সপ্তম শতাব্দীর কোনও গ্রন্থকারের গ্রন্থে ঐ তিনটী (পারসীক-যাবনিক ও রোমক) শব্দ দেখিয়া তত্তদ্দেশ সম্বন্ধে ভারতবাসীর যে অভিজ্ঞতার বিষয় কল্পনা করিয়াছেন, আমরা পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে সহস্র সহস্র সেরূপ শব্দ উদ্ধৃত করিতে পারি এবং তত্তৎশব্দে ভারতবর্ষের বহির্ভাগস্থ জনপদসমূহকে যে বুঝাইয়া থাকে, তাহাও অনায়াসে প্রতিপন্ন করিতে পারি। এতৎসম্বন্ধে একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণের অবতারণা করিতেছি; তাহাতে

ভৌগোলিক-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা।

* Mounstuart Elphinstone, *History of India,* Book III. Chap II. এল্‌ফিন্‌ষ্টোনেই এই কথা প্রকাশ আছে।

পৃথিবীর ভৌগোলিক-তত্ত্বে ভারতবাসিগণের কিরূপ অভিজ্ঞতা ছিল, অতি সহজেই উপলব্ধি হইবে। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত "গোলাধ্যায়" গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"লঙ্কা কুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্ পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যেহথ যাম্যে বড়বানলশ্চ॥
কুবৃত্তপাদান্তরিতানি তানি স্থানানি ষড় গোলবিদো বদন্তি॥
লঙ্কাপুরেহর্কস্য যদোদয়ঃ তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাং।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেহস্তকালঃ স্যাদ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥"

অর্থাৎ,—"ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে 'লঙ্কা'। তাহার পূর্ব্বে 'যমকোটি', পশ্চিমে 'রোমকপত্তন', অধঃস্থলে 'সিদ্ধপুর', উত্তরে 'সুমেরু', দক্ষিণে 'বাড়বানল' (কুমেরু),—গোলবিৎ পণ্ডিতগণ এই ছয়টী স্থানকে ভূ-পরিধির পাদান্তরিত অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ সামানান্তরিতরূপে স্থিত বলেন। লঙ্কাপুরে যে সময়ে সূর্য্যের উদয় হয়, সে সময়ে যমকোটিতে দিবা দুই প্রহর, সিদ্ধপুরে অস্ত এবং রোমকপত্তনে দুই প্রহর রাত্রি হয়।" * লঙ্কাদ্বীপ বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ বলিয়া (পুরাকালে বিষুব পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল, এরূপও হইতে পারে) জ্যোতির্ব্বিদ বোধ হয় লঙ্কা-দ্বীপের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়,—ভারতবর্ষে যখন প্রভাত, তাহার পূর্ব্বাংশে যমকোটি নামক দেশে (বর্ত্তমান প্রশান্ত-মহাসাগর-মধ্য-স্থিত দেশ-বিশেষে) তখন দিবা দ্বি-প্রহর এবং সিদ্ধপুরে (কোনও কোনও মতে,—সিদ্ধপুর অর্থে দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তরাংশ) সূর্য্যাস্ত এবং রোমকপত্তনে অর্থাৎ রোম-সাম্রাজ্যান্তর্গত ইউরোপে তখন রাত্রি দ্বি-প্রহর। যদি পৃথিবীর গোলত্ব-বিষয়ে এবং নগর-জনপদাদির অবস্থান-সম্বন্ধে আর্য্য-হিন্দুগণের অভিজ্ঞতা না থাকিত, এ কথা কেমন করিয়া তাঁহারা বলিতে পারিতেন? ভূগোল-জ্ঞানের পরিচয় ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? † নাম ও পরিচয় কাল-প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু এ নিগূঢ় তত্ত্ব যাঁহারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞাত কি থাকিতে পারে? আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে ভারত-সীমান্তস্থিত জনপদাদির সংস্কৃত-মূলক নাম উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া ভারতবাসীর ভৌগোলিক অভিজ্ঞতার বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাই না। পূর্ব্বে সংস্কৃত-মূলক শব্দে যে সকল দেশের নামকরণ হইয়াছিল, সে সকল দেশের সহিত ক্রমশঃ ভারতবর্ষের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং সেই সকল দেশে বিপরীত প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায়, সে সকল নাম বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে,—ইহাই স্বাভাবিক। দৃষ্টান্ত-স্থলে 'বারাণসী' ও 'বেনারাস' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করিতে পারি।

---

* 'মৃন্ময়ী'-গ্রন্থে পণ্ডিত গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ-বারিধি মহাশয় শ্লোকটীর ঐরূপ অনুবাদ সম্পন্ন করিয়া সিদ্ধপুরকে আমেরিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু রোমকপত্তনকে রোমনগর বলিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার সেরূপ অসম্মতির বিশেষ কোনও কারণ ছিল না।

† এল্‌ফিন্‌ষ্টোন এই রোমকপত্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া একটু বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন,—'রোমকপত্তন' 'রোম' হওয়াই সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে আরও বলিয়াছেন,—"ভারতবাসীরা চীনা-দিগকেও জানিতেন।" তবেই বুঝা গেল,—এল্‌ফিন্‌ষ্টোন পূর্ব্বে যে ভারতবাসীর অন্য দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন, প্রকারান্তরে এতদ্বারা তাহার প্রতিবাদ হইয়াছে।

'বারাণসী' শব্দ যেরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, অন্যান্য দেশের নামেও সেরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভবপর। বিশেষতঃ, আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক গ্রীস-দেশীয় ঐতিহাসিকগণের উচ্চারণের দোষেও অনেক নাম বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত হইতে যখন সাণ্ড্রকোট্টস ও কাণ্ড্রগুপ্স্ হয়, তখন আর অন্যে পরে কা কথা! ফলতঃ, ভারতের বহির্ভাগস্থিত জনপদাদির সংস্কৃত-মূলক নাম গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিতে পারেন নাই বলিয়া, তত্তদ্দেশের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ছিল না, এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের এ সিদ্ধান্তের কোনই সারবত্তা দেখিতে পাই না। ভারতবাসীর যে ভৌগোলিক-জ্ঞানের অভাব ছিল—তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, আর এক শ্রেণীর তার্কিকগণ আর এক প্রকার তর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—"পুরাণাদি শাস্ত্রে যে সকল জনপদের নাম লিখিত আছে, তাহাদের অবস্থান বিষয়ে অনেক সময় মতান্তর দৃষ্ট হয়। এমন কি, যে রাজ্য বা যে জনপদ ভারতের পূর্ব্ব-ভাগে অবস্থিত, সময়ে সময়ে তাহা পশ্চিম-ভাগে অবস্থিত বলিয়াও লিখিত আছে।" দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহারা চীন ও কাশ্মীর প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করেন; বলেন,—"মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে সঞ্জয়োক্তিতে চীনাদিগের বাস উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং কাশ্মীর, পারস্য প্রভৃতি তাহাদের পারিপার্শ্বিক দেশ-রূপে কথিত আছে। এইরূপে পুরাণে কোথাও প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য, প্রাচ্যদেশ বলিয়া, কোথাও বা প্রতীচ্য-দেশ বলিয়া লিখিত রহিয়াছে।" এইরূপ তর্ক উত্থাপন করিয়া যাঁহারা অনভিজ্ঞতার বিষয় জ্ঞাপন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই প্রকার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, লিপিকার-প্রমাদে 'প্রাচ্য' স্থলে 'প্রতীচ্য' বা 'পর' স্থলে 'অপর' শব্দ লিখিত হওয়া অসম্ভব নহে; এবং তাহাতে পূর্ব্বদেশ স্থলে পশ্চিম-দেশ অর্থ সংঘটিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যে স্থলে পশ্চিমদেশবাসী চীনা-শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, সেখানে চীনাদিগের কোনও উপনিবেশ ছিল বলিয়াও মনে হইতে পারে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ পারদ, যবন প্রভৃতির দেশ বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহাতে, এক সময়ে সেই সকল স্থানে পারদ, যবন প্রভৃতির বাস হইয়াছিল—এরূপ বলা যায় না কি? ফলতঃ, এ সকল কথায় ভৌগোলিক-জ্ঞানের অভাব প্রতিপন্ন হয় না। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশ বিষয়ে যে ভারতীয় আর্য্যগণের অভিজ্ঞতা ছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদান্তরে এবং এই গ্রন্থের অন্যান্য নানা স্থানে আমরা তাহা প্রমাণ করিয়াছি। সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক-তত্ত্ব-বিষয়ে ভারতবাসিগণের যে পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল, গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় তাহার বিবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। সেই গ্রীক ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত বিবরণের আলোচনা করিয়াই কানিংহাম বলিয়া গিয়াছেন,—"From the accounts of the Greeks it would appear that the ancient Indians had a very accurate knowledge of the true shape and size of their country."

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—:০:—

কোশল-রাজ্য।

[কোশল-রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা,—অযোধ্যার ধ্বংস ও পুনঃ-প্রতিষ্ঠা;—সাকেত ও অযোধ্যা—অযোধ্যার লুপ্ত-গৌরবের পুনরুদ্ধার;—চীন-পরিব্রাজকগণের মতে প্রাচীন অযোধ্যার পরিচয়,—কানিংহামের আলোচনায় সাকেত, অযোধ্যা ও শাচীর সম্বন্ধ-তত্ত্ব;—দক্ষিণ-কোশল,—উত্তর-কোশল ও দক্ষিণ-কোশলের স্বাতন্ত্র্য;—চীন-পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় দক্ষিণ-কোশলের পরিচয়;—কুশস্থলী ও শ্রাবস্তী-নগরীদ্বয়ের অবস্থান ও প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা;—কোশল-রাজ্যের ও তৎসংশ্রবযুক্ত স্থান-সমূহের পরিচয়-প্রসঙ্গ;—গান্ধার, পুষ্কলাবত ও তক্ষশীলা প্রভৃতি।]

অযোধ্যা-নগরী।

শাস্ত্রানুসারে প্রথম প্রতিষ্ঠান্বিত রাজ্য—কোশল। সেই কোশল-রাজ্যের প্রাচীনতম রাজধানীর নাম—অযোধ্যা। কোশল-রাজ্যের প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের বহু স্থানে কোশল-রাজ্যের নামোল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১।৪।১) কোশল-রাজ্যের সীমানার একটি পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,—'সদানীরা (পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে—গণ্ডক) নদীর এক পার্শ্বে কোশল এবং অপর পার্শ্বে বিদেহ রাজ্য অবস্থিত।' কোশল—ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের রাজ্য। উহা ধনধান্যশালী আনন্দকোলাহলপূর্ণ জনপদ এবং সরযূ-নদীর তীরে অবস্থিত। কোশল-রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যা-নগরীর বিশদ বর্ণনা রামায়ণে দৃষ্ট হয়। তাহাতে প্রকাশ,—'মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং ঐ নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মহা-নগরী সুবিভক্ত রাজ-পথে সুশোভিতা, দ্বাদশ যোজনায়তা, ত্রিযোজন-বিস্তৃতা ও অতিশয় শোভাবতী। এই মনোহারিণী নগরীর রাজপথগুলি নিয়ত সলিলসিক্ত ও প্রস্ফুটিত পুষ্পে সুশোভিত থাকিত। এই নগরী গম্ভীর-জল-দুর্গম পরিখা-পরিব্যাপ্ত-থাকা-প্রযুক্ত সকলেরই দুর্গমা ছিল; বিশেষতঃ, শত্রুপক্ষ ইহার নিকটেও গমন করিতে পারিত না। নগরী কবাট-তোরণদ্বার-সমন্বিতা, সমস্ত যন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিতা, সর্ব্বায়তবতী ও অতি শ্রীমতী। পর্ব্বত-তুল্য অত্যুচ্চ অট্টালিকা-সমূহে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় এই অযোধ্যা-নগরী শোভমানা ছিল।' * শত্রুর নিকটে ঐ নগরী অজেয় ছিল বলিয়া উহা 'অযোধ্যা' নামে পরিচিত হয়। ইক্ষ্বাকু হইতে শ্রীরামচন্দ্র পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় ধুরন্ধর নৃপতিগণ অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপ্রতিহত-প্রভাবে পৃথিবী-পালন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের মহা-প্রস্থানের পর, অযোধ্যা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। তাহার পর, বহুকাল পর্য্যন্ত, অযোধ্যা কি অবস্থায় অবস্থিত ছিল,—তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। রামায়ণ এবং পুরাণ-পরম্পরা অনুসন্ধান করিয়া আমরা দেখিতে পাই,—'শ্রীরামচন্দ্রের লব ও কুশ নামক দুই পুত্রের মধ্যে কোশল-রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায়।' কুশের রাজ্যের নাম হয়—কোশল বা কোশলা এবং লবের রাজ্যের নাম হয়—উত্তর কোশল।

* রামায়ণ, আদিকাণ্ড, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় এবং পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ঊনবিংশ ও অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

তখন দুই জনের দুই স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কুশের রাজধানীর নাম হয়—কুশাবতী বা কুশস্থলী; লবের রাজধানীর নাম হয়—শ্রাবস্তী। কুশাবতী বিন্ধ্যাচলের পাদদেশে অবস্থিত ছিল; শ্রাবস্তী—অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমে শোভা বিস্তার করিতেছিল। * ভরতের জ্যেষ্ঠ-পুত্র তক্ষ—তক্ষশীলায় এবং কনিষ্ঠপুত্র পুষ্কল (পুষ্কর)—পুষ্কলাবতে (পুষ্করাবতী), লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গদ—অঙ্গদীয়ায় এবং কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকেতু—চন্দ্রবক্ত্রা (রামায়ণের মতে—চন্দ্রকান্তা) নাম্নী শোভনা পুরীতে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এদিকে শত্রুঘ্ন-পুত্র শত্রুঘাতীর রাজধানী—বিদিশা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের মহা-প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার সহিত সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের সম্বন্ধ একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন অযোধ্যা প্রকারান্তরে জনশূন্য অরণ্যানী-মধ্যে পরিগণিত হয়। পরিশেষে, কখন কি প্রকারে অযোধ্যা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া রামায়ণে দেখিতে পাই, মহর্ষি বাল্মীক বলিয়াছেন,—'ভবিষ্য-কালে ঋষভ † রাজার রাজত্ব-সময়ে অযোধ্যা পুনরায় জনপূর্ণ হইবে।' কোন্ বংশের কোন্ পর্য্যায়ে ঋষভ রাজার স্থান, তাহা নির্ণয় করা যায় না। বিষ্ণুপুরাণের চন্দ্রবংশে বৃহদ্রথের পৌত্র বলিয়া এক ঋষভ রাজার উল্লেখ আছে। তিনি মগধাধিপতি জরাসন্ধের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনিই কি তবে অযোধ্যা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন? বায়ুপুরাণে বৃহদ্রথ-বংশের একটি পরিচয় আছে। তাহাতে ইক্ষ্বাকু-বংশের শেষ নৃপতিগণের পরিচয় প্রসঙ্গে পুরাণকার বলিতেছেন,—'বৃহদ্রথের দায়াদ রাজা বৃক্ষৎক্ষয় বীর ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম—ক্ষয়; ক্ষয়ের পুত্র বৎসব্যূহ, তৎপুত্র দিবাকর। এই দিবাকরই সংপ্রতি রাজা হইয়া অযোধ্যা-নগরীতে অবস্থান করিতেছেন।' বিষ্ণুপুরাণ-বর্ণিত রাজা ঋষভের সহিত দিবাকরের পিতৃ-পুরুষ-গণের হয় তো কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে এবং সেই সূত্রে তিনি অযোধ্যার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণেও উক্ত দিবাকরের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সেখানে ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে সূত বলিতেছেন,—'বৃহদ্বলের দায়াদ রাজোপাধিধারী উরুক্ষয়। তৎপুত্র মহাযশা বৎসদ্রোহ; তৎপুত্র প্রতিব্যোম, তৎপুত্র দিবাকর। এই মহাত্মারই মধ্য-দেশে অযোধ্যা-নাম্নী শোভমানা নগরী ছিল।' তাহা হইলে দেখা যাইতেছে,—কলিযুগের প্রারম্ভে অযোধ্যা নগরী পুনরায় প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের অন্য আর এক স্থলে আবার দেখিতে পাই,—'শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশে মরু ‡ জন্মগ্রহণ করেন।' পুরাণকার বলিতেছেন,—'এই মরু যোগে অবস্থান করতঃ অদ্যাপি কলাপ গ্রাম আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। আগামী যুগে ইনিই সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের প্রবর্ত্তয়িতা হইবেন।' শ্রীমদ্ভাগবতেও এই একই উক্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতকার বলিতেছেন,—'শীঘ্রের পুত্র মরু; তিনি যোগ-সিদ্ধ হইয়া কলাপগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। কলি-যুগের অবসানে সূর্য্যবংশ বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া পুত্রোৎপাদন দ্বারা

* রামায়ণ, উত্তর-কাণ্ড, ১১৪শ সর্গ; বায়ুপুরাণ, ৮৮শ অধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

† "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, ৩১৬শ পৃষ্ঠা, বঙ্গ-লতা দ্রষ্টব্য।

‡ "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড ২৯৭শ এবং ৩৪৭শ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

তিনি ঐ বংশ পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবেন।' ইহাতে বৃহদ্বলের রাজত্বের কিছু পূর্ব্বে অযোধ্যা-নগরী লুপ্ত-গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের বংশ-লতায় দেখিতে পাই,—মরুর অধস্তন অষ্টম-পুরুষে (বিষ্ণুপুরাণের বংশলতায় ষষ্ঠ পুরুষে) বৃহদ্বল বিদ্যমান ছিলেন। ভারত-যুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে তিনি নিহত হন। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়—কুরুক্ষেত্র সমরের পূর্ব্বে ঐ অযোধ্যা নগরী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরাণাদির বর্ণনায়, অযোধ্যা—ভারতের মধ্য-দেশান্তর্গত বলিয়া পরিচিত। সে হিসাবে, প্রাচীনতম কোশল-রাজ্য—মধ্যদেশে অবস্থিত ছিল, বলিতে হয়।

বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব সময়ে অযোধ্যা শাক্য-নৃপতিগণের অধিকার-ভুক্ত ছিল। শাক্য-গণ—সূর্য্যবংশেরই শাখা-বিশেষ। বংশ-লতা আলোচনায় দেখিতে পাই,—অভিমন্যু-হস্তে নিহত রাজা বৃহদ্বলের বংশে সঞ্জাত বা সুজাতের পুত্র শাক্য নামে অভিহিত হন। সেই শাক্য-বংশে শুদ্ধোদনের অংশে বুদ্ধদেব (সিদ্ধার্থ) জন্মগ্রহণ করেন। সঞ্জাতের (সুজাতের) অধস্তন অষ্টম পুরুষে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব বহু দিন পর্য্যন্ত অযোধ্যায় বসবাস করেন, অযোধ্যায় ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন—তৎসম্বন্ধে নানা প্রমাণ বিদ্যমান আছে। বুদ্ধদেবের অধস্তন পুরুষে সুমিত্র পর্য্যন্ত ঐ নগরী প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। পুরাণাদির মতে, সুমিত্র রাজা হইলে পর, কলি-যুগে, ইক্ষ্বাকু-বংশ ধ্বংস হইয়া যায়। * শাক্য-বংশের রাজত্ব-কালে অযোধ্যা-নগরী শাকেত (Saketa) অর্থাৎ শাক্যগণের নগরী নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। শাক্য-বংশের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইলে, অযোধ্যা মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহার পর অযোধ্যার আবার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রাধান্যের অবসান-কালে রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য (মতান্তরে বিক্রমজিৎ) অযোধ্যার লুপ্ত-গৌরব পুন-রুদ্ধারে প্রযত্নপর হন। অযোধ্যার ভগ্নস্তূপ-সমূহ অনুসন্ধান করিয়া, তিনিই রামায়ণো-ল্লিখিত বিশেষ বিশেষ স্থান-সমূহ চিহ্নিত করিয়া দেন। মনে হয়, সেই বিক্রম-চিহ্নিত স্থান-সমুদায়ই অধুনা অযোধ্যার অতীত কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বিক্রমাদিত্য অযোধ্যায় তিন শত ষাট্‌টী দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। তিনি রামায়ণ-বর্ণিত যে সকল প্রাচীন স্থান চিহ্নিত করিয়া দেন, তন্মধ্যে রামকোট, মণি-পর্ব্বত, নাগেশ্বর, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মক্ষেত্র প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। যেখানে রামচন্দ্র এবং দশরথের দুর্গ প্রাসাদাদি বিদ্য-মান ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, বিক্রমাদিত্য সেই স্থানটীকে 'রামকোট' নামে অভিহিত করেন। বিশল্যকরণী আনয়ন করিতে গিয়া, গন্ধমাদন পর্ব্বত লইয়া, হনুমান যখন লঙ্কার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়ে ভরতের বাণাঘাতে গন্ধমাদনের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অযোধ্যার মণি-পর্ব্বত—সেই ভগ্নস্তূপ বলিয়া কথিত হয়।

সাকেত ও অযোধ্যা।

* শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম, স্কন্ধ, দ্বাদশ অধ্যায় এবং বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, দ্বাবিংশ অধ্যায়। সুমিত্র হইতেই যে ইক্ষাকু-বংশের অবসান হয়, তৎ-সম্বন্ধে অতি প্রাচীন-কাল হইতে একটী গাথা প্রচলিত আছে। সে গাথা এই,—

"ইক্ষাকুণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি। যতস্তং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপস্যতে কলৌ॥"

অযোধ্যার নৃপতিগণ যেখানে শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া বিক্রমাদিত্য নাগেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অযোধ্যার আরও নানা স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের ও রাজা দশরথের কীর্ত্তি-স্মৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। সরযূ-তীরে রামঘাট, লক্ষ্মণঘাট, ভরতঘাট প্রভৃতি এখন প্রতিষ্ঠিত। কোনও স্থান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, কোনও স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন সুরক্ষিত। কথিত হয়, অযোধ্যা-পুরীর পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া বিক্রমাদিত্য প্রায় আশী বৎসর কাল অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর সমুদ্রপাল নামে অযোধ্যার আর এক জন নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমুদ্রপাল-বংশের আট জন নৃপতি ছয় শত তেতাল্লিশ বৎসর কাল অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া উক্ত হন। সমুদ্রপালের বংশধরগণের আধিপত্য লোপ পাইলে, অযোধ্যা কনোজ রাজবংশের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়। কনোজ-রাজবংশের হস্ত হইতেই উহা মুসলমানগণের করতলগত হইয়াছিল।

চীন-পরিব্রাজকগণের পরিদৃষ্ট অযোধ্যা।

ফা-হিয়ান এবং হুয়েন-সাং—এই দুই চীন-পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে অযোধ্যার আর এক নূতন মূর্ত্তি দেখিতে পাই। তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে অযোধ্যা বা শাকেত নামের উল্লেখ নাই; অথচ, তাঁহারা অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়। ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 'শাচী' (Shachi) নামক এক রাজ্যের নাম লিখিত আছে। হুয়েন সাংঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 'বিশাখ' নামক এক জনপদের পরিচয় দৃষ্ট হয়। ফা-হিয়ান বলেন,—'শাচী' একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য। হুয়েন-সাং বলেন,—'বিশাখ' অসংখ্য বিধর্ম্মী ব্রাহ্মণগণে পূর্ণ ছিল। ফা-হিয়ানের বর্ণনায় প্রকাশ,—শাচীর দক্ষিণে 'সি-ওয়ে' (She-Wei) অবস্থিত। সি-ওয়ে—'শ্রাবস্তী'র নামান্তর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু হুয়েন-সাঙের মতে, বিশাখের উত্তর-পশ্চিমে ঐ নগর অবস্থিত। ঐ দুই নগরের দূরত্বের বর্ণনায় উভয়ের মধ্যে মতান্তর দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হইলেও কানিংহাম 'শাচী' ও 'বিশাখকে' অযোধ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং 'সি-ওয়ে' বা 'শ্রাবস্তী' উহার উত্তরে অবস্থিত ছিল বলিয়া তৎকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাচী বা বিশাখ যে সাকেত বা অযোধ্যার নামান্তর, ফা-হিয়ান ও হুয়েন-সাঙের বর্ণিত দুইটি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিয়া, আলেকজাণ্ডার কানিংহাম তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শাচী-নগরের বর্ণন-প্রসঙ্গে ফা-হিয়ান লিখিয়াছেন,—'দক্ষিণের তোরণ-দ্বার দিয়া ঐ নগর পরিত্যাগ করিলে, রাজপথের পূর্ব্ব-পার্শ্বে, একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। বুদ্ধদেব ঐ বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। ঐ বৃক্ষের উচ্চতা সাত ফিট; উহার আকৃতির কখনও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই।' শাচী-নগরের পথ-পার্শ্বে ফা-হিয়ান যে প্রকারের বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন, হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় বিশাখ-নগরের রাজপথের পার্শ্বেও সেইরূপ এক বৃক্ষের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। হুয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন,—'বিশাখ রাজধানীর দক্ষিণাংশে, রাজপথের বাম-পার্শ্বে (That is, to the East as stated by Fa-Hian; অর্থাৎ ফা-হিয়ান কথিত পূর্ব্বধারে), যে সকল পবিত্র সামগ্রী বিদ্যমান আছে

তন্মধ্যে একটী অপূর্ব্ব বৃক্ষ বিশেষ উল্লেখযোজ্য। বৃক্ষটীর উচ্চতা ছয় সাত ফিট; উহার অবয়বের কখনও কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। বুদ্ধদেব দন্ত-ধাবনের জন্য যে বৃক্ষের শাখা ব্যবহার করিতেন, উহা সেই বৃক্ষেরই শাখা—বুদ্ধদেব কর্তৃক রোপিত হইয়াছিল।' এই বৃক্ষের এবং নগরের অবস্থানাদির বর্ণনায় ফা-হিয়ান-কথিত 'শাচী'-নগরীই যে হুয়েন-সাং-কথিত 'বিশাখ'—তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। শাচী ও বিশাখ এক হইলেও উহাই যে অযোধ্যা—তাহা কি প্রকারে বলিতে পারা যায়? কানিংহাম তাহারও সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'বিশাখ ও সাকেত একই স্থান, বিবিধ প্রকারে তাহা প্রতিপন্ন হয়। প্রথম,—শ্রাবস্তী-নগরের ধনী বণিক পূর্ণবর্দ্ধনের সহিত সাকেত-নগরীর অনিন্দ্য-সুন্দরী বিশাখার পরিণয়-কাহিনী বহু বৌদ্ধ-গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ণবর্দ্ধনের পিতার নাম—মৃগার (Mrigar); আর বিশাখা—ধনঞ্জয়-নামক ধনী বণিকের কন্যা। বিশাখার পিতা রাজগৃহ হইতে সাকেত-নগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এক সময়ে সাকেত-নগরে বিশাখার বড়ই প্রতিপত্তি হয়। এমন কি, তখন ধনদেব এবং বিশাখা দত্তের নামে মুদ্রা পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছিল। শ্রাবস্তী এবং সাকেত নগরে বিশাখা 'পূর্ব্বারাম' প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ, এক সময়ে সাকেতে বিশাখার এতই খ্যাতি-প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, তাঁহার নামানুসারে 'সাকেত'-নগরের 'বিশাখ' নামে পরিচিত হওয়াও অসম্ভব নহে। হুয়েন-সাং যখন অযোধ্যা বা সাকেত-নগর পরিভ্রমণ করিতে যান, সম্ভবতঃ এ নগর তখন 'বিশাখ' নামেই পরিচিত ছিল।' সাকেত ও বিশাখ যে একই নগরী, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কানিংহাম আরও একটী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ, বুদ্ধদেব বিশাখ-নগরে ছয় বৎসর বাস করিয়াছিলেন। এদিকে পালিভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়,—বুদ্ধদেব সাকেত-নগরে ষোল বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কানিংহামের বিশ্বাস, ছয় স্থলে ষোল বা ষোল স্থলে ছয়—লিপিকার-প্রমাদে ঘটিয়াছে; নচেৎ, বুদ্ধদেবের অবস্থিতি-কালের হিসাবে বিশাখ ও সাকেত অভিন্ন হয়। বিশাখ, শাচী বা সাকেত অভিন্ন হইলেও উহা অযোধ্যা কি প্রকারে হইতে পারে? কানিংহাম বলেন,—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে সোমা-ডি'-কোরস (Csoma de' Koros)—সাকেতন্ অর্থে অযোধ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হোরেস উইলসনের 'সংস্কৃত অভিধানে' (Sanskrit Dictionary গ্রন্থে) সাকেত শব্দে অযোধ্যা অর্থ লিখিত হইয়াছে। এদিকে রামায়ণের এবং রঘুবংশের কয়েকটী শ্লোকে দশরথের রাজধানীর 'সাকেত-নগর' নাম দৃষ্ট হয়। লক্ষ্ণৌ-নগরের জনৈক ব্রাহ্মণ রামায়ণ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, কৈকেয়ীর পিতা অশ্বজিৎ 'সাকেত-নগরের রাজা' দশরথের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দেন, শ্লোকে এইরূপ লিখিত আছে। শ্লোকটী এই,—'সাকেতং নগরং রাজা নাম্না দশরথো বলী। তস্মৈ দেয় ময়া কন্যা কৈকেয়ী নামতো জনাঃ।' এতদ্ভিন্ন রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের উনাশীতি শ্লোকে ও চতুর্দ্দশ সর্গের ত্রয়োদশ শ্লোকে সাতেক-নগরের নাম আছে এবং তাহা অযোধ্যাকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং সাকেত ও অযোধ্যা যে অভিন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। কানিংহামের অনুসন্ধান ও গবেষণা বিশেষ

প্রশংসনীয়। তবে 'সাকেত-নগর' নাম বা ঐ শ্লোকটী বাল্মীকির রামায়ণে সন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না। লক্ষ্ণৌ-নগরের যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ঐ শ্লোক দেখাইয়াছিলেন, তিনি বোধ অন্য কোনও রামায়ণ হইতে তাহা দেখাইয়া থাকিবেন। আমাদের বিশ্বাস, শাক্য-নৃপতিগণের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যার 'সাকেত' বা 'শাকেত' নাম সূচিত হইয়াছিল। তাহা হইলে, শাক্য-বংশের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে বাল্মীকি যে রামায়ণ রচনা করেন, তাহাতে 'শাকেত' নাম কি প্রকারে থাকা সম্ভবপর? তার পর, কানিংহাম রঘুবংশের যে দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দুইটীতেই সাকেত' শব্দ দৃষ্ট হয় এবং সে দুইটী শব্দ 'অযোধ্যা' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। যথা,—

> "ক্রোশার্দ্ধং প্রকৃতিপুরঃসরেণ গত্বা কাকুৎস্থঃ স্তিমিতজবেন পুষ্পকেণ।
> শত্রুঘ্ন প্রতিবিহিতোপকার্য্যমার্য্যঃ সাকেতোপবনমুদারমধ্যুবাস॥" ১৩.সর্গঃ, ৭৯শ শ্লোকঃ॥
> "শ্বশ্রূজনানুষ্ঠিতচারুবেষাং কর্ণীরথস্থাং রঘুবীরপত্নীম্।
> প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যবন্ধৈঃ সাকেতনার্য্যোঽঞ্জলিভিঃ প্রণেমুঃ॥" ১৪শ সর্গঃ, ১৩শ শ্লোকঃ॥

অর্থাৎ,—'আর্য্য রামচন্দ্র প্রজাগণের অনুগামী পুষ্পক-রথে ধীরে ধীরে অর্দ্ধক্রোশ গমন করিয়া শত্রুঘ্ন-বিরচিত পটমণ্ডপ-বিশিষ্ট অযোধ্যার মনোরম উপবনে অবস্থিতি করিলেন। অযোধ্যাবাসিনী রমণীগণ শ্বশ্রূজন-বিরচিত মনোরম বেশধারিণী কর্ণীরথারূঢ়া রঘুবীর-পত্নী সীতাদেবীকে প্রাসাদ-জাল-মার্গে সুস্পষ্ট-লক্ষ্য অঞ্জলিপুট বন্ধন করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।' রঘুবংশে এই 'সাকেত' শব্দ অযোধ্যার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বা কালিদাসের সমসময়ে অযোধ্যা 'সাকেত' নামে পরিচিত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বায়ুপুরাণে ভবিষ্য-রাজবংশ-বর্ণন-প্রসঙ্গে 'সাকেত' শব্দের উল্লেখ আছে। যথা,—"অনুগাঙ্গং প্রয়াগাঞ্চ সাকেত-মগধাংস্তথা।" এই সাকেত শব্দেও যে অযোধ্যা-রাজ্যকে বুঝাইতেছে, বায়ুপুরাণের নবনবতিতমাধ্যায় পাঠ করিলে, অনায়াসে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ফা-হিয়ান এবং হুয়েন-সাং যখন ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তখন অযোধ্যার সে নাম পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে। এই সকল বিবরণ হইতে বুঝা যায়,—অযোধ্যায় যখন যাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, পরবর্ত্তিকালে উহা তখন সেইরূপ নামেই পরিচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রাচীন অযোধ্যা নগরী এখন নাই। এখন যে অযোধ্যা-নগরী, তাহা প্রাচীনের অনুসরণে পরবর্ত্তিকালে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে অযোধ্যা ছিল, বর্ত্তমান অযোধ্যা-নগরী তাহার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। রামায়ণ-বর্ণিত অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমান অযোধ্যা দুই মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে এক মাইলেরও কম। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন-সাং যে অযোধ্যা দেখিয়াছিলেন, সে অযোধ্যার পরিধি ষোল লি অর্থাৎ প্রায় ২৮ মাইল ছিল। তাহা এখনকার অযোধ্যার অর্দ্ধেক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থের বর্ণনায় পুরাতন অযোধ্যা—দৈর্ঘ্যে এক শত আটচল্লিশ ক্রোশ এবং প্রস্থে এক শত ছত্রিশ ক্রোশ বলিয়া উল্লিখিত আছে। সে হিসাবে, ঘর্ঘরা (Gogra) নদীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমগ্র অযোধ্যা-প্রদেশে উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। মুসলমানদিগের

আধিপত্যকালে, অযোধ্যার ভগ্নস্তূপ-সমূহ হইতে ইষ্টকাদি উপাদান সংগ্রহ করিয়া ফয়জাবাদ নগরী বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ নগরীর দৈর্ঘ্য আড়াই মাইল, প্রস্থ এক মাইল। অযোধ্যা এবং ফয়জাবাদ পাশাপাশি অবস্থিত। উভয় নগরের পরিমাণ ফল—মোটের উপর ছয় বর্গ মাইল। অযোধ্যা-প্রদেশ মুসলমানগণের অধিকার-ভুক্ত হইলে, অযোধ্যা-প্রদেশের প্রথম প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (নবাব) ফয়জাবাদ নগরীতে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ কোশল।

রামায়ণে আভাষ পাই,—শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র, শ্রাবস্তী নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া উত্তর-কোশল রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করেন; আর শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুশ, কুশাবতী নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া দক্ষিণ-কোশল প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন। রামায়ণে যদিও উত্তর-কোশল এবং দক্ষিণ-কোশল—এই দুই নাম পৃথক ভাবে উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু পরবর্ত্তি-কালের গ্রন্থাবলীর আলোচনায় ঐ সময় হইতে দুইটী কোশল-রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল, সহজেই প্রতিপন্ন হয়। মহাভারতের সভাপর্ব্বে, ত্রিংশ অধ্যায়ে, উত্তর-কোশল নামের উল্লেখ আছে। রাজসূয়-যজ্ঞ উপলক্ষে পাণ্ডবগণ যে যে দেশে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন, তন্মধ্যে উত্তর-কোশলের নাম দৃষ্ট হয়। সেখানে লিখিত আছে,—'অনন্তর অরিন্দম বৃকোদর কুমার-রাজ্যের শ্রেণিমানকে এবং কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে জয় করিলেন। অযোধ্যার মহাবল ধর্ম্মজ্ঞ দীর্ঘযজ্ঞকে তিনি অনতিতীক্ষ্ণ কর্ম্ম-দ্বারায় পরাভূত করিলেন। তৎপরে সেই প্রভাব-সম্পন্ন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, গোপালকক্ষ, উত্তর-কোশল ও মল্লদিগের অধিপতি পার্থিবকেও পরাভূত করিলেন। অনন্তর হিমালয়ের পার্শ্বে উপনীত হইয়া, অতি অল্প-কালের মধ্যে সমুদায় জলোদ্ভব দেশ স্ববশে আনয়ন করিলেন।' এই অংশের আলোচনায় প্রতীত হয়,—উত্তর-কোশল রাজ্য তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহদ্বল—কোশলের অধিপতি ছিলেন; দীর্ঘযজ্ঞ অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন; এবং তদ্ভিন্ন উত্তর-কোশল নামে আর এক নূতন জনপদ ছিল। লবের রাজত্বকালে 'উত্তর-কোশল' বলিতে যে অংশ বুঝাইত, এতদ্দ্বারা যদিও সে অর্থ সূচিত হয় না, তথাপি ভারতবর্ষের উত্তরাংশে উত্তর-কোশল নামে এক অভিনব জনপদের অস্তিত্ব সহজেই প্রতিপন্ন হয়। ইহার পর, মহাভারতের উক্ত সভাপর্ব্বের অপর এক অধ্যায়ে (একত্রিংশ অধ্যায়ে) আর এক কোশলের নাম দৃষ্ট হয়। যদিও 'পূর্ব্ব-কোশল' নামে সেই কোশল অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা যে দক্ষিণ-স্থিত কোশল, তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। পাণ্ডব-গণের রাজধানী হস্তিনাপুরের পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে সে কোশল-রাজ্য অবস্থিত হইলেও তাহা যে উত্তর-কোশলের দক্ষিণে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় হয় না। সহদেব মহতী সেনাসমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন,—মহাভারতে লিখিত আছে। সেই দক্ষিণ-দিকস্থিত অবন্তী প্রভৃতি রাজ্যে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া সহদেব 'কোশলাধিপতি বেণ্বাতটের অধীশ্বর কান্তারবর্গ ও পূর্ব্ব-কোশলস্থ সমুদায় নরপতিকে পরাজিত করেন।' ইহাতে আরও কত কথাই মনে আসিতে পারে। উত্তর-কোশল যেমন বহু

ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কালে দক্ষিণ-কোশলও সেইরূপ বিভিন্ন জনপদে বিভাগীকৃত হইয়াছিল। উত্তর-কোশল, দক্ষিণ-কোশল, পূর্ব্ব-কোশল—প্রভৃতি নামই তাহার পরিচায়ক। রঘুবংশে ষষ্ঠ সর্গের একটি শ্লোকে উত্তর-কোশল নামের এবং উত্তর-কোশলই যে ঐক্ষ্বাক-বংশের রাজ্য ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সে শ্লোকটী এই,—

"ইক্ষাকুবংশ্যঃ ককুদং নৃপাণাং কাকুৎস্থ ইত্যাহিতলক্ষণোঽভূৎ।
কাকুৎস্থ শব্দং যত উন্নতেচ্ছাঃ শ্লাঘ্যং দধত্যুত্তর-কোশলেন্দ্রাঃ॥"

অর্থাৎ,—'পূর্ব্বকালে প্রখ্যাতগুণসম্পন্ন নৃপতি-প্রধান কুকুৎস্থ নামে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় এক রাজা ছিলেন। উন্নতচিত্ত দিলীপ প্রভৃতি উত্তর-কোশলের অধীশ্বরগণ সেই রাজা হইতেই অতি-গৌরবকর কাকুৎস্থ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' এই শ্লোকে 'উত্তর-কোশল' শব্দ দৃষ্টে মহাকবি কালিদাসের সম-সময়ে দক্ষিণ-কোশল নামক এক জনপদের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে দেবরক্ষিত নামক কোশল-রাজ্যের জনৈক নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই দেবরক্ষিত যে দক্ষিণ-কোশলের অধিপতি ছিলেন,—বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় তাহা প্রতীত হয়। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে প্রথমে উত্তর-ভারতের কয়েকটী জনপদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে পুরাণকার বলিতেছেন,—"দেবরক্ষিত নামে এক ব্যক্তি কোশল, উড্র, তাম্রলিপ্ত ও সমুদ্রতটস্থ জনপদ-সমূহ পালন করিতেন।" মথুরা প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তৎপরে বিষ্ণুপুরাণ এই কোশল-রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা পূর্ব্বোক্ত দক্ষিণ-কোশল ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? বায়ুপুরাণের নবনবতিতম অধ্যায়েও এই পরিচয় প্রাপ্ত হই। সেখানে লিখিত আছে,—'গুপ্ত-বংশীয় নরপতিগণ গঙ্গার সমীপবর্ত্তী প্রয়াগ, সাকেত ও মগধ প্রভৃতি জনপদে রাজত্ব করিবেন। মণিধান্য-বংশীয় অধিপতিগণ নিষধ, যদুক, শৈশীৎ ও কালপোতকে, গুহরাজ কোশল, অন্ধ্র, পৌণ্ড্র, সসাগর তাম্রলিপ্তে, দেবরক্ষিত রম্য, চম্পাপুরী, কলিঙ্গ, মহিষ ও মহেন্দ্রনিলয়ে এবং কনকরাজগণ সৌরাষ্ট্র, ভক্ষক প্রভৃতি জনপদে একই সময়ে রাজত্ব করিবেন।' ইহাতে বুঝা যাইতেছে,—দক্ষিণ-কোশলে গুহরাজের রাজত্ব ছিল এবং সাকেত বা উত্তর-কোশল গুপ্ত-বংশীয় নৃপতিগণ শাসন করিতেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও দেবরক্ষিত-বংশীয়গণ কর্ত্তৃক কোশল-রাজ্য শাসিত হইত বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহাও দক্ষিণ-কোশল।

চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-কালে দক্ষিণ-কোশল-রাজ্য কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আলোচনায় প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম তাহার আভাষ প্রদান করিয়াছেন। চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনায় দৃষ্ট হয়, 'কলিঙ্গ হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে আঠার শত বা উনিশ শত লি (তিন শত হইতে তিন শত সতের মাইল) অগ্রসর হইয়া, তিনি 'কিয়াও-সা-লো' রাজ্যে (Kiao-sa-lo) উপনীত হন। 'কোশল' শব্দই যে ঐরূপ কিয়াও-সা-লো আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। কলিঙ্গ-দেশের উত্তর-পশ্চিমে হুয়েন-সাং যে দূরত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কোশল-দেশ আধুনিক বেরার বা গণ্ডোয়ানা প্রদেশ হইতে পারে। হুয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন,—কোশল-রাজ্যের পরিধি প্রায় ছয় হাজার

পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় দক্ষিণ-কোশল।

লি অর্থাৎ প্রায় এক হাজার মাইল। তিনি যদিও ঐ রাজ্যের চতুঃসীমার বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আলোচনায় প্রতীত হয়, উত্তরে উজ্জয়িনী, পশ্চিমে মহারাষ্ট্র দেশ, পূর্ব্বে উড়িষ্যা এবং দক্ষিণে অন্ধ্র ও কলিঙ্গ-রাজ্য,—এতৎ-সীমান্তবর্ত্তী দেশ তৎকালে কোশল-রাজ্য নামে অভিহিত হইত। কানিংহামের হিসাবে, তাপ্তী-নদীর তীরস্থিত বুরহাণপুর এবং গোদাবরী-তীরস্থিত নান্দের হইতে ছত্রিশগড় প্রদেশস্থিত রত্নপুর এবং মহানদীর উৎপত্তিস্থান-সন্নিহিত নবগড় পর্য্যন্ত ঐ কোশল-রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ঐরূপ সীমানা অনুমান করিয়া লইলেই হুয়েন-সাং-কথিত হাজার মাইলের কিঞ্চিদধিক কোশল-রাজ্যের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-কালে এই কোশল-রাজ্যের রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কানিংহাম বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। হুয়েন-সাংএর বর্ণনায় রাজধানী সম্বন্ধে এই মাত্র উল্লেখ আছে যে, দক্ষিণকোশল রাজ্যের রাজধানী চল্লিশ লি অর্থাৎ প্রায় সাত মাইল পরিধিযুক্ত ছিল। কানিংহাম বলেন,—ইহাতে বর্ত্তমান মধ্য-ভারতের চারিটি প্রধান নগরের কোনও একটীর বিষয় মনে হইতে পারে। সেই চারিটি নগরের নাম,—চন্দা, নাগপুর, অমরাবতী এবং ইলিচপুর। তবে এই কয়েকটী নগরীর বিষয় আলোচনা করিয়া কানিংহাম চন্দা-নগরীকেই প্রাচীন কোশল-রাজ্যের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এদিকে 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' দেখা যায়,—মতান্তরে বৈরগড় বা ভাণ্ডক নামক নগর কোশল-রাজ্যের রাজধানী-রূপে উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, কানিংহাম যে যুক্তিবলে উক্ত চান্দা-নগরীকে হুয়েন-সাং-কথিত কোশল-রাজ্যের রাজধানী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। 'চান্দা'—প্রাকার-দুর্গ-সমন্বিত। উহার পরিধি—ছয় মাইল। পান-গঙ্গা এবং বার্দ্দা-নদীর সঙ্গমস্থলে উহা অবস্থিত; গোদাবরী-তীরস্থিত রাজমহেন্দ্রী হইতে দুই শত নব্বই মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং কৃষ্ণা-নদীর তীরস্থিত ধরণীকোটা (Dharanikota) হইতে দুই শত আশী মাইল দূরে বিদ্যমান। ধরণীকোটা বা ধানাকাকাতা হইতে হুয়েন-সাং কোশল-রাজ্যের রাজধানীর যে দূরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ঐ নগরী চান্দা ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। নাগপুরের পরিধি যদিও সাত মাইল, কিন্তু চান্দা হইতে উহা পচাশী মাইল উত্তরে এবং রাজমহেন্দ্রী হইতে, হুয়েন-সাঙের বর্ণনা অপেক্ষা সত্তর মাইল অধিক দূরে ঐ নগরী অবস্থিত। রাজমহেন্দ্রী হইতে অমরাবতী নগরীর দূরত্ব প্রায় একই প্রকার অর্থাৎ প্রায় নাগপুরের দূরত্বের সমান। ইলিচপুর আরও ত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এ ক্ষেত্রে চন্দা-নগরীই হুয়েন-সাং-কথিত কোশল-রাজ্যের রাজধানী হওয়া সম্ভবপর। অমরাবতীকে কানিংহাম ধরণীকোটা বা ধানাকাকাতা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গুপ্তরাজগণের শাসন-কালে দক্ষিণ-কোশল—মহাকোশল নামে পরিচিত হইয়াছিল। ঐ বংশের ভব-গুপ্তের রাজত্ব-কালে কলিঙ্গ ও উৎকল প্রদেশ মহাকোশলের অন্তর্ভুক্ত হয়। হুয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ সময়ে জনৈক বৌদ্ধ-নৃপতি মহাকোশলে রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার নাম শতবাহন বলিয়া উল্লিখিত হয়। কাহারাও কাহারও মতে বর্ত্তমান ছত্রিশগড় এবং গণ্ডোয়ানা প্রদেশ মহাকোশলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উত্তর-কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী এবং দক্ষিণ-কোশলের রাজধানী কুশাবতী বা কুশস্থলী কোন্ সময় কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কি প্রকারে কি আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে, পুরাণেতিহাসে তাহার নানারূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত—শ্রাবস্তী নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব-কালের অনেক পূর্ব্ব হইতেই শ্রাবস্তী-নগরী বিদ্যমান ছিল। কুশস্থলী-পুরীও বহু প্রাচীন বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। আনর্ত্তের পুত্র রেবত কুশস্থলী-নাম্নী পুরীতে বাস করিতেন। রেবতের পুত্র রৈবতও সেই পুরীর অধিকারী হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণানুসারে পুণ্যজন-নামধেয় রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক কুশস্থলী-পুরী বিধ্বস্ত হয়। সেই অমরাবতী-তুল্য রমণীয় কুশস্থলী পরিবর্ত্তি-কালে দ্বারকাপুরী নামে অভিহিত হইয়াছিল। * কুশস্থলীর এই বিবরণ অলৌকিক রহস্যপূর্ণ। রেবতের এক শত পুত্রের মধ্যে রৈবত কুকুদ্মিই জ্যেষ্ঠ। সেই পরম-ধার্ম্মিক রাজা রৈবত আপন কন্যা রেবতীর বিবাহের উপযুক্ত পাত্রানুসন্ধান জন্য বহির্গত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেখানে এক মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মলোকের সেই এক মুহূর্ত্তে ভূতলে বহু যুগ অতীত হইয়া যায়। অবশেষে অষ্টাবিংশতিতম মনুর অধিকারের চতুর্যুগ গতপ্রায় হইলে, রাজা রৈবত পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন বলরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বলরাম-রূপ উপযুক্ত পাত্রে আপন রেবতী-কন্যাকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হন। † রৈবত রাজা যখন পৃথিবীতে অবতারণ করেন, তাঁহার কুশস্থলী তখন দ্বারকা-পুরী রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং শ্রীবলরাম দ্বারকাপুরীর শোভা-সম্বর্দ্ধন করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। এতদুপাখ্যানে মনে হয়, পূর্ব্বে যেখানে রাজধানী ছিল, পরিবর্ত্তিকালে সেখান হইতে রাজধানী দ্বারকাপুরীতে উঠিয়া আসিয়াছিল। মৎস্যপুরাণানুসারে কুকুদ্মির পূর্ব্বপুরুষ আনর্ত্ত—আনর্ত্ত-দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর নাম—কুশস্থলী। বলরামের সহিত রেবতীর বিবাহ-ঘটিত উপাখ্যান সেখানে উল্লিখিত হয় নাই। যাহা হউক, কুশরাজ্য কুশস্থলী, আর এই কুশস্থলী অভিন্ন কি না—কে নির্ণয় করিবে? যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে দুই কুশস্থলীই এখন লোপ পাইয়াছে। মধ্য-ভারতের চান্দা, নাগপুর বা অমরাবতী কখনই সে কুশস্থলী হইতে পারে না। রামায়ণে কুশস্থলীর নাম নাই। রামায়ণের সে নাম—কুশাবতী। কুশাবতী ও কুশস্থলী এক কি না, তাহাও নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হুয়েন-সাং—'কিয়াও-সা-লো' (Kiao-sa-lo) নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন; ভারতবর্ষের দুরদৃষ্ট যে, তাহা হইতেই আমাদিগকে এখন কুশস্থলীর সন্ধানে ফিরিতে হইতেছে। শ্রাবস্তী সম্বন্ধেও এইরূপ বিবিধ মত প্রচলিত। রামায়ণে এবং বায়ুপুরাণে উত্তর-কোশলের

কুশস্থলী ও শ্রাবস্তী।

---

* বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশে প্রথম অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোকে কুশস্থলীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"কুশস্থলী যা তব ভূপ রম্যা পুরী পুরাভূদমরাবতীব।
সা দ্বারকা সম্প্রতি তত্রচাস্তে সকেশবাংশোবলদেব নামা॥"

† "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, ৩৪৮শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাজধানী শ্রাবস্তী—এই মাত্র লিখিত আছে। * কিন্তু মৎস্যপুরাণে শ্রাবস্তী-নগরীর একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে,—'শ্রাবস্ত কর্ত্তৃক গৌড়দেশে শ্রাবস্তী-পুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল।' † লিঙ্গপুরাণ এবং কূর্ম্মপুরাণেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। ইহাতে পরবর্ত্তিকালে শ্রাবস্তীর অবস্থান সম্বন্ধে বড়ই মতান্তর ঘটিয়াছে। যাহা হউক, সকল মতের আলোচনা করিয়া, সরযূ বা ঘর্ঘরা নদীর উত্তর-পারস্থিত প্রদেশ উত্তর-কোশল এবং তদন্তর্গত নগরী বা রাজধানীই শ্রাবস্তী-পুরী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কানিংহাম বলেন,—'অযোধ্যা-রাজ্য সরযূ নদী কর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। উত্তর-ভাগের নাম—উত্তর-কোশল এবং দক্ষিণ-ভাগের নাম—বানায়োধ (Banaodha)। ঐ দুই অংশ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটী ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। বানায়োধের মধ্যে 'প্রাচ্যরাট' এবং 'পূর্ব্বরাট' অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিভাগ ছিল। এদিকে উত্তর-কোশল—গৌড় ও কোশল নামক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। রাপ্তি-নদীর দক্ষিণ-দিকস্থিত প্রদেশ গৌড়দেশ নামে এবং তাহার উত্তর-দিকস্থিত প্রদেশ কোশল-দেশ নামে অভিহিত হইত। গৌড়ের মধ্যে শ্রাবস্তী এবং কোশলের মধ্যে অযোধ্যা-নগরী বিদ্যমান ছিল। শ্রাবস্তী-নগরীর ধ্বংসাবশেষ সেই গৌড়-প্রদেশে এখনও দৃষ্ট হয়। সেই গৌড়-প্রদেশ এখন 'গণ্ডা' জেলা নামে মানচিত্রে পরিচিত।' বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-কালে শ্রাবস্তী-নগরীতে বৌদ্ধ-প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ফা-হিয়ান, শ্রাবস্তীকে 'সি ওয়ে' (She-Wei) নামে এবং হুয়েন-সাং 'সে-লো-ফা-সি-টি' (She-lo-fa-si-ti) নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। হুয়েনসাঙের বর্ণনা অনুসারে শ্রাবস্তী-রাজ্যের পরিধি—চারি সহস্র লি অর্থাৎ প্রায় ৬৬৭ মাইল ছিল। হুয়েন-সাং যে সময়ের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তখন হয় তো হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত মালভূম (Malbhum) ও খাসী (Khachi) প্রদেশদ্বয় শ্রাবস্তীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহা হইলে বুঝা যায়,—এক দিকে (উত্তরে) হিমালয়-পর্ব্বত, অন্য দিকে (দক্ষিণে) ঘর্ঘরা নদী, পশ্চিমে কর্ণালী-নদী, পূর্ব্বে ধবল-গিরি ও ফয়জাবাদ,—এতৎ-সীমান্তর্ব্বর্ত্তী দেশ তৎকালে শ্রাবস্তী বলিয়া পরিচিত ছিল। ঐ সীমান্তর্ব্বর্ত্তী দেশের পরিধি প্রায় ছয় শত মাইল দাঁড়াইতে পারে। হুয়েন-সাঙের হিসাবের সহিত তাহা প্রায় মিলিয়া যায়। লব-রাজ্য শ্রাবস্তীর নাম—পুরাবৃত্তে অনেক দিন পর্য্যন্ত অপরিচিত ছিল। বুদ্ধদেবের সম-সময়ে মহাকোশলের পুত্র প্রসেনজিতের রাজধানী-মধ্যে উহা পরিগণিত হয়। রাজা প্রসেনজিৎ বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট-কাল বুদ্ধদেবের সুহৃৎ ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের রক্ষক-রূপে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। এই প্রসেনজিতের রাজত্ব-কালে, রাজ-গৃহে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়া, বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী-পুরীতে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে 'জিতবন' নামক এক অরণ্যে বৌদ্ধগণের আবাস-স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব সেই অরণ্যে গমন করিয়া সর্ব্বদা শিষ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের দ্বিতীয় বর্ষের শেষ-ভাগে শ্রাবস্তীর সহিত এইরূপে তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত

* রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড, ১০৮শ অধ্যায়; বায়ুপুরাণ, ৮৮শ অধ্যায়।

† মৎস্যপুরাণ, দ্বাদশ অধ্যায়।

হয়। তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের সপ্তম বর্ষে, বর্ষার পর, আর এক বার তিনি শ্রাবস্তী নগরীতে আগমন করিয়াছিলেন। কথিত হয়, সেই সময়ে বুদ্ধের এক অলৌকিক কার্য্যের বিষয় প্রচারিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের জন্মের সাত দিবস পরে তাঁহার জননীর লোকান্তর হয়। এই সময় সেই লোকান্তরিতা জননীর নিকট স্বর্গধামে গমন করিয়া বুদ্ধদেব স্বর্গগতা আপন জননীকে ধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রসেনজিতের পুত্র বিরোধক শাক্যগণকে বড়ই ঘৃণা করিতেন। শাক্যদিগের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তিনি পাঁচ শত শাক্য-মহিলাকে নিহত করেন। ঐ সকল শাক্য-মহিলাকে প্রথমে তিনি আপন অন্তঃপুরচারিণী করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহার হস্তে নিরীহ মহিলাকুল প্রাণ-দানে বাধ্য হইয়াছিল। বিরোধকের এবম্বিধ নৃশংসাচরণে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন। সে অভিশাপ—সাত দিনের মধ্যে নৃশংস নৃপতি অগ্নি-দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইবেন। হুয়েন-সাং যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই লোমহর্ষণ কাহিনী বৌদ্ধগণ তাঁহার নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। অধিক কি, সেই ঘটনার একাদশ শতাব্দী পরেও বৌদ্ধগণ একটী পুষ্করিণী দেখাইয়া হুয়েন-সাংকে বলিয়াছিলেন,—'নৃশংস নরপতি অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় এই পুষ্করিণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও তিনি নিষ্কৃতি-লাভ করিতে পারেন নাই।' বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পাঁচ শতাব্দী পরে, কনিষ্কের রাজত্ব-কালের এক শতাব্দী অতীত হইলে, বিক্রমাদিত্য শ্রাবস্তীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বৌদ্ধগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তিনি অশেষ প্রকার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কালে 'বিভাস-শাস্ত্র' নামক গ্রন্থ-প্রণেতা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক 'মানরহিত' ব্রাহ্মণগণের সহিত তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, আত্ম-হত্যা করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের উত্তরাধিকারীর শাসনকালে বসুবন্ধু নামক মানরহিতের জনৈক প্রধান শিষ্য ব্রাহ্মণদিগকে তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করেন। বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার সেই উত্তরাধিকারীর রাজত্ব-কাল ৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৩ খৃষ্টাব্দ বলিয়া কথিত হয়। পরবর্ত্তী দুই শতাব্দী কাল ক্ষীরধার এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ শ্রাবস্তীনগরের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ২৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের শাসন-কাল। পূর্ব্বে যে সময়ের কথা উল্লিখিত হইল, সেই সময়ে মগধের গুপ্তরাজগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। 'সাকেত' নগরে তখন তাঁহাদের অধীন-রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইত। শ্রাবস্তীর রাজাও মগধের বশ্যতা স্বীকার করিতেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। গুপ্তবংশের প্রাধান্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবস্তী-পুরী ধ্বংস-পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ৪০০ খৃষ্টাব্দে ঐ নগরে দুই শত মাত্র পরিবারের বসতি ছিল। চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন শ্রাবস্তী নগর পরিদর্শন করেন, নগরীর তখন ঐ অবস্থা। নগরী দিনদিনই তখন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—যে জিতবনে বুদ্ধদেব আপনার ধর্ম্ম-প্রচার করিতেন, সে বনের সৌন্দর্য্য তখনও পূর্ণমাত্রায় বিকশিত ছিল। সেই বিহার বা প্রচার-ক্ষেত্র, যেখানে বসিয়া বুদ্ধদেব ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেন, সেটীও তখন অভিনব সৌন্দর্য্য-

শালী ছিল। স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবর, মুকুলিত কুঞ্জবন, বিবিধ বিচিত্র পুষ্পস্তবকপূর্ণ বৃক্ষরাজি—সে স্থানের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিল। সেই বিহার বা মঠের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি যখন শুনিলেন,—ফা-হিয়ান এবং তাঁহার সহকারী উভয়ে চীন-দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পরিব্রাজককে লক্ষ্য করিয়া মঠাধ্যক্ষ আবেগভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—'বড় আশ্চর্য্য! সত্যের অনুসন্ধান জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে মানুষ যে এত দূরদেশে আসিতে পারে, ইহা বড়ই বিস্ময়াবহ।' পূর্ব্বে যে নগরী নিয়ত জনকোলাহলে পূর্ণ ছিল, ফা-হিয়ানও যে নগরে দুই শত লোকের বাস দেখিতে পাইয়াছিলেন, ৬৩২ খৃষ্টাব্দে সেই নগরী সম্পূর্ণরূপ জনশূন্য হইয়াছিল। বর্ত্তমান-কালে এখন যদি কেহ শ্রাবস্তী-নগরীর অনুসন্ধান লইতে যান, বন্যজন্তুপূর্ণ বিষম জঙ্গল পুরোভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে,—দেখিতে পাইবেন।

প্রাচীন কোশল রাজ্যের প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের আরও নানা স্থানের কথা আসিতে পারে। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্রদ্বয়—লব ও কুশ, যেমন শ্রাবস্তী ও কুশাবতী রাজধানী স্থাপন করিয়া, উত্তর-কোশল ও দক্ষিণ-কোশল দুই জনপদের অধীশ্বর হন, তেমনই ভরতের দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল, তক্ষশীলায় ও পুষ্কলাবতে এবং লক্ষ্মণের দুই পুত্র—অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু—অঙ্গদীয়া ও চন্দ্রবক্ত্রা নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জনপদে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন। এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের কোশল-রাজ্য তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে বিভাগীকৃত হওয়ার বিবরণ-দৃষ্টে, সে রাজ্য এক সময়ে কত দূর বিস্তৃত ছিল, তাহার আভাষ পাওয়া যায়। উত্তর-কোশল ও দক্ষিণ-কোশলের স্থান-নির্দ্দেশ-ব্যপদেশে আমরা বুঝিয়াছি,—উত্তর-ভারতের এবং দক্ষিণ-ভারতের বহু প্রদেশ কুশী-লবের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। তক্ষের তক্ষশীলা এবং পুষ্কলের পুষ্কলাবতী রাজ্যের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই,—উত্তর-পশ্চিমে ভারত-সীমান্ত—এমন কি বর্ত্তমান আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত, সেই দুই রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। রামায়ণে দেখিতে পাই,—গন্ধর্ব্ব-দেশকে দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়া, তক্ষশীলা ও পুষ্কলাবত নামক দুইটী পুরী বা রাজধানী নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক, ভরতের দুই পুত্রকে প্রদান করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষ যখন নবভাগে বিভক্ত ছিল, তখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত দেশ (আফগানিস্থান প্রভৃতি প্রদেশ—এমন কি, পারস্য পর্য্যন্তও তাহা বিস্তৃত থাকা অসম্ভব নহে) গন্ধর্ব্ব-দেশ নামে অভিহিত হইত। পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—মধ্য-যুগে যাহা গান্ধার, অধুনা যাহা কান্দাহার, প্রাচীনকালে তাহাই গন্ধর্ব্ব-দেশ নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবোর বিবরণে 'গান্দারাইটিস' (Gandaritis) নাম দৃষ্ট হয়। সিন্ধু-নদ এবং চোস্পেশ (Chospes) নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে, কপিশা (Kophes) নদীর তীরে, ঐ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। টলেমির উচ্চারণ গান্দারী (Gandarae)। তাঁহার বর্ণনায় বুঝা যায়—সিন্ধুনদের সহিত কপিশা নদী যেখানে সম্মিলিত হইয়াছে, তাহার উত্তরাংশস্থিত প্রদেশ ঐ নামে অভিহিত ছিল। চীন-দেশীয় পরিব্রাজকগণের

পুষ্কলাবতী প্রভৃতি।

* রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১১৪শ অধ্যায়।

উচ্চারণে গান্ধার—'কিয়েন-টো-লো' (Kien-to-lo) নামে পরিচিত। সিন্ধু-নদের পশ্চিমে উহা অবস্থিত—তাঁহারা সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ঐ রাজ্যের রাজধানীর নাম—'পু-লু-শা-পু-লু' (Pu-lu-sha-pu-lu) অর্থাৎ পলাশপুর। সিন্ধু-নদ হইতে চারি দিন পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে, যে একটি স্রোতস্বিনী দৃষ্ট হয়, তাহারই তীর-দেশে ঐ নগর বিদ্যমান ছিল। কানিংহাম বলেন,—এখন যাহা পেশোয়ার, তাহাই তখন ঐ নামে অভিহিত হইত; কারণ, মোগল-সম্রাট আকবরের শাসন-কালেও পেশোয়ার 'পরাশোয়ার' (Parashawar) নামে পরিচিত ছিল। আবুল-ফজেল, বাবর এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক 'আবুরিহান' * এবং দশম শতাব্দীর আরব-দেশীয় ভৌগোলিকগণ সকলেই ঐ কথা কহিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়ান ঐ নগরের নাম 'ফোলু-শা' (Folu-sha) রূপে উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—'নগরহার' † হইতে ঐ নগরের দূরত্ব—ষোল যোজন অর্থাৎ প্রায় এক শত বার মাইল। চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনায়, ঐ প্রদেশ পূর্ব্ব-পশ্চিমে এক হাজার 'লি'—প্রায় এক শত ছেষট্টি মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে আট শত 'লি'—প্রায় এক শত তেত্রিশ মাইল বিস্তৃত ছিল। এইরূপ দৈর্ঘ্য-বিস্তৃতির আলোচনায় কানিংহাম প্রাচীন গান্ধার-রাজ্যের একটি সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'দৈর্ঘ্য-বিস্তৃতির আলোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয়, গান্ধার রাজ্যের পশ্চিমে লামঘান ও জেলালাবাদ, উত্তরে স্বাত-প্রদেশ ও বুনীর গিরিশ্রেণী, পূর্ব্বে সিন্ধু-নদ এবং দক্ষিণে কালাবাগ শৈলমালা,—এতন্মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই গান্ধার-রাজ্য নামে অভিহিত হইত। এই সীমানার মধ্যে প্রাচীন-ভারতের বহু প্রসিদ্ধ নগরী বিদ্যমান ছিল। এই সীমানার মধ্যেই বহু নগর-জনপদাদি আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের লোমহর্ষণ ঘটনাবলীর স্মৃতি-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে; আর, এই সীমানার মধ্যেই

* আবু-রিহান—আলবারুণি নামেও প্রসিদ্ধ। তিনি একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিলেন ৯৭০ খৃষ্টাব্দে, বর্ত্তমান 'খিবা' প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদ যখন খিবা অধিকার করেন, এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিককে তিনি বন্দী করিয়া গজনীতে লইয়া যান। মামুদের অত্যাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলবারুণি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিরপেক্ষতার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়; তবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতবাসীর অনভিজ্ঞতার বিষয় যাহা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা সমীচীন নহে। মামুদের ভারত-আক্রমণের সময় ভারতবর্ষের অধঃপতন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যে সর্ব্ব-বিষয়ে সমুন্নত ছিল—তাহা বলাই বাহুল্য।

† নগরহার (Nagarahara)—জেলালাবাদ প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী। চারি মাইল ইহার পরিধি ছিল। এতৎপ্রদেশ বিবিধ ফল-ফুলে সুশোভিত ছিল; অধিবাসীরা সাহসী, সরল ও সৎপ্রকৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। চীনাদিগের গ্রন্থে ঐ নগর 'নাঙ্গোলোহোলো' (Nang-go-lo-ho-lo) নামে অভিহিত। হুয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ-কালে ঐ নগরে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাধান্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ নগরে হিন্দুদিগের পাঁচটী দেব-মন্দির ছিল এবং তৎকালে ঐ নগরে এক শত হিন্দু বাস করিত। নগরহারের পূর্ব্বপ্রান্তে রাজা অশোকের নির্ম্মিত তিন শত ফিট উচ্চ বিবিধ কারু-খচিত একটি স্তূপ বিদ্যমান ছিল। নগরের নিকট অনেকগুলি বৌদ্ধদিগের 'সাঙ্ঘারাম' দৃষ্ট হয়। তৎকালে গান্ধার এবং নগরহার কপিশার রাজার প্রাধান্য স্বীকার করিত। নগরহারের আধুনিক নাম—নাংনিহার (Nang-Nihar) অর্থাৎ নয়টী নদীর সম্মিলন-স্থল। হয় তো সে স্থলে প্রাচীন-কালে নয়টী নদী প্রবাহিত ছিল।

বহু নগরীতে বুদ্ধদেবের অলৌকিক কীর্ত্তি-কাহিনী-সমূহ সংশ্লিষ্ট আছে। রাজা কনিষ্কের কত কীর্ত্তি-গাথাও এই সীমানায় নিবদ্ধ রহিয়াছে।' তবে যাহা পদাশপুর, পরাশোয়ার বা পেশোয়ার বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাই যে ভরত-পুত্র পুষ্কলের রাজ্য পুষ্কলাবতী ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে 'পিউ-কে-লাও-টিস' (Peu-ke-lao-.is) অথবা 'পিউকোলাইটিস' (Peu:olaitis) নামক নগরের নাম দৃষ্ট হয়। কানিংহাম বলেন,—সংস্কৃত ভাষার 'পুষ্কলাবতী' এবং পালি-ভাষার 'পুক্কালাওতী' (Pukkalaoti) আলেকজাণ্ডারের সময়ে পুর্ব্বোক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় ঐ নগরের অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—পরাশোয়ার পরিত্যাগ করিয়া উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে তিনি এক শত লি অর্থাৎ প্রায় সতের মাইল পথ অগ্রসর হন। তৎপরে একটি নদী অতিক্রম করিয়া 'পু-সে-কিয়া-লে-ফা-তি' (Pu-se-kia-lo-fa-ti) নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। উহাই যে পুষ্কলাবতী নগরী, অনেকে তাহা অনুমান করেন। পুষ্কলাবতী নগরী একটি বৌদ্ধ-স্তূপের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। কথিত হয়, সেই স্থানে বুদ্ধদেব আপন চক্ষু উৎপাটন করিয়া ভিক্ষা-দান করিয়াছিলেন; তাহারই স্মরণার্থ ঐ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে, পুষ্কলাবতী-নগরে অবস্থান-কালে, হুয়েন-সাং জানিতে পারিয়াছিলেন,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আরও সহস্রবার বুদ্ধদেব ঐরূপে ভিক্ষা-স্বরূপ আপনার চক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর ফা-হিয়ান এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর সুং-উং বুদ্ধদেবের একবার চক্ষু-দানের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক এরিয়ান (A:ian) পুষ্কলাবতীকে 'পিউকেলাস' (Peukelas) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ঐ নগর সিন্ধুনদের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। আলেকজাণ্ডার যখন নগর আক্রমণ করেন, 'অস্তেজ' (Astes) বা অষ্ট নামক একজন নৃপতি তখন ঐ নগরে রাজত্ব করিতেন। ত্রিশ দিন নগর অবরোধের পর আলেকজাণ্ডারের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ 'হেফাষ্টিয়ান' কর্ত্তৃক অস্তেজ নিহত হন। তখন নগরটী আলেকজাণ্ডারের অধিকারে আসে। আলেকজাণ্ডার তৎপরে সিন্ধুনদের অভিমুখে অগ্রসর হন। ষ্ট্রাবো ও এরিয়ান যদিও ঐ নগরকে সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু টলেমি সু-অস্তিন অর্থাৎ স্বাত বা পাচকোড়া নদীর পূর্ব্বধারে ঐ নগরীর বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এ বিষয়ে টলেমির বর্ণনার সহিত হুয়েন-সাঙের বর্ণনার অভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ঐ নগরী এক সময়ে 'অষ্ট' নগর নামে পরিচিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে দেখা যায়,—পুষ্কলাবতীর সন্নিকটে স্বাত-নদীর অপর পারে আটটী নগরী অবস্থিত ছিল। সেই অষ্ট-নগরের অধিপতি অষ্টকের নামানুসারে উহার 'অষ্টক' নাম হওয়া অসম্ভব নহে। ফলে, প্রাচীন পুষ্কলাবতী কাল-বশে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে, তাহার আশে-পাশে নানা নামের নানা নগরীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডার যে সময়ে ভারতে আগমন করেন, প্রাচীনের ভিত্তির উপর তখন সেই সকল নূতন জনপদ দর্শন করিয়াছিলেন। প্রায় পনের মাইল পর্য্যন্ত তখন পুষ্কলাবতীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়াছিল।

তক্ষশীলা পুরাবৃত্তে সুপ্রসিদ্ধ। রামায়ণের মতে, উহা গন্ধর্ব্ব-দেশের অন্তর্ভুক্ত। কোনও কোনও রামায়ণে উহা গান্ধার-দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তক্ষশীলার প্রসঙ্গে রামায়ণে লিখিত আছে,—"ভরতের মাতুল কেকয়-রাজ যুধাজিৎ তাঁহার পুরোহিত অঙ্গিরা-তনয় গার্গ্যের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে উপঢৌকন দিবার জন্য অত্যুৎকৃষ্ট দশ হাজার অশ্ব, কম্বল, উত্তম চিত্র-বস্ত্র এবং নানা প্রকার শুভ আভরণ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সকল উপঢৌকন সহ মহর্ষি গার্গ্য শ্রীরামচন্দ্র সমীপে উপনীত হইয়া জ্ঞাপন করেন,—'মহাবাহো! আপনার মাতুল নরবর যুধাজিৎ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি বলিয়াছেন,—সিন্ধু-নদের উভয়-পার্শ্বে যে ফল-মূল-শোভিত গন্ধর্ব্ব-দেশ আছে, তিন কোটী যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ মহাবল শৈলুষ-তনয় * গন্ধর্ব্ব সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। মহাবাহো! তুমি সেই গন্ধর্ব্বদিগকে পরাস্ত করিয়া গন্ধর্ব্ব-দেশ তোমার সুশাসিত সাম্রাজ্যের অধীন কর।" মহর্ষি গার্গ্যের নিকট মাতুল যুধাজিতের এবম্বিধ অনুরোধের বিষয় শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সাহায্যের জন্য, শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে গন্ধর্ব্ব-দেশ-জয়ে প্রেরণ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের উপদেশ অনুসারে সেই দেশ অধিকার করিয়া ভরত আপনার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দেন। সেই সূত্রে ভরতের জ্যেষ্ঠ পুত্র তক্ষ তক্ষশীলা লাভ করেন; আর, সেই সূত্রেই তক্ষশীলা নগরীতে তক্ষের রাজধানী স্থাপিত হয়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে (তৃতীয় অধ্যায়ে) রাজা জনমেজয় তক্ষশীলা জয় করেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ভরত-পুত্র তক্ষের বংশধরগণই তখনও তক্ষশীলায় রাজত্ব করিতেছিলেন, কি অপর কোনও নূতন রাজবংশ তক্ষশীলায় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার কোনও নিদর্শন নাই। মহারাজ জনমেজয় তক্ষশীলা অধিকার করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ দেশ শাসন করিয়াছিলেন এবং সেই তক্ষশীলায়ই তাঁহার সর্প-সত্রের অনুষ্ঠান হইয়াছিল,—মহাভারতে স্বর্গারোহণ-পর্ব্বে (পঞ্চম অধ্যায়ে) তাহা লিখিত আছে। সেখানে দেখিতে পাই,—'মহারাজ জনমেজয় তক্ষশীলায় সর্প-সত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞ সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিয়া তিনি তক্ষশীলা হইতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন।' জনমেজয়ের পূর্ব্ববর্তী কালে, যুধিষ্ঠিরাদির প্রাধান্য-সময়ে, তক্ষশীলার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। গন্ধর্ব্বগণের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, গন্ধর্ব্ব-দেশ তাঁহারা অধিকার করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব-সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিত, এরূপ বর্ণনা মহাভারতের নানা স্থানে দেখা যায়। কিন্তু গন্ধর্ব্ব-গণের রাজধানী তখন যে তক্ষশীলা নামে পরিচিত ছিল, তাহার কোনই নিদর্শন নাই। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন, 'তক্ক' জাতি কর্তৃক তক্ষশীলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ জাতির আদিপুরুষের নাম—তক্ষক। আজিও আটক নগরে এবং পঞ্জাবের নানা স্থানে, রাওলপিণ্ডী বিভাগে, তক্ক-জাতীয় লোক দৃষ্ট হয়। তক্কগণ নাগোপাসক ছিলেন; তাঁহাদের তক্ষশীলা-নগরে সর্প-বিগ্রহের পূজা হইত। রাজা কনিষ্ক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনায় সেই সর্প-পূজা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তক্ক-

তক্ষশীলা।

* এই শৈলুষ-তনয়গণকে কেহ কেহ 'সেলজুক' আফগান বলিয়া অনুমান করেন।

জাতিকে তুরানীয়-বংশ-সম্ভূত বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন। টড সাহেবের মতে, তক্ষ তুরস্ক-জাতির শাখা-বিশেষ। পুরাণের মতে—শেষ, বাসুকী ও তক্ষক, এই তিন জন প্রধান নাগ। তক্ষকের পিতার নাম কশ্যপ এবং মাতার নাম কদ্রু। তক্ষক ইচ্ছাক্রমে সর্প-দেহ ও নরদেহ পরিগ্রহ করিতে পারিতেন। খাণ্ডববনে তাঁহার বাস ছিল। তক্ষক-দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুর বিষয়, তক্ষক-বংশীয়গণের জাতীয়-নিদর্শন সর্প এবং জনমেজয়ের সর্প-সত্রে তক্ষক-বংশ-ধ্বংস,—ইহার মধ্যে কোনরূপ রূপকের সংস্রব আছে বলিয়াও অনেকে অনুমান করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে, তক্ষক ও নাগ-বংশীয়-গণ অনার্য্য-জাতি-মধ্যে পরিগণিত। কানিংহাম সিদ্ধান্ত করেন, তক্ষক-দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু অর্থ--তক্ষ-জাতির সহিত যুদ্ধে পাণ্ডবগণ পরাজিত হইলে পরীক্ষিত নিহত হন। যাহা হউক, তক্ষশীলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে ঐ নামে একাধিক স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণের মতে, সিন্ধু-নদের উভয়-পার্শ্বে ঐ দেশ অবস্থিত ছিল। মহা-ভারতে উহার কোনও স্থান-নির্দ্দেশ হয় নাই। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত-আক্রমণে অগ্রসর হন, পঞ্চ-নদ প্রদেশের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য বলিয়া তক্ষশীলার পরিচয় পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ইতিহাসে প্রকাশ, পঞ্চনদ-প্রদেশ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই সকল রাজ্যের নৃপতিগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসা-দ্বেষ-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্চনদ-প্রদেশে উপনীত হন, তাঁহাকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, তক্ষশীলার অধিপতি তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের প্রতিদ্বন্দ্বী পুরু-বংশীয় রাজার (Porus) সহিত তক্ষশীলার তাৎকালিক অধিপতির শত্রুতা ছিল। কথিত হয়, সেই জন্যই তিনি আলেকজাণ্ডারের সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, আলেকজাণ্ডার তিন দিন তক্ষশীলায় অবস্থান করিয়া, তক্ষশীলার রাজার নিকট সম্মান-সমাদর লাভ করিয়া, ভারতাভিমুখে অগ্রসর হন। পুরুবংশীয় সেই রাজা (পোরস), আলেক-জাণ্ডারের সহিত ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় বাধা দিয়াও আলেকজাণ্ডারের গতিরোধ করিতে পারেন নাই; পরন্তু তিনি আলেকজাণ্ডারের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু পুরুবংশীয় রাজার বীরত্বে মহাবীর আলেকজাণ্ডার এতই মুগ্ধ হন যে, অবশেষে তাঁহার রাজ্য জয় করিয়াও সে রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। তখন পারিপার্শ্বিক কয়েকটী রাজ্যও পুরুবংশীয় রাজার অধিকার-ভুক্ত হয়। ইহার পর, আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলিউকাস নিকাটর সিন্ধু-নদ অতিক্রম করিয়া তক্ষশীলা প্রদেশ ও পুরুবংশীয় রাজার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত তখন মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলিউকাসের মিত্রতা-বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সূত্রে চন্দ্রগুপ্তের নিকট কতকগুলি হস্তী উপহার প্রাপ্ত হইয়া, সেলিউকাস আপনার অধিকৃত পঞ্চ-নদ-প্রদেশের সমস্ত রাজ্য চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান করিয়া যান। তদবধি তক্ষশীলা মগধ-রাজ্যের অধিকার-ভুক্ত হয়। আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনের পঞ্চাশ বৎসর পরে, বিন্দুসারের রাজত্ব-কালে, তক্ষশীলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ-পুত্র সুসীমা তখন তক্ষশীলা-

প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। বিন্দুসারের মধ্যম-পুত্র অশোক সেই সূত্রে তক্ষশীলায় গমন করেন। তক্ষশীলায় শান্তি স্থাপিত হয়। অশোক, তক্ষশীলার অধিপতি বলিয়া পরিচিত হন। ইহার পর, অনেক দিন পর্য্যন্ত তক্ষশীলা অশোকের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত ছিল। অশোক যখন তক্ষশীলার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তক্ষশীলার রাজ ভাণ্ডারে তখন ছত্রিশ কোটী মুদ্রা সঞ্চিত ছিল। যত দিন বিন্দুসার জীবিত ছিলেন, প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা রূপে অশোক তক্ষশীলা-প্রদেশ শাসন করিতেন। বিন্দুসারের লোকান্তরের পর অশোক যখন মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তাঁহার পুত্র কুণাল তখন ঐ প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মৌর্য্যবংশের রাজত্বের অবসানে তক্ষশীলা ইউক্রেটাইড্‌সের + রাজ্যান্তর্ভুক্ত হয়। ১২৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে গ্রীকদিগের হস্ত হইতে ঐ রাজ্য শক জাতীয় সুস বা আবার্স (Sus or Abars) কাড়িয়া লন। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর কাল তক্ষশীলা তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। অবশেষে কুশাল-বংশীয় শকগণ তক্ষশীলা অধিকার করেন। তখন কনিষ্ক ঐ রাজ্যের অধিপতি হন। 'পরাশর' (পেশোয়ার) —কনিষ্কের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল; তক্ষশীলার শাসন-ভার তিনি জনৈক প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তক্ষশীলার প্রাচীন মুদ্রা ও তাম্র-লিপি প্রভৃতি দৃষ্টে এখন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পালি-ভাষায় লিখিত 'তক্খশিলা'—তক্ষশীলার রূপান্তর এবং তাহা হইতেই গ্রীকগণ 'তাক্সিলা' (Tax a) নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন,—মুদ্রা ও তাম্র-লিপি হইতে এতদ্বিষয় প্রতিপন্ন হয়। চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে (৪০০ খৃষ্টাব্দে) তক্ষশীলা নামের পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য। তিনি 'চু-শা-শি-লো' (Chu-sha-shi-lo) নামক একটী নগরের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ঐ শব্দের অর্থ—ছিন্ন মস্তক (Severed Head)। চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনায় প্রকাশ,—বুদ্ধদেব ঐ স্থানে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া ভিক্ষা-দান করিয়াছিলেন। সেই জন্যই ঐ নগর পূর্ব্বোক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ৫০২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সুং-উং ঐ স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—বুদ্ধদেব যেখানে মস্তক দান করিয়াছিলেন, সেখান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইলে তিন দিনের পথে 'শিন্টু' (Shintu) অর্থাৎ সিন্ধু-নদ বিদ্যমান। প্রথমে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে এবং পরে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হুয়েন-সাং তক্ষশীলা দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ নগরের নাম—'তা-কা-শি-লো' (Ta-ka-shi-lo)

+ 'ইউক্রেটাইড্‌স্-দি-গ্রেট' (Eukratides the Great) নামে গ্রীসের ইতিহাসে এক প্রবল প্রতাপশালী নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। বাক্‌ট্রীয়ার অধিপতি বলিয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ। তিনি হিন্দুকুশের দক্ষিণ প্রদেশে পঞ্জাব পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো বলেন,—তিনি ভারতবর্ষের সহস্রাধিক নগরের আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রাচীন মুদ্রাদি পঞ্চনদ প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য যে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। তিনি গ্রীসের অধিপতি ডেমিট্রাসের উত্তরাধিকারী বলিয়া কথিত হন। ভারতবর্ষ জয় করিয়া তিনি যখন দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, তাঁহার পুত্র হেলিওক্লেস (Heliocles) তাঁহার সংহার সাধন করিয়াছিলেন। সে ঘটনা ১৪৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের বলিয়া কথিত হয়।

বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁর বর্ণনায় প্রকাশ,—'ঐ নগরের-পরিধি দশ লি অর্থাৎ প্রায় ১৮০ মাইল। ঐ নগরের আদিম রাজ-বংশ লোপ পাইয়াছে। ঐ প্রদেশ প্রথমে কপিশার রাজার শাসনাধীন ছিল। এখন উহা কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত। ঐ প্রদেশের ভূমি বড়ই উর্ব্বর; ঝরণার ও নদীর জলে সেই উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেখানে অসংখ্য মঠ বিদ্যমান। কিন্তু তাহার অধিকাংশই এখন ধ্বংস-প্রাপ্ত। সেই সকল মঠে ভিক্ষুর সংখ্যা এখন অতি অল্প মাত্র। তাঁহারা প্রায়ই 'মহাযান' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব বিষয়ক বৌদ্ধ-গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন। ঐ নগরের বার কিম্বা তের লি (অর্থাৎ প্রায় দুই মাইল) উত্তরে রাজা অশোকের একটী স্তূপ বিদ্যমান আছে। বুদ্ধদেব পূর্ব্ব-জন্মে যে স্থানে আপনার মস্তক ভিক্ষা-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, উহা তাহারই স্মৃতি-চিহ্ন। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী সহস্র জন্মে বুদ্ধদেব সহস্র বার ঐ স্থানে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া ভিক্ষা দান করিয়াছিলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এইরূপ চারিটী স্তূপ বিদ্যমান আছে।' ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে হুয়েন-সাং দ্বিতীয় বার সেই স্তূপের নিকট (যেখানে বুদ্ধদেব সহস্র বার মস্তক দান করিয়াছিলেন) সম্মান প্রদর্শন করেন। হুয়েন-সাং তক্ষশীলা-প্রদেশের পরিধি দুই হাজার লি অর্থাৎ প্রায় তিন শত তেত্রিশ মাইল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হুয়েন-সাঙের সেই হিসাব হইতে কানিংহাম সিন্ধুনদের পশ্চিম-দিকস্থিত একটী প্রদেশকে প্রাচীন তক্ষশীলা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। পশ্চিমে সিন্ধু নদ, উত্তরে উরাশা-জেলা, পূর্ব্বে বিতস্তা-নদী এবং দক্ষিণে সিংহপুর-জেলা,—কানিংহামের মতে, এতৎসীমান্তর্বর্ত্তী প্রদেশেই প্রাচীন তক্ষশীলা বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন তক্ষশীলার এখন আর বিশেষ কোনও নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কানিংহাম স্থির করিয়াছেন, এখন যাহা 'শা-ধেরি' নামে অভিহিত, পূর্ব্বে তৎপ্রদেশ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহ 'তক্ষশীলা' নামে পরিচিত ছিল। পরিবর্ত্তনের প্রবল আঘাতে তক্ষশীলা লোপ পাইয়াছে। তাহার স্থলে এখন নানা নামের নানা নগরীর অভ্যুদয় হইয়াছে।

কোশল-রাজ্যের সহিত সংশ্রবযুক্ত আরও বিবিধ জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সকল জনপদ এখন কোথায়,—কি নামে অবস্থিত, নির্ণয় করা সুকঠিন। রামায়ণে লিখিত আছে, কেকয়-রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল গিরিব্রজ বা রাজগৃহ। সেই গিরিব্রজ বা রাজগৃহ এবং মগধের অন্তর্গত গিরিব্রজ বা রাজগৃহ যে স্বতন্ত্র দেশ, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে গিরিব্রজ বা রাজগৃহ কোথায়? কেকয়-রাজ্যই বা কোন্ প্রদেশে অবস্থিত ছিল? রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে কেকয়-রাজ্যের ও গিরিব্রজ নগরের অবস্থানাদির আভাষ পাওয়া যায়। অযোধ্যা হইতে রাজদূত কেকয়-রাজ্যে গিরিব্রজে গমন করিয়াছিল এবং ভরত গিরিব্রজ হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; গমনাগমনের সময়ে তাঁহাদিগকে যে সকল দেশ, নগর, নদ-নদী ও পর্ব্বতাদি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, রামায়ণে তাহার উল্লেখ আছে। অযোধ্যা হইতে কেকয়-রাজ্যে গমন করিবার সময় রাজদূত প্রথমে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। রামায়ণের বর্ণনায় লিখিত আছে,—"তাহারা পশ্চিম দিকে অপরতাল দেশের এবং উত্তর দিকের

কেকয়-রাজ্যে গিরিব্রজ ও রাজগৃহ।

প্রলম্ব নামক জনপদের মধ্যবাহিনী মালিনী নদীর শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিল। পরে হস্তিনাপুরে যাইয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, পাঞ্চাল দেশ অতিক্রম করিয়া, পশ্চিমাভিমুখে কুরু-জাঙ্গলের মধ্যভাগ দিয়া যাইতে লাগিল। ইহার পর, শরদণ্ড-নাম্নী মনোহারিণী নদী অতিক্রম করিয়া তাহারা কুলিঙ্গ-নাম্নী পুরীতে প্রবেশ করে। পরে অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক জনপদ-দ্বয় অতিক্রম করিয়া, ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের পিতৃ-পিতামহ-সেবিতা পুণ্যদায়িনী ইক্ষুমতী নদী উত্তীর্ণ হয়। অতঃপর, বাহ্লিক দেশের মধ্য দিয়া গমন করিয়া সুদামা পর্ব্বতে গিয়া উপনীত হইয়াছিল। বিপাশা, শাল্মলী প্রভৃতি নদী এবং বহু বাপী ও সরোবর অতিক্রমের পর তাহারা গিরিব্রজপুরে উপনীত হয়।" * যাইবার সময় দূত যে যে স্থান দিয়া গিরিব্রজে গমন করিয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ভরত তাহার দুই-একটী স্থান মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে ভিন্ন পথে আসিয়াছিলেন, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণের বর্ণনায় প্রকাশ,—'ইক্ষ্বাকু-নন্দন ভরত পূর্ব্বাভিমুখীন হইয়া, রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, সেই সুদামা-নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। পরে তিনি অতি-বিস্তৃতা তরঙ্গ-সমাকুলা পশ্চিমবাহিনী হ্লাদিনী-নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইয়া শতদ্রু-নাম্নী নদীর পর পারে গমন করিলেন। ইহার পর, ঐলধান নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী নদী, অপর-পর্ব্বত প্রদেশ, শিলাবহা নদী গঙ্গা ও স্বরস্বতীর সঙ্গম-স্থান প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বীরমৎস্য প্রদেশের উত্তর ভাগ দিয়া, তিনি ভারুণ্ড নামক বনে প্রবেশ করেন। কুলিঙ্গা নামক পার্ব্বত্য নদী ও যমুনা অতিক্রম করিয়া অংশুধান নামক গ্রামের নিকটস্থ মহানদী গঙ্গা পার হইতে গিয়া তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন। সেখানে গঙ্গা পার হওয়া কঠিন বিবেচনা করিয়া প্রাগ্বট নগরে গমন-পূর্ব্বক ভরত গঙ্গা পার হন। তৎপরে কুটিকষ্ঠিকা নদী উত্তরণ পূর্ব্বক তিনি ধর্ম্মবর্দ্ধন গ্রামে গমন করেন। সেখান হইতে তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থ গ্রামে উপনীত হন। অতঃপর বরুথ নামক গ্রামের রমণীয় বনমধ্যে রজনী যাপন করিয়া উজ্জিহানা নগরীতে উপনীত হন। পরে সর্ব্বতীর্থ নামক গ্রামে রাত্রি-বাস করিয়া, কয়েকটী নদী অতিক্রম করেন। এই সময় কুটিকা নদী উত্তরণ-পূর্ব্বক লোহিত্য নামক গ্রামে কপিবতী নামক নদী অতিক্রম করেন। ইহার পর একশাল গ্রামের নিকটস্থিতা স্থাণুমতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া বিনোত নামক গ্রামে উপনীত হন। সেখান হইতে গোমতী নদী পার হইয়া কলিঙ্গ নগরে গমন করেন। তৎপরে শালবনে বিশ্রাম করতঃ অরুণোদয়ে অযোধ্যা নগরীতে উপনীত হন। এইরূপে পথি মধ্যে সপ্তরাত্রি কাটাইয়া অষ্টম দিবসে ভরত অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন।' দূতের কেকয়-রাজ্যে গমন এবং ভরতের অযোধ্যায় আগমন,—এই দুই ব্যাপারের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে, কেকয়-রাজ্যের স্থান-নির্দ্দেশ কঠিন হইয়া পড়ে। বাহ্লিক-দেশকে যদি বর্ত্তমান 'বাল্‌খ' প্রদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে কত দূরে কেকয়-রাজ্যের বিদ্যমানতা সম্ভবপর হয়, সহজে বুঝা যায়। কিন্তু ভরতের প্রত্যাগমন-ব্যপদেশে কেকয়-রাজ্য নিকটস্থিত দেশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। সে দেশ তবে কোন্ দেশ?

---

* রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৪শ ও ৭১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কানিংহাম বলেন,—বিতস্তা (Jhelum) নদীর পশ্চিম পারস্থিত জালালপুর এবং তন্নিকট-বর্ত্তী স্থান-সমূহ কেকয়-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আকবরের শাসনকালে সেই প্রাচীন নগরী জালালপুর নামে পরিচিত হয়। জালালপুরের সন্নিকটস্থিত 'গির্জ্জাক' নামক লবণময় গিরি-শ্রেণী গিরিব্রজ নগরের শেষ চিহ্ন বলিয়া মনে হইতে পারে। জালালপুর হইতে উহা এগার শত ফিট উচ্চ। গির্জ্জাক—রামায়ণ-বর্ণিত গিরিব্রজেরই নামান্তর। জালালপুর পঞ্জাবের 'ঝিলম' জেলায় বিতস্তা নামক নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান কেকয়-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল,—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকেই এখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। কাহারও কাহারও মতে, পুরাকালে কাশ্মীরের প্রদেশ-বিশেষ কেকয়-রাজ্য নামে অভিহিত হইত। মহাভারতে, হরিবংশে, এবং তন্ত্র-শাস্ত্রাদিতে কাশ্মীরের নাম বহু বার উল্লিখিত হইয়াছে। * কিন্তু রামায়ণে কাশ্মীরের নাম একেবারেই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং রামায়ণের সম-সময়ে বর্ত্তমান কাশ্মীর-রাজ্য—কেকয় প্রভৃতি নামে পরিচিত থাকা অসম্ভব নহে। কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে 'রাজপুরী' নামক এক নগরীর পরিচয় পাওয়া যায়। সংগ্রাম-পাল সেই নগরে স্বাধীন-ভাব অবলম্বন করিলে, কাশ্মীরাধি-পতি রাজা হর্ষদেব রাজপুরী অধিকার করিবার জন্য দণ্ডনায়ক নামক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আঠার মাস পরে পথ হইতে দণ্ডনায়ক প্রত্যাবৃত্ত হন। পরিশেষে সেনাপতি কন্দর্প কর্ত্তৃক রাজপুরী হর্ষদেবের অধিকার-ভুক্ত হয়। এই রাজপুরীই যে রামায়ণ-বর্ণিত 'রাজগৃহ' নগরের নামান্তর, অনেকের তাহাই বিশ্বাস। † তবে এস্থলে একটী গুরুতর প্রশ্ন উঠিতে পারে। কাশ্মীর হইতে আসিবার সময় দূতকে কেন বাহ্লিক-রাজ্য অতিক্রম করিতে হইল? এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা পূর্ব্বেই আমরা করিয়াছি। পুরাকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ আসিয়া উপ-নিবেশ স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেন। যে পল্লীতে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইত, সেই পল্লী তাঁহাদের নামেই পরিচিত থাকিত। সেই জন্যই আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে একই নামের জনপদের উল্লেখ দেখিতে পাই। কোনও বর্ণনায় দেখিতে পাই,—ভারতের পূর্ব্বোত্তরে চীনাগণের বাস; আবার কোনও বর্ণনায় দেখিতে পাই,—পশ্চিমোত্তরে তাহারা বসতি করে। সে হিসাবে, কাশ্মীর-প্রদেশই যদি কেকয়-রাজ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে, বাহ্লিক-দেশীয় জনগণের বাসস্থলী বাহ্লিক নামে পরিচিত কোনও জনপদ অযোধ্যা ও কেকয়ের মধ্যপথে বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নহে। রামচন্দ্রের নিকট মহর্ষি গার্গ্যের বর্ণনায় কেকয়-রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী গন্ধর্ব্ব-রাজ্যের যে পরি-চয় পাওয়া যায়, তাহাতেও কেকয়-রাজ্যকে বর্ত্তমান কাশ্মীর-রাজ্য বা তাহার অংশ-বিশেষ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

---

* মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৮২শ অধ্যায়ের ৯০শ শ্লোকে কাশ্মীর দেশ তক্ষক-নাগের ভবন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সভাপর্ব্বের ২৭শ শ্লোকে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কাশ্মীর-দেশ-জয়ের বিষয় লিখিত আছে। হরিবংশের ১১ম ও ১১ম অধ্যায়ে কাশ্মীর-রাজ্যের গোনর্দ্দ নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়।

† রাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে রাজা হর্ষদেব কর্ত্তৃক রাজপুরী-অধিকারের বিবরণ বর্ণিত আছে।

এইরূপ কত রাজ্য কত জনপদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। লক্ষ্মণ-পুত্র অঙ্গদের রাজ্য ছিল—কারুপদ দেশ। সে রাজ্যের রাজধানীর নাম—অঙ্গদীয়া। লক্ষ্মণ-পুত্র চন্দ্রকেতু—মল্লদেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নাম—চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রবক্ত্রা বা চন্দ্রদ্যুতি। শত্রুঘ্ন-পুত্র শত্রুঘাতীর রাজধানীর নাম—বিদিশা। এ সকল এখন কোথায়, কি ভাবে পরিবর্ত্তিত, কে নির্ণয় করিবে? শত্রুঘ্নের অপর পুত্র সুবাহুর রাজধানীর নাম—মধুরা। কেহ বলেন,—উহাই মথুরা। কাহারও মতে, উহা দাক্ষিণাত্যের মাদুরা। কাশী, সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র, সৌবীর, দাক্ষিণাত্য, কোশল, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস্য, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ দশরথের অধীন বা মিত্র-রাজ্য বলিয়া অভিহিত। কাশী রাজ্যের রাজধানী বারাণসী, শ্রীরামচন্দ্রের পরম মিত্র প্রতর্দ্দনের পুরী বলিয়া উল্লিখিত আছে। দশরথ-সখা রোমপাদ অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। বলিতে গেলে, কোশল-রাজ্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে এইরূপ আরও কত জনপদের কথা উত্থাপন করা যাইতে পারে। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনকালে নন্দীগ্রামে অবস্থিতি-পূর্ব্বক ভরত রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। রামায়ণের বর্ণনায় দেখিতে পাই, নন্দীগ্রাম অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। * কিন্তু সে নন্দীগ্রাম এখন কোথায়? শৃঙ্গবেরপুর, ভরদ্বাজাশ্রম, দণ্ডকারণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, বৎস্যদেশ প্রভৃতি নানা স্থানের নাম রামায়ণের প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে। কোশল-রাজ্যের প্রান্তভাগে শৃঙ্গবেরপুর; নিষাধপতি গুহ তথায় অবস্থিতি করিতেন। বর্ত্তমান এলাহাবাদের উত্তরে গঙ্গার অনতিদূরে এই স্থান এখন চিহ্নিত হয়। প্রয়াগে—গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে, বর্ত্তমান এলাহাবাদ নগরের প্রান্তভাগে, উত্তর-পশ্চিম দিকে, ভরদ্বাজাশ্রমের স্মৃতি লোকে আজিও কল্পনা করিয়া লইতেছে। শ্রীরামচন্দ্র যেখানে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, অর্থাৎ বর্ত্তমান এলাহাবাদ প্রদেশ, বৎস্যদেশ নামে অভিহিত হইত, বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণে লিখিত আছে,—শৃঙ্গবেরপুরে সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গাপারে শস্যবহুল বৎস্যদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। রামায়ণ-বর্ণিত চিত্রকূট পর্ব্বত—বর্ত্তমান এলাহাবাদের দক্ষিণে, বুন্দেলখণ্ড জেলার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া চিহ্নিত হয়। দণ্ডকারণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা প্রভৃতি স্থান দাক্ষিণাত্যের অন্তর্ভুক্ত, বিন্ধ্য-পর্ব্বতের পর-পারে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন, পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্মমাল, মালব, পুণ্ড্র, মহাগ্রাম, কলিন্দ-গিরি প্রভৃতি জনপদ; দক্ষিণ দিকে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, কেরল, পাণ্ড্য, মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌষিক, ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, অবন্তী প্রভৃতি; পশ্চিম দিকে সৌরাষ্ট্র, বাহ্লিক, চন্দ্রমিত্র, বিশালপুর, কুক্ষিদেশ প্রভৃতি সুসমৃদ্ধ জনপদ; এবং উত্তর দিকে প্রস্থল, মদ্রক, দক্ষিণ-কুরু প্রভৃতি স্থানের নাম দৃষ্ট হয়। কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে সুগ্রীব ঐ সকল স্থানের নাম ও তাহাদের অবস্থানের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এতন্মধ্যস্থিত জনপদাদির বিবরণ আমরা আবশ্যকানুসারে যথাস্থানে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইব। কোশল-রাজ্য-প্রসঙ্গে তৎসমুদায়ের আলোচনা বাহুল্যমাত্র।

অন্যান্য জনপদ।

* "ক্রোশমাত্রে হ্যযোধ্যায়াঃ।" রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ১২৭শ সর্গ, ২১ শ্লোক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিদেহ-রাজ্য।

[প্রাচীন বিদেহ-রাজ্যের পরিচয়,—মিথিলা, বৈশালী, জনকপুর প্রভৃতির অবস্থান-স্থান,—লিচ্ছবি, উজ্জিস, উজ্জিহান, ব্রিজি প্রভৃতির প্রসঙ্গ,—ব্রিজি শব্দ—বিরাজ শব্দের রূপান্তর,—তৎপ্রদেশে সাধারণ তন্ত্র শাসন-প্রণালীর পরিচয় ;—সাঙ্কাশ্যা-রাজ্যের পরিচয়—সাঙ্কাশ্যা নগরীর স্থান-নির্দ্দেশ।]

মিথিলা, বৈশালী প্রভৃতি।

যেমন কোশল, তেমনি বিদেহ। উভয়েরই প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সদানীরা (গণ্ডক) নদীর এক পার্শ্বে কোশল এবং অন্য পার্শ্বে বিদেহ রাজ্য। এখন আমরা উত্তর-বিহার বলিতে যে অংশ বুঝিয়া থাকি, প্রাচীন কালে তাহা বিদেহ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিদেহ-রাজ্যের অপর নাম—মিথিলা। রাজর্ষি জনকের নামের সঙ্গে সঙ্গে ঐ রাজ্যের খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত। ইক্ষ্বাকু-পুত্র নিমির বংশে রাজর্ষি জনক বা বৈদেহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর নাম—মিথি। তাঁহার নামানুসারেই রাজ্য 'বিদেহ' বা 'মিথিলা' নামে অভিহিত হয়। * এই বংশের অধিকাংশ নৃপতি জনক নামে পরিচিত। এই বংশের শিরধ্বজ জনকের কন্যা সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্রের পরিণয় হইয়াছিল। নিমি-পুত্র জনক মিথিলা-নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। সেই নগরীই বিদেহ-রাজের রাজধানী। রামায়ণে দেখিতে পাই,—'বৈজয়ন্ত নামে নিমি রাজার প্রতিষ্ঠিত সুন্দরী পুরী ছিল। গৌতমাশ্রমের নিকট তাহা অবস্থিত। সেই পুরী মিথিলার রাজধানী নামে প্রখ্যাত।' বৈজয়ন্ত—মিথিলারই যে নামান্তর, তাহাই প্রতীত হয়। জনকের নামানুসারে উহা 'জনকপুর' নামে অভিহিত হইত। ত্রিহুত জেলায় জনকপুর নামে যে এক প্রচীন জনপদ দৃষ্ট হয়, অনেকে তাহাকেই প্রাচীন মিথিলা বলিয়া অনুমান করেন। সীতামারী, সীতাকুণ্ড নামক দুইটা পবিত্র তীর্থস্থান জনকপুরে বিদ্যমান আছে। সীতাদেবীর জন্মক্ষেত্র বলিয়া সীতামারী প্রসিদ্ধ। বিবাহের পূর্ব্বে সীতাদেবী সীতাকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন,—এইরূপ কিংবদন্তী আছে। মিথিলার নৃপতিগণের সকলেই প্রধানতঃ জ্ঞানী ও বিদ্বান বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপনিষদের আলোচনার জন্য জনকের রাজধানী প্রতিষ্ঠান্বিতা। শতপথ ব্রাহ্মণে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে, কৌষিতকী উপনিষদে জনকের এবং বিদেহ-রাজ্যের বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিদ্যার প্রভাবে, জ্ঞানের গরিমায় রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই। এই মিথিলা প্রদেশেই ইক্ষ্বাকুর অপর পুত্র বিশাল 'বৈশালী' বা 'বিশাল' নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বামিত্র যখন রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া মিথিলায় গমন করিতেছিলেন, সেই সময় গঙ্গা পার হইয়া প্রথমে তাঁহারা বিশালা নগরীতে উপনীত হন। চীন-পরিব্রাজকগণের ভারতভ্রমণ-প্রসঙ্গে বৈশালীর এবং মিথিলার ভগ্নাবশেষের কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। বারাণসী হইতে হুয়েন-সাং প্রথমে তিন শত লি প্রায় পঞ্চাশ মাইল পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া 'চেঞ্চু' (Chen-Chu) নামক স্থানে উপনীত হন। প্রতিপন্ন হয়,—চেঞ্চু বর্ত্তমান গাজীপুরের নামান্তর। সেখান হইতে ৫৮০ লি প্রায় এক শত তিন মাইল গমন করিয়া হুয়েন-সাং বৈশালীতে উপনীত হইয়াছিলেন। তাহা

* রাজর্ষি জনকের মিথি বা বৈদেহ নাম হওয়ার উপাখ্যান, "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

হইলে, বারাণসী হইতে মোট ৮৮০ লি অর্থাৎ প্রায় দেড় শত মাইল দূরে বিশাল রাজ্যে বৈশালী নগরী বিদ্যমান ছিল, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 'চেঞ্চু' যে গাজীপুরের নামান্তর, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিত-গণ নানারূপ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। চীনাভাষায় 'চঞ্চু' শব্দের অর্থ—যুদ্ধের অধিপতি (Lord of Battles)। জুলিয়ান তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করেন,—উহা যোধপতি বা যোধরাজপুর হওয়া সম্ভবপর। অর্থ ধরিয়া নাম কল্পনা করিতে হইলে, বিগ্রহপতি, রণস্বামী, যোধনাথ বা যুদ্ধনাথ নামও কল্পনা করা যাইতে পারে। কথিত হয়, ঐ নগর গঙ্গার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং উহার পরিধি দশ লি অর্থাৎ প্রায় ১৮ মাইল। ইহাতে কানিংহাম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—হুয়েন-সাং-কথিত 'চেঞ্চু' বর্ত্তমান গাজীপুর ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। বারাণসী হইতে উহা পঞ্চাশ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত এবং উহার আদি নাম—গর্জ্জপুর (Garjpur) ; মুসলমানগণ কর্ত্তৃক উহা গাজীপুররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। 'গর্জ্জন' (Grajan) শব্দে যুদ্ধ বুঝাইতে পারে। গর্জ্জনপতি—রণদেবতার সংজ্ঞা হওয়া সম্ভবপর। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই হুয়েন-সাং অর্থ ধরিয়া 'চেঞ্চু' নাম কল্পনা করিয়া থাকিবেন। হুয়েন-সাঙের হিসাবে গাজীপুর-জেলার তাৎকালিক পরিধি দুই হাজার লি অর্থাৎ প্রায় ৩৩৩ মাইল। তাহা হইলে, উত্তরে ঘর্ঘরা, দক্ষিণে গোমতী, পশ্চিমে গঙ্গার শাখানদী ও ঘর্ঘরা—এতন্মধ্যবর্ত্তী সীমানায় উহা অবস্থিত ছিল। এই সীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশের কুম্ভস্তূপ দর্শন করিয়া, ১৪০ বা ১৫২ লি অর্থাৎ ২৩ মাইল হইতে ২৫ মাইল উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, হুয়েন-সাং বৈশালী নগরীতে উপনীত হন। গণ্ডক নদীর পূর্ব্বতীরে এই বৈশালী নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে 'বেসার' (Besarh) নামে এক গ্রাম আছে। সেই গ্রামের অনতিদূরে একটী ভগ্ন দুর্গের স্তূপ দৃষ্ট হয়। লোকে তাহাকে রাজা বিশালের গড় বলিয়া অভিহিত করে। পাটলিপুত্র হইতে ঐ নগর এক শত কুড়ি লি প্রায় ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। আবুল ফজেল 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে 'বেসার' নামক স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পরিব্রাজকের বর্ণনা এবং আবুল ফজেলের বর্ণনা মিলাইয়া দেখিলে, বেসারকে—বেসারের ভগ্নস্তূপকে, প্রাচীন বৈশালী রাজ্য বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে। বৈশালী রাজ্যের পরিধি পাঁচ হাজার লি প্রায় ৮৩৩ মাইল,—হুয়েন-সাং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে, বৈশালীর উত্তর-পূর্ব্বস্থিত 'ব্রিজি' * (Vriji) বা 'ওয়াজিস' (Wajjis) রাজ্য উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া বুঝা যায়। বুদ্ধদেবের সমসময়ে এবং তাঁহার পরিবর্ত্তিকালে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈশালী 'ব্রিজিদিগের' দেশ বলিয়া কথিত হইত। বৈশালীর অধিবাসীরা তখন 'লিচ্ছবি' নামেও পরিচিত হইয়াছিল। লিচ্ছবি, বৈদেশ এবং তিরাভুক্তি,—একই অর্থবোধক শব্দ বলিয়া গ্রন্থান্তরে লিখিত হইয়াছে। বিদেহ বা মিথিলা যে জনক রাজার

* 'বিরাজ' শব্দই কানিংহামের ভাষায় 'ব্রিজি' রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বিরাজ অর্থে 'রাজশূন্য রাজ্য'। এক সময়ে ঐ প্রদেশ কোনও নির্দ্দিষ্ট রাজার শাসনাধীন ছিল না তখন সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী-ক্রমে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক ঐ দেশ সুশাসিত হইত। রাজা ছিল না বলিয়াই ঐ দেশ 'বিরাজ' নামে অভিহিত হয়। আর সেই 'বিরাজ' হইতেই কানিংহাম 'ব্রিজি' (Vriji) নাম লিখিয়া গিয়াছেন। লিচ্ছবি, উজ্জিহান প্রভৃতির রাজা-প্রসঙ্গে, এই গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদে, উক্ত রাজ্যের সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশ এবং উহা যে এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। 'তিরাভুক্তি' হইতে 'তিরাহুতি' বা 'ত্রিহুত' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এখন যাহা প্রাচীন জনকপুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, হুয়েন-সাঙের বর্ণনা অনুসারে তাহা ব্রিজির রাজধানী ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। হুয়েন-সাং 'চেং-শু-না' (Chen-shu-na) নামে উহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনাক্রমে প্রতীত হয়, সপ্তম শতাব্দীতে জনকপুর ব্রিজির রাজধানী ছিল। হুয়েন-সাং 'ফো-লি-শি' (Fo-li-shi) নামে ব্রিজির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—উত্তর দেশের অধিবাসীরা ঐ রাজ্যকে 'সান-ফা-শি' (San-fa-shi) নামে অভিহিত করিয়া থাকে। উহা (পালি-ভাষায়) 'সাম্ভাজি'—'সম্-ব্রিজি' অর্থাৎ সমগ্র ব্রিজি-দেশ শব্দের রূপান্তর বলিয়া প্রতীত হয়। এই নাম হইতে কানিংহাম স্থির করিয়াছেন,—ব্রিজি-দেশের অধিবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। বৈশালীর অধিবাসীরা 'লিচ্ছবি' নামে অভিহিত হইত; মিথিলার অধিবাসীরা 'বৈদেহ' নামে পরিচিত ছিল; এবং ত্রিহুতবাসীরা 'তিরাভুক্তি' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। হুয়েন-সাঙের বর্ণনা অনুসারে যে স্থান বৈশালী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার দুই শত লি অর্থাৎ প্রায় তেত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেই নগরীতে বুদ্ধদেব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মহাদেব নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক চক্রবর্ত্তী রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত হয়, ভগ্নস্তূপ সেই স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। পূর্ব্বে যে ব্রিজির বিষয় উল্লিখিত হইল, বৈশালী হইতে তাহা পাচ শত লি অর্থাৎ প্রায় তিরাশী মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ঐ প্রদেশ পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ও উত্তর-দক্ষিণে সঙ্কীর্ণ। বর্ণনা অনুসারে প্রতিপন্ন হয়, গণ্ডক হইতে মহানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, দৈর্ঘ্যে তিন শত মাইল এবং প্রস্থে এক শত মাইল পরিমাণযুক্ত, প্রদেশ ব্রিজি নামে অভিহিত হইত। পরবর্ত্তিকালে ঐ প্রদেশে আটটী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় রাজধানী স্থাপন করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা পাইয়াছিল। বৈশালী, কেশরীয়া ও জনকপুর এক দিকে অবস্থিত ছিল। নবনন্দগড়, শিমরুণ, সারণ, দ্বারবঙ্গ, পুরণিয়া (পূর্ণিয়া), মতিহারী প্রভৃতি অপর দিকে অবস্থিত। যে আট সম্প্রদায় ঐ আট প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, উজ্জিহানগণ তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়। লিচ্ছবিগণও বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, বর্ত্তমান ত্রিহুত বিভাগের জনকপুর, সারণ, দ্বারবঙ্গ, পূর্ণিয়া, মতিহারী প্রভৃতি স্থানই যে প্রাচীন কালে বিদেহ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অধুনা তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

সাঙ্কাশ্যা-পুরী।

বিদেহ-রাজ্যের প্রসঙ্গে সাঙ্কাশ্যা (সাঙ্কিশা) দেশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিরধ্বজ জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজ সাঙ্কাশ্যা নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া সেই প্রদেশ শাসন করিতেন। রামায়ণে দেখিতে পাই,—সাঙ্কাশ্যা দেশ পূর্ব্বে সুধন্বা নৃপতির শাসনাধীন ছিল। শিরধ্বজ জনক, সুধন্বাকে হনন করিয়া সেই রাজ্য অধিকার করেন। পরিশেষে কুশধ্বজ সাঙ্কাশ্যা-রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইহার পর বহু দিন সাঙ্কাশ্যা-নগরীর বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাভারতের সমসময়ে উহা পাঞ্চাল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদু-

র্ভাব-কালে সাঙ্কাশ্য বৌদ্ধগণের তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। চীন-পরিব্রাজকগণের বর্ণনা হইতে সাঙ্কাশ্য-নগরের অবস্থানের একটী পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে প্রতীত হয়, দক্ষিণ-পূর্ব্বে কনোজ, দক্ষিণ-পশ্চিমে মথুরা, উত্তরে পিলুশানা, এবং উত্তর-পূর্ব্বে অহিচ্ছত্রা,—এতৎসীমান্তবর্ত্তী গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী একটি প্রদেশ, পুরাকলে সাঙ্কাশ্য নামে পরিচিত ছিল। পিলুশানা এবং কনোজ হইতে সমদূরবর্ত্তী স্থানে সাঙ্কাশ্য অবস্থিত। চীন-পরিব্রাজকগণ 'সেং-কিয়া-শি' (S-ng-kia-she) নামক একটী জনপদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাই যে সাঙ্কাশ্য, সহজেই প্রতিপন্ন হয়। হুয়েন-সাং উহাকে 'কিয়া-পিথা' (Kia-pi-.ha) বা কপিথা (Kapi ha) নামেও অভিহিত করিয়াছেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—ঐ স্থান (সাঙ্কাশ্য) বৌদ্ধগণের একটি প্রধান পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া তখন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কথিত হয়,—ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে বুদ্ধদেব সুবর্ণ-মণি-মাণিকা-খচিত সোপানের সাহায্যে ঐ স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য পৌরাণিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। বুদ্ধদেবের জন্মের সাত দিবস পরেই তাঁহার মাতা মায়াদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। লোকান্তরের পর ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে তাঁহার আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই স্বর্গের তেত্রিশটী দেবতার মধ্যে ইন্দ্রই সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। স্বর্গধামে বাস করিয়া বুদ্ধদেবের নীতিসমূহ শ্রবণ করিবার মায়াদেবীর অবসর হয় নাই। সুতরাং মাতাকে আপনার নীতিতত্ত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য বুদ্ধদেব সেই ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গধামে গমন করেন এবং তিন মাস কাল তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক জননীর নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যায় নিযুক্ত থাকেন। ধর্ম্মব্যাখ্যা শেষ হইলে, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত তিনি মর্ত্ত্যভূমে অবতরণ করেন। ভূতলে অবতরণকালে তাঁহাদের তিন জনের জন্য তিন খানি সোপান রক্ষিত হয়। সেই সোপান তিনখানির এক খানি স্ফটিক অথবা মূল্যবান প্রস্তরে, একখানি সুবর্ণে এবং অপর খানি রৌপ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফা-হিয়ানের বর্ণনায় প্রকাশ,—সপ্তবিধ মূল্যবান সামগ্রীতে অর্থাৎ বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদিতে যে সোপানখানি নির্ম্মিত ছিল, বুদ্ধদেব সেই সোপানের সাহায্যে ভূতলে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত রৌপ্যবিনির্ম্মিত সোপানে ব্রহ্মা এবং বামপার্শ্বস্থিত সুবর্ণবিনির্ম্মিত সোপানে ইন্দ্র অবতরণ করেন। কিন্তু হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—সুবর্ণবিনির্ম্মিত সোপানে বুদ্ধদেব এবং তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বস্থিত রৌপ্যবিনির্ম্মিত সোপানে ব্রহ্মা ও বামপার্শ্বস্থিত স্ফটিকবিনির্ম্মিত সোপানে ইন্দ্রদেব মর্ত্ত্যধামে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অবতরণ-সময়ে অসংখ্য দেবতা বুদ্ধদেবের জয়গান করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে মর্ত্ত্যধামে উপনীত হন। এই আখ্যায়িকা প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে, অশোকের রাজত্বকালে, এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খৃষ্ট শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজকগণ এ আখ্যায়িকা শুনিয়া গিয়াছিলেন। আজিও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধগণের মধ্যে এ আখ্যায়িকা প্রচারিত হইয়া আছে। যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি আজিও সাঙ্কিশা (সাঙ্কাশ্য) নামে পরিচিত, পার্শ্বস্থ সমতল প্রদেশ

হইতে এক-চল্লিশ ফিট উচ্চ একটী ভগ্ন-স্তূপের উপর উহা বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ উচ্চ স্তূপ 'কেল্লা' বা দুর্গ নামে অভিহিত। উহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় দেড় হাজার ফিট, বিস্তৃতি প্রায় এক হাজার ফিট। এই স্তূপের উত্তর ও পশ্চিমাংশ দুরারোহ। কিন্তু অন্যান্য দিক ক্রমনিম্ন বিধায় সেই সেই দিক দিয়া অনায়াসে স্তূপের উপর উঠিতে পারা যায়। এই কেল্লার দক্ষিণে, ষোল শত ফিট দূরে, ইষ্টক-নির্ম্মিত একটী সুদৃঢ় স্তূপ বিদ্যমান। তাহার উপরে 'বিশারী' দেবীর মন্দির শোভা পাইতেছে। দুর্গ এবং ঐ দেবী-মন্দিরের পার্শ্বে আরও অনেক স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল স্তূপ প্রাচীন সাঙ্কাশ্যা-নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান হয়। যে স্থানে সেই সকল স্তূপ বিদ্যমান, সেই স্থানটীর দৈর্ঘ্য তিন হাজার ফিট এবং বিস্তৃতি দুই হাজার ফিট। তাহার পরিধি প্রায় দুই মাইল। অনেকে অনুমান করেন, ঐ অংশ প্রাচীন সাঙ্কাশ্যা-নগরীর কেন্দ্রস্থল ছিল; রাজপ্রাসাদ এবং ধর্ম্মমন্দিরসমূহ, তিনটী পবিত্র সোপানকে বেষ্টন করিয়া, এক কালে ঐ স্থানের শোভা সম্বর্দ্ধন করিত। এই মধ্যবর্ত্তী ভগ্নস্তূপকে বেষ্টন করিয়া নগরী বিদ্যমান ছিল। নগরীর চারি পার্শ্ব মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রাকার দ্বারা পরিরক্ষিত হইত। সেই প্রাকারের পরিধি প্রায় ১৮,৯০০ ফিট অর্থাৎ সাড়ে তিন মাইলের উপর। এই প্রাকারের অনেক অংশ আজিও বিদ্যমান আছে। দেখিয়া বোধ হয়, ঐ প্রাকার দ্বাদশ কোণ-বিশিষ্ট ছিল। প্রাকারের তিনি পার্শ্বে—পূর্ব্বে, উত্তর-পূর্ব্বে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে—তিনটী প্রবেশ-পথ; প্রাকারের অবস্থা দেখিয়া তাহাদের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। রামায়ণ-বর্ণিত সাঙ্কাশ্যার সহিত বর্ত্তমান সাঙ্কিশার অথবা চীন-পরিব্রাজকগণ-কথিত 'সেং-কিয়া-শি'র উচ্চারণের অনেকটা মিল আছে বলিয়াই যে ঐ তিনটীকে অভিন্ন স্থান বলিতে হইবে, কেবল তাহা নহে; মথুরা, কনোজ এবং অহিচ্ছত্রা হইতে সাঙ্কিশার যে দূরত্বের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও বর্ত্তমান নগরী সেই প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হুয়েন-সাং ঐ নগরীর পরিধি কুড়ি লি অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন মাইল লিখিয়া গিয়াছেন। কানিংহামও উহার যে পরিমাপ (আঠার হাজার নয় শত ফিট—প্রায় সাড়ে তিন মাইল) প্রদান করিয়াছেন, হুয়েন-সাঙের মাপের সহিত তাহা প্রায়ই মিলিয়া যায়। সাঙ্কাশ্যা নগরের বর্ণনায় হুয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন,—ঐ নগরের পার্শ্বে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ বসতি করিতেন। সাঙ্কিশার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় হুয়েন-সাঙের এতদুক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। ঐ প্রদেশে জন-প্রবাদ,—আঠার বা উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে সাঙ্কিশা নগরী জন-সাধারণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। তের শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ৫৬০ খৃষ্টাব্দে ঐ নগর জনৈক 'কায়েৎ' ভূস্বামীর অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণের বসবাসের জন্য তাঁহাদিগকে ঐ নগর দান করিয়াছিলেন। হুয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন, সাঙ্কিশা-নগরীর পরিধি প্রায় দুই সহস্র লি অর্থাৎ প্রায় তিন শত তেত্রিশ মাইল। কানিংহাম অনুমান করেন, উত্তরে ও দক্ষিণে গঙ্গা ও যমুনা এবং পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কনোজ ও আতরাঞ্জি, এই সীমান্তর্ব্বর্ত্তী দেশ সাঙ্কাশ্যা দেশ বলিয়া পরিচিত। ইহার পরিধি দুই শত কুড়ি মাইলের অধিক হওয়া সম্ভবপর নহে

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কাশী-রাজ্য।

[শাস্ত্রে কাশী-রাজ্যের প্রসঙ্গ,—উপনিষৎ, পুরাণ প্রভৃতির আলোচনায় কাশী-তত্ত্ব নির্ণয়,—কাশী-রাজ্যের স্থিতি;—বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-কালে কাশীরাজ্যের অবস্থা,—বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্ম্ম-প্রচার-প্রসঙ্গ;—হুয়েন-সাঙের ভ্রমণ-কাহিনীতে এবং পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ও আবুল-ফজেল প্রভৃতির বর্ণনায় কাশীর পরিচয়;—কাশী-রাজ্যের ইতিবৃত্ত,—প্রাচীন রাজগণের পরিচয়;—বৌদ্ধ ও মুসলমান অধিকারে কাশী।]

কোশল ও বিদেহ-রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গেই কাশী-রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এক দিকে বিদেহ-রাজ্যে রাজর্ষি জনক, অন্য দিকে কাশী-রাজ্যে অজাতশত্রু,—বিদ্যার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বেদে, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, ইতিহাসে, কাশীর ও কাশী-নরেশগণের মাহাত্ম্য-তত্ত্ব কত প্রকারেই বিবৃত রহিয়াছে! বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে গৃৎসমদ প্রভৃতি রাজর্ষিগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। * "অতঃ কাশয়োঽগ্নিনা দত্তং; যজ্ঞং কাশীনাং ভরতঃ সাত্বতামিব।"—ইত্যাদি সূত্রে, শতপথ ব্রাহ্মণে, কাশীর নাম বহু বার উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই,—"ওঁ। দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য আস হোবাচাজাতশত্রুং কাশ্যং ব্রহ্মতে ব্রবাণীতি। স হোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মো জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তী।" † ইহাতে বুঝা যায়, রাজর্ষি জনকের বিদ্যানুরাগ-প্রভাবে বিদ্যানুরাগী জনসাধারণ কাশীরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মিথিলায় বা বিদেহ-রাজ্যে গমন করিতেছেন। সেই জন্য কাশীর রাজা অজাতশত্রুঃ ‡ ক্ষোভপ্রকাশে মহর্ষি গার্গ্যের নিকট বলিতেছেন,—'কি ক্ষোভের বিষয়! জনক আমাদের জনক-স্থানীয়—এই বলিয়া লোকে এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছে!' রাজর্ষি জনক বিদ্বানগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাশী-নরেশ্বর অজাতশত্রুও বিদ্বজ্জনের সমাদর করিতেন। কাশীর প্রাচীন ইতিহাসে কাশীর এই এক অভিনব প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই।

শাস্ত্রাদিতে কাশী-রাজ্য।

* গৃৎসমদ, দিবোদাস, ধন্বন্তরি প্রভৃতি।

† বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম ব্রাহ্মণ, ১ম সূত্র।

‡ অজাতশত্রু নামে পুরাণেতিহাসে বহু নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহার শত্রু মাত্র নাই, তিনিই অজাতশত্রু। বোধ হয়, সেই অর্থেই বহু প্রতিষ্ঠান্বিত নৃপতির বিশেষণ-রূপে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইত। কাশীর রাজা অজাতশত্রুকে কেহ কেহ জনক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যদি জনক হন, তবে তিনি কোন্ জনক—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ, মহর্ষি গার্গ্যের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতে তিনি ও জনক উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। চন্দ্রবংশের ও সূর্য্য-বংশের বংশলতায় আদি-কালে অজাতশত্রু নাম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রতর্দ্দন বা তাঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ অজাতশত্রু নামে অভিহিত হইয়া থাকিবেন, ইহাই সম্ভবপর। শাক্যসিংহের সম-সময়ে মগধে অজাতশত্রু নামে এক রাজা ছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর, রাজগৃহে একটী বৃহৎ স্তূপের অভ্যন্তরে সেই অজাতশত্রু কর্তৃক বুদ্ধদেবের অস্থি রক্ষিত হইয়াছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও সময়ে সময়ে অজাতশত্রু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

কাশী অন্নপূর্ণার লীলা-নিকেতন, কাশী দেবদেব মহাদেবের আশ্রয়-স্থল, কাশী ভূতলে স্বর্গরূপে বিরাজমান,—কাশীর এবম্বিধ সহস্র মাহাত্ম্য-তত্ত্ব প্রচারিত থাকিলেও বিদ্যোৎসাহী বলিয়া কাশীনরেশ অজাতশত্রুর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। জাবালোপনিষদে কাশী-মাহাত্ম্য সংক্ষেপে অথচ সুন্দররূপে পরিবর্ণিত। সেখানে লিখিত আছে—'সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র (বারাণসী) বরুণা ও নাসী এই নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত।' উপনিষদ, বরুণা, ও নাসীর অর্থনিষ্পত্তিতে বলিয়াছেন,—সর্ব্বেন্দ্রিয়কৃত দোষ বারণ করে বলিয়াই উহা 'বরণা' এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়কৃত পাপ নাশ করে বলিয়া উহার নাম 'নাসী'। এ সম্বন্ধে উপনিষদের ভাষা,—'সোঽবিমুক্তে কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতি ইতি। বরণায়াং নাস্যাং চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কাচ নাসীতি সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি। তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপন্নয়তীতি। তেন নাসী ভবতীতি।" রামায়ণের নানা স্থানে কাশীরাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। দশরথের সমসময়ে কাশীনরেশগণ কোশলের অধীনতা স্বীকার করিতেন। * দশরথের অশ্বমেধ-যজ্ঞে কাশীনরেশ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। দশরথের কুলগুরু বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিতেছেন,—'তুমি সতত প্রিয়বাদী, স্নিগ্ধস্বভাব, দেবতুল্য, সাধুচরিত্র কাশীরাজ প্রভৃতিকে সৎকার-পূর্ব্বক স্বয়ং এখানে আনয়ন কর।' সেখানে কাশীনরেশ মিত্ররাজমধ্যে পরিগণিত। † বনবাসের পর, শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় কাশীরাজ প্রতর্দ্দন নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় শ্রীরামচন্দ্র আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"রাজন্! আপনি যুদ্ধের সাহায্যের জন্য ভরতের সহিত উদ্যোগী হইয়া আমার প্রতি পরম সৌহার্দ্দ্য এবং প্রীতি দেখাইয়াছেন। এক্ষণে আপনি কাশীপুরীতে গমন করুন। সুচারু প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত তোরণবিশিষ্ট সেই রমণীয় বারাণসী আপনারই দ্বারা সুরক্ষিত আছে।" ‡ শ্রীরামচন্দ্রের এবম্বিধ উক্তিতে কাশীনরেশের সহিত তাঁহার সখ্যতার পরিচয়, কাশীরাজ্যের রাজধানীর নাম বারাণসী এবং কাশী যে প্রাকারাদিপরিবেষ্টিত সুরক্ষিত ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণের আর এক স্থলে কাশীরাজ্যের আরও একটু অভিনব পরিচয় দৃষ্ট হয়। সেখানে লিখিত আছে,—"মহাযশা পুরু মহদ্ধর্ম্মে পরিবৃত হইয়া কাশীরাজ্যের অন্তর্গত পুরশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান্‌নগরে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।" এতদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠান্ নগর পর্য্যন্ত এক সময়ে কাশীরাজ্য বিস্তৃত ছিল, প্রতীত হয়। ¶ মহাভারতের আদিপর্ব্বে পাণ্ডবগণের সহিত কাশীরাজের শত্রুতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। বারাণসী নগরীতে কাশীরাজের অম্বা, আম্বলিকা ও অম্বিকা নাম্নী অপ্সরোপমা তিন কন্যার

---

* কেকয়ীর নিকট দশরথের উক্তিতে তাহা প্রকাশ। অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম সর্গ, ৩৭শ শ্লোক।

† রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১৩শ সর্গ, ২৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৪৮শ সর্গ, ১৫শ শ্লোক।

§ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৬৯শ সর্গ, ১৯শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

†† কাশীরাজ্যের প্রাচীন রাজগণের বিবরণ এবং কাশীরাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ইতিহাস "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ডের "নির্ঘণ্টে" কাশী, কাশ্য, দিবোদাস, ধন্বন্তরি প্রভৃতি শব্দের অনুসন্ধানে প্রতীত হইবে। বাহুল্য-ভয়ে, সে সকল বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিলাম না।

স্বয়ম্বর আয়োজন হইয়াছিল। মাতা সত্যবতীর আদেশ অনুসারে ভীষ্মদেব কাশীরাজের [illegible] বল-পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আনেন। জ্যেষ্ঠা অম্বা মনে মনে শাল্ব-রাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ভীষ্ম তাহা অবগত হইয়া শাল্বরাজের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু শাল্বরাজ তাঁহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন; বলেন,—'ভীষ্ম যখন তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছেন, তখন ভীষ্মই তাঁহার পাণি-গ্রহণের অধিকারী।' এদিকে ভীষ্মও তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন না। অগত্যা অম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা অম্বিকা এবং কনিষ্ঠা কন্যা অম্বালিকা ভীষ্মের বৈমাত্র ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত পরিণীতা হন। অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর এবং অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সকল ঘটনার পর, কাশীরাজ পাণ্ডবগণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। পাণ্ডবগণের অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞে কাশীরাজের উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে, শিবপুরাণে, বামনপুরাণে, বিশেষতঃ স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে কাশীরাজ্যের বিবরণ নানা প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে (পঞ্চমাংশ, চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে) কাশীরাজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ-কাহিনী বর্ণিত আছে। সেই যুদ্ধে কাশীরাজ নিহত হন। তখনও বারাণসী-পুরী কাশীরাজ্যের রাজধানী ছিল। সেই পুরী বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাশী-রাজ্য কোন্ সময়ে কিরূপভাবে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল, ধন্বন্তরি, দিবোদাস, প্রতর্দ্দন প্রভৃতির কীর্ত্তি-কাহিনীর সহিত পুরাণেতিহাস তাহা সহস্র কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন।

কাশীরাজ্য কোন্ সময়ে কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করা সম্ভবপর নহে। রামায়ণে দেখিয়াছি, প্রতিষ্ঠান্ নগর পর্য্যন্ত কাশীরাজ্যের সীমানা বিস্তৃত ছিল। মৎস্যপুরাণে দেখিতে পাই,—"কাশীক্ষেত্রে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দ্বি-যোজন এবং দক্ষিণে ও উত্তরে অর্দ্ধ যোজন বিস্তৃত ছিল। ভীষ্ম-চণ্ডিকা হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ব্বতেশ্বরের নিকট শুষ্কা নদী পর্য্যন্ত বারাণসী পুরী প্রখ্যাত ছিল।" * শিবপুরাণে এই বারাণসীর সীমানা সম্বন্ধে লিখিত আছে,—'এই স্থানে সরিদ্বরা বরণা, গঙ্গা ও অসি বিদ্যমান।' অর্থাৎ গঙ্গা, অসি ও বরণার সঙ্গম-স্থান বারাণসী নামে পরিকীর্ত্তিত। শিবপুরাণের অন্যত্র আবার লিখিত আছে,—"বারাণসী পঞ্চক্রোশী। † প্রাসাদাদি উপকরণ-শোভিত সুন্দর নগরী।" এই নগরীর প্রসঙ্গে সূত বলিতেছেন,—"এই যে কাশী-নামে পুণ্যক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত দেখিতেছেন, যখন জগতে বস্তু সৃষ্ট হয় নাই, তখনও ইহা ছিল। প্রকৃতি-পুরুষ যখন তপস্যার স্থান সন্ধান করিয়া পান নাই, নির্গুণ শিব সেই জলরাশিবেষ্টিত এই প্রাচীন পঞ্চক্রোশব্যাপিনী কাশীকে ত্রিশূলাগ্রে ধারণ করিয়া ছিলেন।" সুতরাং কাশীক্ষেত্র যে

কাশীরাজ্যের বিস্তৃতি।

---

* মৎস্যপুরাণ, ১৮৩শ অধ্যায়, ৬১শ—৬৮শ শ্লোক। ১৮৪শ অধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোকেও ঐ একই উক্তি দৃষ্ট হয়।

† শিবপুরাণ, সনৎকুমার-সংহিতা, পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়, ১১১শ শ্লোক এবং জ্ঞানসংহিতা, একোন-পঞ্চাশ অধ্যায়, ৮ম শ্লোক।

কত কাল বিরাজমান আছেন, তাহা নির্ণয় করা মনুষ্যের ক্ষমতাধীন নহে। বামনপুরাণে বারাণসীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—'ভগবান বলিতেছেন, প্রয়াগ নামে যে এক পুণ্যক্ষেত্র আছে, তথায় আমার অংশসম্ভূত এক অব্যয় পুরুষ সর্ব্বদা যোগশায়ী আছেন। তাঁহার দক্ষিণ চরণ হইতে সর্ব্বপাপহরা শুভদা এক নদী বহির্গত হইয়াছে। ঐ নদী বরণা নামে অভিহিত। আর তাঁহার বামপদ হইতে অসি নামে প্রসিদ্ধা অন্য নদী প্রবাহিতা। উভয় সরিৎ-শ্রেষ্ঠাই সর্ব্বজন-পূজনীয়া। সেই দুই নদীর মধ্যস্থলে যে ক্ষেত্র অবস্থিত, সেই সর্ব্বপাপনাশকারী ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রে ভগবান যোগশায়ী আছেন। ঐ তীর্থের সন্নিকটে সুভদা পুণ্যদা বারাণসী নগরী অবস্থিত।' * বারাণসী নগরী যে সমধিক সমৃদ্ধি-শালিনী ছিল, বামনপুরাণে তাহাও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে কাশীরাজ্যের ও বারাণসীর পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখিত আছে। বরণা ও অসির সঙ্গম-ক্ষেত্র বলিয়াই যে উহার নাম বারাণসী হইয়াছিল, কাশীখণ্ডে তাহা এইরূপভাবে লিখিত আছে,—

"অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে॥
বরণাসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে।
অসেশ্চ বরণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা॥"

অর্থাৎ,—'এই কাশীক্ষেত্র রক্ষা করিতে অসি ও বরণা নাম্নী নদী নির্ম্মিত হইয়াছে। অসি ও বরণার সহিত সঙ্গত হইয়া এই কাশী বারাণসী নামে বিখ্যাত।' বারাণসী পঞ্চক্রোশী এবং বারাণসীর মধ্যে মণিকর্ণিকা, জ্ঞানবাপী, দশাশ্বমেধ প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র, বিশ্বেশ্বর, দণ্ডপাণি, ভৈরব, ঢুণ্টিবিনায়ক প্রভৃতি দেবতা সত্যযুগ হইতে বিদ্যমান আছেন,—কাশী-খণ্ড-পাঠে তাহা প্রতীত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-কালে বারাণসীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রবাদ,—বুদ্ধদেব বারাণসীতে আপনার ধর্ম্মমত প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটী প্রধান ঘটনার মধ্যে এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার জীবনের সেই চারিটি প্রধান ঘটনার স্মরণার্থ যে চারিটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কাশীরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্তূপ তাহার অন্যতম। বর্ত্তমান বারাণসী নগরীর সাড়ে তিন মাইল উত্তরে ঐ স্তূপ অবস্থিত। উহা 'ধামেক' (Dhamek) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে স্থানে ঐ স্তূপ বিদ্যমান, তাহা অধুনা সরনাথ † বলিয়া পরিচিত। স্তূপটী পুঞ্জীকৃত ধ্বংসরাশির মধ্যে বিরাজমান। তাহার তিন পার্শ্বে যেন কৃত্রিম হ্রদ তাহাকে ঘেরিয়া ছিল। কানিংহাম বলেন,—ধর্ম্মোপদেশক নামের অপভ্রংশে 'ধামেক' নামে স্তূপটী অভিহিত হইয়া থাকে। এই শব্দ সাধারণতঃ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। এইস্থানে বুদ্ধদেব প্রথমে আপনার 'ধর্ম্মচক্র' পরিচালনা করিয়াছিলেন; তাই স্তূপটী ঐ নামে অভিহিত হইয়া

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে কাশীর অবস্থা।

* বামনপুরাণ, তৃতীয় অধ্যায়, ২৬শ—২৯শ শ্লোক।

† যাঁহারা কাশীধামে গমন করেন, তাঁহারা প্রায়ই সরনাথের স্তূপ দেখিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বে যে স্থান 'মৃগদাব' (Deer Park) নামে পরিচিত ছিল, সরনাথের স্তূপ তাহারই উপর নির্ম্মিত। কানিংহাম মনে করেন,—সরনাথের স্তূপ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আসিতেছে। ললিতবিস্তরে লিখিত আছে,—বারাণসী প্রদেশে, ঋষিপত্তনে 'মৃগদাব' নামক স্থানে শাক্যসিংহ প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ফলতঃ, কানিংহাম-কথিত 'ধামেক', ললিতবিস্তরোল্লিখিত 'মৃগদাব' এবং বর্ত্তমান 'সরনাথ' একস্থানকেই বুঝাইয়া থাকে; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে উহা পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যখন ভারতভ্রমণে আগমন করেন, তিনি 'পো-লো-নি-স' (Po-lo-ni-sse) নামক স্থান দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভ্রমণ-

হুয়েন সাং প্রভৃতির মত।

বৃত্তান্তে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বারাণসী তাঁহার ভাষায় 'পো-লো-নি-স' রূপে উচ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'পো-লো-নি-স' রাজ্যের পরিধি চারি হাজার লি অর্থাৎ প্রায় ছয় শত মাইল। গঙ্গার পশ্চিম তীরে উহার রাজধানী অবস্থিত। সেই রাজধানীর দৈর্ঘ্য আঠার উনিশ লি অর্থাৎ প্রায় তিন মাইল, প্রস্থ পাঁচ ছয় লি অর্থাৎ প্রায় এক মাইল। এবম্বিধ বর্ণনা হইতে কানিংহাম সিদ্ধান্ত করেন,—এই রাজ্যের উত্তরে গোমতী নদী। গোমতী হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত এবং 'টন' হইতে 'বিলহারী' পর্য্যন্ত ইহার পশ্চিম সীমা। বিলহারী হইতে শোণহাট পর্য্যন্ত দক্ষিণ সীমা এবং কর্ম্মনাশা ও গঙ্গানদী ইহার পূর্ব্বভাগে বিরাজমান। এই সীমানার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের পরিধি সাড়ে ছয় শত মাইল হওয়া সম্ভবপর। এই নগরী গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার উত্তর-পূর্ব্বে বরণা নদী দক্ষিণ-পশ্চিমে অসিনালা। এলাহাবাদের উত্তর হইতে প্রবাহিত হইয়া বরণা নদী কাশীধামে গঙ্গায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঐ নদীর দৈর্ঘ্য এক শত মাইল। অসি—একটি ক্ষুদ্র প্রণালীবিশেষ। ইহার দৈর্ঘ্য অতি সামান্য। সুতরাং সাধারণ মানচিত্রে ইহার উল্লেখ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। বরণা ও অসির নামানুসারে, ঐ দুই নদীর সঙ্গম-স্থান বলিয়া 'বারাণসী' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এদিকে কিন্তু জনপ্রবাদ আছে,—প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা বানার (Banar) কর্ত্তৃক 'বারাণসী' বা 'বারাণসীপুরী' পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাঁহারই নামানুসারে উহা 'বারাণসী সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। সম্ভবতঃ বেনরস নামেরও তাহাই মূলীভূত। আবুল ফজেল বারাণসীর সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—বরণা ও অসি দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান সাধারণতঃ 'বেনারস' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, বেনারস আটটী মহালে বিভক্ত ছিল এবং উহার পরিমাণ—ছত্রিশ হাজার আট শত উনসত্তর বিঘা। টলেমির গ্রন্থে কাশীরাজ্য 'কাশীদিয়া' বা 'কাশীদা' নামে পরিচিত।

চন্দ্রবংশীয় কাশ্য হইতে কাশীরাজ্যের প্রতিষ্ঠা, পুরাণে ইহাই দৃষ্ট হয়। কাশীরাজ দিবোদাস কাশীর অশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন। কাশীমাহাত্ম্যে দিবোদাসের

কাশী-রাজ্যের পুরাবৃত্ত।

কীর্ত্তিকথা নানারূপে প্রচারিত। এক সময়ে কাশীরাজ্য শ্রাবস্তীর রাজার শাসনাধীন ছিল। তখন তাঁহার প্রতিনিধি প্রসেনজিৎ ঐ প্রদেশ শাসন করিতেন। বুদ্ধদেবের সম-সময়ে কাশীতে দেবদত্ত নামক এক নৃপতির নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। অবশেষে কাশীরাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে

দেখিতে পাই, শিশুনাগ কাশীরাজ্য অধিকার করিয়া আপন পুত্রকে সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৎপরে কাশী কখনও মগধ রাজগণের, কখনও গুপ্তরাজগণের, কখনও কনোজ-রাজবংশের শাসনাধীন দেশ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। বারাণসী-ধামে হুয়েন-সাঙের আগমন-সময়ে তৎপ্রদেশে বৌদ্ধদিগের ত্রিশটী সঙ্ঘারাম ছিল এবং সেই সকল সঙ্ঘারামে অন্যূন তিন সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত অবস্থিতি করিতেন। হিন্দুদিগের দেবমন্দিরের সংখ্যা প্রায় এক শত এবং অন্যূন দশ সহস্র উপাসক সেই সকল মন্দিরে উপাসনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। সে সময়ে মহেশ্বরের পূজার প্রাধান্য লক্ষিত হইত। সহরের মধ্যে অন্যূন কুড়িটী দেবমন্দির বিদ্যমান ছিল। প্রতি দেবমন্দিরের পার্শ্বে বৃক্ষসমূহ ছায়া বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। প্রতি দেবমন্দিরকে বেষ্টন করিয়া যেন এক একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। এক শত ফিট উচ্চ মহেশ্বরের একটি তাম্রমূর্ত্তি সহরের মধ্যস্থলে শোভা পাইত। সে মূর্ত্তি যেমন গম্ভীর, তেমনই রজোগুণসম্পন্ন ও প্রভাবশালী। দেখিলে, সে মূর্ত্তি জীবন্ত বলিয়া মনে হইত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কাশীরাজ্য গৌড়ের পাল-বংশীয় রাজগণ অধিকার করিয়া বসেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সরনাথের পালবংশীয় নৃপতি মহীপালের প্রদত্ত একখানি শিলালিপি প্রাপ্তে অনেকে অনুমান করেন, পালবংশীয়গণের মধ্যে তিনিই কাশীর প্রথম নৃপতি ছিলেন। স্থিরপাল, বসন্তপাল প্রভৃতি পালবংশীয় নৃপতিগণের শাসনকালের পর উহা কনোজাধিপতির রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে কনোজ-রাজ জয়চন্দ্র পরাভূত হন। অবশেষে কনোজ-রাজ্য মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইলে, কাশীরাজ্য মুসলমানগণের করতলগত হয়। মহম্মদ ঘোরী কাশীর অসংখ্য দেবমন্দির চূর্ণীকৃত করেন। আওরঙ্গজেব বারাণসীর নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। তাঁহার সনন্দে উহা মহম্মদাবাদ নামে অভিহিত হইয়াছিল। তিনি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরচূড়া ভগ্ন করিয়া তাহার উপর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বেণীমাধবের মন্দির কলুষিত করিয়া তদুপরি 'মিনার' স্তম্ভ গঠন করিয়াছিলেন। যাঁহারা কাশীধামে গমন করেন, তাঁহারা আওরঙ্গজেবের সেই অত্যাচার আজিও জাজ্বল্যমান দেখিয়া আসেন। বিশ্বেশ্বরের নূতন মন্দিরের পার্শ্বেই পুরাতন মন্দিরের উপর বিনির্ম্মিত মস্‌জিদ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এ দিকে কাশীধামে প্রবেশ করিলে 'বেণীমাধবের ধ্বজা' নামধেয় আওরঙ্গজেবের স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। আওরঙ্গজেবের পূর্ব্বে কালাপাহাড় আর একবার কাশীর ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন। সে স্মৃতিও জনসাধারণ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। কাশীধামে প্রতি দেবমন্দিরে প্রাচীন কাহিনী মুখে মুখে প্রচারিত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানী কাশীধামের সীমানা নির্দ্ধারণ করেন। তৎকর্ত্তৃক নগরী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ সময়ে হোলকার-রাজমহিষী অহল্যাবাই কর্ত্তৃকও ধ্বংসপ্রায় কাশীর বিবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:•:—

প্রয়াগ-রাজ্য।

[প্রতিষ্ঠান ও প্রয়াগ,—পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ;—প্রয়াগে বৌদ্ধ-প্রাধান্য,—অশোকের স্তম্ভ ও অক্ষয়বট প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক প্রসঙ্গ;—এলাহাবাদের প্রতিষ্ঠা, দুর্গ-নির্ম্মাণে প্রয়াগ নামক ব্রাহ্মণের প্রাণ-দানে প্রয়াগ নামের উৎপত্তি বিষয়ক উপাখ্যান;—কৌশম্বী-নগরী,—উদয়ন-বৎসের রাজত্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাধান্য; হুয়েন-সাং-দৃষ্ট বুদ্ধদেবের চন্দন-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি;—কোসম-পল্লীতে কৌশম্বীর স্থান-নির্দ্দেশ;—বাকুলার উপাখ্যান।]

বারাণসী-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ রাজ্য এক সময়ে প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রামায়ণে দেখিতে পাই,—মধ্যভারতে ইল রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানপুর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ নগরী এক সময়ে পুরুরবার রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সে প্রতিষ্ঠান নগর এখন কোথায়? অনেকে মনে করেন, বর্ত্তমান প্রয়াগ বা এলাহাবাদ সেই প্রতিষ্ঠান-নগরের ভগ্নাবশেষের উপর বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠান ও প্রয়াগ।

মৎস্যপুরাণে * দেখিতে পাই, যযাতি যখন পুরুকে রাজ্য প্রদান করেন, তখন বলিয়াছিলেন—"গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে কৃৎস্নোঽয়ং বিষয়স্তব।" ইহাতে প্রয়াগ বা প্রতিষ্ঠান প্রদেশকেই যে বুঝাইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইলে ঐ প্রদেশ পুরুরবা হইতে যযাতি পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল প্রতিপন্ন হয়। যযাতি পুরুকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠাংশ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। সুতরাং ঐ জনপদ সে সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সম-সময়েও প্রতিষ্ঠান নামক জনপদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। তখন প্রতিষ্ঠান যে প্রয়াগের রাজধানী, তাহাই বুঝিতে পারি। যুধিষ্ঠির প্রয়াগ-মাহাত্ম্য অবগত হইবার জন্য মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন,—'প্রয়াগে প্রতিষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া বাসুকী হ্রদ পর্য্যন্ত লোক-প্রসিদ্ধ যে স্থান, তাহার নাম প্রজাপতি-ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে কম্বল, অশ্বতর ও বহু মূল নাগের বাস।' মৎস্যপুরাণে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। * কূর্ম্মপুরাণে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মুখে যুধিষ্ঠির প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাইতেছেন। মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন,—'গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে ত্রিভুবনপ্রসিদ্ধ সর্ব্বসমুদ্র নামক গহ্বর এবং প্রতিষ্ঠান নগরী বিদ্যমান আছে। প্রতিষ্ঠানের উত্তরে এবং ভাগীরথীর সব্যপার্শ্বে হংসপ্রপতন নামক ভুবনবিখ্যাত তীর্থ।' † এ বর্ণনায় গঙ্গার পরপারেও, বর্ত্তমান এলাহাবাদের পূর্ব্ব-ধারে, প্রতিষ্ঠান-নগর বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কাল-প্রভাবে সে নগর লয়প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা এলাহাবাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়াছে। প্রতিষ্ঠান লোপপ্রাপ্ত হইলে, প্রয়াগের প্রাধান্যই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্রয়াগ যদিও কখনও স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী-রূপে প্রাচীন কালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, অন্ততঃ পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু সৃষ্টির

* মৎস্যপুরাণ, ৩৬শ ও ১০৪শ অধ্যায়, পঞ্চম শ্লোক।

† কূর্ম্মপুরাণ, [illegible]

আদিকাল হইতে প্রয়াগ যে মুক্তিপ্রদ তীর্থক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এই প্রয়াগ তীর্থের মাহাত্ম্য শাস্ত্রাদিতে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। রামায়ণে প্রয়াগ তীর্থের ও প্রাগ্‌বটের উল্লেখ আছে। প্রয়াগে ভরদ্বাজাশ্রম, প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম,—অযোধ্যা-কাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গে দেখিতে পাই। সেখানে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন,—'সৌমিত্রে! ঐ দেখ, প্রয়াগ তীর্থের চতুর্দ্দিক হইতে ভগবান অগ্নির কেতু-স্বরূপ ধূম উত্থিত হইতেছে। বোধ করি, মুনি সন্নিহিত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই আমরা গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গম-স্থানে আসিয়াছি। কেন-না, দ্বিবিধ জলের সংঘর্ষে সমুত্থিত শব্দ আমাদিগের কর্ণগোচর হইতেছে।' সূর্য্য অস্তগমন করিতে উদ্যত হইলে, সেই ধনুর্দ্ধারী-শ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ সুখে যাইয়া গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গম প্রদেশস্থ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। এতৎপ্রসঙ্গে রামায়ণের সমসময়ে, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগ ও ভরদ্বাজাশ্রমের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উহা যে তখন কোনও রাজার রাজধানী ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং প্রতিষ্ঠান রাজধানী লোপ পাইলে, ঐ প্রদেশ কোশল রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, মনে করিতে পারি। প্রাগ্‌বটের উল্লেখ রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গে দেখিতে পাই। মাতুলালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ভরত প্রাগ্‌বট নগরে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। প্রয়াগই যে প্রাগ্‌বট নগর নামে সেখানে অভিহিত, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। পরবর্ত্তিকালে যাহা 'অক্ষয় বট' নামে সম্পূজিত, রামায়ণের সময় তাহা প্রাগ্‌বট নামে অভিহিত ছিল এবং প্রাগ্‌বটের নামানুসারেই প্রাগ্‌বট নগরের নামকরণ হইয়াছিল,—এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আত্মীয় স্বজনের বিনাশ-জনিত শোকে যুধিষ্ঠির যখন মুহ্যমান, প্রয়াগ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-ব্যপদেশে মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিতেছেন,—'হে নরাধিপ! তোমার যদি অল্পমাত্রও পাপ হইয়া থাকে, প্রয়াগ তীর্থের স্মরণে তাহা ক্ষয় হইবে। প্রয়াগ তীর্থের দর্শন, নাম কীর্ত্তন বা মৃত্তিকা লেপনে নর পাপমুক্ত হয়।' প্রয়াগ মহারাজ দুর্য্যোধনের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠির সুযোধন বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভ্রাতৃশোকে সন্তপ্ত হইয়া, প্রয়াগের কথা স্মরণ পূর্ব্বক, যুধিষ্ঠির এক দিন মনে মনে অনুতাপ করিতেছিলেন,—'হায়! একদা সুযোধন এই রাজ্যের রাজা ছিল। সে একাদশ অক্ষৌ-হিণীর অধীশ্বর ছিল। আমাদিগকে বহুধা সন্তাপিত করিলে পরিশেষে আপনি আত্মীয়-স্বজন-সহ নিধনপ্রাপ্ত হইল।' মৎস্যপুরাণে ও কূর্ম্মপুরাণে যুধিষ্ঠিরের এই শোকবাক্য দৃষ্ট হয়। ইহার পর হইতেই প্রয়াগ পাণ্ডবগণের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের ন্যায় প্রয়াগে এক সময়ে বৌদ্ধপ্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রয়াগে, বর্ত্তমান দুর্গের অভ্যন্তরে, একটী ধাতুনির্ম্মিত স্তম্ভ (লাট) বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ দেশ এক সময়ে রাজা অশোকের (প্রিয়দর্শীর) রাজ্যান্ত-র্ভুক্ত ছিল, স্তম্ভ তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি-তত্ত্ব এবং উপদেশপরম্পরা ঐ স্তম্ভে খোদিত রহিয়াছে। অশোকের পর-বর্ত্তিকালে প্রয়াগ গুপ্তরাজ-বংশের অধিকারভুক্ত হয়। গুপ্তবংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্ত অশোকের

প্রয়াগে প্রাধান্য

খোদিত লিপির গাত্রে আপনার স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। সমুদ্রগুপ্তের সময়ে তাঁহার পিতৃকুলের পরিচয় এবং তাঁহার রাজ্যের গৌরব-কাহিনী স্তম্ভে খোদিত হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট আকবরের শাসন-সময়ে প্রয়াগে মুসলমানদিগের দুর্গ নির্ম্মিত হয়। সেই দুর্গের নাম— 'ইল্লাহাবাছ।' তদনুসারে সাজাহান কর্ত্তৃক উহা 'আল্লাহাবাদ' এবং পরবর্ত্তিকালে এলাহাবাদ নামে অভিহিত হইয়া আসে। যাহা হউক, পূর্ব্বে অশোকের যে স্তম্ভের * কথা বলিতেছিলাম, সম্রাট জাহাঙ্গীর তাহার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলেন, শ্রীহীন করেন এবং ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সেই স্তম্ভের পুনঃসংস্কার করাইয়া তাহার উপর পারস্য ভাষায় আপনার রাজ্যের ও রাজত্বের গৌরব-কাহিনী খোদিত করিয়া দেন। এলাহাবাদের কেল্লার মধ্যে এখন যে স্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই স্তম্ভ ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির শাসন-কালের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লাঞ্ছনা বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। চীন-পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রয়াগের যে পরিচয় পাই, তাহাতে জানিতে পারি,—ফা-হিয়ান এবং হুয়েন-সাং দুই জনই অযোধ্যা হইতে প্রয়াগে গিয়াছিলেন বটে; কিন্তু দুই জনের গন্তব্য পথ বিভিন্ন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—'অযুধো' (A-yu-to) অর্থাৎ অযোধ্যা হইতে নৌকাযোগে তিন শত লি (অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ মাইল) গমন করিয়া তিনি গঙ্গার উত্তরতীরস্থিত 'ওইমুখী' (O-ye-mu-khi) † নামক স্থানে অর্থাৎ হয়মুখে উপনীত হন। কিংবদন্তী,—'হয়' নামক দানবের রাজধানী ছিল বলিয়া উহার নাম 'হয়মুখ' হয়। চন্দ্রবংশীয় যদুবংশে 'হয়' নামে নৃপতি ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক ঐ নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াও মনে হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে 'হয়' নামক যবনাধিপতি কর্ত্তৃক পুরঞ্জন রাজার রাজ্য আক্রমণের প্রসঙ্গ আছে। হয়মুখ সেই যবনাধিপতির রাজ্য ছিল বলিয়াও অনুমান হয়। সেই যবনাধিপতি বোধ হয় দৈত্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, হুয়েন-সাং সেখান হইতে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে সাত শত লি (প্রায় এক শত ষোল মাইল) গমন করিয়া প্রয়াগে পৌঁছিয়াছিলেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে ঐ নগরী প্রতিষ্ঠিত এবং উহার পশ্চিম-প্রান্তে বালুকাময় বৃহৎ সমতল ক্ষেত্র বিদ্যমান। নগরের মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণদিগের একটী দেবমন্দির ছিল। প্রবাদ এই—ঐ মন্দিরে একটী পয়সা উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিলে, মানুষ সহস্র সহস্র পয়সার অধিকারী হইতে পারিত। মন্দিরের প্রধান প্রকোষ্ঠের সম্মুখে বহু দূর বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত একটী বৃহৎ বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল। কথিত হয়, সেই বৃক্ষে এক নরভুক্ দৈত্য বাস করিত। বৃক্ষটীর চারি দিকে অসংখ্য নরকঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

---

* এলাহাবাদ-স্থিত অশোকের স্তম্ভে যে লিপি খোদিত আছে, জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপ প্রথমে তাহার পাঠোদ্ধার করেন। তাঁহার মতে, ঐ লিপি চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছিল। সমুদ্র-গুপ্তের পরিচয়-মূলক লিপি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কর্ত্তৃক খোদিত হয়,—কোনও কোনও ঐতিহাসিক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

† হয়মুখ—দণ্ডিয়া খেরা (Dandia khera) নামে অভিহিত হয়। উহা বৈশ্য-রাজপুতদিগের রাজধানী ছিল। কানপুর হইতে মাণিকপুর ও সালন পর্য্যন্ত, গঙ্গা ও শায়ি নদীর মধ্যবর্ত্তী বৈশারা নামক স্থানকে [illegible] হয়মুখ হওয়া সম্ভবপর।

ছিল। যে সকল যাত্রী ঐ মন্দিরের সম্মুখে আত্মবলিদান করিত, তাহাদেরই কঙ্কালসমূহ ঐরূপে বৃক্ষের চতুঃপার্শ্বে পতিত থাকিত। হুয়েন-সাং বলেন—'স্মরণাতীত কাল হইতে বৃক্ষ-পার্শ্বে এইরূপে নরকঙ্কালসমূহ রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। কানিংহাম মনে করেন, এলাহাবাদ সহরের অন্যতম প্রধান উপাস্য সামগ্রী অক্ষয়বটকে লক্ষ্য করিয়াই হুয়েন সাং ঐ কথা বলিয়া থাকিবেন। কেল্লার মধ্যে, স্তম্ভবিশিষ্ট প্রোথিত গৃহের অভ্যন্তরে সেই অক্ষয়বট বৃক্ষ আজিও বিদ্যমান আছে। মন্দিরের চিহ্ন এখন বিশেষ কিছুই সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তবে সেই সকল স্তম্ভ দেখিয়া অনেকে সেই স্তম্ভসমূহকেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনুমান করেন। এলাহাবাদ দুর্গের অভ্যন্তরে, 'এলেনবরা ব্যারাকের' পূর্ব্ব পার্শ্বে, অশোকের ও সমুদ্রগুপ্তের খোদিত পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর-স্তম্ভের উত্তরে, সেই দেবমন্দির বিদ্যমান ছিল,—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। অক্ষয়বট এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্তম্ভসমূহ দৃষ্টে তথায় প্রাচীন নগরীর অস্তিত্ব অনুভূত হয়। কালক্রমে তাবৎপার্শ্বের ভূমি আবর্জ্জনারাশিতে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং অক্ষয়বট ও মন্দির মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়া আছে। এখন সেই অক্ষয়বটের নিকটে যাইতে হইলে, একটা সোপান-সাহায্যে মৃত্তিকাভ্যন্তরে অবতরণ করিতে হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম এইভাবে সেই সোপান-সাহায্যেই অবতরণ করিয়াছিলেন। আজও সেইরূপ সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া তথায় গতিবিধি করিতে হয়। রসিদ উদ্দীন প্রণীত 'জামি-উত্তারিখ' গ্রন্থে এই অক্ষয়বটের প্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—প্রয়াগের ঐ বৃক্ষ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। রসিদ উদ্দীনের লিখিত অধিকাংশ বিষয়ই আবু-রিহাণের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আবুরিহাণের গ্রন্থে গজনীর মামুদের সমসাময়িক বিবরণ উল্লেখ থাকা সম্ভবপর। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন-সাং দেখিয়াছিলেন,—'প্রয়াগ নগর এবং গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের মধ্যে দুই মাইল পরিধি-যুক্ত বালুকাময় প্রান্তর ব্যবধান ছিল। তিনি যখন ঐ বটবৃক্ষকে নগরের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তখন উহার অন্ততঃ এক মাইল দূরে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমক্ষেত্র হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু হুয়েন-সাঙের ভারতাগমনের নয় শতাব্দী পরে, আকবরের রাজত্ব-কালে আবুল কাদির বলিয়া গিয়াছেন,—ঐ বৃক্ষ হইতে লোকে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক নদীর জলে পতিত।' তবেই বুঝা যায়, হুয়েন-সাঙের সময়ে নদী নগর হইতে দূরে অবস্থিত ছিল এবং আকবরের সম-সময়ে নদীপ্রবাহ নগরের নিকটে আসিয়াছিল। আকবরের শাসন-কালের বহু পূর্ব্ব হইতে বোধ হয় প্রাচীন নগরী জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। কারণ, আকবরের রাজত্বের একবিংশ বর্ষে হিজিরা ৯৮২ বৎসরে (১৫৭২ খৃষ্টাব্দে) যখন 'ইলাহাবাছ' দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, বৃক্ষ ভিন্ন জনপদের অন্য কোনও চিহ্ন নিকটে বিদ্যমান ছিল না। আবুরিহাণের বর্ণনায় প্রয়াগের নাম নাই; বটবৃক্ষের মাত্র নামোল্লেখ আছে। সুতরাং তখন ঐ নগরী জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া সম্ভবপর। আকবরের পূর্ব্বের এবং আবুরিহাণের পরের কোনও মুসলমান ঐতিহাসিক ঐ নগরীর বিষয় উল্লেখ করেন নাই বলিয়াও মধ্যবর্ত্তি-কালে অস্তিত্বাভাব প্রতিপন্ন হয়।

প্রয়াগের প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে অদ্ভুত এক কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে। কিম্বদন্তীতে প্রকাশ,—প্রয়াগ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, আকবরের রাজত্বকালে, ঐ স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারই নাম অনুসারে প্রয়াগ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কথিত হয়, সম্রাট আকবর যখন 'ইলাহাবাদ' দুর্গ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন, সেই সময়ে নদীর স্রোতে এক দিকের প্রাচীর কেবলই ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। কারিকরগণ কোনক্রমেই সে দিকের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইতেছিল না। আকবর এ বিষয়ে কয়েক জন বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাহাতে স্থির হয়,—নরবলি ভিন্ন ভিত্তিভূমি গ্রথিত হওয়া সম্ভবপর নহে। অতঃপর ঘোষণা প্রচার হয়—যে কোনও ব্যক্তি এই দুর্গ-নির্ম্মাণের সহায়তা-কল্পে প্রাণদান করিবে, তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাহারই নামানুসারে নগরের নামকরণ হইবে। প্রয়াগ নামক সেই ব্রাহ্মণ আকবরের ঘোষণা-বাণী শ্রবণ করিয়া দুর্গের ভিত্তিভূমি-গঠনে প্রাণদানে অগ্রসর হয়। প্রয়াগের প্রাণদানে দুর্গ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই নগরটী প্রয়াগ নামে পরিচিত। কানিংহাম লিখিয়া গিয়াছেন,—'অক্ষয়বট দেখিতে যাইলে, প্রয়াগের প্রতিষ্ঠার বা প্রয়াগ নামের উৎপত্তি বিষয়ক এই উপাখ্যান যাত্রিগণের নিকট প্রায়ই পরিকীর্ত্তিত হইত।' যাহা হউক, কানিংহাম প্রয়াগের এই নামোৎপত্তির উপাখ্যানে আস্থা স্থাপন করেন নাই। ইহার প্রতিবাদ ব্যপদেশে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'সপ্তম শতাব্দীর হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রয়াগ নাম দৃষ্ট হয়। দুই শত পঁয়ত্রিশ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে মহারাজ অশোক যে স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও প্রয়াগের পরিচয় আছে। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর কর্তৃক দুর্গ নির্ম্মাণ-ব্যপদেশে প্রয়াগ নামকরণের যে কিম্বদন্তী প্রচলিত, তাহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে।' প্রয়াগ প্রদেশের পরিধি পাঁচ হাজার লি অর্থাৎ আট শত তেত্রিশ মাইল,—হুয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কানিংহামের মতে, উহার পরিধি পাঁচ শত লি অর্থাৎ তিরাশী মাইল হওয়া সম্ভবপর। কারণ, গঙ্গার ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ব-দ্বীপ প্রয়াগ প্রদেশ বলিয়া কথিত হইলে উহার পরিধি অত অধিক হইতে পারে না।

এলাহাবাদের প্রতিষ্ঠা।

প্রয়াগের অনতিদূরে, বলিতে গেলে প্রয়াগ ব-দ্বীপেরই সীমানার মধ্যে, কৌশাম্বী নামক এক প্রাচীন নগরীর পরিচয় পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে ঐ নগরী প্রখ্যাতনামা নৃপতিগণের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই নগর কখনও কৌশাম্বী এবং কখনও কৌশাম্বীমণ্ডল নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমান কালে 'কোসম' নামক জনপদকে প্রাচীন কৌশাম্বী নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। রামায়ণে বিশ্বামিত্রের মুখে এই জনপদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের সহিত শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ যখন মিথিলায় গমন করিতেছিলেন, পথিপার্শ্বস্থিত জনপদাদির বিবরণ বিশ্বামিত্র তাঁহাদের নিকট বর্ণন করেন। সেই উপলক্ষে কৌশাম্বী নগরের উল্লেখ আছে। বিশ্বামিত্র বলিতেছেন,—'কুশ নামক জনৈক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মতনয় ছিলেন। তিনি সদৃশীকুলীনা পত্নী বৈদর্ভীতে কুশাম্ব, কুশনাভ, অসূর্ত্তরজস ও বসু নামক আত্মতুল্য মহাবলসম্পন্ন চারিটী পুত্র উৎপাদন করেন।

কৌশাম্বী নগরী।

সেই চারি পুত্র কর্ত্তৃক চারিটী নগরী নির্ম্মিত হয়। কুশাম্ব কৌশাম্বী নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করেন। কুশনাভ কর্ত্তৃক মহোদয় নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। অসূর্ত্তরজস ধর্ম্মারণ্য নামক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। বসু গিরিব্রজপুর নির্ম্মাণ করেন।' এই চারিটী নগরের মধ্যে কৌশাম্বী পরবর্ত্তিকালে 'কোসম' নামে অভিহিত হইয়াছে। মহোদয় নগর 'কান্যকুব্জ' বা 'কনোজ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। বসু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গিরিব্রজ নগর 'বসুমতী' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। সেই গিরিব্রজই মগধের রাজধানী গিরিব্রজ বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামায়ণেও উহা মগধদেশ-মধ্যস্থিত এবং মাগধী নামে উল্লিখিত হইয়াছে। * ধর্ম্মারণ্যের অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। পুরুরবার বংশে, অধস্তন দশম পুরুষে, কুশাম্ব জন্মগ্রহণ করেন। সেই কুশাম্ব কর্ত্তৃক কৌশাম্বী নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কোনও কোনও পুরাণে উল্লিখিত। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই,—গঙ্গা কর্ত্তৃক হস্তিনাপুর অপহৃত হইলে, কুরুবংশীয় রাজা নিচক্ষু (নেমিচক্র) কৌশাম্বীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। † সেই সময় ঐ নগর কুরুগণের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত ও অধিকতর সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' গ্রন্থে উদয়ন নামক কৌশাম্বীর জনৈক নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে প্রকাশ,—উজ্জয়িনীর অনেক লোক তখন কৌশাম্বী-রাজ উদয়নের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যেও কৌশাম্বী-রাজ উদয়নের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। 'মহাবংশ' নামক বৌদ্ধ-গ্রন্থ পঞ্চম শতাব্দীতে বিরচিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে,—'মহানুভব যশ পলায়ন করিয়া বৈশালী হইতে কৌশাম্বী নগরে বৌদ্ধধর্ম্মযাজকগণের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।' 'ললিতবিস্তর' নামক বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ ৭০ এবং ৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। সুতরাং খৃষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তিকালে ঐ গ্রন্থ যে বিরচিত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। সেই গ্রন্থে কৌশাম্বীর রাজা শতানিকের পুত্র উদয়নবৎসের জন্মদিনের বিষয় লিখিত আছে। যে দিন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন; উদয়নবৎস সেই দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—ইহাই প্রকাশ। লঙ্কাদ্বীপের গ্রন্থ-সমূহে ভারতবর্ষের উনিশটী প্রধান নগরের মধ্যে কৌশাম্বীর নাম উল্লিখিত। কৌশাম্বীর রাজা উদয়নবৎসের নাম তিব্বতীয়-গণের মধ্যে প্রচারিত ছিল। রত্নাবলী নাটকে কৌশাম্বীর রাজা—বৎস রাজা নামে এবং তাঁহার রাজ্য বৎসপত্তন নামে পরিচিত। ‡ বুদ্ধদেব বৌদ্ধত্ব লাভ করিয়া তাঁহার বৌদ্ধ-জীবনের ষষ্ঠ ও নবম বৎসর ঐ নগরে অতিবাহিত করেন। হুয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন, কৌশাম্বীতে তিনি চন্দন-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের এক প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে রাজা উদয়ন সেই মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে

* রামায়ণ, আদিকাণ্ড, দ্বাত্রিংশ সর্গ।

† বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, একবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

‡ বনগমন-কালে শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গা অতিক্রম করিয়া বৎস-দেশে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রতিপন্ন হইতেছে;—সেই বৎসদেশে ও বৎসপত্তন একই প্রদেশকে বুঝায়। তবে কি বৎসদেশের রাজা বলিয়া উদয়নের নাম উদয়নবৎস হইয়াছিল?

প্রস্তরবিনির্ম্মিত এক আবরণের মধ্যে ঐ মূর্ত্তি রক্ষিত ছিল। রত্নাবলী নাটকে বৎসরাজার রাজধানী কৌশাম্বীর একটি দৃশ্য প্রকটিত আছে। রাজা হর্ষদেবের রাজত্বকালে ঐ নাটক বিরচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, এই হর্ষদেব কাশ্মীরের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু কানিংহাম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—কনোজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের ঐ নামে অভিহিত হওয়া সম্ভবপর। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় লিখিত ছিল,—বহুদেশের রাজপুত্রগণ যাঁহার চরণতলে মস্তক অবনত করিয়া আছেন, তিনিই সেই হর্ষদেব। যাহা হউক, ৬০৭ এবং ৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ প্রস্তাবনা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। খারা (Khara) দুর্গের সিংহদ্বারে একটী খোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে ১০৯২ সম্বতে অর্থাৎ ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে কৌশাম্বী রাজ্য কনোজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল, এইরূপ লিখিত আছে। সুতরাং কৌশাম্বীর হর্ষদেব ও কনোজের হর্ষবর্দ্ধন অভিন্ন ব্যক্তি হওয়াই সম্ভবপর।

পাণ্ডুবংশীয় শেষ নৃপতিগণের রাজধানী সেই কৌশাম্বী নগরী অথবা হুয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট বুদ্ধদেবের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তিসম্বলিত সেই প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব বহু দিন লোপ পাইয়াছে।

কোসম-পল্লীতে কৌশাম্বীর স্থান-নির্দ্দেশ।

বর্ত্তমান কালে যমুনা নদীর অনতিদূরে 'কোসম' নামক যে পল্লী দৃষ্ট হয়, সাধারণে তাহাকেই প্রাচীন কৌশাম্বী নগর বা কৌশাম্বীমণ্ডলীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনুমান করেন। এলাহাবাদ সহর হইতে প্রস্থ প্রায় ত্রিশ মাইল এবং এলাহাবাদ দুর্গ হইতে প্রায় একত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, যমুনার উত্তর পারে, 'কোসম' নগর অবস্থিত। কোসম নগরই যে কৌশাম্বী নগরের শেষ স্মৃতি, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কানিংহাম একটি অদ্ভুত উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। কৌশাম্বী নগরে 'বাকুল' নামক এক শিশু জন্মগ্রহণ করে। শিশুর মাতা যমুনায় স্নান করিতে গেলে, শিশু হঠাৎ জলমধ্যে নিপতিত হয়। একটী মৎস্য শিশুটীকে গিলিয়া ফেলে এবং কাশীধামে লইয়া যায়। সেখানে ধীবর কর্ত্তৃক মৎস্য ধৃত হইলে, জনৈক সম্ভ্রান্ত-বংশীয় রমণী সেই মৎস্য ক্রয় করিয়া লন। কিন্তু মৎস্যের উদরে সেই শিশুকে প্রাপ্ত হইয়া রমণী পুত্রবৎ শিশুকে প্রতিপালন করিতে থাকেন। এদিকে শিশুর আশ্চর্য্য জীবন-লাভের বিষয় চারিদিকে প্রচারিত হইলে, শিশুর মাতা বারাণসী-ধামে উপনীত হইয়া, শিশুকে ফিরাইয়া পাইবার প্রার্থনা করেন। কিন্তু যে সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলা মৎস্য মধ্যে শিশুটীকে প্রাপ্ত হইয়া লালনপালন করিতেছিলেন, তিনি শিশুকে প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হন। তখন রাজার নিকট সেই বিষয়ের বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে রাজা স্থির করিয়া দেন,—'দুই জনেই শিশুর মাতা; এক জন গর্ভধারিণী, আর এক জন ক্রয়কারিণী।' যাহা হউক, সেই হইতেই শিশু 'বাকুল' বা দুই কুলোদ্ভব সংজ্ঞা লাভ করে। নব্বই বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বাকুলের কোনই ব্যায়রাম-পীড়া হয় নাই। সেই সময় বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচারে সে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ব্যপদেশে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,—'শিষ্যগণের মধ্যে যাহারা রোগমুক্ত, তাহাদের মধ্যে তুমি প্রধান স্থান অধিকার করিবে।' বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর বাকুল আরও নব্বই বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি এক জন

বোদ্ধযোগী বলিয়া প্রখ্যাত। এই উপাখ্যানে প্রতিপন্ন হয়, কৌশাম্বী নগরী যমুনার তীরে অবস্থিত ছিল। পবিত্র প্রয়াগ তীর্থ * অতিক্রম করিয়া মৎস্ত বারাণসীতে উপনীত হইয়াছিল। প্রয়াগ হইতে কৌশাম্বীর যে দূরত্বের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও বর্ত্তমান কোসম পল্লীকেই কৌশাম্বী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কৌশাম্বীতে প্রাচীন দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ পুঞ্জাকারে বিদ্যমান আছে। উহার সন্নিকটে প্রভাস নামে একটী ক্ষুদ্র গিরি দৃষ্ট হয়। ঐ গিরির উপর প্রাচীন দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাই অনেকে অনুমান করেন। কৌশাম্বী প্রদেশের পরিধির পরিচয় ছয় হাজার লি (প্রায় এক হাজার মাইল), হুয়েন-সাং নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কানিংহামের মতে উহা অতিরঞ্জিত। পারিপার্শ্বিক জনপদসমূহের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে, উহার পরিধি ছয় শত লি প্রায় এক শত মাইলের অধিক হওয়া সম্ভবপর নহে। মোগলসম্রাট আকবর বর্ত্তমান কোসম পল্লীতে একটী প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই স্তম্ভে যে লিপি খোদিত আছে, তদ্দ্বারা উহাকে কৌশাম্বীপুর বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ, আকবরের সময়ও, আলোচনায় স্থির হইয়াছিল, বর্ত্তমান এলাহাবাদের প্রায় পনের ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে, যমুনার উত্তর তীরে; কৌশাম্বী নগর অবস্থিত ছিল। সুতরাং, কোসম ও কৌশাম্বী অভিন্ন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কৌশাম্বী হইতে হুয়েন-সাং কুশপুর নামক এক নগরে গমন করিয়াছিলেন। ঐ নগরের নাম তাঁহার বর্ণনায় 'কিয়া-শে-পু-লো' (Ka-she-pu-lo) রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। এম জুলিয়ান তাহা হইতে 'কাশাপুর' পাঠ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। হিন্দুগণের নিকট ঐ নগর কুশপুর বা কুশভবনপুর নামেও অভিহিত হয়। কুশপুর নগরের প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে নানা প্রকার কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। কেহ বলেন,—শ্রীরাম-পুত্র কুশ কর্ত্তৃক ঐ কুশপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। কেহ বলেন,—ঐ নগরে কৌশাম্বী-পতি কুশের ভ্রাতা কুশনাভের রাজধানী থাকা সম্ভবপর। যাহা হউক, সে তথ্য নির্ণয় করা এখন অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ, তিনি কৌশাম্বী হইতে উত্তরাভিমুখে সাত শত লি অর্থাৎ প্রায় ১১৭ মাইল গমন করিয়া ঐ নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। বিশাখ (অযোধ্যা) হইতে ঐ নগর ১৭০ এবং ১৮০ লির অর্থাৎ প্রায় ২৮ হইতে ৩০ মাইলের মধ্যে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই সকল হিসাব দেখিয়া, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, গোমতী-নদীর তীরে সুলতানপুর নামক যে প্রাচীন নগরী দৃষ্ট হয়, কুশপুর তাহারই নিকটে অবস্থিত ছিল; অথবা, কুশপুরের ভগ্ন-স্তূপের উপরই সুলতানপুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

---

* প্রয়াগ পবিত্র তীর্থ, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থল বলিয়া প্রয়াগ অশেষ মাহাত্ম্য-যুক্ত। বাল্মীকির রামায়ণে, অযোধ্যা-কাণ্ডে, পঞ্চদশ সর্গে, "গঙ্গা-যমুনয়োঃ পুণ্যাৎ সঙ্গমাদাহৃতং জলং" আছে। অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থান অতি পুণ্য-জনক ক্ষেত্র। প্রয়াগই যে সেই ক্ষেত্র, উক্ত অযোধ্যা-কাণ্ডের চতুঃপঞ্চাশ সর্গে ষষ্ঠ শ্লোকে তাহা প্রতিপন্ন হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

---- * ----

কুরু-পাঞ্চাল-বিরাট-রাজ্য।

[কুরুরাজ্য,—কুরুক্ষেত্র, শাস্ত্র-মতে তাহার অবস্থানাদি,—হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ,—ঐ দুই রাজধানীর বর্ত্তমান অবস্থা;—স্থাণ্বীশ্বর বা থানেশ্বর,—নামের উৎপত্তি,—পৌরাণিক মতে এবং পাশ্চাত্য মতে উহার অবস্থিতির পরিচয়,—প্রাচীন দুর্গ ও ভগ্নস্তূপ, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতির প্রসঙ্গ,—মামুদ গজনীর লুণ্ঠন-কাহিনী;—কুরুক্ষেত্রের অবস্থিতি,—কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত তীর্থ-সমূহের অনুসন্ধান,—উহার মাহাত্ম্য, পরিমাণ ও বিস্তৃতি;—পাঞ্চাল-রাজ্য,—রাজ্যের নামকরণ,—উত্তর-পাঞ্চাল ও দক্ষিণ-পাঞ্চাল,—দ্রোণ-দ্রুপদ প্রসঙ্গ,—অহিচ্ছত্র ও কাম্পিল্য,—পরবর্ত্তিকালে উত্তর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ পাঞ্চাল, দুই রাজ্যের দুই রাজধানীর অনুসন্ধান,—বর্ত্তমানে উহাদের অবস্থা;—শ্রুঘ্ন, মদাবর, গভীষণ, ব্রহ্মপুর, পীলুশন, কর্ণাল প্রভৃতির প্রসঙ্গে হরিদ্বার, মায়াপুর, দ্রোণহ্রদ, কনখল প্রভৃতির পরিচয়;—বিরাট-রাজ্য,—মহাভারতে বিরাট প্রসঙ্গ,—পাণ্ডবগণের সহিত বিরাট-রাজ্যের সম্বন্ধ-সূত্র;—বিরাট-নগরের অবস্থান সম্বন্ধে মতান্তর,—কাহারও মতে উত্তর বঙ্গে রাজসাহী জেলায়, কাহারও মতে মধ্যভারতে বিরাট-রাজ্যের অবস্থান-স্থান;—হুয়েন-সাং প্রভৃতির বর্ণনায় বিরাট-রাজ্যের পরিচয় ও তদনুসারে সিদ্ধান্ত,—পরবর্ত্তিকালে বিরাট-নগরের নাম-পরিবর্ত্তন,—পাণ্ডবদিগের বাসস্থান সম্বন্ধে কিংবদন্তী।]

যেমন কাশী-কোশল-বিদেহ, পুরাবৃত্তে তদ্রূপ কুরুরাজ্য প্রতিষ্ঠান্বিত। কুরু ও কুরুক্ষেত্র নামের পরিচয় স্মরণাতীত কাল হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রাজচক্রবর্ত্তী প্রিয়ব্রতের পুত্র কুরু নামে অভিহিত ছিলেন। এদিকে বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে, আরণ্যকে, উপনিষদে কুরুক্ষেত্রের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। * সুতরাং কুরু ও কুরুক্ষেত্র, এই দুই নাম অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে।

কুরু ও কুরুক্ষেত্র।

কিন্তু প্রধানতঃ কুরুক্ষেত্র, কুরু বা কুরু-রাজ্য বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহার সহিত চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষি কুরুর স্মৃতি ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। চন্দ্রবংশীয় রাজা সম্বরণের ঔরশে, তপতীর গর্ব্ভে, রাজর্ষি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। † মহাভারতে এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তিনি কুরুক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন। 'কর্ষণ করার' তাৎপর্য্য কি, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পুরাকালে কুরুক্ষেত্র তৎকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, অথবা যজ্ঞাদি দ্বারা তিনি ঐ স্থানের উৎকর্ষ-সাধন বা মাহাত্ম্যবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, 'কর্ষণ' শব্দে এরূপ অর্থই প্রতীত হইতে পারে। মহাভারতের শল্য-পর্ব্বে, ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়ে, কুরু কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্র-কর্ষণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। ঋষিগণ বলরামকে বলিতেছেন,—

* শতপথ-ব্রাহ্মণে,—"কুরুক্ষেত্রেঽমী দেবা যজ্ঞং তন্বতে।" অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র-তীর্থে দেবগণ যজ্ঞ করিতেন। জাবালোপনিষদে,—"ওঁ বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনুকুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্।" ইত্যাদি। অর্থাৎ, বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিতেছেন,—কুরুক্ষেত্র দেবগণের যজন-স্থান। ইহা অবিমুক্ত ক্ষেত্র এবং সকলের পক্ষে ব্রহ্মসদন।

† পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ডের বংশলতা, ৩১৫ম ও ৩২২ম পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

'হে রাম। এই সমন্তপঞ্চক প্রজাপতির সনাতনী উত্তর বেদী বলিয়া বিখ্যাত আছে। পুরাকালে মহাবলপ্রদ দেবগণ এই স্থানে প্রধান প্রধান যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়াছিলেন। মহামুভব রাজর্ষি কুরু বহু বর্ষ ব্যাপিয়া এই স্থানে কর্ষণ করেন। এই জন্যই ইহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রথিত হইয়াছে।' * ইহার পর, ঐ অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রের এবং তদন্তর্গত হ্রদ-সমূহের ও তীর্থাদির মাহাত্ম্য-তত্ত্ব পরিবর্ণিত। মহাভারতের বনপর্ব্বে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রের একটী সীমানার পরিচয় পাই। সেখানে লিখিত আছে,—'যাহারা দৃষদ্বতীর উত্তর ও সরস্বতীর দক্ষিণ কুরুক্ষেত্রে বাস করে, তাহারা স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ সকল ও মচক্রুক,—এই সকল স্থানের অন্তর্বর্ত্তী যে স্থান, তাহা কুরুক্ষেত্র, সমন্তপঞ্চক ও ব্রহ্মার উত্তর বেদী বলিয়া নির্ণীত হয়।' কুরুক্ষেত্রের পরিমাণ দ্বাদশ যোজন। উহার সীমানার মধ্যে তিন শত পঁয়ষট্টিটী তীর্থস্থান বিদ্যমান আছে। হস্তিনাপুর এই কুরুক্ষেত্র-প্রদেশের রাজধানী ছিল। চন্দ্রবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি হস্তী কর্ত্তৃক হস্তিনাপুর নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রামায়ণে কুরুক্ষেত্রের নাম যদিও দৃষ্ট হয় না; কিন্তু কুরুজাঙ্গাল ও হস্তিনাপুরের নাম উল্লিখিত আছে। কেকয় রাজ্য হইতে ভরতকে আনয়নের জন্য যে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, হস্তিনাপুরে গঙ্গা পার হইয়া পাঞ্চাল, কুরুজাঙ্গাল প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিয়া, তাহাকে কেকয় রাজ্যে যাইতে হইয়াছিল। ইহাতে প্রতীত হয়—হস্তিনাপুর, কুরুক্ষেত্র অথবা কুরুজাঙ্গাল প্রভৃতির অস্তিত্ব শ্রীরামচন্দ্রাদির রাজত্বের পূর্ব্বকাল হইতেই বিদ্যমান ছিল। চন্দ্রবংশীয় হস্তী সেই হস্তিনাপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া উহাকে প্রতিষ্ঠান্বিত করিয়াছিলেন এবং কুরুর রাজত্বকালে কুরুক্ষেত্র সমধিক প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র, কুরুজাঙ্গাল উভয়ই কুরুর নামে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। † নচেৎ, বহু পূর্ব্বেও ঐ সকল স্থান বিদ্যমান ছিল, সহজেই বুঝা যায়। হস্তীর অধস্তন চতুর্থ পুরুষে কুরু জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণাদির আলোচনায় প্রতীত হয়, কুরুর শাসন-কালে ঐ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য উহা কুরুরাজ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যে পরম পবিত্র স্থান, পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে তাহা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ‡

---

* "প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে।" মহাভারত, শল্য-পর্ব্ব, ৫৩শ অধ্যায়, নীলকণ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

† কুরুজাঙ্গাল সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত। কেহ বলেন, কুরুক্ষেত্র জঙ্গলাকীর্ণ ছিল; কুরু কর্ত্তৃক সেই জঙ্গল পরিষ্কৃত হয়; তাই উহার নাম কুরুজাঙ্গাল। কেহ বলেন,—কুরুক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বস্থিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কুরুজাঙ্গাল নামে অভিহিত হইত। রামায়ণের বর্ণনায় বুঝা যায়,—হস্তিনাপুর ও পাঞ্চালের পশ্চিমে কুরুজাঙ্গাল অবস্থিত ছিল। কুরুর নামানুসারেই কুরুজাঙ্গাল প্রখ্যাত। মহাভারত, আদিপর্ব্বে, কুরুজাঙ্গাল ও কুরুক্ষেত্র একই স্থান বলিয়া উল্লিখিত। সেখানে লিখিত আছে,—'সেই মহাতপা কুরুর তপস্যা দ্বারা কুরুজাঙ্গাল নামক স্থান পবিত্র ও তাঁহার নামানুসারে কুরুক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।' (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৯৪শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

‡ মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ১৮শ শ্লোক; অগ্নিপুরাণ, ১০৯ম অধ্যায়, ১৪শ—১৫শ শ্লোক; বামনপুরাণ, ৪১শ—৫০শ অধ্যায়, ১ম ও ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হস্তিনাপুর অনেক দিন পর্য্যন্ত কৌরবগণের রাজধানী ছিল। কুরু-পাণ্ডবের মহা-সমরের পূর্ব্বে হস্তিনাপুরের সমৃদ্ধির পরিচয় মহাভারতে ও পুরাণাদি গ্রন্থের নানা স্থানে দেখিতে পাই। কৌরবগণের সহিত পাণ্ডবগণের বিবাদ উপস্থিত হইলে, কৌরব রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কৌরব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের রাজধানী হস্তিনাপুরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। পাণ্ডব-সংজ্ঞা-প্রাপ্ত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ খাণ্ডবারণ্য দাহন করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় আপনাদের রাজধানী স্থাপন করেন। * কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় এই দুই রাজধানী হইতে সমরায়োজন হইয়াছিল। হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থের মধ্যস্থলে কুরুক্ষেত্র বিদ্যমান। সিদ্ধান্ত হয়, বর্ত্তমান দিল্লী নগরীর দক্ষিণাংশে ইন্দ্রপ্রস্থ বিদ্যমান ছিল। অধুনা দিল্লীর সন্নিকটে 'ইন্দরপৎ' নামে যে প্রান্তর দৃষ্ট হয়, তাহাই ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন। দিল্লীর 'পুরাণ কিল্লা' নামক মুসলমানদিগের সহর ইন্দ্র প্রস্থের ভিত্তি-ভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল, এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। হস্তিনাপুর এখন নাই। ইন্দ্রপ্রস্থের উত্তরে, বর্ত্তমান থানেশ্বরের সন্নিকটে, ঐ হস্তিনাপুর অবস্থিত ছিল,—ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র-সমরে জয়লাভের পর, ভ্রাতৃগণ সহ যুধিষ্ঠির হস্তিনা-পুরে গিয়া বসবাস করেন। ইন্দ্রপ্রস্থের পরিবর্ত্তে হস্তিনাপুরেই তাঁহাদের নবরাজ্য-প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে যখন যুধিষ্ঠিরাদির একছত্র প্রভাব, হস্তিনাপুর তখন পাণ্ডবগণের রাজধানী। পরিশেষে গঙ্গা কর্ত্তৃক, হস্তিনাপুর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে কুরুবংশীয় নৃপতি নিচক্ষু (নেমিচক্র) কৌশাম্বী নগরে গিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। সে হিসাবে, হস্তিনাপুর অনেক দিন বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এখন তাহার স্থান-নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। † তথাপি অনুসন্ধিৎসুগণ স্থির করেন, বর্ত্তমান দিল্লী হইতে ৬৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে যে এক ভগ্নস্তূপ আছে, তাহাই হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশেষ হওয়া সম্ভবপর। ‡

হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ।

* দুর্য্যোধনাদির কৌরব-সংজ্ঞা এবং যুধিষ্ঠিরাদির পাণ্ডব-সংজ্ঞা সম্বন্ধে একটী সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেন; অথচ, এক পক্ষ কৌরব, অপর পক্ষ পাণ্ডব সংজ্ঞা লাভ করিলেন কেন? ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ-হেতু রাজ্য-লাভে অনধিকারী হইলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতিপত্তির অভাবে তাঁহার বংশ কুরুর নামানুসারে কৌরব নামেই পরিচিত রহিল। আর, পাণ্ডু রাজ্য লাভ করিয়া প্রতিপত্তিতে গৌরবান্বিত হওয়ায় তাঁহার বংশ পাণ্ডব-বংশ সংজ্ঞা লাভ করিল। উভয় পক্ষের কৌরব ও পাণ্ডব সংজ্ঞা-লাভে ইহাই কারণ বলিয়া মনে হয়। অথবা দুর্য্যোধন কুরুবংশের জ্যেষ্ঠ-পুত্রের বংশ-সমুদ্ভূত; সুতরাং তিনি কৌরব-সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া পিতার নামানুসারে আপনাদিগকে পাণ্ডববংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, দূর ভবিষ্যতে যুধিষ্ঠিরাদির বংশও কুরুবংশ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিল।

† শাস্ত্র-মতে হস্তিনাপুর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, প্রাচীন হস্তিনাপুর সন্ধান করিয়া পাওয়া দুরূহ হইলেও অধুনা হরিদ্বারের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে হস্তিনাপুর নামে একটী নগরী কল্পিত হইয়া থাকে।—কর্ণেল টড রাজস্থানের ইতিহাসে এ বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। Vide Colonel Tod's *Rajasthan*, Vol. I., Chap. IV.

‡ "The capital of the Kurus...was the city of Hastinapur, the supposed ruins of which have been discovered on the upper course of the Ganges, about 65 miles to the north-east of Delhi."—R. C. Dutt, *A History of Civilisation in Ancient India,* Vol. I.

আধুনিক মানচিত্রে দিল্লী, পাণিপথ, কর্ণাল, থানেশ্বর প্রভৃতি যে সকল স্থান দৃষ্ট হয়, উহাই প্রাচীন কালে পাণ্ডব-কৌরবগণের লীলাক্ষেত্র ছিল।

বর্ত্তমান থানেশ্বরকে স্থাণ্বীশ্বর বা প্রাচীন কুরুক্ষেত্র তীর্থের কেন্দ্রস্থল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কুরুক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্বোক্ত তিন শত পঁয়ত্রিশটী তীর্থক্ষেত্র এই থানেশ্বরেরই আশে-পাশে বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মহাভারতে পুরাণাদি শাস্ত্রে থানেশ্বর নাম দৃষ্ট হয় না। মহাভারতের বনপর্ব্বে স্থাণুতীর্থ নামে এক তীর্থক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। স্থাণু-নামধেয় মহেশ্বর সেই তীর্থে বিরাজমান ছিলেন, তাই সেই স্থানটীকে 'স্থাণ্বীশ্বর' তীর্থ বলা হইত। স্থাণ্বীশ্বর মহাদেবের নামানুসারে ঐ স্থান স্থানেশ্বর এবং তাহার অপভ্রংশে কালক্রমে থানেশ্বর রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। স্থাণুতীর্থে স্থাণ্বীশ্বর শিব বিদ্যমান ছিলেন, মহাভারতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। বনপর্ব্বের ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ে সে পরিচয় দেখিতে পাই। যথা,—

স্থাণ্বীশ্বর বা থানেশ্বর।

"ততো মুঞ্জবটং নাম স্থাণোঃ স্থানং মহাত্মনঃ। উপোষ্য রজনীমেকাং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ॥
তত্রৈব চ মহারাজ যক্ষিণীং লোকবিশ্রুতাম্॥ স্নাত্বাভিগম্য রাজেন্দ্র সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥
কুরুক্ষেত্রস্য তদ্দ্বারং বিশ্রুতং ভারতর্ষভ। প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য তীর্থসেবী সমাহিতঃ॥
সম্মিতং পুষ্করাণাঞ্চ স্নাত্বার্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ। জামদগ্ন্যেন রামেণ কৃতঃ তৎসুমহাত্মনাঃ॥"

'হে মহাত্মন্! স্থাণু মহাদেবের স্থান মুঞ্জবট নামেও প্রসিদ্ধ। সেখানে অবস্থিতি পূর্ব্বক এক রাত্রি উপবাস করিলে গাণপত্য-লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া তত্রত্য যক্ষিণীকে দর্শন করিলে সর্ব্ব-কামনা সিদ্ধ হয়। হে ভারতর্ষভ! ঐ স্থান কুরুক্ষেত্রের দ্বার বলিয়া বিখ্যাত। তীর্থসেবিগণ সমাহিত চিত্তে ঐ স্থান প্রদক্ষিণ করিলে মুক্তি লাভ করিবে।' ইত্যাদি। বামনপুরাণে এই স্থাণু মহাদেবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"স্থাণুর্নাম্না হি লোকেষু পূজনীয় দিবৌকষাম্। স্থাণুরীশ্বর হিতো যস্মাৎ স্থাণ্বীশ্বর স্ততঃ স্মৃতঃ॥"

ইহাতে বুঝা যায়, লোক-পূজনীয় স্থাণু নামক মহাদেব ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেন এবং সেই স্থাণুরীশ্বরের নাম অনুসারে ঐ স্থান স্থাণ্বীশ্বর নামে পরিচিত ছিল। তবেই বুঝা যাইতেছে,—পরবর্ত্তিকালে স্থাণ্বীশ্বর শিবের নাম অনুসারেই স্থাণ্বীশ্বর বা থানেশ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাভারতের সমসময়ে উহা কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ বিদ্যমান ছিল। এখন উহাকে অবলম্বন করিয়াই কুরুক্ষেত্রের তথ্যানুসন্ধান করিতে হইতেছে।

থানেশ্বর এক সময়ে একটী অভিনব রাজ্যের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যখন ঐ নগরী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াছিলেন,—থানেশ্বর একটী রাজ্যের রাজধানী-রূপে অবস্থিত এবং তাহার পরিধি সাত হাজার লি অর্থাৎ প্রায় ১১৬৭ মাইল। ঐ নগরের কোনও রাজার নাম হুয়েন-সাং উল্লেখ করেন নাই বটে; কিন্তু থানেশ্বর তখন যে রাজার শাসনাধীন ছিল, তিনি কনোজাধিপতি রাজা হর্ষবর্দ্ধনের করদ-রাজ-মধ্যে গণ্য ছিলেন,—হুয়েন-সাঙের বর্ণনা হইতে তাহা উপলব্ধি হয়। হুয়েন-সাঙের উচ্চারণে উহার নাম,—'সা-তা-নি-শি-ফা-লো' (Sa-ta-ni-shi-fa-lo)। হুয়েন-সাং থানে-

পরবর্ত্তি-কালের থানেশ্বর।

শ্বরের যে পরিধি-পরিমাণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উপলব্ধি হয়,—তাঁহার সময়ে ঐ রাজ্য শতদ্রু হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কানিংহাম উহা হইতে স্থির করিয়াছেন,—'পরিব্রাজকের বর্ণনানুসারে গঙ্গাতীরস্থিত মজঃফরনগর হইতে শতদ্রু-তীরস্থিত হরিপত্তন পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা অঙ্কিত করিলে থানেশ্বর-রাজ্যের উত্তর-সীমা সূচিত হইতে পারে। এদিকে শতদ্রু-তীরস্থিত পাকপত্তন হইতে ভটনার ও নারনোল দিয়া গঙ্গাতীরস্থিত অনুপসহর পর্য্যন্ত অপর একটী বক্র-রেখার অঙ্কনে উহার দক্ষিণ-সীমানা চিহ্নিত করিতে পারা যায়। এতৎসীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশের পরিধি প্রায় প্রায় নয় শত মাইল হয়। পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের হিসাব অপেক্ষা উহা একচতুর্থাংশ কম হইলেও উহাকেই থানেশ্বর রাজ্যের সীমা-পরিমাণ বলা যাইতে পারে। থানেশ্বরে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেই ভগ্নাবশেষের উপরিভাগের পরিমাণ বার শত বর্গ ফিট। সেই ভগ্ন-দুর্গের পুরোভাগে মৃত্তিকা-স্তূপের উপর বর্ত্তমান নগরী অবস্থিত। উহার পশ্চিমে 'বাহারি' নামে একটী পল্লী আছে। সে পল্লীও অপর একটী মৃত্তিকা-স্তূপের উপর বিদ্যমান। মোটের উপর ঐ তিনটী স্তূপের দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে এক মাইল এবং উহার বিস্তৃতি দুই শত ফিট। ইহাতে ঐ স্থানের পরিধি চৌদ্দ হাজার ফিট অর্থাৎ ২৮০ মাইলের কিছু কম হওয়া সম্ভবপর। হুয়েন-সাং নগরীর পরিধি কুড়ি লি অর্থাৎ প্রায় ৩।৴০ মাইল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, পূর্ব্বে দ্বার-হ্রদ (স্বর্গ-দ্বার) থানেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মুসলমানদিগের আক্রমণাদি কারণে হ্রদ ও নগরীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের বসবাস লোপ পাইয়াছে। সুতরাং নগরীর পরিধি হিসাবে কিছু কমিয়া গিয়াছে। ফলতঃ, ভগ্ন-স্তূপাদির বিষয় আলোচনা করিলে প্রাচীন থানেশ্বর নগর; চতুষ্পার্শ্বে এক মাইল করিয়া, চারি মাইল পরিধি-যুক্ত থাকা সম্ভবপর। থানেশ্বরে যে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে জন-প্রবাদ,—ঐ দুর্গ রাজা দিলীপ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি রাজর্ষি কুরুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডবগণের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষে বংশ-লতায় তাঁহার স্থান দৃষ্ট হয়। কথিত হয়, সেই দুর্গের বায়ান্নটী চূড়া ছিল। তাহার কয়েকটীর ভগ্নাবশেষ এখনও লোকে দেখাইয়া থাকে। দুর্গ-প্রাকারের পশ্চিম-পার্শ্ব রাজপথ হইতে ষাট ফিট উচ্চ। কিন্তু তাহার মধ্যস্থিত ধ্বংসাবশেষ চল্লিশ ফিটের অধিক উচ্চ নহে। ভগ্ন ইষ্টকাদিতে সেই স্তূপ মণ্ডিত রহিয়াছে। এতৎ-সংলগ্ন তিনটী কূপ অতি-প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। থানেশ্বরের উত্তর-পশ্চিমে মহারাজ অশোকের একটী স্তূপ দেখা যায়। সেই স্তূপ প্রায় তিন শত ফিট উচ্চ। তদ্দৃষ্টে, ঐ স্থানে এক সময়ে অশোকের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। মুসলমান-অধিকারের পূর্ব্বে থানেশ্বর কনোজ-রাজ-বংশের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। তাহার পূর্ব্বে কিছু কাল প্রভাকরবর্দ্ধন (স্থাণীশ্বরে) থানেশ্বরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি হর্ষদেবের পিতা বলিয়া পরিচিত। তাঁহার জামাতা গ্রহবর্ম্মা তখন কনোজ-প্রদেশ শাসন করিতেন। হর্ষবর্দ্ধন হইতেই উহা কনোজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মামুদ গজনী থানেশ্বর আক্রমণ করিয়া তত্রত্য দেব-মূর্ত্তি ধ্বংস করেন। কনোজাধিপতি, মামুদ গজনীর কবল হইতে দিল্লী উদ্ধার করিতে পারেন নাই। দিল্লীতে তখন পৃথ্বীরাজ

রাজত্ব করিতেন। মামুদকে থানেশ্বর হইতে বিতাড়িত করিয়া পৃথ্বীরাজ থানেশ্বর অধিকার করেন। পরবর্ত্তি-কালে গ্রহ-বৈগুণ্যে তাঁহাকে ঐ রাজ্য মুসলমানগণের হস্তে সমর্পণ করিতে হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রের অবস্থিতি।

থানেশ্বরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী এবং সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত। থানেশ্বর নগরের দক্ষিণে যে পবিত্র হ্রদ দৃষ্ট হয়, সেই হ্রদের পার্শ্বে বসিয়া রাজর্ষি কুরু তপস্যা করিয়াছিলেন, শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। ঐ হ্রদের নানা নামের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মসর, রামহ্রদ, বায়ব-সর, পবন-সর প্রভৃতি কত নামেই উহা অভিহিত হইয়া থাকে। এই সরোবরের তীরে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন;—এই সরোবরের তীরদেশ পরশুরাম ক্ষত্রিয়-শোণিতে সিক্ত করিয়াছিলেন;—এই সরোবর পবন দেবতার লীলা-নিকেতন ছিল;—ইত্যাদি নানা হেতুবাদে, এই সরোবরের নানা নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত তীর্থসমূহের সংখ্যা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পৃথুদক নামক নগরের পার্শ্বে, থানেশ্বর হইতে সাত ক্রোশ পশ্চিমে, অগ্নিতীর্থ বিদ্যমান। চন্দনাল গ্রামে, থানেশ্বরের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে, অমরহ্রদ। অগ্নিতীর্থ এখন অগ্নিকুণ্ড নামে এবং অমরহ্রদ অমৃতকূপ নামে পরিচিত। কৌবের তীর্থ, কৌষিকী সঙ্গম, পুষ্করতীর্থ, রামতীর্থ, বিশ্বামিত্রতীর্থ প্রভৃতি তীর্থসমূহের আজিও স্থান-নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। মহাভারতের বনপর্ব্বে (৮২শ, ৮৩শ, ৮৪শ, ৯০শ ও ১২৯ম অধ্যায়ে), শল্যপর্ব্বে (৩৮শ, ৪০শ, ৪২শ, ৪৩শ, ৪৭শ, ৪৮শ, ৫৩শ, অধ্যায়ে), কূর্ম্মপুরাণে (২য় অধ্যায়ে), অগ্নিপুরাণে (১০৯ম অধ্যায়ে), বামনপুরাণে (৩৪শ—৪৪শ অধ্যায়ে) কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত তীর্থসকলের বিবরণ লিখিত পাছে। সেই সকল তীর্থের মধ্যে দধীচি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন। ঋক্-সংহিতায় দধীচ (দধীচির) নাম আছে। কুরুক্ষেত্রান্তর্গত প্রদেশে ইন্দ্র দধীচির অস্থি গ্রহণে বজ্র ধারণ করিয়াছিলেন, সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যে এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। * সেই

---

* ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৮৪শ সূক্তের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ ঋক ইন্দ্র ও দধীচি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই দুইটী ঋক,—

"ইন্দ্র দধীচে অনভি বৃত্রাণা প্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব॥

ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্ব্বতেষপশ্রিতং। তদ্বিদচ্ছর্যাণাবতি॥"

ঋক দুইটীর অর্থ,—'অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতি বার বধ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র সেই মস্তক শর্য্যণাবৎ (সরোবরে) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' শর্যাণাবৎকে সায়ণাচার্য্য কুরুক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শাট্যায়ন ব্রাহ্মণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—"শর্যাণাবদ্ধ বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে সরঃ।" আরও বলিয়া গিয়াছেন,—"শর্য্যণা নাম কুরুক্ষেত্রবর্ত্তিনো দেশাঃ। তেষামদূরেভবং সরঃ শর্য্যণাবৎ॥" ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে (৬৫শ সূক্তের ২২শ ঋকে এবং ১৩শ সূক্তের ১ম ঋকে) শর্য্যণাবতী শব্দ দৃষ্ট হয়। তাহা শর্য্যণাবৎ স্থানকেই বুঝাইতেছে। শর্য্যণাবতে সোম প্রস্তুত হইয়াছে, ইন্দ্র সেই সোম পান করুন,—সেই দুই ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। সেই হেতু মহাভারতে উহা সোমতীর্থ বলিয়াও পরিবর্ণিত। মহাভারতের বনপর্ব্বে, ৮৩শ অধ্যায়ে, সে আভাব পাওয়া যায়। দধীচি ও ইন্দ্র সংক্রান্ত রূপকাদি অন্যান্য বিষয় "পৃথিবীর ইতিহাস," প্রথম খণ্ডে, নির্ঘণ্টানুসরণে অবগত হওয়া যাইবে।

হইতে ঐ স্থান পবিত্র তীর্থক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত। অধুনা স্থানেশ্বরের নিকট ঐ তীর্থ চিহ্নিত হয়। ঋগ্বেদে শর্য্যণাবতী নাম উল্লেখ আছে। শর্য্যণাবতীতে দধীচি তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আভাস তাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সায়ণাচার্য্য শর্য্যণাবৎকে কুরুক্ষেত্রান্তর্গত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রারম্ভেই 'ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' ইত্যাদি উক্তি দৃষ্ট হয়। চীনপরিব্রাজক হুয়েন-সাং কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে সেই কথাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় কুরুক্ষেত্রের পরিধি দুই শত লি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি চল্লিশ 'লি'তে চারিক্রোশযুক্ত এক যোজন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহা হইলে, তাঁহার হিসাবে ঐ ধর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি কুড়ি ক্রোশ হইতে পারে। কিন্তু আকবরের সময়ে ঐ স্থানের পরিধি চল্লিশ ক্রোশ বলিয়া উক্ত হইয়াছিল। কানিংহাম যখন ধর্ম্মক্ষেত্র দর্শন করেন, তিনি শুনিয়াছিলেন, উহা আটচল্লিশ ক্রোশ বিস্তৃত। সাধারণতঃ চল্লিশক্রোশব্যাপী বলিয়াই কুরুক্ষেত্রতীর্থ পরিচিত আছে। সর্ব্বসামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে কুরুক্ষেত্রতীর্থের পরিধি চল্লিশ ক্রোশের কম হওয়া সম্ভবপর নহে। সরস্বতীতীরস্থিত পৃথূদক, কৌষিকী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গমস্থল এবং দৃষদ্বতীনদী কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। পৃথূদক—স্থাণ্বীশ্বরের চৌদ্দ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। উহা 'পেহোয়া' নামেও পরিচিত। কথিত হয়,—রাজচক্রবর্ত্তী পৃথু এইস্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। পিতা বেণরাজার মৃত্যুর পর এই স্থানে সরস্বতীতীরে তিনি পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করেন। পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ডে, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, কুরুক্ষেত্র এবং তদন্তর্গত পৃথূদকতীর্থের বিবরণ বিশদভাবে কীর্ত্তিত আছে। কুরুক্ষেত্রের পরিধি কুড়ি ক্রোশ ধরিলে, এই সকল প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান কুরুক্ষেত্রের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের পরিধি চল্লিশ ক্রোশের কম হওয়া সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মক্ষেত্রের অঙ্গস্থানীয় যে পবিত্র হ্রদ বর্ত্তমান থানেশ্বরের পুরোভাগে বিদ্যমান, তাহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্বপশ্চিমে ২৪,৫৪৬ ফিট, বিস্তৃতি ১৯০০ ফিট। উহার আকৃতি একটি অসমভুজ আয়তক্ষেত্রের ন্যায়। বরাহমিহির বলেন,—চন্দ্রগ্রহণের সময় ঐ হ্রদে সর্ব্বতীর্থের সমাবেশ হয়। সুতরাং গ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রের যে অংশ দধীচি তীর্থ বলিয়া অভিহিত হয়, প্রচার এই—উহারই অপর নাম চক্রতীর্থ। ভীষ্মদেবের সংহারসাধন জন্য ভগবান ঐ স্থানে চক্রধারণ করিয়াছিলেন। এই চক্রতীর্থের পার্শ্বে অস্থিপুর নামক এক তীর্থ নির্দ্দিষ্ট হয়। দধীচির অস্থি সেই স্থলে গৃহীত হইয়াছিল,—এইরূপ কিংবদন্তী। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে হুয়েন-সাং যখন ঐ স্থান দর্শন করেন, তিনি কতকগুলি বৃহদাকার অস্থি দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই অস্থিই যে দধীচির অস্থি, তাহাই তিনি বোধ হয় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-তীর্থ-নির্ণয়ের মতে, কুরুক্ষেত্রের এইরূপ সীমানা নির্দ্দিষ্ট হয়,—"কুরুক্ষেত্রের ঈশাণকোণে তরন্তুক বা রত্নযক্ষ, বায়ুকোণে অরন্তুক, নৈর্ঋত কোণে কপিল (ইহার নিকট রামহ্রদ) এবং অগ্নি-কোণে মচক্রুক অবস্থিত। মহাভারোতোক্ত তরন্তুক এখন 'রতনযক' নামে অভিহিত। ইহা সরস্বতী নদীর তীরে, পিপলি নামক স্থানের নিকট। অরন্তুকের বর্ত্তমান নাম—বাহের।

কৈথল গ্রামের উত্তরপশ্চিমে উহা অবস্থিত। রামহ্রদ ও কপিলতীর্থ ঝিন্দের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে, বর্ত্তমান রামরায় নামক স্থানে বিদ্যমান। মচক্রুক, বর্ত্তমান শিখ নামক স্থান। ইহা পাণিপথ ও ঝিন্দের মধ্যপথে অবস্থিত। উপরোক্ত স্থান-নির্দ্দেশ অনুসারে কুরুক্ষেত্রের ভূমিপরিমাণ এইরূপ নির্ণীত হয়;—পূর্ব্বে তরন্তুক হইতে মচক্রুক ২৭ ক্রোশ; পশ্চিমে রামহ্রদ হইতে অরন্তুক ২০ ক্রোশ; উত্তরে অরন্তুক হইতে তরন্তুক ২০ ক্রোশ; দক্ষিণে মচক্রুক হইতে রামহ্রদ ১২॥ সাড়ে বার ক্রোশ।" *

কুরুরাজ্যের প্রসঙ্গে নানা স্থানের ও নানা রাজ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। সেই সকল রাজ্যের মধ্যে পাঞ্চালরাজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুরুরাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্চাল-রাজ্য প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল। চন্দ্রবংশীয় রাজা হর্য্যশ্বের রাজ্য—পাঞ্চালরাজ্য-সংজ্ঞা লাভ করে। তাঁহার পাঁচ পুত্র। পুত্রগণ সকলেই রাজকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সেই হেতু হর্য্যশ্ব পাঁচ পুত্রের উপর রাজ্যভার প্রদান করিয়া পাঞ্চাল বা পাঁচ পুত্রের রাজ্য নামে আপন রাজ্যকে অভিহিত করিয়াছিলেন। পুরাকালে, ভারতবর্ষ যখন নয় ভাগে বিভক্ত ছিল, পাঞ্চাল নামে তাহার একটি বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, বক্ষ্যমাণ পাঞ্চালরাজ্য এবং পূর্ব্বোক্ত পাঞ্চাল স্বতন্ত্র জনপদ। কুরুপাণ্ডবগণ পাঞ্চালরাজ্যের সহিত নানা প্রকার সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং মহাভারতে পাঞ্চাল-প্রসঙ্গ বিশেষভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। পাঞ্চালরাজদুহিতা দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের সহিত পরিণীতা হন। কুরুক্ষেত্র মহা-সমরে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বনে কৌরববিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ এবং তাঁহার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি মহাভারতপ্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ। পাঞ্চালরাজ পৃষতের মৃত্যুর পর দ্রুপদ পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। দ্রোণাচার্য্যের সহিত বাল্যকালে তাঁহার মিত্রতা ছিল। দ্রোণাচার্য্য দরিদ্র অবস্থায় পতিত হইয়া সখা দ্রুপদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু বন্ধুকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, দ্রুপদ পদ-গৌরবে মত্ত হইয়া দ্রোণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে ক্ষুন্নমনে দ্রোণাচার্য্য হস্তিনায় কুরুপাণ্ডবগণের নিকট উপনীত হন। দ্রোণাচার্য্যের সমরকৌশল অস্ত্রবিদ্যার বিষয় ভীষ্ম বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। তিনি দ্রোণাচার্য্যকে কুমারগণের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। দ্রোণাচার্য্য কুরুপাণ্ডব উভয়েরই শিক্ষক ছিলেন। কুমারগণের শিক্ষা সমাপনান্তে কুমারগণ গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য প্রস্তুত হন। দ্রোণাচার্য্য তখন অর্জ্জুনের নিকট আপনার একটি মনোভাব জ্ঞাপন করেন;—দ্রুপদরাজ্য জয় করিয়া, সেই রাজ্য গুরুদক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিতে বলেন। ইহার পর অর্জ্জুন কর্তৃক দ্রুপদরাজ্য আক্র-মণ এবং দ্রুপদরাজকে বন্দিভাবে দ্রোণের নিকট আনয়ন। বন্দিভাবে আনীত দ্রুপদ দ্রোণের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, অধিকৃত পাঞ্চালরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইবার ব্যবস্থা হয়। উত্তর পাঞ্চাল দ্রোণ গ্রহণ করেন; দক্ষিণ পাঞ্চালে

পাঞ্চাল রাজ্য।

* কানিংহামের আর্কিয়লজিকাল রিপোর্ট প্রভৃতি মিলাইয়া 'বিশ্বকোষ' অভিধানে এইরূপ সীমানা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। 'কুরুক্ষেত্র মাহাত্ম্য-নির্ণয়' গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে।

দ্রুপদ পুনরধিকার প্রাপ্ত হন। 'অহিচ্ছত্রা' নগরী এই সময়ে উত্তর পাঞ্চালের (দ্রোণের) রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হয়। দ্রুপদ 'কাম্পিল্য' নগরে আপন রাজধানী স্থাপন করেন।* অহিচ্ছত্রা নগরী পূর্ব্ব হইতেই রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় হইতে কাম্পিল্য নগরীও দ্রুপদের রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠান্বিত হয়। কুরুক্ষেত্রের অর্থাৎ কুরুপাণ্ডবগণের রাজ্যের পূর্ব্বদক্ষিণ সীমান্তে, গঙ্গার অপর পারে, উত্তরপাঞ্চালরাজ্য অবস্থিত ছিল। আর কান্যকুব্জের উত্তর, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, দক্ষিণপাঞ্চাল রাজ্য নামে অভিহিত হইত। মহাভারতে সভাপর্ব্বের ২৯শ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—'রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে দেশ-জয়ে বহির্গত হইয়া, ভীমসেন প্রথমেই পূর্ব্বদিকে অবস্থিত পাঞ্চাল-রাজ্য জয় করিয়াছিলেন।' রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পাঞ্চাল দেশ অযোধ্যার পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভরতকে আনয়নের জন্য কেকয়রাজ্যে গমনের সময় দূত অযোধ্যার পশ্চিমস্থিত পাঞ্চালরাজ্য অতিক্রম করিয়াছিলেন, মহর্ষি বাল্মীকি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় তীরেই পাঞ্চাল রাজ্যের অবস্থিতি ছিল। বর্ত্তমানকালে অনেকে রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্থানকে উত্তর পাঞ্চাল এবং এটোয়া প্রভৃতি জেলাকে দক্ষিণ পাঞ্চাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

অহিচ্ছত্র—অহিক্ষেত্র, অহিচ্ছত্রা, প্রত্যগ্রথ, আদিকোট প্রভৃতি নামেও পরিচিত। হুয়েন-সাং 'অহি-চি-টা-লো' (Ahi-chi-ta-lo) নামে উহাকে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

অহিচ্ছত্র ও কাম্পিল্য।

অহিক্ষেত্রের বা অহিচ্ছত্রের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে উহা নাগগণের দেশ ছিল। নাগগণ সর্প-পূজক; তদনুসারে উহা অহিক্ষেত্র সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। এক জন আহির কর্ত্তৃক এই নগরী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়,—এইরূপও জনপ্রবাদ। আহির এক দিন মাঠে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। সেই সময় তাহার মস্তকের উপর একটী সর্প ছত্র বা ফণা বিস্তার করিয়া রৌদ্র নিবারণ করিতেছিল। নিদ্রিত আহিরের মস্তকে সর্প কর্ত্তৃক ফণা-বিস্তার দেখিয়া লোকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল,—আহির রাজা হইবে। কিছুকাল পরে আহিরই ঐ প্রদেশের আধিপত্য লাভ করে এবং 'আদিরাজা' নামে অভিহিত হয়। আহিরের রাজ্য বলিয়াও ঐ নগরীর অহিক্ষেত্র এবং আদিক্ষেত্র নাম হইয়াছিল, এইরূপ কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। টলেমির গ্রন্থে 'আদিয়াপো' নামক একটী নগরীর উল্লেখ আছে। উহা আদিক্ষেত্র বা অহিচ্ছত্রের নামান্তর বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। হুয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন,—'এই নগরের বহির্ভাগে নাগহ্রদ নামে একটি জলাশয় বিদ্যমান ছিল। সেই হ্রদের নিকটে বুদ্ধদেব সপ্তাহকাল আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। অশোক-বিনির্ম্মিত স্তূপ তাহারই স্মৃতিচিহ্ন-রূপে বিদ্যমান আছে। বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রবাদ, ঐ প্রদেশের অধিপতি নাগরাজ, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, বুদ্ধদেবের মস্তকে ছত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। সেই হইতে উহা অহিচ্ছত্র নামে পরিচিত।' ঐ নাগরাজ—উপাখ্যানে সর্প বলিয়া অভিহিত। সর্পের ফণাবিস্তাররূপ রূপক বৌদ্ধদিগের প্রচলিত গল্পেরও অন্তর্নিবিষ্ট আছে। অহিচ্ছত্র নগরীর পরিধি সতের বা আঠার লি অর্থাৎ

* মহাভারত, আদি-পর্ব্ব ১৩৮শ অধ্যায়।

প্রায় তিন মাইল বলিয়া উল্লিখিত। হুয়েন-সাঙের ভ্রমণ সময়ে সেখানে বারটী বৌদ্ধ মঠ বিদ্যমান ছিল। সেই সকল মঠে সহস্রাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু অবস্থিতি করিত। এদিকে নয়টী মন্দিরে তিন শত সন্ন্যাসী শিবের আরাধনায় ব্রতী ছিলেন। নাগ-হ্রদের সন্নিকটে অশোকের যে স্তূপ ছিল, তাহার পার্শ্বে তিনি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটী স্তূপ দেখিয়াছিলেন। প্রবাদ এই,—বুদ্ধদেব পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন্মে ঐ চারি স্তূপে উপবেশন করিতেন। অহিচ্ছত্রা নগরী একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষরূপে প্রতীয়মান। ঐ অহিচ্ছত্র দুর্গের ভগ্নাবশেষের পরিধি প্রায় সাড়ে তিন মাইল। উহা দেখিতে একটি সমকোণ ত্রিভুজের ন্যায়। উহার চারিদিক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এদিকে প্রকৃতিও উহাকে নানারূপে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহার এক দিকে রামগঙ্গা ও ধন্ধান নদী, অন্য দিকে পিরিয়ানালা। প্রথমোক্ত অংশে বালুকা-রাশি ও গহ্বর; অন্য দিকও উচ্চ-নীচ সমতল গহ্বরসমাকুল। সময় সময় সেই সকল গহ্বর জলপূর্ণ থাকে। সুতরাং ঐ নগরে গমন করা বড়ই দুঃসাধ্য। উহার উত্তর-পশ্চিমে, লাকনোরের দিকে একটি মাত্র পথ আছে। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পথ দিয়া অহিচ্ছত্র নগরীতে প্রবেশ করিতে হয়। অহিচ্ছত্র কত কালের প্রাচীন নগর, তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় যজ্ঞাশ্ব এক অহিচ্ছত্র নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিল। সুমদ নামক জনৈক নৃপতি তখন সেই রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। শত্রুঘ্ন প্রভৃতি যজ্ঞাশ্বের অনুগমন করিলে সুমদ উপঢৌকন-সহ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করেন। পদ্মপুরাণে, পাতাল-খণ্ডে, অহিচ্ছত্র নগরীর এইরূপ একটি ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সেই অহিচ্ছত্র এবং উত্তর-পাঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্রা এক কিনা, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? যদি উভয়ই এক নগরীকে বুঝাইয়া থাকে, তাহা হইলে কত ভগ্নাবশেষের উপর কত ভগ্নাবশেষ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ইংরেজদিগের মধ্যে কাপ্তেন হগসন প্রথমে ঐ স্থান জরিপ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ উহা কয়েক মাইল পরিধিযুক্ত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ মাত্র। উহার চৌত্রিশটী চূড়া ছিল। লোকে উহাকে 'পাণ্ডবদিগের গড়' নামে অভিহিত করিত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কানিংহাম যখন ঐ নগর জরিপ করিতে যান, তিনি প্রাচীন দুর্গের বত্রিশটী চূড়ার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পান। দুর্গের অনেক স্থল তখন গভীর জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ছিল; সুতরাং অন্যান্য চূড়ার তিনি সন্ধান করিতে পারেন নাই। তিনি অনুমান করেন, দুর্গের চূড়াসমূহের অনেকগুলি আধুনিক। দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, প্রায় ক্রোড় টাকা ব্যয়ে, আলি মহম্মদ খাঁ ঐ দুর্গের সংস্কার-সাধনে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে ঐ চূড়া প্রস্তুত হইয়াছিল। দুর্গ-প্রাকারের ঘনত্ব কোনও কোনও স্থলে আঠার ফিট পর্য্যন্ত তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। চীনা-পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় সমগ্র অহিচ্ছত্র-বিভাগের পরিধি তিন হাজার লি প্রায় পাঁচ শত মাইল বলিয়া কথিত হয়। ইহাতে কানিংহাম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—বর্ত্তমান রোহিলখণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধাংশ অহিচ্ছত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে গঙ্গা-নদী, পূর্ব্বে ঘর্ঘরা নদীতীরস্থিত খয়রাবাদ এবং পশ্চিমে পিলিভিৎ,—এতৎসীমান্তর্ব্বর্ত্তী

ভূখণ্ডের পরিমাণের সহিত হুয়েন-সাং কথিত পরিমাণ প্রায় মিলিয়া যায়। কাম্পিল্য নগরী—হর্য্যশ্বের পুত্র কাম্পিল্যের নামানুসারে স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর। ঐ নগর কাম্পিল্য নামেও পরিচিত। বুদায়ুন এবং ফরকাবাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, গঙ্গা-নদীর তীরে, ঐ নগরের বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়। দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের রাজধানী এই কাম্পিল্য নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরিবর্ত্তিকালে ঐ নগর কনোজের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ত্তমানে উহা ফরক্কাবাদের অন্তর্গত কাইমগঞ্জ তহশিলের এলাকাধীন।

কুরুপাঞ্চাল রাজ্যের মধ্যে কতিপয় পুরাণপ্রসিদ্ধ স্থানের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। সেই সকল স্থানের মধ্যে শ্রুঘ্ন, মদাবর, গভীষণ, ব্রহ্মপুর, পীলুষণ, কপাল প্রভৃতির সহিত প্রাচীন স্মৃতি নানারূপে বিজড়িত রহিয়াছে। আমরা একে একে তৎসমুদায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছি। শ্রুঘ্ন এবং মদাবর—নামক প্রাচীন স্থান দুইটী পাঞ্চালের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হয়। চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনায় শ্রুঘ্ন 'সু লু কিন্-না' (Su-lu-kin-na) নামে এবং মদাবর—'মো-তি-পু-লো (Mo-ti-pu-lo) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ দুই স্থানে বৌদ্ধদিগের আধিপত্যের বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে। কিন্তু বৌদ্ধাধিপত্যের পূর্ব্বে ঐ দুই স্থান কি নামে পরিচিত ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান কালে শার্ম্মুর, ঘরোয়াল প্রভৃতি, গঙ্গার ও গিরি নদীর মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং আম্বালা ও শাহারাণপুরের কিয়দংশ শ্রুঘ্ন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া কথিত হয়। ঐ রাজ্যের পরিধি, হুয়েন-সাঙের মতে, ছয় হাজার লি অর্থাৎ প্রায় এক হাজার মাইল। মদাবর নগর পশ্চিম রোহিলখণ্ডে বিজনরের নিকট অবস্থিত। মেগাস্থিনাসের বর্ণনায় দৃষ্ট হয়,—'মাথে' (Mathe) নামক এক সম্প্রদায়ের লোক 'এরিনেসেস' (Erineses) নদীর তীরে বাস করিত। তাহারাই মদাবরের অধিবাসী। কানিংহাম এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—এরিনেসেস নদী শকুন্তলার লীলাক্ষেত্র মালিনী নদী হওয়া সম্ভবপর। তাহাতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বিবরণ স্মৃতি-পটে উদয় হইয়া থাকে। ঐ নগরের পরিধি ২০ লি অর্থাৎ ৩।/০ প্রায় মাইল এবং ঐ রাজ্যের পরিধি ছয় হাজার লি অর্থাৎ প্রায় হাজার মাইল। এক সময়ে অহিচ্ছত্র এবং গভীষণ মদাবরের রাজার শাসনাধীন ছিল। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ—ঐ দেশের রাজা 'সিন্-টো-লো' (Sin-to-lo) দেবোপাসক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রাহ্য করিতেন না। 'সিন্-টো-লো' শব্দে শূদ্র অর্থ বুঝাইয়া থাকে;—প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এইরূপ অনুমান করেন। মদাবর রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে অনেকে বলেন,—হরিদ্বার হইতে কনোজ পর্য্যন্ত গঙ্গা-তীরের পূর্ব্বভাগে ঐ রাজ্য অবস্থিত ছিল। ঘর্ঘরা নদীতীরবর্ত্তী খইরিগড় পর্য্যন্ত উহার সীমানা বিস্তৃত হইয়াছিল। মায়াপুর—হরিদ্বারের নামান্তর। হুয়েন-সাং 'মো-উ-লো' (Mo-yu-lo) বা 'মো-উ-রো' বলিয়া উহাকে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। উহা গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে, মদাবর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, অবস্থিত। হুয়েন-সাং-বর্ণিত মো উ-লো বা মো উ-রো—মায়াপুর নামের অপভ্রংশ। হুয়েন-সাং ঐ স্থানকে গঙ্গার পূর্ব্ব-পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহার অপর নাম গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বার। বর্ত্তমান কালে হরিদ্বার, কনখল প্রভৃতি ঐ মায়াপুরের অংশ বলিয়া প্রতীত হয়। এখনও

হরিদ্বার প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদ।

হরিদ্বার ও কনখলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মায়াপুরের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত হইয়া থাকে। হুয়েন-সাং উহাকে মো-উ-লো অথবা মো-উ-রো নাম প্রদান করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ ঐ স্থানকে 'ময়ূরপুর' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। ঐ স্থানের আরণ্যপ্রদেশে অসংখ্য ময়ূর দলে দলে বিচরণ করে। সে হিসাবেও উহার ময়ূরপুর নাম হওয়া অসম্ভব নহে। তবে মায়াপুরে মায়াদেবীর মন্দির, ভৈরব এবং নারায়ণ শিলা প্রভৃতি বহুকাল হইতে বিদ্যমান আছে। তাহাতে উহার মায়াপুর নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। মায়াপুর বা হরিদ্বারের প্রসঙ্গ পুরাণাদি শাস্ত্রে বিবিধ আকারে উল্লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে হরিদ্বার, শিবপুরাণে হরদ্বার এবং অলকানন্দ প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। রামায়ণের সময়ে হরিদ্বার রামরাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল,—হরিদ্বারে পিণ্ডদানাদি তীর্থকৃত্যের মন্ত্রোচ্চারণে তাহা প্রতীত হয়। ঐ স্থান রাম-রাজত্বের অন্তর্গত ছিল, মন্ত্রে তাহা স্পষ্টতঃ উচ্চারিত হইয়া থাকে। কত কাল হইতে হরিদ্বারে তীর্থযাত্রিগণ ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, কত কাল হইতে হরিদ্বারে শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হুয়েন-সাঙের পর্য্যটনকালে মায়াপুর নগর কুড়ি লি অর্থাৎ প্রায় তিন মাইল পরিধিযুক্ত এবং জনকোলাহলপূর্ণ ছিল। উহার সন্নিকটে 'বেণ' রাজার গড় নামক একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। রাজা বেণ কর্ত্তৃক সেই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। পুরাণাদি গ্রন্থে হরিদ্বার, হরদ্বার প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হইলেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হরিদ্বার নাম আধুনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের তদ্রূপ নির্দ্দেশের হেতুবাদ,—আবুরিহাণ এবং রসিদ উদ্দীন হরিদ্বার নামের উল্লেখ না করিয়া গঙ্গাদ্বার লিখিয়া গিয়াছেন। কালিদাসের 'মেঘদূত' গ্রন্থে কনখলের নাম আছে, কিন্তু হরিদ্বারের নাম নাই। অমরসিংহ গঙ্গাকে 'বিষ্ণুপদী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু হরিদ্বার শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। আবুরিহাণের সমসময়ে বিষ্ণুপদে কোনও মন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাইমুরের * সমসাময়িক ঐতিহাসিক সৈয়ফউদ্দীনের বর্ণনায় বিষ্ণুপদ পাহাড়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গঙ্গাদ্বার মন্দির সেই পাহাড়ের নিম্নে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোগল-সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে হরিদ্বার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আবুল ফজেল বলিয়া গিয়াছেন,—'হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে মায়াদেবীর মন্দির অবস্থিত। এই স্থান হইতে আঠার ক্রোশ পর্য্যন্ত অতি পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।' গভীষণের অপর নাম কাশীপুর। মদাবর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে চারি শত লি অর্থাৎ প্রায় সাতষাট্টি মাইল অগ্রসর হইয়া হুয়েন-সাং 'কি-উ-পি-শ্বাং-না' (Kiu-Pi-shwang-na) নামক রাজ্যে উপনীত হন। জুলিয়ানের মতে সেই রাজ্যের নাম গভীষণ। বর্ত্তমান মোরাদাবাদের উত্তরে, কিছু দূরে, ঐ রাজ্যের অবস্থান হওয়া সম্ভবপর। এখন গভীষণ নামে কোনও স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু যে দিকে গভীষণের অবস্থানের বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে, সেই দিকে উজ্জয়িনী গ্রামের নিকট একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়।

* চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাইমুরের উপদ্রবে, মধ্য-এসিয়া এবং ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাতার-দেশীয় দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য সহ ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী নগরী অধিকার করেন।

উজ্জয়িনী গ্রাম কাশীপুরের এক মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করেন, উজ্জয়িনী গ্রামের নিকটস্থ দুর্গই হুয়েন-সাং-কথিত প্রাচীন নগর—গভীষণ। বিশপ হেবার * ভারত-ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখিয়া গিয়াছেন,—'কাশীপুর নগরী পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কাশী নামক দেবতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ স্থান হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থক্ষেত্র।' কানিংহাম বলেন,—'বিশপ হেবার ঐ নগরীর প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক সংবাদ-সংগ্রহে প্রতারিত হইয়াছেন। কারণ, কাশীপুর আধুনিক নগর। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে কাশীনাথ কর্ত্তৃক ঐ নগর নির্ম্মিত হয়। কাশীনাথ—কুমায়ুন পর্ব্বতের অন্তর্গত চম্পাবতী নগরীর রাজা দেবীচন্দ্রের এক জন অনুচর ছিলেন।' ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গ এখন উজ্জয়িনী গ্রামের নামেই পরিচিত হয়। উহার পূর্ব্ব নাম এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। কাশীপুর নগরীর অভ্যুদয়ের শত শত বৎসর পূর্ব্বে জনসাধারণ কর্ত্তৃক ঐ স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই কাশীপুরের সন্নিকটে দ্রোণ-সাগর নামে এক পবিত্র হ্রদ বিদ্যমান আছে। এখনও হিন্দু-তীর্থযাত্রিগণ ঐ স্থান দর্শন করিয়া আসেন। দ্রোণসাগর—দ্রোণাচার্য্যের নামানুসারে প্রতিষ্ঠান্বিত হয় এবং তাঁহারই দুর্গ গভীষণে বিদ্যমান ছিল,—জনপ্রবাদে তাহাই উল্লিখিত হইয়া থাকে। যাঁহারা হরিদ্বারে গমন করিতেন, তাঁহারা সকলেই দ্রোণ-হ্রদের পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া আসিতেন। দ্রোণ-সাগরের উচ্চ তীরদেশে সতীদিগের স্মৃতিস্তম্ভ-সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। হরিদ্বারে, কনখলে, গঙ্গার তীরে, যেরূপ সহমৃতা সতীর স্মৃতিস্তম্ভ দৃষ্ট হয়, দ্রোণ-সরোবরের তীরেও সেইরূপ স্তম্ভ বিদ্যমান। গভীষণ প্রদেশের পরিধি দুই হাজার লি অর্থাৎ প্রায় তিন শত তেত্রিশ মাইল। উত্তরে ব্রহ্মপুর, পশ্চিমে মদাবর, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে অহিচ্ছত্র,—এই সীমানার মধ্যে গভীষণ বিদ্যমান ছিল। তাহাতে কাশীপুর, রামপুর, পিলিভিৎ প্রভৃতি জেলা এবং পশ্চিমে রামগঙ্গা, পূর্ব্বে ঘর্ঘরা ও দক্ষিণে বরেলী,—এতন্মধ্যবর্ত্তী স্থান উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মপুর—চীন-পরিব্রাজক কর্ত্তৃক 'পো-লো-কি-মো-পু-লো' (Po-lo-ki-mo-pu-lo) এবং 'পো-লো-হি-মো-লো' (Po-lo-hi-mo-lo) নামে অভিহিত। এই ব্রহ্মপুর বিরাটপত্তনের অংশ বলিয়া কথিত হয়। ইহা বিরাটরাজ্যের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল—কিম্বদন্তী আছে। হুয়েন-সাং যে সময়ে ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন এই রাজ্য ৪০০০ লি অর্থাৎ প্রায় ৬৭৭ মাইল পরিধিযুক্ত ছিল। বর্ত্তমানে বৃটিশ ঘরোয়াল ও কুমায়ুন প্রদেশ নামে যাহা অভিহিত, অলকানন্দা ও কর্ণাল নদীর মধ্যবর্ত্তী সেই দেশ, ব্রহ্মপুর বলিয়া অনুমিত হয়। কর্ণের নামানুসারে কর্ণাল নামের উৎপত্তি হইয়াছে এবং কর্ণ ঐ স্থানে বসতি করিতেন, অনেকে বলিয়া থাকেন।

মহাভারতে বিরাট-প্রসঙ্গ।

মহাভারত-পাঠকের নিকট বিরাট-রাজ্যের নাম বিশেষ পরিচিত। এই বিরাটরাজ্যে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে এক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী সহ পঞ্চ-পাণ্ডব, আপনাদের নাম ও বেশভূষার পরিবর্ত্তন করিয়া, বিরাট-রাজের গৃহে বিবিধ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের নাম হইয়াছিল—কঙ্ক; তিনি বিরাট-রাজ্যের সভাসদ-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বল্লভ নামগ্রহণে বৃকোদর সূপকারের কার্য্যে ব্রতী হন। বৃহন্নলা নামে পরিচিত হইয়া, নপুংসকবেশে অর্জ্জুন

* *Vide* Bishop Heber, *Travels in India*, Vol. II.

বিরাট-রাজকুমারী উত্তরার গীত-বাদ্য শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। গ্রন্থিক নাম গ্রহণে নকুল অশ্বশালার অধ্যক্ষ হন এবং তন্ত্রিপাল নামে পরিচিতা হইয়া সহদেব গো-শালা পরিদর্শনে ব্রতী ছিলেন। দ্রৌপদী—সৈরিন্ধ্রী নামে পরিচিতা হইয়া অন্তঃপুরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিরাট-রাজের শ্যালক কীচক রাজপ্রাসাদেই বসবাস করিতেন। তাঁহার বাহু-বলে বিরাটরাজ্য রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া রাজার নিকট তাঁহার সমাদরের অবধি ছিল না। দুর্বৃত্ত কীচক একদা দ্রৌপদীর সতীত্ব-নাশের চেষ্টা পায়। বিরাটরাজ তাহার দণ্ড বিধানে সঙ্কুচিত হন। সূপকার-বৃত্তিধারী ভীম কীচকের প্রাণ-সংহার করেন। ত্রিগর্ত্তরাজের সহিত বিরাটের শত্রুতা ছিল। কীচক নিহত হইয়াছে শুনিয়া, ত্রিগর্ত্তরাজ বিরাট-রাজ্য আক্র-মণে বিরাট-রাজকে বন্দী করেন। ভীমের বাহুবলে বিরাট মুক্ত পান। এদিকে কৌরবগণ বিরাটের উত্তর-গোগৃহ অধিকার করিয়া বসেন। বিরাট-পুত্র উত্তর, বৃহন্নলা-নামধারী অর্জ্জুনকে সারথি-পদে বরণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। অর্জ্জুনের বাহুবলে সে যুদ্ধেও বিরাটের জয়লাভ হয়। এদিকে অজ্ঞাতবাসের বৎসর পূর্ণ হইয়া আসায় যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয় আপনা-আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিরাট-রাজকন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র-সমরে বিরাট-রাজ দ্রুপদ পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের হস্তে তাঁহার ইহলীলা সাঙ্গ হয়। মহাভারতে বিরাট-রাজ্য সম্বন্ধে এই পরিচয় প্রাপ্ত হই। বিরাট-রাজের রাজ্য মৎস্য-দেশ নামে অভিহিত ছিল। বিরাট-নগরী তাঁহার রাজধানী। মনুসংহিতায় বিরাট-রাজ্যের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। মনু বলিয়াছেন,—'যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সময় কুরু-ক্ষেত্রের, মৎস্য-দেশের, পাঞ্চালের এবং শূরসেন দেশের যোদ্ধৃগণকে পুরোভাগে রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিবে।' ইহাতে বুঝা যাইতেছে, মৎস্য-দেশে অতি পুরাকালে যোদ্ধৃজাতির বসতি ছিল। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিলে বিরাট-রাজ্য তাঁহাদের মিত্ররাজ্য মধ্যে পরিগণিত হয়। কুরু-পাণ্ডবের মহাসমরের সময়ে বিরাট-রাজ পুত্রাদি-সহ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বনে কৌরবদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্ব্বে এবং বিরাট-পর্ব্বে এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিবর্ণিত আছে।

মৎস্য-দেশ বা বিরাট-রাজ্য সম্বন্ধে এখন নানা মত প্রচলিত। এক পক্ষ বলেন,—বর্ত্তমান রাজসাহী-বিভাগ প্রাচীন মৎস্য-দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব্ব-বঙ্গ এবং উত্তর-বঙ্গ

বিরাট-রাজ্য সম্বন্ধে মতান্তর।

মৎস্য-দেশের মধ্যে পরিগণিত হইত। মৎস্য-বহুল দেশ বলিয়াই, ঐ দেশ 'মৎস্য-দেশ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। রাজসাহী প্রদেশের উত্তর বিরাট-রাজের গো-গৃহ ছিল,—বহুকাল হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। রাজসাহীর ইতিহাসে লিখিত আছে,—"উত্তর-বঙ্গ রেলওয়ে ষ্টেসন পাঁচবিবি হইতে পূর্ব্ব-মুখে বার মাইল পথ যাইলে মাগুরা এবং ঐ মাগুরা হইতে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে পাঁচ মাইল যাইলে বিরাট নগর। এই নগর মৎস্যদেশীয় নরপতি বিরাট স্থাপন করেন। এই বিরাট নগরে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন। এই নগরের দুই মাইল দক্ষিণে বিরাট রাজের সেনাপতি কীচকের বাসভবন ছিল। ইহার অনতিদূরে মহাভারতীয় শমী

বৃক্ষস্থান। রাজসাহী মৎস্যদেশের অন্তর্গত এবং রাজসাহী যে মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের রাজ্য ছিল, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস হেতু বিরাটরাজ্যের অন্তর্গত রাজসাহী প্রদেশ পুণ্যভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। বিরাট-রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ এবং তান্নিকটবর্ত্তী কীচকের রাজভবনের ভগ্নাবশেষ রাজসাহী প্রদেশে বিদ্যমান থাকিয়া পাণ্ডবগণের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।" কেবল ইতিহাসে প্রকাশ আছে বলিয়া নহে; জনসাধারণ পুরুষপরম্পরাক্রমে ঐ কথাই বলিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি প্রদেশ এক সময়ে বিরাটরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল—এরূপও কিম্বদন্তী শুনিতে পাই। বিরাটরাজ্যের অবস্থান সম্বন্ধে বঙ্গদেশে এইরূপ প্রচার আছে বটে; কিন্তু অন্যত্র আবার মধ্যভারতে বিরাট রাজ্য অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রমাণপরম্পরা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সে হিসাবে, বর্ত্তমান দিল্লীসহরের এক শত পাঁচ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে, জয়পুর রাজ্যের একচল্লিশ মাইল। উত্তরে, বিরাট-রাজধানীর অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। প্রোক্ত বিরাট নগর, চারিদিক রক্তাভ প্রাকার পরিবেষ্টিত, বৃত্তাকার উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। তাম্রের খনির জন্য বিরাট নগরের পারিপার্শ্বিক সেই পর্ব্বতসমূহ সুপ্রসিদ্ধ। যে উপত্যকায় বিরাট নগর অবস্থিত, সেখানে প্রবেশ করিতে হইলে, বাণগঙ্গা নদীর একটী প্রধান শাখার উত্তর-পশ্চিম তীর অবলম্বন করিয়া যাইতে হয়। উপত্যকার ব্যাস প্রায় আড়াই মাইল এবং পরিধি সাড়ে সাত বা আট মাইল। ঐ স্থানের ভূমি উর্ব্বর। সেখানে বৃক্ষসমূহ, বিশেষতঃ তিন্তিরি বৃক্ষগুলি, দেখিতে সুন্দর এবং প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। বিরাট-নগরীর যে ধ্বংসাবশেষ এখন দৃষ্ট হয়, তাহার দৈর্ঘ্য এক মাইল, প্রস্থ অর্দ্ধ মাইল এবং পরিধি প্রায় আড়াই মাইল। এই ধ্বংসাবশেষের চতুর্থাংশে বর্ত্তমান নগরী বিদ্যমান আছে। ঐ বিরাট নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থিত ময়দানে ভগ্ন মৃৎপাত্র এবং তাম্রপাত্রের ভগ্নাংশসমূহ বিক্ষিপ্ত আছে। ঐ উপত্যকার সাধারণ দৃশ্য রক্তাভ তাম্রবর্ণ। বিরাট নামে যে প্রাচীন নগরী ছিল, কিংবদন্তী এইরূপ,—বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরিশেষে সম্রাট আক-বরের রাজত্বকালে (প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে) ঐ নগরে পুনরায় লোকের বসতি হইয়াছিল। আকবরের শাসন সময়ে ঐ নগরী যে বিদ্যমান ছিল, আবুল ফজেলের 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে সে আভাষ পাওয়া যায়। ঐ স্থানে লাভজনক তাম্রখনি ছিল, আবুল-ফজেল তাহা বলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান নগরের আধ মাইল পূর্ব্বভাগে, পাহাড়ের অব্যবহিত নিম্নদেশে, একটী প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ দৃষ্ট হয়। লোকে বলে, উহাই প্রাচীন। নগর। কিন্তু সেই সকল স্তূপ দর্শনে কানিংহাম মনে করেন, ধর্ম্মসংক্রান্ত মঠাদির উহা ধ্বংসাবশেষ হওয়া সম্ভবপর। কানিংহাম যখন ঐ নগর পরিদর্শন করিয়াছিলেন, নগরে তখন চৌদ্দ শত গৃহস্থের বসতি ছিল বলিয়া জানিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে ছয় শত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, চারি শত আগরওয়ালা বেণিয়া, দুই শত মীনা এবং অবশিষ্ট দুই শত অন্যান্য জাতি ছিল। প্রতি গৃহস্থের গড়ে পাঁচ জন করিয়া পরিবার থাকিলে, ঐ সময়ে বিরাটের লোকসংখ্যা সাত হাজার হওয়া সম্ভবপর।

চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে বিরাট নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—বিরাট-রাজ্যের রাজধানীর পরিধি চৌদ্দ কিংবা পনের লি অর্থাৎ প্রায় আড়াই মাইল। প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষের যেরূপ পরিধির বিষয় কানিংহাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, হুয়েন-সাঙের হিসাবের সহিত তাহার সাদৃশ্য বুঝিতে পারা যায়। হুয়েন-সাং বলিয়াছেন,—ঐ নগরের অধিবাসীরা সাহসী ও তেজস্বী ছিল। তাহাদের রাজা 'ফেশী' (Fei-she) 'বৈশ্য' শব্দের অপভ্রংশে 'ফেশী' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্যের জন্য ঐ প্রদেশের নৃপতি বড়ই প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঐ নগরে তৎকালে বৌদ্ধদিগের আটটী মঠ ছিল। কিন্তু সে সকল ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া আসিতেছিল এবং তাহাতে ভিক্ষুর সংখ্যাও কমিয়া আসিয়াছিল। নানা-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তখন ঐ নগরে বাস করিতেন। তাঁহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক এবং তাঁহাদের বারটী দেব-মন্দির ছিল। ব্রাহ্মণদিগের শিষ্য-সম্প্রদায়ের সংখ্যাও অনেক। তাঁহাদিগকে নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক বলিয়া হুয়েন-সাং উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হুয়েন-সাঙের হিসাব-মত নগরের অধিবাসীর সংখ্যা তখন ত্রিশ সহস্রের কম ছিল না এবং তাহাদের চতুর্থাংশ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। হুয়েন সাঙের পর মামুদ গজনীর রাজত্বকালে বিরাট নগরের উল্লেখ দেখা যায়। হিজরী ৪০০ বৎসরে, ১০০৯ খৃষ্টাব্দে, মামুদ-গজনী ঐ নগর আক্রমণ করেন। ঐ দেশের রাজা তাঁহার বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য হন। প্রথম বার রাজা বশ্যতা-স্বীকার করিলেও চারি বৎসর পরে মামুদ পুনরায় ঐ নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং নগরে হিন্দু-মুসলমানের লোমহর্ষণ সংগ্রাম চলিয়াছিল। আবু-রিহান বলেন, সেই বিষম সমরের ফলে নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; জনসাধারণ নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। ফেরিস্তায় প্রকাশ,—মামুদের আক্রমণ হিজিরা ৪১৩ বৎসরের (১০২২ খৃষ্টাব্দের) ঘটনা। প্রথম আক্রমণে রাজার বশ্যতা-স্বীকারের পর, মামুদ জানিতে পারেন,—কৈরা ও নার্দ্দিন নামক দুইটী পার্ব্বত্য জনপদ তখনও পৌত্তলিক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। সেই জন্য ঐ দুই স্থানের অধিবাসী-দিগকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, মামুদ যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন। আমির-আলি কর্ত্তৃক ঐ স্থান অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয়। নগর লুণ্ঠন-কালে আমির-আলি একটি প্রাচীন শিলালিপি প্রাপ্ত হন। সেই শিলা-লিপি পাঠে তিনি জানিতে পারেন,—ঐ নগরের অন্তর্ভুক্ত নারায়ণ বিগ্রহের মন্দির চল্লিশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'ওটাবি' নামক জনৈক ঐতিহাসিকও ঐরূপ শিলালিপির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই শিলালিপি এতই প্রাচীনকালের বর্ণমালায় লিখিত যে, তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণ তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। মেজর বার্ট (Major Burt) বিরাট নগরের কোনও এক পর্ব্বতের উপরিভাগে একখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হন। সে শিলা-লিপি রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। কানিংহাম বলেন, আমির আলি যে শিলালিপি দেখিয়াছিলেন, এখানি সেই শিলালিপি। শিলালিপিখানি কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটীতে পরিরক্ষিত হইয়াছে। অশোকের সময়ের শিলালিপি

হুয়েন-সাং প্রভৃতির বর্ণনা।

হইলে আমির আলি তাহাকে চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের শিলালিপি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন কেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অপিচ, আমির আলি পরিদৃষ্ট শিলালিপি এবং মেজর বার্ট কর্তৃক উল্লিখিত শিলালিপি অভিন্ন কিনা, তাহাই বা কে বলিতে পারে? হুয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, সপ্তম শতাব্দীতে, তিন হাজার লি (প্রায় পাঁচ শত মাইল) বিরাট-রাজ্যের পরিধির উল্লেখ দেখা যায়। তখন ঐ নগর মেষ ও বলিবর্দ্দের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ফল-পুষ্প ঐ নগরে অল্পই দৃষ্ট হইত। কানিংহাম বিরাট-রাজ্যের চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন,—ঝুঞ্ঝুন হইতে কোটকাশিম পর্য্যন্ত সত্তর মাইল উত্তর সীমা। ঝুঞ্ঝুন হইতে আজমীর পর্য্যন্ত এক শত কুড়ি মাইল পশ্চিম সীমা; আজমীঢ় হইতে বানা ও চম্বল-নদীর সঙ্গম-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত এক শত পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ সীমা-রেখা; এবং শেষোক্ত স্থান হইতে কোট-কাশিম পর্য্যন্ত এক শত পঞ্চাশ মাইল পশ্চিম-সীমা-রেখা।

কি সূত্রে বিরাট-রাজ্যের পূর্ব্বোক্ত-রূপ সীমানা কল্পিত হয়, তাহার আলোচনা কানিংহাম এইরূপে করিয়া গিয়াছেন। হুয়েন-সাং 'পো লি-এ-টো-লো' (Po-li-ye-to-lo) নামক একটী জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। এম রেণো (M. Rainaud) বলেন, উহাই 'পারিয়াত্র' (Paryatra) বা বৈরাট (Bairat)। মথুরা হইতে উহা পাঁচ শত লি অর্থাৎ প্রায় ৮৩।৶০ মাইল পশ্চিমে এবং 'সে-টো-টু লো' (She-to-tu-lo) অর্থাৎ শতদ্রু রাজ্য হইতে প্রায় আট শত লি (প্রায় ১৩৩।৶০ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। হুয়েন-সাং-নির্দ্দিষ্ট ঐ স্থানে এখন যে নগর দৃষ্ট হয়, তাহা মৎস্যদেশের রাজধানী বিরাট-রাজ্য হওয়াই সম্ভবপর। মামুদের সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবু-রিহান লিখিয়া গিয়াছেন—কার্জ্জাটের রাজধানী 'নারাণা' মথুরার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তিনি যে দূরত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, হুয়েন-সাঙের হিসাব অপেক্ষা তাহা চৌদ্দ মাইল অধিক হয়। পরিমাপের গোলযোগে অথবা হিসাবের ভুলে এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। তবে কর্জ্জাট যে বিরাটের নামান্তর, ইহা বেশ বুঝা যায়। বাজানা (Bazana) অথবা নারাণা (Narana) একই স্থান। বিরাটের দশ মাইল দূরে নারাণপুর নামে এক নগর আছে। আবু-রিহাণের সমসময়ে সেই নগরে রাজধানী থাকা অসম্ভব নহে। নারাণপুরকেই তিনি 'নারাণা' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। অধুনা যাহা বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া চিহ্নিত হয়, তাহার প্রায় এক মাইল উত্তরে একটি পর্ব্বতের উপরিভাগে ভীমসেনের আবাসস্থান ছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাহার নাম—ভীমগুহা। উত্তর পার্শ্বে যুধিষ্ঠিরাদির বাসস্থানাদিরও ধ্বংসাবশেষ নির্দ্দিষ্ট হয়।

বিরাট-রাজ্যের নামাদির পরিবর্ত্তন।

এক মতে বঙ্গদেশে, অন্যমতে রাজপুতানায়,—বিরাট রাজ্যের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ মতান্তর বিদ্যমান। সুতরাং কোন বিরাট প্রকৃত বিরাট-রাজ্য ছিল, তৎসম্বন্ধে এখন নানা তর্ক-বিতর্ক উঠিয়া থাকে। ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা কর্ত্তৃক উত্তর-গোগৃহ হইতে গোধন-সমূহ অপহৃত হইলে, দুর্য্যোধনের আদেশক্রমে, দুঃশাসনাদি কৌরবগণ যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বিরাট-রাজ্যে উত্তর-গোগৃহে সৈন্যসমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে হস্তিনাপুর হইতে বিরাট-রাজ্য অধিক দূরে

বিরাট রাজ্যের অবস্থান-বিষয়ে বক্তব্য।

অবস্থিত ছিল বলিয়া কখনই অনুমান করা যায় না। মহাভারতে লিখিত আছে,—'সুশর্ম্মা কৃষ্ণা-সপ্তমীকে যথোদৃষ্ট পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া গোধন-সমূহ হরণ করিতে লাগিলেন। পরে অষ্টমী তিথিতে কৌরবেরাও সমগ্র দলবলে মিলিত হইয়া সহস্র সহস্র গোধন আক্রমণ করিলেন।' * এরূপ বর্ণনা-দৃষ্টে বিরাট-রাজ্য কখনই বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয় না,—প্রথম পক্ষের ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু অপর পক্ষ তদুত্তরে বলেন,— 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসময়ে এদেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানে এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন বা সৈন্য-পরিচালনা সহজেই সুসাধ্য হইত। কোথায় দ্বারকা, আর কোথায় হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ; কিন্তু স্মরণমাত্র শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কি অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে এই সকল কার্য্য সমাহিত হইত, এখন তাহা ধারণা করাও সুকঠিন। সে ক্ষেত্রে দূরত্বের প্রসঙ্গ উঠিতেই পারে না।' এবম্বিধ যুক্তিতেও উপেক্ষা করা যায় না। প্রাচীন ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানে যেরূপ উন্নত হইয়াছিল, পুরাণেতিহাসের আলোচনায় তাহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে কোনও যুক্তিই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। রামায়ণে, লঙ্কাকাণ্ডে সমুদ্র-বন্ধনের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল সমুদ্র-বন্ধনে অত্যাশ্চর্য্য স্থপতি-বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন। আধুনিক কালে ইঞ্জিনিয়ারগণ যন্ত্রাদির সাহায্যে যেরূপভাবে কার্য্য-সম্পাদন করেন, নলের কার্য্যকলাপে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিকন্তু এখনকার ন্যায় তখন যে যন্ত্র-সকল ব্যবহৃত হইত, সে আভাষও সেখানে প্রাপ্ত হই। সাগর-বন্ধন-বর্ণন-ব্যপদেশে মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়াছেন;—"হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ। পর্ব্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ॥" অর্থাৎ,—'হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড পর্ব্বত-সকল এবং প্রস্তরখণ্ডকে উৎপাটন করিয়া যন্ত্র দ্বারা বহন করিতে লাগিলেন। † এখন ভাবিয়া দেখুন দেখি, সে যন্ত্র কি?—যে যন্ত্র সাহায্যে ঐরাবত-সদৃশ পাষাণ খণ্ড এবং পর্ব্বত সমূহ উৎপাটিত ও সংবাহিত হয়, সে যন্ত্র কি অপূর্ব্ব বিজ্ঞান-বুদ্ধির পরিচায়ক গুরুভার দ্রব্য উত্তোলনের জন্য অধুনা 'ক্রেণ' (Crane) নামধেয় যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, রামায়ণোক্ত যন্ত্র তাহা অপেক্ষা কোনক্রমেই হীন বলিয়া মনে করিতে পারা যায় কি? এইরূপ আলোচনা করিয়া প্রচীন ভারতের যে বিবিধ-বিষয়িণী প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই, তাহাতে কুরুক্ষেত্র হইতে বিরাট-নগরে সৈন্য সমাবেশে দূরত্বের বা সময়াল্পতার প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলেও চলিতে পারে। আরও এক কথা, বিরাট-রাজের রাজ্য বঙ্গদেশে এবং মধ্যভারতে—দুই প্রদেশে অবস্থিত থাকাও অসম্ভব নহে। মধ্য-ভারতেও তাঁহার রাজ্য ছিল, বঙ্গদেশেও তাঁহার রাজ্য ছিল, এরূপও হইতে পারে। দুই প্রদেশে তাঁহার একই নামের দুইটি রাজধানী থাকাও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

* মহাভারত বিরাট-পর্ব্ব, ২১শ—৩৫শ অধ্যায় প্রভৃতিতে এই গোধন-হরণ বৃত্তান্ত পরিবর্ণিত।

† রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ২২শ সর্গ, ৫৬শ শ্লোক।

দশম পরিচ্ছেদ।

——*:○:*——

মথুরা-রাজ্য।

[মথুরা-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা,—রামায়ণ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে মথুরার প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গ;—মথুরার অবস্থান্তর,—উগ্রসেন, কংস, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির প্রসঙ্গ,—যাদবগণের মথুরা-ত্যাগ,—মথুরায় মগধের আধিপত্য;—মথুরার পুরাবৃত্ত,—গ্রীসে ও চীনে মথুরা-প্রসঙ্গ,—সীমা-পরিমাণাদি; মথুরার শেষ অবস্থা,—শকদিগের আধিপত্য,—স্থলতান মামুদের মথুরা লুণ্ঠন,—মুসলমান-শাসনে মথুরার অবস্থা,—মথুরার স্তূপাদি;—ব্রজধাম ও বৃন্দাবন,—পুরাণাদির মতে উহাদের অবস্থান,—গ্রীক ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে উহার উল্লেখ,—মথুরায় মুসলমানগণের শাসন-সময়ে উহার অবস্থান্তর;—দ্বারকা বা দ্বারাবতী,—পৌরাণিক আখ্যায়িকা,—দ্বারকার শেষ পরিণাম,—সোমনাথ প্রসঙ্গ,—বর্ত্তমান অবস্থা।]

মথুরা-রাজ্যের ও মথুরা-নগরীর প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে রামায়ণের উত্তর-কাণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। পুরাকালে, সত্যযুগে, ঐ স্থান মধু নামক মহাসুরের অধিকারভুক্ত ছিল। অসুররাজ ব্রাহ্মণভক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ ও উদার-চরিত ছিলেন। তজ্জন্য রুদ্রদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে একটী শূল উপহার দিয়াছিলেন। সেই শূল হস্তে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, শত্রুগণ ভস্মসাৎ হইত; শূলের অধিকারীকে কেহই পরাজিত করিতে পারিত না। পিতার মৃত্যুর পর, মধু দৈত্যের পুত্র লবণ সেই শূল প্রাপ্ত হন। লবণ দুর্দ্ধর্ষ, ধর্ম্মবিদ্বেষী ও অত্যাচারপরায়ণ ছিলেন। শূলের প্রভাবে তিনি দেবমানব সকলকেই তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তাহাতে ঋষিগণের যজ্ঞকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিত, ব্রাহ্মণগণ অতিমাত্র বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন অযোধ্যার সিংহাসনে ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত; লবণ দৈত্যের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া ভার্গবপ্রমুখ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ শ্রীরামচন্দ্র-সমীপে উপনীত হন;—লবণ দৈত্যের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিয়া প্রতিকার-প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। ঋষিগণের নিকট লবণ দৈত্যের সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, তাহাকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে, শ্রীরামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে মধুপুরী আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে শত্রুঘ্ন মধুপুরী অবরোধ করেন। লবণ দৈত্যের সহিত কিছু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার ঘোর যুদ্ধ চলে। অবশেষে শত্রুঘ্ন-হস্তে লবণ দৈত্য নিহত হয়। দেবতাগণের অনুগ্রহে শত্রুঘ্ন লবণ দৈত্যের সংহারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। লবণ দৈত্য নিহত হইলে, দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া শত্রুঘ্নকে বর-দানে অগ্রসর হন। শত্রুঘ্ন তাহাতে বলিয়াছিলেন,—'এই দেবনির্ম্মিতা মনোহরা রমণীয়া মধুপুরী মথুরা (মধুরা) রাক্ষসের ভয়ে জনশূন্যা ছিল। এক্ষণে ইহা জনপূর্ণ হউক।' দেবগণ সেই বরই প্রদান করেন। অতঃপর সুচারু নগর বিনির্ম্মিত হইল। সেই নগর যমুনা-তীরে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং রমণীয় অট্টালিকা-সমূহে নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—চারি বর্ণ নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

মথুরা রাজ্য।

পূর্ব্বে লবণ দৈত্যের যে সকল অট্টালিকা ছিল, তৎসমুদায়েও সংস্কার-সাধন করিয়া শত্রুঘ্ন সে নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিলেন। এইরূপে মথুরা-নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর সেখানে অবস্থিতি করিয়া শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন। অযোধ্যা হইতে মথুরায় গমনকালে শত্রুঘ্নকে যমুনা পার হইতে হইয়াছিল এবং তিনি মথুরায় ব্রাহ্মণগণের পুরাকালীন যজ্ঞ স্থানাদির স্তূপ-সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন;—রামায়ণে এইরূপ উল্লেখ আছে। ফলতঃ, শত্রুঘ্ন-কর্ত্তৃক মথুরাপুরী প্রতিষ্ঠিত হইলেও, পূর্ব্বে ঐ নগরী বিদ্যমান ছিল,—রামায়ণের বর্ণনায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। * মধু-দৈত্যের রাজত্ব-কালে উহা 'মধুবন' নামে প্রখ্যাত ছিল। লবণাসুরের অধিকার-কালে উহা 'মধুপুরী' সংজ্ঞা-লাভ করিয়াছিল। শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক ঐ নগরী পুনর্নির্ম্মিত হওয়ার পর উহা মথুরাপুরী নামে অভিহিত হয়। মনুসংহিতায় মথুরা শূরসেন † নামে পরিচিত। মথুরার অধিবাসীরা যুদ্ধ-কুশল ছিল বলিয়া মনু উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই মথুরাপুরী স্থাপন-সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে পূর্ব্বোক্ত বিবরণই সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। পুরাণকার বলিতেছেন,—'অমিত-বল-পরাক্রম মধুপুত্র লবণ নামক রাক্ষসেশ্বরকে হনন-পূর্ব্বক শত্রুঘ্ন মথুরা নামে একটী পুরী স্থাপন করেন।' ‡ বরাহপুরাণে মথুরা-মাহাত্ম্য বিশদ-রূপে পরিবর্ণিত। মথুরায় কোন্ কোন্ তীর্থ আছে, কোন্ তীর্থ কিরূপ সুফলপ্রদ,—বরাহপুরাণ তাহার পরচয় দিয়াছেন। এই পুরাণের মতে,—মথুরার পরিমাণ বিংশতি যোজন। মথুরার অন্তর্গত 'দ্বাদশ বন' যাহারা দর্শন করে, তাহারা কখনও নিরয়গামী হয় না। সেই দ্বাদশ বনের নাম—মধুবন, তালবন, কুন্দবন, কাম্যবন, বহুবন, ভদ্রবন, খাদিরবন, মহাবন, লৌহার্গলবন, বিল্ববন, ভাণ্ডীর-বন, বৃন্দাবন। ¶ শ্রীমদ্ভাগবতে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এবং হরিবংশে মথুরার মাহাত্ম্য-কথা বিবিধ প্রকারে পরিবর্ণিত।

উগ্রসেন, কংশ ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির প্রসঙ্গে মথুরা পুরাণে প্রতিষ্ঠান্বিত। উগ্রসেন মথুরার রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কংশ। শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনের দৌহিত্র। শত্রুঘ্নের রাজ্য মথুরাপুরী এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মথুরা-রাজ্য কি প্রকারে উগ্রসেনের পিতৃ-পিতামহের অধিকারে আসিয়াছিল, সে বিবরণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পরিবর্ত্তি-কালে আমরা যখন মথুরার পরিচয় পাই, দ্বাপরের শেষ-ভাগে মথুরা যখন সমৃদ্ধিশালিনী, তখন উগ্রসেন মথুরার রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উগ্রসেনের পুত্র কংশ দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আপন পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া তিনি আপনা-আপনি মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের

মথুরার অবস্থান্তর।

---

* রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ত্রিসপ্ততিতম সর্গ হইতে পঞ্চাশীতিতম সর্গে এই মথুরাপুরী-প্রতিষ্ঠার বিবরণ বিবৃত রহিয়াছে।

† শত্রুঘ্নের সাহায্যকারী শূর (দেব) সৈন্যগণ যুদ্ধ-সময়ে মথুরা-নগরে বাস করিয়াছিল বলিয়া নগরী 'শূরসেন' নামে অভিহিত হইয়াছিল। শত্রুঘ্নের পুত্রের নাম শূরসেন। পুত্রের নামানুসারেও নগরী শূরসেনা নামে পরিচিত হইয়াছিল,—এরূপও কথিত হয়।

‡ বিষ্ণুপুরাণে, চতুর্থাংশ, চতুর্থ অধ্যায়।

¶ বরাহপুরাণ, সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় হইতে একষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায়ে মথুরা-মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত।

সময় তিনি দৈববাণী শুনিয়াছিলেন, তাঁহার ভগ্নী দেবকীর অষ্টম-গর্ভ-সম্ভূত পুত্র তাঁহাকে সংহার করিবেন। সেই জন্য কংস, ভগ্নী দেবকীকে এবং ভগ্নীপতি বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেন। সেই কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। ভগবৎ-প্রেরণায় বসুদেব তাঁহাকে বৃন্দাবনে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে লালিতপালিত হন। মাতামহ উগ্রসেন, পিতা বসুদেব এবং জননী দেবকী কংস-কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ যখন জানিতে পারেন, তখন মর্ম্মাহত হইয়া কংসের বধোপায়-উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন। বসুদেবের অপরা পত্নী রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা;—বলরাম জ্যেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠ। বসুদেব কারাগারে রুদ্ধ থাকায়, রোহিণীও আপন পুত্র বলরামকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে কৃষ্ণ-বলরাম একত্র পরিবর্দ্ধিত হন। কৃষ্ণের বিষয় জানিতে পারিয়া কৃষ্ণের বধ-সাধন জন্য কংস প্রথম হইতেই চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। অবশেষে কংস এক ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেই ধনুর্যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে ও বলরামকে মথুরায় আনয়ন করিয়া, বহু বলশালী মল্ল ও মত্ত-মাতঙ্গ দ্বারা তাঁহাদিগকে নিহত করিবেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি অক্রূরকে ব্রজধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় আগমন করিয়া যে অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করেন, সকলকেই তাহাতে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়। কংস-নিয়োজিত চানূর মুষ্টিক প্রভৃতি মল্লগণ তাঁহাদের হস্তে নিহত হইয়াছিল। কংসের কুবলয়পীড় নামক মত্ত-হস্তীকেও শ্রীকৃষ্ণ সংহার করেন। অতঃপর কৃষ্ণ-বলরাম সভা-মঞ্চে উপনীত হইয়া কংসের বধ-সাধন করিয়াছিলেন। কংস নিহত হইলে, উগ্রসেন মথুরার রাজাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হন;—বসুদেব-দেবকীর বন্ধন মোচন হয়। কংস-বধ এবং মাতামহ উগ্রসেনকে সিংহাসন দান প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য-কলাপের স্মৃতি মথুরায় বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে মগধাধিপতি জরাসন্ধ বড়ই কুপিত হন। কংস তাঁহার জামাতা। জামাতৃ-হননকারী যাদবগণের বধের জন্য তিনি মথুরা-নগর অবরোধ করেন। জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে অষ্টাদশ বারই তাঁহাকে বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। অবশেষে জরাসন্ধ কালযবনের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন। কালযবন গার্গ্যের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। যবনাধিপতির গৃহে তিনি প্রতিপালিত হন। জরাসন্ধের সহিত যখন মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হন, কালযবন তখন শক্তিশালী নৃপতি-মধ্যে পরিগণিত। কালযবনের সেই বিবিধায়ুধ-পরিবৃত ভয়ঙ্কর সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া জরাসন্ধ যখন মথুরা-আক্রমণে অগ্রসর হন, যাদবগণ অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া পড়েন; বিশেষতঃ মহাদেবের নিকট গার্গ্য বর পাইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র কালযবন যাদবগণের অজেয় হইবে। সুতরাং কালযবন কর্ত্তৃক নগরাক্রমণে মথুরাবাসিগণ বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষয়ই অবগত ছিলেন। মথুরা পরিত্যাগ না করিলে শ্রেয়ঃ নাই বুঝিতে পারিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছিলেন। এখন কালযবন-সহ জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণে অগ্রসর হইলে আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে লইয়া সেই

সেই নূতন রাজধানীতে পলায়ন করাই তিনি যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। সেই নূতন রাজধানীর নাম—কুশস্থলী বা দ্বারাবতী। ফলে, জরাসন্ধ ও কালযবনের বিভীষিকায় মথুরা পরিত্যক্ত হইল;—দ্বারাবতী নগরীতে যাদবগণ নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। যাদবগণ দ্বারাবতী নগরে গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে * নিহত করিয়াছিলেন। কালযবনের ধনরত্ন শ্রীকৃষ্ণের অধিকারভুক্ত হইলে, তিনি তাহা উগ্রসেনকে প্রদান করেন। সেই জয়লব্ধ ধনসম্পত্তিদ্বারা দ্বারাবতী সুশোভিত হয়। এই ঘটনার পর পুরাণে মথুরার বিশেষ কোনও বিবরণ দৃষ্ট হয় না। প্রতীত হয়, মথুরা প্রথমে কিছুকাল জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর উহা মগধ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

মথুরার পুরাবৃত্ত।

গ্রীসদেশীয় ঐতিহাসিক এরিয়ান (আরিয়ান) মথুরাকে শূরসেনী রাজ্যের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার মতে,—শূরসেনী রাজ্যে দুইটী প্রসিদ্ধ নগর বিদ্যমান। একটীর নাম 'মেথোরাস' (Methoras), অপরটীর নাম 'ক্লিসোবোরাস' (Klisoboras)। 'যোবারেস' (Jobares) নদী ঐ দুইটী নগরীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ঐতিহাসিক প্লিনি—জোমানেস (Jomanes) নাম্নী নদীর তীরে 'মেথোরা' (Methora) ও 'ক্লিসোবোরা' (Clisobora) নগরীদ্বয় অবস্থিত, বলিয়া গিয়াছেন। টলেমির গ্রন্থে 'মদুরা' (Modura) নামের উল্লেখ আছে। তিনি ঐ নামের অর্থ করেন,—দেবতাদিগের নগরী বা পবিত্র নগরী। পরিব্রাজক ফা-হিয়ান নগরহার এবং অপরাপর স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, সিন্ধুনদ অতিক্রম-পূর্ব্বক, মথুরায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। মথুরার পদবাহিনী যমুনা নদীর বামে ও দক্ষিণে দুই পার্শ্বে তখন কুড়িটী সঙ্ঘারাম ছিল এবং সেই সকল সঙ্ঘারামে তিন সহস্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম-যাজক অবস্থিতি করিতেছিলেন। মথুরায় বৌদ্ধধর্ম্মের তখন বিশেষ প্রাদুর্ভাব। হুয়েন-সাং যখন মথুরায় আগমন করেন, তখনও মথুরায় বৌদ্ধদিগের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। কুড়িটী সঙ্ঘারাম তখনও মথুরায় বিদ্যমান ছিল। তবে ঐ সকল সঙ্ঘারামে তখন দুই সহস্র মাত্র ধর্ম্মযাজক অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ—মথুরা রাজ্যের পরিধি পাঁচ হাজার লি অর্থাৎ প্রায় আট শত তেত্রিশ মাইল (মতান্তরে এক হাজার মাইল) এবং রাজধানী মথুরা নগরের পরিধি কুড়ি লি অর্থাৎ প্রায় ৩।৴০ মাইল (মতান্তরে চারি মাইল) হুয়েন-সাঙের পরিভ্রমণ-কালে, মথুরা উর্ব্বর ও ধনধান্যপূর্ণ ছিল; তুলা এবং স্বর্ণ মথুরার প্রধান পণ্যের

* মহর্ষি গার্গ্য ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহার শ্যালক তাঁহাকে পুত্র-হীন বলিয়া অপবাদ দেন। তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া শূলপাণির আরাধনায় তিনি গোপালী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে ঐ পুত্র লাভ করেন। যবনরাজ (কে সে যবন-রাজ, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন) কর্ত্তৃক কালযবন পালক-পুত্র-রূপে পরিগৃহীত হন। মহাদেবের বরে কালযবন অজেয় হইয়াছিলেন। কালযবনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত, কালযবন শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করেন। সেই গুহায় মুচকুন্দ নিদ্রিত ছিলেন। দেবাসুরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুচকুন্দ নিদ্রারূপ বরলাভ করেন। যাহার দ্বারা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে, তাঁহার নয়নাগ্নিতে সেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে, ইহাই নিয়ম ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তিনি গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুচকুন্দের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হন। কালযবন চীৎকার করিতে করিতে গুহায় প্রবেশ করেন। কালযবনের চীৎকারে মুচকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হয়; সঙ্গে সঙ্গে মুচকুন্দের নয়নাগ্নিতে কালযবন জীবন বিসর্জ্জন দেন। এই মুচকুন্দ সূর্য্য-বংশীয় রাজা মান্ধাতার পুত্র বলিয়া পরিচিত। (হরিবংশ, ১১৩ম ও ১১৪ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এ সময়ে তাঁহার বিদ্যমানতা এবং কালযবনের সংহার-সাধন বিষয়ক উপাখ্যানের মর্ম্মানুধাবন সুকঠিন, সন্দেহ নাই।

মধ্যে পরিগণিত হইত; অধিবাসিগণ বিনয়ী ও সরল প্রকৃতি ছিল; তাহারা ধর্ম্মের সম্মাননা করিত, বিদ্যার উৎসাহ দিত, বহুমূল্য ও জাঁকজমকশালী উজ্জ্বল রেশমনির্ম্মিত পোষাক ব্যবহার করিত। তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ, অমায়িক এবং বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসবান্ ছিল। তবে ঐ সময়ে সঙ্ঘারামসমূহ ক্রমেই শূন্য হইয়া আসিতেছিল; ধর্ম্মযাজকগণের সংখ্যা ক্রমেই কমিতে আরম্ভ হইয়াছিল। হুয়েন-সাং-কথিত পরিমাণাদির বর্ণনা হইতে তাৎকালীন মথুরা রাজ্যের একটী সীমানা নির্দ্দিষ্ট হয়। কেবল বিরাট ও আতরাঞ্জির মধ্যেই যে ঐ রাজ্য নিবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; আগরা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে মাড়োয়ার ও শিবপুরী এবং সিন্ধুনদের পূর্ব্ব-তীর পর্য্যন্ত উহার সীমানা বিস্তৃত ছিল। তাহা হইলে বর্ত্তমান মথুরা জেলা, ভরতপুর, ক্ষীরাগুলি, ঢোলপুর এবং গোয়ালিয়র রাজ্যের উত্তরার্দ্ধাংশও মথুরার অন্তর্ভুক্ত থাকা সম্ভবপর। উহার পূর্ব্ব সীমানায় তাৎকালিক জিজহাওতি (Jijhaoti) অর্থাৎ আধুনিক বুন্দেলখণ্ড প্রদেশ এবং দক্ষিণে মালব-রাজ্য অবস্থিত ছিল। শেষোক্ত দুই রাজ্যকে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া হুয়েন-সাং নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে শকদিগের প্রাদুর্ভাব-কালে, খৃষ্ট-জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, শকগণ * মথুরা ও মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। শক-জাতীয় রাজা কণিষ্কের এবং তাঁহার বংশধরগণের শাসন-কালে মথুরায় তাঁহাদের প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তা অবস্থিতি করিতেন। রাজা কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে 'পুরুষপুর' (বর্ত্তমান পেশোয়ার) নগরে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মথুরার শেষাবস্থা।

তাঁহার সিংহাসনারোহণ সময় হইতে 'শক' নামক বর্ষাব্দ গণনা প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময়ে ভারতবর্ষে শকগণের এতই প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শকাব্দ আজিও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচলিত রহিয়াছে। রাজা কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এবং দেশ-বিদেশে (চীন, তাতার, তিব্বত ও উত্তর এসিয়ার বহু স্থানে) ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য তিনি অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই মথুরায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়। কনিষ্কের পর হবিষ্ক এবং হবিষ্কের পর বাসুদেব (বাজদেও) সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ঐ বংশ ১৯০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে 'দেবপুত্র' বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহাদের প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তৃগণ 'ক্ষত্রপ' নামে অভিহিত হইতেন। মথুরা এক সময়ে সেই 'ক্ষত্রপ'-সংজ্ঞা-প্রাপ্ত রাজপ্রতিনিধিগণের শাসনাধীন ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-সময়ে,

---

* শক জাতির-উৎপত্তি-সম্বন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্রে অনেক কথা লিখিত আছে। সূর্য্যবংশে নরিষ্যন্তের অংশে শকগণের উৎপত্তি হইয়াছিল, বংশলতার আলোচনায় তাহা দেখিতে পাই। এদিকে সগর রাজা কর্ত্তৃক যাঁহারা রাজ্যভ্রষ্ট ও দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হন, শকগণ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহারা ক্রিয়ালোপ হেতু ব্রাহ্মণ-দর্শনাভাবে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন,—মধ্য-এসিয়া প্রাচীন কালে শক-দ্বীপ নামে অভিহিত হইত। গ্রীকগণ ঐ দেশকে সিদিয়া (Scythia) সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মধ্য-এসিয়ার অধিবাসীরাই শক নামে পরিচিত। শকগণ এক সময়ে বড়ই প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক সময় দলবদ্ধ হইয়া দেশে বিদেশে গমন করিয়া লুণ্ঠনাদি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন।

মথুরা কনোজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের প্রাধান্য স্বীকার করিত। ইহার পর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক মথুরার দুর্দ্দশার সমাচার ইতিহাসে জাজ্বল্যমান হইয়া আছে। মথুরা তখন কনোজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী। কনোজের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও মথুরার ঐশ্বর্য্যের তখন অবধি ছিল না সুলতান মামুদ নবম বার ভারত আক্রমণে অগ্রসর হইয়া প্রথমে কনোজ আক্রমণ করেন। কনোজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলে, তিনি মথুরাভিমুখে অগ্রসর হন। মথুরায় তখন পুনরায় হিন্দুদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। দেব-মন্দিরাদিতে মথুরা আবার এক নূতন শ্রী ধারণ করিয়া ছিল। সুলতান মামুদ মথুরা আক্রমণ করিয়া কুড়ি দিন যথেচ্ছভাবে মথুরা লুণ্ঠন করেন। দেবমূর্ত্তিসমূহ চূর্ণীকৃত এবং দেবালয়-সমূহ কলুষিত হয়। সুবর্ণাদি ধাতু-নির্ম্মিত বহু বিগ্রহ-মূর্ত্তি এই লুণ্ঠন-ব্যপদেশে মামুদ গলাইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে প্রকাশ আছে। ফেরিস্তায় প্রকাশ,—মামুদের মথুরা-লুণ্ঠন-সময়ে মথুরায় পাঁচটী সুবর্ণনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি ছিল। বহু মূল্যবান পদ্মরাগ-মণি দ্বারা সেই বিগ্রহ কয়েকটীর চক্ষু নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুবর্ণ-নির্ম্মিত ঐ বিগ্রহপঞ্চক ব্যতীত, রৌপ্যনির্ম্মিত শতসংখ্যক বিগ্রহ-মূর্ত্তিও মথুরায় বিদ্যমান ছিল। * মামুদ প্রায় সকল বিগ্রহ-মূর্ত্তিগুলিকেই ধ্বংস করিয়াছিলেন। নগর লুণ্ঠন-সময়ে সৈন্যগণ নগরের অনেক অংশ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে নগরের দেবমন্দির প্রভৃতির অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্যের ও কারুকার্য্যের পরিচয় পাইয়া, মামুদ সেগুলিকে নষ্ট করিতে নিষেধ করেন। মথুরার তাৎকালিক অট্টালিকা ও দেবালয় প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, মামুদ গজনী-নগরের শাসন-কর্ত্তাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। 'ফেরিস্তা' গ্রন্থে সেই পত্রের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই পত্রের মর্ম্ম,—'এখানে সহস্র সহস্র সুরম্য অট্টালিকা বিদ্যমান। ভক্তের ভক্তির ন্যায় সেগুলি অটল অচল। অধিকাংশ অট্টালিকাই শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত। অট্টালিকাগুলির সমতুল্য সুদৃশ্য সুদৃঢ় অসংখ্য দেবমন্দিরে নগরী পরিশোভিত। কত অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া যে ঐ নগরীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। দুই শত বৎসরের কমে এরূপ একটী নগর নির্ম্মাণ হওয়া সম্ভবপর নহে।' † মথুরা নগরীর সৌন্দর্য্য দর্শনে মামুদ এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি আপনার রাজধানীকে মথুরার অনুকরণে নির্ম্মাণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হন। ‡ মথুরা-লুণ্ঠনে মামুদ যে অজস্র

---

* "There were in Mathura five golden idols with eyes of rubies, and a hundred idols of silver."—Brizg's *Ferishta*, Vol. I.

† মিঃ ব্রিগ 'ফেরিস্তা' গ্রন্থান্তর্গত ঐ অংশের এইরূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন—"Here there are a thousaud edifices as firm as the faith of the faithful, most of them of marble, besides innumerable temples; nor is it likely that this city has attained its present condition but at the expense of many millions of deenars; nor could such another be constructed under a period of two centuries."—Brigg's *Ferishta*, Vol. I.

‡ এতৎসম্বন্ধে মিঃ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন লিখিয়া গিয়াছেন,—"All agree that he was struck with the highest admiration of the buildings which he saw at Muttra, and it is not improbable that the impression they made on him gave the first impulse to his own undertakings of the same nature."—Elphinstone's *History of India*.

ধনরত্ন লইয়া যান, তদ্দ্বারা তাঁহার রাজধানী গজনী নগরী সুশোভিত হইয়াছিল। মামুদের মথুরা অক্রমণের উপর দিয়া পরিবর্ত্তনের অশেষ প্রবাহ প্রবাহিত হয়। আওরঙ্গজেব মথুরার দেবমন্দির-পার্শ্বে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। আওরঙ্গজেবের দরবার হইতে শিবজীর পলায়ন-ব্যপদেশেও মথুরার নাম ইতিহাসে উল্লিখিত। দিল্লী হইতে পলায়ন-কালে শিবজীর পুত্র শম্ভুজী (শম্ভাজী) মথুরার ব্রাহ্মণদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন। মুসলমানদিগের শাসনাবসানে মথুরা ইংরেজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই হইতে মথুরার শ্রীসম্পদ পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মথুরায় এখনও অসংখ্য ভগ্নস্তূপ বিদ্যমান। যমুনার তীরে উত্তর দক্ষিণে এই নগরী কতদূর বিস্তৃত ছিল, সেই সকল ভগ্নস্তূপ তাহার পরিচয়-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। উত্তরে নবী মসজিদ এবং রাজা কংশের দুর্গ, দক্ষিণে 'তিলকংস এবং 'তিলসতৃক' পর্য্যন্ত মথুরার সীমানা এক সময়ে বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণাংশের প্রাচীন নগরী এখন পরিত্যক্ত-প্রায়। অধুনা সেই প্রাচীন নগরীর উত্তরে এবং নবী মসজিদের পশ্চিমে নূতন নগরী পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ত্তমান নগরীর তিন মাইল দক্ষিণে, জেলের সন্নিকটে, একটি প্রকাণ্ড স্তূপ দৃষ্ট হয়। খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে সেই স্তূপ বৌদ্ধদিগের মঠ ছিল। স্তূপ-মধ্যপ্রাপ্ত স্তম্ভাদির খোদিত-লিপি এবং প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রভৃতি দৃষ্টে মথুরার ঐ অংশ বৌদ্ধ-প্রাদুর্ভাবের সময়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

মথুরা-প্রদেশের অপর নাম ব্রজমণ্ডল। ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, সেই জন্য ব্রজমণ্ডল সুপ্রসিদ্ধ। যমুনার উভয় তীর ঐ ব্রজমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। ব্রজ, গোকুল, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি ব্রজমণ্ডলে সুপ্রসিদ্ধ। গোকুলের অপর নাম—ব্রজধাম। সেই ব্রজধামে নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। যমুনার এক পারে মথুরা এবং অপর পারে ব্রজধাম অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান মথুরা-সহরের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে এখনও গোকুল, ব্রজধাম ও নন্দালয় চিহ্নিত হইয়া থাকে। গোকুলে ব্রজধামে, শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বাল্য-লীলার কাহিনী—শ্রীমদ্ভাগবতে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিশদভাবে পরিবর্ণিত আছে। * পরবর্ত্তী ইতিহাসে মথুরার সঙ্গে সঙ্গেই গোকুলের অস্তিত্ব মিশিয়া গিয়াছে। অক্রূর আসিয়া ব্রজধাম হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় ধনুর্যজ্ঞে লইয়া যান। তাহার পর হইতেই মথুরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৃন্দাবনে নগর-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে। বরাহপুরাণে দেখিতে পাই, ব্রজধামের অন্তর্গত দ্বাদশ বনের মধ্যে বৃন্দাবন অন্যতম। গোপবালকসহ শ্রীকৃষ্ণ সেই বনে গোচারণে যাইতেন। বৃন্দাবনে গোচারণ-কালে ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ দর্শন করিত। সেই কথা ব্রজধামে প্রচারিত হয়। ফলে, ব্রজবাসিগণ সকলেই বৃন্দাবন-দর্শনে ঔৎসুকান্বিত হন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নূতন নগরী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বৃন্দাবন-নগরী নির্ম্মিত হয়।

ব্রজধাম ও বৃন্দাবন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে, দশম স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায়ে, ব্রজধামের বিবরণ বর্ণিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড অংশে, সপ্তদশ অধ্যায়ে, বৃন্দাবন-নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গ বিশদ পরিবর্ণিত।

তখন, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মাহাত্ম্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া, বৃন্দাবন সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে,—শ্রীমতী রাধিকার ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দা নাম শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। তাঁহারই রম্য ক্রীড়াবন বলিয়া উহা বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ গোলকধামে রাধিকার প্রীত্যর্থ ঐ বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করেন। পরে পৃথিবী-তলেও তাঁহার প্রীত্যর্থ ঐ বন বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। এই বৃন্দাবনের মধ্যে বহু তীর্থস্থান বিদ্যমান। কালীয়-দমন-ঘাট, কেশী-ঘাট, শ্যাম-কুঞ্জ রাধা-কুঞ্জ, প্রভৃতি তন্মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বৃন্দাবনের অনতি-দূরে গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের চারিপার্শ্বেও নানা তীর্থ বিদ্যমান্। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের কেহই বৃন্দাবনের নাম উল্লেখ করেন নাই। এরিয়ানের ইতিহাসে 'ক্লিসোবোরাস' নামক নগরের যে উল্লেখ আছে, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাহাকেই বৃন্দাবন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কানিংহাম বলেন,—'ঐ স্থানের প্রাচীন নাম 'কালিকাবর্ত্ত'। যমুনা-তীরবর্ত্তী কদম্ব-বৃক্ষে কালিকা (কালীয়) নামক সর্প বাস করিত এবং তদ্দ্বারা যমুনার ঐ অংশ বিষাক্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালীয়-দমন-প্রসঙ্গে তাহা প্রতিপন্ন হয়। সেই সর্পের নামানুসারে ঐ স্থান কালিকাবর্ত্ত নামে পরিচিত ছিল। ক্লিসোরোরা নাম—কোনও কোনও পাণ্ডুলিপিতে 'কারিসোবোরা' (Carisobora) এবং 'কিরিসোবোর্কা' (Cyrisoborka) রূপে লিখিত আছে। কালিসোবোর্কা শব্দ কালিকোবর্ত্তা বা কালিকাবর্ত্ত শব্দের রূপান্তর বলিয়া অনুমান হয়।' দুরন্বয়ে এই প্রকারে কানিংহাম প্রাচীন গ্রীকদিগের গ্রন্থে বৃন্দাবনের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। যাহা হউক, মথুরা-নগরী নানারূপ বিপর্য্যয়ে উৎখাত ও পরিত্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনও জনশূন্য হইয়াছিল। পরিবর্ত্তি-কালে কত কাল বৃন্দাবন জনশূন্য অবস্থায় পতিত ছিল, কেহই তাহা বলিতে পারেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে কৃষ্ণপরায়ণ রূপ-সনাতন বৃন্দাবন পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া তুলেন। রূপ-সনাতন দুই ভাই। তাঁহারা গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্ত্তা হুসেন খাঁর কর্ম্মচারী ছিলেন। রূপ ও সনাতন উভয়েই সংস্কৃত-সাহিত্যে পারদর্শিতা লাভ করেন। শাস্ত্র-তত্ত্ব তাঁহাদিগের অধিগত হয়। হুসেন খার অধীনে কর্ম্ম করিবার সময় 'দবিরখাস' প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। রাজার পক্ষ হইয়া তাঁহারা অনেক সময় প্রজার প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। শাস্ত্র-পাঠে তাঁহাদের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। কৃতকর্ম্মের জন্য হৃদয় অনুশোচনার অনলে জ্বলিয়া উঠে। তখন সেই জ্বালা জুড়াইবার জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নিকেতন বৃন্দাবন-ধামের অনুসন্ধানে দেশ-ত্যাগ করেন। বৃন্দাবন তখন অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা বৃন্দাবনের সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া লন। ক্রমশঃ বৃন্দাবন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতে থাকে; বৃন্দাবনে গোবিন্দজী প্রভৃতির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের শাসন-সময়ে বৃন্দাবন বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের উচ্চ-চূড়া—রাত্রিতে উজ্জ্বল দীপালোকে উদ্ভাসিত হইত। আগরার প্রাসাদে বসিয়া এক দিন রাত্রিতে আওরঙ্গজেব সেই আলো দেখিতে পান। মন্দিরের চূড়ায় আলোক-রশ্মি-দর্শনে অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া, আওরঙ্গজেব চূড়া ভাঙ্গিয়া দিবার

জন্য আদেশ প্রচার করেন। গোবিন্দজীর পুরোহিতগণ আওরঙ্গজেবের আদেশের বিষয় জানিতে পারেন। গোবিন্দজীকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহারা রাজপুতানায় উদয়পুর-রাজ্যে পলায়ন করেন। পুরোহিতগণ কর্তৃক গোবিন্দজী স্থানান্তরিত হওয়ার অব্যবহিত পরে, আওরঙ্গজেবের আদেশে, মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এখনও সেই ভগ্ন-মন্দির বৃন্দাবনে আওরঙ্গজেবের কীর্ত্তি-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। গোবিন্দজী এক্ষণে জয়পুর-রাজভবনে সম্পূজিত হইতেছেন। এদিকে তাঁহার ভগ্ন-মন্দিরের পার্শ্বে বৃন্দাবনে আর এক নূতন গোবিন্দজী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। অন্যান্য সৌধেও অধুনা বৃন্দাবন-পুরী সুসজ্জিত হইয়াছে।

দ্বারকা বা দ্বারাবতী।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগে, মথুরা পরিত্যাগ করিয়া, যাদবগণ দ্বারকা-নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। দ্বারাবতী, দ্বারবতী, বনমালিনী, দ্বারকা, অব্ধি-নগরী, দ্বারক প্রভৃতি নামে দ্বারকা পরিচিত। রেবত রাজার পুরী বলিয়া 'রৈবত' এবং পুরাকালীন কুশস্থলী-পুরী নামেও উহা প্রসিদ্ধ। * কুশস্থলী নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপরে দ্বারকা-পুরী বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, বিষ্ণু-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখিতে পাই,—শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক ঐ পুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই দ্বারকা পুণ্যপ্রদ তীর্থস্থান-মধ্যে পরিগণিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উহা পিতৃতীর্থ এবং সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। † হরিবংশে দ্বারকা চতুর্ব্বর্গের মোক্ষ-দ্বার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ‡ তন্ত্র-মতেও দ্বারাবতী মোক্ষ-দায়িকা। দ্বারাবতীতে শ্রীমধুসূদন বিরাজ করিতেছেন,—মহাভারতে ধৌম্য-যুধিষ্ঠির-সংবাদে উল্লিখিত আছে। ¶ সেখানে দ্বারকা সৌরাষ্ট্র-দেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অন্যত্র আবার (মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বে) দেখিতে পাই, দ্বারবতী গোকর্ণ-দেশ বলিয়া পরিচিত। অর্জ্জুন যজ্ঞাশ্বের সহিত দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার দাক্ষিণাত্য-বিজয়-প্রসঙ্গে প্রভাস ও দ্বারকার নাম দেখিতে পাই। সেখানে লিখিত আছে,—"পাকশাসন-সুত পার্থ নিষাদ-রাজ-তনয়কে জয় করতঃ তৎকর্ত্তৃক পরমাদরে পূজিত হইয়া দক্ষিণ-সমুদ্রে গমন করিলেন; তথায় দ্রাবিড়, অন্ধ্র, রৌদ্রকর্ম্মা, মাহিষক এবং কোল্বগিরেয়দিগের সহিত কিরীটীর যুদ্ধ হইল। তিনি অনতি-তীব্র কর্ম্ম-দ্বারা তাহাদিগকে জয় করতঃ তুরঙ্গমের বশবর্ত্তী হইয়া সুরাষ্ট্রাভিমুখে গমন করিলেন। পরে অশ্ব গোকর্ণ দেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রভাসে গমন করতঃ তথা হইতে বৃষ্ণিবীর-পালিতা রমণীয়া দ্বারবতী-নগরীতে উপনীত হইল। কুরুরাজের যজ্ঞীয় অশ্ব দ্বারবতীতে উপনীত হইলে যাদবকুমারগণ তাহাকে উন্মথিত করিতে লাগিল, পরন্তু বৃষ্ণ্যন্ধকপতি উগ্রসেন পুর হইতে বহির্গত হইয়া কুমারগণকে নিবারিত করিলেন।" ইহাতে প্রতীত হয়, লোকপ্রসিদ্ধ প্রভাস-তীর্থ এই দ্বারকারই অন্তর্ভুক্ত। এই প্রভাসের তীরে

* এই গ্রন্থের অন্তর্গত কোশল-রাজ্যের প্রসঙ্গে ১০০ম পৃষ্ঠায় এতদ্বিবরণ আছে।
† ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড, ১০৩ম ও ১০৪ম অধ্যায়।
‡ হরিবংশ, ১১৫ম অধ্যায়ে দ্বারাবতী-পুরী নির্ম্মাণের বিষয়ে পরিবর্ণিত।
§ মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৮৮শ অধ্যায়, তীর্থ-বর্ণন-প্রসঙ্গে দ্বারকার বিষয় উল্লিখিত।

মদোন্মত্ত যাদবগণ পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্র-মতে শ্রীকৃষ্ণের দেহ-ত্যাগের পর দ্বারকা নগরী সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং পুরাণ-প্রসিদ্ধ দ্বারকা এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি জনসাধারণ অধুনা দ্বারকা ও প্রভাস প্রভৃতির একটী অবস্থান-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছেন। স্মরণাতীত-কাল হইতে সেই নির্দ্দেশ মান্য হইয়া আসিতেছে। দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইলেও এখন যাহা দ্বারকা ও প্রভাস প্রভৃতি নামে পরিচিত, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে গুজরাট প্রদেশে, এখন তাহার অবস্থান-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দ্বারকা এখন কাথিওয়ারের অন্তর্গত একটী প্রধান বন্দর। এ বন্দর বরোদা রাজ্যের অধিপতি গাইকোয়ারের এলাকাভুক্ত। বরোদা হইতে পশ্চিমাভিমুখে, প্রায় ১৩৫ ক্রোশ দূরে, এই দ্বারকা অবস্থিত। প্রাচীন দ্বারকা নগরী গুজরাটেরই অন্তর্গত পুরবন্দর নগরের প্রায় পনের ক্রোশ দক্ষিণে বিদ্যমান ছিল, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। বর্ত্তমান দ্বারকা-নগরে দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের মন্দির বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত। প্রতি বৎসর অসংখ্য যাত্রী ঐ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের পূজা দিতে গমন করেন।

হুয়েন-সাং প্রভৃতির বর্ণনায় দ্বারাবতী বা দ্বারকার নাম উল্লেখ নাই। টলেমি প্রমুখ ঐতিহাসিকগণও দ্বারকা বা দ্বারাবতী নাম উল্লেখ করেন নাই। টলেমি প্রভৃতির বর্ণনায় 'সুরাষ্ট্রীণ' (Surastrene) অর্থাৎ সৌরাষ্ট্র দেশের এবং হুয়েন-সাঙের বর্ণনায়—'কিউ-চে-লো' (Kiu-che-lo), 'ফা-লা-পি' (Fa-la-pi) ও 'সু-লা-চা' (Su-la-cha) রাজ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। প্রতীত হয়, হুয়েন-সাঙের উচ্চারণে গুর্জ্জর বা গুজরাট-রাজ্য 'কিউ-চে-লো' নামে, বল্লভী বা বলভদ্র রাজ্য * 'ফা-লা-পি' নামে এবং সুরাষ্ট্র বা সৌরাষ্ট্র-রাজ্য 'সু-লা-চা' নামে অভিহিত হইয়াছে। টলেমির এবং 'পেরিপ্লস'-গ্রন্থ-প্রণেতার বর্ণনায় বুঝা যায়, ঐ সকল দেশ 'সুরাষ্ট্রীণ' সৌরাষ্ট্র-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্লিনিও 'সুয়ারাটারাট' (Suaratarata<) অথবা ভেরেটেটে' (Varetatae) রাজ্যের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ টলেমি ও প্লিনি প্রভৃতির অনুসন্ধানে সৌরাষ্ট্র রাজ্যের প্রাধান্যই প্রতিপন্ন হয়। দ্বারাবতী প্রভৃতি লোপ পাইয়া তখন সৌরাষ্ট্র-রাজ্যই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল—ইহাই বুঝিতে পারা যায়। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন সময়ে সে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। তখন 'ফা-লা-পি' অর্থাৎ বল্লভী-রাজ্যই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন; 'কিউ-চে-লো' অর্থাৎ গুর্জ্জর এবং 'সু-লা-চা' অর্থাৎ সুরাষ্ট্র-রাজ্য—বল্লভীর প্রাধান্যই স্বীকার করিতেছে। হুয়েন-সাঙের বর্ণনা হইতে বল্লভী, গুর্জ্জর ও সৌরাষ্ট্র-দেশের অবস্থিতির একটি আভাষ পাওয়া যায়; তাহাতে প্রতীত হয়,—বর্ত্তমানে যাহা গুজরাট-উপদ্বীপ, তৎকালে তাহা বল্লভী রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। এখন যাহা রাজপুতনা, তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ প্রায় সমস্তই গুর্জ্জর-রাজ্য বলিয়া কথিত হইত; এবং সৌরাষ্ট্র বলিতে তখন কাম্বে-উপসাগরের পূর্ব্বস্থিত বিস্তীর্ণ প্রদেশকে বুঝাইত। তিন প্রদেশের তিনটি রাজধানী ছিল; তিনটি রাজ্যই বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল;

বল্লভী, গুর্জ্জর সৌরাষ্ট্র।

* বল্লভী বা বলভদ্র-রাজ্য বলরামের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে।

অথচ, তিনটি রাজ্যই যেন একসূত্রে গ্রথিত ছিল। হুয়েন সাং বল্লভী-রাজ্যের পরিধি ছয় হাজার 'লি' অর্থাৎ প্রায় এক হাজার মাইল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে হিসাবে কানিংহাম বলেন, বরোচ ও সুরাট জেলা এবং সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপ সমস্তই বল্লভীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানী বল্লভী নগরীর পরিধি, হুয়েন-সাঙের হিসাবে, ত্রিশ 'লি' অর্থাৎ পাঁচ মাইল। সে প্রাচীন বল্লভী-নগরী এখন লোপ পাইয়াছে। ডক্টর নিকলসনের মতে—বর্ত্তমান ভাওনগরের (ভগনগরের) আঠার মাইল উত্তর-পশ্চিমে 'বেল' গ্রামের নিকটে যে ভগ্ন স্তূপ দৃষ্ট হয়, তাহাই বল্লভী নগরীর ধ্বংসাবশেষ। আবুল-ফজেলের বর্ণনায় প্রকাশ,—'সিরৌজ গিরিশ্রেণীর পাদদেশে একটি প্রাচীন নগরী ধ্বংসপথে অগ্রসর। মাচিদবিন এবং ঘোগা-বন্দর ঐ নগরীর শাসনাধীন।' কানিংহাম ইহা হইতে স্থির করিয়াছেন, ঘোগা-বন্দরের দশ ক্রোশ অন্তরে যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাই বল্লভী-নগরীর শেষ স্মৃতি। 'কিউ-চে-লো' অর্থাৎ গুর্জ্জর, বল্লভীর ১৮০০ লি (প্রায় ৩০০ মাইল) উত্তরে এবং উজ্জয়িনীর ২৮০০ লি (প্রায় ৪৬৭ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল,—হুয়েন-সাং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনানুসারে গুর্জ্জরের রাজধানী 'পি-লো-মি-লো' (Pi-lo-mi-lo or Balmar) বল্লভীর ভগ্নাবশেষের ৩০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। গুর্জ্জর রাজ্যের পরিধি, হুয়েন-সাঙের হিসাবে, পাঁচ হাজার লি অর্থাৎ ৮৩৩ মাইল। তাহাতে কানিংহাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রাজপুতানার অন্তর্গত বিকানীর, যশল্মীর এবং যোধপুর পর্য্যন্ত তখন গুর্জ্জরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'সু-লাচা' অর্থাৎ সৌরাষ্ট্র তখন বল্লভীর প্রাধান্য স্বীকার করিত। উহার রাজধানী সুরাট-নগর বল্লভীর পাঁচ শত লি (প্রায় ৮৩ মাইল) পশ্চিমে 'ইউ-চেন-টা' (Yeu-chen-ta) অর্থাৎ উজ্জন্তা (অজন্তা) পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। উজ্জন্তা বা উজয়ন্ত পর্ব্বতের অপর নাম 'গিরিনার'। জুনাগড় নামক যে প্রাচীন নগর ঐ পর্ব্বতের পাদদেশে বিদ্যমান, কানিংহাম সিদ্ধান্ত করেন, ঐ নগরই সৌরাষ্ট্র দেশের তাৎকালিক রাজধানী ছিল। বল্লভীর ধ্বংসাবশেষের প্রায় ৮৭ মাইল পশ্চিমে উহা অবস্থিত। সুতরাং হুয়েন-সাঙের প্রদত্ত দূরত্বের হিসাবের সহিত উহার প্রায় ঐক্য দৃষ্ট হয়। সৌরাষ্ট্র বা সুরাট রাজ্যের পরিধি, হুয়েন-সাঙের মতে, চারি হাজার লি (প্রায় ৬৬৭ মাইল) এবং উহার পশ্চিমে 'মো-হি' নদী (মাহী নদী) বিদ্যমান। কানিংহাম তাহা হইতে নির্দ্ধারণ করেন, বল্লভী রাজধানীও এই হিসাবে সুরাটের সীমানার মধ্যে আসে। ফলতঃ সৌরাষ্ট্র, বল্লভী ও গুর্জ্জর তিনে এক এবং একে তিন, তখন প্রায় এই ভাবেই বিদ্যমান ছিল। এক এক সময়ে এক এক রাজ্যের আধিপত্য অন্যত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং সীমানাও সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে গুর্জ্জর বা গুজরাট রাজ্যই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তখন বল্লভী প্রভৃতির নাম লোপ পাইয়া গুজরাট নামেরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইতে থাকে। গুজরাটের ইতিহাসে চৌলুক্য-নৃপতিগণ এবং সোমনাথ-কাহিনী বিশেষ প্রসিদ্ধ। মামুদ গজনী কর্ত্তৃক সোমনাথ লুণ্ঠন এবং তাঁহাকে বাধা প্রদানে অগ্রসর হইয়া অসংখ্য হিন্দুর প্রাণদান,—ইতিহাসে রক্তরাগে রঞ্জিত আছে।

মগধ রাজ্য।

-:০:-

এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বহিঃ-প্রদেশেও মগধের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। সে মানচিত্র এখানে প্রকাশ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। এখানে আমরা কেবল, মগধ বলিতে অতি প্রাচীন কালের এবং আধুনিক কালের কোন স্থান মানচিত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছি।
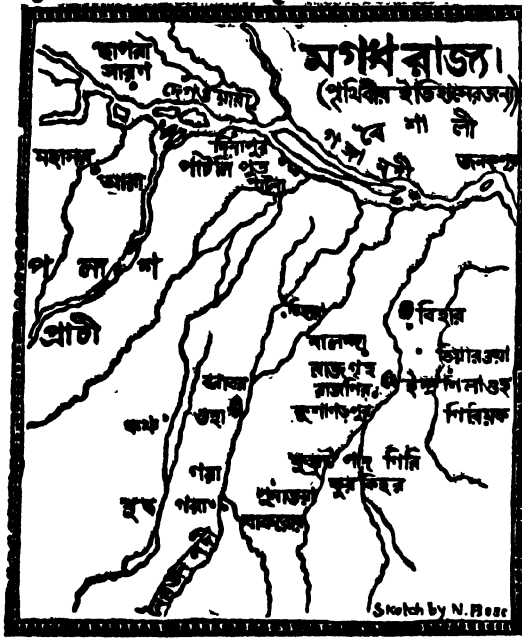
এই মানচিত্রে যে সকল স্থানের নাম চিহ্নিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি অতি প্রাচীন কালের স্মৃতি-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে; অপর কতকগুলি অধুনা প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। গয়া, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থান পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন; পাটলিপুত্র, নালন্দা, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধ প্রভাব-সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পাটনা, সারণ প্রভৃতি সে তুলনায় আধুনিক নাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

[১৬১ পৃষ্ঠা

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মগধ-রাজ্য।

[কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরবর্ত্তিকালে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অভ্যুদয়;—জরাসন্ধের পরবর্ত্তী মগধ-রাজবংশ;—সোমাপি হইতে মহানন্দী পর্য্যন্ত মগধ-রাজগণের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পরিচয় এবং তাঁহাদের শাসন-কাল;—মগধে শিশুনাগ-বংশের রাজত্ব-কালে পারিপার্শ্বিক ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের পরিচয়,—শিশুনাগ, বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ ও শাক্য প্রভৃতির রাজ্য-পরিচয়;—বিম্বিসার কর্ত্তৃক রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন,—গৌতম-বুদ্ধের আবির্ভাব; অজাতশত্রুর শাসন-পরিচয়,—পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী নির্ম্মাণ,—তৎকর্ত্তৃক ভজ্জিয়ানদিগের দমন-চেষ্টা,—ভজ্জিয়ান-দমনে গৌতম-বুদ্ধের নিকট তাঁহার মন্ত্রিদ্বয়ের পরামর্শ গ্রহণ,—বুদ্ধের ভবিষ্যবাণী,—বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোভাবের জন্য বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্ব-কালের প্রসিদ্ধি।]

ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অভ্যুদয়।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর, যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণে, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীভূত রাজ-শক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পরীক্ষিত-তনয় জনমেজয়ের বংশ, তাৎকালিক ইন্দ্রপ্রস্থে অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদৃশ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তৎকালে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত 'ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট' বলিয়া কাহারও পরিচয় পাওয়া যায় না; পরন্তু তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে অল্প-শক্তি-সম্পন্ন রাজন্যবর্গ শাসন-দণ্ড পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তাহাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেই সকল রাজ্যের মধ্যে, পরবর্ত্তি-কালে মগধ-রাজ্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হয়। পুরাণে দেখিতে পাই,—যে সময়ে ভারতবর্ষ এইরূপ বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তৎকালে মগধ-রাজ্যের দ্বাত্রিংশ জন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন; আর তাঁহাদের সমসময়ে, চতুর্ব্বিংশতি জন ঐক্ষ্বাক, সপ্তবিংশতি জন পাঞ্চাল, চতুর্ব্বিংশতি জন কাশেয়, অষ্টাবিংশতি জন হৈহয়, দ্বাত্রিংশৎ জন কলিঙ্গ, পঞ্চবিংশতি জন অশ্মক, ষড়বিংশতি জন কুরু, অষ্টাবিংশতি জন মৈথিল, ত্রয়োবিংশতি জন সুরসেন এবং বিংশতি জন বীতিহোত্র তুল্যকালে বিভিন্ন জনপদে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উচ্ছেদ-সাধনে মহানন্দী-তনয় মহাপদ্ম, কলির অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া, একছত্র প্রভাব বিস্তার করেন। মহাপদ্মানন্দ মগধ-রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন; কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের দুই হাজার সাত শত ত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। এই মহাপদ্মানন্দ-বংশের উচ্ছেদ সাধনের পর, চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহাতে নন্দ-বংশের অবসানে মগধে মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। মগধে জরাসন্ধ-বংশের শেষ নৃপতি—রিপুঞ্জয় (অরিঞ্জয়); তাঁহার মন্ত্রী সুনীক (সুনিক) তাঁহাকে হত্যা করিয়া আপন পুত্র প্রদ্যোৎকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে জরাসন্ধ হইতে অষ্টাবিংশতি জন নৃপতির রাজত্বের পর, শিশুনাগ মগধের রাজা

হন। শিশুনাগ-বংশীয় দশ জন নৃপতির শাসনকালে মহাপদ্মানন্দের শাসনাধিকার আরম্ভ হইয়াছিল।

জরাসন্ধের পরবর্ত্তী মগধাধিপতিগণের পরিচয় ও রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে অবশ্য সর্ব্বত্র ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয় না। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে,—'ভারত-যুদ্ধে জরাসন্ধ-তনয় সহদেব বিনিপাতিত হইলে, তাঁহার সোমাধি নামক এক দায়াদ গিরিব্রজের রাজা হন। তিনি পাঁচ শত আট বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।' বিষ্ণুপুরাণে, ভবিষ্য-রাজবংশের বিবরণে, দেখিতে পাই,—'জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবের সোমাপি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে এবং তাঁহার বংশ মগধের রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।' তখন, কোথায় তাঁহাদের রাজধানী ছিল, অথবা কত কাল তাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন,—বিষ্ণুপুরাণে তাহার কোনও পরিচয় নাই। কিন্তু বায়ুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—'প্রসিদ্ধ ভারত-সংগ্রামে জরাসন্ধ-পুত্র সহদেব নিপাতিত হইলে, তৎপুত্র রাজর্ষি সোমাধি গিরিব্রজের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি অষ্ট-পঞ্চাশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রুতশ্রবা চতুঃষষ্টি বৎসর, শ্রুতশ্রবার পুত্র অযুতায়ু ষড়বিংশতি বর্ষ, তৎপুত্র নিরামিত্র এক শত বর্ষ, তৎপুত্র সুকৃত্য ষট্পঞ্চাশৎ বর্ষ, এবং তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা ত্রয়োবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। বৃহৎকর্ম্মার পুত্র (নাম উল্লেখ নাই) সংপ্রতি মগধ-রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনিও ত্রয়োবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করিবেন। ইঁহার পুত্র শ্রুতঞ্জয় চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ, তৎপুত্র মহাবাহু পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, তৎপুত্র সুচী অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষ, তৎপুত্র ক্ষেম অষ্টাবিংশতি বর্ষ, তৎপুত্র ভুবন চতুঃষষ্টি বর্ষ, তৎপুত্র ধর্ম্মনেত্র পঞ্চ বর্ষ, তৎপুত্র সুব্রত অষ্টত্রিংশৎ বর্ষ, তদনন্তর দৃঢ়সেন অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষ, সুমতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ষ, সুবল দ্বাবিংশতি বর্ষ, সুনেত্র চত্বারিংশৎ বর্ষ, সত্যজিৎ ত্র্যশীতিবর্ষ, বীরজিৎ পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ এবং সর্ব্বশেষে অরিঞ্জয় পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজ্যভোগ করিবেন। এইরূপে বৃহদ্রথ হইতে দ্বাত্রিংশৎ জন নরপতি পর পর প্রাদুর্ভূত হইয়া পূর্ণ এক সহস্র বর্ষ মহীপালনে ব্রতী রহিবেন।' এই সকল নৃপতির নাম ও রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে আবার অন্যরূপ লিখিত আছে,—'সোমাধি পাঁচ শত আট বৎসর কাল, শ্রুতঃশ্রবা চতুঃষষ্টি বৎসর, অপ্রতীপ পঞ্চবিংশতি বৎসর, নিরমিত্র চত্বারিংশৎ বৎসর, সুরক্ষ পাঁচ শত আট বৎসর, বৃহৎকর্ম্মা ত্রয়োবিংশতি বৎসর, সেনাজিৎ পঞ্চ শত বৎসর, শ্রুতঞ্জয় চত্বারিংশৎ বৎসর, বিভু অষ্টাবিংশতি বৎসর, সুচী চতুঃষষ্টি বৎসর, ক্ষেম অষ্টাবিংশতি বৎসর, অনুব্রত ষষ্টি বৎসর, সুনেত্র পঞ্চবিংশতি বৎসর, নির্ব্বৃত্তি অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসর, ত্রিনেত্র অষ্টাবিংশতি বৎসর, দ্যুমৎসেন চত্বারিংশৎ বৎসর, মহীনেত্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর, অচল দ্বাত্রিংশৎ বৎসর এবং রিপুঞ্জয় পঞ্চাশৎ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।' মৎস্যপুরাণ মগধরাজ-বংশের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া, পরিশেষে বলিয়াছেন,—"দ্বাত্রিংশতি নৃপাহ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথাঃ। পূর্ণং বর্ষ সহস্রন্তু তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি॥" বায়ুপুরাণও বলিয়াছেন,—"দ্বাত্রিংশচ্চ নৃপাহ্যেতে ভাবতারো বৃহদ্রথাৎ। পূর্ণং বর্ষ সহস্রং বৈ তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি॥" নৃপতি-সংখ্যা এবং তাঁহাদের রাজত্ব-কালের পরিমাণ-

মগধের রাজগণ।

বিষয়ে উভয় পুরাণের শ্লোকদ্বয়ে ঐকমত্য থাকিলেও, প্রসঙ্গোক্ত বিষয়ের সর্ব্ব-সামঞ্জস্য করা সুকঠিন। তবে ইহাতে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যায়,—বৃহদ্রথ-বংশে (জরাসন্ধের পিতার নাম—বৃহদ্রথ) রিপুঞ্জয় (অরিঞ্জয়) পর্য্যন্ত দ্বাত্রিংশৎ জন নৃপতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে যে অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়,—সোমাপি (সোমাধি) হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত অষ্টাদশ জন (বায়ুপুরাণে একবিংশতি জন) নৃপতি মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রাজত্ব-কালের পরিমাণ—মৎস্য-পুরাণের মতে দুই হাজার এক শত চুয়াল্লিশ বৎসর এবং বায়ুপুরাণের মতে নয় শত তের বৎসর। এতদুভয় উক্তিতে বিষম অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং সর্ব্ব-সামঞ্জস্য বিধানার্থ আমরা দ্বিবিধ পন্থা অবলম্বন করিতে পারি। প্রথমতঃ, পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ বা একবিংশতি জন নৃপতি ব্যতীত আরও চতুর্দ্দশ বা একাদশ জন নৃপতি মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রাজত্ব-কালের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর ছিল। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বোক্ত নৃপতিগণ ভিন্ন আরও বত্রিশ জন নৃপতির সহস্র বৎসর রাজত্ব-কাল সম্ভবপর। এই-রূপে, মৎস্যপুরাণের মতে,—'জরাসন্ধ-পৌত্র সোমাধি হইতে বৃহদ্রথ-বংশের শেষ নৃপতি রিপুঞ্জয়ের রাজত্ব-কাল পরিমাণ—তিন হাজার এক শত চুয়াল্লিশ বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। মৎস্যপুরাণের মতে,—পুলক কর্ত্তৃক বৃহদ্রথ-বংশ নিপাতিত হয়। তদানীন্তন নিজ প্রভুকে হত্যা করিয়া, পুলক স্বীয় পুত্রকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পুলক-তনয় ত্রয়োবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি কপটাচারী ছিলেন বলিয়া, সামন্তগণ তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিতেন না। মৎস্যপুরাণ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। পুলকের পর পালক অষ্টাবিংশতি বৎসর, বিশাখযূপ ত্রিপঞ্চাশৎ বৎসর এবং সূর্য্যক একবিংশতি বৎসর রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। সূর্য্যক আপন পুত্রকে বারাণসীর রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া, স্বয়ং গিরিব্রজের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার পর শিশুনাগ চত্বারিংশ বৎসর এবং তৎসুত কাকবর্ণ ষড়্‌বিংশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। তৎপরে ক্ষেমধামা ষট্‌চত্বারিংশ বৎসর, ক্ষেমজিৎ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর, বিন্ধ্যসেন অষ্টাবিংশতি বৎসর, কাণ্বায়ন নয় বৎসর, ভূমিমিত্র চতুর্দ্দশ বৎসর, অজাতশত্রু সপ্তবিংশতি বৎসর, বংশক চতুর্ব্বিংশতি বৎসর, উদাসী ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর, নন্দীবর্দ্ধন চত্বারিংশৎ বৎসর, এবং মহানন্দী ত্রিচত্বারিংশৎ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ুপুরাণে দেখিতে পাই,—"বৃহদ্রথ-বংশের অবসানে বীতিহোত্র বংশের অভ্যুদয় হয়। তৎকালে মুনিক নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারী স্বীয় প্রভু রাজা প্রদ্যোৎকে নিহত করিয়া, তাঁহার পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। প্রদ্যোৎ-পুত্র কোনও নীতিবিগর্হিত কার্য্য করেন না। সুতরাং সমস্ত সামন্ত-নরপতি তাঁহার নিকট প্রণত ছিলেন। তিনি ত্রয়োবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। অনন্তর রাজা পালক চতুর্ব্বিংশতি বৎসর, বিশাখযূপ পঞ্চবিংশতি বৎসর, অজক একত্রিংশ বৎসর, অজক-পুত্র বর্ত্তিবর্দ্ধন বিংশতি বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া-ছিলেন। প্রদ্যোৎ-বংশীয় পঞ্চ রাজকুমার ক্রমান্বয়ে এক শত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রদ্যোৎ-বংশের যশঃপ্রভা পরিম্লান করিয়া, শিশুনাক নামক

অনেক রাজা গিরিব্রজে রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র বারাণসী-প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি চত্বারিংশৎ বর্ষ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র শুকবর্ণ ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ, তৎপরে ক্ষেমবর্ম্ম বিংশতি বর্ষ, অজাতশত্রু পঞ্চবিংশতি বর্ষ, ক্ষত্রোজা চত্বারিংশৎ বর্ষ, রাজা বিবিসার অষ্টাবিংশতি বৎসর, রাজা দর্শক পঞ্চবিংশতি বর্ষ এবং উদায়ী ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। আপনার রাজত্ব-কালের চতুর্থ বর্ষে রাজা উদায়ী গঙ্গার দক্ষিণ উপকূলে কুসুমপুর পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উদায়ীর পর রাজা নন্দীবর্দ্ধন দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষ এবং তৎপরে নরপতি মহানন্দী দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষ রাজত্ব করেন। এইরূপে শিশুনাগ-বংশীয় দশ জন রাজা সমষ্টিতে তিন শত বাষট্টি বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সকল রাজার রাজত্ব-কালে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অনেক রাজার অভ্যুদয় হইয়াছিল। তখন, ইক্ষ্বাকু-বংশের চতুর্ব্বিংশতি, পাঞ্চাল-দিগের পঞ্চবিংশতি, কালকদিগের চতুর্ব্বিংশতি, হৈহয়-দিগের চতুর্ব্বিংশতি, কলিঙ্গ-দিগের দ্বাত্রিংশৎ, শক-দিগের পঞ্চবিংশতি, কুরু-দিগের ষট্‌ত্রিংশৎ, মৈথিল-দিগের অষ্টাবিংশতি, সুরসেন-দিগের ত্রয়োবিংশতি এবং বীতিহোত্র-দিগের বিংশতি জন মহীপতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজার অবসানে, রাজা মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম রাজা হন। বহুকাল পরে তিনিই ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তিনি অষ্টাবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।” কিন্তু মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে,- “ইত্যেতে ভবিতারো বৈ দশ দ্বৌ শিশুনাকজা। শতানি ত্রিণি পূর্ণানি ষষ্টির্বর্ষাধিকানি তু।” অর্থাৎ, শিশুনাক-বংশীয় দ্বাদশ জন নৃপতি পূর্ণ তিন শত ষাট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণ-বর্ণিত অংশে শিশুনাকের বংশে কাকবর্ণ হইতে মহানন্দী পর্য্যন্ত একাদশ জন নৃপতির নাম এবং তিন শত চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব-কালের পরিচয় পাইতেছি। সুতরাং তিন শত ষাট বৎসর শাসন-কাল এবং দ্বাদশ জন শিশুনাক-বংশীয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে, একজন নৃপতি এবং তাঁহার ছাপ্পান্ন বৎসর শাসন-কাল বাদ পড়িয়াছে—মানিয়া লইতে হয়। যাহা হউক, শিশুনাক-বংশীয় নৃপতি মহানন্দীর রাজ্যাবসানে মহাপদ্মানন্দ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাণ্ডব-বংশের একছত্র অধিকার লোপের পর, তিনিই প্রথম 'ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

মাগধ রাজ-বংশের এই পরিচয়-প্রসঙ্গে, মৎস্যপুরাণের সহিত বিষ্ণুপুরাণের, শ্রীমদ্ভাগবতের, বায়ুপুরাণের এবং ভবিষ্যপুরাণের কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সে পার্থক্যের প্রধান কারণ—পাঠ-বিকৃতি। দৃষ্টান্ত-স্থলে, সোমাপি, বিন্দুসার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে পারি। বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সহদেব-পুত্রের নাম—সোমাপি; মৎস্যপুরাণে ও বায়ুপুরাণে তিনি সোমাধি নামে অভিহিত হইয়াছেন। এদিকে আবার, তাঁহার বংশ-সম্বন্ধেও মত-পার্থক্য দেখিতে পাই। বিষ্ণুপুরাণে যিনি বিম্বসার, বায়ুপুরাণে তিনি বিবিসার, অন্যত্র তিনি বিন্দুসার, এবং মৎস্যপুরাণে তাঁহার নামই প্রকাশ নাই। তবে মৎস্যপুরাণে শিশুনাক-বংশে, অধস্তন পঞ্চম পুরুষে, বিন্ধ্যসেন নামে একজন নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়। তিনিই বিম্বসার বা বিন্দুসার কি না,—কে নির্ণয় করিবে?

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে মগধ-রাজ-বংশ।

যাহা হউক, আমরা ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ হইতে জরাসন্ধের পরবর্ত্তী মাগধ নৃপতিগণের নাম ও শাসন-কাল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে এ তত্ত্ব বিশদীকৃত হইতে পারে।

মৎস্যপুরাণে	শাসন-কাল।	বায়ুপুরাণে	শাসন-কাল।	বিষ্ণুপুরাণে।	শ্রীমদ্ভাগবতে।
সোমাধি	৫০৮ বর্ষ	সোমাধি	৫৮ বর্ষ	সো[illegible]পি	মার্জ্জারি
শ্রুতশ্রবা	৬৪ „	শ্রুতশ্রবা	৬৪ „	শ্রুতবান	শ্রুতশ্রবঃ
অপ্রতীপ	৩৫ „	অযুতায়ু	২৬ „	অযুতায়ু	যুতায়
নিরমিত্র	৪০ „	নিরামিত্র	১০০ „	নিরা[illegible]ত্র	নিরমিত
সুরক্ষ	৫০৮ „	সুকৃতা	৫৬ „	সুক্ষত্র	সুনক্ষত্র
বৃহৎকর্ম্মা	২০ „	বৃহৎকর্ম্মা	২৩ „	বৃহৎকর্ম্মা	বৃহৎসেন
সেনজিৎ	৫০০ „	(পুত্র)	২৩ „	সেনজিৎ	কর্ম্মজিৎ
শ্রুতঞ্জয়	৫০ „	শ্রুতঞ্জয়	২৪ „	শ্রুতঞ্জয়	সুতঞ্জয়
বিভু	২৮ „	মহাবাহু	২৫ „	বিপ্র	বিপ্র
সুচী	৬৪ „	শুচি	৫৮ „	শুচি	শুচি
ক্ষেম	২৮ „	ক্ষেম	২৮ „	ক্ষেমা	ক্ষেম
অনুব্রত	৬০ „	ভুবন	৬৪ „	সুব্রত	সুব্রত
সু[illegible]নত্র	২৫ „	ধর্ম্মনেত্র	৫ „	ধর্ম্ম	ধর্ম্মসূত্র
নির্ব্বৃতি	৫৮ „	সুব্রত	৩৮ „	সুশ্রম	সম
ত্রিনেত্র	২৮ „	দৃঢ়সেন	৫৮ „	দৃঢ়সেন	দ্যুমৎসেন
দ্যুমৎসেন	৪০ „	সুমতি	৩৩ „	সুমতি	সুমতি
মহীনেত্র	৩৩ „	সুবল	২২ „	সুবল	সুবল
অচল	৩২ „	সুনেত্র	৪০ „	সুনীতি	সুনীথ
রিপুঞ্জয়	৫০ „	সত্যজিৎ	৮৩ „	সত্যজিৎ	সত্যজিৎ
দ্বাত্রিংশ পুরাণে	১০০০ বর্ষ	বীরজিৎ	৩৫ „	বিশ্বজিৎ	বিশ্বজিৎ
	৩১৪৪ বর্ষ	অরিঞ্জিৎ	৫০ „	রিপুঞ্জয়	রিপুঞ্জয়

বিষ্ণুপুরাণে এই বার্হদ্রথ-বংশীয় রাজগণের শাসন-কাল সহস্র বর্ষ বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সোমাপির ভ্রাতার নাম মার্জ্জারি এবং তাঁহা হইতেই মাগধ-নৃপতিগণের বংশ-পর্য্যায় গণনা করা হইয়াছে। হরিবংশে এবং অগ্নিপুরাণে সোমাপির পরিবর্ত্তে উদাপি নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে বৃহদ্রথ-বংশে জরাসন্ধের নামই দেখিতে পাওয়া যায় না। বার্হদ্রথ-বংশের অবসানে বিষ্ণুপুরাণে প্রদ্যোৎ-বংশীয় এবং মৎস্যপুরাণে পুলক-বংশীয় নৃপতিগণের পরিচয় দেখিতে পাই। মৎস্যপুরাণে রিপুঞ্জয়ের হত্যাকারীর নাম—পুলক; বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার নাম—সুনিক; আর বায়ুপুরাণে তাঁহার নাম—মুনিক। উভয় বংশের (পুলক-বংশের এবং প্রদ্যোৎ-বংশের) পরিচয় তিন পুরাণে ত্রিবিধরূপ লিখিত আছে।

মৎস্য-পুরাণে	শাসন কাল।	বায়ুপুরাণে	শাসন কাল।	বিষ্ণুপুরাণে
পুলকতনয়	২৩ বর্ষ	প্রদ্যোৎ	১৫ বর্ষ	প্রদ্যোৎ
পালক	২৮ বর্ষ	তৎপুত্র	২৩ বর্ষ	পালক
বিশাখযূপ	৫৩ বর্ষ	পালক	২৭ বর্ষ	বিশাখযূপ
সূর্য্যক	২১ বর্ষ	বিশাখযূপ	২৫ বর্ষ	জনক
	১২৫ বর্ষ	অজক	৩১ বর্ষ	নন্দীবর্দ্ধন
		বর্ত্তিবর্দ্ধন	২০ বর্ষ	

এ হিসাবে, মৎস্যপুরাণের মতে চারি জন নৃপতি এক শত পচিশ বৎসর, এবং বায়ুপুরাণের মতে ছয় জন নৃপতি এক শত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের

মতে, নৃপতির সংখ্যা—পাঁচ জন; এবং তাঁহারা এক শত আটত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণের হিসাবে, মৎস্যপুরাণে এক জন নৃপতির নাম বাদ পড়িয়াছে; কিন্তু সমষ্টিতে শাসন-কাল মিলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, পরস্পরের অসামঞ্জস্য—উপরি-উদ্ধৃত তালিকা-দৃষ্টেই প্রতীত হইবে। মৎস্যপুরাণের পুলক, বায়ুপুরাণের মুনিক এবং বিষ্ণু-পুরাণের সুনিক—একই ব্যক্তি সম্ভবপর; অপিচ, মৎস্যপুরাণের পুলক-পুত্র এবং বিষ্ণুপুরাণের ও বায়ুপুরাণের প্রদ্যোৎ অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইতে পারে। সূর্য্যপ, অজক ও জনক সম্বন্ধেও সেই সিদ্ধান্তই সম্ভবপর নহে কি? নন্দীবর্দ্ধন ও বর্ত্তিবর্দ্ধন—একই ব্যক্তি কি না, কে বলিতে পারে? অতঃপর, শিশুনাগ (শিশুনাক) বংশ। শিশুনাগ-বংশের নাম ও শাসন-কাল সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে নানারূপ পরিচয় পাওয়া যায়। পালি-ভাষায় লিখিত সিংহল-দ্বীপে প্রচলিত 'মহাবংশ' নামক গ্রন্থে তাঁহাদের রাজ্য-কালের ও নামের যেরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, বিষ্ণুপুরাণের, বায়ুপুরাণের ও মৎস্যপুরাণের তালিকার সহিত তাহার অনেক অসামঞ্জস্য। নিম্নে সেই সকল গ্রন্থ হইতে শিশুনাগ-বংশের পরিচয় প্রদান করিলাম।

মৎস্যপুরাণে	শাসন-কাল।	বায়ুপুরাণে	শাসন-কাল।	মহাবংশে	শাসন-কাল।	বিষ্ণুপুরাণে
শিশুনাগ	৪০ বৎ	শিশুনাক	৪০ বৎ	শিশুনাগ	২৫ বর্ষ	শিশুনাগ
কাকবর্ণ	২৬ "	শুকবর্ণ	৩৬ "	কাকবর্ণ	২৫ "	কাকবর্ণ
ক্ষেমধামা	৩৬ "	ক্ষেমবর্ম্মা	২০ "	ক্ষেমধর্ম্ম	২৫ "	ক্ষেমধর্ম্মা
ক্ষেমাজিৎ	২৪ "	অজাতশত্রু	২৫ "	ভারতীয়	২৫ "	ক্ষত্রৌজা
বিন্ধ্যসেন	২৮ "	ক্ষত্রৌজা	৪০ "	বিম্বিসার	৫২ "	• বিম্বসার
কাণ্বায়ন	৯ "	বিবিসার	২৮ "	অজাতশত্রু	২০ "	অজাতশত্রু
ভূমিমিত্র	১৪ "	দর্শক	২৫ "	উদয়ভদ্রক	১৬ "	দর্ভক
অজাতশত্রু	২৭ "	উদায়ী	৩৩ "	অনুরাধক, মুণ্ড	৮ "	উদয়াশ্ব
		নন্দীবর্দ্ধন	৪২ "	নাগদশক	২৪ "	
বংশক	২৪ "	মহানন্দী	৪৩ "	দ্বিতীয় শিশুনাগ	১৮ "	নন্দীবর্দ্ধন
উদাসী	৩৩ "		———	কালাশোকমহানন্দ	২৮ "	মহানন্দী
নন্দীবর্দ্ধন	৪০ "		৩৩২ বৎ	সুধমানন্দ	২২ "	———
মহানন্দী	৪৩ "			নবনন্দ	২২ "	মোট ৩৬২ বর্ষ।
	৩৪২ বৎ				৩২২ বর্ষ	

বিষ্ণুপুরাণের মতে, শিশুনাগ-বংশীয় দশ জন ভূমিপাল তিন শত বাষট্টি বৎসর কাল রাজত্ব করেন। বায়ুপুরাণের তালিকায় দশ জন নৃপতির নাম এবং তাঁহাদের রাজত্ব-কালের পরিমাণ তিন শত বত্রিশ বৎসর পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ুপুরাণে আরও লিখিত আছে,—শিশুনাক-বংশীয় নৃপতিগণ তিন শত বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, কোনও নৃপতির রাজত্ব-কাল-পরিমাণ অধিক ছিল বলিয়া প্রতীত হয়। অথবা, এক জন নৃপতির নাম এবং তাহার শাসন-কাল ত্রিশ বৎসর বাদ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। মৎস্যপুরাণের হিসাবে, শিশুনাগ-বংশীয় নৃপতিগণের সংখ্যা—একাদশ জন, এবং

তাঁহাদের শাসন-কাল—তিন শত চৌদ্দ বৎসর। কিন্তু শিশুনাগকে তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত করিলে, সংখ্যায় দ্বাদশ এবং শাসন-কাল তিন শত বিয়াল্লিশ বৎসর হয়। মহাবংশে শিশুনাগ-বংশের চৌদ্দ জন নৃপতির তিন শত বাইশ বৎসর শাসন কাল দৃষ্ট হয়। এদিকে আবার, পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি,—মৎস্যপুরাণে শিশুনাগ-বংশের মোট শাসন-কাল তিন শত বিয়াল্লিশ বৎসর এবং বিষ্ণুপুরাণে ও বায়ুপুরাণে তিন শত বাষট্টি বৎসর।

মগধ ও অন্যান্য রাজা।

সহদেব-পুত্র সোমাপির রাজ্য-প্রাপ্তির তিন হাজার দুই শত উনষাট অথবা তিন হাজার দুই শত বিরাশী বৎসর পরে, শিশুনাগ মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। * শিশুনাগ-বংশ তিন শত বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। শিশুনাগ-বংশীয় মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভে মহাপদ্মানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এবং তাঁহার সুকল্পাদি আট পুত্র (বায়ুপুরাণের মতে, দ্বাদশ পুত্র—ছিয়ানব্বই বৎসর) এক শত বৎসর মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহাদিগের উচ্ছেদ-সাধনে, কৌটিল্যের সহায়তায়, চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সেই হইতেই মগধে মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠা। তবেই বুঝা যায়,—সহদেব-পুত্র সোমাপির রাজ্য-প্রাপ্তির তিন হাজার সাত শত বিয়াল্লিশ বৎসর পরে, চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। † কিন্তু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির কাল—তিন শত বার পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে তিন শত কুড়ি পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডার (সেকেন্দার সাহ) ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের বহু গ্রন্থ-পত্রে লিপিবদ্ধ আছে। সেই সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই সাধারণতঃ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির কাল-নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। এ হিসাবে বুঝিতে পারা যায়,—সহদেব-পুত্র সোমাপি, খৃষ্ট-জন্মের চারি হাজার বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ‡ কুরুক্ষেত্রের মহাসমর তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ঘটনা। সুতরাং খৃষ্ট-জন্মের কত বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল,—ইহাতেও বুঝিয়া দেখুন।

বিম্বিসারের সম-সময়ে।

যাহা হউক, সোমাপি হইতে আরম্ভ করিয়া, শিশুনাগ-বংশীয় বিম্বসার এবং অজাতশত্রুর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের অনেকেরই তাদৃশ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইতিহাসে বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর নাম বিশেষরূপ প্রসিদ্ধ। রাজা বিম্বিসার রাজগৃহে মগধের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী পরিবর্ত্তনের কারণ—বিদেহ ক্ষত্রিয়গণের মগধাক্রমণ। বিম্বিসারের রাজত্ব-কালে মিথিলায় বিদেহ-ক্ষত্রিয়গণ কিছু পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে মগধ-

* মৎস্যপুরাণ-মতে বার্হদ্রথ-বংশের রাজত্বকাল (১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ৩১৪৪ বৎসর, পুলক-বংশের রাজত্ব-কাল (১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ১২৫ বৎসর শিশুনাগ-বংশের রাজত্ব আরম্ভ হইলে, ৩১৪৪+১২৫=৩২৫১ বৎসর হয়। এদিকে আবার প্রদ্যোৎবংশের শাসন-কাল সম্বন্ধে বায়ুপুরাণের ও বিষ্ণুপুরাণের মত গ্রহণ করিলে (১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তৎসংযোগে আরও তেইশ বৎসর বাড়িয়া যায়; এবং ৩৭৪২ বৎসর হইয়া দাঁড়ায়।

† সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় ৩১৪৪ বৎসর, প্রদ্যোৎ-বংশ ১৩৮ বৎসর, শিশুনাগ বংশ ৩৬২ বৎসর, মহাপদ্মানন্দ ও তাঁহার পুত্রগণ ১০০ বৎসর,—একুনে এই ৩৭৪২ বৎসর ধরা যাইতে পারে।

‡ ৩২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের বিদ্যমানতা এবং তাহার ৩৭৪২ বৎসর পূর্ব্বে সোমাপির রাজ্য-প্রাপ্তি-কাল ইহাতে খৃষ্টজন্মের ৪০৬২ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা হইয়া দাঁড়ায় না কি?

রাজ্য আক্রমণ করিতেন। তাঁহাদের সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত গঙ্গা ও শোণ * নদীর সঙ্গম-স্থলে, রাজগৃহ-নগর সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করিয়া, বিম্বিসার † তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ গিরিব্রজে মগধের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; বিম্বিসারের রাজত্ব-কালে সেই রাজধানী রাজগৃহে স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমানে দক্ষিণ-বিহার বলিয়া যে প্রদেশ অভিহিত, তৎকালে সেই প্রদেশ মগধ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গঙ্গার দক্ষিণ উপকূল হইতে শোণ নদীর উভয় তীর পর্য্যন্ত সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল,—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন গঙ্গার উত্তরভাগে লিচ্ছবিগণ মাগধগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে রাজগৃহে যেমন বিম্বিসারের রাজধানী ছিল, গঙ্গার উত্তর-ভাগে বৈশালী নগরীতে সেইরূপ লিচ্ছবিগণের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকে তখন অঙ্গ (পূর্ব্ব-বিহার) রাজ্য,—'চম্পা' (বর্ত্তমান ভাগলপুরের সন্নিকটস্থ) তাহার রাজধানী; উত্তর-পশ্চিমে কোশল-রাজ্য,—অযোধ্যা হইতে আরও উত্তর ভাগে শ্রাবস্তী'-নগরী তাহার রাজধানী। বিম্বিসারের সমসময়ে রাজা প্রসেনজিৎ সেই কোশল-রাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। দক্ষিণের কাশীরাজ্য তখন কোশল-রাজ্যেরই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনজিতের প্রতিনিধি বারাণসী-প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। কোশল-রাজ্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বভাগে সমধর্ম্মাবলম্বী দুইটী জাতি বাস করিত। তাহাদের নাম—শাক্য ও কোলীয়। রোহিণী নাম্নী স্রোতস্বিনীর উভয় তীরে ঐ দুই জাতি বসতি করিতেছিল। যদিও তাহারা স্বাধীন বলিয়া পরিচিত ছিল, কিন্তু মগধ ও কোশলের প্রভু-শক্তির নিকট সর্ব্বদাই তাহাদিগকে সঙ্কুচিত থাকিতে হইত। শাক্যদিগের রাজধানীর নাম—কপিলাবস্তু। শাক্যকুলপতি শুদ্ধোদন তথায় রাজত্ব করিতেন। তৎকালে কোলীয়গণের সহিত শাক্য-বংশের সৌহার্দ্দ ছিল। রাজা শুদ্ধোদন, কোলীয়-বংশের দৌহিত্রীকে বিবাহ করিয়া, উভয় জাতির মধ্যে প্রীতি-বন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন। কোলীয়গণের নৃপতির নাম—সুভূতি; 'দেবদহো' নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। অন্য দিকে, ইন্দ্রপ্রস্থে (বর্ত্তমান দিল্লীর সন্নিকটে), কুরু-বংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্য তখন নানা জনপদে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দূর অতীতে ত্রেতায় দেখিতে পাই, শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব-কালে সমগ্র দাক্ষিণাত্য—লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত—অযোধ্যার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। তৎপরে দ্বাপরে যদুবংশ দ্বারকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকা-পুরী সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হয়। পরবর্ত্তি-কালে গুজরাটের সৌরাষ্ট্র এবং দাক্ষিণাত্যের চৌলুক্য নৃপতিগণ বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। তখন আর আর যে সকল রাজা দাক্ষিণাত্যে

* শোণ-নদী তৎকালে 'হিরণ্যবাহ' নামে অভিহিত হইত। গ্রীকগণ উহাকে "ইরান্নোবোয়াস" (Erannoboas) বলিতেন। এতৎসম্বন্ধে সার উইলিয়ম জোন্‌স্ বলেন,—"I found in classical Sanskrit nearly 2990 years old that Hiranyabahu which the Greeks changed into Erannoboas, was in fact another names for the Sone itself."—Sir William Jones, *Asiatic Researches*.

† বিম্বিসারের অপর নাম—শ্রেণিক। বিষ্ণুপুরাণে তিনি বিন্ধ্যসার, বায়ুপুরাণে বিন্দিসার এবং বৌদ্ধদিগের "মহাবস্তু অবদান" প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি বিম্বিসার নামে পরিচিত আছেন।

বিদ্যমান ছিল, যথাস্থানে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইবে। ফলতঃ বিম্বিসার যখন মগধে রাজত্ব করিতেন, আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য—উভয়ত্রই তখন ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

বিম্বিসারের লোকান্তরের পর, তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কথিত হয়, আপনার পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া তিনি সিংহাসন লাভ করেন। অজাতশত্রু বহু দূর পর্য্যন্ত আপন রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। কোশল এবং পশ্চিম-ভারতের বহু রাজ্য তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তুরাণীয় বংশজ ভজ্জিয়ানগণ হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, এই সময়ে উত্তর-বিহারে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আপনাদিগের অধিকৃত দেশে সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহারা বলদর্পে গরীয়ান হন, এবং মগধের প্রতি নিয়ত লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আপন রাজ্যের সমধিক দৃঢ়তা-সম্পাদনার্থ এবং ভজ্জিয়ান জাতিকে দমনে রাখিবার অভিপ্রায়ে, অজাতশত্রু রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। অজাতশত্রু 'বিদেহী-পুত্র' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। বিদেহ-রাজ-কন্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এবং তাঁহার পিতা বিদেহ-রাজকন্যার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন —ইহাতে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ভাষাকর এবং সুনিধ নামে অজাতশত্রুর দুই জন মন্ত্রী ছিলেন। অজাতশত্রু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভজ্জিয়ানদিগের মূলোচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প হইলে, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ভাষাকর তদ্বিষয়ে গৌতম বুদ্ধের পরামর্শ লইতে যান। অজাতশত্রুর পিতা বিম্বিসারের রাজত্বকালে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অজাত-শত্রুর শাসনকালে গৌতম-বুদ্ধের যশঃজ্যোতি দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধদেব রাজগৃহের অনতিদূরে গৃধ্রকূট গিরিগুহায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভাষাকর তাঁহার নিকট ভজ্জিয়ানগণের সংহার-সাধনের জন্য পরামর্শপ্রার্থী হন। গৌতমবুদ্ধ তাহাতে উপদেশ দেন,—'ভজ্জিয়ানগণ যতদিন পর্য্যন্ত একতা-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া আপনাদের প্রাচীন রীতিনীতি মান্য করিয়া চলিবে, ততদিন তাহাদের ধ্বংসসাধন অসম্ভব। পরন্তু তাহারা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।' এই ভজ্জিয়ানদিগকেই অনেকে প্রাচীন 'লিচ্ছবি' জাতি বলিয়া অনুমান করেন। অজাতশত্রু যখন পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী স্থাপন করেন, পাটলিপুত্র তখন ক্ষুদ্র একটী গ্রাম ছিল; তখন উহা 'পাটলিগ্রাম' নামে অভিহিত হইত। সুনিধ এবং ভাষাকর নামক অজাতশত্রুর মন্ত্রিদ্বয়ের উদ্যোগে, সেখানে দুর্গপ্রাকারাদি নির্ম্মিত হয়। মন্ত্রিদ্বয় কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া গৌতম-বুদ্ধ যখন ঐ নগরে আগমন করেন, আপন পারিষদ আনন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন,— 'এই পাটলিপুত্র-নগর কালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এ নগর বণিকগণের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইবে;—এ নগর সর্ব্বদা জনকোলাহল মুখরিত থাকিবে।' গৌতম বুদ্ধের এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্ত্তিকালে বর্ণে বর্ণে সার্থক হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজধানী-রূপে পাটলিপুত্র কি গৌরবে গৌরবান্বিত হয় এবং কত

অজাতশত্রু।

সহস্র সহস্র বৎসর তাহা ভারতের রাজধানী-মধ্যে পরিগণিত ছিল, অতীত-সাক্ষী ইতিহাস তাহার অসংখ্য প্রমাণ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ পাটনা-নগরী আজিও সে পরিচয় প্রদান করিতেছে। অজাতশত্রুর ও বিম্বিসারের রাজত্বকাল—গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোভাবের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। বিম্বিসারের রাজত্বকালে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং অজাতশত্রুর রাজত্বকালে তাঁহার তিরোভাব হয়। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যে, পরবর্ত্তিকালে ঐ নগরীর প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি অশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যে সময়ে মগধ-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন মগধ-রাজ্য ক্রমশঃ ধ্বংস-পথে অগ্রসর হইতেছিল। মগধের প্রাচীন রাজধানী পাটলিপুত্র নগরীর পূর্ব্বগৌরব তখন বিলুপ্তপ্রায়। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি রাজচক্র-বর্ত্তিগণের লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে, মগধের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া আসিয়াছিল। হুয়েন-সাং 'ব্রিজি' ও নেপাল-পরিদর্শন করিয়া মগধ-রাজ্যে পাটলিপুত্র নগরে উপনীত হন। তিনি যখন মগধ-রাজ্যে প্রবেশ করেন, মগধে তখন পঞ্চাশটি বৌদ্ধ-মঠ বিদ্যমান ছিল, এবং সেই সকল মঠে সর্ব্বসাকুল্যে দশ সহস্র মাত্র বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করিতেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—তিনি যখন মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে উপনীত হন, যদিও তখন উহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল; তথাপি উহার বিস্তৃতি তখনও ৭০ লির (অর্থাৎ প্রায় ১১৸৵০ মাইলের) কম ছিল না। হুয়েন-সাং দেখিয়াছিলেন, পাটলিপুত্র নগরের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য মঠ, স্তূপ এবং বৌদ্ধ-মন্দির-সমূহের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান ছিল। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়, প্রাচীন কালে পাটলিপুত্র নগরী 'কুসুমপুর' নামে অভিহিত হইত। পাটলিপুত্র নগরের কুসুমপুর নামে অভিহিত হওয়া সম্বন্ধে তৎকালে একটি আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু পরিব্রাজকের বর্ণনায় সে আখ্যায়িকা উল্লিখিত হয় নাই। হুয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ সময়ে মগধের অন্তর্গত প্রায় প্রতি বৌদ্ধ-তীর্থক্ষেত্রে সম্বন্ধে এক একটি জনপ্রবাদ শুনা যাইত। সেই সকল তীর্থক্ষেত্রে, দেশাধিপতির সমক্ষে, ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণের মধ্যে, ধর্ম্মবিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিত। যে পক্ষ বিচার-বিতর্কে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইতেন, দেশপতি রাজা তাঁহাকে নগর-গ্রাম পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিতেন। কোনও কোনও স্থলে, পরাজিত ব্যক্তি বিজয়ীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াও ইহজীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে, এই সময় মধ্যভারতের গুণমতি নামা জনৈক বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারক, সাঙ্খ্য-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মাধব নামা জনৈক ব্রাহ্মণকে তর্কে পরাজিত করিয়া, তাৎকালিক রাজার নিকট হইতে দুই খানি গ্রাম উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।* যাহা হউক, চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং পাটলিপুত্র নগরের উল্লেখ করিলেও গ্রীকগণের বর্ণনায় পাটলিপুত্র নাম দৃষ্ট হয় না। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থান-কালে গ্রীক-দূত মেগাস্থি-

পরিব্রাজকের বর্ণনায় মগধ ও পাটলিপুত্র।

* Elphinstone's *History of India*.—"We find frequent accounts of disputations held in the presence of kings, between the most learned partizans of the two creeds &c"

নীস মগধের যে পুরাবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে "পালিবোথ্‌রা' (Palibothra) নামক এক নগরীর উল্লেখ আছে। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানও, মেগাস্থিনীসের বর্ণনা অনুসারে, 'পালিবোথ্‌রা' নগরীরই নামোল্লেখ করিয়াছেন। হুয়েন-সাং-কথিত 'পাটলিপুত্র' নগরী এবং আরিয়ান-বর্ণিত 'পালিবোথ্‌রা' অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মেগাস্থিনীসের বর্ণনার অনুসরণে ঐতিহাসিক আরিয়ান, মগধের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়,—'পালিবোথ্‌রা নগরী প্রাচীন কালে সমগ্র ভারতের রাজধানী বলিয়া অভিহিত হইত। ইরান্নোবোয়াস (হিরণ্যবাহু) ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে, প্রাসী (প্রাচী) দেশের সীমান্তে, ঐ নগরী অবস্থিত ছিল। তৎকালে হিরণ্যবাহু ভারতের মধ্যে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ নদী বলিয়া উক্ত হইত। সিন্ধু-নদ ও গঙ্গা-নদী অতি-পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেও, তখন ইরান্নোবোয়াস বা হিরণ্যবাহু নদীর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অবি-সম্বাদিত ছিল। হিরণ্যবাহু নদী গঙ্গা নদীতে পতিত হইতেছিল।' পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ রাভেন্সা প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রাচীন-কালে পাটনার কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে আসিয়া শোণ নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—শোণ ও হিরণ্যবাহু নদী অভিন্ন; যেহেতু গঙ্গার সহিত উভয় নদীর মিলন-স্থান অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সোনা এবং হিরণ্য উভয়ই একার্থ-বোধক; নদীগর্ভস্থিত বালুকারাশি স্বর্ণবর্ণ পরিদৃষ্ট হইত বলিয়াই উহার ঐরূপ নামকরণ হয়। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় প্রকাশ,—'পাটলিপুত্র নগরের দৈর্ঘ্য ৮০ ষ্টেডিয়া এবং বিস্তৃতি ১৫ ষ্টেডিয়া। নগরের চতুর্দ্দিকে ত্রিশ হস্ত গভীর একটি পরিখা প্রায় ছয় 'একর' অর্থাৎ ৪৮৪০ বর্গ-গজ ভূমি ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল। নগর-প্রাকারের উপরিভাগে ৫৭০টী উচ্চপ্রাসাদ-সদৃশ চূড়া এবং সেই প্রাকার-গাত্রে ৬৪টী সিংহদ্বার নগরীর শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছিল।' * গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো, পাটলিপুত্র নগরের ঐ একইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মেগাস্থিনীস এবং আরিয়ানের বর্ণনা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিৎ আলেকজাণ্ডার কানিংহাম সিদ্ধান্ত করেন,—'সেলিউকাস নিকাটরের সম-সময়ে মগধের প্রাচীন রাজধানীর পরিধি ২২০ ষ্টেডিয়া অর্থাৎ প্রায় ২৫।০ মাইল ছিল। অধুনা পাটনা-নগরের পরিধি-পরিমাণ যেরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, পাটলিপুত্র নগরের পরিধি-পরিমাণের সহিত তাহা অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।' বুকানন যখন ঐ নগরীর পরিমাপ গ্রহণ করেন, তখন উহার দৈর্ঘ্য ৯ মাইল, প্রস্থ ২।০ মাইল এবং পরিধি ২২॥০ মাইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়,—হুয়েন-সাং যখন মগধ-রাজ্য পরিদর্শনে গমন করেন, তখন প্রাচীন কুসুমপুর নগরীর আকার বর্ত্তমান আকারের অর্দ্ধ পরিমাণ বা ১১.মাইল পরিধিযুক্ত ছিল। †

* "The capital city of India is *Palibothra*, in the confines of *Prasii*, near the confluence of the two great rivers Erannoboas and Ganges, &c."—*Vide* Arrian, *Indica*.

† *Vide*, Major-General Alexander Cunningham, *Ancient Geography of India*, Vol. I. "In the seventh century, therefore, we may readily admit that the old city of Kusumapura may have been about half this size, or 11 miles in circuit, as stated by Hwen Thsang."—*Ibid*.

পাটলিপুত্র নগরীর প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। গ্রীক ঐতিহাসিক ডাইডোরাসের * মতে,—হেরাক্লেস কর্ত্তৃক ঐ নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরাম এবং হেরাক্লেস অভিন্ন ব্যক্তি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এতদনুরূপ সিদ্ধান্ত আমরা কিন্তু সমর্থন করিতে পারি না। পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের আলোচনায় পাটলিপুত্র নগরীর প্রতিষ্ঠার যে পরিচয় প্রাপ্ত হই, আমরা এস্থলে তাহারই আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। বায়ুপুরাণে, ভবিষ্য-রাজবংশ বর্ণন-প্রসঙ্গে, উক্ত হইয়াছে,—"ক্ষেমবর্ম্মার রাজত্বের পর পঞ্চবিংশতি বর্ষ যাবৎ রাজা অজাতশত্রুর রাজ্য-শাসন-কাল চলিবে। অনন্তর রাজা ক্ষত্রৌজা চত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিবেন। তৎপশ্চাৎ রাজা বিম্বিসার অষ্টাবিংশতি বর্ষ, রাজা দর্শক পঞ্চবিংশতি বর্ষ এবং নরপতি উদায়ী ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ষ রাজ্যশাসন করিবেন। এই শেষোক্ত রাজা কুসুমপুর নামে এক প্রসিদ্ধ পুর নির্ম্মাণ করিবেন। এই কুসুমপুর গঙ্গার দক্ষিণ উপকূলে বিরাজ করিবে। ইঁহার রাজ্য-শাসনের চতুর্থ বৎসরে ঐ পুরী নির্ম্মিত হইবে।" † 'মহাবংশ' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে আবার দেখিতে পাই,—'অজাতশত্রুর পুত্র উদয় কর্ত্তৃক কুসুমপুর বা পাটলিপুত্র নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল।' বায়ুপুরাণের বর্ণনার সহিত মহাবংশের বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান করিতে গেলে, বংশপর্য্যায়ে অজাতশত্রু-পুত্র উদয়ের স্থান-নির্দ্দেশ সুকঠিন হইয়া পড়ে। বিষ্ণুপুরাণে অজাতশত্রুর পুত্র দর্ভক নামে পরিচিত। বায়ুপুরাণোক্ত বিম্বিসারের পুত্র দর্শক এবং বিষ্ণুপুরাণোক্ত অজাতশত্রুর পুত্র দর্ভক একই ব্যক্তি কিনা—নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কারণ, বায়ুপুরাণের বিম্বিসারকে এবং বিষ্ণুপুরাণের বিম্বসারকে যদি একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত করা যায়, তাহা হইলে বংশ-পর্য্যায়ে অজাতশত্রুর স্থান-নির্দ্দেশে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। বায়ুপুরাণানুসারে অজাতশত্রু বিম্বিসারের ঊর্দ্ধতন দ্বিতীয় পুরুষে বিদ্যমান অর্থাৎ বিম্বিসার অজাতশত্রুর পৌত্র বলিয়া পরিচিত। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণানুসারে বিম্বসারে (বিম্বিসার

পাটলিপুত্র-প্রতিষ্ঠা।

* সিকিউলাস ডাইডোরাস (Seculas Diodorus) একজন প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক। সিসিলি-দ্বীপের এগিরিয়ম নগরে তাঁহার জন্ম হয়। জুলিয়াস এবং অগাষ্টাস সিজারের সময়-সময়ে তিনি গ্রীসদেশে বিদ্যমান ছিলেন। এসিয়া ও ইউরোপের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া, ইতিহাস-রচনার উদ্দেশ্যে, জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি রোম নগরীতে অতিবাহিত করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম—বিবলিওথিকা। (Bibliotheca) ইহাতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে জুলিয়স সিজারের গল-যুদ্ধের বিবরণ পর্য্যন্ত, পৃথিবীর ইতিবৃত্ত নিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার এই বৃহৎ গ্রন্থ-খণ্ডকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম খণ্ডে ট্রয়-যুদ্ধের বিবরণ পর্য্যন্ত লিখিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৪৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইতে ৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাবতীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। গ্রন্থত্রয়ের প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কতকাংশ এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।

† বায়ুপুরাণ, ৯৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। উইলসনের অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণের উপক্রমণিকা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া জেনারেল কানিংহাম দেখাইয়াছেন—'বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, অজাতশত্রুর পৌত্র রাজা উদয়াশ্ব কর্ত্তৃক কুসুমপুর নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।' আমরা কিন্তু বায়ুপুরাণের কোথাও উদয়াশ্ব নামক অজাতশত্রুর কোনও পৌত্রের পরিচয় পাইলাম না। বায়ুপুরাণে অজাতশত্রুর পৌত্রের নাম বিম্বিসার এবং বিম্বিসারের পৌত্রের নাম উদায়ী লিখিত আছে।

বা বিম্বিসার) পুত্রের নাম অজাতশত্রু। সুতরাং আমাদের মনে হয়, অনন্ত অতীত কালের ঘটনায়, লিপিকার-প্রমাদ-বশতঃ এখানেও কোনও নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে, অথবা পর্য্যায়-বিন্যাসে ইতর-বিশেষ 'ওলট পালট' ঘটিয়াছে। তবে বৌদ্ধগণের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়,—বুদ্ধদেব যখন শেষবার গঙ্গা অতিক্রম করিয়া রাজগৃহ হইতে বৈশালী নগরে আগমন করেন, সেই সময় মগধরাজ অজাতশত্রুর দুই জন মন্ত্রী পাটলিগ্রামে একটি দুর্গ-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত ছিলেন। তৎকালে ব্রিজি-বাসী উজ্জিহানগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অত্যাচার-নিবারণোদ্দেশে মগধ-রাজ অজাতশত্রু এই দুর্গ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। বুদ্ধদেব সেই সময় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—'পাটলিগ্রাম কালে একটি জনাকীর্ণ সহররূপে পরিণত হইবে।' উল্লিখিত পরম্পরানুকূল ঘটনা-পরম্পরা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, অজাতশত্রুর রাজত্ব-কালেই পাটলিপুত্র নগরী নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয় এবং তাঁহার পুত্র বা পৌত্রের রাজত্ব-কালে (খৃষ্ট-জন্মের প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে) ঐ নগরীর নির্ম্মাণ-কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ পালিবোথ্রার অধিবাসীদিগকে 'প্রাসী' (Prasii) আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 'প্রাসী'—সংস্কৃত প্রাচী (পূর্ব্বদেশার্থক) শব্দের রূপান্তর বলিয়াই প্রতীত হয়। কানিংহাম বলেন,—"প্রাচীন-কালে মগধ—'পলাশ' বা 'পরাশ' নামে অভিহিত হইত। উহাই মগধের প্রকৃত নাম। সুতরাং গ্রীকগণ যাহাদিগকে 'প্রাসী' আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, 'পলাশের' বা 'পরাশের' অধিবাসী 'পলাসীয়' বা 'পরাশীয়'-গণের উহাই প্রকৃত পরিচয়।" প্রাচীন কালে, এমন কি হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন সময়েও, ঐ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে পলাশ-বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল। পলাশ-বৃক্ষের প্রাচুর্য্য-হেতু ঐ প্রদেশ 'পলাশ' নামে অভিহিত হইত,—এরূপও জনপ্রবাদ আছে। হুয়েন সাঙের হিসাবানুসারে মগধ-রাজ্যের পরিধি-পরিমাণ তৎকালে পাঁচ হাজার লি অর্থাৎ প্রায় ৮৩৩ মাইল ছিল। উত্তরে গঙ্গানদী, পশ্চিমে বারাণসী জেলা, পূর্ব্বে হিরণ্যপ্রভাত বা মুঙ্গের এবং দক্ষিণে কর্ণ-সুবর্ণ বা সিংহভূম জেলা,—এতৎসীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ তৎকালে মগধ-রাজ্য নামে অভিহিত হইত। বর্ণনা অনুসারে বুঝিতে পারা যায়,—পশ্চিমে কর্ম্মনাশা নদী এবং দক্ষিণে দামোদরের উৎপত্তি-স্থান পর্য্যন্ত মগধ-রাজ্য ঐ সময়ে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সীমানার পরিধি, আধুনিক মানচিত্র অনুসারে, প্রায় সাত শত মাইল। তবে চতুর্দ্দিকবর্ত্তী রাজপথ ইহার অন্তর্ভুক্ত ধরিলে, উহার পরিধি প্রায় আট শত মাইল দাঁড়াইতে পারে।

মগধ রাজ্যের প্রসঙ্গে তদন্তর্গত আরও বহু জনপদের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। মগধ-দেশে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথম আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং সেইখানেই তাঁহার প্রচারক-জীবনের প্রথম ভাগ অতিবাহিত হয়। মগধ-দেশেই পুরাবৃত্ত-প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-তীর্থক্ষেত্রসমূহের অধিকাংশ অবস্থিত। সেই সকল জনপদের মধ্যে বুদ্ধগয়া, কুক্কুটপাদ, রাজগৃহ, কুশাগড়পুর, নালন্দা, ইন্দ্রশিলাগুহা, কপোতিকা প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। বুদ্ধগয়া—গয়া-ক্ষেত্রের অন্তর্গত সর্ব্বপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-তীর্থস্থান। এই স্থানে, বোধিদ্রুম মূলে, বুদ্ধদেব পূর্ণ ছয়

প্রসঙ্গোক্ত জনপদাদি ও গয়াক্ষেত্র।

বৎসর কাল কঠোর যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন। কানিংহাম ও হাণ্টার প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন,—গয়াক্ষেত্র প্রথমে বৌদ্ধতীর্থ বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরে, বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদে, হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, গয়াক্ষেত্র হিন্দুদিগের তীর্থ-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তাঁহাদের এ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা অবশ্য কোনও মতেই স্বীকার করা যায় না। বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে গয়াক্ষেত্র যে হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র-মধ্যে পরিগণিত হইত, পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহা নানারূপে প্রমাণিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে গমন করিলে, চিত্রকূট-পর্ব্বতে তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া, ভরত যখন তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করেন। সেই উপদেশ-প্রসঙ্গে প্রতীয়মান হয়,—শ্রীরামচন্দ্রাদির জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই গয়াক্ষেত্র হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। উপদেশ-প্রদান ব্যপদেশে সেখানে শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলিতেছেন,—

"শ্রূয়তে বীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা। গয়েন যজমানেন গয়েষেব পিতৃন্ প্রতি॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্‌যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃন্ যৎ পাতি সর্ব্বতঃ॥
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ। তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিদ্‌গয়াং ব্রজেৎ॥
এবং রাজর্ষয়ঃ সর্ব্বে প্রতীতা রঘুনন্দন। তস্মাৎ ত্রাহি নরশ্রেষ্ঠ পিতরং নরকাৎ প্রভো॥" *

অর্থাৎ,—ভাই! শুনিতে পাওয়া যায়, গয়া-প্রদেশে গয় নামক কোনও বুদ্ধিমান্ যশস্বী যাজ্ঞিক পিতৃলোকের প্রীতি-কামনায় এই প্রণতি গান করিয়াছিলেন যে,—সন্তান পুৎ নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে এবং ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্ম দ্বারা পিতাকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করে। এই হইতেই 'পুত্র' নাম সিদ্ধ হইয়াছে। এই জন্যই লোকে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ও গুণবান্ বহুপুত্রের কামনা করে। কেন-না, তাহাদের মধ্যে কেহ-না-কেহ গয়ায় যাইয়া পিতৃকৃত্য করিবে। অতএব হে নরবর! তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর। মহাভারতে, বনপর্ব্বে, চতুরশীতিতম অধ্যায়ে গয়া-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিত আছে,—'যে নর কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষ গয়াক্ষেত্রে বাস করে, সে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত স্বীয় কুল উদ্ধার করে। মনুষ্য বহু পুত্র লাভের কামনা করিবে; কেন-না, যদি তাহাদের এক জনও গয়ায় গমন করে।' উক্ত পর্ব্বের সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ে এবং অনুশাসন-পর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে ঐ একই উক্তি দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়, হরিবংশে, বায়ুপুরাণে গরুড়পুরাণে এবং অগ্নিপুরাণে গয়াক্ষেত্রের মাহাত্ম্য-তত্ত্ব বিশদ পরিবর্ণিত। † সুতরাং প্রতিপন্ন হয়, স্মরণাতীত কাল হইতে গয়াক্ষেত্র হিন্দুদিগের তীর্থক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। গয়াক্ষেত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতান্তর দৃষ্ট হয়। মহাভারতে ‡ দেখিতে পাই,—এইস্থানে চন্দ্রবংশজ অমূর্ত্তরজের পুত্র গয়, যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়, প্রচুরান্ন ও ভূরি দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নামানুসারে এই স্থান 'গয়া'

* রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭ সর্গ, ১১শ—১৪শ শ্লোক।

† যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ২৬০ম শ্লোক; হরিবংশ, ১০ম অধ্যায়; বায়ুপুরাণ, গয়ামাহাত্ম্য, ১০৫ম—১১২ম অধ্যায়; গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ৮২শ—৮৬ অধ্যায়; অগ্নিপুরাণ, ১১৫ম অধ্যায়, ২৬শ শ্লোক।

‡ মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৯৭ম অধ্যায় এবং দ্রোণপর্ব্ব ৬৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নামে পরিচিত হয়। হরিবংশে লিখিত আছে,—'প্রজাপতি মনু পুত্রকাম হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে মিত্র ও বরুণের অংশে ইড়া (ইলা) নাম্নী কন্যার উৎপত্তি হয়। মিত্র ও বরুণের বরে তিনিই আবার সুদ্যুম্ন নামে ত্রিলোক-বিখ্যাত মনুর বংশধর পুত্র হইয়াছিলেন। আর জাতিত্রয় অর্থাৎ উৎকল, গয় ও বীর্য্যবান বিনতাশ্ব পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে গয়ের অধীনে গয়াপুরী ছিল।' বায়ুপুরাণান্তর্গত গয়া-মাহাত্ম্যে গয়াক্ষেত্র-প্রতিষ্ঠার বিবরণ একটু রূপান্তরে বর্ণিত রহিয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই,—মহাবলশালী গয় নামক এক বিষ্ণুভক্ত অসুর ছিল; সে কঠোর তপস্যায় রত হয়। তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবগণ বর দিতে আসিলে, গয়াসুর আপনার প্রার্থনা জ্ঞাপন করে। সে বলে,—'ব্রাহ্মণ, তীর্থশিলা, দেবত, মন্ত্র, যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, ধর্ম্মী, জাতি প্রভৃতি হইতে আমার দেহ যেন পবিত্র হয়।' দেবগণ 'তথাস্তু' বলিয়া গমন করেন। তখন গয়াসুরের পবিত্র দেহ সন্দর্শনে জীবগণ চতুর্ভুজ হইয়া স্বর্গবাসে গমন করিতে লাগিল। সুতরাং অবশেষে কৌশলে দেবগণ তাহাকে নিশ্চল করেন। গয়াসুরের দেহ যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, দেবগণের বরে তাহাই পুণ্যপ্রদ গয়াতীর্থে পরিণত হয়। * যাহা হউক, গয়াক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে এইরূপ মতবিরোধ থাকিলেও, গয়াক্ষেত্র যে অতি প্রাচীন কাল হইতে—বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে—বিদ্যমান আছে এবং হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। মগধে যে সময়ে বৌদ্ধ-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, গয়াক্ষেত্র সেই সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল প্রবাহে বিধ্বস্ত হয়। সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বুদ্ধদেব গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত গয়শীর্ষ পর্ব্বত অতিক্রম করেন। নিরঞ্জনা নদী তীরে উপনীত হইয়া তিনি বোধিদ্রুম মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই স্থানেই তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয়। অশোকের রাজত্বকালে গয়াধামে কয়েকটী বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে, হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে, অশেষ শিল্প-খচিত বহু বৌদ্ধ মঠ, সঙ্ঘারাম, স্তূপ, বিহার প্রভৃতি বিধ্বস্ত ও লোপপ্রাপ্ত হয়। গয়াক্ষেত্রে বহু তীর্থ বিরাজমান। ফল্গু-তীর্থ, নাগকূট, গৃধ্রকূট, পাণ্ডুশিলা, স্বর্গদ্বার, ধর্ম্মশিলা প্রভৃতি তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ। এই গয়াক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে ভীম জানু পাতিয়া বসিয়াছিলেন বলিয়া এখনও জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। গয়াধামে প্রাচীনকালে বহু মঠ ও মন্দির বিদ্যমান ছিল। মুসলমান অধিকারে, মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে, তাহাদের অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যে সময় গয়াধাম দর্শন করেন, তখনও গয়ার পূর্ব্ব-গৌরব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাকার-পরিখা-পরিবেষ্টিত গয়াপুরী তখনও শত্রুর দুরধিগম্য ছিল। সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ-পরিবার সেই সময় গয়া-নগরীতে বসবাস করিতেছিলেন। যে বোধি-বৃক্ষমূলে বুদ্ধদেব কঠোর তপশ্চারণা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই বোধিবৃক্ষ আজিও চিহ্নিত হইয়া থাকে। কানিংহাম লিখিয়া গিয়াছেন,—'বৃক্ষটীর একটী কাণ্ড; পশ্চিমাভিমুখীন ইহার তিনটী

পরিব্রাজকের পরিদৃষ্ট গয়া।

* পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ডে গয়াসুর ও গয়াক্ষেত্র প্রসঙ্গে এতদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শাখা আজিও পরিম্লান হয় নাই। তবে অন্যান্য শাখাগুলির সকলই বন্ধনশূন্য এবং জীর্ণ।' হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—বোধি-বৃক্ষের সন্নিকটে জনৈক ব্রাহ্মণ একটি প্রসিদ্ধ 'বিহার' বা বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে মহেশ্বরের উপাসক ছিলেন। পরিশেষে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। চীন-পরিব্রাজক যে সময়ে বোধিদ্রুম দর্শন করেন, সে সময়ে তথায় এতাধিক বৌদ্ধ-স্তূপ বিদ্যমান ছিল যে, তাহার সংখ্যা করা যাইত না। বর্ষা-সমাগমে বৌদ্ধভিক্ষুগণ সেই সকল মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। তখন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যোগী ও জন-সাধারণের সমাগমে সে অরণ্যানী জন-কোলাহল-পূর্ণ নগরে পরিণত হইত। সাত দিন সাত রাত্রি সমবেত জনমণ্ডলীর নৃত্য-গীত-বাদ্যে সে স্থান মুখরিত হইয়া উঠিত। পরিশেষে জনসাধারণ বহ্নাম্লান হইয়া পুষ্পাদি দ্বারা বৌদ্ধ-মূর্ত্তির সম্মাননা করিত। শ্রাবণের প্রথম দিবসে ভিক্ষুগণ মঠে প্রবেশ করিতেন; আর আশ্বিনের শেষ দিবসে তাঁহারা মঠ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় গয়া 'কিয়া-ই' (Kia-ye) নামে অভিহিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—শিলাভদ্র হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪০ অথবা ৫০ লি (প্রায় ৭ বা ৮ মাইল) অগ্রসর হইয়া 'নি-লিয়েন-শেন' (Ni-lien-shen) বা নিরঞ্জনা নদী অতিক্রম করিলেই গয়াধামে প্রবেশ করা যায়। পাটলিপুত্র হইতে গয়াধামে আগমন সময়ে চীন-পরিব্রাজক আরও কয়েকটি প্রাচীন নগর দর্শন করেন। 'তি-লো-সি-কিয়া' বা 'তি-লো-ত্রে-কিয়া' (Ti-lo-shi-kia বা Ti-lo-tre-kia) তাহাদের অন্যতম। পাটলিপুত্র নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত হইতে ১০০ লি বা ১৬৸৵০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া হুয়েন সাং ঐ নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। কানিংহামের নির্দ্দেশক্রমে 'তি-লো-শি-কিয়া'—পুরাণ-বর্ণিত তিলোদক তীর্থ বলিয়াই মনে হয়। কানিংহাম বলেন,—'বর্ত্তমান পাটনা সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের দুই শত লি বা তেত্রিশ মাইল দক্ষিণে ঐ নগরের অবস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। সে হিসাবে ফল্গু-নদীর পূর্ব্বপারে যে স্থানে 'তিলারা' (Tillara) সহর বিদ্যমান, সেই স্থানে ঐ নগর অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। পরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে এই সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। চীনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে, নালন্দার বৌদ্ধ-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া, হুয়েন-সাং তিলোদকে উপনীত হন। তাঁহার মতে, নালন্দার তিন যোজন বা একুশ মাইল পশ্চিমে ঐ নগরী অবস্থিত ছিল। কানিংহাম বলেন,—'বর্ত্তমান রাজগীরের ছয় মাইল উত্তরে, বড়গাঁও পল্লীতে প্রাচীন নালন্দার অবস্থান হওয়া সম্ভবপর। এই তিলোদকের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৯০ লি গমন করিয়া পরিব্রাজক এক পর্ব্বতের উপর উপনীত হন। কথিত হয়, সেই পর্ব্বত হইতে বুদ্ধদেব মগধ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কামনা করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ৩০ লি (প্রায় ৫ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া তিনি 'গুণমতি' মঠে উপনীত হইয়াছিলেন। জনপ্রবাদ,—এই মঠের গুণমতি তর্কযুদ্ধে ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আর এই ঘটনা চির-স্মরণীয় করিবার জন্যই গুণমতির নামানুসারে ঐ মঠের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ হইয়াছিল। নিদাওতের অনতিদূরে, পেওয়ার নদীর পূর্ব্ব তীরে, পর্ব্বতমালার উপরিভাগে, ঐ মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। নিদাওতের তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, পেওয়ার

নদীর পূর্ব্ব তীরে, বিথাওয়া পর্ব্বতে উহার অবস্থান-স্থান নির্দ্দেশ হইতে পারে। ঐ স্থান হইতে ৪০ বা ৫০ লি (প্রায় ৭ বা ৮ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, পরিব্রাজক নৈরঞ্জনা নদী অতিক্রম করেন। পরিশেষে তিনি গয়া নগরে উপনীত হন। উক্ত নৈরঞ্জনা নদীই অধুনা ফল্গু নামে অভিহিত। এই নদীর পশ্চিম শাখা 'লীলাজন' বা 'নীলাজন' নামে উক্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধগয়া হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশের জন্য এখনও এই নগর 'ব্রহ্মগয়া' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। নগরের এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গয় পর্ব্বত বিরাজমান। শাস্ত্রকারগণ উহাকে দেব-পর্ব্বত আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অধুনা ঐ পর্ব্বত ব্রহ্মযোনি নামে আখ্যাত। পূর্ব্বে যেখানে অশোকের স্তূপ বিদ্যমান ছিল, অধুনা সেখানে একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতটীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে কশ্যপত্রয়ের তিনটী স্তূপ অবস্থিত ছিল। তাহারই পূর্ব্বে, ফল্গু নদীর পর-পারে, 'প্রাগ্‌বোধি' নামক পর্ব্বতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। চীন-পরিব্রাজক সেই প্রাগ্‌বোধি পর্ব্বতকে 'পো-লো-কি-পু-টি' (Po-lo-ki-up-ti) আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পর্ব্বতটীর ঐরূপ নামকরণ সম্বন্ধে একটী জনপ্রবাদ প্রচলিত ছিল। পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের নিকটও সেই প্রবাদ বিবৃত হইয়াছিল। কথিত হয়,—এই পর্ব্বতের উপরিভাগে বুদ্ধদেব কয়েক বৎসর নির্জ্জন বাস করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর কঠোর তপশ্চারণার পর, কঠোর যোগ-সাধনা পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধদেব এই পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি দুগ্ধান্ন আহার করিয়া ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এই পর্ব্বতোপরি তিনি পুনরায় কঠোর যোগাভ্যাসে রত হইবেন। কিন্তু পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতারা তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া তাঁহার যোগভঙ্গ করেন। পর্ব্বত প্রকম্পিত হইতে থাকে। বুদ্ধদেব তখন ঐ পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া ১৫ লি প্রায় ২॥০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম বা পিপল-বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কানিংহাম ইহা হইতে স্থির করিয়াছেন,—অধুনা মোড়া (Mora) পাহাড় বলিতে যে পর্ব্বতকে বুঝাইয়া থাকে, প্রাচীন কালে সেই পর্ব্বতই প্রাগ্‌বোধি নামে অভিহিত হইত। ঐ পর্ব্বত হইতে অবতরণ-কালে, মধ্যপথে একটী গহ্বর দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এই, বুদ্ধদেব এই গুহায় কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ফা-হিয়ানের বর্ণনায়ও এই গহ্বরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহার মতে, বোধি-বৃক্ষের অর্দ্ধযোজন (প্রায় ৩॥০ মাইল) উত্তর-পূর্ব্বে এই গহ্বর অবস্থিত ছিল। আজি পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত স্থানেই এই গহ্বরের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বৌদ্ধ-প্রাধান্যের অবসানে, হিন্দু-প্রাধান্যের পুনরভ্যুদয়ে এবং মুসলমান অধিকারে, গয়ার ও বুদ্ধগয়ার যেরূপ পরিণতি সংঘটিত হইয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহার আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে।

কুক্কুটপাদ গিরি।

মগধের অন্তর্গত 'কুক্কুটপাদ'—বৌদ্ধগণের একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া উক্ত হয়। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে কুক্কুটপাদের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। রামায়ণ মহাভারতেও উহার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে কুক্কুটপাদ ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধগণের প্রাধান্য-সময়ে তা। কুক্কুটপাদ নামে অভিহিত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যে সময়ে এই কুক্কুটপাদ-গিরি দর্শন করেন, তখন ইহার অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে অসংখ্য বৌদ্ধমন্দির, মঠ ও স্তূপ চূর্ণীকৃত হয় এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ অশেষ প্রকারে নিগৃহীত হন। সে সময়ে কুক্কুটপাদ-তীর্থ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থানের প্রবল বন্যায় ভাসমান হইয়াছিল। হুয়েন-সাং সে পরিবর্ত্তনের বহু পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধগয়া দর্শন করিয়া হুয়েন-সাং কুক্কুটপাদ-তীর্থে উপনীত হন। কুক্কুটপাদ-তীর্থে আগমন-কালে পথিমধ্যে তিনি আরও কয়েকটী তীর্থ-স্থান দর্শন করেন। তন্মধ্যে গন্ধহস্তীর নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বুদ্ধগয়া হইতে নিরঞ্জনা নদী অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, গন্ধহস্তী নামক বৌদ্ধস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রকাশ,—বুদ্ধগয়ার এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে, লীলাজন নদীর পূর্ব্ব তীরে, বর্ত্তমান বাক্রোর নামক পল্লীতে, ঐ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। গন্ধহস্তী স্তূপ দর্শনান্তর পরিব্রাজক পূর্ব্ব দিকে, 'মো-হো' (Mo-ho) বা মহানা নদী অতিক্রম করিয়া, গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। সেই বনে বৌদ্ধগণের একটী পবিত্র প্রস্তর-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখান হইতে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে ১০০ লি (প্রায় ১৭ মাইল) গমন করিয়া, হুয়নে-সাং কুক্কুটপাদ পর্ব্বতে উপনীত হইয়াছিলেন। হুয়েন-সাং ঐ পর্ব্বতকে 'কিউ-কিউ-চ-পো-থো' (Kiu-kiu-cha-po-tho) নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়ানের বর্ণনায়, বুদ্ধগয়া হইতে কুক্কুটপাদের দূরত্ব তিন লি বা অর্দ্ধ মাইল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণনা অনুসারে, কুক্কুটপাদ বুদ্ধগয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। কানিংহাম কিন্তু ফা-হিয়ান-বর্ণিত এই দূরত্ব-পরিমাণ ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কানিংহামের মতে,—'ফা-হিয়ান ভ্রমক্রমে তিন যোজন স্থলে তিন লি লিখিয়া গিয়াছেন। তিন যোজনে একুশ মাইল হয়। আর তাহা হইলেই হুয়েন-সাঙের বর্ণনার সহিত ফা-হিয়ানের বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে। হুয়েন-সাং বুদ্ধগয়া হইতে কুক্কুটপাদের দূরত্ব ১৭ মাইল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নদীর বিস্তৃতি দুই মাইল ধরিলে মোট উনিশ মাইল হয়। প্রাচীন গণনায় দুই মাইলের ইতর-বিশেষ হওয়া অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ, উভয়ের গণনাপদ্ধতিও স্বতন্ত্র ছিল।' কানিংহাম বলেন,—অধুনা যাহা 'কুরকিহার,' প্রাচীন কালে তাহাই কুক্কুটপাদ বলিয়া অভিহিত হইত। বর্ত্তমান বজিরগঞ্জের তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, গয়া-নগরীর উত্তরে ষোল মাইল উত্তর-পূর্ব্বে এবং বুদ্ধ-গয়ার কুড়ি মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কুক্কুটপাদ-তীর্থ বিদ্যমান ছিল। অধুনা উহা কুরকিহার নামে পরিচিত। গয়া ও বিহারের মধ্যে কুরকিহারই বৃহত্তম জনপদ। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে জানা যায়, কুরকিহারের প্রকৃত নাম—'কুরক-বিহার' (Kurak-Vihar)। উহা 'কুক্কুটপাদ-বিহার' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই অনুমান হয়। প্রাচীন-কালে কুক্কুটপাদ শৈলের তিনটী অত্যুচ্চ শৃঙ্গ দৃষ্ট হইত। অধুনা তাহার অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তবে কুরকিহারের অর্দ্ধ মাইল উত্তরে তিনটী অনতিদীর্ঘ গিরিশ্রেণী দৃষ্ট হয়। অনেকে অনুমান করেন, উহাই প্রাচীন কালে কুক্কুটপাদ পাহাড়ের চূড়াত্রয় বলিয়া উক্ত হইত। কোনও কোনও বর্ণনায় কুক্কুটপাদ 'গুরুপাদগিরি' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। কথিত হয়,—বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর, তাঁহার শিষ্য মহাকশ্যপ এই গিরিতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার বসবাস-হেতু ঐ পর্ব্বত বৌদ্ধগণের একটী তীর্থ-

স্থান মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এইরূপ কিংবদন্তী শুনা যায়,—'কুক্কুটপাদের সন্নিকটস্থ ত্রিশৃঙ্গ-পর্ব্বতে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে একটী উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতে থাকে। পাহাড়ের উপরিভাগে গমন করিলে, সে আলোক আর দৃষ্টিগোচর হয় না।'

কুশাগড়পুর, গিরিব্রজ, রাজগৃহ।

মগধ-রাজ্যের প্রাচীনতম রাজধানী—কুশাগড়পুর বা কুশাগ্রপুর। পণ্ডিতগণ বলেন, উহাই মগধের আদি রাজধানী। পরবর্ত্তিকালে উহা রাজগৃহ এবং গিরিব্রজ নামে পরিচিত। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্রে কুশাগড়পুর নাম দৃষ্ট হয় না। কিন্তু শাস্ত্রসমূহে গিরিব্রজ ও রাজগৃহ নামের উল্লেখ আছে। রামায়ণে, কেকয়-রাজ্যের রাজধানী এক গিরিব্রজের নাম দেখা যায়। শ্রীরামচন্দ্র বনগমন কালে, অযোধ্যার রাজদূত ভরতকে অযোধ্যায় আনয়নের জন্য কেকয়-রাজ্যের রাজধানী গিরিব্রজ নগরে গমন করিয়াছিলেন। রামায়ণে গিরিব্রজ নগরের অবস্থানাদির বিষয় যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয়,—মগধের রাজধানী গিরিব্রজ এবং রামায়ণোক্ত কেকয়-রাজ্যের রাজধানী গিরিব্রজ দুইটী স্বতন্ত্র জনপদ। * রামায়ণে গিরিব্রজের যেরূপ অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান শতদ্রু-নদীর পশ্চিমে এবং বিপাশা-নদীর পূর্ব্ব-পারে উহা অবস্থিত ছিল বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে,—কাশ্মীর ও পঞ্জাবের কতকাংশ প্রাচীন কালে কেকয়-রাজ্য নামে আখ্যাত হইত এবং রামায়ণোক্ত গিরিব্রজ সেই প্রদেশেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু মগধের অবস্থানাদির বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, মগধের রাজধানী গিরিব্রজ—বঙ্গ, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কতকাংশে, মগধ-রাজ্যে অবস্থিত ছিল। † গিরিব্রজ মহাভারতে মগধের রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ‡ তাহাতেও রামায়ণোক্ত গিরিব্রজের এবং মগধের রাজধানী গিরিব্রজের স্বাতন্ত্র্য-বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। সেখানে লিখিত আছে,—'জরাসন্ধের বধোদ্দেশ্যে কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীমসেন কুরুদেশ হইতে

* "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ১০৯ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠাসমূহ দ্রষ্টব্য। দূতের কেকয়-রাজধানী গিরিব্রজ-গমন-প্রসঙ্গে রামায়ণে (অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৮ সর্গ, ১৮শ-২২শ শ্লোক) উক্ত হইয়াছে,—

"যুযর্মধ্যেন বাহ্লীকান্ সুদামানাঞ্চ পর্ব্বতম্॥ বিষ্ণোঃ পদং প্রেক্ষমাণা বিপাশাঞ্চাপি শাল্মলীম্॥
নদীর্বাপীস্তড়াগানি পল্বলানি সরাংসি চ।...গিরিব্রজং পুরবরং শীঘ্রমাসেদুরঞ্জসা॥"

আবার ভরতের গিরিব্রজ-পরিত্যাগ ও অযোধ্যা-গমন-প্রসঙ্গে রামায়ণে (অযোধ্যাকাণ্ড, ৭১ সর্গ, ১ম-২য় শ্লোক) মহর্ষি বাল্মীকি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"স প্রাঙ্মুখো রাজগৃহাদভিনির্যায় বীর্য্যবান্। ততঃ সুদামাং দ্যুতিমান্ সন্তীর্য্যাবেক্ষ্য তাং নদীম্॥
হ্লাদিনীং দূরপারাঞ্চ প্রত্যক্‌স্রোতস্তরঙ্গিণীম্। শতদ্রুমতরচ্ছ্রীমান্ নদীমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ॥"

† এই পরিচ্ছেদের ১৭০ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২০শ অধ্যায়ে এই বর্ণনা দৃষ্ট হয়। জর্ম্মাণদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ লাসেন (Lassen) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন,—'রামায়ণে গিরিব্রজ মগধের রাজধানী-রূপে উক্ত হইয়াছে।' এলফিনষ্টোনের ইতিহাসেও প্রকাশ,—"This was the caiptal of the ancient kings of Magadha, and it is no doubt the same as the Girivraja of Ramayana."—Elphinstone's *History of India*. কিন্তু প্রচলিত রামায়ণ আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। রামায়ণে লিখিত আছে, 'বসুরাজা গিরিব্রজ নামে উত্তমপুর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নামানুসারে উহা বসুমতী নামেও অভিহিত হইয়াছিল।' (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৩২শ অধ্যায়) এস্থলে মগধ-রাজ্যের নাম-গন্ধ নাই। গিরিব্রজ—মগধের রাজধানী, এতদুক্তিও এখানে দৃষ্ট হয় না।

প্রস্থান করতঃ কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া রমণীয় পদ্মসরোবরে গমন করিলেন। পরে কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, সদানীরা, শর্করাবর্ত্ত এবং একপর্ব্বতকস্থ নদী-সমুদায় ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া চলিলেন। অনন্তর তাঁহারা মনোরমা সরযূ অতিক্রম-পূর্ব্বক পূর্ব্ব-কোশল সমুদায় দর্শন করিয়া মিথিলা এবং মালা ও চর্ম্মণ্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থিত হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ পার হইয়া সেই অক্ষয় উৎসাহসম্পন্ন বীরত্রয় পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করতঃ কুশাম্ব-দেশের বক্ষঃস্থল-স্বরূপ মগধ-রাজ্যের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সলিল-সমাকীর্ণ, গোধনপূর্ণ ও মনোহর বৃক্ষবিশিষ্ট গোরথ নামক পর্ব্বত হইয়া মগধ-রাজ্যের পুরী দর্শন করিলেন।" বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থে গিরিব্রজের যে পরিচয় দেখিতে পাই, এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহাভারতে গিরিব্রজের অবস্থান সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"উচ্চশৃঙ্গান্বিত, শীতল-দ্রুম-বিশিষ্ট, পরস্পর-সংযুক্ত বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক, এই পঞ্চ মহাশৈল যেন এক-যোগ হইয়া গিরিব্রজ নগরকে রক্ষা করিতেছে।" * সিংহল-দেশীয় পালি ভাষার গ্রন্থ-সমূহের আলোচনায়, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে, পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ টার্ণারও (Turnour) এই উক্তির সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পালিগ্রন্থে পঞ্চ-পর্ব্বতের নাম এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে,—গৃহ্যকূট, ইসিগিলি, উভারো (বেভারো), উপলো এবং পাণ্ডবো। ঐ পর্ব্বত-পঞ্চক অধুনা যথাক্রমে বৈভার-গিরি, বিপুল-গিরি, রত্নাগিরি, উদয়-গিরি এবং সোনাগিরি নামে পরিচিত। পালিভাষার উভারো এবং বৈভার অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বেভার পর্ব্বতের জৈন-মঠ-সমূহের খোদিত-লিপি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই পর্ব্বত-গাত্রে সপ্তপর্ণি গুহা বিদ্যমান। কথিত হয়, খৃষ্ট-জন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তিব্বত-দেশীয় 'দুল্‌ভ' (Dulva) গ্রন্থে, ইহার নাম 'ন্যগ্রোধ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে রত্নাগিরি বিরাজমান। ফা-হিয়ান যাহাকে পিপ্পল গুহা বলিয়া গিয়াছেন, রত্নাগিরি তাহারই নামান্তর মাত্র। সপ্তপর্ণি গুহার প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে ইহা অবস্থিত। পণ্ডিতগণ বলেন,—পালি-ভাষায় যাহা পাণ্ডবো নামে উক্ত হইয়াছে, তাহাই অধুনা রত্না-গিরি নামে অভিহিত। ললিতবিস্তরে উহাকে গিরিরাজ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অধুনা ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী জৈন-মন্দির দৃষ্ট হয়। বহু জৈন-তীর্থ-যাত্রী প্রায়ই ঐ স্থান দর্শন করিয়া থাকেন। অনেকে বলেন—মহাভারতোক্ত ঋষিগিরি ও রত্নাগিরি অভিন্ন। বিপুল-পর্ব্বত পালি-ভাষায় 'উপলো' নামে উক্ত হইয়াছে। মহাভারতোক্ত চৈত্যক গিরির উক্ত নামে অভিহিত হওয়া অসম্ভব নহে। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং এই পর্ব্বতের উপরিভাগে বহু স্তূপ বা চৈত্যের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। অনেকে

---

* মহাভারত, সভাপর্ব্বে, গিরিব্রজ নগরের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহা হইতে বুঝা যায়,—জরাসন্ধের রাজত্বকালে গিরিব্রজ পশুসমাকুল, নিয়তজলযুক্ত, উপদ্রবশূন্য এবং সুন্দর অট্টালিকা সমূহে সুশোভিত ছিল।

বলেন,—উদয়গিরি ও সোনাগিরি যথাক্রমে ইসিগিলি ও উভারো নামে পরিচিত। পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—প্রাচীরবৎ বৃত্তাকারে অবস্থিত ঐ পর্ব্বত-পঞ্চকের পরিধি-পরিমাণ ১৫০ লি বা ২৫ মাইল। হুয়েন-সাঙের এই বর্ণনায় হইতে কানিংহাম পর্ব্বত-পঞ্চকের পরস্পর দূরত্বের নিম্নরূপ পারচয় প্রদান করিয়াছেন,—

১।	বৈভার হইতে বিপুল ...	১২,০০০ ফিট।
২।	বিপুল হইতে রত্নাগিরি	৪,৫০০ ফিট।
৩।	রত্নাগিরি হইতে উদয়গিরি	৮,৫০০ ফিট।
৪।	উদয়গিরি হইতে সোনাগিরি	৭,০০০ ফিট।
৫।	সোনাগিরি হইতে বৈভার	৯,০০০ ফিট।
		মোট—৪১,০০০ ফিট।

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, গিরিব্রজ-নগরীর পরিধি পবিমাণ তখন প্রায় আট মাইল ছিল। কিন্তু প্রকৃত পরিমাপ ধরিতে গেলে, হুয়েন-সাং যে পরিধি-পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া মনে হয়। চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের বর্ণনায়ও ঐ পর্ব্বত-পঞ্চকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মতে,—তাৎকালিক রাজগৃহ নগরের চারি লি বা প্রায় ৷৷৶৹ মাইল দক্ষিণে, পঞ্চপর্ব্বতমধ্যস্থিত উপত্যকায়, প্রাচীন নগরী অবস্থিত ছিল। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় দূরত্বের ও অবস্থান-স্থানের তারতম্য অনুভূত হয় না। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—পাঁচটী পর্ব্বত এই নগরীর প্রাচীর-স্বরূপ বিদ্যমান।' অধুনা ঐ নগর 'পুরাণ রাজগীর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গিরিব্রজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রামায়ণে দৃষ্ট হয়,—কুশাত্মজ বসু এই নগরী নির্ম্মাণ করেন। কুশ এবং বসু কোন্ বংশজ, গ্রন্থে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। সূর্য্যবংশে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বসু নামক কোনও পুত্রের অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার পুত্রের নাম—অতিথি। সে বংশে বসু নামক কোনও রাজার নাম দৃষ্ট হয় না। চন্দ্র-বংশজ অমাবসুর বংশে, অষ্টম পর্য্যায়ে, কুশ নামক এক নরপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বসু নামে তাঁহারও কোনও পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং উল্লিখিত গ্রন্থোক্ত কুশাত্মজ বসু কোন্ বংশজ এবং কোন্ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে এই গিরিব্রজ যে অতি প্রাচীন নগরী, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। নগরীর গিরিব্রজ নাম হইবার পূর্ব্বে উহা কুশাগড়পুর নামে পরিচিত ছিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ঐ নগরে প্রাচীন কালে প্রচুর পরিমাণে কুশ-তৃণ জন্মিত বলিয়া উহার নাম কুশাগড়পুর হইয়াছিল। আবার, কুশের নামানুসারেও উহার কুশাগড়পুর নাম হওয়া অসম্ভব নহে। চীন-পরিব্রাজক এই নগরীকে 'কিউ-শে-কিয়া-লো-পু-লো' (Kiu-she-kia-lo-pu-lo) নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনানুসারে প্রাচীন নগরীর পরিধি ৩০ লি বা ৫ মাইল ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ফা-হিয়ান ঐ নগরের পরিধি পরিমাণ ২৪—২৮ লি প্রায় ৪৷৴০ মাইল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। জেনারেল কানিংহাম যখন ঐ স্থানের পরিমাপ গ্রহণ করেন, তখন উহার পরিধি ৩৪,৫০০ ফিট বা বা ৪৸০ মাইল দাঁড়াইয়াছিল।

হুয়েন-সাং বলেন,—কুশাগড়পুর বা গিরিব্রজ কোন্ সময়ে রাজগৃহ নামে পরিচিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। কথিত হয়, মগধরাজ শ্রেণিক (বিম্বিসার) রাজগৃহ নগরী নির্ম্মাণ করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থানুসারে জানা যায়,—খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৬০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে) ঐ নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তদনুসারে প্রতীত হয়,—কুশাগড়পুর এবং রাজগৃহ স্বতন্ত্র জনপদ। যাহা হউক, ফা-হিয়ান যখন এই নগরে আগমন করেন, উহা তখন জনশূন্য অরণ্যানী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। হুয়েন-সাঙের সময়ে ঐ নগরে এক সহস্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের বসতি ছিল। অশোক যখন পাটলিপুত্র নগরীতে আপনার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণদিগকে ঐ নগর দান করিয়া গিয়াছিলেন। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন কালে নগর-বহির্ভাগস্থ প্রাচীর ধ্বংস হইয়াছিল বটে; কিন্তু নগরাভ্যন্তরস্থিত প্রাচীরের পরিধি তখনও ২০ লি বা প্রায় ৩৶০ মাইল পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইত। কানিংহামের পরিমাপেও সে প্রাচীরের পরিধি-পরিমাণের তারতম্য উপলব্ধি হয় নাই। যাহা হউক, অধুনা রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ রাজগীর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। * বৌদ্ধ-প্রাধান্যের সময় ঐ নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তৎপরে ঐ নগর পরিবর্ত্তনের প্রবল প্রবাহে কিরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে আজিও ঐ স্থান বৌদ্ধগণের একটি প্রধান তীর্থ-ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

নালন্দা।

বৌদ্ধযুগে প্রতিষ্ঠান্বিত মগধের অন্যতম প্রধান নগরীর নাম—নালন্দা। নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিশ্রুত। চীন, তিব্বত, তাতার, শ্যাম, আনাম প্রভৃতি নানা দিগ্দেশ হইতে আসিয়া বিদ্যার্থিগণ এখানে শাস্ত্রাধ্যয়নে রত থাকিতেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—'তর্ক-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-লাভের জন্য নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থিগণ এখানে আগমন করিতেন।' ভারতবর্ষে এক সময়ে নালন্দা বিদ্যার ও শিক্ষার কেন্দ্র-স্থান ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নালন্দার সুপ্রসিদ্ধ বিহার বা মঠ চারি জন দেশপতি সম্রাটের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মঠে বৌদ্ধধর্ম্মসভার অধিবেশন-কালে প্রায় দুই সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের লোক সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। কথিত হয়, নালন্দার এই মঠের উৎকর্ষ-সাধনে প্রায় এক শত জনপদের রাজস্ব উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং নালন্দায় উপনীত হইলে, দুই শত বৌদ্ধ-ভিক্ষু এবং নগরের জনসাধারণ পুষ্পপত্র-পতাকা সমভিব্যাহারে শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মঠে বিশ্রামানন্তর হুয়েন-সাং শীলভদ্র নামক তত্রত্য জনৈক প্রধান আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বৌদ্ধদর্শনে শীলভদ্রের অশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যখন নালন্দায় আগমন করেন, তখন ভারতবর্ষে উহাই শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। প্রায় দশ সহস্র বৌদ্ধ-ভিক্ষু নালন্দার বিভিন্ন বৌদ্ধমঠে অবস্থিতি করিতেছিলেন। হুয়েন-সাং নালন্দায়

* কর্ণেল টড বলেন,—'রাজগৃহ অধুনা রাজমহল নামে পরিচিত। "Rajgriha, or Rajmahal, capital of Magadha, or Behar."—Vide, Col. Tod, *Rajasthan*, Vol. I.

প্রায় পাঁচ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থিতি কালে তিনি যোগ, ন্যায়, সার, অভিধর্ম্ম, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন,—বিহারের অন্তর্গত বর্ত্তমান রাজগীর হইতে সাত মাইল দূরে, বরগাঁ (Barigaon) গ্রামে, প্রাচীন কালে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। আজিও তাহার যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়াবহ।

নালন্দার অবস্থান সম্বন্ধে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুকানন ঐ স্থানের ভগ্নস্তূপ দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন, প্রাচীন কালে কোনও রাজা ঐ নগরে রাজত্ব করিতেন। বিহারের জৈনধর্ম্ম-যাজকগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—উহা রাজা শ্রেণিকের এবং তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ। হিন্দুগণের মতে ঐ স্থানে অতি প্রাচীন কালে বিদর্ভ-রাজের রাজধানী পুরাণ-প্রসিদ্ধ কুণ্ডিন নগর বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান বেরার-প্রদেশ প্রাচীন কালে বিদর্ভ নামে অভিহিত হইত। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে কুণ্ডিন-নগর বিদর্ভ-রাজ ভীষ্মকের রাজধানী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কথিত হয়, শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী ঐ স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নগরের অবস্থান-সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন,—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত বুলন্দসহর জেলায় অনুপসহর তহশীলের আহির নামক নগর প্রাচীন কালে কুণ্ডিন-নগর বা কুণ্ডনপুর নামে অভিহিত হইত। মতান্তরে প্রকাশ,—অযোধ্যার অন্তর্গত খৈরিগড় জেলার অনতিদূরে যে কুণ্ডনপুর নগর বিদ্যমান, উহাই প্রাচীন কুণ্ডিলপুর বা কুণ্ডনপুর। জনপ্রবাদ এই, সেই নগরে রাজা ভীষ্মক রাজত্ব করিতেন। আসামের অন্তর্গত সাদিয়া জেলার কুণ্ডিনপুরেও অনেকে কুণ্ডিনপুরের অস্তিত্ব কল্পনা করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু মগধ-রাজ্যের অবস্থিতির বিষয় আলোচনা করিলে, উপরোক্ত কোনও যুক্তিই সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থেও তাহার কোনও আভাষ নাই। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ-শাস্ত্রে বিদর্ভ-রাজের রাজধানী কুণ্ডিন-গ্রামের যে উল্লেখ আছে, সে সকল বর্ণনা হইতে নালন্দা ও কুণ্ডিন গ্রামকে কোনমতেই অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। * চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের বর্ণনায় প্রকাশ,—গিরিএক বা গির্জ্জাক হইতে ঐ নগরীর দূরত্ব এক যোজন বা সাত মাইল। নবপ্রতিষ্ঠিত রাজগৃহ হইতেও উহার একই দূরত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। সিংহল-দ্বীপের পালি-ভাষার গ্রন্থসমূহেও উহার ঐরূপ দূরত্বের বিষয়ই বর্ণিত আছে। সেখানে দেখিতে পাই,—রাজগৃহ হইতে এক যোজন দূরে নালন্দা অবস্থিত ছিল। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন,—বুদ্ধগয়া হইতে নালন্দার দূরত্ব সপ্ত-যোজন বা উনপঞ্চাশ মাইল। ফা-হিয়ান ঐ স্থানকে "নালো" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রাজগৃহ হইতে ৩০ লি (প্রায় ৫ মাইল) দূরে নালন্দা অবস্থিত। এই সকল বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রাচীন নালন্দা আধুনিক বড়গাঁও ভিন্ন অন্য কিছুই

অবস্থান-বিষয়ে মতান্তর।

---

* হরিবংশ, ১০৭ম পরিচ্ছেদের ২২শ ও ২৮শ শ্লোক এবং ১০৯ম পরিচ্ছেদ, ২৯শ শ্লোক; বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চম অংশ, ২৬শ অধ্যায়, ২য় শ্লোক; শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, ৫৩শ অধ্যায়, ১৬শ শ্লোক।

হইতে পারে না। ফা-হিয়ান বলেন,—এই নালন্দায় বুদ্ধদেবের দক্ষিণ-হস্ত-স্থানীয় সারীপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হুয়েন-সাঙের মতে,—নালন্দা হইতে চারি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব, নালন্দা ও ইন্দ্রশিলা-গুহার মধ্যবর্ত্তী কলপিনাক নামক স্থানে, সারিপুত্র জন্মলাভ করিয়াছিলেন। নালন্দার ৮ বা ৯ লি (প্রায় দেড় মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে কুলিক (Kulika) গ্রাম। উহা বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য মহামোগলানার জন্মস্থান। কানিংহাম বলেন,—শেষোক্ত স্থান অধুনা জগদাশপুর নামে অভিহিত। নালন্দার বৌদ্ধ-মঠের চতুর্দ্দিকে যে সকল বৌদ্ধমন্দির ছিল, তাহাদের ধ্বংসাবশেষ আজিও বড়গাঁয় দৃষ্ট হয়। নালন্দার নামকরণ সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী শুনা যায়,—'নালন্দার-মঠের দক্ষিণবর্ত্তী পুষ্করিণীতে নাগরাজ নালন্দ বাস করিতেন; তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থান নালন্দা নামে পরিচিত হইয়াছিল।' ভগ্ন-মঠের দক্ষিণে অধুনা 'কার্গিদ্য পুকুর' (Kargidya Pokhar) নামে যে ক্ষুদ্র সরোবর দৃষ্ট হয়, কথিত হয়, উহাতেই প্রাচীন কালে নাগরাজ নালন্দ বাস করিতেন। নালন্দার পরবর্ত্তী ইতিহাস মগধের ইতিহাসের সহিত ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। মগধের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে তদন্তর্গত দেশ-জনপদাদিরও ভাগ্য-বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং মগধ-রাজ্যের পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত বর্ণনায় নালন্দা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের ইতিবৃত্ত সন্নিবিষ্ট হইবে। নালান্দার পূর্ব্ব দিকে ৪৬ লি বা ৭৷৵০ মাইল অগ্রসর হইলেই ইন্দ্রশিলাগুহা তীর্থে উপনীত হওয়া যায়। কানিংহামের মতে, ইন্দ্রশিলাগুহা ও গিরিএক বা গির্জ্জাক অভিন্ন। তিনি বলিয়াছেন,—হুয়েন-সাং যাহাকে ইন্দ্রশিলাগুহা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, ফা-হিয়ানের বর্ণনায় জানা যায়, সেই একগিরি পর্ব্বতে ইন্দ্রদেব গৌতম-বুদ্ধের নিকট বিয়াল্লিশটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গুহার প্রস্তর গাত্রে যে বিয়াল্লিশটী চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়, প্রকাশ—'স্বয়ং ইন্দ্র আপনার অঙ্গুলি-সঞ্চালনে গুহাগাত্রে প্রশ্নচ্ছলে তৎসমূহ অঙ্কিত করেন। সেই হেতু ঐ গিরিগুহার ইন্দ্রশিলাগুহা নামকরণ হইয়াছিল।' পণ্ডিতগণ বলেন,—ফা-হিয়ান-কথিত 'একগিরি' পাহাড় এবং গিরিএক অভিন্ন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলেও (গিরি+এক) সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। গিরিএকের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে জরাসন্ধের রাজপ্রাসাদ। বঙ্গাঙ্গ নদীতীর হইতে উহার দূরত্ব প্রায় ২৫০ ফিট। প্রাসাদ-সন্নিকটস্থ পর্ব্বত-গাত্রে যে গহ্বর পরিদৃষ্ট হইত, তাহা গৃধ্র-দ্বার নামে অভিহিত। কেহ কেহ বলেন,—এই গুহাই প্রাচীন কালে ইন্দ্রশিলাগুহা নামে পরিচিত হইয়াছিল। ফা-হিয়ানের বর্ণনাক্রমে জানা যায়,—মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে আট যোজন বা ছাপ্পান্ন মাইল গমন করিলে এই একগিরি পর্ব্বতে উপনীত হওয়া যায়। নালন্দা হইতে উহার দূরত্ব পূর্ব্ব দিকে প্রায় এক যোজন বা সাত মাইল। কিন্তু বরগাঁ এবং গিরিএক,—এতদুভয়ের দূরত্ব ৯ মাইল মাত্র। গিরিএক গিরির ১৫০ লি—১৬০ লি অর্থাৎ ২৫ মাইল হইতে ২৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কপোতিকার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-মঠ। এই মঠের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে, নির্জ্জন পর্ব্বতোপরি, নানা কারুখচিত অসংখ্য প্রাসাদ পরিবেষ্টিত অবলোকিতেশ্বরের 'বিহার' বা মন্দির অবস্থিত।

গিরিয়ক দর্শনানন্তর পরিব্রাজক হুয়েন-সাং অবলোকিতেশ্বরের প্রাচীন মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ বলেন,—গিরিয়কের প্রায় এগার মাইল উত্তর-পূর্ব্ববর্ত্তী এই স্থান পরিবর্ত্তিকালে বিহার (বেহার) নামে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু কানিংহামের মতে,—'বিহার নাম হইতে উপলব্ধি হয়, এই স্থানে পূর্ব্বে একটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার বা মঠ অবস্থিত ছিল। অবলোকিতেশ্বরের বিহার বা মঠ ও বর্ত্তমান বিহার-প্রদেশ অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। বিহারের উত্তর-পশ্চিমে নির্জ্জন পর্ব্বতোপরি আজিও অসংখ্য বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ-সমূহ স্তরে স্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে ঐ পর্ব্বতোপরি বহু মুসলমান-পরিবার বসবাস করিতেছেন।'

বিহার ও হিরণ্যপ্রভাত।

কপোতিকার বৌদ্ধ-মঠের ৪০ লি বা সাত মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে গমন করিলে তিতারোয়ার (তিতিরের) ভগ্ন স্তূপে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থান বিহার হইতে সাত মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। তিতারোয়ায় দ্বাদশ সহস্র ফিট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট স্বচ্ছসলিলা একটী দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। দীর্ঘিকার তীরদেশে যে সকল ভগ্নস্তূপ বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে ঐ স্থানে পুরাকালে একটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে পরিব্রাজক হুয়েন-সাং পুনরায় পূর্ব্বদিকে গমন করেন। প্রায় সত্তর লি বা বার মাইল অগ্রসর হইয়া তিনি গঙ্গা-নদীর তীরদেশে একটী বৃহৎ জনপদে উপনীত হন। কানিংহাম বলেন,—হুয়েন-সাং যে বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে বিহার বা তিতারোয়ার সন্নিকটে কোনও পর্ব্বতের অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। গিরিয়কের প্রায় চৌদ্দ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, শেখপুর নামক স্থানে, ৬৬৫ ফিট একটী পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ পাহাড়ের উপরেই যে প্রাচীন কালে কপোতিকার মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অবলোকিতেশ্বরের মঠ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ ও পর্ব্বতকে কানিংহাম বিহার আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সে হিসাবে, মুঙ্গেরের প্রায় ৩৪ মাইল পশ্চিমে, দরিয়াপুরের অনতিদূরে, বিহারের অবস্থিতি প্রমাণিত হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে পরিব্রাজক পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া আর একটী বৌদ্ধমঠে উপনীত হইয়াছিলেন। সেই স্থানকে পরিব্রাজক 'লো-ইন্-নি-লো' (Lo-in-ni-lo) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভিভিয়েন-ডি'-সেণ্ট-মার্টিন * নামা জনৈক পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ কর্ত্তৃক ঐ স্থান 'রোহিনিলা' (Rohi-nila) বা 'রোহিনালা' (Rohinala) নামে উক্ত হইয়াছে। রোহিনালা বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। রোহিনালা হইতে দুই শত লি বা তেত্রিশ মাইল পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া পরিব্রাজক হিরণ্যপ্রভাত নামক প্রসিদ্ধ জনপদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিব্রাজকের বর্ণনায় হিরণ্যপ্রভাত 'ই লান-না-পো-ফাটা' (I-lan-na-po-fa-ta) বলিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। হুয়েন সাং বলিয়াছেন,—'নগরের অনতিদূরে হিরণ্য নামা পর্ব্বত বিদ্যমান। পর্ব্বত হইতে সময় সময় ধূম ও বাষ্প নির্গত হইয়া চন্দ্র-সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত।' কিন্তু কানিংহাম বলেন,—'পর্ব্বতের অবস্থিতির বিষয় আলোচনা করিলে হিরণ্যপ্রভাত ও

---

* সেণ্ট মার্টিন ফরাসীদেশীয় একজন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ। বৈদিক সূক্তাদির আলোচনায় ইনি প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক-তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পারিস নগরে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

মুঙ্গের অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পর্ব্বত হইতে অধুনা ধূম ও বাষ্প নির্গত না হইলেও, মুঙ্গেরের সন্নিকটে যে সমুদায় উষ্ণপ্রস্রবণ বিদ্যমান, তাহা হইতে বুঝা যায়, প্রাচীন কালে পর্ব্বত হইতে অগ্নি নিঃসৃত হইত। 'হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-সময়ে এ স্থানে জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। সে সময়ে হিরণ্যপ্রভাত বা মুঙ্গের—উত্তরে গঙ্গানদী এবং দক্ষিণে নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার পরিধি-পরিমাণ সেই সময়ে তিন হাজার লি বা পাঁচ শত মাইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে দক্ষিণে পরেশনাথ পাহাড় পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি হওয়া অসম্ভব নহে।' যাহা হউক, হুয়েন-সাং প্রভৃতির বর্ণনা হইতে কানিংহাম প্রাচীন হিরণ্যপ্রভাতের একটী সীমা-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার হিসাবে উত্তরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী লক্ষ্মীসরাই হইতে সুলতানপুর পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে পরেশনাথ পাহাড়ের পশ্চিম সীমানা হইতে বরাকর ও দামোদর নদীর মিলন-স্থান পর্য্যন্ত ঐ নগর বিস্তৃত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই সীমানার অন্তর্ভুক্ত স্থানের পরিধি-পরিমাণ ৩৫০ মাইল। চতুর্দ্দিকস্থ রাজপথ লইয়া হিরণ্যপ্রভাতের পরিধি-পরিমাণ ৪২০ মাইল পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে পারে।

মগধ-রাজ্যের শ্রী-সৌভাগ্যের দিনে প্রাচীন চম্পা বা চম্পাপুরী বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল। চম্পার প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ও পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র, হরিতের পুত্র, চম্প কর্ত্তৃক চম্পা বা চম্পাপুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

চম্পারাজ্য। চম্পাপুরী যে বহুকাল হইতে বিদ্যমান, ইহাতে তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়। বিষ্ণুপুরাণে এবং হরিবংশে হরিত-পুত্র চঞ্চু নামে পরিচিত। চম্পা নামে বহু জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-উপদ্বীপের একটী রাজ্য প্রাচীনকালে চম্পা নামে অভিহিত হইত। অনেকে অনুমান করেন, ঐ রাজ্য বর্ত্তমান আনাম ও কাম্বোডিয়ার (অর্থাৎ প্রাচীন কম্বোজ রাজ্যের) দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। এখনও ঐ প্রদেশের কতকাংশ চম্পা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে, কাশ্মীরের সীমান্ত-প্রদেশে চম্পা নামক রাজ্যের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্রহ্মপুর উহার রাজধানী এবং অধুনা উহা চম্বা নামে পরিচিত। মধ্য-প্রদেশের বিলাসপুর জেলায়ও চম্পা (চাঁপা) নামক একটি জনপদের অস্তিত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়। যাহা হউক, আমরা যে চম্পা-রাজ্যের বিষয় এক্ষণে আলোচনা করিব, পূর্ব্বোক্ত চম্পা-নগরীসমূহ হইতে তাহা একটি স্বতন্ত্র জনপদ। এই চম্পা মগধ-রাজ্যের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল, মগধ ও চম্পার অবস্থানের আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। এই চম্পা প্রাচীনকালে অঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। উহার অপর নাম—মালিনী, লোমপাদপুর ও কর্ণপুর। বর্ত্তমান ভাগলপুরের সন্নিকটে চম্পা-নগরী অবস্থিত ছিল বলিয়া অধুনা নির্দ্দিষ্ট হয়। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং চম্পার এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন;—'চম্পা বহু-বিস্তৃত জনপদ। রাজধানী চম্পানগরী গঙ্গার তীরে অবস্থিত। উহার ভূমি উর্ব্বর ও সমতল। মৃদুমন্দ নাতিশীতোষ্ণ পবন-হিল্লোলে উহার অধিবাসিগণের মনঃপ্রাণ স্বতঃই প্রফুল্লিত হয়। অধিবাসিগণ সরল ও সত্যবাদী। এই স্থানে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-মঠ ও সঙ্ঘারাম বিদ্যমান; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। সেই সকল মঠে প্রায় দুই শত বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করেন। বৌদ্ধ মঠ ব্যতীত চম্পা-নগরে প্রায় কুড়িটী হিন্দু-দেব-মন্দির

অবস্থিত। রাজধানী প্রাকার-পরিখা-বেষ্টিত ও সুরক্ষিত। নগরের অনতিদূরে গঙ্গা-তীরবর্ত্তী প্রদেশে, একটী অনতি-উচ্চ পাহাড় ও তদুপরি একটী মন্দির দৃষ্ট হয়। শুনা যায়, সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা বহু অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। চম্পার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বৌদ্ধ-গ্রন্থসমূহে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। তাহাতে প্রকাশ,—বর্ত্তমান কল্পের প্রারম্ভে, মনুষ্য-সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে, কোনও অজ্ঞাতনামা অপ্সরা স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যে আগমন করেন। কিছু কাল পরে কোনও দেবতার ঔরসে তাঁহার চারিটী পুত্রসন্তান জন্মে। অপ্সরার সেই পুত্রগণের মধ্যে জম্বুদ্বীপ বিভাগীকৃত হইলে, চারি ভ্রাতা জম্বুদ্বীপের চারি অংশে আপন আপন রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের এক জন এই চম্পানগরীতে আপনার রাজধানী নির্ম্মাণ করেন।' চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় চম্পা—'চেন-পা' (Chen-po) নামে অভিহিত। তাঁহার মতে, হিরণ্যপ্রভাত বা মুঙ্গের হইতে উহার দূরত্ব—৩০০ লি বা ৫০ মাইল। নদীপরিবেষ্টিত পাহাড়ের ১৪০ লি হইতে ১৫০ লি (২৩ মাইল হইতে ২৫ মাইল) পশ্চিমে, গঙ্গার তীরে, চম্পার অবস্থিতির বিষয় তাঁহার বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ নগরী একটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত ছিল। পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী দেবমন্দির বিদ্যমান। কানিংহাম বলেন,—'পরিব্রাজকের উক্তরূপ বর্ণনা হইতে প্রতীত হয়, চিত্রের ন্যায় সুদৃশ্য যে পাহাড়টী অধুনা 'পাথরঘাটা' নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই প্রাচীন চম্পানগরীর ধ্বংসাবশেষ। ভাগলপুর হইতে পাথরঘাটার দূরত্ব ২৪ মাইল। সুতরাং উক্ত পাথরঘাটায় অথবা তন্নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে চম্পানগরীর অবস্থিতি হওয়া সম্ভবপর। এই পাথরঘাটার সন্নিকটে পশ্চিমদিকে অধুনা চম্পানগর নামক একটী জনপদ দৃষ্ট হয়। চম্পা নগরের সন্নিকটে আবার চম্পাপুর বা চাঁপাপুর নামক একটী গণ্ডগ্রাম অবস্থিত। বোধ হয়, ঐ স্থানই প্রাচীন চম্পার রাজধানী বলিয়া উক্ত হইত। পরিব্রাজকের গণনাক্রমে চম্পার পরিধি ৪০০০ লি বা ৬৬৭ মাইল। ইহার উত্তরে গঙ্গানদী এবং পশ্চিমে হিরণ্যপ্রভাত বা মুঙ্গের, পূর্ব্বে গঙ্গার শাখা ভাগীরথী এবং দক্ষিণে দামুদ (দামোদর ?) নদী বিদ্যমান। উত্তরে গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তী জঙ্গিরা ও তেলিয়াগলি নগর এবং দক্ষিণে দামোদর-তীরস্থিত পাঞ্চিৎ ও ভাগীরথী-তীরস্থিত কালনা নগর চম্পার অন্তর্ভুক্ত ধরিলে চম্পা-প্রদেশের দৈর্ঘ্য ৪২০ মাইল হইতে পারে। কিন্তু সমগ্র রাজপথ লইয়া দৈর্ঘ্যপরিমাণ ৫০০ শত মাইল দাঁড়ায়। হুয়েন-সাঙের গণনার সহিত ইহার কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পুরাবৃত্তে উল্লেখ আছে,—চম্পার পশ্চিমস্থিত হিরণ্যপ্রভাতের বা মুঙ্গেরের রাজা চম্পার নৃপতি কর্ত্তৃক রাজ্য-চ্যুত হইয়াছিলেন এবং চম্পার পূর্ব্বদিকের কাঙ্গকোল জনপদ চম্পার অধীন রাজ্যমধ্যে পরিগণিত হইত। কানিংহাম বলেন,—পরিব্রাজক হুয়েন-সাং হয় তো ঐ দুই রাজ্য চম্পার অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া পরিধি-পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইলে, এক দিকে লক্ষ্মীসরাই হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাজমহল পর্য্যন্ত এবং অন্য দিকে দামোদরের পার্শ্ববর্ত্তী পরেশনাথ পর্ব্বত হইতে ভাগীরথী তীরবর্ত্তী কালনা পর্য্যন্ত চম্পারাজ্য বিস্তৃত হওয়াও অসম্ভব নহে। সে হিসাবে, চম্পার পরিধি-পরিমাণ—৫০০ মাইল। কিন্তু রাজপথসমূহ চম্পার অন্তর্ভুক্ত গণনা করিলে, চম্পার পরিধি-পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০ মাইল হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

-*:○:*-

কনোজ-রাজ্য।

[কনোজ-রাজ্য,—পুরাবৃত্তে কনোজের প্রসিদ্ধি,—কনোজ-প্রতিষ্ঠা,—নামোৎপত্তির কারণ,—কনোজের প্রাচীন ইতিবৃত্ত,—পরবর্ত্তিকালে কনোজের অবস্থান্তর;—কনোজের অবস্থান-সম্বন্ধে মতভেদ,—প্রাচীনকালের কনোজ-রাজ্যের সীমা-পরিমাণ,—কনোজের শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয়;—প্রাচীন ও আধুনিক কনোজ,—কনোজে হর্ষবর্দ্ধন,—বর্ত্তমান কনোজের সীমানা-নির্দ্দেশ,—কানিংহামের সিদ্ধান্ত;—নেপাল রাজ্য,—নেপালের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মতভেদ,—পরিব্রাজকের বর্ণনায় নেপাল-রাজ্য,—নেপালের ইতিবৃত্ত,—কপিলবস্তু ও প্রসঙ্গোক্ত জনপদাদি,—কপিলবস্তুর সমৃদ্ধির পরিচয়,—নেপালের অবস্থানাদির পরিচয়,—কাকুপুর ও কাপলনগর,—লাম্বিনী উদ্যানে বুদ্ধদেবের জন্ম,—মোক্ষ. শোভাবতী প্রভৃতি নগরীর প্রসঙ্গ,—রামগ্রামের পরিচয়,—পরিব্রাজক-পরিদৃষ্ট রামগ্রামের আধুনিক অবস্থান,—অনোমা বা ঔমা নদী;—পিপ্পলবন,—অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা;—কুশিনগর —বুদ্ধের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি —আধুনিক কুশিনগর।]

কনোজ-রাজ্য পুরাবৃত্তে সুপ্রসিদ্ধ। প্রাচীনত্বে—ত্রেতা যুগ হইতে কনোজ-রাজ্যের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। কণ্যকুব্জ, কান্যকুব্জ, মহোদয়, কান্যাকুব্জ, গাধিপুর, কোশ, কুশস্থল প্রভৃতি নামেও, পুরাণাদি শাস্ত্রে, কনোজের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণে দেখিতে পাই,—কুশের পুত্র কুশনাভ এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। তৎকালে এই নগরী 'মহোদয়' নামে পরিচিত হইয়াছিল। * কুশনাভের নামানুসারে 'মহোদয়' কোশ ও কুশস্থল নামেও অভিহিত হইত। পরিশেষ ঐ নগরীর নাম,—কণ্যকুব্জ, কান্যকুব্জ ও কন্যাকুব্জ নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কুশনাভের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গাধি মহোদয় নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎকালে, তাঁহার নামানুসারে, উহার গাধিপুর নামকরণ হইয়াছিল। কণ্যকুব্জ, কন্যাকুব্জ প্রভৃতি নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে রামায়ণে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন,—ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি কুশনাভ, ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরাতে এক শত পরম রূপ-গুণ-সম্পন্না কন্যা উৎপাদন করেন। একদা যৌবনকালে দিব্যরত্নাভরণে ভূষিত হইয়া, বর্ষাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় জগৎ আলো করিয়া, কন্যাগণ প্রমোদ-উদ্যানে নৃত্য-গীত-বাদ্যে আমোদ-প্রমোদে রত হন। তাঁহাদের রূপচ্ছটায় উদ্যান যেন হাস্যরাশিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। মেঘান্তরাল-মধ্যবর্ত্তী তারকারাজির ন্যায় বিরাজমানা, অনুপম রূপশালিনী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, পরম গুণবতী নবযৌবনসম্পন্না রাজকুমারীগণকে দর্শন করিয়া, বায়ু তাঁহাদিগকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বায়ু কন্যাগণকে বলেন,—'তোমরা মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও। তোমরা অমর হইয়া অক্ষয় যৌবন লাভ করিবে। বায়ুর প্রস্তাবে কন্যাগণ তাঁহাকে পরিহাস করেন, প্রত্যুত্তরে বলেন,—'হে সুরসত্তম! তোমার প্রভাব সকলই আমরা অবগত আছি। তুমি সকলেরই

পুরাবৃত্তে কনোজ-রাজ্য।

* রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৩২শ সর্গ:—"কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্।"

অন্যত্র বিরাজ কর,—সকলেরই অন্তর পরিজ্ঞাত আছ। তবে কেন আজ আমাদিগকে অপমানিত করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমরা স্বাধীনা নহি। পিতা কুশনাভ আমাদিগের প্রভু ও পরম দেবতা। তিনি যাহার হস্তে আমাদিগকে সম্প্রদান করিবেন, তিনিই আমাদের পতি হইবেন। কাম-বশতঃ, সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া আমাদিগের স্বয়ম্বরা হইবার প্রবৃত্তি হউক,—এরূপ সময় যেন কদাচ উপস্থিত না হয়।' কন্যাগণের এবম্বিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় ক্রোধপ্রযুক্ত, ভগবান বায়ু তাঁহাদিগের শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত অবয়ব ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। কন্যাগণ গৃহপ্রত্যাগমন করিলে অমিততেজা রাজা কুশনাভ কন্যাদিগকে ভগ্না ও দীনা দেখিয়া সবিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ধর্ম্মকে অবমাননা করিয়া কে তোমাদিগকে কুব্জা করিয়াছে, শীঘ্র বল?' কন্যাগণ পিতার নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। অশুভ-মার্গ অবলম্বন করিয়া, বায়ু যেরূপে ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে, যেরূপে কন্যাগণের ধর্ষণা করিতে বাসনা করিয়াছে এবং কন্যাগণ যেরূপভাবে কুলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে,—মহামতি কুশনাভ একে একে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিশেষ চিন্তাকুলিত হইলেন। অতঃপর কন্যাগণের বিবাহের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। সেই সময় ব্রহ্মদত্ত নামক জনৈক নৃপতি কাম্পিল (কাম্পিল্য) নামক পুরীতে বাস করিতেছিলেন। কুশনাভ সেই ব্রহ্মদত্ত রাজাকে শত কন্যা দান করিলেন। ব্রহ্মদত্ত কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিবা মাত্র, কন্যাগণ বিগতকুব্জা, বিগতজ্বরা এবং পরমা শোভাশালিনী হন। * বায়ু কর্ত্তৃক কন্যাগণ কুব্জা হইয়াছিলেন বলিয়াই মহোদয় বা গাধিপুর নগরী কন্যকুব্জ, কান্যকুব্জ বা কন্যাকুব্জ নামে অভিহিত হইয়াছে। মহোদয় বা কান্যকুব্জ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কুশ কোন্ বংশজ এবং কাহার সন্তান, রামায়ণে সে পরিচয় পাওয়া যায় না। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রাত্মজ কুশের কুশনাভ নামক কোনও পুত্রের উল্লেখ নাই। সেখানে কুশের কোনও পুত্রের নামই দৃষ্ট হয় না। তবে পুরাণাদি শাস্ত্রে, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, শিবপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে, সূর্য্য-বংশোদ্ভব কুশের পুত্রের নাম—অতিথি। † তদ্ভিন্ন কুশের অন্য কোনও পুত্রের নামোল্লেখ নাই। হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে, ব্রহ্মপুরাণে বায়ুপুরাণে, মৎস্যপুরাণে, চন্দ্রপুত্র পুরূরবার অধস্তন দশম পুরুষে, কুশ নামা জনৈক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। ‡ তাঁহার চারি পুত্র—কুশিক, কুশনাভ, কুশাশ্ব, মূর্ত্তিমান। সম্ভবতঃ চন্দ্রবংশীয় এই কুশ-পুত্র কুশনাভই 'মহোদয়' নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরাণাদি গ্রন্থে কুশ-নাভের কোনও পুত্র-সন্তান ছিল না বলিয়াই প্রকাশ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কুশনাভের

* রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৩২শ সর্গ, ১১শ—২০শ শ্লোক এবং ৩৩ সর্গ, ১ম—২৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, চতুর্থ অধ্যায়, ৪৮শ শ্লোক; ব্রহ্মপুরাণ, ৮ম অধ্যায়; অগ্নিপুরাণ, ১১৫ম অধ্যায়; শিবপুরাণ, ৬১শ অধ্যায়; শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ, ১২শ অধ্যায়, ৫২শ শ্লোক।

‡ হরিবংশ, ১৮শ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ, ৭ম অধ্যায়, ৩য় শ্লোক; শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, ১৫শ অধ্যায়; ব্রহ্মপুরাণ, ১০ম অধ্যায় বায়ুপুরাণ, ৯১ম অধ্যায়।

পুত্র গাধির নামানুসারে 'মহোদয়' গাধিপুর নামে পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে গাধি কুশিকের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহারই ঔরসে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অনন্ত অতীতের ঘটনার সামঞ্জস্য-বিধান ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে পুরাণকার বলিয়াছেন,—কুশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গাধি কনোজ-রাজ্যে রাজত্ব করেন। গাধির দেহাবসানে তদাত্মজ বিশ্বামিত্র সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই; সিংহাসনারোহণের কিছুদিন পরেই তিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সংসারত্যাগী হন। বিশ্বামিত্রের পর কোন্ নৃপতি কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরবর্ত্তিকালে কনোজ-রাজ্যের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, শাস্ত্রগ্রন্থে তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। বহু বর্ষ ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া, খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে, গুপ্তবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে, কনোজ-রাজ্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল। গুপ্ত-বংশীয়দিগের রাজ্যাবসানে কনোজ 'মুখারি' রাজবংশের করতলগত হয়। মুখারি-বংশের উচ্ছেদের পর, আবার কিছুকাল পুরাবৃত্তানুসন্ধানে কনোজ-রাজ্যের কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে চীন-পরিব্রাজকগণের বর্ণনা হইতে জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রভাকরবর্দ্ধন, তৎপরে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন কনোজে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রবাদ,—হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব কালে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণকে আনাইয়া গৌড়দেশে বসবাস করাইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কনোজ-রাজ্যের কিরূপ পরিণতি সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা জানা. যায় না। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পালবংশীয় গোপাল মগধে রাজ্যস্থাপন করিলে, পালবংশের অপর এক শাখা কনোজ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পালবংশীয় রাজ্যপালের শাসন সময়ে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে, সুলতান মামুদ (মামুদ গজনী) কনোজ বিধ্বস্ত করেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কনোজে দাক্ষিণাত্যের রাঠোর ক্ষত্রিয়গণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কথিত হয়, চন্দ্রদেব কনোজে রাঠোর-বংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজত্ব-কালে কনোজে অসংখ্য হিন্দু-দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সকল দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ আজিও উত্তর-ভারতের নানা স্থানে চিহ্নিত হইয়া থাকে। রাঠোর বংশের রাজা জয়চন্দ্রের রাজত্ব-কালে মহম্মদ ঘোরী কনোজ-রাজ্য অধিকার করিয়া লন। সেই হইতে কনোজ-রাজ্য হিন্দুরাজগণের হস্তস্খলিত হইয়া মুসলমানদিগের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়। প্রাচীন খোদিত শিলালিপিতে দেবশক্তি নামা কনোজের জনৈক রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। দেবশক্তির বংশধরগণ বহু দিন কনোজে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ বংশ কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত কত দিন কনোজে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। *

* বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে (Bengal Asiatic Society's Journal, Vol, XXXII.) এবং আর্কিয়লজিকাল সার্ভে রিপোর্টে (Archaeological Survey, Vol. XX.) এই বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

কনোজ-রাজ্যের অবস্থিতি সম্বন্ধে নানা মতান্তর দৃষ্ট হয়। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বলেন,—মনুসংহিতার টীকায় কল্লুক ভট্ট পাঞ্চাল দেশকে কান্যকুব্জ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। * তাঁহার মতে—সম্ভবতঃ দক্ষিণ পাঞ্চাল কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে পারে। কিন্তু অধুনা কানপুরের পশ্চিমাংশে প্রাচীন কান্যকুব্জ চিহ্নিত হইয়া থাকে। কথিত হয়, ঐ স্থানে প্রাচীন কান্যকুব্জের ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং কনোজ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—সাঙ্কিশার দুই শত লি বা তেত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কনোজ অবস্থিত ছিল। সাঙ্কিশা—গঙ্গানদীর 'দোয়াব' প্রদেশে অবস্থিত, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। † ফা-হিয়ানের বর্ণনায়ও ঐ একই দূরত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হই। পরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়,—খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কনোজ-রাজ্য ৬৬৭ মাইল পরিধিযুক্ত ছিল। ইহাতে গঙ্গা নদীর উত্তরস্থিত কতকগুলি জনপদ এবং নদীর দক্ষিণ-দিগ্‌বর্ত্তী জলময় প্রদেশের কতকাংশ কনোজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া প্রতীত হয়। হুয়েন-সাঙের গণনাক্রমে, ঘর্ঘরা-নদীর তীরবর্ত্তী খয়রাবাদ ও তান্দা জেলার মধ্যস্থিত সমগ্র ভূ-খণ্ড এবং যমুনা-তীরবর্ত্তী এটোয়া ও এলাহাবাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহ, কনোজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের বর্ণনায় প্রকাশ,—কনোজ-রাজ্য সঙ্কীর্ণ অথচ বহুবিস্তৃত ছিল। প্রাচীন কালে নেপাল এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ত্তমান চম্বল ও বানাস হইতে আজমীঢ় পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করিলে, প্রাচীন কনোজের পশ্চিম সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ‡ কর্ণেল টড "রাজস্থান" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—মুসলমান-রাজত্বের সময়েও কনোজ রাজ্যের ঐরূপ সীমা পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। § প্রবাদ এই, পুরাকালে কনোজ ৮৪টী মহল্লায় বিভক্ত ছিল। অধুনা তাহার ২৪টী মাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন কনোজ-নগর গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। তখন সে স্থানে অসংখ্য দেবমন্দির এবং বৌদ্ধগণের চৈত্য ও সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধুনা ঐ নগরীর যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক নহে। ১০১৬ খৃষ্টাব্দে মামুদ গজনী যখন ঐ নগরী আক্রমণ করিতে যান, তখন নগরের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। 'ফেরিস্তা'

কনোজের অবস্থানাদি।

---

* মনুসংহিতায় (দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯শ শ্লোক) লিখিত আছে,—

'কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ। এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥'

ইহার টীকায় কল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন,—"কুরুক্ষেত্রমিতি মৎস্যাদি শব্দা বহুবচনান্তা এব দেশবিশেষবাচকাঃ পাঞ্চালাঃ কান্যকুব্জদেশাঃ শূরসেনকা মথুরাদেশাঃ এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ কিঞ্চিদূনঃ।" ইহাতে কল্লুক-ভট্ট পাঞ্চাল, কান্যকুব্জ প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বুঝা যায়। সুতরাং এল্‌ফিন্‌ষ্টোন যে বলিয়াছেন,—পাঞ্চাল ও কান্যকুব্জ একই রাজ্য, তাহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন,—"The indentity of Canouj and Panchala is assumed in Menu, II. 19."—*Vide* Elphinstone's *History of India*, P. 230.

† পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

‡ *Vide*, Elphinstone's *History of India*.

§ *Vide* Col. Tod's *Rajasthan*, Vol. II.

গ্রন্থে লিখিত আছে,—'মামুদ যখন কনোজ আক্রমণ করেন, তখন নগরী যেন আকাশ চুম্বন করিতেছিল। নগরীর আকৃতি এবং দৃঢ়ত্ব দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, বুঝি ইহার দ্বিতীয় নাই।' * মামুদির বর্ণনায় আবার প্রকাশ—দশম শতাব্দীতে কনোজ একটী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী জনপদ মধ্যে পরিগণিত হইত এবং এই নগর ভারতের রাজচক্রবর্ত্তিগণের রাজধানী ছিল। ইবন্ ওয়াহাবের অনুসরণে আবু জাইদও লিখিয়া গিয়াছেন,—'গোজার রাজ্যে কাহুজী (Kaluje) একটী বিশেষ ক্ষমতাশালী জনপদ।' উচ্চারণ দোষে কনোজই যে কাহুজী নাম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যখন কনোজ-নগর দর্শন করেন, তখন নগরীর দৈর্ঘ্য ২০ লি বা ৩।০ মাইল এবং প্রস্থ ৪ বা ৫ লি অর্থাৎ ৮০ মাইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। নগরের চতুষ্পার্শ্বে দুর্ভেদ্য উচ্চ প্রাচীর সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া শত্রুর প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল। তদন্তে বিস্তৃত পরিখা বৃত্তাকারে নগরটীকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত ছিল। সম্মুখে, পূর্ব্বদিকে, পুণ্যতোয়া গঙ্গা-নদী নগরীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া সাগর সঙ্গমে গমন করিতেছিলেন। অসংখ্য মন্দির, বৌদ্ধ মঠ ও সঙ্ঘারামসমূহ নগরের শোভা-সম্বর্দ্ধন করিতেছিল। সেই প্রাচীন নগরীর গৌরব এখন এতই বিলুপ্ত হইয়াছে যে, অধুনা তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমির গ্রন্থে 'কানোগিজ' (Kanogiza) নামক জনপদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনি উহাকে 'কলিনিপক্ষ' (Calin paxa) নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'কনোজ' ও কলিনিপক্ষ' যে কনোজেরই রূপান্তর, পাশ্চাত্য ভাষায় ঐরূপে উচ্চারিত হইয়াছে,—তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যৎকালে কনোজে পদার্পণ করেন, তখন রাজা হর্ষবর্দ্ধন কনোজের সিংহাসনে অধিরূঢ় ;—উত্তর ভারতে তৎকালে হর্ষবর্দ্ধনের ন্যায় পরাক্রমশালী কোনও নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায় না। হুয়েন-সাং তাঁহাকে বৈশ্যবংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন মালব ও বল্লভী রাজপুতগণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। সে হিসাবে, হর্ষবর্দ্ধনের বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব হওয়াই সম্ভব। বৈশ্য-রাজপুতগণের রাজ্য সে সময়ে লক্ষৌ হইতে খারা মাণিকপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং অযোধ্যার সমগ্র দক্ষিণ ভাগ তাঁহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিত। হর্ষ-বর্দ্ধনের রাজত্ব-কালে, কনোজে এক শত বৌদ্ধ-মঠ বিদ্যমান ছিল এবং সেই মঠসমূহে দশ সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত কনোজে তখন এক শত হিন্দু-দেবদেবীর মন্দিরও বিদ্যমান ছিল। কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়,—প্রাচীন কনোজ নগরী, উত্তরে রাজঘাটের সন্নিকটস্থ 'হাজি হারমান' মসজিদ হইতে দক্ষিণে 'মিরণকা সরাই' পর্য্যন্ত তিন মাইল বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বপ্রান্তে গঙ্গার প্রাচীন ধারা অথবা ছোট-গঙ্গা বা কালানদী হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে কপোতীয় (Kapatya) ও মকরন্দ নগর পর্য্যন্ত

প্রাচীন ও আধুনিক কনোজ।

"He there saw a city which raised its head to the skies, and which in strength and structure might justly boast to have no equal."—*Vide* Brigg's *Ferishta,* Vol. I.

সমগ্র জনপদ কনোজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। * কথিত হয়,—পূর্ব্বে কালি বা কালিন্দী নদী, সঙ্গীগ্রামপুর বা সংগ্রামপুরের নিকট গঙ্গায় নিপতিত হইতেছিল। কিন্তু কয়েক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে গঙ্গার ধারা আরও উত্তরগামী হওয়ায় কালী নদীর মোহানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সংগ্রামপুরের নিকট কালী নদীর অস্তিত্ব আজিও কল্পিত হইয়া থাকে। কানিংহামও সংগ্রামপুরের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীকে কালী নদী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উহাই যে পূর্ব্বে গঙ্গার ধারা ছিল, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের বর্ণনায়ও কনোজের অবস্থান-সম্বন্ধে একইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন নগরের উত্তরাংশটুকু মাত্র অধুনা কনোজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থান এক্ষণে কিল্লা বা দুর্গ নামে অভিহিত। উত্তরে হাজি-হারমায়ন মসজিদ, দক্ষিণ-পশ্চিমে 'তাজবাজ' কবর, দক্ষিণ-পূর্ব্বে মসজিদ ও মুকদম জাহানীয়া কবর,—এতৎসীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থান এক্ষণে কনোজ-নগরী বলিয়া উক্ত হয়। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে নগরীর পরিমাণ—এক বর্গ মাইল; কিন্তু নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ষোল হাজারের অধিক নহে। দুর্গটী ত্রিভুজাকার। দুর্গের উত্তরে হাজি-হারমায়ন মসজিদ, দক্ষিণ-পশ্চিমে অজয় পালের মন্দির এবং তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে 'ক্ষেম কালী বুরুজ' নামক বিস্তৃত পরিখা। প্রাচীন কনোজ-নগরীর অধুনা দুইটী সিংহদ্বার নির্দ্দেশ করা হয়। একটী নগরের উত্তরে, হাজি হারমায়ন মসজিদের সন্নিকটে, অপরটী ক্ষেমকালী-বুরুজের অনতিদূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত ছিল। যাহা হউক, চীন-পরিব্রাজকগণের বর্ণনা হইতে কানিংহাম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন সময়ে গঙ্গা-নদীর (অধুনা যাহাকে ছোট গঙ্গা বলে) তীরবর্ত্তী হাজি-হারমায়ন হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' রাজপথ পার্শ্বস্থিত মকরন্দ-নগর পর্য্যন্ত কনোজ-নগরী বিস্তৃত ছিল। তখন ইহার দৈর্ঘ্য তিন মাইল এবং প্রস্থ এক মাইল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সীমানার মধ্যেই অধুনা কনোজের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নের ভগ্নাবশেষসমূহ পরিদৃষ্ট হয়।

কনোজ-রাজ্যান্তর্ভুক্ত নেপাল অতি প্রাচীন জনপদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে নেপাল নামধেয় কোনও স্বতন্ত্র রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

নেপাল-রাজ্য।

মহাভারতে, ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে, সর্ব্বদর্শী সঞ্জয় ভারতবর্ষের তাৎকালিক যে সকল জনপদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, উত্তর ভারতের জনপদ প্রসঙ্গে নানা কথাই তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তন্মধ্যে নেপালের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। রামায়ণেও নেপালের কোনও পরিচয়

* কনোজের যে ভগ্নাবশেষ অধুনা বিদ্যমান, তদ্দর্শনে হুয়েন-সাঙের কনোজ-বর্ণনার সহিত কানিংহাম একমত হইতে পারেন নাই। তিনি স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন,—"In comparing Hwen Thsang's description of ancient Kanoj with the existing remains of the city, I am obliged to confess with regret that I have not been able to identify even one solitary site with any certainty; so completely has almost every trace of Hindu occupation been obliterated by Musalmans."—*Vide* Cunningham's *Ancient Geography of India, Vol. I.*

নাই। এমন কি, বরাহমিহির-কৃত 'বৃহৎ-সংহিতা' গ্রন্থেও নেপাল নামক কোনও জনপদের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং নেপাল প্রাচীন কালে ভিন্ন-নামে পরিচিত থাকাই সম্ভব। বৌদ্ধ-প্রাধান্যের সম-সময়ে বা তাহার পরবর্ত্তী কালে নেপাল নাম দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন,—চন্দ্রবংশীয় নীপ নামক নরপতি এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহারই নামানুসারে পরবর্ত্তি-কালে উহার 'নেপাল' নামকরণ হইয়াছিল। চন্দ্রবংশোদ্ভব এই নীপ নৃপতি যযাতি-পুত্র পুরুর অধস্তন একচত্বারিংশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। তাঁহারই অধস্তন তৃতীয় পুরুষে রাজচক্রবর্ত্তী পৃথু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পৃথুর পূর্ব্বে 'নেপাল' নামকরণ হইলে শাস্ত্রগ্রন্থে কোন-না-কোন স্থানে নেপালের উল্লেখ থাকিত। সুতরাং নীপ কর্ত্তৃক নেপালের প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে স্বতঃই মতভেদ ঘটিয়া থাকে। নীপ কর্ত্তৃক নেপালের প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, নেপাল-রাজ্য যে প্রাচীন রাজ্য, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে নেপালের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের বিবরণী হইতে আমরা নেপালের যে ইতিবৃত্ত অবগত হইতে পারি, তদ্ব্যতীত নেপালের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। চীন-পরিব্রাজকদিগের বিবরণে 'নি-পো-লো' (Ni-po-lo) নামক এক অভিনব জনপদের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন,—উহা নেপালের নামান্তর; চীনাভাষায় উহা নি-পো-লো রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। 'ব্রিজি' পরিদর্শন করিয়া পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ঐ নগরে আগমন করেন। তাঁহার মতে, 'নি-পো-লো' বা নেপাল—ব্রিজি হইতে ১৫০০ লি (২৩৩ মাইল হইতে ২৫০ মাইল) দূরে অবস্থিত। জনকপুর হইতে নেপালে আসিবার দুইটী পথ বিদ্যমান। একটী, কমলা নদীর পথে; অপরটী বাঘমতী বা ভগবতী নদীর তীরদেশ দিয়া। উভয়ের দূরত্বই প্রায় দেড় শত মাইল। নেপাল রাজ্যের পরিধি ৪০০০ লি বা ৬৬৭ মাইল। কানিংহাম বলেন,—'এ গণনা ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে; কেননা ইহাতে রাজ্যের পরিমাণ বড়ই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। ইহাতে বুঝা যায়, গণ্ডক-তীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য দেশ পুরাকালে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া উক্ত হইত। কিন্তু সেরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।' কানিংহামের বর্ণনায় প্রতীত হয়,—কাশীনদীর শাখানদীসমূহ (সপ্তকৌশিকী) এবং গণ্ডকের তীরবর্ত্তী সমুদয় প্রদেশ নেপাল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে হিসাবে, নেপাল-রাজ্যের পরিধি ৬০০০ লি বা ১০০০ মাইল দাঁড়াইতে পারে। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-সময়ে লিচ্ছবি জাতীয় ক্ষত্রিয় নরপতি আশুবর্ম্ম নেপালে রাজত্ব করিতেন। কোনও কোনও ইতিহাসে তিনি অংশুবর্ম্ম নামেও অভিহিত হইয়াছেন। আশুবর্ম্মের পরবর্ত্তী পঞ্চদশ পর্য্যায়ে রাঘবদেবের নাম দৃষ্ট হয়। কথিত হয়, তিনি ৮৮০ খৃষ্টাব্দে একটী 'নেওয়ার' অব্দ প্রচলন করেন। অংশুবর্ম্মার ঊর্দ্ধতন সপ্তত্রিংশৎ পর্য্যায়ের নেওয়ারিত নামধেয় জনৈক নৃপতি নেপাল রাজ্য জয় করেন বলিয়া পুরাবৃত্তে উক্ত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে জানা যায়, তিনি খৃষ্ট-জন্মের চারি বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিব্বত এবং লাদাকের রাজগণ এই লিচ্ছবিগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

কনোজ-রাজের প্রসঙ্গে কপিলবস্তুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্থানে বুদ্ধদেব নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া শাক্যরাজপুরী পবিত্র করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র এসিয়া-খণ্ড পরিপ্লাবিত করিয়াছিল। এই স্থানই বৌদ্ধযুগে সুখমোক্ষের আধার বলিয়া উক্ত হইত। বৌদ্ধ-প্রাধান্যের পূর্ব্বে কপিলবস্তুর * কোনও পরিচয় সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের সিদ্ধি-লাভের সমসময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে কপিলবস্তু প্রসিদ্ধি লাভ করে,—ইহাই অনেকে বলিয়া থাকেন। তবে প্রাচীন পরিচয়ের মধ্যে এই মাত্র জানা যায় যে, পুরাকালে কপিলবস্তু নগরে শাক্যরাজগণ রাজত্ব করিতেন। শাক্যগণ—শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর। বৌদ্ধ-গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের সমসময়ে কপিলবস্তু নগরীতে অসংখ্য লোকের বাস ছিল। মনোহর উদ্যান, সুরম্য হর্ম্ম্যমালা, বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত রাজপ্রাসাদ-সমূহ নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। নানা দিগ্দেশ হইতে জনগণ আসিয়া কপিলবস্তু নগরে বসবাস করিত। কপিলবস্তু সৌভাগ্য-শ্রীর লীলানিকেতন ছিল। চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এবং তাঁহার পরবর্ত্তী হুয়েন-সাং যে সময়ে কপিলবস্তু নগর দর্শন করেন, তখনও কপিলবস্তুর সৌভাগ্যসম্পদ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। হুয়েন-সাঙের সময়ে ঐ নগরের পরিধি ৬৬৭ মাইল (৪০০০ লি) নির্দ্দিষ্ট হইত। গঙ্গা ও গণ্ডকের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র দেশ, ফয়জাবাদ হইতে নদীদ্বয়ের শাখানদী সমূহ পর্য্যন্ত, তখনও কপিলবস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রবাদ এই—সূর্য্যবংশীয় গোতমের কোনও বংশধর রোহিণীনদীতীরে কোশল-রাজ্যে এই কপিলবস্তু প্রতিষ্ঠা করেন। গোতম কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোন্ পর্য্যায়ে অবস্থিত, বংশলতা-দৃষ্টে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন, অধুনা যে স্থান 'নগর' নামে পরিচিত, প্রাচীন কপিলবস্তু সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। হুয়েন-সাঙের বর্ণনাক্রমে বুঝা যায়, তিনি শ্রাবস্তী হইতে কপিল-নগরে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে শ্রাবস্তী হইতে কপিলের দূরত্ব—৫৯৯ লি বা ৮৩ মাইল। ফা-হিয়ানের বর্ণনার সহিত ইহার একটু তারতম্য দৃষ্ট হয়। ফা-হিয়ানের হিসাব-মতে শ্রাবস্তী হইতে কপিলের দূরত্ব—১৩ যোজন বা ৯১ মাইল। উভয়ের বর্ণনা হইতে কপিলের এবং ক্রকুচণ্ডের † জন্মস্থানের অবস্থান সম্বন্ধে একটু সমস্যায় পড়িতে হয়। হুয়েন-সাং প্রথমে কপিল দর্শন করিয়া পরে ক্রকুচণ্ডের জন্মস্থান পরিদর্শন করেন। কপিল ও ক্রকুচণ্ডের জন্মস্থানের ব্যবধান—এক যোজন বা সাত মাইল। ক্রকুচণ্ডের জন্মস্থান ককুয়া নামে অভিহিত হয়। নগর হইতে উহার দূরত্ব প্রায় ৮ মাইল। পণ্ডিতগণ বলেন,—ককুয়া এবং কপিল নগর অভিন্ন। নগর-সহরটী—চণ্ডতাল নদীর পূর্ব্ব তীরে

কপিলবস্তু ও প্রসঙ্গোক্ত জনপদ।

---

* কপিল সম্বন্ধে "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ ও ত্রিংশ পরিচ্ছেদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। কথিত হয়, এই স্থানে কপিল মুনির আশ্রম ছিল বলিয়া নগরীর নাম কপিলবস্তু বা কপিল-নগর হইয়াছিল।

† ক্রকুচণ্ড—সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক। তিনি মেখলাধিপতি ক্ষেম রাজার পুরোহিত ছিলেন।

অবস্থিত। উহার এক দিকে রাপ্তী নদীর কোহানা নামক একটী শাখা-নদী প্রবাহমান। পশ্চিম দিকে সিদ্ধ নামক অপর একটী নদী নগর পার্শ্ববর্ত্তী একটি হ্রদে পতিত হইতেছে। প্রবাদ এই,—এই নদীর তীরে কপিল মুনির সিদ্ধাশ্রম ছিল এবং তদনুসারে নদীর নাম 'সিদ্ধ' হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে রোহিণী নদীর নামোল্লেখ হইয়াছে, তাহার অবস্থান-সম্বন্ধে চীন-পরিব্রাজকগণের বর্ণনার ও সিংহল-দ্বীপের পুরাবৃত্তের বর্ণনার মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় না। পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এই নগরের অন্তর্গত লান্-মিং (Lun-ming) বা লাম্বিনী নামক একটি উদ্যানের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কথিত হয়, ঐ প্রমোদ-উদ্যানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কপিল নগরের ৫০ লি বা প্রায় ৪।৵০ মাইল পূর্ব্বে এই প্রমোদ-উদ্যান অবস্থিত ছিল। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় এই প্রমোদ-উদ্যান 'লা-ফা-নি' নামে অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার মতে,—উহা একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী-তীরে অবস্থিত ছিল। সিংহল-দেশীয় পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায়, রোহিণী-নদী কপিল ও কোলি নগর-দ্বয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। কোলি—বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর জন্মস্থান বলিয়া উক্ত হয়। ইহার অপর নাম—ব্যাঘ্রপুর। কপিল এবং কোলি নগরদ্বয়ের মধ্যে 'লাম্বিনী' নামক শালবন অবস্থিত। উভয় নগরের অধিবাসীরা বিশ্রামার্থ সেই বনে গমন করিত। * সেই বনে মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যত্র আবার দৃষ্ট হয়,—একদা অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে, কোলি ও কপিলের অধিবাসিগণ রোহিণীর জল-বিভাগ লইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই সকল বিবরণ হইতে রোহিণী নদীর অবস্থান-বিষয়ে কানিংহাম লিখিয়াছেন,—রোহিণী নদী আধুনিক 'কোহানা' হওয়াই সম্ভব। নগরের ৬ মাইল পূর্ব্ব দিকে এই নদী প্রবাহমান। বুকানন ইহারই নাম কোয়ানি (Koyane) লিখিয়া গিয়াছেন। কপিলবস্তুর অন্তর্গত কোলি জনপদের অবস্থান-নিরূপণে একটু সমস্যায় পড়িতে হয়। কানিংহামের মতে, কোহানার তিন মাইল দূরে, নগরের এগার মাইল পূর্ব্বে, অধুনা যে 'আম কোহিল' পল্লী দৃষ্ট হয়, উহাই সম্ভবতঃ প্রাচীন কোলি জনপদ। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে আবুল-ফজেল বুদ্ধদেবের জন্মস্থানকে 'মোক্ত' (Mokta) নাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মোক্ত—মোক্ষ শব্দের অপভ্রংশ। ফা-হিয়ানের মতে ক্রকুচন্দের জন্মস্থান—'না-পি-কিয়া' (Na-pi-kia)। বৌদ্ধগ্রন্থানুসারে উহার নাম—ক্ষেমবতী বা খেমবতী। সিংহলদেশীয় পুরাণে ক্রকুচন্দ —সেখলাধিপতি ক্ষেম রাজার দ্বার-পুরোহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ক্রকুচন্দের জন্মস্থানের অবস্থিতি-সম্বন্ধে ফা-হিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন,—কপিল নগরের কিছু পশ্চিম দিকে, উত্তর-পশ্চিম কোণে, এক যোজন বা সাত মাইল দূরে, ঐ নগর অবস্থিত। কিন্তু হুয়েন-সাঙের মতে—উহা কপিল নগরের দক্ষিণে ; উহার দূরত্ব—৫০ লি বা প্রায় ৮।৵০ মাইল। নগরের সাত মাইল দক্ষিণে, 'কালওয়ারি খাসের' অনতিদূরে, আজিও

* হার্ডি তাঁর 'ম্যানুয়েল-অব-বুদ্ধিজম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"Between the two cities there was a garden of *Sal* trees called *Lumbini*, to which the inhabitants of both cities were accustomed to resort for recreation."—*Vid* Hardy's *Manual of Budhism*.

ঐ স্থান চিহ্নিত হইয়া থাকে। ক্রকুচণ্ডের জন্মস্থান 'কাকুনগরের' বা ক্ষেমবতীর দক্ষিণে কনকমুনি নামক আর একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-তীর্থস্থান বিদ্যমান। মহাবংশ' গ্রন্থে ঐ নগরী 'শোভাবতী' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। নগরের ৬৷৷০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং কাকুয়ার ৬৷৷০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে শুভপুরস নামক একটি নগর দৃষ্ট হয়। কানিংহাম বলেন, উহাই প্রাচীন-শোভাবতী নগরীর ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বৌদ্ধগণের আর একটি পবিত্র তীর্থস্থান—রামগ্রাম। বৌদ্ধ-প্রাধান্য সময়ে ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কপিল দর্শন নন্তর চীন-পরিব্রাজকদ্বয় এই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উচ্চারণে ঐ স্থান 'লান-মো' (Lan-mo) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন,—পরিব্রাজকগণের 'লান-মো' এবং বৌদ্ধ-পুরাবৃত্তের 'রামগ্রাম' অভিন্ন। পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের মতে, কপিল হইতে উহার দূরত্ব পূর্ব্ব দিকে ৫ যোজন বা ৩৫ মাইল; এবং হুয়েন-সাঙের মতে দুই শত লি বা ৩৩৷৴০ মাইল। পরিব্রাজকদ্বয়ের বর্ণনায় মতানৈক্য না থাকিলেও, কানিংহাম তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় সত্যের কিছু অপলাপ হইয়াছে। সুতরাং কানিংহাম বৌদ্ধদিগের পুরাবৃত্তের অনুসরণে বৌদ্ধমতই গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে কপিল হইতে রামগ্রামের দূরত্ব—৪২ মাইল নির্দ্দিষ্ট হয়। কানিংহাম এতৎসম্বন্ধে একটি হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'পরবর্ত্তি-কালে পরিব্রাজকদ্বয় যখন অনোমা (Anoma) নদী তীরে উপনীত হন, তাঁহাদের মধ্যে ফা-হিয়ান রামগ্রাম হইতে অনোমার দূরত্ব তিন যোজন বা একুশ মাইল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু হুয়েন-সাঙের মতে এই দূরত্ব—১০০ লি বা ১৬৷৷৴০ মাইল। তাহা হইলে, কপিল হইতে অনোমা, ফা-হিয়ানের মতে, ৮ যোজন বা ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিত; এবং হুয়েন-সাঙের মতে, কপিল হইতে অনোমার ব্যবধান—৩০০ লি বা ৫০ মাইল। বৌদ্ধ-পুরাবৃত্তের হিসাবের সহিত ইহার বিশেষ অসামঞ্জস্য।' কানিংহামের মতে, আধুনিক ওঁমি (Aumi) নদীই প্রাচীন অনোমার স্থান অধিকার করিয়া আছে। নগর হইতে এই নদীর দূরত্ব—৪০ মাইল। রামগ্রামের অবস্থিতি-সম্বন্ধে পরিব্রাজকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—নগর এবং অনোমা-নদীর মধ্যস্থলে উহা অবস্থিত ছিল। তাঁহাদের বর্ণনানুসারে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, সেখানে অধুনা 'দেওয়ালি' নামক একটি জনপদ বিদ্যমান। তথায় একটি ভগ্নস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। অনেকে অনুমান করেন, 'মহাবংশে' যে স্তূপের গঙ্গাস্রোতে ভগ্ন হওয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে, ইহা তাহারই শেষ পরিচয়-চিহ্ন। প্রকাশ—বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি যখন আট ভাগে বিভক্ত হয়, তখন তাহার একটি অংশ রামগ্রামে স্থাপিত হইয়াছিল। তদুপরি একটি স্তূপ নির্ম্মিত হয়। কয়েক বৎসর পরে মগধরাজ অজাতশত্রু সাত খণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাজগৃহের একটি মঠে সংস্থাপিত করেন; কিন্তু অষ্টম খণ্ড রামগ্রামেই রহিয়া যায়। সিংহল দেশীয় পুরাবৃত্তে উল্লিখিত হইয়াছে,—রামগ্রামের সেই স্তূপ গঙ্গার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রে পতিত হয়। জল-দেবতা নাগগণ সেই স্তূপটী তাঁহাদের রাজাকে প্রদান করেন। নাগরাজ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া

তন্মধ্যে সেই স্তূপটি স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৬১ হইতে ১৩৭ বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ-ভিক্ষু সেনুত্তারো নাগ-রাজের নিকট হইতে নানা কৌশলে স্তূপটি উদ্ধার করিয়া সিংহল-রাজ দথগামিনীকে প্রদান করেন। লঙ্কাদ্বীপের 'মহাথুপ' নামক বৃহৎ মঠে তিনি নবপ্রাপ্ত স্তূপটি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, চীন-পরিব্রাজকগণ যখন রামগ্রাম দর্শন করেন, তখন উহার নিকটে কোনও নদীর বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয় নাই। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে পরিব্রাজক ফা-হিয়ান স্তূপের সন্নিকটে একটি সরোবর দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, ঐ সরোবরে নাগরাজ বাস করিতেন এবং সর্ব্বদা মঠ প্রহরা দিতেন। নাগগণ প্রত্যহ মনুষ্য-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্তূপের অর্চ্চনা করিত। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে পরিব্রাজক হুয়েন-সাং সেই মঠ ও সেই সরোবর দেখিয়াছিলেন এবং নাগরাজের সেই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই,—অশোক যখন স্তূপটি আপনার রাজধানীতে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়াস পান, নাগরাজ সে সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—'যদি তুমি সাধনা-বলে এতদপেক্ষা সুদৃশ্য মঠ নির্ম্মাণ করিতে ক্ষমবান হও, এই মঠ ধ্বংস কর। কেহ কোনও বাধা দিবে না। ইত্যাদি।' উল্লিখিত বর্ণনা-সমূহ হইতে ক্যানিংহাম স্থির করিয়াছেন,—'রামগ্রামের সরোবর সিংহলদেশীয় পুরাবৃত্তে অতিরঞ্জিতভাবে নদীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এবং হুয়েন-সাং যে সরোবরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই বর্ণনা প্রকৃত ও আড়ম্বরশূন্য। এ হিসাবে, সিংহলদেশীয় পুরাবৃত্তের বর্ণনা কোনমতেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে,—দেওখালি এবং রামগ্রাম অভিন্ন।' পঞ্চম শতাব্দীতে, ফা-হিয়ানের ভারতাগমন সময়ে, রামগ্রাম মরুভূমে পরিণত হইয়াছিল। তখন একটি মাত্র ধর্ম্মমন্দির রামগ্রামে বিদ্যমান ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন-সাং রামগ্রামের সে অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন দেখেন নাই। এক্ষণে প্রাচীন রামগ্রামের অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া একান্ত দুরূহ।

প্রাচীন অনোমা-নদী।

কপিল নগরের পূর্ব্ব দিকে যে অনোমা নদীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, কথিত হয়, বুদ্ধদেব সেই নদী-তীরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ সিদ্ধার্থ কপিল নগর পরিত্যাগ করিয়া বৈশালীর পথে রাজগৃহে উপনীত হন। পরিশেষে দেওখালি হইয়া সংগ্রামপুরের নিকট অনোমা নদী-তীরে আগমন করেন। ইহারই সন্নিকটে 'অমিয়র' হ্রদ বিদ্যমান। অনোমার বা ঔমীর সংস্কৃত নাম—'অবমী।' টার্ণার বলেন,—অবমী শব্দ হীনার্থবাচক। সিংহলের ও ব্রহ্মদেশের জনপ্রবাদ অনুসারে জানা যায়, বুদ্ধদেব আপনার ঘোটক ও অনুচর-বর্গকে বিদায় দিয়া আপনার প্রিয় শিষ্য চণ্ডকে নদীর নাম জিজ্ঞাসা করেন। নদীর নাম অবগত হইয়া তিনি নদীর নাম-সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন ভাবে বুদ্ধদেবের সেই মন্তব্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মদেশীয় পুরাবৃত্ত * অনুসারে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,—"আমি যে স্বর্গীয় সম্পদের কামনা করি,

* বিশপ বিগান্দেত (Bishop Bigandet) ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধপ্রবাদ (Legend of the Burmese

আমি কখনই তাহা লাভের অনুপযুক্ত হইব না।” এই বলিয়া তিনি ঘোটক চালনা করিলে ঘোটকটী এক লম্ফে নদীর পরপারে উপনীত হয়। সিংহলদেশীয় 'বৌদ্ধবংশের আত্মকথা' (Attakatha) হইতে মিঃ টার্ণার এতৎসম্বন্ধে এক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তদনুসারে জানা যায়,—রাজপুত্র সিদ্ধার্থ আপনার অনুচর চণ্ডকে নদীর নাম জিজ্ঞাসা করেন। চণ্ডক উত্তর করেন,—'এই নদীর নাম অনোমা।' চণ্ডকের বাক্য শ্রবণ করিয়া, 'আমার সাধনায় কোনরূপ অনোমার (নীচাশয়তার) প্রশ্রয় দিব না'—এই বলিয়া বুদ্ধদেব ঘোটকে কষাঘাত করেন। ঘোটক এক লম্ফে নদী পার হইয়া পরপারে উপনীত হয়। * চীন-পরিব্রাজকগণের বর্ণনা হইতে জানা যায়—কপিল এবং রাজগৃহের মধ্যে এই নদী প্রবহমান। ব্রহ্ম ও সিংহল দেশীয় পুরাবৃত্তে কপিল হইতে অনোমার দূরত্ব ৩০ যোজন বা ২১০ মাইল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কানিংহাম বলেন, চীন-পরিব্রাজকগণের ভ্রমসঙ্কুল গণনার অনুসরণে পুরাবৃত্তে উক্তরূপ দূরত্ব-পরিমাণ স্থান পাইয়াছে। তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত 'ললিতবিস্তার' গ্রন্থে কপিল হইতে অনোমার দূরত্ব—৬ যোজন বা ৪২ মাইল দৃষ্ট হয়। কানিংহাম বলেন,—'ললিতবিস্তারের হিসাবই ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য। অনোমা নদী বক্রভাবে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত। সেই জন্য নগর হইতে উহার দূরত্ব কোনও স্থলে ৪০ মাইল, আবার কোনও স্থলে ৪৫ মাইল। ললিতবিস্তার গ্রন্থে লিখিত আছে,—অনুবৈণেয় (Anuvaineya) জেলার মণীয় (Manaya) নগরে বুদ্ধদেব অনোমা-নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন। নগরের নাম এক্ষণে অপরিজ্ঞাত। তবে অনৌলা (Anaola) এবং অনুবৈণেয় অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। ঔমী নদীর পশ্চিম-তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ অনুবৈণেয় নামে অভিহিত হওয়া সম্ভবপর। সংগ্রামপুর এবং অমীয়র হ্রদ উহার অন্তর্ভুক্ত। কেহ কেহ বলেন,—বৈণেয় নদীর তীরবর্ত্তী ভূ-ভাগ প্রাচীন কালে অনুবৈণেয় সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে এস্থানে প্রচুর পরিমাণে বংশ জন্মিত। প্রকাশ,—সেই জন্য কিম্বা নদীতীরে 'বংশী' নামক জনপদের বিদ্যমানতা হেতু তৎপার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র ভূ-খণ্ড অনুবৈণেয় নামে অভিহিত হইয়াছিল। অনোমা নদীর পূর্ব্ব তীরে কয়েকটী প্রসিদ্ধ স্থান অবস্থিত। তদনুসারে কানিংহাম সিদ্ধান্ত করেন,—প্রাচীন অনোমা এবং ঔমী নদী অভিন্ন। ললিতবিস্তার মতে,—অনোমা নদীর পরপারে আগমন করিয়া বুদ্ধদেব আপনার অনুচরবর্গকে কপিল নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করেন। প্রকাশ,—চণ্ডের প্রত্যাগমন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সেই স্থানে 'চণ্ডক নিবর্ত্তন' নামে একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। 'চণ্ডক নিবর্ত্তন' শব্দের অপভ্রংশে পরিবর্ত্তিকালে ঐ স্থান 'চণ্ডাবর্ত্ত' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কানিংহাম বলেন,—ঔমী নদীর পূর্ব্বতীরে, গোরক্ষপুরের দশ মাইল দক্ষিণে,

---

Budha) গ্রন্থে বুদ্ধদেবের এই উক্তির নিম্নপ্রকার অনুবাদ করিয়াছেন,—"I will *not* show myself *unworthy* of the high dignity I aspire to."

* প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ টার্ণার 'বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' এইরূপ লিখিয়াছেন। *Vide, Journal of* the *Asiatic Sosiety of Bengal*, Vol. vii.

অমিরর হ্রদের সন্নিকটে, যেখানে অধুনা চন্দোলি গ্রাম বিদ্যমান, ঐ স্থানই পুরাকালে চণ্ডাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইত। প্রবাদ,—এই স্থানে চণ্ডকে বিদায় দিয়া বুদ্ধদেব তরবারি দ্বারা মস্তকের চূড়া ছেদন করিয়াছিলেন। কেশগুচ্ছ ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে, দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন। পরিশেষে দেবগণ কর্তৃক ঐ স্থানে 'চূড়াপতিগ্রহ' নামক একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রচলিত ভাষায় 'চূড়াপতিগ্রহ'—চূড়াগ্রহ নামে অভিহিত। কানিংহাম বলেন,—চন্দোলির তিন মাইল উত্তরবর্ত্তী আধুনিক 'চুড়েয়' (Chureya) গ্রামই পুরাবৃত্ত-প্রসিদ্ধ 'চূড়াপতিগ্রহ' বা 'চূড়াগ্রহ।' মস্তকমুণ্ডনানন্তর সিদ্ধার্থ বারাণসীর অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্রনির্ম্মিত আপনার 'কাশায়' নামক রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, গৈরিক বসন পরিধান করেন। সেই স্থানে বৌদ্ধগণ 'কাশায়গ্রহণ' নামক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চন্দোলির সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অধুনা 'কাশেয়র' (Kaseyar) নামক একটি পল্লী দৃষ্ট হয়। কানিংহাম বলেন,—উহাই প্রাচীন 'কাশেয়গ্রহণ'। চীন-পরিব্রাজকগণ উল্লিখিত স্থান-সমূহের অবস্থান-বিষয়ে যে বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত ঐ স্থানের বিশেষ কোনও তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহাদের বর্ণনা অনুসারে চুড়েয় হইতে কাশেয়রের দূরত্ব ছয় মাইল হইতে পারে।

অনোমা নদীর তীরদেশ হইতে চীন-পরিব্রাজকগণ 'পিপ্পল-বন' নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-তীর্থে উপনীত হইয়াছিলেন। পিপ্পল বা অশ্বত্থ-বৃক্ষের প্রাচুর্য্যহেতু ঐ স্থান পিপ্পলবন বলিয়া উক্ত হয়। শাস্ত্রগ্রন্থে পিপ্পল-বনের নামোল্লেখ নাই। তবে বৌদ্ধ-পুরাবৃত্তের আলোচনায় প্রতীত হয়,—এই স্থানে বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল; আর তাঁহারই চিতাভস্মের উপর প্রসিদ্ধ পিপ্পল-বনের পবিত্র স্তূপ নির্ম্মিত হয়। এই নগরে তখন 'মরীয়' (Moriya) নামধেয় জাতি বাস করিত। 'মরীয়'—মৌর্য্য-শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই প্রতীত হয়। মরীয়গণ বুদ্ধদেবের চিতাভস্মের কতকাংশ প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধ-গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ফা-হিয়ান বলেন,—অনোমা-নদীর চারি যোজন বা ২৯ মাইল পূর্ব্বদিকে ঐ স্তূপ অবস্থিত ছিল। কিন্তু হুয়েন-সাঙের বর্ণনাক্রমে অনোমা হইতে উহার দূরত্ব ১৮০ লি হইতে ১৯০ লির (৩০ মাইল হইতে ৩২ মাইলের) মধ্যে। ফা-হিয়ানের বর্ণনায় নগরটীর নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সিংহল ও ব্রহ্মদেশীয় পুরাবৃত্তে ঐ স্থান 'পিপ্পলি-ওয়ানো' নামে অভিহিত হইয়াছে। তিব্বতদেশীয় 'দুল্ভ' গ্রন্থে উহার নাম—'ন্যগ্রোধ'। হুয়েন-সাং স্বয়ং এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় ঐ স্তূপের ও স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অধুনা পিপ্পল-বনের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন 'সাহকট' নগরের চতুর্দ্দিকে যে নিবিড় বন পরিদৃষ্ট হয়, উহাকে কেহ কেহ 'পিপ্পল-বন' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুকানন ঐ বনে কতকগুলি ভগ্ন বৌদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার গণনাক্রমে, ঐ স্থান ঔমী নদীর তীরে চন্দোলি-ঘাটের ২০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া মানচিত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পিপ্পল-বন।

কনোজের সুখ-সমৃদ্ধির দিনে কনোজ-রাজ্যের বহু প্রাচীন নগরী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিল। তন্মধ্যে নবদেবকুল, কাকুপুর, কুশিনগর প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে, কনোজের পরপারে, নবদেবকুল অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান নবৎগঞ্জের সন্নিকটে অধুনা নবদেবকুল চিহ্নিত হইয়া থাকে। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রতীত হয়, হোলি-বন হইতে এক শত লি বা সতের মাইল অগ্রসর হইয়া, তিনি নবদেবকুল নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। নগরের প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে সে সময়ে অশোক-নির্ম্মিত কতকগুলি বৌদ্ধস্তূপ বিদ্যমান ছিল। কেহ কেহ বলেন,—পুরাকালে গঙ্গা ও ঈশান-নদী যে স্থানে প্রবাহমান ছিল, তাহারই মধ্যে ছয় মাইল দীর্ঘ এবং চারি মাইল প্রস্থ যে একটি দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হইত; সেই দ্বীপে নবদেবকুল নামক জনপদ অবস্থিত ছিল। কালে গঙ্গাপ্রবাহে বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন ও স্তূপসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কানিংহাম বলেন,—উল্লিখিত স্থানে এক্ষণে দেওখালি নামক একটি জনপদ দৃষ্ট হয়। নবদেবকুলের 'নব' শব্দের অবর্ত্তমানে বা ঐ শব্দের অর্থ 'নূতন' ধরিলে, নবদেবকুল ও দেওয়ালি অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাই,—নবদেবকুলের বর্ত্তমান নাম—'নবল' বা 'নওয়াল'। চীন-পরিব্রাজক-গণের ভারতাগমন-সময়ে নবদেবকুল অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। নবদেবকুল দর্শন করিয়া পরিব্রাজক 'কাকুপুর' নামক নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। শেওরাজপুরের এক মাইল উত্তরে এবং বর্ত্তমান কানপুরের একুশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ঐ নগর অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে। কথিত হয়, কাকুপুর এক সময়ে 'অযুত' বা অযোধ-রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিৎ সেণ্ট মার্টিন বলেন,—অযোধ এবং শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যা অভিন্ন। কিন্তু কানিংহামের মতে, অযোধ বা অযুত এবং অযোধ্যা স্বতন্ত্র রাজ্য। অযোধ্যা—কনোজের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কিন্তু অযুত কনোজের দক্ষিণ-পূর্ব্বে,—হুয়েন-সাং তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, অযোধ্যা ও অযোধ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাকুপুরের অবস্থান বিষয়ে কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। তবে কাকুপুরের আধুনিক কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তিব্বতীয় গ্রন্থসমূহে 'বাগুড়' (Bagud) বা 'ভাগুড়' (Vagud) নামক একটি জনপদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গ্রন্থে লিখিত আছে,—শাম্পক-নামা শাক্যবংশীয় জনৈক ব্যক্তি কপিলবস্তু হইতে নির্ব্বাসিত হইলে, বাগুড়ে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। বাগুড়ে আগমন-কালে তিনি বুদ্ধদেবের কেশদাম ও নখ সঙ্গে আনিয়া-ছিলেন। সেই কেশদাম ও নখের উপর শাম্পক কর্ত্তৃক বাগুড়ে একটি চৈত্য বা মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে শাম্পক বাগুড়ের রাজা বলিয়া পরিচিত হন এবং বাগুড়ের বৌদ্ধ-মঠ 'শাম্পক-স্তূপ' নামে অভিহিত হয়। বাগুড়ের অবস্থান-সম্বন্ধে কোনও বিবরণ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে কানিংহাম বলেন,—বাগুড় ও অযোধ একই রাজ্য। গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাই,—কাকুপুরের অংশবিশেষ অধুনা ছত্রপুরের গড়-রূপে বিরাজমান। পুরাকালে কনোজের অধিবাসিগণ কাকুপুরের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন। তাঁহাদের মতে বিলার হইতে এই স্থান দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। কাকুপুর এবং বিলারের মধ্যবর্ত্তী স্থান উৎপলারণ্য

প্রসঙ্গোক্ত জনপদাদি।

নামে অভিহিত। উহার পরিধি পাঁচ ক্রোশ বা দশ মাইল। কাকুপুরে ক্ষীরেশ্বর মহাদেবের এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার দুইটি মন্দির আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানে প্রতি-বৎসর মেলা বসে। হুয়েন-সাঙের গণনাক্রমে অযোধের পরিধি ৫০০০ লি বা ৮৩৩ মাইল। কানিংহাম বলেন,—হুয়েন-সাঙের গণনা ঠিক নহে। কাকুপুর এবং কাণপুরের মধ্যস্থলে যে সঙ্কীর্ণ ভূ-ভাগ বিদ্যমান, তাহার পরিধি-পরিমাণ—৫০০ লি বা ৮৩ মাইলের অধিক হইতে পারে না। পথিমধ্যে রামগ্রাম প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া পরিব্রাজক হুয়েন-সাং কাকুপুর হইতে কুশিনগরে উপনীত হন। এই স্থানে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন বলিয়া কুশিনগর বৌদ্ধগণের একটী পবিত্র তীর্থস্থান মধ্যে পরিগণিত। কুশিনগরের অনতিদূরে সিংহলীয় পুরাবৃত্ত-প্রসিদ্ধ 'পায়া' (Pawa)। কুশিনগর হইতে উহার ব্যবধান বার মাইল। কথিত হয়, 'পায়া' নগরী বুদ্ধদেবের শেষ বিশ্রাম স্থান। কাশেয় নগরের বার মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, 'পদ্রৌনা' বা পদর-বন নামক স্থানে, ভগ্নস্তূপের মধ্যে, বুদ্ধদেবের কয়েকটি জীর্ণ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন,—'পদরবনই' অধুনা প্রাচীন 'পায়া' নগরীর স্থান অধিকার করিয়া আছে। পূর্ব্বে নগরের সন্নিকটে, যে ক্ষুদ্র নদীতে বুদ্ধদেব অবগাহন করিয়াছিলেন, সেই নদী এক্ষণে 'বাঁধি নাল' নামে পরিচিত; উহা কাশীয় নগরের আট মাইল দক্ষিণে ছোট গঙ্গায় পতিত হইতেছে। কুশিনগর সম্বন্ধে অধ্যাপক উইল্‌সন বলেন,—কশাই নামক স্থান অধুনা কুশিনগরের স্থান অধিকার করিয়া আছে। পণ্ডিতগণ উইল্‌সনের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। অধুনা গোরক্ষপুরের ৩৫ মাইল পূর্ব্ব-দিকে এই নগর চিহ্নিত হয়। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-সময়ে কুশিনগরের প্রাচীরসমূহ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল;—নগর জনশূন্য অবস্থায় পতিত ছিল। পুরাতন নগরীর পরিধি-পরিমাণ তখনও ১২ লি বা দুই মাইল নির্দ্দিষ্ট হইত। অধুনা অনরুদ্ধ ও কাশীয় নগরের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে অসংখ্য ভগ্নস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ তৎসমুদায়ের অধিকাংশ নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে কানিংহাম প্রাচীন কুশিনগরের পরিমাণাদি গণনা করিয়া বলিয়াছেন,—অনরুদ্ধ গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বে কুশিনগরের অবস্থান হওয়া সম্ভবপর। বুদ্ধদেব যে স্থানে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, সে স্থানে আধুনিক 'মঠ-কোর-কা-কোট' (Matha-kuar-ka-kot) বিদ্যমান। উহার অন্তর্গত স্তূপটি নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিৎ লিষ্টন এই স্থানকে 'মাট' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু কানিংহাম বলেন,—বিষ্ণুপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে 'মাথা' লিখিয়া দিয়াছিল। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় বুঝা যায়, যেখানে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইখানে পরবর্ত্তিকালে বুদ্ধদেবের অন্তিম-শয্যার প্রতিকৃতি সমন্বিত একটি ইষ্টক-মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাশীয় নগরে আজিও তৎসমুদায়ের ভগ্নাবশেষ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সেই সকল ভগ্নস্তূপ ও শিলা-লিপি হইতে প্রতিপন্ন হয়, কাশীয় নগরেই বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন এবং আধুনিক কাশীয় নগর প্রাচীন কুশিনগরের অতীত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

-*:○:*-

অবন্তী, উজ্জয়িনী, মালব-রাজ্য।

[প্রাচীন অবন্তী-রাজ্য,—পুরাবৃত্তে তাহার প্রসিদ্ধি,—সূত্রগ্রন্থে, রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণাদি গ্রন্থে অবন্তীর পরিচয়,—মেঘদূতে অবন্তীর উল্লেখ—বৌদ্ধ-প্রাধান্য-সময়ে অবন্তীর শ্রেষ্ঠত্ব;—প্রাচীন উজ্জয়িনী—পুরাণের ও গ্রীকগণের বর্ণনায় উজ্জয়িনীর পরিচয়,—উজ্জয়িনীর পরবর্ত্তী ইতিহাস,—পরিব্রাজক-গণের বর্ণনায় উজ্জয়িনী-প্রসঙ্গ,—উজ্জয়িনীতে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব;—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীর গৌরব-গরিমা,—চারুদত্তের প্রসঙ্গ,—বাসুদেবের কুক্রিয়া-প্রসঙ্গ;—মালব-রাজ্য,—পুরাবৃত্তে তাহার প্রসিদ্ধি,—পরিব্রাজক-পরিদৃষ্ট মালব-রাজ্য,—মালবের ইতিবৃত্ত;—মালব-প্রসঙ্গে অন্যান্য জনপদের কথা,—কেদা, আনন্দপুর, ইদার প্রভৃতি রাজ্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে বিবিধ বিষয়ক আলোচনা।]

পুরাবৃত্তানুসন্ধানে যে সকল প্রাচীনতম জনপদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, অবন্তী-রাজ্য তাহাদের অন্যতম। উজ্জয়িনী, বিশালা এবং পুষ্পকরণ্ডিনী প্রভৃতি নামেও অবন্তী-রাজ্যের প্রসিদ্ধি চিরবিশ্রুত। কেহ কেহ বলেন, উজ্জয়িনী প্রাচীন কালে অবন্তী রাজ্যের রাজধানী ছিল; পরিশেষে রাজধানীর নামানুসারে রাজ্যের নামকরণ হইয়াছিল। কেহ আবার বলেন,—অবন্তী-রাজ্য প্রাচীন কালে মালব-রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। অবন্তী উহার রাজধানী। পরিশেষে ক্রমশঃ উক্ত মালব-রাজ্য প্রথমে অবন্তী-রাজ্য এবং পরে উজ্জয়িনী-নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহা হউক, অবন্তী-রাজ্য যে অতি প্রাচীন রাজ্য, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ঋক-সংহিতায় স্পষ্টতঃ অবন্তীর নাম উল্লেখ না থাকিলেও সূত্রগ্রন্থে আমরা অবন্তী-রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। সূত্র-গ্রন্থে লিখিত আছে,—'সত্ব' (Satvas) নামধেয় এক জাতি ঐ রাজ্যে বাস করিত। তাহারা মানুষ-নামে পরিচিত হইলেও, তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি মানুষের ন্যায় ছিল না। বৌধায়ন-সূত্রে লিখিত আছে,—অবন্তী, মগধ, সৌরাষ্ট্র, সিন্ধু-সৌবীর প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ মিশ্র জাতি। রামায়ণে অবন্তীর নাম স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব যখন সীতার অন্বেষণে বানরগণকে চারিদিকে প্রেরণ করেন, তিনি তখন তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—'সহস্রশৃঙ্গযুক্ত নানা তরু ও লতাসমূহে সমাকীর্ণ বিন্ধ্যগিরি এবং মহাসর্পনিষেবিত মনোহর নর্ম্মদা, গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি নদী অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে বিন্ধ্যাশ্রিত দশার্ণ, অবন্তী, মৎস্য প্রভৃতি দেশ অনুসন্ধান করিবে।' * মহাভারতে সঞ্জয়-কথিত উত্তর-ভারতের জনপদসমূহের মধ্যে অবন্তীর নাম দৃষ্ট হয়। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় বলিতেছেন,—'কুরু, পাঞ্চাল, দশার্ণ, কুন্তী, অবন্তী প্রভৃতি উত্তর-ভারতের জনপদ বলিয়া উল্লিখিত হয়।' তাঁহার বর্ণনায় মালব ও অবন্তী দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। মহাভারত-অনুসারে মালব দক্ষিণ-ভারতে অবস্থিত। পুরাণাদি

প্রাচীন অবন্তী-রাজ্য।

* রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪১শ সর্গে, সুগ্রীব বানরগণকে বলিতেছেন,—"আব্রবন্তীমবন্তীঞ্চ সর্ব্বমেবানুপশ্যত। বিদর্ভানৃষ্টিকাংশ্চৈব রম্যান্ মহিষকানপি॥" ইত্যাদি ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্র-গ্রন্থে এবং তন্ত্রশাস্ত্রে অবন্তীর ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। মৎস্যপুরাণে ভারতবর্ষ-বর্ণন-প্রসঙ্গে ঋষিগণের নিকট পুরাণবিৎ স্থত অবন্তীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ব্যপদেশে কহিতেছেন,—

"আবন্তাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ মূকাশ্চৈবা হ্নকৈ সহ। মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রায়শঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

অরূপাঃ শৌণ্ডিকেরাশ্চ বীতিহোত্রা অবন্তয়ঃ। এতে জনপদাঃ খ্যাতা বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ॥" *

অর্থাৎ,—'আবন্ত, কলিঙ্গ, মূক ও অন্ধক এই সকল জনপদ মধ্যদেশবর্ত্তী। অরূপ, শৌণ্ডিকের, বীতহোত্র, অবন্তী, এই সমস্ত জনপদ বিন্ধ্যপৃষ্ঠে অবস্থিত।' ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতেও অবন্তীর বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে,—"অনুপাস্তুণ্ডিকেরাশ্চ বীতিহোত্রা হ্যবন্তয়ঃ। এতে জনপদাঃ সর্ব্বে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ॥" অর্থাৎ,—'অনূপ, তুণ্ডিকের, বীতিহোত্র ও অবন্তী এই সকল জনপদ বিন্ধ্যপৃষ্ঠে অবস্থিতি।' ব্রহ্মপুরাণে বিন্ধ্যপৃষ্ঠস্থিত জনপদসমূহের মধ্যে অবন্তীর নাম দৃষ্ট হয় না। সেখানে লিখিত আছে,—'মলজ, ককশ, মোলক, চোলক, উত্তমার্ণ, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধ্য, তোষল, কোশল, ত্রৈপুর, বৈদিশ, তুম্বুর, চর, যবন, পবন, অভয়, রুণ্ডিকের, চর্চ্চর, হোত্রধর্ত্তি এই সকল বিন্ধ্যাচলস্থ জনপদ।' † ভারতবর্ষ-বর্ণন-প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণেও অবন্তীর নাম দৃষ্ট হয় না; সে স্থলে উহা মালব নামে অভিহিত। ‡ বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশে দেখিতে পাই,—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সন্দীপনি মুনির নিকট অবন্তী-নগরে অস্ত্রশিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। § কিন্তু সে অবন্তী কোন্ প্রদেশে কোথায় অবস্থিত ছিল, নির্ণয় করা সুকঠিন। গরুড়পুরাণে অবন্তী বা মালবের নাম আদৌ উল্লিখিত নাই। কিন্তু বায়ুপুরাণে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পুরাবৃত্তপ্রসিদ্ধ অবন্তী-রাজ্যের এইরূপ পরিচয় দেখিতে পাই,—

"অনুপাস্তুণ্ডিকেরাশ্চ বীতিহোত্রা হ্যবন্তয়ঃ। এতে জনপদাঃ সর্ব্বে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ॥" **

দুই পুরাণে একই শ্লোক অপরিবর্ত্তিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে অবন্তী নগরের মাহাত্ম্য-পরিচয়ে লিখিত আছে,—"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥" তন্ত্রশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—"অবন্তী সংজ্ঞকো দেশঃ কালিকা তত্র তিষ্ঠতি।" সুতরাং দেখা যাইতেছে,—সূত্র-সাহিত্যের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া তন্ত্রোৎপত্তির পরবর্ত্তিকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রাদিতে অবন্তী-রাজ্যের মাহাত্ম্য-তত্ত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। কোন্ সময়ে কোন্ রাজবংশ কর্ত্তৃক অবন্তী-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পুরাবৃত্তের আলোচনায় তাহার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। মৎস্যপুরাণে দেখিতে পাই, অবন্তী-নগরে মঙ্গলগ্রহের জন্ম হইয়াছিল। বরাহ-মিহির-প্রণীত বৃহৎ-সংহিতায় এবং কালিদাস-প্রণীত মেঘদূত গ্রন্থে অবন্তীর বিশেষ সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে ইহার বিশেষ সমৃদ্ধি ছিল। সেই সময় এই নগরী শ্রীসৌন্দর্য্য ও জ্ঞান-

---

* মৎস্যপুরাণ, ১১৪শ অধ্যায়, ৩৬শ ও ৫৪শ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

† ব্রহ্মপুরাণ, ১৭শ অধ্যায়, ৫১শ—৬২শ শ্লোকে দেশাদির এইরূপ নামোল্লেখ আছে।

‡ বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয়াংশ ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

§ বিষ্ণুপুরাণে, পঞ্চম অংশে, ১৯শ শ্লোকে লিখিত আছে,—

"ততঃ সন্দীপনিং কাশ্যমবন্তীপুরবাসিনম্। অস্ত্রার্থং জগ্মতুর্ব্বীরৌ বলদেবজনার্দ্দনৌ॥"

‡ বায়ুপুরাণ, ৪৫শ অধ্যায়, ১৩৪শ শ্লোক।

গরিমার আধার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত। মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্ পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥"

অর্থাৎ,—'যে স্থানের গ্রামবৃদ্ধ পুরুষেরা উদয়ন নরপতির বাসবদত্তা হরণাদি অত্যাশ্চর্য্য উপাখ্যান-বর্ণনে অভিজ্ঞ, তুমি সেই অবন্তী দেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্য-সম্পত্তিমতী উজ্জয়িনীতে প্রস্থান করিবে। সর্ব্বপ্রধান উজ্জয়িনী রাজধানী দর্শনে বোধ হইবে, যেন সুরলোকবাসী পুণ্যশীলগণের পুণ্যফল ক্ষীণপ্রায় হইলে যখন তাঁহারা পুনরায় অবনীধামে অবতীর্ণ হন, তৎকালে সেই সকল মহাত্মারাই অবশিষ্ট পুণ্যপ্রভাবে সুর-লোকের এক খণ্ড সমুজ্জ্বল সারাংশ ঐ স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন।'* পণ্ডিতগণ বলেন, অবন্তী নামক নদীর তীরে অবন্তী-নগর অবস্থিত ছিল এবং অবন্তী নদী অবন্তী রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। পরবর্ত্তিকালে ঐ নদী 'শিপ্রা' নামে অভিহিত হইয়াছিল। অবন্তী-নগর কালে উজ্জয়িনী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধগ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়,—বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-কালে অবন্তী সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কথিত হয়, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর, বৈশালীর ভজ্জিয়ান-জাতীয় ভিক্ষুগণ বৈশালীতে একটী বৌদ্ধ-সভার অধিবেশন করিয়া দশটী নিয়ম প্রচার করেন। তাহাতে নির্দ্ধারিত হয়,—ভিক্ষুগণ, স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ভিন্নান-বর্জ্জিত মদ্যের ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবে। সেই সভায় ককণ্ডক নামা জনৈক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষুর পুত্র যশ উক্ত দশটী নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতি-বাদ উত্থাপন করিয়াছিলেন। পরিশেষে উক্ত নিয়ম-সমূহ রহিত করিবার উদ্দেশ্যে যশ কর্ত্তৃক বৈশালীতে আর একটী সভার অধিবেশন হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলী রহিত করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মীমাংসা-ব্যপদেশে সেই সভা হইতে যশ পশ্চিম দেশে, অবন্তী-রাজ্যে এবং দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি ভিক্ষু প্রেরণ করেন। † যশের পন্থাবলম্বনে অবন্তী-রাজ্যের ভিক্ষুগণ ভজ্জিয়ান-ভিক্ষু-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী রহিত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অবন্তী-নগর পরবর্ত্তিকালে উজ্জয়িনী বা উজ্জৈন নামে পরিচিত হয়। তদনুসারে অবন্তী-রাজ্য উজ্জয়িনী নামে অভিহিত হইয়াছিল। মহাভারতে অবন্তী এবং

উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী উভয় নামই দৃষ্ট হয়। সুতরাং বুঝা যায়, মহাভারতের সম-সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে বা পরে অবন্তী-নগর উজ্জয়িনী নামে পরিচিত হইয়াছিল। অবন্তীর ন্যায় উজ্জয়িনীও বিশালা প্রভৃতি নামে পরিচিত। গ্রীকগণের বর্ণনায় বুঝা যায়, উজ্জয়িনী এক সময়ে অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিৎ টলেমি এবং পেরিপ্লাস এই নগরকে 'ওজিনি'

---

* মেঘদূত পূর্ব্ব মেঘ, ৩১শ শ্লোক। এই শ্লোক হইতে অনুমান হয়, উদয়ন নামক রাজা অবন্তী-রাজ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই লীলাক্ষেত্র বলিয়া মহাকবি কালিদাস ঐ শ্লোকে রাজা উদয়নের নামোল্লেখ করিয়াছেন। নচেৎ, শ্লোকে উদয়নের নামোল্লেখের সার্থকতা উপলব্ধি হয় না। বিষ্ণুপুরাণে চন্দ্রবংশজ কুরুর বংশে উদয়নের নাম দৃষ্ট হয়। কলিযুগারম্ভের বহু পূর্ব্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

† অবন্তীর বিষয় এইরূপে লিখিত হইয়াছে,—"Yasa sent messangers to the Bhikus of the western country, and of Avanti and of the southern country &c". *Vide* R. C. Dutt, *Civilization in Ancient India,* Vol. I,

(Ozene) নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। টলেমির বর্ণনায় প্রকাশ,—ওজিনি তিয়াষ্টানের রাজধানী। তিয়াষ্টান শব্দের উল্লেখ দৃষ্টে কত কথাই মনে আসিতে পারে। তিয়াষ্টান নামে পুরাবৃত্তে কোনও জনপদের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপি পাঠে জানা যায়,—মালব-দেশে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাচীন কালে 'তস্তান' নামধেয় এক রাজা রাজত্ব করিতেন। সান্দ্রোকোটস ও কাণ্ড্রাগুপ্স্ শব্দের ন্যায় 'তস্তান' শব্দও হয় তো বিদেশীয় ভাষায় এইরূপ বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, মালবদেশীয় কোন্ রাজার নাম বৈদেশিক ভাষায় 'তস্তান' নামে উচ্চারিত হইয়াছে, অথবা মালবদেশই ঐ নামে পরিচিত কি না, নির্ণয় করা কঠিন। পেরিপ্লাসের নির্দ্দেশক্রমে প্রতীত হয়, ওজিনি-নগর বারিগজের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। তথায় এক রাজা রাজত্ব করিতেন। পণ্ডিতগণ বলেন,—গ্রীক ঐতিহাসিকোল্লিখিত বারিগজ অধুনা বরোচ নামে অভিহিত। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে জানা যায়, প্রাচীন কালে অসংখ্য রাজচক্রবর্ত্তী এই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজ্য-শাসন-প্রণালী বা তাঁহাদের সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবরণ-সমূহ সন্ধান করিয়া পাওয়া সুকঠিন। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশে' লিখিত আছে, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার যে সময়ে পাটলিপুত্র নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি আপনার পুত্র অশোককে উজ্জয়িনার শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। অশোকের সময় হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীর বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কালে উজ্জয়িনী সৌভাগ্য-সম্পদের আধার-স্থান বলিয়া উক্ত হইত। প্রাকার-পরিখা পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত নগরী শত্রুর দুরধিগম্য ছিল। এক্ষণে সেই প্রাচীন বিশালা বা উজ্জয়িনী ভূগর্ভে প্রোথিত। তাহারই সন্নিকটে বর্ত্তমান উজ্জয়িনী নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। কতকাল পূর্ব্বে প্রাচীন উজ্জয়িনী লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু এখনও বর্ত্তমান নগরটীর সন্নিকটে, বনমধ্যস্থ মৃত্তিকা খনন করিলে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ ইষ্টক-প্রাচীরাদির চিহ্ন দৃষ্ট হয়। আলাউদ্দীন খিলিজির সময় উজ্জয়িনী মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। অধুনা উহা সিন্ধিয়ার রাজ্যভুক্ত। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যে সময় উজ্জয়িনী দর্শন করেন, তখনও উজ্জয়িনী নগরে বহু লোকের বাস ছিল। উজ্জয়িনী রাজ্যের পরিধি-পরিমাণ তখন ৬০০০ লি প্রায় এক হাজার মাইল এবং নগরীর পরিধি ৩০ লি বা ৫ মাইল পরিমিত হইত। পশ্চিমে মালব রাজ; ধারনগর বা ধার (Dhara Nagara or Dhar) তাহার রাজধানী। উত্তরে মথুরা এবং জজহোতি, পূর্ব্বে মহেশ্বরপুর এবং দক্ষিণে নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সাতপুরা গিরিশ্রেণী;—এতৎসীমান্তবর্ত্তী ভূ-ভাগ তখন উজ্জয়িনী নামে অভিহিত হইত। এতদ্দ্বারা প্রতীত হয়, প্রাচীন কালে পশ্চিমে চম্বল নদীর পার পর্য্যন্ত উজ্জয়িনী বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তখন, পশ্চিমে রত্নাম্বর ও বুরাহানপুর, পূর্ব্বে ভুমো ও সিউনি এই সীমার অন্তর্গত, নয় শত মাইল পরিধিযুক্ত রাজ্য উজ্জয়িনী রাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং তখন জনৈক ব্রাহ্মণ রাজাকে ঐ দেশে রাজত্ব করিতে দেখিয়া-

ছিলেন। হুয়েন-সাং—উজ্জয়িনীকে 'উ-শে-এন-না' (U-she-en-na) নামে অভিহিত করিয়াছেন। হুয়েন-সাঙের 'মা-লো-পো' (Ma-lo-Po) বা মালব-রাজ্য তখন চম্বল নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত ছিল; চম্বল নদী অতিক্রম করিয়া ঐ রাজ্যের বিস্তৃতির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। মালব দেশে সে সময়ে একজন বৌদ্ধ নৃপতি রাজত্ব করিতেছিলেন। কানিংহাম বলেন, উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায়,—মালবের বৌদ্ধ-নৃপতির রাজ্যের কতবাংশ অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণ-নৃপতি উজ্জয়িনী রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উজ্জয়িনীতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-মন্দির বিদ্যমান ছিল। কিন্তু হুয়েন-সাং তন্মধ্যে তিন-চারিটীর অধিক দেখিতে পান নাই। সেই তিন-চারিটী বৌদ্ধ-মন্দিরও সে সময়ে ধ্বংসপথে অগ্রসর হইয়াছিল। মন্দিরসমূহে তখন তিনি শত বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করিতেন। বৌদ্ধগণের মঠ বা মন্দির অপেক্ষা হিন্দুদিগের মন্দিরের সংখ্যা তখন অনেক অধিক ছিল। তৎপ্রদেশের অধিপতি হিন্দু-ধর্ম্মের পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন এবং জনগণের মনে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্য তিনি রাজ্যের নানা স্থানে নানা দেব-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনী নগরে বহু তীর্থস্থান বিদ্যমান। দশাশ্বমেধ ঘাট, অঙ্কপাত তীর্থ, দামোদর ও বিষ্ণুসাগর প্রভৃতি কুণ্ড, মঙ্গলেশ্বর, কেদারেশ্বর, মহাকাল প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধি সম্পন্ন। উজ্জয়িনী নগরে কতকগুলি ভৈরব মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। উজ্জয়িনীর প্রায় প্রতি বৃক্ষমূলে এক একটী সতীস্তম্ভ বর্ত্তমান। কথিত হয়,—সতী-রমণীর চিতাভস্মের উপর স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের দক্ষিণ দিকে, 'যোগসহীদ' নামক পর্ব্বতের পাদদেশে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন প্রোথিত ছিল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তথায় রাজা বিক্রমাদিত্যের মানযন্ত্র ছিল, বাবর তাহা বলিয়া গিয়াছেন। নগরের পার্শ্বে, পর্ব্বত গাত্রে একটী গুহা দৃষ্ট হয়। প্রবাদ,—রাজা ভর্ত্তৃহরি সংসার-পরিত্যাগ করিয়া ঐ গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধুনা গুহাটী ভর্ত্তৃহরি-গুহা নামে অভিহিত।

ষষ্ঠ-শতাব্দীর উজ্জয়িনী।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর এক অভিনব চিত্র দেখিতে পাই। এক সময়ে উজ্জয়িনী জ্ঞান-গরিমা-সৌন্দর্য্য-সম্পদের আধার-স্থান বলিয়া উক্ত হইত;—মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' গ্রন্থে তাহার ভুরি-ভুরি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'মৃচ্ছকটি' নাটকেও উজ্জয়িনীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-সম্পদের ভূয়সী পরিচয় বিদ্যমান। প্রবল-প্রতাপশালী রাজার সুশাসন-গুণে রাজ্য হইতে দস্যু-তস্কর-ভীতি বিদূরিত হইয়াছিল। তখন নানা-দেশীয় বণিকগণ উজ্জয়িনী নগরে বাণিজ্য করিতে আসিতেন; তাঁহাদের আবাস-স্থান মৃচ্ছকটিতে 'শ্রেষ্ঠিচত্ত্বর' নামে অভিহিত হইয়াছে। বাণিজ্য-ব্যপদেশে উজ্জয়িনীর সেই ধনী বণিকগণের উত্তর-ভারতের সর্ব্বত্র গতিবিধি ছিল। রেশম, রত্নাদি প্রভৃতি বহুমূল্য পণ্য দ্রব্য তাঁহারা নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতেন। তাঁহাদের অর্থে উজ্জয়িনী নগরে সে সময়ে বহু হিন্দু-দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সকল মন্দিরে অসংখ্য ব্রাহ্মণ-পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। সুচতুর জহুরী, মরকত, হীরক, মণি, মুক্তা, নীলকান্ত মণি প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নের ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তৎকালে উজ্জয়িনীতে গন্ধদ্রব্যবিক্রেতাও দৃষ্ট হইত। উজ্জয়িনী

নগরের পথিপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও নানাজাতীয় ব্যবসায়ী বিপণি সাজাইয়া বিকিকিনি করিত। এতদ্ব্যতীত উজ্জয়িনী নগরে রাজব্যয়ে দ্যূতাশলা প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। কথিত হয়,—দ্যূতক্রীড়ায় লভ্যাংশের পঞ্চমাংশ বা দশমাংশ রাজা প্রাপ্ত হইতেন। কালিদাসের শকুন্তলা পাঠে জানা যায়,—ঐ সময় উজ্জয়িনী নগরে মদ্যব্যবসায়ীর ও মদ্যপায়ীর অভাব ছিল না। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরাই তখন মদ্যপান করিত বটে; কিন্তু রাজসভাসদ্‌গণ এবং অপরিমিতব্যয়ী ও আমোদ-প্রয়াসী ব্যক্তিবর্গ মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ ব্যবসায়ী ও চাষী সম্প্রদায়ে, মদ্যের প্রচলন একবারে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী নগর সুবৃহৎ রাজধানীর সর্ব্বপ্রকার কলঙ্ক-কালিমায় কলুষিত হইয়াছিল। ভারবীর এবং কালিদাসের গ্রন্থ হইতে স্ত্রীলোকের মদ্যপানের পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ধ্যাসমাগমে রাজপথ-সমূহ মদ্যপায়ী অসচ্চরিত্র নরনারীতে পরিপূর্ণ হইত বলিয়া 'মৃচ্ছকটি' নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটি নাটকে দেখিতে পাই,—একদা চারুদত্তের গৃহে চুরি হয়। রাজপথে তখন প্রহরার বন্দোবস্ত ছিল; কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া চোর প্রস্থান করিলে প্রহরী চারুদত্তের গৃহে উপনীত হইয়াছিল। উজ্জয়িনী নগরের ধনী ব্যক্তিগণ প্রায়শঃই অসংখ্য সভাসদ, চাটুকার এবং অগণিত ভৃত্যে পরিবৃত থাকিতেন বলিয়া 'মৃচ্ছকটি' নাটকে উল্লেখ আছে। তাৎকালিক জনৈক ধনী ব্যক্তির পরিচয়ে কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই সিংহদ্বার। সিংহদ্বারটী দেখিতে অতি মনোরম। দ্বারমধ্যে প্রবেশ করিলে চারিদিকে নানা কারুখচিত নানাবর্ণে চিত্রিত প্রাচীর গাত্রে নানা জাতীয় পুষ্প ও মাল্য স্তবকে স্তবকে সজ্জিত রহিয়াছে দেখা যায়। আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলে, প্রথমেই চতুর্দ্দিকের শুভ্রবর্ণ প্রাচীর নয়নপথে পতিত হয়। প্রাচীর-গাত্র বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত, এবং সোপানাবলী নানা জাতিয় প্রস্তরে সংগ্রথিত। স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ প্রস্তর-নির্ম্মিত বাতায়নগুলি দেখিতে কি সৌন্দর্য্যের আধার! প্রথম আঙ্গিনা অতিক্রম করিলেই দ্বিতীয় আঙ্গিনায় অসংখ্য রথযানবাহনাদি, অশ্বতর, হস্তী এবং গোমেষাদি গৃহপালিত পশু দৃষ্টিগোচর হয়। তৃতীয় আঙ্গিনায় রাজদরবার; আগন্তুকগণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত উহা বিবিধ প্রকারে সুসজ্জিত। চতুর্থ আঙ্গিনা নৃত্যগীতবাদ্য আমোদ প্রমোদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। পঞ্চম আঙ্গিনায় রন্ধনশালা এবং ষষ্ঠ আঙ্গিনায় জহুরী, শিল্প প্রভৃতির আবাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট। সপ্তম আঙ্গিনায় পশুশালা প্রভৃতি। এইরূপে একে একে সাতটী আঙ্গিনা অতিক্রম করিলে, অষ্টম আঙ্গিনায় গৃহস্বামীর আবাস-ভবনে উপনীত হওয়া যায়। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়,—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু-পরিবারগণ কিরূপ জাঁকজমকে বাস করিতেন। অষ্টম আঙ্গিনা অতিক্রম করিলেই পুষ্পোদ্যান, সরোবর প্রভৃতি। তৎকালে যাঁহার যতগুলি ক্রীতদাস থাকিত, তিনিই তত ধনী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেন। মৃচ্ছকটিতে দৃষ্ট হয়,—জনৈক দ্যূতক্রীড়াসক্ত দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঋণ-পরিশোধের জন্য আপনাকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। উজ্জয়িনী নগরে তৎকালে বলিবর্দ্দ-সংবাহিত একরূপ শিবিকার প্রচলন ছিল। ধনী ব্যক্তিগণ তাহাতে আরোহণ করিয়া সহর পরিক্রমণ করিতেন।

ঘোটকারোহণ তৎকালে বিশেষ সম্মানার্হ ছিল। কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ঘোটকী পৃষ্ঠে আপনার স্ত্রীর সংবাহিত হওয়ার বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। * অশ্ববাহিত যানাদি কেবল দেশপতি সম্রাটই তখন ব্যবহার করিতেন। মৃচ্ছকটিক † নাটকে উজ্জয়িনীর তাৎকালিক বিচার-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। চারুদত্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বসন্তসেনা নাম্নী স্ত্রীলোকের হত্যাপরাধে কোনও শত্রু কর্ত্তৃক রাজ-সকাশে অভিযুক্ত হন। চারুদত্তের সেই শত্রুর নাম—বাসুদেব। সে আপনাকে রাজ-মহিষীর সহোদর বলিয়া পরিচয় দিত। বারবণিতা বসন্তসেনার সহিত চারুদত্তের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। বাসুদেব বসন্তসেনার প্রণয়াভিলাষী হয়। কিন্তু বসন্তসেনা তাহাকে উপেক্ষা করে। তজ্জন্য সে নিজে বসন্তসেনাকে গুরুতর প্রহার করিয়া হত্যাপরাধে ব্রাহ্মণ চারুদত্তকে অভিযুক্ত করিয়াছিল। যাহা হউক, বিচারপতিগণ ব্রাহ্মণ চারুদত্তকে বিচারালয়ে আহ্বান করিলেন। চারুদত্ত বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। সাক্ষ্য গৃহীত হইল। বিচারপতিগণ চারুদত্তের অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বলিলেন,—'হিমালয় তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা যাইতে পারে, পদব্রজে সমুদ্র পার হইতে পারা যায়, বায়ু উদরসাৎ করাও অসম্ভব নহে; কিন্তু চারুদত্তের চরিত্রে কখনই দোষারোপ করা যায় না।' ইতিমধ্যে চারুদত্তের জনৈক বন্ধু বসন্তসেনার অলঙ্কারাদি লইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হন; বসন্তসেনা নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ হইয়া যায়। সুতরাং চারুদত্তের অপরাধ বিষয়ে সন্দিহান হইলেও বিচারপতিগণ চারুদত্তের প্রতি দণ্ড-বিধান করেন। চারুদত্ত প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হন। এদিকে জনৈক বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর শুশ্রূষায় বসন্তসেনা জীবন লাভ করে। যখন চারুদত্তের প্রাণ-বধের উদ্যোগ হইতেছিল, বসন্তসেনা সেই সময়ে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া চারুদত্তের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। পরিশেষে চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনার বিবাহ হয়।

যেমন অবন্তী-রাজ্য, পুরাবৃত্তে তেমনি মালব-রাজ্য প্রতিষ্ঠান্বিত। উভয়েরই প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। প্রাচীন সূত্র-গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে সর্ব্বত্র মালব-রাজ্যের বিষয় উল্লিখিত আছে। বৌধায়ন-সূত্রে মালব-দেশবাসিগণ মিশ্রজাতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। রামায়ণে বানরগণের সীতান্বেষণে গমন উপলক্ষে সেনাপতি সুগ্রীব মালব-রাজ্যে অনুসন্ধানের বিষয় বলিয়াছিলেন। ‡ সে স্থলে মালব পূর্ব্বদেশে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহাভারতে সঞ্জয়োক্ত ভারতবর্ষের জনপদাদির মধ্যে মালব-রাজ্যের নাম দেখিতে পাই।

পুরাবৃত্তে মালবের প্রসিদ্ধি।

---

* কথাসরিৎ-সাগর, ১২৪ম, অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† 'মৃচ্ছকটিক' একখানি সংস্কৃত নাটক। চারুদত্ত ও বসন্তসেনার উপাখ্যান এই নাটকের আখ্যান-ভাগ। নাটকের রচয়িতা সম্বন্ধে নানা মতান্তর দৃষ্ট হয়। অনেকে অনুমান করেন, অবন্তীর রাজা এই নাটক লিখিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে নাটক-রচয়িতা—অন্ধ্রবংশের আদি রাজা; এক শত বৎসর রাজত্বের পর পুত্রহস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি অগ্নি-প্রবেশ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন,—খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বে এই নাটকখানি রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থ-মধ্যে তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান।

‡ রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড, ৪১শ সর্গ দ্রষ্টব্য।

মৎস্যপুরাণে মালব প্রাচ্যে-জনপদ মধ্যে পরিগণিত। * সেখানে লিখিত আছে ;—

"সুহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া মার্গবাগেয়মালবাঃ। শাল্ব-মাগধ-গোনর্দ্দা প্রাচ্যা জনপদা স্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ,—সুহ্ম, প্রবিজয়, মার্গ, মাগেয়, মালব, শাল্ব, মগধ, গোনর্দ্দ প্রভৃতি প্রাচ্য জনপদ।' বায়ুপুরাণে মালব পর্ব্বতাশ্রিত দেশ বলিয়া উল্লিখিত। † ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতবর্ষ বর্ণন-প্রসঙ্গে মালব-রাজ্যের পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং মালব যে অতি প্রাচীন-রাজ্য তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অনেকে মালব ও অবন্তী অভিন্ন বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের আলোচনায় মালব ও অবন্তী এতদুভয় রাজ্য স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তবে একই রাজ্যের কখনও মালব, আবার কখনও অবন্তী নাম হওয়াও অসম্ভব নহে। মালব-রাজ্য কোন্ সময় কোন্ নৃপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। পুরাবৃত্তে দেখিতে পাই, বৌদ্ধ-প্রাধান্যের সময়ে মালব-দেশ গৌরব-গরিমার উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব-কালে মালব-রাজ্য কনোজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক মালব-রাজ্য বিধ্বস্ত হওয়ার কাহিনী ইতিহাসে বিবৃত রহিয়াছে। দাসরাজগণের রাজত্ব-সময়ে মালব মুসলমানগণের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিছুকাল পরে, মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে, মালব-রাজ্য স্বাধীনতা অবলম্বন করে। পরিশেষে দিল্লীশ্বর আকবর কর্ত্তৃক এই রাজ্য পুনরায় মুসলমানগণের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হয়।

চীনদেশীয় 'সি-উ-কি' (Si-yu-ki) গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—পরিব্রাজক ফা-হিয়ান 'মো-লো-কি-উ-চা (Mo-lo-kiu-cha), মালাকুতা (Malakuta) বা মালব-রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন।

পরিব্রাজক-পরিদৃষ্ট মালব।

গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ দেশের অধিবাসিগণ তখনও অসভ্য বর্ব্বর ছিল। স্বার্থ-সিদ্ধি তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মধ্যে পরিগণিত হইত। তৎপ্রদেশের বৌদ্ধমঠ-সমূহ তখন ধ্বংসপ্রায়। কিন্তু হিন্দু-দেব-দেবীর মন্দির-সমূহ সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া নগরের শোভা-সম্বর্দ্ধন করিতে-ছিল। ভগ্নপ্রায় বৌদ্ধ-মঠ সমূহ তখন 'নিগ্রন্থ' নামধেয় নাস্তিকগণে পরিপূর্ণ থাকিত। কিন্তু ফা-হিয়ানের স্বরচিত বিবরণী পাঠে জানা যায়,—পরিব্রাজক মালব-রাজ্যে পদার্পণ করেন নাই। হুয়েন-সাং ঐ রাজ্যকে 'মো-লা-পো' (Mo-la-po) বা মালোয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—'পূর্ব্ব-দক্ষিণে মালব-রাজ্য এবং উত্তর-পূর্ব্বে মগধ-রাজ্য তখন শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বলিয়া উক্ত হইত।' হুয়েন-সাং আরও বলিয়া গিয়াছেন,—'মালবের পুরাবৃত্ত আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে সুশিক্ষিত জ্ঞানবান শিলাদিত্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন।' এ হিসাবে, হুয়েন-সাং যখন ভারতে আগমন করেন, তখন দ্বিতীয় শিলাদিত্য মালবের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল ৬১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। হুয়েন-সাঙের সময়ে

---

* মৎস্যপুরাণ, ১১৪শ অধ্যায়।

† বায়ুপুরাণ, ৪৫শ অধ্যায়।

মালব-রাজ্যে হিন্দু-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম উভয় ধর্ম্মেরই প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তখনও মালব-দেশে এক শত সঙ্ঘারাম এবং এক শত দেব-মন্দির অবস্থিত থাকিয়া মালবের গৌরব-গরিমার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। সেই সকল মঠে তৎকালে 'সম্মতীয়' নামধের সম্প্রদায়ের প্রায় বিশ সহস্র বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করিতেন। অধুনা মালব নামে এক জনপদের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় বটে; কিন্তু মালবের সে সমৃদ্ধি আর নাই। এক্ষণে সেই সকল বৌদ্ধ-মঠ ও দেব-মন্দির-সমূহ ধ্বংসপথে অগ্রসর।

পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—মো-হো (Mo-ho) বা মাহি নদীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং বারোচের দুই হাজার লি বা তিন শত তেত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীন মালব-দেশ অবস্থিত ছিল। আধুনিক মানচিত্রে দৃষ্ট হয়,—মালব-রাজ্য বরোচের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত এবং বরোচ হইতে মাহি নদীর উৎপত্তি-স্থানের দূরত্ব—১৫০ মাইল মাত্র। কানিংহাম, হুয়েন-সাঙের পরিমাপ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বরোচ হইতে মালবের দূরত্ব উত্তর-পূর্ব্বে এক হাজার লি বা ১৬৭ মাইল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বরোচের ১৬৭ মাইল দূরে মালবের আধুনিক রাজধানী ধার-নগর বা ধার অবস্থিত। কানিংহামের মতে—পরিব্রাজকের গণনা ভ্রমসঙ্কুল। বর্ত্তমান ধার-নগরীর দৈর্ঘ্য পৌণে এক মাইল, প্রস্থ অর্দ্ধ মাইল এবং পরিধি আড়াই মাইল। নগরের বহির্ভাগে দুর্গ অবস্থিত। দুর্গসমেত নগরের পরিধি-পরিমাণ সাড়ে তিন মাইল হইতে পারে। পরিব্রাজকের মতে,—মালব-রাজ্যের পরিধি ছয় হাজার লি বা এক হাজার মাইল। রাজ্যের পশ্চিমে মালবের দুইটী অধীন রাজ্য বিদ্যমান। তাহাদের একটীর নাম খেড়া; তাহার পরিধি তিন হাজার লি বা পাঁচ শত মাইল। অপরটীর নাম—আনন্দপুর; তাহার পরিধি-পরিমাণ—দুই হাজার লি বা তিন শত তেত্রিশ মাইল। এতদ্ব্যতীত 'ভেদারি' নামে মালবের একটী করদ-রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পরিধি-পরিমাণ ছয় হাজার লি বা এক হাজার মাইল। এই রাজ্য তিনটীকে মালবের অন্তর্ভুক্ত ধরিলে, মালবের পরিধি-পরিমাণ এক হাজার তিন শত পঞ্চাশ মাইল দাঁড়াইতে পারে। আর তাহা হইলে, পশ্চিমে কচ্ছ প্রদেশ, পূর্ব্বে উজ্জয়িনী, উত্তরে গুর্জ্জর ও বিরাট এবং দক্ষিণে বল্লভী ও মহারাষ্ট্র দেশ,—এতৎ-সীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ মালবের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং বোধ হয়, পরিব্রাজক অধীন রাজ্যগুলিকেও মালবের মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মালবের পরিমাণ হইতে উত্তরাংশের স্বাধীন ভেদারি রাজ্য পরিত্যাগ করিলে, মানচিত্রে মালবের পরিধি ৮৫০ মাইল নির্দ্দেশ হয়। কিন্তু চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রাজপথের পরিধি গণনা করিলে মালবরাজ্যের পরিধি-পরিমাণ এক হাজার মাইল দাঁড়ায়। এ হিসাবে উত্তরে ভেদারি-রাজ্য, পশ্চিমে বল্লভী, পূর্ব্বে উজ্জয়িনী এবং দক্ষিণে মহারাষ্ট্র-দেশ,—বোধ হয়, প্রাচীন কালে এতৎ-সীমান্তর্ব্বর্ত্তী দেশ মালব নামে অভিহিত হইত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কচ্ছ উপত্যকার বানাস নদীর তীর হইতে মণ্ডীসরের নিকটবর্ত্তী চম্বল নদী পর্য্যন্ত এবং দমন ও মালিগামের মধ্যবর্ত্তী সহ্যাদ্রি হইতে বুরহানপুরের দক্ষিণে তাপ্তী নদী পর্য্যন্ত প্রাচীন কালে মালব-রাজ্যের সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

মালবের অবস্থান-পরিমাণাদি।

মালব-প্রসঙ্গে তদন্তর্গত আরও কয়েকটী প্রাচীন জনপদের পরিচয় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। খেড়া, আনন্দপুর ও ইদার প্রভৃতি মালব-রাজ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় খেড়া—'কিয়ে-চা' (Kie-cha) নামে অভিহিত হই-য়াছে। * তিনি বলিয়াছেন,—মালব হইতে উহার দূরত্ব উত্তর-পশ্চিমে তিন শত লি বা পঞ্চাশ মাইল। কানিংহাম বলেন,—সংস্কৃত 'কয়রা' (Kaira) শব্দের অপভ্রংশে 'খেড়া' শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে। খেড়া—গুজরাটের একটী সমৃদ্ধিশালী নগরী। উহা আমেদাবাদ এবং কাম্বের মধ্যস্থলে অবস্থিত। কানিংহাম বলেন—দূরত্ব-গণনায় হুয়েন-সাং ভুল করিয়াছিলেন। কেন-না, মালব রাজ্যে সীমানার পঁচিশ মাইল পশ্চিমে স্বাধীন উজ্জয়িনীর অবস্থান নির্দ্দেশ করিতে গেলে, ধার নগরের পঞ্চাশ মাইল মধ্যে অন্য রাজ্যের বিদ্যমানতা কদাচ সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে, মালব-রাজ্যের বিস্তৃতি উজ্জয়িনী ও খেড়ার মধ্যে পঞ্চাশ মাইলের অধিক হইতে পারে না। সর্ব্ব-সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে, খেড়া—মালব-রাজ্যের পশ্চিম-সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। হুয়েন-সাঙের মতে, খেড়ার পরিধি-পরিমাণ তিন হাজার লি বা পাঁচ শত মাইল। 'খয়রা' নগরের পরিমাণের সহিত ইহার অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। পশ্চিমে সবরমতী নদী, উত্তর-পূর্ব্বে মাহী নদী এবং দক্ষিণে বরোদা রাজ্য—খেড়া-নগরীর সীমানা বলিয়া উক্ত হয়। মালবের অন্যতম প্রাচীন জনপদ আনন্দপুর। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় উহা 'ও-নন-তো-পু-লো' (O-non-to-pu-lo) নামে অভিহিত। তাঁহার মতে,—বল্লভীর সাত শত লি বা এক শত সতের মাইল উত্তর-পশ্চিমে ঐ নগর অবস্থিত। জৈনদিগের 'কল্পসূত্রের' অনুসরণে ভিভিয়েন-ডি-সেণ্ট-মার্টিন ঐ স্থানকে 'বড়নগর' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আনন্দপুর পুরাকালে মালবের অধীন ছিল এবং উহার পরিধি দুই হাজার লি বা তিন শত তেত্রিশ মাইল নির্দ্দিষ্ট হইত। আনন্দপুরের পশ্চিম সীমানায় বানাস নদী এবং পূর্ব্বে সবরমতী নদী বিদ্যমান। মালব পরিত্যাগের পর উত্তর-পশ্চিমে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পরিব্রাজক হুয়েন-সাং 'ও চা-লি' (O-cha-li) বা ভেদারি নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। মালব হইতে ভেদারির দূরত্ব, হুয়েন-সাঙের মতে, ২৪০০ লি হইতে ২৫০০ লি বা ৪০০ মাইল হইতে ৪১৭ মাইলের মধ্যে। কানিংহাম, হুয়েন-সাঙের এই সিদ্ধান্ত প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে, সুরাট হইতে ভেদারি বা ইদারের দূরত্ব দুই শত মাইল, এবং ইদার মালবের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ইদা-রের অবস্থান নির্দ্দেশ করিলে, হুয়েন-সাং বর্ণিত ও-চা-লি বা ভেদারি এবং ইদার অভিন্ন প্রতিপন্ন হইতে পারে।' কানিংহাম বলেন,—'বসন্তগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি পাঠে ভেদারি

মালব-প্রসঙ্গে অন্যান্য জনপদ।

---

* এম জুলিয়েন এবং ভিভিয়েন-ডি-সেণ্ট-মার্টিন পরিব্রাজকোক্ত 'কিয়ে-চা' নগরীকে কচ্ছ প্রদেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কানিংহাম তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন,—'চা' (Cha) যুক্ত অন্যান্য নামের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে 'কিয়ে-চা' শব্দে কচ্ছ বুঝাইতে পারে না। কারণ, —হুয়েন-সাঙের ও-চা-লি (O-cha-li) জুলিয়েন কর্ত্তৃক 'অতলি' (A-a-li) নামে অভিহিত হইয়াছে। কানিংহাম বলেন,—প্রত্নতত্ত্ববিদ্দ্বয় ভ্রমক্রমে 'কিয়ে-চা' শব্দের অনুবাদে 'কচ্ছ' শব্দ লিখিয়াছেন।

এবং ইদার একই বলিয়া মনে হয়। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভেদারি নগরে জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। বড়নগরের সন্নিকটে, ইদারের ত্রিশ মাইল পশ্চিমে, তাঁহার রাজধানী অবস্থিত ছিল।' ভেদারির রাজা আপনাকে রাজা ভবগুপ্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। উদয়পুরের শিশোদীয় বংশে 'ভব' নামক জনৈক রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বংশধরগণ ইদারে বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুরাবৃত্তের আলোচনায় প্রতীত হয়,—বাপ্পা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। এই সকল নানা কারণে কানিংহাম বলেন, শিলালিপি-বর্ণিত ইদার ও ভেদারি এবং পরিব্রাজক-উল্লিখিত ওচালি বা ভেদারি অভিন্ন। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন সময়ে ঐ প্রদেশের পরিমাণ—৬০০০ লি বা এক হাজার মাইল ছিল। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হয়,—উত্তরে বিরাট, পশ্চিমে গুর্জ্জর, পূর্ব্বে উজ্জয়িনী এবং দক্ষিণে মালব, এতৎ-সীমান্তবর্ত্তী ভূ-ভাগ ভেদারি বা ইদার নামে অভিহিত হইত। আধুনিক হিসাবানুসারে, এই রাজ্যের উত্তরে আজমীঢ় ও রন্তাম্বর, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে লোনি ও চাম্বল নদী, দক্ষিণে মালবের সীমান্ত-প্রদেশ বিদ্যমান। এই সীমানার অন্তর্গত দেশের পরিধি-পরিমাণ নয় শত মাইল। কানিংহাম বলেন,—'এই প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে 'বের' নামক এক প্রকার বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। বের বৃক্ষের প্রাচুর্য্য-হেতু হয় তো প্রদেশের নাম 'বেদারি' বা ভেদারি হইয়া থাকিবে।' ঐতিহাসিক প্লিনি সিন্ধু নদের পূর্ব্বদিকবাসী জাতি-সমূহের যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতেও ভেদারি ও ইদার অভিন্ন প্রতিপন্ন হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন,—ভারতের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত কাপিটালিয়া পরিবৃত দেশে 'নরে' (Narae) জাতির বাস। এই পর্ব্বতের অপরান্ত দেশে *যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য ও স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহাদের বসতি-স্থান অতিক্রম করিলে 'ওরাতুরে' বা 'ওরাতে'* (Oraturae or Oratae) জাতির দেশে উপনীত হওয়া যায়। তাহাদের রাজার দশটী হস্তী ও অসংখ্য পদাতি সৈন্য ছিল। 'ওরাতুরে' জাতির পরেই 'ভারেতাতে বা সানরাতাতাতে (Varatatae or Sanratatatae) জাতির দেশ। তাহার পরই 'ওদম্বরে' (Odomborae) জাতি। ওদম্বরে জাতির কচ্ছদেশে বাস। প্লিনি যে কাপিটালিয়া পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছেন, উহার আধুনিক নাম—অর্ব্বুদ বা আবু পর্ব্বত। বড়পুরের অধিবাসিগণ প্লিনি কর্তৃক 'ওরাতুরে' নামে অভিহিত। বড়পুর এবং বড়নগর অভিন্ন। ওরাতুরা—বর্ত্তমান ওরাপুর।

মালব-রাজ্যের উপকণ্ঠে জজহোতি নামক প্রাচীন জনপদ। পুরাবৃত্তে জজহোতির প্রতিষ্ঠার বহুল পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন-সাং জজহোতি দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থানুসারে এই জনপদের নাম—'চি-চি-টো' (Chi-chi-to); উহা উজ্জয়িনীর ১০০০ লি বা ১৬৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন,—'চীন-দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এই জনপদের নাম বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হইয়াছে। তৎসমুদায়ের আলোচনায় পরিব্রাজকোল্লিখিত 'চি-চি-টো' জনপদকে জজহোতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।' ঐতিহাসিক আবুরিহাণও ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থানুসারে

জজহোতি ও কাজুরহো।

জজহোতির রাজধানীর নাম 'কাজুরহো' (Kajuraho); উহা কনোজের ৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। 'ইবন বাতুতা' নামক জনৈক পারস্য-দেশীয় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে উহার রাজধানীর নাম 'কাজুরা'। * কাজুরার উপকণ্ঠে অসংখ্য দেবমন্দির পরিবৃত প্রায় এক মাইল দীর্ঘ একটী হ্রদ পরিদৃষ্ট হইত। কাজুরহো নগরীতে এখনও অসংখ্য দেব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। আবুরিহাণোক্ত কনোজ হইতে কাজুরহো নগরীর দূরত্ব-বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম মুসলমান ঐতিহাসিকের সহিত এক মত হইতে পারেন নাই। কানিংহামের মতে, কনোজের দক্ষিণে, প্রায় ১৮০ মাইল দূরে, কাজুরা নগর অবস্থিত। হুয়েন-সাং যখন ঐ নগরী দর্শন করেন, তখন কাজুরায় ১৬১ ঘর লোকের অধিক বসতি ছিল না। তখন উহার লোক-সংখ্যা ছিল—এক সহস্র। তন্মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর জজহোতীয় ব্রাহ্মণ-বংশের কতব-গুলি এবং চান্দেল রাজপুতদিগের কয়েকটী শাখা ঐ নগরে বাস করিতেন। নগরের চারিদিকে, প্রধানতঃ পশ্চিমে উত্তরে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে, অগণিত দেবমন্দির ও প্রাচীন মঠসমূহের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান থাকিয়া জজহোতি জনপদের অতীত গৌরব-গরিমার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। পশ্চিম দিকের হিন্দুদেবমন্দিরগুলি ৬০০ বর্গ ফিট পরিমিত 'শিবসাগর' নামক জলাশয়ের চারিদিকে অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব্বের জৈনমঠসমূহ হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় এক মাইল। খাজুর-সাগর এবং পশ্চিম দিকের দেব-মন্দিরের মধ্যস্থলে কোনও প্রাচীন মঠাদির ধ্বংসাবশেষের বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং মনে হয়, পূর্ব্বোক্ত শিব-সাগরের পরপার পর্য্যন্ত এই নগরী বিস্তৃতি লাভ করে নাই। শিবসাগর সরোবরের অপরাপর তিন দিকে বহু-দূর বিস্তৃত অবিচ্ছিন্ন ধ্বংসরাশি বিদ্যমান। উত্তর-দক্ষিণে ঐ স্থানের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫০০ ফিট এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃতি প্রায় ২৫০০ ফিট। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক হুয়েন-সাং 'কাজুরহো' নগরীর যে আকারের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কানিংহাম বলেন, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত আকারের অভিন্নতা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তবে পরবর্ত্তি-কালে কাজুরহো নগরী পূর্ব্বে ও দক্ষিণে 'কুরার-নালা' পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় উহার পরিধি-পরিমাণ ৩॥০ মাইলেরও কম দাঁড়াইয়াছিল। কাজুরার সন্নিকটস্থ মহোবা নগরীরও ঐ একইরূপ পরিধি-পরি-মাণের পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্দৃষ্টে কানিংহাম বলেন,—হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-কালে, কোন্ নগরী—কাজুরহো বা মহোবা—জজহোতি জনপদের রাজধানী ছিল, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। তবে পুরাবৃত্তের আলোচনায় চান্দেল-বংশীয় রাজপুতগণের অভ্যুত্থানের সহিত মহোবা বা 'মহোৎসব-নগরীর' নাম এক সূত্রে গ্রথিত বলিয়া প্রতীত হয়। হয় তো হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন সময়ে কাজুরহো নগরীই জজহোতীয় ক্ষত্রিয়-গণের রাজধানী ছিল এবং সেই হইতেই উহা জজহোতি রাজ্যের রাজধানী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কানিংহামের এতৎ-সিদ্ধান্তে মনে হয়,—উজ্জয়িনী হইতে কাজুরা

* ইবন্ বাতুতার লিখিত গ্রন্থের অনুবাদে ডাঃ লি কাজুরা শব্দে কাজওয়ারা (Kajwara) লিখিয়াছেন। কিন্তু পারস্য-ভাষায় উহার উচ্চারণ—'কৈরোরা' (Kaiwra)।

বা কাজুরহো নগরী তিন শত মাইল উত্তরে অবস্থিত। কিন্তু কানিংহামের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে, উজ্জয়িনী হইতে কাজুরহোর দূরত্ব—দুই হাজার লি বা তিন শত তেত্রিশ মাইল হয়। বুন্দেলখণ্ডবাসীরা চারি মাইলে ক্রোশ গণনা করিয়া থাকেন। বোধ হয়, পরিব্রাজক হুয়েন-সাং তদ্বিষয় অবগত ছিলেন না বলিয়া তাঁহার হিসাবে ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছে।

আবুরিহাণ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ জজহোতি রাজ্যের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার আলোচনায় কানিংহাম বলেন,—জজহোতি এবং আধুনিক বুন্দেলখণ্ড অভিন্ন।

জজহোতির পরিচয়।

পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ—'চি-চি-টো' রাজ্যের পরিধি-পরিমাণ—চারি সহস্র লি বা ৬৬৬ মাইল। এ হিসাবে জজহোতির প্রত্যেক দিকের সীমানা ১৬৭ মাইল দাঁড়াইতে পারে। বুন্দেলখণ্ডের সীমা-পরিমাণ আলোচনা করিলে দেখা যায়,—পশ্চিমে বেতোয়া * নদী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনী-দেবীর মন্দির পর্য্যন্ত বিস্তৃত, গঙ্গা ও যমুনা নদী দ্বয়ের দক্ষিণ-দিকবর্ত্তী, সমগ্র ভূভাগ জজহোতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহা হইলে নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তিস্থানের দক্ষিণে চান্দেরি-সাগর এবং বিলহারি জেলাত্রয় ইহার সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়ে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুকাননও জজহোতি রাজ্যের এইরূপ পরিচয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উত্তরে যমুনা নদী হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে বেতোয়া নদী-তীরস্থিত অর্চ্চা হইতে পূর্ব্বে বুন্দেলনালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র জনপদ জজহোতি রাজ্য বলিয়া উক্ত হইত। কানিংহাম বলিয়াছেন, তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল উল্লিখিত স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেতোয়া নদীর পশ্চিমে এবং যমুনার উত্তরে কোন স্থলেই জজহোতীয় ব্রাহ্মণ দেখিতে পান নাই। তিনি বলিয়াছেন,—কেবল বেতোয়া নদীতীরবর্ত্তী বড়সাগরে, যমুনা তীরস্থিত হামিরপুরের নিকটবর্ত্তী মহোদয়ে, কেন নদীর তীরবর্ত্তী রাজনগরে ও কাজুরহো নগরে এবং চান্দেরি ও ভিল্‌সার মধ্যবর্ত্তী উদয়পুরে, পাথারী জেলায় ও ইরাণে জজহোতীয় ব্রাহ্মণের বাস দেখিয়াছিলেন। জজহোতীয় শব্দ 'যজুর্হোতা' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। যজুর্ব্বেদোক্ত বিধানের অনুসরণে ক্রিয়াকলাপ্র করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ 'যজুর্হোতা' শব্দের অপভ্রংশে 'জজহোতীয়' আখ্যা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে আবার বেণিয়াগণও জজহোতীয় বংশজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বলেন,—জজহোতি জনপদে বাস বলিয়াই তত্রত্য জনসাধারণ 'জজহোতীয়' নামে অভিহিত। এতৎসিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, উৎকল দেশে বাস বলিয়া 'উৎকলীয়', মিথিলায় বাস হেতু 'মৈথিল', কনোজে অবস্থান জন্য

---

* পুরাণোক্ত 'বেত্রবতী' বা 'বেদবতী' ও বেতোয়া নদী অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। পুরাণে লিখিত আছে,—বেত্রবতী বা বেদবতী পারিযাত্র (পারিপাত্র) পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত। পারিযাত্র পর্ব্বতের আধুনিক সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ সুকঠিন। তবে পুরাবৃত্তে জানা যায়,—বেত্রবতী (বেতোয়া) নদী বারাণসীর সন্নিকটে গঙ্গা নদীতে সম্মিলিত।

'কনোজীয়', গৌড়দেশে বাস বলিয়া 'গৌড়ীয়' প্রভৃতি নামে তত্তদেশের অধিবাসিগণ আজি পর্য্যন্ত পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জজহোতীয় ব্রাহ্মণ-বহুল প্রদেশই জজহোতি নামে অভিহিত হইত; এবং প্রাচীন জজহোতি ও আধুনিক বুন্দেলখণ্ড অভিন্ন। তবে বুন্দেলখণ্ডের সীমা-পরিমাণ অপেক্ষা প্রাচীন জজহোতি আরও বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—তাঁহার পরিদৃষ্ট জজহোতি রাজ্যের পরিধি-পরিমাণ চারি সহস্র লি বা ৬৬৭ মাইল। এ হিসাবে, সিন্ধু-নদ ও টন নদী পর্য্যন্ত এবং উত্তরে গঙ্গা নদী হইতে দক্ষিণে নয়াসরাই ও বিলহারি পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ জজহোতি রাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এই ভূভাগের মধ্যেই কালিঞ্জরের প্রসিদ্ধ দুর্গ। কথিত হয়, মুসলমান-আক্রমণে বুড়ী-চান্দেরী পরিত্যক্ত হইলে এবং মহোবা নগরী মুসলমানগণ অধিকার করিয়া লইলে, চান্দেল-রাজগণ কালিঞ্জর দুর্গে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। প্রকাশ,—এই সময়ে চান্দেরি দুর্গও মুসলমানগণ অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

কাজুরহো (খাজুরহো) নগরীর চৌত্রিশ মাইল উত্তরে, বেতোয়া ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে, প্রাচীন মহোবা নগরী। হামিরপুরের চুয়ান্ন মাইল দক্ষিণে, পর্ব্বতের পাদদেশে, ঐ নগরী অবস্থিত। কথিত হয়,—চান্দেল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রবর্ম্মা এই নগরে একটী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তদনুসারে উহা মহোৎসব-নগরী বা তাহার অপভ্রংশে মহোবা নামে অভিহিত হইয়াছে। মহোবার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে চাঁদ কবির 'মহোবা-খণ্ডে' একটী উপাখ্যান লিখিত আছে। তাহাতে প্রকাশ,—বারাণসীর প্রবল-প্রতাপশালী রাজা ইন্দ্রজিতের পুরোহিত হেমরাজের কন্যা হেমবতী হইতে চান্দেল-রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। হেমবতী অসামান্যা রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। এক দিন হেমবতী একাকিনী 'রতিতালাব' নামক কুণ্ডে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। চন্দ্রদেব হেমবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার সহিত সঙ্গোপনে মিলিত হন। চন্দ্রের এই ধৃষ্টতায় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া হেমবতী শাপ দিতে উদ্যতা হইলে, চন্দ্রদেব তাঁহাকে বলেন,—'তুমি বৃথা অভিসম্পাত করিও না। তোমার পুত্র পৃথিবী-পতি হইয়া সুখে কালযাপন করিবে এবং তাহা হইতে সহস্র রাজবংশের উদ্ভব হইবে।' হেমবতী তাহাতে জিজ্ঞাসা করেন,—'অনূঢ়া অবস্থায় আমার গর্ভধারণের কলঙ্ক কিরূপে অপনোদিত হইবে?' চন্দ্রদেব তাহাতে উত্তর দেন,—'তুমি ভীত হইও না। কর্ণাবতী নদীতীরে তোমার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে। তুমি তাহাকে খাজুরহো নগরে লইয়া গিয়া তত্রত্য নৃপতির হস্তে সমর্পণ করিও। তোমার সেই পুত্র মহামহিমান্বিত হইয়া মহোবা নগরে রাজত্ব করিবে। আমি তাহাকে স্পর্শমণি প্রদান করিব। মণি-স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হইবে। অতঃপর তোমার সেই পুত্র কালিঞ্জর নগরে একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিবে। পুত্রের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে আপনার কলঙ্ক-মোচনের জন্য তুমি 'ভাণ্ডযাগ' সম্পন্ন করিয়া বারাণসী হইতে কালিঞ্জরে গিয়া বাস করিও।' এই কথা বলিয়া

প্রাচীন মহোবা নগরী।

চন্দ্রদেব প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রদেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বৈশাখ মাসে, শুক্ল একাদশী তিথিতে, সোমবারে, কর্ণাবতী (আধুনিক কয়ান বা কেন) নদী-তীরে, হেমবতীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া দ্বিতীয় চন্দ্রমার স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। এদিকে চন্দ্রদেব দেবগণ পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। চন্দ্রদেব কর্তৃক সেই স্থানে একটি মহামহোৎসব সম্পন্ন হইল। বৃহস্পতি জাত-বালকের ভাগ্যলিপি রচনা করিলেন। বালকের নাম হইল —চন্দ্রবর্ম্মা। ইহার পর শিশু-সন্তান শুক্লপক্ষের চন্দ্রের স্থায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শিশু ক্রমে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই সময় ষোড়শবর্ষীয় বালক চন্দ্রবর্ম্মা একটি ব্যাঘ্র বধ করেন। তখন চন্দ্রদেব পুনরায় পুত্রের নিকটে আগমন করিয়া তাহাকে স্পর্শমণি প্রদান করিলেন। চন্দ্রদেব ক্রমে পুত্রকে রাজনীতি শিখাইলেন। ইহার কিছুদিন পরে চন্দ্রদেব কর্তৃক কালিঞ্জরের দুর্গ নির্ম্মিত হয়। অতঃপর মাতার কলঙ্ক অপনোদনের উদ্দেশ্যে খাজুরপুরে গমন, ভাণ্ডযাগের অনুষ্ঠান, তথায় ৮৫টা দেবমন্দির নির্ম্মাণ এবং মহোৎসবপুর বা মহোবা নগরে গমন করিয়া রাজধানী স্থাপন প্রভৃতি চন্দ্রবর্ম্মার কার্য্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ সময়ে এই সকল ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহার কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শিলালিপি-সমূহ পাঠে প্রতীত হয়,—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে (৮০০ খৃষ্টাব্দে) চান্দেল-রাজ-বংশের উৎপত্তি এবং মহোবা নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চান্দেলবংশীয় রাজগণ মহোবায় বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। শিলালিপি প্রভৃতি পাঠে জানা যায়, তাঁহাদের রাজত্বকাল ৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ। এই বংশের শেষ রাজা পরমর্দ্দির সময় হইতে চান্দেল-রাজগণের যশোভাতি ক্রমশঃ মলিন হইয়া আসে। পরমর্দ্দির রাজত্বকালে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ একবার মহোবা আক্রমণ করেন। পরে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতবুদ্দীন কর্তৃক ঐ নগরী আক্রান্ত হইয়াছিল। উভয় যুদ্ধেই পরমর্দ্দি পরাজিত হন। তাহার ফলে পরমর্দ্দির অধীনস্থ সামন্ত-রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। চাঁদ কবির 'মহোবাখণ্ডে' প্রকাশ,—দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজিত হইয়া পরমর্দ্দি দুই শত সঙ্গী সহ পলায়ন করিয়াছিলেন। অনেকে চাঁদ কবির এই উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহারা বলেন,—পৃথ্বীরাজের মহোবা আক্রমণের প্রায় বিশ বৎসর পরে কুতবুদ্দীন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরমর্দ্দি প্রাণপণে কালিঞ্জরের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে যখন তিনি মুসলমানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধিস্থাপনে প্রস্তুত হন, তখন তাঁহার মন্ত্রী তাঁহার প্রাণবধ করেন। মন্ত্রী আরও কয়েক দিবস দুর্গরক্ষা করিয়া অবশেষে নিহত হইলে মুসলমানগণ দুর্গ অধিকার করিয়া লন।' যাহা হউক, পরমর্দ্দির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বীরবর্ম্মা এবং পৌত্র ভোজবর্ম্মা মহোবায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরিশেষে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শের সাহ কালিঞ্জর-দুর্গ আক্রমণ করেন। চান্দেল-বংশের শেষ নৃপতি কিরাতসিংহ প্রাণ-পণে নগর রক্ষা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু শের সাহের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। যুদ্ধে কিরাতসিংহ নিহত হন। শের সাহ কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করিয়া বসেন। কালিঞ্জর তীর্থক্ষেত্র বলিয়াও প্রসিদ্ধ। রামায়ণে, মহাভারতে, হরিবংশে এবং পুরাণ-সমূহে কালিঞ্জর তীর্থের উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণে দেখিতে পাই,—কালিঞ্জর শৈব-তীর্থক্ষেত্র।

উহার ন্যায় পবিত্র তীর্থক্ষেত্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। ফেরিস্তার মতে, কেদারনাথ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কালিঞ্জর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কালিঞ্জর-রাজ বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। লাহোরাধিপতি রাজা জয়পালের এবং আনন্দপালের সহিত মিলিত হইয়া কালিঞ্জরাধিপতি গজনীতে ও পেশোয়ারে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কুতবুদ্দীন কালিঞ্জর অধিকার করিয়া কালিঞ্জরের শিবমন্দির পার্শ্বে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।

কথিত হয়, প্রাচীনকালে মহোবার দৈর্ঘ্য ৬ যোজন এবং প্রস্থ ২ যোজন নির্দ্দিষ্ট হইত। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম ইহাকে অতিরঞ্জিত বলিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা অনুসারে

অধুনিক অবস্থান।

পশ্চিমে রাইকোটের রাজপ্রাসাদ এবং পূর্ব্বে কল্যাণসাগর পর্য্যন্ত মহোবার দৈর্ঘ্য দেড় মাইলের অধিক হইতে পারে না। প্রস্থে ইহার পরিমাণ এক মাইল মাত্র। তাহা হইলে নগরের পরিধি পাঁচ মাইল হয়। কিন্তু এই পরিধি-পরিমাণের অন্তর্গত মদনসাগর বাদ দিলে, নগরটী এক বর্গ মাইল পরিধিযুক্ত হইয়া পড়ে। অতি সমৃদ্ধির দিনে, নগরের লোকসংখ্যা এক লক্ষ ছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম ঐ নগরে ছয় সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে মহোবায় ৭৫৬টী বাড়ী এবং ৪০০০ মাত্র লোকের বসতি ছিল। তদবধি মহোবার লোকসংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহোবা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম,—পাহাড়ের উত্তর দিকে, মহোবা নগরী; দ্বিতীয়,—পাহাড়ের উপরিভাগে 'ভিতরি কিল্লা' বা আভ্যন্তরীণ দুর্গ; তৃতীয়,—দবির বা পর্ব্বতের দক্ষিণ-ভাগস্থ সহরতলী। মহোবার পশ্চিমে দেড় মাইল পরিধিযুক্ত কিরাতসাগর। কথিত হয়, কীর্ত্তিবর্ম্মা ঐ সরোবর নির্ম্মাণ করেন। কীর্ত্তিবর্ম্মার রাজত্বকাল—১০৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। নগরের দক্ষিণ দিকে মদন-সাগর। উহার পরিধি-পরিমাণ—তিন মাইল। প্রকাশ,—মদনবর্ম্মা ঐ সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১১৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। কল্যাণসাগর নামা ক্ষুদ্র হ্রদ মহোবার পূর্ব্বে অবস্থিত। এই হ্রদ অতিক্রম করিলে গভীর জলপূর্ণ বিজয়-সাগর নামক হ্রদ দৃষ্ট হয়। কথিত হয়,—বিজয়পাল এই হ্রদ খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল—১০৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৬৫ খৃষ্টাব্দ। শেষোক্ত বিজয়-সাগরের পরিধি-পরিমাণ চারি মাইলের কম নহে। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে মদন-সাগরই দেখিতে সুন্দর। মদন-সরোবরের পশ্চিমে 'গ্রেনাইট' প্রস্তর-সমন্বিত গোকর নামক পাহাড়। উত্তরের সারি সারি অসংখ্য ঘাট, দুর্গের সানুদেশে অসংখ্য দেবমন্দির এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রস্তর শ্রেণী জলরাশির মধ্যভাগ ভেদ করিয়া অন্তরীপ-সদৃশ শোভমান। নগরের উত্তর দিকে যে পার্ব্বত্য দ্বীপ দৃষ্ট হয়, উহা অট্টালিকা-সমূহের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। পশ্চিম দিকে চান্দেল-রাজগণের দুইটী 'গ্রেনাইট' প্রস্তরের প্রাচীন দেবমন্দির দৃষ্ট হয়। তাহার একটি ধ্বংসপ্রায়। কিন্তু অপরটী সাত শত বৎসরের পরও সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া আছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন।

[পুণ্ড্র-রাজ্য—শাস্ত্রে পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের প্রতিষ্ঠা,—রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থে পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের পরিচয় প্রসঙ্গ ;—পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের পরবর্ত্তী ইতিহাস ; —পরিব্রাজক-পরিদৃষ্ট পুণ্ড্র-বর্দ্ধন,—বৌদ্ধযুগে পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের প্রসিদ্ধি,—পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের অবস্থানাদি,—পাবনা ও পুণ্ড্র-রাজ্য।]

পুণ্ড্রবর্দ্ধন অতি প্রাচীন রাজ্য। পুণ্ড্রবর্দ্ধন—পৌণ্ড্র, পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক, পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন প্রভৃতি নামে পুরাবৃত্তে প্রসিদ্ধ। বোধায়ন সূত্রে দেখিতে পাই,—পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদের অধিবাসিগণকে দর্শন করিলে 'পুনষ্টোম' বা 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' নামক যজ্ঞ বা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। * এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, এককালে পুণ্ড্র-দেশের অধিবাসিগণ, কোনও গর্হিত কর্ম্ম হেতু, সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। মন্বাদি-সংহিতা-শাস্ত্রেও এইরূপ উক্তি নিবদ্ধ আছে। মনু বলিয়াছেন,—পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ—এই কয়েক দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কার এবং যজনাধ্যয়নাদি অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ‡ রামায়ণে, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, পুণ্ড্র দক্ষিণ-দেশীয় জনপদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। সীতান্বেষণে অঙ্গদ, সুষেণ ও জাম্ববান প্রভৃতি বানরগণকে, দক্ষিণ-দেশে প্রেরণ ব্যপদেশে সুগ্রীব কহিতেছেন,—দক্ষিণদিকে গোদাবরী প্রদেশে, পুণ্ড্র, কেরল, চোল প্রভৃতি রাজ্য অনুসন্ধান করিবে।' ‡ মহাভারতে, সঞ্জয়োক্ত দেশ-জনপদাদির উল্লেখ প্রসঙ্গে, পুণ্ড্র-রাজ্য উত্তর-ভারতের জনপদ মধ্যে গণ্য। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞে পুণ্ড্র-রাজের উপস্থিতির বিষয় দৃষ্ট হয়। যজ্ঞাশ্ব রক্ষার্থ তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অর্জ্জুন—বঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিয়া কোশল দেশে উপনীত হইয়াছিলেন,—মহাভারতে উল্লেখ আছে। মহাভারতে উহা পুণ্ড্রক নামে অভিহিত। মৎস্যপুরাণের মতে, পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের অবস্থিতি প্রাচ্যদেশে। § ব্রাহ্মণ্ডপুরাণের মতে, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভারতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত সেখানে উহা পৌণ্ড্র নামে পরিচিত। ** গরুড়পুরাণে দেখিতে পাই,—পুণ্ড্র-রাজ্য ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভাগে বিদ্যমান। বৃহৎ-সংহিতায় বরাহমিহির পুণ্ড্র-রাজ্য পূর্ব্বদেশের

---

* বৌধায়ন সূত্র, প্রথম অধ্যায়, ১ম ও ২য় শ্লোক।

‡ মনুসংহিতায় আছে,—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"

মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ। ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥"

‡ রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪১শ সর্গ দ্রষ্টব্য।

§ মৎস্যপুরাণ, ১১৪শ অধ্যায়, ৪৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

** ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৫১শ অধ্যায়, ৫৭শ শ্লোক।

অন্তর্গত বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। * এই সকল বর্ণনা দৃষ্টে প্রতীত হয়, পুণ্ড্র-বংশীয় নরপতি-গণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জনপদে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন অথবা তত্তদ্দেশে এক এক সময়ে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তাই কখনও ভারতবর্ষের উত্তরাংশে, কখনও দক্ষিণাংশে এবং কখনও বা পূর্ব্বাংশে পৌণ্ড্র-রাজ্যের অবস্থিতির পরিচয় পাই। অধুনা পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের যে অস্তিত্বের পরিচয় অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হই, তাহাতে পুণ্ড্র-বর্দ্ধন পূর্ব্বদেশীয় জনপদ বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। পৌণ্ড্র-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে শাস্ত্র-গ্রন্থে দেখিতে পাই,—চন্দ্রবংশোদ্ভব পুণ্ড্র নামক নরপতি এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যযাতি-পুত্র পুরুর বংশে, অধস্তন ত্রিংশ পর্য্যায়ে, (ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ অনুসারে বিভিন্ন পর্য্যায়ে) বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও ওড্র নামক পুত্রগণ উৎপাদন করেন। তাঁহারা যে যে দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামানুসারে সেই সেই দেশ যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছিল। পুণ্ড্রের কোনও পুত্র-সন্তানের পরিচয় পাওয়া যায় না। পুরাণাদির আলোচনায় প্রতীত হয়, পুণ্ড্র হইতেই পুরু-বংশের অবসান হয় অথবা সে বংশের অপর কেহই প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং পুণ্ড্রের পর পুণ্ড্র-বর্দ্ধনে কোন্ নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। বৌদ্ধ-গ্রন্থাদির আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-কালে পুণ্ড্র-বর্দ্ধন বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল। খৃষ্ট-জন্মের ২৬৪ বৎসর পূর্ব্বে, বিন্দুসারের মৃত্যুর পর, তাঁহার মন্ত্রী রাধাগুপ্ত অশোকবর্দ্ধনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় অশোকের রাজ্য নিরাপদ করিবার জন্য রাধাগুপ্ত অশোকের আত্মীয়-স্বজন সকলকেই নিহত করিয়াছিলেন। অশোকের ভ্রাতা বীতাশোক তখন সন্ন্যাস-গ্রহণে পুণ্ড্র-বর্দ্ধনে পলায়ন করিয়া আপনার প্রাণ বাচাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের উত্তর-বিভাগ তখন পুণ্ড্র-বর্দ্ধন নামে অভিহিত হইত। মৌর্য্যবংশের রাজত্বের অবসানে পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। পরিবর্ত্তি-কালে বঙ্গদেশ মুসলমানগণের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইলে পুণ্ড্র-বর্দ্ধনও মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের পরবর্ত্তী ইতিহাস বঙ্গদেশের ভাগ্যাবপর্য্যয়ের সহিত ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত।

পরিব্রাজক-পরিদৃষ্ট পুণ্ড্র-বর্দ্ধন।

চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যখন পুণ্ড্র-বর্দ্ধনে আগমন করেন, তখন ঐ রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। সে সময়ে পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের পরিধি আট শত মাইল নির্দ্দিষ্ট হইত। পুণ্ড্র-বর্দ্ধন তখন জনাকীর্ণ ছিল। রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশাল দীর্ঘিকা, রাজ-কাছারী এবং ফলপুষ্প-সমন্বিত অটবী-শ্রেণী পুণ্ড্র-রাজ্যের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছিল। পুণ্ড্র-রাজ্যের উর্ব্বর ক্ষেত্রে তখন প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইত। পরিব্রাজক ঐ রাজ্যে তিন শত ভিক্ষু-অধ্যুষিত বিংশতিটী সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছেন। নগ্ন-দেহ নিগ্রন্থগণ পুণ্ড্র-রাজ্যের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইত। বৌদ্ধ মঠ ও সঙ্ঘারাম ব্যতীত পুণ্ড্র-ভূমির প্রায় শত-সংখ্যক দেব-মন্দির তৎকালে

* বৃহৎসংহিতা, ১৪ অধ্যায়, কূর্ম্মবিভাগ-প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

হিন্দু-ধর্ম্মের গৌরব-গরিমার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিল। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন নামক কোনও জনপদের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার বর্ণনায় 'পান-না-ফা-তান-না' (Pan-na-fa-tan-na) নামক রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জুলিয়েন বলেন,—পরিব্রাজক-কথিত 'পান-না-ফা-তান-না' রাজ্য এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অভিন্ন। ভিভিয়েন-ডি-সেণ্ট-মার্টিন উহাকে 'বর্দ্ধমান' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সেণ্ট-মার্টিনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,— পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থানের বিষয় আলোচনা করিলে কখনই উহাকে বর্দ্ধমান আখ্যা প্রদান করা যায় না। তাঁহার মতে, পুণ্ড্রবর্দ্ধন এবং আধুনিক পাবনা অভিন্ন। গঙ্গা-নদীর পর-পারে কাঁকজোল * নগরের প্রায় এক শত মাইল পূর্ব্বে, পাবনা অবস্থিত। পরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে প্রতীত হয়, তিনি কাঁকজোল হইতে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া প্রথমেই 'পান-না-ফা-তান-না' নগরে উপনীত হন। তাঁহার হিসাবে, কাঁকজোল হইতে ঐ নগরের দূরত্ব—৬০০ লি বা ১০০ মাইল। কানিংহামের মতে, পাবনা ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কাশ্মীরের ইতিহাসে প্রকাশ,—পুণ্ড্রবর্দ্ধন গৌড়-রাজ্যের রাজা জয়ন্তের রাজধানী ছিল। রাজা জয়ন্ত ৭৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। † চলিত ভাষায় পুণ্ড্রবর্দ্ধন—পোন-বর্দ্ধন বা পোবাধান রূপেও উচ্চারিত হইয়া থাকে। কানিংহাম সিদ্ধান্ত করেন, উহা হইতেই 'পাবনা' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। হুয়েন-সাঙের মতে, পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের পরিধি-পরিমাণ—৪০০০লি বা ৬৬৭ মাইল। ইহার পশ্চিমে মহানদী, পূর্ব্বে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণে গঙ্গানদী বিদ্যমান।

---

* হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন সময়ে বর্ত্তমান রাজমহলের সন্নিকটে কাঁকজোল নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। হুয়েন-সাং 'কিয়ে-কিয়ে-চু-লো' (Kie-kie-chu-lo) রূপে উহার উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। গ্লাডুইন অনুবাদিত আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে ঐ রাজ্য 'গংজুক' (Gungjook) নামে এবং 'গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে রাজমহল-প্রসঙ্গে হামিল্টন কর্ত্তৃক ঐ রাজ্য 'কাউকজোল' (Caukjole) রূপে লিখিত হইয়াছে। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় ঐ রাজ্যের পরিধি তিন শত মাইল। তাহা হইতে কানিংহাম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,— রাজমহলের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে পার্ব্বত্য প্রদেশ বিদ্যমান, সেই পার্ব্বত্য-প্রদেশ এবং তথা হইতে মুর্শিদা-বাদের উত্তরাংশ ভাগীরথী পর্য্যন্ত, কাঁকজোল রাজ্য বিস্তৃত ছিল। রাজমহল জেলা রাজধানীর নাম অনুসারে পূর্ব্বে 'আকবর নগর" নামে অভিহিত হইত এবং রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ-পত্রে উহা কাঁকজোল নামে পরিচিত ছিল। কাঁকজোল তৎকালে একটী প্রধান সৈনিক-নিবাস-স্থান মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

† রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক উইলসন বলেন,—পুণ্ড্র-বর্দ্ধনের বহু জনপদ গঙ্গানদীর উত্তর দিকে অবস্থিত। তন্মধ্যে গৌড়, পাবনা প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। "The greater part of the Province (Paundrabardhan) was to the north of the Ganges, including Gauda, Pubna &c."

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাচ্য-জনপদ-সমূহ।

[প্রাচ্য-জনপদে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপের প্রসিদ্ধি;—কামরূপের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত; কামরূপ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ,—এতদুভয়ের অভিন্নতা-প্রতিপাদন;—পরিব্রাজক-পরিদৃষ্ট কামরূপ-রাজ্য,—কামরূপ-রাজ্যের অবস্থান্তর,—তদন্তর্গত তীর্থস্থানাদির পরিচয়;—ওড্রদেশ,—পুরাতত্ত্ব;—পরবর্ত্তী ইতিহাস;—পরিব্রাজক-পরিদৃষ্ট ওড্র-রাজ্য;—তীর্থস্থানাদির পরিচয়,—পুরীধাম,—জগন্নাথ-মাহাত্ম্য;—বঙ্গ রাজ্য,—প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গ,—বঙ্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-পরিচয়;—শাস্ত্রগ্রন্থে প্রসিদ্ধি,—পরিব্রাজকের বর্ণনায় বঙ্গরাজ্য;—বঙ্গরাজ্যের পরবর্ত্তী ইতিহাস,—আধুনিক অবস্থা;—তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ,—পৌরাণিক পরিচয়,—পুরাবৃত্তে উহার প্রসিদ্ধি,—হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-কালে তাম্রলিপ্তির অবস্থা,—আধুনিক অবস্থান;—প্রসঙ্গোক্ত জনপদাদি।]

শাস্ত্রোক্ত প্রাচ্য-জনপদ-সমূহের মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রাচীন জনপদের ন্যায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্যের প্রাচীনত্বও অবিসম্বাদিত। সূত্রগ্রন্থ সমূহে এবং সংহিতা শাস্ত্রাদিতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামের উল্লেখ না থাকিলেও, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ-নিচয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্যের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনু প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্যের নাম উল্লেখ করেন নাই। তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্রে কিরাত-নিষেবিত জনপদ বলিয়া প্রাচ্যদেশের একটী রাজ্যের উল্লেখ আছে। মহাভারতাদিতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্য কিরাত-জাতির বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং মনে হয়, মনুসংহিতার কিরাত-নিষেবিত রাজ্য এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ অভিন্ন। তবে মনু-সংহিতায় কিরাত-রাজ্যকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে অভিহিত না করার তাৎপর্য্য অবধারণ এক্ষণে সুকঠিন। মনুসংহিতায় কিরাত-দেশ-নিবাসীকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উহারা উপনয়নাদি সংস্কার এবং যজনাধ্যয়নাদি অভাবে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। * রামায়ণে প্রাগ্‌জ্যোতিষ একটী নগর বলিয়া পরিচিত এবং উহা পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ত্রেতাযুগে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাদেবী অপহৃতা হইলে, তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত সেনাপতি সুগ্রীব নানা স্থানে বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ দিকে চর-প্রেরণানন্তর, ভীম-পরাক্রম সুষেণ ও মারীচ প্রভৃতি বানরগণকে পশ্চিমাভিমুখে সীতান্বেষণে প্রেরণ ব্যপদেশে কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব বলিয়াছেন,—

"যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্ব্বতঃ। সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্। তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥" †

অর্থাৎ,—'অতলস্পর্শ বরুণালয় সমুদ্র মধ্যে চতুঃষষ্টি যোজন বিস্তৃত সুবর্ণ-শিখর-বিশিষ্ট

---

* মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৪৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪২শ সর্গ, ৩০শ ও ৩১শ শ্লোক।

বরাহ নামক মহাপর্ব্বত দেখিতে পাইবে। তথায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে কাঞ্চন-নির্ম্মিত পুরী বর্ত্তমান। সেই পুরী মধ্যে নরক নামক দুরাত্মা দানব বাস করিয়া থাকে।' রামায়ণোক্ত এই প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরী ভারতবর্ষের কোথায় অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আমরা যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, অধুনা উহা 'আসাম' প্রদেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আসামের অনেক স্থানে সুবৃহৎ পর্ব্বতমালা বিরাজিত বটে; কিন্তু রামায়ণ-বর্ণিত বরুণালয় সমুদ্র মধ্যে ঐ সকল পর্ব্বতের অবস্থিতি অধুনা সপ্রমাণ হয় না। ত্রেতাযুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বহু যুগ বহু বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কাল-বিবর্ত্তনে কত জনপদের উত্থান-পতন ঘটিয়াছে; কত জলময় প্রদেশ স্থল-ভূমিতে, আবার কত স্থলভূমি জলময় মহাসাগরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কাল-প্রবাহে এরূপ পরিবর্ত্তন-বিবর্ত্তন, নূতন-পুরাতনের এরূপ উত্থান-পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মনে হয়, হয় তো কোনও এক ত্রেতা-যুগে, শ্রীরামচন্দ্রের অবতার-গ্রহণ সময়ে, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্য ভারতভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং উহাদের মধ্যে অনন্ত জলরাশি বিরাজ করিত। সেই জলাকীর্ণ স্থান ক্রমশঃ স্থলভূমে পরিণত হইয়াছে। মহাভারতে দেখিতে পাই,—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে, অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়ে, প্রাগ্‌-জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত কিরাত, চীন এবং সাগর-তীরস্থ অন্যান্য অনূপদেশ-বাসী বহু-সংখ্যক যোধগণে পরিবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। * কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সময়েও ভগদত্ত, চীন ও কিরাত সেনা দ্বারা, কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সহায়তা করেন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্তের পুত্র মহীপতি বজ্রদত্ত যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিয়াছিলেন। যুদ্ধে বজ্রদত্ত পরাজিত হন। পরিশেষে অর্জ্জুন তাঁহাকে সামন্ত-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লন। মহাভারতে সঞ্জয়োক্ত জনপদ সমূহের মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম দৃষ্ট হয় না। সেস্থলে কিরাত-দেশের উল্লেখ আছে। ‡ পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের সবিশেষ পরিচয় বর্ত্তমান। মৎস্যপুরাণের মতে,—প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রাচ্য-জনপদ-মধ্যে পরিগণিত। § বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বামনপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ভারতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ** বিষ্ণুপুরাণে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের নাম আদৌ দৃষ্ট হয় না। বিষ্ণুপুরাণে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্যের পরিবর্ত্তে কামরূপ-রাজ্য লিখিত আছে। সেখানে ভারতের নদ-নদীর নাম-কীর্ত্তন ও তাহাদের অবস্থানাদি নিরূপণ ব্যপদেশে মহর্ষি পরাশর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন,—'কামরূপ-নিবাসী পূর্ব্বদেশীয়গণ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ প্রভৃতি ও দাক্ষিণাত্যবাসি-

---

* মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২৬শ অধ্যায়।

† মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব্ব, ৫৭শ অধ্যায় এবং "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ৯ম অধ্যায় এবং "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

§ মৎস্যপুরাণে, ১১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—
"প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ। শাল্বমাগধগোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ॥"

** বায়ুপুরাণ, ৪৬শ অধ্যায়, ১২০শ শ্লোক; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৪৯শ অধ্যায়, ৫৭শ শ্লোক; বামনপুরাণ, ১৩শ অধ্যায়, ৪৬শ শ্লোক; ব্রহ্মপুরাণ, ২৭শ অধ্যায়, ৫০শ শ্লোক।

গণ এই সকল নদীর জল পান করে।' * এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়,—প্রাচীন-কালে পূর্ব্বদেশে কামরূপ রাজ্যই বিশেষ ক্ষমতাশালী ও প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। পরিশেষে উহা প্রাগ-জ্যোতিষ নামে অভিহিত হয়। এরূপ সিদ্ধান্তের হেতু স্বরূপ কালিকা-পুরাণোক্ত কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। কালিকাপুরাণোক্ত সেই শ্লোক কয়েকটী এই,—

"করতোয়া সদা গঙ্গা পূর্ব্বভাগাবধিশ্রয়া। যাবল্ললিতকান্তাস্তি তাবদেব পুরং তব ॥
অত্র দেবী মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ। কামাখ্যারূপমাস্থায় সদা তিষ্ঠতি শোভনা ॥
অত্রাস্তি নদরাজোঽয়ংলৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ। অত্রৈব দশদিকপালাঃ স্বে স্বে পীঠে ব্যবস্থিতাঃ ॥
অত্র স্বয়ং মহাদেবো ব্রহ্মাচাহং ব্যবস্থিতঃ। চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ সততং বসতোঽত্র চ পুত্রক ॥
সর্ব্বে ক্রীড়ার্থমায়াতা রহস্যং দেশমুত্তমম্। অত্র শ্রীর্বসতে ভদ্রা ভোগামাত্র তথা বহু ॥
অস্য মধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্ নক্ষত্রং সসর্জ্জহ। ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরীং শক্রপুরী সমা ॥
অত্র ত্বং বস ভদ্রং তে স্থাভিষিক্তো ময়া স্বয়ম্। কৃতদারঃ সহামাত্যো রাজা ভূত্বা মহাবলঃ ॥"

—কালিকা-পুরাণ, ৩৮শ অধ্যায়।

শ্রীভগবান নরকাসুরকে কহিতেছেন,—হে পুত্র! যে স্থানে করতোয়া নাম্নী গঙ্গানদী সর্ব্বদা পূর্ব্বদিকে প্রবহমানা এবং যে স্থানে ললিতকান্তা-দেবী বিরাজিতা, সেই স্থান পর্য্যন্ত তোমার পুরী। এই স্থানে দেবী মহামায়া জগৎপ্রসবিনী যোগনিদ্রা, কামাখ্যারূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য-নদও তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পুণ্যভূমিতে দশদিক্‌পালগণ স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত। এই স্থানে স্বয়ং মহাদেব, ব্রহ্মা ও আমি সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছি। চন্দ্র সূর্য্যাদিও সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন। এ স্থান বড় রহস্যপূর্ণ; সেই জন্য ক্রীড়ার নিমিত্ত সমস্ত দেবগণ এখানে আগমন করেন। এস্থলে সর্ব্বতোভদ্রা নামে লক্ষ্মী আছেন। এই পুরীতে ব্রহ্মা পূর্ব্বে একটী নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া-ছিলেন; সেই জন্য ইন্দ্রপুরী-সদৃশ এই পুরী প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ভদ্র নরক! তুমি দার-পরিগ্রহ করিয়া এই পুরীতে রাজত্ব কর। আমি তোমাকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম।' † গরুড়-পুরাণে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম দৃষ্ট হয় না। সেখানে কামরূপ মহাতীর্থ বলিয়া উল্লিখিত। পুরাণাদি ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রে কামরূপের মাহাত্ম্য-তত্ত্ব বিস্তারিত রূপে পরিকীর্ত্তিত। তন্ত্রশাস্ত্রে দেখিতে পাই,—'কামরূপ—দেবী-ক্ষেত্র। এমন স্থান আর নাই। অন্যত্র দেবীর দর্শন অসম্ভব হইতে পারে; কিন্তু কামরূপের ঘরে ঘরে দেবী বিরাজমানা।' ‡ যোগিনী-তন্ত্রে দৃষ্ট হয়,—'মহাপীঠ কামরূপ অতি গুহ্যতীর্থ।' এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, 'ত্রেতাযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া যুগে যুগে কামরূপের বা প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের মাহাত্ম্য-তত্ত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বরাহ-মিহিরের ভারতবর্ষের বিভাগ বর্ণনায় কামরূপের নাম লোপ পাইয়াছে। § সে স্থলে প্রাগ্‌-জ্যোতিষ নাম উল্লিখিত। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে, রঘুর দিগ্বিজয়ে,

* "পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ। পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গামগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।"

† গরুড়পুরাণ, পূর্ব্ব-খণ্ড, ৮১শ অধ্যায়, ১৬শ শ্লোক,—"কামরূপং মহাতীর্থং কামাখ্যা তত্র তিষ্ঠতি।"

‡ "দেবীক্ষেত্রং কামরূপং বিদ্যতেঽন্যং ন তৎসমম্। অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে।"

§ এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়, ৫২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কামরূপ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ উভয় নামই দেখিতে পাই। সেখানে লিখিত আছে,—

"চম্পকে তর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ। তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহকালাগুরুদ্রুমৈঃ॥
ন প্রসেহে স রুদ্ধার্কমধারাবর্ষদুর্দ্দিনম্। রথবর্ত্মরজোঽপ্যস্য কুতএব পতাকিনীম্॥
তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডলবিক্রমম্। ভেজে ভিন্নকটৈর্নাগৈরন্যানুপরুরোধ যৈঃ॥
কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্। রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ্চ পাদয়োঃ॥"

অর্থাৎ—'তিনি (রঘু) লৌহিত্য নদ পার হইলে, তদীয় গজবন্ধন জন্য কৃষ্ণাগুরু-বৃক্ষ-সমূহ যেরূপে কম্পিত হইয়াছিল, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতিও তদ্রূপ কম্পিত হইতে লাগিলেন। রঘুর রথচক্রে রাশি রাশি ধূলি উত্থিত হইয়া, বিনামেঘেও যেন মেঘাচ্ছন্ন দিনবৎ আকাশ আবৃত করিয়া, সমুদায় দুর্দ্দিনের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া তুলিল। সেনার আক্রমণ দূরে থাকুক, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি সেই ধূলিরাশিও সহ্য করিতে পারিলেন না। যে মদস্রাবী মাতঙ্গগণ সমভিব্যাহারে অন্যান্য নৃপতিদিগকে আক্রমণ করিতেন, কামরূপের অধিপতি সেই গজ-সমূহকে ইন্দ্রাধিক বিক্রমশালী রঘুরাজকে উপহার দিলেন। চরণ-প্রভা দ্বারা রঘু সুবর্ণময় পাদপীঠ অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়াছিলেন; কামরূপেশ্বর আসিয়া রত্নরূপ পুষ্পোপহার দ্বারা তাহার সেই চরণযুগল অর্চ্চনা করিলেন।' এতদ্দ্বারা উপলব্ধি হয়,—কামরূপ-রাজ্য কতকাল হইতে বিদ্যমান, এবং কখনও উহা কামরূপ রাজ্য নামে, কখনও বা প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্য নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। তবে কালিকা-পুরাণের আর একটী শ্লোক দৃষ্টে প্রতীত হয়, প্রাগজ্যোতিষ—কামরূপের অংশ-বিশেষ মাত্র। কামরূপ একটী বিস্তীর্ণ জনপদ; প্রাগজ্যোতিষপুরী উহার রাজধানী। * কামরূপের নামকরণ সম্বন্ধে কালিকা-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—কাম, হর-কোপানলে ভস্মীভূত হইয়া, মহাদেবের অনুগ্রহে এই পীঠে আসিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তদবধি এই পীঠ 'কামরূপ' নামে অভিহিত। † আবার পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই স্থানে থাকিয়া নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন;—সেই জন্য ইহার প্রাচীন নাম প্রাগজ্যোতিষ হইয়াছিল। ‡ মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞোপলক্ষে দেশজয়ে বহির্গত হইয়া, অর্জ্জুন যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্য এবং অধুনা-নির্দ্দিষ্ট প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্য অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। অশ্বমেধের অশ্ব ত্রিগর্ত্তদেশ হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে গমন করে এবং সেখান হইতে সিন্ধুদেশে উপনীত হয়। কোথায় সিন্ধুদেশ, কোথায় আসাম প্রদেশ! এতদুভয়ের সামঞ্জস্য বিধান কি প্রকারে সম্ভবপর? মনে হয়,—অশ্ব পর পর যে যে স্থানে গমন করিয়াছিল, মহাভারতকার তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই।

* কালিকা-পুরাণ, ৩৮শ অধ্যায়, ৯৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য,—
"নিমেষা-ক্ষণমাত্রেণ প্রাগজ্যোতিষ পুরং গতঃ। মধ্যগং কামরূপস্য কামাখ্যা যত্র নায়িকা॥"
জগৎকর্ত্তা নারায়ণ, পৃথিবী ও নরককে লইয়া ক্ষণকালের মধ্যে প্রাগজ্যোতিষ-পুরে উপনীত হইলেন। এই স্থানটী কামরূপের মধ্যে।

† কালিকা-পুরাণ, ৫১শ অধ্যায়, ৬৭শ শ্লোক,—"শম্ভুনেত্রাগ্নিনির্দ্দগ্ধঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ। তত্র রূপং যতঃ প্রাপ কামরূপং ততোঽভবেৎ॥"

‡ কালিকা-পুরাণ, ৩৮শ অধ্যায়, ১১৯শ শ্লোক।

প্রাচীনকালে কামরূপ-রাজ্য একটী বহু-বিস্তৃত জনপদ ছিল। বর্ত্তমান আসাম, কুচ-বিহার, জলপাইগুড়ী এবং রঙ্গপুর—কামরূপ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া উক্ত হয়।

কামরূপের ইতিবৃত্ত।

তন্ত্র-শাস্ত্র মতে, করতোয়া নদী হইতে দিক্করবাসিনী * পর্য্যন্ত কামরূপ-রাজ্য বিস্তৃত। ইহার উত্তর সীমায় কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী,† পূর্ব্ব সীমানায় দিক্ষু নদী ‡ এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা নদীর সঙ্গম-স্থল। § শাস্ত্রমতে কামরূপ-রাজ্যের আকৃতি ত্রিকোণাকার। ইহার দৈর্ঘ্য এক শত যোজন এবং পরিসর ত্রিশ যোজন। করতোয়া-নদী ইহার পশ্চাদ্ভাগে বিরাজিতা।** স্কন্দ-পুরাণে, কুমারিকা-খণ্ডে, দেখিতে পাই,—"কামরূপে চ গ্রামাণাং নবলক্ষাঃ প্রকীর্ত্তিতা।" অর্থাৎ, কামরূপ-রাজ্যে নয় লক্ষ গ্রাম বিদ্যমান। কামরূপের 'বুরুঞ্জি' গ্রন্থে-মতেও ইহার উত্তরে কঞ্জগিরি বা ভুটানের পার্ব্বত্য প্রদেশ, পূর্ব্বে মহাচীন বা চীন-সাম্রাজ্য, দক্ষিণে লাক্ষা এবং পশ্চিমে করতোয়া-নদী। ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রাচীন-কালে কামরূপ-রাজ্য কত দূর বিস্তৃত এবং কিরূপ আকৃতি-সম্পন্ন ছিল। কোন্ সময়ে কোন্ নৃপতি কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। পুরাণাদির আলোচনায় মহীরঙ্গ নামা প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর জনৈক দানব-রাজের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মহীরঙ্গ পুরাণ-প্রসিদ্ধ কোন্ দানব-বংশজ এবং কামরূপ-রাজ্য কিরূপে তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহার কোনও বিবরণ দৃষ্ট হয় না। মহীরঙ্গের মৃত্যুর পর তদ্বংশীয় চারি জন দানব নৃপতি প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের পর আমরা নরকাসুরের নাম দেখিতে পাই। পূর্ব্বে সুগ্রীবোক্ত যে শ্লোকদ্বয় রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয়,—শ্রীরামচন্দ্রের সমসময়ে নরকাসুর প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি ছিলেন। নরকাসুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে কালিকা-পুরাণে একটী কৌতূহলপূর্ণ উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। সেই উপাখ্যান,—বরাহরূপী ভগবান

---

* দিক্কর শব্দে মহাদেব। মহাদেবে যিনি অবস্থান করেন, তিনিই দিক্কর-বাসিনী। অর্থাৎ, দিক্কর-বাসিনী শব্দে দেবী ভগবতীকেই বুঝাইয়া থাকে। এ হিসাবে, দিক্কর-বাসিনীর মন্দির কামরূপের একটী সীমা। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—মানসসরোবরের সন্নিকটে এই মন্দির বিদ্যমান ছিল।

† অধুনা রঙ্গপুর-জেলায় তিস্তা বা ত্রিস্রোতা নদী বিদ্যমান। ঐ নদীতে পাথরাজ নামক একটী ক্ষুদ্র নদী মিলিত হইয়াছে। রঙ্গপুরের অধিবাসিগণ বলেন,—উহাই করতোয়া-নদীর প্রাচীন ধারা। কাল-প্রবাহে করতোয়ার গতি অন্যদিকে পরিচালিত হইয়াছে মাত্র।

‡ প্রাচীন দিক্ষু নদীর আধুনিক নাম—দিখু। শিবসাগরের নিকট এই নদী ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। শাস্ত্রমতে এই নদী কামরূপ-রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা।

§ যোগিনী-তন্ত্রে কামরূপ-রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াত্তু পশ্চিমে॥
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষু-নদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে। দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়া সঙ্গমাবধি॥
ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেণ শত যোজনম্। কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্॥"

** কালিকা-পুরাণ, ৫১শ অধ্যায়, ৬৫শ ও ৬৬শ শ্লোকে দৃষ্ট হয়,—
"করতোয়া-নদী পূর্ব্বং যাবদ্দিক্করবাসিনীম্। ত্রিংশদ যোজন বিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্॥
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতাচল পূরিতম্। নদীশতসমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

বিষ্ণুর ঔরসে ধরিত্রীর গর্ভে নরকের জন্ম হয়। শৈশবে রাজর্ষি জনক তাঁহাকে লালনপালন করেন। ভগবানের বরে, ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরীতে নরক আপনার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নারায়ণের বর ছিল,—যতদিন নরক মানুষভাবে প্রকৃতি-রঞ্জন করিবে, ততদিন নরকের পতন হইবে না। কিন্তু মানুষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া যখন অত্যাচারী ও প্রকৃতি-পীড়ক হইবে, তখনই তাহার আসন্ন-মৃত্যু-কাল উপস্থিত জানিবে। মনুষ্যজনোচিত বিধি-বিধানের অনুসরণে নরক বহু দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরিশেষে ত্রেতাযুগের অবসানে বলি-পুত্র বাণ-রাজার সহিত নরকের বিশেষ সখ্য হয়। বাণ-রাজ আসুর-ভাবে বিচরণ করিতেন। তাঁহার সংসর্গে ক্রমে নরকও আসুর-ভাবাপন্ন হইলেন; দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদা বশিষ্ঠ-দেব মহামায়া কামাখ্যা-দেবীর দর্শন জন্য প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরে উপনীত হইলেন। নরক তাঁহাকে পুরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তাহাতে, দেবী-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া, বশিষ্ঠদেব নরককে অভিশপ্ত করিলেন,—"তুমি মদগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত; তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী। তুমি যাঁহার ঔরসে জন্মিয়াছ, তাঁহারই হস্তে তোমার সংহার-সাধন হইবে। যত দিন তুমি জীবিত থাকিবে, তত দিন সপরিজন কামাখ্যা-দেবী এই পুরী পরিত্যাগ করিবেন।" বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া নরক ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মার বরে তাঁহার ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান্ ও সুমালী নামক চারিটী পুত্র জন্মে। ইতিমধ্যে দেবগণ রম্ভা ও তিলোত্তমার ন্যায় রূপগুণ-সম্পন্না ষোড়শ সহস্র রমণী উৎপাদন করেন। রমণীগণ হিমালয়ে বিচরণ করিতেছিল। নরকাসুর তাহাদিগকে হরণ করিয়া আনেন। নরকাসুরের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠে। তখন দ্বাপরের শেষভাগ উপস্থিত। ভগবান ভূভার-হরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবগণের আদেশে শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরী আক্রমণ করেন। নরকের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নরকাসুর নিহত হন। * নরক নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ নরকের কোষাগারে প্রবেশ করিয়া মণি, মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য, মরকত, চন্দ্রকান্ত, হীরক, সুবর্ণ প্রভৃতি বহুবিধ ধন-রত্ন, মহার্হ শয্যা, প্রদীপ্তানলতুল্য সিংহাসন, সুবর্ণের শত-সহস্র ধারা, প্রবাল-খচিত অঙ্কুশ প্রভৃতি এবং দেশজাত অষ্ট লক্ষ উত্তম মাতঙ্গ, প্রিয়-দর্শন পক্ষী, ক্রীড়নক প্রভৃতি দ্বারাবতী নগরে লইয়া আসেন। † শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নরকাসুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার সময়ে পূর্ব্বে চীন-সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত কামরূপ-রাজ্য বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল। ভগদত্তের পর, কামরূপ-রাজ্যের কিরূপ পরিণতি সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। কামরূপের প্রাচীন ইতিহাসে, ভগদত্তের পর, ধর্ম্মপাল, রত্নপাল, কামপাল, পৃথ্বীপাল ও সুবাহু নামক পাঁচ জন রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, ইঁহারা সকলেই ভগদত্তের বংশসম্ভূত। কিন্তু গ্রন্থে ইঁহাদের কোনও পরিচয় নাই। অথবা, ইঁহারা কোন্ সময়ে, কত দিন কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন,

* কালিকা-পুরাণ, ৩৬শ—৪০শ অধ্যায় সমূহ দ্রষ্টব্য।

† হরিবংশ, ১২১শ অধ্যায়ে এতদ্বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

[illegible] অজ্ঞাত। অনেকে ধর্ম্মপালকে পালবংশধর বলিয়া থাকেন। ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে, আসামের পূর্ব্বভাগে, 'ছুটীয়া' নামক এক প্রবল-পরাক্রান্ত জাতি বাস করিত। তাহারাও 'পাল' উপাধি-ভূষণে ভূষিত ছিল। কামরূপাধিপতি ধর্ম্মপাল ছুটীয়া-বংশ কিংবা গৌড়ীয় 'পাল'-রাজবংশোদ্ভব, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক, ধর্ম্মপালের রাজত্বের পর, কামরূপ-রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ে, কামরূপ-রাজ্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল-প্রবাহে ভাসমান হইয়াছিল। গুপ্তবংশীয় অশোকের রাজত্বকালে কামরূপ-রাজ্য তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। গুপ্ত রাজগণের শিলা-লিপি পাঠে জানা যায়,—সামাতাতা, * কামরূপ, নেপাল প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণ অশোকের আদেশ পালন করিয়া তাঁহাকে প্রতি বৎসর কর প্রদান করিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন-সাং যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন কামরূপ-রাজ্যে ভাস্করবর্ম্মা নামক জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। কনোজ-রাজ হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্য ছিল। হুয়েন-সাং তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন; ভাস্করবর্ম্মার রাজত্বকালে কামরূপ-রাজ্যে অসংখ্য হিন্দু-দেব-দেবীর মন্দির ছিল; পরিব্রাজক তখন একটীও বৌদ্ধ-বিহার বা সঙ্ঘারাম দেখিতে পান নাই। ভাস্করবর্ম্মা কুমাররাজ নামেও উক্ত হইতেন। ৫৬৫ শকে নালন্দায় যে বৌদ্ধ-সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে ভাস্করবর্ম্মা যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল-বংশের উচ্ছেদের পর কামরূপে কামাতিপুরের † রাজ-বংশের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই বংশের নীলাম্বরের রাজত্বকালে বাঙ্গালার নবাব আলাউদ্দীন হোসেন সাহ কামরূপ আক্রমণ করেন। সেই সময় কামরূপ-রাজ্য বার বৎসর কাল অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। ১৫৬৪-১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় কামাখ্যা দেবীর মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। তখন মহারাজ নরনারায়ণ কামরূপে রাজত্ব করিতেন। নরনারায়ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ, কালাপাহাড়ের প্রভাবে ভীত হইয়া, তাঁহার সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কুচবিহার তখন নরনারায়ণের রাজধানী ছিল। নরনারায়ণ হইতেই কুচবিহার-রাজবংশের অভ্যুদয়। নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল বাদসাহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার

---

* হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-কালে সমতট নামধেয় এক রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 'সান্-মো-তা-চা' (San-mo-ta-cha) রূপে উহার উচ্চারণ করিয়াছেন। কামরূপের দক্ষিণে ১২ শত লি হইতে ১৩ শত লি (২০০ মাইল হইতে ২১৭ মাইল) দূরে ঐ রাজ্য অবস্থিত ছিল, তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ। তাঁহার কথিত 'সান-মো-তা-চা' ইংরাজিতে 'সামাতাতা' (Samatata) রূপে লিখিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, 'সমতট' শব্দই ভাষান্তরে ঐরূপ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। কানিংহাম সামাতাতাকে যশোহর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাম্রলিপ্ত বা তমলুক হইতে উহার দূরত্ব, পূর্ব্ব দিকে, নয় শত লি বা দেড় শত মাইল। সামাতাতা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এবং এই পরিচ্ছেদের পরবর্ত্তী পৃষ্ঠান্তরে দ্রষ্টব্য।

† কুশবিহার বা কুচবিহার বিভাগের রাজধানীর নাম—কামাতিপুর। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন কালে কামাতিপুর নগর শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। তাঁহার বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায়,—পাবনা হইতে কামাতিপুর নয় শত লি বা দেড় শত মাইল উত্তরে অবস্থিত। তখন কামরূপ-রাজ্যের রাজধানী—ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ-তীরস্থিত গৌহাটী। পাবনা হইতে গৌহাটীর দূরত্ব—১৯ শত লি বা ৩১৭ মাইল, তাঁহার বর্ণনায় বুঝা যায়। সময় সময় কুচবিহার-প্রদেশও কামাতিপুর নামে অভিহিত হইয়াছিল।

করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ-রাজ্য ইংরেজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন। তখন উহা কামরূপ নামে প্রসিদ্ধ। প্রবল-প্রতাপশালী কামরূপ-রাজ্যের

পরিব্রাজক-পরিদৃষ্ট কামরূপ।

পরিধি-পরিমাণ তখন দুই সহস্র মাইল নির্দিষ্ট হইত। সে হিসাবে, বর্ত্তমান আসাম, মণিপুর, কাছাড়, ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্ট উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিব্রাজকের বর্ণনায় প্রকাশ,—তৎকালে কামরূপ-রাজ্যের উর্ব্বর-ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নারিকেল, যব, গম, ধান্য ও অন্যান্য খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইত। রাজ্যের সর্ব্বত্র নদী ও সরোবরের প্রাচুর্য্য হেতু, কামরূপ-রাজ্যে কদাচ জলকষ্ট অনুভূত হইত না। নাতিশীতোষ্ণ স্নিগ্ধ জলবায়ুর প্রভাবে সাধু ও সদাচার-পরায়ণ অধিবাসিগণ প্রফুল্ল-ভাবে কালাতিপাত করিতেন। কামরূপের অধিবাসিগণ খর্ব্বাকৃতি ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু তাঁহারা বিশেষ কর্ত্তব্য-পরায়ণ ছিলেন। কামরূপে তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অধিবাসিগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না। শত-সংখ্যক হিন্দু-দেব-দেবীর মন্দিরে মেষ-মহিষাদি বলিদানে দেবার্চ্চনা হইত। তখন এই রাজ্যে একটীও বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম বা মঠ ছিল না। কুমার-উপাধিধারী রাজা ভাস্করবর্ম্মা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ভাস্করবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং কনোজ রাজ হর্ষবর্দ্ধনের সহিত পরিচিত হন। হুয়েন-সাং বলিয়াছেন,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৯০০ লি বা ১৫০ মাইল পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া, একটী বৃহৎ নদী অতিক্রমণের পর, তিনি কামরূপ-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। হুয়েন-সাং কামরূপ-রাজ্যকে 'কিয়া-মো-লিউ-পো, (Kia-mo-leu-po) নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, ঐ রাজ্যের পরিধি দশ সহস্র লি বা ১৬৬৭ মাইল। তাহা হইলে, ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য-নদের উপত্যকা ভূমি বা বর্ত্তমান আসাম বিভাগ, কুশ-বিহার (কুচবিহার) ও ভুটান কামরূপ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পুরাকালে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল—(১) পূর্ব্বভাগ বা সাদীয় প্রদেশ, (২) মধ্যভাগ বা আসাম প্রদেশ, (৩) পশ্চিম বিভাগ বা কামরূপ প্রদেশ। কথিত হয়, কামরূপের প্রাধান্য-হেতু তিনটী স্বতন্ত্র জনপদ কামরূপ-রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। কামরূপের পশ্চিম বিভাগের নাম কুশবিহার বা কুচবিহার। কামরূপ-রাজ্যে ইহার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী জনপদ আর দ্বিতীয় ছিল না। কামরূপের রাজগণ অনেক সময় এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন। তখন কামাতিপুর তাহাদের রাজধানী হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ-তীরস্থিত গোহাটী কামরূপের প্রাচীন রাজধানী বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনা অনুসারে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গোহাটী কামরূপের রাজধানী ছিল বলিয়া বুঝা যায়। কামরূপের বিস্তৃতি-পরিমাণ এখন আর সেরূপ নাই। অধুনা কামরূপ আসাম-প্রদেশের ক্ষুদ্র একটী জেলারূপে পরিগণিত। উত্তরে ভুটান, দক্ষিণে খাসিয়া-গিরিশ্রেণী, পশ্চিমে গোয়ালপাড়া জেলা এবং পূর্ব্বে দরঙ্গ ও নওগাঁ,—কামরূপ এক্ষণে এতৎসীমানায় নিবদ্ধ। ইহার পরিমাণ-ফল ৩৮৫৭৷৷০ বর্গ মাইল মাত্র।

পুরাবৃত্ত অনুসন্ধানে কামরূপ-রাজ্যে বহু তীর্থের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্ত্র-শাস্ত্রে লিখিত আছে,—বিস্তৃত কামরূপ-রাজ্য সিদ্ধপীঠ, মহাপীঠ, ব্রহ্মপীঠ, বিষ্ণুপীঠ, রুদ্রপীঠ প্রভৃতি নবযোনিপীঠে বিভক্ত। এই সকল পীঠ ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রে আরও কতকগুলি পীঠের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সৌমার-পীঠ, শ্রীপীঠ, রত্নপীঠ ও কামপীঠ প্রভৃতি প্রধান। তন্ত্রশাস্ত্রে শেষোক্ত এই পীঠ-চতুষ্টয়ের সীমা-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাচীনকালে কামরূপ-রাজ্যের সমগ্র উত্তরাংশ 'সৌমার' নামে অভিহিত হইত। সৌমারের অংশ-বিশেষে সৌমার-পীঠ অবস্থিত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। কামরূপের সৌমার বিভাগের সীমা-পরিমাণ এইরূপ,—ইহার উত্তরে বিহগাচল, দক্ষিণে মন্দশৈল, পূর্ব্বে স্বর্ণনদী বা আধুনিক সুবর্ণ-শ্রী এবং পশ্চিমে করতোয়া। সৌমার পীঠের সীমানা সম্বন্ধে আসামের পুরাবৃত্তে দৃষ্ট হয়, ভৈরবী নদী এবং দিকরাই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান সৌমার-পীঠ নামে অভিহিত। তন্ত্রশাস্ত্র মতে,—ইহার উত্তরে মানস-সরোবর, পূর্ব্বে সৌরশীলারণ্য, দক্ষিণে ব্রহ্মযূপ এবং পশ্চিমে স্বর্ণনদী। সৌরশীলারণ্য এবং ব্রহ্মযূপের আধুনিক পরিচয় প্রদান করা দুরূহ। রত্নপীঠ সম্বন্ধে পণ্ডিত-গণ বলেন,—উহার বর্ত্তমান নাম কুচবিহার। স্বর্ণকোষী নদী হইতে রূপিকা নদী পর্য্যন্ত এই পীঠ বিস্তৃত।* স্বর্ণ-পীঠ—ভৈরবী (বর্ত্তমান ভরালী) ও রূপহী নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। এই সকল পীঠের মধ্যে কামাখ্যা-পীঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রাচীন কামরূপ-তীর্থে কামাখ্যার ন্যায় প্রাচীন পীঠ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তন্ত্রশাস্ত্র-মতে বিষ্ণু চক্র দ্বারা মহামায়ার যোনিদেশ কর্ত্তন করিয়া এই স্থানে পাতিত করেন। কামাখ্যা পীঠের অনতিদূরে উগ্রপীঠ ও ব্রহ্মপীঠ বিদ্যমান। কথিত হয়, কামরূপে সর্ব্বপ্রথমে নরকাসুর কর্তৃক কামাখ্যা-দেবীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী আছে। একদা নরকাসুর মদগর্ব্বে গরীয়ান্ হইয়া কামাখ্যা দেবীকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করে। তখন কামাখ্যা দেবীর মন্দিরাদি কিছুই ছিল না। মহামায়া অসুরের প্রস্তাবে বলিয়াছিলেন,—'যদি তুমি এক রাত্রির মধ্যে আমার মন্দির, রাস্তা, পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে পতিত্বে বরণ করিব।' মহামায়ার নির্ব্বন্ধাতিশয্য দর্শনে নরকাসুর তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া মহামায়ার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রাত্রিশেষের পূর্ব্বেই প্রায় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন মহামায়া নিরুপায় হইয়া মায়ারূপী কুক্কুট সৃষ্টি করিলেন। কুক্কুটগণ নিশাবসান জ্ঞাপন করিয়া ধ্বনি করিতে লাগিল। নরকাসুর দেখিলেন, রাত্রি অবসান হইয়াছে। তখন মহামায়া নরককে তাঁহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—'তুমি আমার আদেশপালনে অপারক হইয়াছ বলিয়া, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহি।' নরকাসুর তখন ক্রোধান্ধ হইয়া কুক্কুটকে বধ করেন। সে স্থান 'কুকুরা-কটাচকি' নামে অভিহিত হয়। অধুনা কমাখ্যা দেবীর যে মন্দির বিদ্যমান, কথিত হয়, উহাই নরকাসুর-নির্ম্মিত

কামরূপের তীর্থ-পরিচয়।

* স্বর্ণকোষী ও রূপিকা নদীর আধুনিক নাম—যথাক্রমে সোণকোষী ও রূপহী। এই নদীদ্বয় ভুটানের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। সোণকোষী জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবাহিত।

সেই আদি মন্দির। পূর্ব্বোক্ত পীঠ সমূহ ব্যতীত কামরূপে মণিপীঠ, অগস্ত্যপীঠ, পিতৃপীঠ, কপিলা-তীর্থ, ধনুতীর্থ, চক্রতীর্থ, বাসবতীর্থ, রুক্মিণীকুণ্ড প্রভৃতি আরও কত তীর্থ বিদ্যমান, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অধুনা ঐ সকল তীর্থের অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে।

উৎকলের বা ওড্ররাজ্যের পুরাতত্ত্ব।

উৎকল বা ওড্রদেশের প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়,—মনু-পুত্র সুদ্যুম্নাত্মজ উৎকল আপনার নামানুসারে উৎকল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। * ইক্ষ্বাকু ও সুদ্যুম্ন সমসাময়িক। সুতরাং কত কাল হইতে উৎকল দেশ বিদ্যমান, সহজেই প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রবংশে যযাতিপুত্র অণুর অধস্তন দ্বাদশ পর্য্যায়ে (শ্রীমদ্ভাগবতের মতে) ওড্র-নামে বলির এক পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। মতান্তরে প্রতীত হয়,—সেই ওড্র পরবর্ত্তিকালে উৎকলদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারে ওড্রদেশের নামকরণ হইয়াছিল। বৌধায়ন-সূত্রে ওড্রদেশ কলিঙ্গ-দেশ বলিয়া অভিহিত। হয় তো এক সময়ে ওড্র বা উৎকল কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মহাভারতে দৃষ্ট হয়, কুরুপাণ্ডবের সমসময়ে, ওড্রদেশান্তর্গত বৈতরণী নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাভারত, বনপর্ব্ব, চতুর্দ্দশাধিক শততমাধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী। যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞীয়ং গিরিশোভিতম্। উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্॥"

অর্থাৎ,—হে কৌন্তেয়! এতৎপ্রসঙ্গোক্ত সমগ্র দেশ কলিঙ্গ নামে অভিহিত। এই স্থানে মোক্ষদায়িকা বৈতরণী নদী প্রবাহিতা। দেবগণের সহায়তায় ভগবান ধর্ম্ম এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই বৈতরণী নদীর উত্তর-তীরে দ্বিজাতিগণ বাস করেন। ঐ স্থানে ঋষিগণের যজ্ঞীয় উপকরণ-সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।' বৌধায়ন-সূত্র-মতে, ওড্র রাজ্য দর্শন করিলে পুনষ্টোম যজ্ঞ করিতে হয়। মনুসংহিতায় ওড্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ সংস্কারাভাবে পতিত বলিয়া উল্লেখ আছে। † রামায়ণে ও মহাভারতে ওড্রদেশ বহু প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ‡ পুরাণাদি গ্রন্থে জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতবর্ষ বর্ণন প্রসঙ্গে আমরা কলিঙ্গ ও ওড্র দেশের নাম পুনঃপুনঃ দেখিতে পাই। সে সকল স্থলে ওড্র ও কলিঙ্গ পরস্পর স্বতন্ত্র-রাজ্য বলিয়া প্রতীত হয়। স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ড মতে উৎকল-দেশ একটী পবিত্র তীর্থস্থান। § রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনে মহাকবি লিখিয়াছেন,—

"স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধ দ্বিরদসেতুভিঃ। উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ॥" **

---

* এতৎসম্বন্ধে হরিবংশে লিখিত আছে,—
"সুদ্যুম্নস্য তু দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরম ধার্ম্মিকা। উৎকলঃ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বশ্চ ভারত॥
উৎকলোস্যোৎকলা রাজন্ বিনতাশ্বস্য পশ্চিমা। দিক্ পূর্ব্বা ভরত শ্রেষ্ঠ গয়স্য তু গয়াপুরী॥"

† মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৪৪শ শ্লোক।

‡ রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪১শ অধ্যায় এবং মহাভারত, দ্রোণপর্ব্ব, ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

§ স্কন্দপুরাণ, উৎকলখণ্ড, ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—
"সাগরস্যোত্তর তীরে মহানদ্যাস্তু দক্ষিণে। স প্রদেশ পৃথিব্যাং হি সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ॥

** মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৩৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ,—সূর্য্যবংশাবতংস রঘু হস্তি-দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া কপিশা নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপরে উৎকল-রাজগণের সাহায্যে পথাদির অবস্থা অবগত হইয়া কলিঙ্গাভিমুখে গমন করিলেন। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, রাজা বিক্রমাদিত্যের ও কালিদাসের সমসময়ে উৎকল ও কলিঙ্গ রাজ্য পরস্পর স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। প্রাচীন শিলালিপি হইতে আবার জানা যায়, পুরাকালে ওড্রদেশে কলিঙ্গের রাজধানী ছিল। অধুনা অনেকে ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী স্থান-বিশেষে কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানীর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন। মহাভারত, শান্তি-পর্ব্বে, দেখিতে পাই,—তীর্থ-দর্শনে গমন করিয়া পাণ্ডবগণ সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বৈতরণী-তটে সর্ব্বপ্রথমে উপনীত হইয়াছিলেন। তৎকালে কলিঙ্গ-রাজ্য চিত্রাঙ্গদের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। এই সকল আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, ওড্র বা উৎকল রাজ্য বহু দিন হইতেই বিদ্যমান আছে এবং নানা নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। উৎকল-রাজ্যে বহু তীর্থ বিরাজমান। তন্মধ্যে পুরুষোত্তম, ভুবনেশ্বর বৈতরণী, মহাবেদী, মহানদ, ঋষিকুল্যা, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, কপিল, সোম-তীর্থ, নীলাচল, কপাল-মোচন প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী তীর্থের নাম দৃষ্ট হয়। তবে সেগুলিকে আধুনিক বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন।

রাজা উৎকলের পর উৎকল-রাজ্যের কোনও ইতিবৃত্ত জানা যায় না। বহুকাল রাজ্য-ভোগের পর রাজা উৎকল ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কোনও পুত্র-সন্তানাদি ছিল না। সুতরাং তৎপরবর্ত্তী ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিছুকাল পরে চন্দ্রবংশজ ওড্র উৎকল-দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ওড্রের বংশ কত দিন প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন, তাহার কোনও নিদর্শন নাই। বৌদ্ধ-প্রাধান্যের সমসময়ে উৎকল-রাজ্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ ধর্ম্ম-প্রচার ব্যপদেশে উৎকলে আগমন করিয়া পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিতেন, পুরাবৃত্তে এইরূপ উল্লেখ আছে। সে সকল গুহা দেখিলে অনুমান হয়, অশোকের বহু পূর্ব্বে পর্ব্বতগাত্রে গুহা-সমূহ খোদিত হইয়াছিল। উৎকল-দেশের খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি গাত্রে এইরূপ অসংখ্য গুহা মধুচক্রের ন্যায় বিরাজমান। প্রাচীন গুহাগুলি অপরিসর, আয়তনে ক্ষুদ্রাকার। পরবর্ত্তিকালে বৃহৎ বৃহৎ গুহাও পর্ব্বতগাত্রে খোদিত হইয়াছিল। অশোক যখন কলিঙ্গ জয় করেন, সেই সময় হইতেই বৃহৎ গুহা নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় বলিয়া প্রকাশ। গ্রীকদিগের গ্রন্থে উড়িষ্যা দেশে যবনগণের * গতিবিধির বিষয় জানিতে পারা যায়। উৎ-কলের পুরাবৃত্তে, ১৫০ শকে যবনগণ কর্ত্তৃক পুরী আক্রমণের বিষয় লিখিত আছে। তখন সেবকদেব নামক জনৈক রাজা উৎকলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর, ২৪৫ শকে শোভনদেবের রাজত্বকালে পুনরায় উৎকলে যবনদিগের অত্যাচার আরম্ভ হয়। সেই সময় যবন (Ionians) গণ উৎকল দেশ অধিকার করে। তখন হইতে চারিদিকে

উৎকলের পরবর্ত্তী ইতিহাস।

* 'যবন' শব্দে তৎকালে প্রধানতঃ গ্রীকগণকেই বুঝাইত। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে ব্যাকট্রিয় দেশের গ্রীকগণ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। অন্যত্র আবার দেখিতে পাই,—আর্য্য-হিন্দুগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সময়

যবন ও বৌদ্ধগণের অত্যাচারে উৎকল-রাজগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যে হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। উৎকলের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে, যযাতিকেশরী-নামা জনৈক মগধ-রাজ হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কামনায় উৎকল-দেশে আসিয়া উপনীত হন। তৎকর্ত্তৃক উড়িষ্যায় পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়; অসংখ্য দেবমন্দির—বৌদ্ধ-মঠ ও সঙ্ঘারাম-সমূহের স্থান অধিকার করে। এইরূপে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ-ভাগে, কেশরী-বংশের প্রতিষ্ঠায়, যবনগণের উচ্ছেদ-সাধন হইয়াছিল। তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে উৎকল-দেশে শান্তি স্থাপিত হয়। যযাতি-কেশরীর পূর্ব্বে উৎকল-দেশ যে সকল হিন্দু রাজার শাসনাধীন ছিল, 'মাদলাপঞ্জী' নামক উৎকল-রাজগণের কুলজী গ্রন্থে তাঁহাদের একটী তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই তালিকায় উৎকল দেশ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, প্রকাশ আছে। পরীক্ষিৎ এবং জনমেজয় উড়িষ্যায় শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, মাদলাপঞ্জী' গ্রন্থে তাহাও প্রতীত হয়। মাদলাপঞ্জী' অনুসারে জনমেজয়ের পর যথাক্রমে (১) শঙ্কর-দেব, (২) গোতম-দেব, (৩) মহেন্দ্র-দেব, (৪) ইষ্টদেব, (৫) সেবক-দেব, (৬) বজ্রনাভ-দেব, (৭) নৃসিংহ-দেব, (৮) মনোপৃষ্ঠ-দেব, (৯) ভোজরাজ, (১০) বিক্রমাদিত্য, (১১) শকাদিত্য, (১২) কর্ম্মজিৎ-দেব, (১৩) হাটকেশ্বর, (১৪) বীরভুবন-দেব, (১৫) নির্ম্মল-দেব, (১৬) ভীমদেব, (১৭) শোভনদেব, (১৮) চন্দ্রদেব রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে এক শত ছাপ্পান্ন বৎসর কাল উৎকল-প্রদেশ যবনরাজগণের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ছিল। মহারাজ যযাতি-কেশরী যবনগণের হস্ত হইতে উৎকল-রাজ্য উদ্ধার করিয়া উৎকলে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। 'মাদলাপঞ্জীতে' যুধিষ্ঠির হইতে উড়িষ্যার পরবর্ত্তী রাজগণের শাসন-কালের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়,—১০৮ হইতে ১২০ কল্যব্দে উৎকল যুধিষ্ঠিরের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল, এবং ৩৩৩৯ হইতে ৩৪৭৪ কল্যব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমাদিত্য ও শকাদিত্য উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরিশেষে, ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে যযাতি-কেশরী উৎকলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ প্রায় সাত শত বৎসর

সময় যব ' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা ছিল না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা যবন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে নানা মতান্তর দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তাই লিখিয়াছেন,—"It would seem that the last of the Budhist Kings were called Yavanas; but it is not known if they were so called because descended from the Bactrian Greeks, or simply because they were Budhists."—*Vide*, R. C. Dutt, *Civilisation in Ancient India*, Vol II. এতৎসম্বন্ধে এল্‌ফিনষ্টোন বলিয়াছেন,—"The natives suppose these Yavanas to be Musalmans; and, with similar absurdity, describe two invasions of troops of that persuasion, under Imarat Khan, as taking place about five centuries before Christ. Some will prefer applying the story to Seleucus, or the Bactrian Greeks; but it is evident that the whole is a jumble of such history and mythology as the another was acquainted with, put together without the slightest knowledge of geography or chronology."—Elphinstone, *History of India*. এই সময় তেলিঙ্গনায় একটী যবন-বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে তুঙ্গভদ্রাতীরে, অনঙ্গন্দী নামক স্থানে, একটী যবন-বংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে আরবগণের আক্রমণ আরম্ভ হয়;—বোধ হয়, তাঁহাদের কেহ ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেশরী-বংশের প্রতিষ্ঠা হইতে উড়িষ্যার ধারাবাহিক ইতিহাস আরম্ভ। ডাক্তার হাণ্টার কেশরী-বংশের নিম্নলিখিত তালিকা প্রদান করিয়াছেন ;—

নাম।		রাজ্যপ্রাপ্তিকাল।	নাম।	রাজ্যপ্রাপ্তিকাল।
যযাতিকেশরী	...	৪৭৪ খৃষ্টাব্দ।	মধুসূদনকেশরী	৯০৪ খৃষ্টাব্দ।
সূর্য্যকেশরী	...	৫২৬	ধর্ম্মকেশরী	৯২০ „
অনন্তকেশরী	...	৫৮৩	জনকেশরী	৯৩০ „
অলাবুকেশরী	...	৬২৩	নৃপকেশরী	৯৪১ „
কনককেশরী	...	৬৭৭	মকরকেশরী	৯৫৩ „
বীরকেশরী	...	৬৯৩	ত্রিপুরকেশরী	৯৬১ „
পদ্মকেশরী	...	৭০১	মাধবকেশরী	৯৭১ „
বৃদ্ধকেশরী	...	৭০৬	গোবিন্দকেশরী	৯৮৯ „
বটকেশরী	...	৭১৫	নৃত্যকেশরী	৯৯৯ „
গজকেশরী	...	৭২৬	নরসিংহকেশরী	১০১৩ „
বসন্তকেশরী	...	৭৩৮	কূর্ম্মকেশরী	১০২৪ „
গন্ধর্ব্বকেশরী	...	৭৪০	মৎস্যকেশরী	১০৩৪ „
জনমেজয়কেশরী	...	৭৫৪	বরাহকেশরী	১০৫০ „
ভরতকেশরী	...	৭৬৩	বামনকেশরী	১০৬৫ „
কলিকেশরী	...	৭৭৮	পরশুকেশরী	১০৭৮ „
কমলকেশরী	...	৭৯২	চন্দ্রকেশরী	১০৮০ „
কুণ্ডলকেশরী	...	৮১১	সুজনকেশরী	১০৯২ „
চন্দ্রকেশরী	...	৮২৯	শালিনীকেশরী	১০৯৯ „
বীরচন্দ্রকেশরী	...	৮৪৬	পুরঞ্জনকেশরী	১১০৪ „
অমৃতকেশরী	...	৮৬৫	বিষ্ণুকেশরী	১১০৭ „
বিজয়কেশরী	...	৮৭৫	ইন্দ্রকেশরী	১১১৯ „
চন্দ্রপালকেশরী	...	৮৯০	সুবর্ণকেশরী	১১২৩—১১৩২

উৎকলের অন্তর্গত ভুবনেশ্বরে এই কেশরী-বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। কেশরী-বংশের প্রতিষ্ঠা-সময়ে উৎকলে বহুসংখ্যক দেব-মন্দির, অট্টালিকা ও সুরম্য রাজ-প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। আজিও তাহাদের ধ্বংসাবশেষ নয়ন মুগ্ধ করে। ভুবনেশ্বর এই সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-নগরী বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। যযাতি-কেশরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরের শিব-মন্দির আজিও কেশরী-বংশের অতীত-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, উড়িষ্যায় এক সময়ে শিবের আরাধনা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরেও কেশরী-বংশের আর একটী রাজধানী ছিল। নৃপ-কেশরী কর্ত্তৃক কটক নগর স্থাপিত হইয়াছিল। কেশরী-বংশের শেষ রাজা নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, উৎকল-দেশ কিছুদিন অরাজক হইয়া উঠে। পরে 'গঙ্গাবংশীয়

রাজগণের প্রাদুর্ভাবে উৎকলে শান্তি স্থাপিত হয়। এই বংশের আদি রাজা চোরগঙ্গা উড়িষ্যায় রাজ্য স্থাপন করেন। জনপ্রবাদ—চোরগঙ্গা বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন তাম্রলিপ্তী বা আধুনিক তমলুক গঙ্গাবংশীয়দিগের আদি বাসস্থান। গঙ্গা-বংশের প্রতিষ্ঠায় ধর্ম্মাধিকরণে এক নূতন পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। কেশরী-বংশের রাজত্ব-কালে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদে, উৎকলে শৈব-ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল। কেশরী-বংশীয়েরা শিবোপাসক ছিলেন; তাঁহাদের রাজত্বকালে শিব-পূজার প্রাধান্যই পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু গঙ্গাবংশের অভ্যুদয়ে, শৈব-ধর্ম্মের উচ্ছেদে, উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে; বিষ্ণুর উপাসনা—শিবোপাসনার স্থান অধিকার করে। গঙ্গাবংশীয়দিগের প্রভাবে উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও বৌদ্ধ ও শৈবধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও বৌদ্ধ ও ও শৈব সম্প্রদায় উড়িষ্যায় বিদ্যমান ছিল। গঙ্গাবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে উড়িষ্যার বহু শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। ডাক্তার হাণ্টার গঙ্গাবংশীয় রাজগণের নিম্নলিখিত তালিকা প্রদান করিয়াছেন,—

নাম।		রাজ্যপ্রাপ্তিকাল।	নাম।		রাজ্যপ্রাপ্তিকাল।
চোরগঙ্গা	...	১১৩২ খৃষ্টাব্দ।	শঙ্খবাসুদেব	...	১৩৩৭ খৃষ্টাব্দ
গঙ্গেশ্বর	...	১১৫২ „	বলি „	...	১৩৬১ „
একজটা-কামদেব	..	১১৬৬ „	বীর „	...	১৩৮২ „
মদনমহাদেব	..	১১৭১ „	কলি „	...	১৪০১ „
অনঙ্গভীমদেব	..	১১৭৫ „	লেঙটআঁটা	...	১৪১৪ „
রাজরাজেশ্বরদেব	..	১২০২ „	নেত্র „	...	১৪২৯ „
লাঙ্গুহয় নরশ্ব *	..	১২৩৭ „	কপিলেন্দ্রদেব	...	১৪৫২ „
কেশরী „	..	১২৮২ „	পুরুষোত্তমদেব	...	১৪৭৯ „
প্রতাপ „	...	১৩০৭ „	প্রতাপরুদ্রদেব	...	১৫০৪ „
গতিকান্ত „	...	১৩২৭ „	কলিঙ্গদেব *	...	১৫৩৩ „
কপিল „	...	১৩২৯ „	কহ্লারুগদেব *		১৫৩৩-১৫৩৪ „
শঙ্খভাসুর „	...	১৩৩০ „			

গঙ্গাবংশের প্রাচীন নৃপতিগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। চোরগঙ্গার পুত্র গঙ্গেশ্বরের রাজত্বকালে গঙ্গানদী হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত উৎকল রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই বংশের অনঙ্গভীমদেবের রাজত্বকালে জগন্নাথ-দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। প্রবাদ,—রাজ্যের উন্নতির নিমিত্ত অনঙ্গভীমদেব বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আপনার রাজ্যে তিনি ষষ্টি-সংখ্যক দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। তৎকর্ত্তৃক চল্লিশটী কূপ এবং দশ লক্ষ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত হয়। গঙ্গাবংশের কপিল-নামা নৃপতি

* হাণ্টার লিখিত রাজগণের নামের ও মাদলাপঞ্জী-গ্রন্থে-লিখিত রাজগণের নামের মধ্যে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তাহাতে * চিহ্নিত নামগুলি যথাক্রমে নাঙ্গুরীয় নৃসিংহদেব, কামুয়াদেব, কথারুয়াদেব প্রভৃতি রূপে লিখিত আছে।

সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্চী-রাজা পুরুষোত্তমদেব অধিকার করেন। রুদ্রদেবের রাজত্বকালে নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদেব উৎকল-রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। কহ্লারুগদেব হইতে গঙ্গা-বংশের অবসান হয়। গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক জনৈক ব্যক্তি কহ্লারুগদেবকে নিহত করিয়া উৎকল অধিকার করেন। তিনি কোন্ বংশজ এবং তাঁহার আদি-বাসস্থান কোথায় ছিল, তাহার কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহারই রাজত্বকালে মুসলমানগণ উৎকল-রাজ্য প্রথম আক্রমণ করেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্ব-কাল। গোবিন্দ-বিদ্যাধরের পর চারি জন নৃপতি ক্রমান্বয়ে উৎকল-রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চক্রপ্রতাপ ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, নৃসিংহজন ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, রঘুরাম ছোত্র (ছোট্রা) ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং মুকুন্দদেব ১৫৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উৎকলরাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই মুকুন্দদেবের রাজত্ব-কালে হিন্দুদ্বেষী কালাপাহাড় উৎকল-রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। যাজপুরের যুদ্ধে মুকুন্দদেব পরাজিত ও নিহত হইলে, কালাপাহাড় জগন্নাথদেবের মন্দির লুণ্ঠন করেন। দেবমূর্ত্তি চূর্ণীকৃত হয়; কালাপাহাড়ের অধিনায়কত্বে মুসলমানগণ উৎকল-রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। 'মাদলাপঞ্জী' মতে এই মুকুন্দদেব প্রথম মুকুন্দদেব নামে অভিহিত। এই মুকুন্দদেবের পর, গৌড়ীয় গোবিন্দ দুই বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে উনিশ বৎসর-কাল উড়িষ্যা অরাজক ছিল। তাহার পর যথাক্রমে রামচন্দ্রদেব, নৃসিংহদেব, গঙ্গাধরদেব, বলভদ্রদেব, মুকুন্দদেব (২য়), দ্রব্যসিংহদেব, কৃষ্ণদেব, গোপীনাথদেব, রামচন্দ্রদেব, (২য়), বীরকিশোরদে, দ্রব্যসিংহদেব (২য়), মুকুন্দদেব (৩য়) এবং রামচন্দ্রদেব (৩য়) উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ নৃপতিগণকে কখনও মুসলমানদিগের এবং কখনও মহারাষ্ট্রীয়গণের অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কালাপাহাড়ের পূর্ব্বে, ১৫১০ খৃষ্টাব্দে, মুসলমানগণের মধ্যে ইস্মাইল গাজী সর্ব্বপ্রথম উৎকল-দেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু সে সময়ে মুসলমানগণ উৎকলে আধিপত্য-স্থাপনে সমর্থ হন নাই। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন লিখিয়াছেন,—খৃষ্ট-জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ইমারত খাঁ নামক জনৈক মুসলমান উৎকল-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই, মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে উড়িষ্যায় রাজপুত-জাতির আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে, আকবরের রাজত্বকালে, হাসিম খাঁ নামক জনৈক শাসনকর্ত্তা উড়িষ্যায় স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজ্য সাহাজান কর্ত্তৃক পুনরায় দিল্লীর অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়। নবাব আলিবর্দ্দীর শাসনকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা হইতে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বিতাড়িত হন। উক্ত খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর ইংরেজগণ উৎকলরাজ্য অধিকার করেন। তখন উৎকল-রাজ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপীড়নে দেশ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। কত শত গ্রাম জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। কিন্তু ইংরেজের সুশাসন-গুণে দেশ পুনরায় জনপূর্ণ হয়; উৎকলরাজ্য পুনরায় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।

পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের ভাষায় ওড্রদেশ 'উ-চ' (U-cha) বা ওড (Oda) রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। তিনি যখন ওড্রদেশ দর্শন করেন, তখন উহার পরিমাণ-ফল ১৪০০ ছিল। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—ওড্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে মহাসমুদ্র; সমুদ্র-তীরে 'চে-লি-টা-লো-চিং (Che-li-ta-lo-ching) বা চরিত্রপুর নামক বন্দর। কানিংহামের মতে, চরিত্রপুর অধুনা পুরী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

হুয়েন-সাং-দৃষ্ট ওড্রদেশ।

হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—'ওড্রদেশের উর্ব্বর ভূমিতে সর্ব্বপ্রকার খাদ্য-শস্য প্রচুর-পরিমাণে জন্মিত। দেশের অধিবাসিগণ অসভ্য হইলেও বিদ্যানুরাগী ছিল। ভারতের অন্যত্র *বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব পরিম্লান হইতেছিল বটে; কিন্তু ওড্রদেশে তখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এক শত সঙ্ঘারামে দশ সহস্র বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করিতেন।* দেব-মন্দিরের সংখ্যা পঞ্চাশটীর অধিক ছিল না। তখনও পুরীতে জগন্নাথ-দেবের মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। তথাপি পুরী হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ওড্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে তখন পুষ্পগিরি-নামক বৌদ্ধদিগের একটী সঙ্ঘারাম ছিল। ঐ সঙ্ঘারামাভ্যন্তরস্থিত স্তূপ হইতে সময় সময় দিব্য-জ্যোতিঃ বিকাশ পাইত।' উড়িষ্যার রাজনৈতিক সীমানা সম্বন্ধে গ্রন্থাদির আলোচনায় প্রতীত হয়,—উত্তরে হুগলী ও দামোদর নদী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত ওড্রদেশ বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন ওড্রদেশ বলিতে সুবর্ণরেখা ও মহানদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকেই বুঝাইত। বর্ত্তমান কটক জেলা, সম্বলপুর এবং মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিমে গণ্ডোয়ানা, উত্তরে যশপুর ও সিংহভূমের পার্ব্বত্য-প্রদেশ, পূর্ব্বে মহাসমুদ্র এবং দক্ষিণে গঞ্জাম,—প্রাচীন ওড্রদেশ এতৎসীমানায় নিবদ্ধ ছিল। মহানদী-তীরবর্ত্তী কটক প্রাচীন ওড্রদেশের রাজধানী। কিন্তু ষষ্ঠ-শতাব্দীর প্রারম্ভে কেশরী-বংশের আদি রাজা যযাতিকেশরী, বৈতরণী নদী তীরে, যযাতিপুর নামক স্থানে, অপনার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। যযাতিপুর অধুনা যাজপুর নামে অভিহিত।

বঙ্গদেশের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে অনেক সময়ে অনেকে সংশয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে কারণেই হউক, জনসাধারণের ধারণা—ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে যখন আর্য্য-সভ্যতা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, বঙ্গদেশ তখন সৃষ্ট হয় নাই; অথবা, বঙ্গদেশ তখন জল-জঙ্গলময় ছিল। অধিক কি, একশ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এমনও বলিয়া থাকেন, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও বঙ্গ-দেশ নামে কোনও দেশ ছিল না; কারণ, হুয়েন-সাং তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বঙ্গদেশের নাম উল্লেখ করেন নাই। আমরা অবশ্য এ সকল কথা স্বীকার করি না। পৃথিবীর অন্যত্র আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃত হইবার সময়ে বঙ্গদেশ যে অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, অথবা বঙ্গদেশের বা বঙ্গ-নামের যে উৎপত্তি হয় নাই, সে কথাও আমরা মানিয়া লইতে পারি না। রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণ-পরম্পরায়, বঙ্গদেশের উল্লেখ নানা স্থানে নানা ভাবে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের আরণ্যক অংশেও বঙ্গ-নামের উল্লেখ আছে। ঐতরেয়-আরণ্যকে দেখিতে পাই,—"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা-

বঙ্গদেশ। (প্রাচীনত্ব)

বগধাশ্চেরপাদাস্তস্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র” ইতি। অর্থাৎ,—বঙ্গ, মগধ (বগধ) এবং চেরপাদ নামক জনপদের অধিবাসিগণ দুর্ব্বল, দুরাহার ইত্যাদি। বৌধায়ন-সূত্রে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—পুণ্ড্র, সৌবীর, কলিঙ্গ ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে পুনষ্টোম যজ্ঞ করা প্রয়োজন। মনুসংহিতায়ও বঙ্গ সম্বন্ধে প্রায় উক্তরূপ উক্তিই দৃষ্ট হয়। মনু বলিয়াছেন,—তীর্থ-যাত্রা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে, দ্বিজাতিকে পুনরায় সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। * এতদ্দ্বারা বঙ্গদেশ নিকৃষ্ট দেশ বলিয়া উক্ত হইলেও উহার অস্তিত্ব বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। রামায়ণে দেখিতে পাই, অভিমানিনী কৈকেয়ীকে সান্ত্বনা-দান-ছলে দশরথ বলিতেছেন,—

"দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ। বঙ্গাঙ্গমগধামৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥
তত্র জাতা বহু দ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্। ততো বৃণীষ কৈকেয়ি যদ্‌যত্তং মনসেচ্ছসি॥"

অর্থাৎ,—'সু-সমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ এবং দক্ষিণ-রাজ্য প্রভৃতি সমুদায় রাষ্ট্রই আমার অধীন। ঐ সকল জনপদে ছাগ, মেষ, ধন, ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে; তুমি সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে যে দ্রব্য লইতে অভিলাষ কর, আমি তোমাকে প্রদান করিব।' মহাভারতে এবং পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে বঙ্গদেশের নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতে আছে,—

"অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ। তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনাম কথিতা ভুবি॥"

এস্থলে দীর্ঘতমা ঋষি বলিরাজ-মহিষী সুদেষ্ণাকে কহিতেছেন,—'তোমার আদিত্য-তুল্য তেজস্বী পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিবে। সেই পুত্রগণের নাম—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র হইবে। এই ভূমণ্ডলে তাহাদের নিজ নিজ নামে এক এক দেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।' বিষ্ণু-পুরাণে আছে—"হেমাৎ সুতপাঃ তস্মাদ্বলিঃ যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গ-সুহ্মপুণ্ড্রাখ্যবালেয়ং ক্ষত্র-মজন্যত। তন্নাম সন্ততি সংজ্ঞাশ্চ পঞ্চবিষয়া বভূবঃ॥" পরাশর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন,—'হেমের পুত্র সুতপা, তৎপুত্র বলি। এই বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা নামক ঋষি—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ জন ক্ষত্রিয় উৎপন্ন করেন। এই বলির সন্ততিগণের নামানুসারে পাঁচটী দেশের নামও অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি হইয়াছে। গরুড়-পুরাণেও ঐ একই উক্তি দেখিতে পাই। সেখানে আছে,—'বলিঃ সুতপসো জজ্ঞে অঙ্গবঙ্গ-কলিঙ্গকাঃ।' † বলির অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি পুত্র জন্মিবে। এস্থলে বলির পুত্রগণের নামানুসারে তত্তৎ-নামধেয় জনপদাদির নামকরণ হইয়াছিল কিনা—তাহার উল্লেখ নাই। গরুড়-পুরাণের অন্যত্র আবার ভারতের জনপদাদির প্রসঙ্গে, বঙ্গদেশকে ভারতের পূর্ব্ব-দক্ষিণ-দিক্‌বর্ত্তী বলা হইয়াছে। মৎস্য-পুরাণের দুই স্থলে বঙ্গ রাজ্যের নাম দৃষ্ট হয়। প্রথম,—নদনদীবর্ণন-প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়—ভারতবর্ষের দেশজনপদাদির উল্লেখে। প্রথমোক্ত প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—গঙ্গা-নদী মগধ, পাঞ্চাল, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি জনপদ পবিত্র

* ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১; বৌধায়ন-সূত্র ১।১।২; মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়।

† রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম সর্গ, ৩৭শ ও ৩৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য। মহাভারত, আদি-পর্ব্ব, ১০৪ম অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ১৮শ অধ্যায়; গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ১১৪ম অধ্যায়, ৭১শ শ্লোক।

করিয়া দক্ষিণ-সাগরে পতিত হইয়াছেন। শেষোক্ত প্রসঙ্গে, বঙ্গ—প্রাচ্য-জনপদ মধ্যে পরিগণিত। তন্ত্র-শাস্ত্রেও বঙ্গ-রাজ্যের নাম দৃষ্ট হয়। শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্রের সপ্তম পটলে লিখিত আছে,—

"রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে। বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ।
বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে। গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

এস্থলে শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—'শিবে! সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদ বঙ্গদেশ নামে খ্যাত। ঐ স্থানে গমন করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আবার বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশের (ভুবনেশ্বর?) শেষ সীমা পর্য্যন্ত গৌড় নামে প্রসিদ্ধ জনপদ। এখানকার অধিবাসিগণ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ। বরাহ-মিহির প্রণীত বৃহৎ-সংহিতায় বঙ্গদেশের অবস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। বরাহ-মিহির বলিয়াছেন,—

"উদয়গিরি-ভদ্রগৌড়ক-পৌণ্ড্রোৎকলকাশিমেকলাম্বষ্ঠাঃ।
একপদ-তাম্রলিপ্তিক-কোশলকাবর্দ্ধমানাশ্চ॥
আগ্নেয্যাং দিশি কোশলকলিঙ্গবঙ্গোপবঙ্গ-জঠরাঙ্গাঃ।
শৌলিক বিদর্ভ বৎসান্ধ্র চেদিকাশ্চোর্দ্ধকণ্ঠাশ্চ॥" *

অগ্নিকোণে,—কলিঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, জঠর, অঙ্গ, শৌলিক, বিদর্ভ, বৎস, অন্ধ্র, চেদিক, ঊর্দ্ধকণ্ঠ প্রভৃতি। উপবঙ্গকে অনেকে বাগড়ী নামে অভিহিত করেন। মৎস্যপুরাণের "অঙ্গা বঙ্গা মদ্গুরকা অন্তর্গিরি" প্রভৃতিতে বঙ্গদেশ প্রাচ্যদেশীয় জনপদ বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ আলোচনায় প্রতীত হয়,—বঙ্গদেশের অস্তিত্ব বহু কাল হইতে বিদ্যমান। সুতরাং হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-কালে বঙ্গদেশের অনস্তিত্ব-মূলক উক্তি অসমীচীন। প্রাচীন-কালে বঙ্গদেশের কতকাংশ গৌড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। গৌড়ের প্রতাপশালী রাজার অধীনে সমগ্র বঙ্গদেশও এক সময়ে 'গৌড়' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তখনও বঙ্গ নামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। এইরূপ যখনই কোনও দেশের উপর অন্য দেশের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, সময় সময় শেষোক্ত রাজ্য পূর্ব্বোক্ত রাজ্যের নামানুসারে পরিচিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই সেই দেশের স্বাতন্ত্র্য তখনও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-কালে বঙ্গদেশ কয়েকটী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সেই সেই বিভাগ তখন এতই প্রবল-প্রতাপশালী যে, তিনি তৎসমুদায় রাজ্যকে স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই বিভাগ-সমূহের রাজগণ সে সময়ে কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। বোধ হয়, তখন বঙ্গের নৃপতি হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার অধীনস্থ সামন্ত রাজগণ তাঁহার প্রাধান্য মানিতেন না। আর সেই জন্যই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের প্রাধান্য-বৃদ্ধি-হেতু, বঙ্গ-নামের সাময়িক অস্তিত্বাভাব সম্ভবপর। তাই বলিয়া, তৎকালে বঙ্গ-নামের আদৌ সৃষ্টি হয় নাই, এ কথা আমরা কদাচ স্বীকার করিতে পারি না। অপিচ, পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্র-বচন-সমূহ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়,—বঙ্গদেশ ও বঙ্গ নাম কত কাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কত প্রবল-প্রতাপশালী রাজচক্রবর্ত্তী বঙ্গ-রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছেন। মহাভারত হইতে আমরা কয়েকটী শ্লোক

* বরাহমিহির——বৃহৎসংহিতা, কূর্ম্মবিভাগ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়, ৭ম ও ৮ম শ্লোক।

উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে প্রতীত হইবে,—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সময় হইতেই বঙ্গদেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছে। ভীমসেন রাজসূয়-যজ্ঞোপলক্ষে বহির্গত হইয়া সেই সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। শ্লোক কয়েকটী এই,—

"ততঃ সুহ্মান্ প্রসুহ্মাংশ্চ স্বপক্ষানতিবীর্য্যবান্। বিজিত্য যুধি কৌন্তেয়ো মাগধানভ্যধাবলী॥
দণ্ডক দণ্ডধারঞ্চ বিজিত্য পৃথিবীপতিন্। তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈ গিরিব্রজমুপাদ্রবৎ॥
জরাসন্ধিং সান্ত্বয়িত্বা করে চ বিনিবেশ্য হি। তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈঃ কর্ণমভ্যদ্রবদ্বলী॥
স কম্পয়ন্নিব মহীং বলেন চতুরঙ্গিণা। যুযুধে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ কর্ণেনামিত্রঘাতিনা॥
স কর্ণং যুধি নির্জ্জিত্য বশে কৃত্বা চ ভারত। ততো বিজিগ্যে বলবান্ রাজ্ঞঃ পর্ব্বতবাসিনঃ॥
অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্। পাণ্ডবো বহুবীর্য্যেণ নিজঘান মহামৃধে॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্। কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্র পরাক্রমৌ। নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং। তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ। সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ॥" *

অর্থাৎ,—'আপনাদিগের স্বপক্ষ হইলেও মহাবল ভীমসেন সুহ্ম ও প্রসুহ্মদিগকে জয় করিয়া মাগধদিগের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অপরাপর মহীশ্বরগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গিরিব্রজে উপনীত হইলেন। তখন জরাসন্ধ-নন্দন সহদেব তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন। সহদেবকে যথোচিত সান্ত্বনাযুক্ত ও করায়ত্ত করিয়া, সকলকে সঙ্গে লইয়া, ভীমসেন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব-প্রবর ভীমসেন চতুরঙ্গ বলভরে ধরণীকে কম্পিত করিয়া, শত্রুনাশন কর্ণের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে কর্ণ পরাজিত ও বশীভূত হইলে, ভীমসেন কর্তৃক পর্ব্বতবাসী রাজগণ পরাজিত হইলেন। অনন্তর ভীমসেন মোদাগিরিস্থ অতি বলশালী রাজাকে বাহুবীর্য্য-সহকারে মহাসমরে নিহত করিয়া, পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছ-নিবাসী রাজা মহৌজা, প্রখর-পরাক্রান্ত ও বলসম্পন্ন বীরদ্বয়কে সংগ্রামে বিজিত করিলেন। অতঃপর বঙ্গরাজ্যে ধাবমান হইয়া মহাবল ভীমসেন, মহীপতি সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে, তাম্রলিপ্ত ও কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও পর্ব্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদায় ম্লেচ্ছদিগকেও পরাভূত করিলেন।' ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ-কালে বঙ্গ-রাজ্য—মগধ, অঙ্গ, মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ, বঙ্গ, সুহ্ম, প্রসুহ্ম তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বট প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল এবং ঐ সকল স্থান এক এক স্বাধীন নৃপতির শাসনাধীন ছিল। হুয়েন-সাং যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং সেই সকল রাজ্যের অভ্যুদয়ে বঙ্গ নাম

* মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ১৬শ, ১৭শ ও ২৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্লোকোক্ত জনপদ-সমূহের মধ্যে মগধ ও পৌণ্ড্র-রাজ্যের বিবরণ এই গ্রন্থের ১১শ ও ১৪শ পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। মোদাগিরি-রাজ্যকে পণ্ডিত-গণ মালদহ জেলা বলেন। তাঁহাদের মতে,—কৌশিকীকচ্ছ বর্ত্তমান হুগলী। সুহ্ম সম্বন্ধে একটু মতান্তর দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন সুহ্মের আধুনিক নাম—মেদিনীপুর। কিন্তু মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন,—"সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ।"

পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বঙ্গ নামের পরিবর্ত্তে হুয়েন-সাং সেই স্বাধীন রাজ্য সমূহের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্র বচন-সমূহ হইতে প্রতীত হয়,—বলিক্ষেত্রোৎপন্ন দীর্ঘতমাত্মজ বঙ্গের নামানুসারে বঙ্গ-রাজ্যের নামকরণ হইয়াছিল। সে স্থলে দীর্ঘতমা ঋষি বলিরাজ-মহিষী সুদেষ্ণাকে বলিতেছেন,—'তোমার অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি অমিতপরাক্রম পুত্রগণ জন্মিবে এবং তাহাদের নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইবে।' পুরাণোক্ত বলিরাজ যযাতি-পুত্র অণুর বংশধর,—যযাতির অধস্তন দ্বাদশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। বলির অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র। বঙ্গের কোনও বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় না। হয় তো তাঁহার বংশধরগণ সমধিক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইতে পারেন নাই; তাই, পুরাণ-গ্রন্থে তাঁহাদের উল্লেখ নাই। সংহিতা-গ্রন্থে ও সূত্র-শাস্ত্রে বঙ্গ-রাজ্য নিকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে একটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া সাংসারিক ভোগ-বিলাসে বঞ্চিত হন। কিন্তু তখনও তাঁহার ভোগলালসা পরিতৃপ্ত হয় নাই। দৈববাণী হয়,—'যদি কেহ তাঁহার সহিত যৌবন-বিনিময় করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার জরা মুক্ত হয়।' তদনুসারে তিনি পুত্রগণকে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে জরাগ্রহণের অনুরোধ করেন। একে একে সকলেই জরাগ্রহণে যৌবনদানে অসম্মত হন। কনিষ্ঠ পুরু পিতার জরা গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে আপনার যৌবন দান করিয়াছিলেন। যযাতি অপরাপর পুত্রের (যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অণু) নিকট বিফলমনোরথ হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশপ্ত করেন,— 'তোমাদের বংশধরগণ নিকৃষ্ট স্থান লাভ করিবে।' হয় তো সেই জন্য, অণুর বংশধর বঙ্গ কর্ত্তৃক বঙ্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-হেতু, সূত্রাদি-গ্রন্থে বঙ্গদেশ নিকৃষ্ট-পদবাচ্য হইয়াছে। যাহা হউক, বঙ্গ বহুকাল বঙ্গরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজাবর্গ সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত; দস্যু-চৌর্য্যের বিভীষিকা দেশ হইতে বিদূরিত হইয়াছিল; সর্ব্বত্র সুবর্ষণ-সুকর্ষণে শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরা সর্ব্বদা হাস্যময়ী ছিলেন। বঙ্গের পর, তাঁহার বংশধরগণের কাহারও বঙ্গরাজ্যে রাজত্ব করার পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব বিশেষ ক্ষমতাশালী হন। হরিবংশ প্রভৃতিতে দেখিতে পাই—পুণ্ড্ররাজ বঙ্গদেশের প্রায় সমগ্র ভূ-ভাগ জয় করিয়াছিলেন; ভারতের বহু নৃপতি তাঁহার 'অধীনত'-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পুণ্ড্র-রাজের সম্বন্ধে পুরাণাদিতে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়,—পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবের সহিত নিষাদপতি একলব্য, মগধাধিপতি জরাসন্ধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি নরকাসুর এবং রাজা বাণ সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নরকাসুর নিহত হইলে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠেন। অজ্ঞান-মোহিত জনগণ তাঁহাকে 'তুমিই বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ' বলিয়া তোষামদ করিত। পুণ্ড্ররাজ তাহাতে আপনাকে বাসুদেবাবতার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন;—স্বয়ং বিষ্ণু-চিহ্ন ধারণ করিলেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিয়া পুণ্ড্ররাজ জানাইলেন,—'মূঢ়! তুমি মদীয়

বঙ্গের পুরাবৃত্ত।

চক্রাদি চিহ্ন এবং বাসুদেবাত্মক নাম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া জীবন-রক্ষার্থ আমার নিকট প্রণত হও।' শ্রীকৃষ্ণ দূতকে কহিলেন—পুণ্ড্ররাজকে বলিও, আমি আগামী কল্য তৎসন্নিধানে গমন করিয়া আমার চক্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিব।' পর দিন পুণ্ড্ররাজ-সমীপে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—'পুণ্ড্ররাজ বিষ্ণু-চিহ্ন সমস্তই ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার রথধ্বজ গরুড়াকার, গলদেশে মালা, রথে শার্ঙ্গ-ধনু, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন।' শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে পুণ্ড্ররাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,— 'কৃত্রিমতার আবশ্যক নাই; এই চক্র, গদা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলাম; তুমি গ্রহণ কর।' তখন পুণ্ড্ররাজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাহার ফলে, পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব সবংশে নিধন-প্রাপ্ত হইলেন। পুণ্ড্ররাজের বন্ধু কাশীরাজ মিত্রের বৈরোদ্ধার-মানসে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে কাশীরাজ সবংশে নিহত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের কোপানলে কাশীধাম বিদগ্ধ হয়। * পুণ্ড্ররাজের ধ্বংসের পর, মগধের অংশরূপে আমরা বঙ্গ-রাজ্যের পরিচয় পাই। রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বঙ্গ-রাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকগণ বঙ্গরাজ্য ও ওড্র-দেশকে প্রভূত পরাক্রমশালী দেখিয়াছিলেন। তখন উহা কলিঙ্গ-রাজ্য নামে অভিহিত হইত। খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক কলিঙ্গ-রাজ্য জয় করেন। সেই সময় বঙ্গরাজ্যও তাঁহার অধীন হয়। পরিশেষে গুপ্তবংশের অবসানে, মগধে শুঙ্গ-বংশের প্রতিষ্ঠায়, বঙ্গদেশে শুঙ্গ-বংশীয় রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই বংশের রাজগণ ১৮৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ৭১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। শুঙ্গবংশীয়গণের রাজ্যাবসানে, মগধে যথাক্রমে কণ্ব ও অন্ধ্র রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে মগধে অন্ধ্রবংশ হীনবল হইয়া পড়েন। সেই সময় কনোজে গুপ্তরাজগণ বিশেষ পরাক্রমশালী হন। গুপ্ত-বংশের সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হুন-বংশীয় তোরামানের পুত্র মিহিরকুল গুপ্ত-বংশীয় স্কন্দগুপ্তকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক (নরেন্দ্রগুপ্ত) শিলাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত করিয়া সমগ্র বঙ্গ-রাজ্য অধিকার করেন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে হুয়েন সাং যখন বঙ্গ-রাজ্য দর্শন করেন, তখন উহা পাঁচটী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, কামরূপ, তাম্রলিপ্তী এবং কর্ণসুবর্ণ—বঙ্গরাজ্যের এই পাঁচটী বিভাগ তৎকালে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। ইহার পর, নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত, বঙ্গ-রাজ্যের বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। অধুনা যে সমুদায় তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রতীত হয়, মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে, তিন শত বৎসর কাল, বঙ্গ-রাজ্যে পাল-বংশীয় ও সেন-বংশীয় রাজগণ বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। সেন-বংশীয় রাজগণ পূর্ব্ব-বঙ্গে ও মধ্য-বঙ্গে এবং পাল-বংশীয় রাজগণ পশ্চিম-বঙ্গে ও উত্তর-বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পাল-বংশীয় ও সেন-বংশীয় রাজগণের শাসন-কাল সম্বন্ধে,

* হরিবংশ, উদ্ধৃত ভবিষ্য-পর্ব্ব, ১৯শ, ২৪শ ও ২১শ প্রভৃতি অধ্যায় এবং মৎস্যপুরাণ, ২০ম অধ্যায়।

তৎপ্রণীত "ইণ্ডো এরিয়ান" গ্রন্থে, নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—

পালবংশীয় রাজগণ।		সেনবংশীয় রাজগণ।	
নাম।	রাজ্যপ্রাপ্তিকাল।	নাম।	রাজ্যপ্রাপ্তিকাল।
গোপাল	৮৫৫ খৃষ্টাব্দ।	বীরসেন	৯৮৬ খৃষ্টাব্দ।
ধর্ম্মপাল	৮৭৫ "	সামন্তসেন	১০০৬ "
দেবপাল	৮৯৫ "	হেমন্তসেন	১০২৬ "
বিগ্রহপাল	৯১৫ "	(সমগ্র বঙ্গ-রাজা)	
নারায়ণপাল	৯৩৫ "	বিজয় (ওরফে সুখ) সেন ...	১০৪৬ "
রাজ্যপাল	৯৫১ "	বল্লালসেন	১০৬৬ "
(অজ্ঞাতনামা) ...	৯৭৫ "	লক্ষ্মণসেন	১১০৬ "
বিগ্রহপাল (২য়) ...	৯৯৫ "	মাধবসেন	১১৩৬ "
মহীপাল ...	১০১৫ "	কেশবসেন	১১৩৮ "
ন্যায়পাল ...	১০৪০ "	লাক্ষ্মণেয় (ওরফে অশোক) সেন	১১৪২ "

লক্ষ্মণীয় বা অশোকসেনের রাজত্ব-কালে মুসলমানগণ বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পালবংশীয়-রাজগণের সকলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; তবে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিও তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহারা হিন্দুদিগকে উচ্চ পদ প্রদান করিতেন; হিন্দু-দেবদেবীদের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ-কল্পে তাঁহাদের ভূমিদান প্রভৃতির পরিচয় পালবংশীয় রাজগণের তাম্র-শাসনাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাল-বংশীয় রাজগণ প্রধানতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে রাজত্ব করিতেন। সমগ্র মগধ-রাজ্য তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল। উত্তরে, ত্রিহুত, মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর এবং বগুড়া—প্রাচীন পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের সমগ্র জনপদ, তাঁহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিত। গঙ্গার ব-দ্বীপের অধিকাংশ প্রদেশ পালবংশীয়েরা অধিকার করিতে পারেন নাই। * পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল মগধ জয় করিয়াছিলেন,—নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্র-শাসন হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। কানিংহাম বলেন,—গোপাল ৮১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। † গোপালের বংশধর ধর্ম্মপাল বহুদূর পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের পর দেবপাল সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি বীর-বলিয়া বিখ্যাত। শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে জানা যায়,—তিনি কামরূপ রাজ্য ও উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। হিমালয় পর্ব্বত হইতে বিন্ধ্যাগিরি পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যভূমি তাঁহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। কোনও কোনও শিলালিপিতে দৃষ্ট হয়,—দেবপালের ভ্রাতা জয়পাল ঐ সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন। দেবপালের মৃত্যুর পর জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ভাগলপুরের তাম্রশাসনে প্রকাশ,—বিগ্রহপাল হৈহয়বংশীয় লজ্জা নাম্নী

* "They ruled on the west of Bhagirathi, certainly as far as the boundary of Behar and probably further, taking the whole of the ancient Kingdom of Magadha; on the north it included Tirhut, Malda, Rajshahi, Dinapur (Dinajpur ?), Rangpur and Bogra, which constituted the great ancient Kingdom of Pundra Vardhana. The bulk of the delta seems not to have belonged to them."—Dr. Rajendra Lall Mitra in his *Indo-Aryan*.

† A. Cunningham, *Archæological Survey of India*, Vol. XV, P. 148.

রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিগ্রহপাল অধিক দিন রাজত্ব করেন নাই। সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া, পুত্র নারায়ণপালকে রাজ্যভার প্রদান করেন। এই সময়ে নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল সমগ্র উত্তর-ভারত শাসন করিতেছিলেন। প্রকাশ,— এই সময়েই মহম্মদ গজনী কনোজ আক্রমণ করেন। * রাজ্যপালের বংশধরগণ তাদৃশ ক্ষমতাশালী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। পালবংশীয় রাজা মহীপাল, বিশেষ প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন। কানিংহামের মতে, তাঁহার রাজত্বকাল—১০২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। উৎকলের তাৎকালিক রাজা মহীপালের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মহীপালের বংশধর ন্যায়পালের রাজত্ব-কালে পূর্ব-বঙ্গে সেন-বংশীয় রাজগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী হন। সেনরাজগণ কর্ত্তৃক ন্যায়পাল রাজ্য-ভ্রষ্ট ও বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তখন একমাত্র মগধ পালরাজগণের শাসনাধীন থাকে। ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে পালবংশের অস্তিত্ব লোপ পায়। ন্যায়পালকে বিতাড়িত করিয়া বীরসেন বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—বীরসেন এবং আদিশূর † একই ব্যক্তি। জেনারেল কানিংহামের মতে, বীরসেন—সেনবংশীয় রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ; তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ‡ কথিত হয়, বীরসেন বা আদিশূরই কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থ আনাইয়া বঙ্গদেশে বসবাস করাইয়াছিলেন। § বীরসেনের পুত্র সামন্তসেন ও তৎপুত্র হেমন্ত-সেনের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বিজয়সেনের রাজত্ব-কালে সমগ্র বঙ্গরাজ্য তাঁহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। বিজয়সেনের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র বল্লালসেন

---

* মামুদ গজনীর কনোজ আক্রমণ-কাল—১০১৭ খৃষ্টাব্দ। যদি নারায়ণপালের বা রাজ্যপালের সময়ে মামুদ গজনীর কনোজ-আক্রমণ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নারায়ণপালের ও রাজ্যপালের রাজত্ব-কাল গণনায় নিশ্চয়ই ভ্রম ঘটিয়াছে।

† অনেকে বলেন, আদিশূর কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। শূর বংশের আদি বলিয়া, ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিশূর আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কেহ বলেন,—ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত সোনার-গাঁ বা সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেন। আবার কাহারও মতে, ইঁহার রাজ্য—প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বা মুর্শিদাবাদ জেলার বর্ত্তমান কাণসোণা। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে পশ্চিম-বঙ্গে শশাঙ্ক নামক এক নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। আদিশূর তাঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষে বিদ্যমান বলিয়া প্রকাশ।

‡ কানিংহামের এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ, আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের বংশ একাদশ শতাব্দীতে, বল্লালসেনের রাজত্ব-কালে, এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, বল্লালসেন কর্ত্তৃক তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং মনে হয়, আদিশূরের রাজত্ব-কাল আরও অধিক পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

§ যে উপলক্ষে আদিশূর কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে নানা মতান্তর দৃষ্ট হয়। "ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে" আছে,—আদিশূরের প্রাসাদ-চূড়ায় গৃধ্র বসিয়াছিল। তৎপ্রতিকারার্থ আদিশূর সভাসদ্‌গণের নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কনোজে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—সেই সময় কান্যকুব্জরাজের প্রাসাদে ঐরূপ গৃধ্র বসিয়াছিল। তথাকার বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রবলে গৃধ্র ধরিয়া তাহার মাংসে যজ্ঞ-সম্পাদন করিলে, দোষ নিবারিত হইয়াছিল। আদিশূর সেই ব্রাহ্মণের বাক্যে,—গৃধ্র-উপবেশনের দোষ নিবারণ জন্য, কনোজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়াছিলেন।' দুর্গামঙ্গল মতে—আদিশূরের রাজ্যে অনাবৃষ্টি উপস্থিত

সিংহাসনে আরোহণ করেন। আদিশূর * কর্তৃক আনীত ব্রাহ্মণগণের বংশ বল্লালসেনের রাজত্বকালে বহুল বৃদ্ধি হইয়াছিল। গঙ্গা-নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে, রাঢ় ও বরেন্দ্র-ভূমে, তাঁহারা বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমে বসবাস হেতু ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী ও বরেন্দ্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এই সময়ে রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এতদূর স্বাতন্ত্র্য সাধিত হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধ পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল। বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য-প্রথা স্থাপন করেন। বল্লালসেন মিথিলা জয়

হইলে, তন্নিবারণকল্পে 'বাজপেয়' যজ্ঞ সম্পাদনার্থ মহারাজ, কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। কুলাচার্য্য-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের জন্য আদিশূর কনোজ হইতে ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করেন। ব্রাহ্মণেরা যবনের বেশভূষায় উপস্থিত হওয়ায় আদিশূর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন না। তখন ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ পুষ্প ও দূর্ব্বা আলানে ন্যস্ত করিয়া প্রস্থান করেন। কিছুকাল পরে, ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ-পুষ্পদূর্ব্বা বলে, আলানের শুষ্ক-কাষ্ঠ মুঞ্জরিত মুকুলিত হইয়া হইয়া উঠে। তদ্দর্শনে আদিশূর পুনরায় ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন। পরে ভূম্যাদি দানে বঙ্গদেশে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থান্তরে প্রকাশ—আদিশূর কনোজ-রাজ চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন। চন্দ্রমুখী চান্দ্রায়ণ-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দেশীয় ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞান-বিমূঢ়তা-নিবন্ধন রাজ্ঞীর অভিলাষানুরূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে না পারায়, তাঁহার অনুরোধক্রমে আদিশূর আপনার শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

* আদিশূরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে মতান্তর দৃষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের কেহ কেহ বলেন,— 'বঙ্গাধিপতি আদিশূর সম্বৎ-শকের ২৩৪ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করিয়া কনোজরাজকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এ হিসাবে, আদিশূর রাজা বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান হয়।' 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে,—আদিশূর-বংশীয় এগার জন নৃপতি ৭১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। আদিশূর-বংশের পর, ভূপাল-বংশীয় দশ জন নৃপতি ৬৯৮ বৎসর, পরে সেন-বংশীয় সাত জন নৃপতি ১০৬ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে এই তিন বংশের নিম্নলিখিত বিবরণ দৃষ্ট হয়,—

শূরবংশ	রাজত্বকাল।	পালবংশ।	রাজত্বকাল।	সেনবংশ।	রাজত্বকাল।
আদিশূর	৭৫ বৎসর।	ভূপাল	৫৫ বৎসর।	সুকসেন	৩ বৎসর।
যামিনীভানু	৭৩ "	ধীরপাল	৯৫ "	বল্লালসেন	৫০ "
অনিরুদ্ধ	৭৮ "	দেবপাল	৮৩ "	লক্ষ্মণসেন	৭ "
প্রতাপরুদ্র	৬৫ "	ভূপতিপাল	৭০ "	মাধবসেন	১০ "
ভবদত্ত	৬৯ "	ধনপতি	৪৫ "	কায়স্থসেন	১৫ "
রেকদত্ত	৬২ "	ভিকনপাল	৭৫ "	সদাসেন	১৮ "
গিরিধর	৮০ "	জয়পাল	৯৮ "	নওজে	৩ "
পৃথ্বীধর	৬৮ "	রাজপাল	৯৮ "		১০৬ বৎসর
শৃষ্টিধর	৫৮ "	ভোগপাল	৫ "		
প্রভাকর	৬৩ "	জয়পাল (২য়)	৭৪ "		
জয়ধর	২৩ "		৬৯৮ বৎসর		
	৭১৪ বৎসর				

'কুলাচার্য্য' গ্রন্থে আদিশূরের বংশের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বংশ-তালিকা সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। তদনুসারে কবিশূর, তৎপুত্র মাধবশূর, তৎপুত্র আদিশূর, তৎপুত্র ভূ-শূর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র ধরাশূর। তাহার পর প্রদ্যুম্নশূর এবং তাঁহাদের পর অনুশূর বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনুশূরের পরই বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

করিয়া বঙ্গদেশকে পাঁচটী স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তৎকৃত বঙ্গদেশের সেই পাঁচটী বিভাগ—রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ এবং মিথিলা। বল্লালসের মৃত্যুর পর তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন বঙ্গ-রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি নানারূপে রাজ্যের শ্রী-বৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের পর ক্রমান্বয়ে মাধবসেন ও কেশবসেন সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহাদের পরই লাক্ষ্মণেয় বা অশোকসেনের পরিচয় পাই। কিংবদন্তী এই—'লাক্ষ্মণেয় বা অশোকসেনের রাজত্ব-কালে বক্তিয়ার খিলিজি অষ্টাদশ জন সৈন্য সমভিব্যাহারে বঙ্গ-রাজ্য আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণসেন সপরিবারে পলায়ন করিয়া বিক্রমপুরে (মতান্তরে পুরুষোত্তমে) উপনীত হন। সেই সময় বহু ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ তাঁহার সহিত বিক্রমপুরে গমন করিয়াছিলেন। কথিত হয়, এই হইতেই পূর্ব্ব-বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের প্রভাব বিস্তার হয়।' * ইহার পর, পাঠানগণের রাজত্ব-কালে বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীন হইয়া যায়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গ-রাজ্যে আফগানগণ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। সেই সময় আফগানগণ সমগ্র পূর্ব্ব-বঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম পর্য্যন্ত জয় করেন। মহম্মদ তোগলক তখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। বঙ্গদেশে আফগানগণের প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি-দর্শনে মহম্মদ তোগলক বঙ্গ-রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত করেন। পূর্ব্ব-বঙ্গ বাহাদুর খাঁ নামক জনৈক শাসনকর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি পরিশেষে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। মহম্মদ তোগলক তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহার পর দ্বাদশ বর্ষ কাল বঙ্গ অরাজক হইয়া উঠে। অতঃপর, ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে, হাজি ইলিয়াস নামক জনৈক আফগান 'সমসুদ্দীন ইলিয়াস সা' উপাধি-গ্রহণে, পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গ একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, স্বাধীনভাবে রাজ্য-শাসন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল। গৌড় হইতে পাণ্ডুয়ায় ইলিয়াসের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানে ইলিয়াসের পুত্র সেকেন্দার প্রসিদ্ধ আদিনা-মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। সেকেন্দারের বংশধরগণ তাদৃশ ক্ষমতাশালী ছিলেন না। রাজা গণেশ তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করেন। গণেশ প্রায় আট বৎসর বঙ্গরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহার বিশেষ অনুগত ছিল। তাঁহার পুত্র যদু মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আলাউদ্দীন নামে বিখ্যাত হন। আলাউদ্দীনের পৌত্র আমেদ-সা তাদৃশ জনপ্রিয় ছিলেন না। সুতরাং তিনি রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন। গণেশের বংশ ১৪০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গ-রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গণেশ-বংশের অবসানে বঙ্গদেশে পুনরায় ইলিয়াস-বংশের অভ্যুদয় হয়। ইলিয়াস-সাহী বংশ প্রায় ৪২ বৎসর প্রতিষ্ঠান্বিত থাকিয়া পরিশেষে হীনবল হইয়া পড়ে।

* পাল ও সেন রাজগণের বংশ-নিরূপণে অনেক সময় অনেক প্রকার তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়। পশ্চিম-ভারতে জয়পাল এবং অনঙ্গপাল যখন সুলতান মামুদ ও সবক্তগিণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, সেই সময় পাল-রাজগণ বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন। সুতরাং মনে হয়, খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে যে রাজপুত-বংশ ভারতের সর্ব্বত্র আপনাদের রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় পালরাজগণ তাঁহাদের অন্যতম শাখা। সেন-রাজগণ—সৌরাষ্ট্রবংশীয় বল্লভীসেন হওয়াই সম্ভবপর। বঙ্গদেশে যে সেন-বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই সেনরাজগণ বল্লভী-রাজপুত বা বৈশ্য-রাজপুত জাতীয়।

ইঁহারা খোজা এবং হাবসি নামধেয় দুই জন আবিসিনীয় বীরের ক্রীড়াপুত্তলি-স্বরূপ ছিলেন। এই আবিসিনীয়দ্বয় পরিশেষে ইলিয়াস-সাহী বংশকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া আপনারা বঙ্গ-রাজ্য অধিকার করেন। এই সময় 'সারকি' জাতি বিহারে আধিপত্য বিস্তার করে। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন হুসেন সাহ খোজা ও হাবসির ক্ষমতা ধ্বংস করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন হিন্দুদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। রূপ ও সনাতন নামা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদ্বয় তাঁহার অধীনে উচ্চপদারূঢ় ছিলেন। আলাউদ্দীন কর্তৃক কামাতিপুর বিধ্বস্ত ও উড়িষ্যা আক্রান্ত হয়। আলাউদ্দীনের দুই পুত্র—নসরত সা এবং মামুদ সা—১৫৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শের সাহ মামুদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া লন। শের সাহের বংশধরগণ দিল্লীশ্বর কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বঙ্গদেশে প্রভুত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সুলেমান কিরাণী তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করেন। বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া সুলেমান কিরাণী রাজমহলের নিকটবর্ত্তী তান্দায় আপনার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। সুলেমানের সেনাপতি হিন্দুবিদ্বেষী কালাপাহাড় ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। উড়িষ্যার তাৎকালিক নৃপতি মুকুন্দদেব তৎকর্তৃক নিহত হন। জগন্নাথ-দেবের মন্দির ভস্মীভূত হয়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে সুলেমান ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতা দাউদ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। বাদসাহ আকবরের সহিত দাউদ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীন হইয়া যায়। কিন্তু তখনও বঙ্গদেশ আকবরের অধীনতা সম্পূর্ণরূপ স্বীকার করিত না। পরিশেষে উড়িষ্যায় এক জায়গীর প্রদান করিয়া ওস্মান কিরাণীর অভিভাবক ইশা খাঁকে আকবর বঙ্গদেশের শাসনকর্তৃ-পদে নিয়োগ করেন। এই সময় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা দিল্লীর সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গদেশ শাসন করিতে আরম্ভ করেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার মৃত্যুর পর, সুজাউদ্দীন বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে বিশেষ কোনও অশান্তির লক্ষণ প্রকাশ পান নাই। তিনি দক্ষতার সহিত কয়েক বৎসর বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী-খাঁর শাসন সময়ে, মহারাষ্ট্র বীর রঘুজী ভোঁসলার অধিনায়কত্বে মহারাষ্ট্রগণ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ মহারাষ্ট্রদিগকে দমন করিতে পারেন না। মহারাষ্ট্রগণের অধিনায়ক ভাস্কর পণ্ডিত আলীবর্দ্দী কর্তৃক নিহত হইলে বঙ্গদেশে মহারাষ্ট্রগণের উপদ্রব বৃদ্ধি হয়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী তাঁহাদের সহিত সন্ধি-স্থাপনে বাধ্য হন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অলিবর্দ্দী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলা বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তখন সিরাজ-উদ্দৌলার বয়স সতের বৎসর মাত্র। এই সময়ে বঙ্গদেশে ইংরেজদিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী-প্রাঙ্গণে ইংরেজদিগের সহিত সিরাজ-উদ্দৌলার ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সিরাজ-উদ্দৌলা পরাজিত হন। ইংরেজ-সেনাপতি ক্লাইব বঙ্গদেশ অধিকার করেন।

ইহার পর ক্রমশঃ মুসলমানগণের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব বাঙ্গালার শাসন-কর্তৃপদে নিযুক্ত হন। ইংরেজগণের সুশাসনে, নানারূপ বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তনায়, বঙ্গদেশ ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠে।

চীন-পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে আমরা বঙ্গরাজ্যের বিশেষ কোনও তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি না। তাঁহাদের বর্ণনায় বঙ্গ নামের উল্লেখ নাই। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সময় হইতেই বঙ্গদেশ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ সময়েও সেই সকল বিভাগের অধিকাংশ বর্ত্তমান ছিল। চীন-পরিব্রাজকগণ বঙ্গরাজ্যের সেই সকল বিভাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সেই বিভাগ-সমূহ তখন এক একটী প্রবল-পরাক্রান্ত স্বতন্ত্র রাজ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। পরিব্রাজকগণ হয় তো সেই জন্য স্বতন্ত্র-রূপে বঙ্গ নামের উল্লেখ করেন নাই। ফা-হিয়ান বঙ্গ-রাজ্যের কতকাংশ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ 'কো-কুই-কি'তে প্রকাশ—'গঙ্গার স্রোতোমুখে ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে ১৮ যোজন গমন করিয়া তিনি গঙ্গাতীরস্থিত 'চেন-ফো' (Chen-fo) বা চম্পা নামক বৃহৎ রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে ফোর (Fo) বা বুদ্ধদেবের মন্দির দেখিতে পান। 'ফো' বা বুদ্ধদেব যে চারিটী স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তখন মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই মঠসমূহে ধর্ম্মযাজকেরা বাস করিতেন। এই স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে পঞ্চাশ যোজন অগ্রসর হইয়া পরিব্রাজক 'তো-মো-লি-তি' (To-mo-li-ti) বা তাম্রলিপ্তী রাজ্যে উপনীত হন। এই রাজ্যে তখন কুড়িটী 'সেন-কিয়া-লান' (Sen-kia-lan) বা সঙ্ঘারাম ছিল। সেই সঙ্ঘারাম-সমূহে ধর্ম্মযাজকগণ বাস করিতেন। ফা-হিয়ানের পর সুং-উং ও হুই-সাং নামক চীন-পরিব্রাজকদ্বয় ৫১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এত সংক্ষিপ্ত যে, তাহা হইতে বঙ্গদেশের কোনও তথ্যই পাওয়া যায় না। অতঃপর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন-সাং ভারতে আগমন করেন। 'সি-উ-কি' (Si-yu-ki) অর্থাৎ 'পশ্চিম-রাজ্যের বৃত্তান্ত' নামক তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে প্রতীত হয়,—বঙ্গ-রাজ্য তখন পুণ্ড্র-বর্দ্ধন, কামরূপ, সমতট, কামলঙ্কা, তাম্রলিপ্তী ও কর্ণসুবর্ণ, এই ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল। 'সি-উ-কি' গ্রন্থে প্রকাশ,—চম্পা হইতে চারি শত লি পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া পরিব্রাজক 'কা-শেং-কিয়ে-লো' (Ka-sheng-kie-lo) রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে কিছু পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া, গঙ্গা অতিক্রম করিয়া, পরিব্রাজক ছয় শত লি দূরবর্ত্তী 'পুন্-না-ফা-তান্-না' (Pun-na-fa-tan-na) বা পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন গমন করেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নয় শত লি দক্ষিণ-পূর্ব্বে 'কি-লা-না-সু-ফা-লা-না' (Ki-la-na-su-fa-la-na) বা কর্ণসুবর্ণ রাজ্য। এই রাজ্যে তখন দশটী সঙ্ঘারাম ছিল। সেই সঙ্ঘারাম সমূহে প্রায় তিন শত ধর্ম্ম-যাজক বাস করিতেন। এই স্থানের পূর্ব্ব-দক্ষিণে—সমতট। ইহার সীমানা সমুদ্র পর্য্যন্ত। এখান হইতে পূর্ব্বোত্তরে পর্ব্বত ও উপত্যকা মধ্যে গমন করিয়া পরিব্রাজক 'চি-লিথ-সা-তা-লো' (Chi-lit-sa-ta-lo) বা শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হন। ইঁহার

হুয়েন-সাং-দৃষ্ট বঙ্গ-রাজ্য।

পূর্ব্ব-দক্ষিণে সমুদ্র-মধ্যে কামলঙ্কা। কামলঙ্কার পূর্ব্বে দ্বারাপতি *, তৎপূর্ব্বে ঈশানপুর প্রদেশ, তৎপূর্ব্বে মহাচম্পা প্রভৃতি। এই সকল জনপদের নাম, পরিব্রাজকের মতে,—'লিন-ই' (Lin-yei)। ইহার পশ্চিমে 'এন-মো-লা' (En-mo-la) প্রদেশ। পশ্চিম দিকে, নয় শত মাইল অগ্রসর হইয়া পরিব্রাজক 'সমতট' প্রদেশ দিয়া তাম্রলিপ্তী রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তীতে তখন দশটী সঙ্ঘারাম ছিল এবং সেই সকল সঙ্ঘারামে এক সহস্র বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করিতেন।' গ্রীকদিগের বিবরণে বঙ্গ-নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় বঙ্গদেশ কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া প্রতীত হয়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'মার্কো-পোলো' (Marco-Polo) নামক ভিনিস-দেশীয় জনৈক পরিব্রাজক বঙ্গদেশ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের গো-মেষাদি পশুর এবং দুগ্ধ, চাউল, শর্করা, তুলা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য-সমূহের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নিকোলো-কণ্টি (Nicolo-Conti) নামক ভিনিস-দেশীয় অপর একজন পরিব্রাজক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে উপনীত হন। তখন সুরম্য প্রাসাদ, উদ্যান এবং সুবৃহৎ নগরীতে গঙ্গা-নদীর উভয় তীর শোভমান ছিল। গঙ্গা-প্রবাহের উত্তরদিকস্থিত স্বর্ণ রৌপ্য-প্রবাল-পূর্ণ 'সৌনারজিয়া' দেশের বিবরণ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ম্যানরিক (Manrique) নামধেয় 'সেণ্ট অগাষ্টিন' সম্প্রদায়ের একজন খৃষ্টধর্ম্ম-যাজক বঙ্গদেশ দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—তৎকালে গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূমি বিশেষ উর্ব্বর ছিল; সেই সকল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিত। নয়নমনোমুগ্ধকর রেশমী বস্ত্র বঙ্গদেশ হইতে অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হইত। মোগলগণ প্রজার উপর বিশেষ অত্যাচার করিতেন। রাজস্ব-প্রদানে অপারক হইলে, মোগলগণ প্রজার ভূ-সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইতেন; এমন কি, প্রজার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে বন্দী করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।' ম্যানরিক আরও বলিয়াছেন,—'তখন অসংখ্য যাত্রী সাগরে তীর্থস্নানে গমন করিতেন। সতীদাহ-প্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজধানী—ঢাকা নগরী বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইত। ঢাকা নগরে তখন দুই লক্ষেরও অধিক লোক বাস করিতেন।' সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ডাক্তার নিকোলা-গ্রাফ (Nichola Graaf) নামক জনৈক দিনেমার বঙ্গদেশে উপনীত হন। রাজমহলের মসজিদ, উদ্যান ও 'প্যাগোডা' এবং মুঙ্গেরের শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর, প্রাসাদ-চূড়া ও 'মিনার' দর্শনে তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। এই সময় ফরাসী-দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক বার্ণিয়ারও (Bernier) এদেশে আগমন করেন। বঙ্গ-রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং প্রচুর উৎপন্ন দ্রব্য দর্শনে তিনি বঙ্গদেশের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—তখন রাজমহল হইতে গঙ্গা-নদীর মোহানা সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত, উভয় পার্শ্বে অসংখ্য খাল, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় বিদ্যমান ছিল। সেই সকল জলাশয়ের উভয় পার্শ্বে জনাকীর্ণ নগর ও গ্রাম,

* প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে দ্বারাপতি—সাণ্ডোয়ে (Sandoway) দ্বীপ সমূহ। ওয়াটার্স (Watters) নামক জনৈক পাশ্চাত্য-প্রত্নতত্ত্ববিৎ এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"Dwarapati is the Sanskrit name for

ধান্ত ও ইক্ষু সমন্বিত শ্যামল শস্যক্ষেত্র, দেশের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। বঙ্গভূমি তখন ভারতের শস্যাগার নামে অভিহিত হইত। বঙ্গদেশের উৎপন্ন শস্যেই তখন দেশের অভাব মোচন হইত; অধিকন্তু, তাহার কতকাংশ দেশ-বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাইত। বঙ্গদেশে তৎকালে চিনি, মৎস্য, ফল, তুলা, রেশম, সৈন্ধব, আফিং প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত।

পুরাবৃত্তের আলোচনায় প্রতীত হয়, এক সময়ে বঙ্গদেশ গৌড় নামে অভিহিত হইয়াছিল। ভাগীরথীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরবর্ত্তী ভূ-ভাগ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গৌড়দেশ ও বঙ্গ।

পাণিনির "অরিষ্ট-গৌড় পূর্ব্বে চ" শ্লোকে প্রতীত হয়,—বঙ্গ ও গৌড় উভয়ের সাধারণ প্রাচীন নাম—গৌড়। সময় সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদ 'গৌড়' নামে পরিচিত হইয়াছে। কূর্ম্ম ও লিঙ্গ পুরাণের মতে, সূর্য্যবংশীয় শ্রাবস্তী পুত্র বংশক গৌড়দেশে শ্রাবস্তী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। * শ্রাবস্তীর অবস্থানাদির বিষয় আলোচনা করিলে, পুরাণোক্ত এই গৌড় অযোধ্যা-প্রদেশের কোনও অংশ-বিশেষে অবস্থিতি ছিল, সপ্রমাণ হয়। অযোধ্যা-প্রদেশে অধুনা গণ্ডা নামক একটী জেলার পরিচয় পাই। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে উহাই কূর্ম্ম ও লিঙ্গ পুরাণোক্ত গৌড়দেশ। বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশে গৌড়-দেশে কৌশাম্বী-পুরীর অবস্থিতির আভাষ পাওয়া যায়। † এলাহাবাদ জেলার কোশম পল্লীই প্রাচীন কৌশাম্বী নগরী, তাহা প্রয়াগ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রকূট ও চেদিরাজগণের তাম্রশাসন ও খোদিত শিলালিপিতে প্রকাশ,—চেদি, মালব ও বেরার রাজ্যের সীমান্তে গৌড়দেশ অবস্থিত ছিল। স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত সহ্যাদ্রি-খণ্ডে আবার কুরুক্ষেত্রের মধ্যে গৌড় নামক জনপদের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। ‡ এই সকল আলোচনায় প্রতীত হয়, বঙ্গদেশীয় গৌড় লইয়া প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে পাঁচটী গৌড় বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে সরস্বতী-নদী-প্রবাহিত কুরুক্ষেত্রে একটি, এলাহাবাদ ও কান্যকুব্জের মধ্যে একটি, অযোধ্যা প্রদেশে একটি, মিথিলা ও বঙ্গ মধ্যে একটি এবং বর্ত্তমান উড়িষ্যা ও গণ্ডোয়ানার মধ্যে একটি। পুরাবৃত্তে প্রকাশ—এই পঞ্চগৌড়ের ব্রাহ্মণগণ পরবর্ত্তি-কালে যথাক্রমে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়ীয়, মৈথিল ও উৎকলীয় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই পঞ্চগৌড়ের মধ্যে বঙ্গের নিকটস্থ গৌড়-দেশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। এই গৌড়-দেশের সীমা-পরিমাণাদি সম্বন্ধে শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে লিখিত আছে,—"বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে। গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥" অর্থাৎ—'বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বরের সীমানা পর্য্যন্ত গৌড়দেশ নামে বিখ্যাত। এখানকার লোকেরা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।' শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রের এই উক্তিতে প্রাচীন

* কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণে আছে,—
"শ্রাবস্তীশ্চ মহাতেজা বংশকস্তু ততোঽভবৎ। নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমা॥"

† বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশে লিখিয়াছেন,—"অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী॥"

‡ স্কন্দপুরাণ, উত্তরার্দ্ধ, প্রথম অধ্যায়ে আছে,—"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে। গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

অঙ্গ ও পুণ্ড্র গৌড়দেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। বরাহ-মিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' মতে গৌড় ও বঙ্গ দুইটী স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া প্রতীত হয়। বরাহ-মিহির সে স্থলে লিখিয়াছেন,—

"উদয়গিরি-ভদ্রগৌড়ক-পৌণ্ড্রোৎকল-কাশি-মেকলাম্বষ্ঠাঃ।
একপদ-তাম্রলিপ্তিক-কোশলকা-বর্দ্ধমানাশ্চঃ॥
আগ্নেয্যাং দিশি কোশল-কলিঙ্গ-বঙ্গোপবঙ্গ-জঠরাঙ্গাঃ॥" *

কবিকঙ্কণের চণ্ডীর বর্ণনা হইতেও গৌড়ের ও বঙ্গের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। যথা,—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্ভোজভৃঙ্গ,
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ॥"

গৌড়ের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে বাণভট্টপ্রণীত শ্রীহর্ষচরিতে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। বাণভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন,—কনোজ-রাজ্যে যে সময়ে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় নরেন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক গুপ্তবংশীয় রাজা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চীনপরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় তিনি বৌদ্ধদ্বেষী শশাঙ্ক নামে পরিচিত। কর্ণসুবর্ণে তাঁহার রাজধানী ছিল। কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' পাঠে জানা যায়,—কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে গৌড় রাজ্য অধিকার করেন। গৌড়দেশে তখন প্রচুর পরিমাণে হস্তী পাওয়া যাইত। ললিতাদিত্য গৌড় হইতে বহুসংখ্যক হস্তী সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব-সমুদ্র-তীরে উপনীত হইয়াছিলেন। ললিতাদিত্যের পর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় গৌড়ে উপনীত হন। এই সময় জয়ন্ত নামক গৌড়েশ্বর গৌড়রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জয়াপীড়ের সহিত রাজা জয়ন্তের কল্যাণদেবী নাম্নী কন্যার বিবাহ হয়। † অনন্তর জয়াপীড় সৈন্যাদির সহায়তা ব্যতিরেকে পঞ্চগৌড়ের অধিপতিদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার শ্বশুরকে ঐ সকল রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর গৌড় রাজ্যে পাল ও সেন বংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। তদ্বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বঙ্গ-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। হুমায়ুনের সময়ে গৌড়ের নাম 'বখ্‌তাবাদ' হইয়াছিল। বাঙ্গালার নবাবগণের পরস্পর বিরুদ্ধাচরণে গৌড়রাজ্য ক্রমশঃ শ্রীহীন হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়দেশ জনমানবপরিশূন্য মহারণ্যে পরিণত হয়। কিছুদিন হইতে বৃটিশ গবরমেণ্টের চেষ্টায়, গৌড়দেশের নিবিড় বনসমূহ পরিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

---

* বরাহমিহির-কৃত বৃহৎ-সংহিতা, কূর্ম্মবিভাগ, ১৪শ অধ্যায়, ৭ম ও ৮ম শ্লোক। পণ্ডিতগণ বলেন,—উপবঙ্গ পরবর্ত্তিকালে বাগড়ী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। গ্রন্থান্তরে উপবঙ্গের এইরূপ সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃপরে। পঞ্চযোজন পরিমিতোহ্যুপবঙ্গো হি ভূমিপ॥
উপবঙ্গে যশোরাদি দেশা কাননসংযুতাঃ। জ্ঞাতব্যা নৃপশার্দ্দূল বহুলাসু নদীষু চ॥"

বাগড়ীর সীমানা সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন,— উহা ভাগীরথীর পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এ হিসাবে, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্লোক অনুসারে, সমগ্র বাগড়ীর উপবঙ্গ নাম হওয়া সম্ভব।

† জয়াপীড়ের গৌড়ে অবস্থান সম্বন্ধে 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে একটী কৌতূহলপূর্ণ উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যান—জয়াপীড় আপনার অনুচরবর্গকে বিদায় দিয়া একাকী গৌড়রাজ্যে প্রবেশ করেন। গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরে, কার্ত্তিকেয় মন্দিরে, এক দিন নৃত্যগীত হইতেছিল। জয়াপীড় গীতবাদ্যে পারদর্শী

প্রাচ্য-জনপদ সমূহের মধ্যে তাম্রলিপ্তী প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। মহাভারত, হরিবংশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতিতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে অভিধান-চিন্তামণি গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের এই কয়েকটী পর্য্যায় দৃষ্ট হয়,—তমোলিপ্তি, তামলিপ্তি, বেলাকুল, তমালিকা, তামলিপ্তী, দমলিপ্ত তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ। মহর্ষি জৈমিনি ইহাকে রত্নগড় নামে অভিহিত করিয়াছেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতে ইহার নাম—রত্নাবতীপুর বৌদ্ধদিগের মহাবংশে তামলিপ্তি নাম দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক টলেমি 'তমালাইটেস' (Tomalites) রূপে ইহার নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত তালাক্তি (Taluctae) নামে অভিহিত। মহাভারতে পুনঃপুনঃ তাম্রলিপ্তের নাম দৃষ্ট হয়। সভাপর্ব্বে দেখিতে পাই—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞোপলক্ষে মহামতি ভীমসেন তাম্রলিপ্তের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত-রাজ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-সময়ে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন। দ্রোণপর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে,—"শকাকিরাতাদরদা-বর্ব্বরা-স্তাম্রলিপ্তকাঃ। অন্যে চ বহবো ম্লেচ্ছা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ॥" * এতদ্দ্বারা বোধ হয়,—কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সময় তাম্রলিপ্তে † ম্লেচ্ছগণ রাজত্ব করিত। রামায়ণে তাম্রলিপ্তের সন্নিকটস্থ জনপদের উল্লেখ দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, রামায়ণের সময়ে তাম্রলিপ্ত সমুদ্রগর্ভশায়ী ছিল। পরে মহাভারতের সময়, দ্বাপর যুগে, এই স্থান জনপদে পরিণত হয়। এক শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—ত্রেতাযুগে তাম্রলিপ্ত কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত।

ছিলেন। নৃত্য দেখিবার জন্য জয়াপীড় মন্দির-দ্বারস্থিত একটী প্রস্তর-খণ্ডে উপবেশন করেন। নর্ত্তকী কমলা জয়াপীড়ের অসামান্য রূপ-লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হয়। নৃত্যগীত শেষ হইলে কমলা তাঁহাকে আপনার ভবনে লইয়া যায়। এক দিন জয়াপীড় সন্ধ্যাবন্দনার জন্য নদী-তীরে গমন করিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হয়। ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিতে পান—কমলার গৃহের সকলেই ভীতিবিহ্বল। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারেন,—সিংহের উপদ্রবে তাহারা সকলেই ভীত হইয়াছে; সে সিংহকে কেহই বধ করিতে সাহসী হইতেছে না। পর দিন জয়াপীড় তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে নগর-প্রান্তে বটবৃক্ষ-মূলে উপবিষ্ট রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিংহ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। জয়াপীড়ের হুঙ্কারে সিংহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, জয়াপীড়ের ছুরিকাঘাতে সিংহ হতচৈতন্য হইয়া ভূতলশায়ী হয়। পরদিন রাজা জয়ন্ত জানিতে পারেন, সিংহ নিহত হইয়াছে। কিন্তু কে সেই সিংহের প্রাণবধ করিলে, কেহই বলিতে সমর্থ হইল না। সিংহের মুখমধ্যে জয়াপীড়ের নামাঙ্কিত হীরকাঙ্গুরীয় দর্শনে রাজা জয়ন্ত বুঝিতে পারিলেন,—কাশ্মীর-রাজ জয়াপীড় একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তাঁহার রাজ্যে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থিতি ও গতিবিধি সম্বন্ধে কোনও তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। পুরস্কার ঘোষিত হইল। একজন চর আসিয়া সংবাদ দিল—জয়াপীড় কমলা-নর্ত্তকীর গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তখন জয়ন্ত পৌরজন-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আপনার প্রাসাদে আনয়ন করিলেন; কন্যা কল্যাণদেবীকে জয়াপীড়ের হস্তে প্রদান করিয়া আপনি কৃতকৃতার্থ হইলেন।—রাজতরঙ্গিণী, চতুর্থ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

* মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২৯শ অধ্যায়;— দ্রোণপর্ব্ব ১১৯ম অধ্যায়, ১৫শ শ্লোক; ভীষ্মপর্ব্ব ৯ম অধ্যায়, ৫৬শ শ্লোক প্রভৃতি।

† অনেকে তাম্রলিপ্ত-শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন,—'তমসা লিপ্তঃ' অর্থাৎ পাপলিপ্ত। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন-কালে এই স্থানে ধর্ম্মনিয়ম তাদৃশ প্রতিপালিত হইত না; সেই জন্যই মহাভারতকার তাম্রলিপ্তবাসীদিগকে ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

ছিল; তাই রামায়ণে স্বতন্ত্ররূপে উহার নামোল্লেখ হয় নাই। এতৎসিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বে দেখিতে পাই,—তাম্রলিপ্তের ক্ষত্রিয়েরা পরশুরামের শরাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন। * তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। কল্কি অবতারে ভগবান বিষ্ণু দৈত্যগণকে বিনাশ করিতে করিতে ক্লান্ত হইলে, তাঁহার গাত্র হইতে তাম্রলিপ্তীতে এক বিন্দু ঘর্ম্ম পতিত হয়। দেবতার ঘর্ম্ম পতিত হওয়ায় উহার নাম তাম্রলিপ্ত; আর সেই জন্যই উহা একটী পবিত্র স্থান মধ্যে পরিগণিত। 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের নামকরণ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে;—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা সময়ে চন্দ্র-সূর্য্যের স্তম্ভন হয়। সেই জন্য সূর্য্যদেব আপনার সারথিকে আদেশ করেন,—'আমি ভারতে দিন করিব। তুমি উদয়াচল হইতে অবিলম্বে আগমন কর।' সারথি রশ্মি লইয়া উথিত হইলে, ভারতভূমি জ্যোৎস্না পতিত হয়। তখন সূর্য্যদেব সমুদ্র-প্রান্তে লিপ্ত হন। যে স্থানে অরুণ সমুদ্রে লিপ্ত হন, সেই স্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়। তাম্রলিপ্ত একটি পবিত্র তীর্থস্থান। পুরাণানুসারে—ইহা 'কপালমোচন' নামে অভিহিত। তাম্রলিপ্তের কপালমোচন নামকরণ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—'দক্ষকে বিনাশ করিয়া মহাদেব ব্রহ্মহত্যা-পাতকগ্রস্ত হন। দক্ষের মস্তক তাঁহার হস্তস্খলিত হয় না। উপায়ান্তর না দেখিয়া, দেবাদিদেব দেবগণের শরণাপন্ন হন। দেবগণের পরামর্শে মহাদেব পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু কিছুতেই দক্ষের মস্তক তাঁহার হস্তচ্যুত হয় না। তখন তিনি হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। তপস্যায় বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তাম্রলিপ্তে গমন করিতে বলেন। তদনুসারে মহাদেব তাম্রলিপ্তে উপনীত হইয়া, বর্গভীমা ও জিষ্ণু-নারায়ণের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী জলাশয়ে স্নান করেন। দক্ষের ঘর্ম্ম-লিপ্ত মস্তক তাঁহার হস্তস্খলিত হয়। সেই হইতে ইহার নাম—কপালমোচন।' তাম্রলিপ্তের অবস্থান ও সীমা-পরিমাণাদি সম্বন্ধে 'পাণ্ডব-বিজয়' নামক সংস্কৃত ভৌগলিক গ্রন্থে লিখিত আছে;—ভাগীরথীর তীরে তাম্রলিপ্ত দেশ; ইহার পরিমাণ—তিন যোজন; এস্থানে প্রচুর গোধন পাওয়া যায়। † 'দিগ্বিজয়প্রকাশ' নামক গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের সীমা-পরিমাণ ও অবস্থান সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"মণ্ডলঘট্টদক্ষিণে চ হৈজল্যস্য চহুত্তরে। তাম্রলিপ্তা প্রদেশশ্চ বণিকস্য নিবাসভূঃ॥ দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপানদ্যা স সমীপতঃ॥" অর্থাৎ,—মণ্ডলঘাটের দক্ষিণে ও হিজলীর উত্তরে বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্ত। উহার বিস্তৃতি দ্বাদশ যোজন;—উহা রূপা বা রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত। পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের বর্ণনায় প্রকাশ,—তিনি তাম্রলিপ্ত হইতে অর্ণবপোতারোহণে সিংহল-যাত্রা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের 'মহাবংশ' গ্রন্থে দেখিতে পাই,—সিংহলরাজ এই বন্দরে অর্ণবযানে আরোহণ করেন, এবং এই

বন্দর হইতে পবিত্র বোধিদ্রুম সিংহল-দ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাম্রলিপ্তের আধুনিক অবস্থানাদির বিষয় আলোচনায় উল্লিখিত বিবরণ-সমূহ উপকথাবৎ প্রতীয়মান হয়। এক্ষণে তাম্রলিপ্ত হইতে সমুদ্রের দূরত্ব—প্রায় ষাট-সত্তর মাইল। তাম্রলিপ্তের আদি-রাজবংশ ক্ষত্রিয়। কথিত হয়, তাঁহারা ময়ুর-বংশ-সম্ভূত। ময়ুরধ্বজ এই বংশের আদি রাজা। ময়ুরধ্বজ বিশেষ হরিভক্ত ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞকালে তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া জৈমিনি-ভারতে উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞীয় অশ্ব তাম্রলিপ্ত-নগরে উপনীত হইলে, ময়ুরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ অশ্ব বন্ধন করেন। তাম্রধ্বজের সহিত যুদ্ধে কৃষ্ণার্জ্জুন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন; পাণ্ডব-পক্ষের পরাজয় হয়। ময়ুরধ্বজ পুত্র-মুখে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবমাননা শুনিয়া পুত্রকে ভৎসনা করেন। এদিকে কৃষ্ণার্জ্জুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে রাজার নিকট উপনীত হইয়া বলেন,—'তোমার এক পুত্রকে সিংহ গ্রাস করিয়াছে। যদি তুমি তোমার অর্দ্ধ-শরীর দান করিতে পার,' তাহা হইলে সিংহ পুত্রটীকে ফিরাইয়া দেয়।' রাজা সম্মত হইলেন। পত্নী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ উভয়ে ময়ুরধ্বজের মস্তক দ্বিখণ্ড করিলেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ময়ুরধ্বজের এবম্বিধ নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে পরিতুষ্ট হইয়া আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। ময়ুরধ্বজ রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন।* ময়ুর-বংশের শেষ রাজার নাম—নিঃশঙ্কনারায়ণ। ইনি নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, কালু ভুঁইয়া নামক জনৈক সর্দ্দার তাম্রলিপ্ত অধিকার করেন। ময়ুর-বংশের প্রাধান্য সময়ে প্রাকার-পরিখা-বেষ্টিত আট মাইল ভূমির উপর রাজবাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত হয়,—কালু ভুঁইয়া তাম্রলিপ্তের কৈবর্ত্তবংশের আদি পুরুষ। ইহার পর, তাম্রলিপ্তে কায়স্থ-রাজগণের অভ্যুদয় হয়। তাম্রলিপ্ত অধুনা তমলুক নামে পরিচিত। তাম্রলিপ্তের পূর্ব্বগৌরব এক্ষণে সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তমলুক মেদিনীপুর জেলার ক্ষুদ্র একটি উপবিভাগ;—মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে রূপনারায়ণ নদের অনতিদূরে অবস্থিত।

চীন-পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পরিব্রাজক ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্ত দর্শন করেন। তাঁহার বিবরণ পাঠে অবগত হই,—তাম্রলিপ্ত তখন গঙ্গার মোহানাস্থ একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। তাম্রলিপ্তের চতুর্ব্বিংশতিটী সঙ্ঘারামে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-যোগী বাস করিতেন। ফা-হিয়ান দুই বৎসরকাল তাম্রলিপ্তে অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মপুস্তক-সমূহ নকল করিয়া লইয়াছিলেন। পরিশেষে তাম্রলিপ্ত হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া চৌদ্দ দিবস চৌদ্দ রাত্রির পর তিনি সিংহলে উপনীত হন। ফা-হিয়ানের মতে, তমলুক তখন বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। তিনি তমলুকের অধিবাসীদিগকে সজ্জন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়ানের প্রায় দুই শত বৎসর পরে পরিব্রাজক হুয়েন-সাং তাম্রলিপ্তে আগমন করেন। তিনি তাম্রলিপ্তের পার্শ্বেই সমুদ্র

পরিব্রাজকের বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত।

---

* জৈমিনি-ভারত, ৪১শ হইতে ৪৬শ অধ্যায়। জৈমিনির অনুসরণে কাশীরাম দাসও মহাভারতে এই উপাখ্যানটী সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু মূল মহাভারতে ইহা দৃষ্ট হয় না।

দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—তাম্রলিপ্তের পরিধি-পরিমাণ—১৪ হাজার বা ১৫ হাজার লি অর্থাৎ প্রায় ২৫০ বা ৩০০ মাইল। ইহার রাজধানী সমুদ্র-তীরে অবস্থিত। ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বর; অধিবাসিগণ কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী, ক্ষিপ্র ও চঞ্চল। রাজ্যটী উপদ্বীপ-স্বরূপ; স্থল-পথে ও জল-পথে এস্থানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা। এখানে প্রচুর পরিমাণে মণি-মুক্তা সংগৃহীত হয়; সেই জন্য এখানকার অধিবাসিগণ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। এই স্থানে দশটী সঙ্ঘারাম এবং পঞ্চাশটী হিন্দু-দেবমন্দির বিদ্যমান। ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্তকে 'তা-মো-লি-তি' (Ta-mo-li-ti) রূপে এবং হুয়েন-সাং—'তান-মো-লি-তি' (Tan-mo-li-ti') রূপে উচ্চারণ গিয়াছেন। কানিংহাম বলেন,—তাম্রলিপ্ত ও সংস্কৃত তমলুক অভিন্ন; রূপনারায়ণ ও হুগলী নদীর সঙ্গম-স্থলের প্রায় বার মাইল উত্তরে অবস্থিত। তাঁহার মতে, উত্তরে বর্দ্ধমান ও কাল্না, দক্ষিণে কশাই নদীর তীর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থিত সমগ্র ভূভাগ, প্রাচীন তাম্রলিপ্তের অন্তর্ভুক্ত। হুয়েন-সাঙের মৃত্যুর পর, ৬৭১ খৃষ্টাব্দে ইৎ-চিং (It-Ching) নামক অপর একজন বৌদ্ধ-পর্য্যটক ভারতে আগমন করেন। ইনি ৬৭২ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীর মোহানায় তাম্রলিপ্তীতে উপনীত হইয়াছিলেন। তখনও তাম্রলিপ্ত বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ইৎ-চিং আপনার 'নান্-হেই-চি-কোয়ে-না-ফা-চুয়াং' (Nan-hai-chi-kuei-na'fa-ch'uan) অর্থাৎ "দক্ষিণ-সমুদ্রে অবস্থিতি-কালে স্বদেশে প্রেরিত গোপনীয় পত্র" নামক গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের এইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—'তাম্রলিপ্ত ভারতের প্রান্তদেশে অবস্থিত। ইহার আকৃতি পরিমাণ—তিন শত মাইল। তাম্রলিপ্ত হইতে চল্লিশ মাইল উত্তরে ভারতের পূর্ব্ব সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। এখানে পাঁচ ছয়টী ধর্ম্ম-মন্দির বিদ্যমান। অধিবাসীরা সত্যবাদী ও সমৃদ্ধিশালী। তাম্রলিপ্ত পূর্ব্ব-ভারতের একটী বিস্তীর্ণ জনপদ,—নালন্দা হইতে ষাট যোজন দূরে অবস্থিত। চীনদেশে প্রত্যাগমনের সময় আমরা এই স্থানে জাহাজে আরোহণ করি।' তাম্রলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় স্থান। তমলুকের বর্গভীমা কালী-মন্দির, বিষ্ণুনারায়ণের মন্দির প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রাচীন-কালে তাম্রলিপ্তে তীর্থযাত্রিগণ তীর্থ-পর্য্যটনে আগমন করিতেন।

তাম্রলিপ্ত হইতে পরিব্রাজক হুয়েন-সাং উত্তর পশ্চিমে সাত শত লি (প্রায় এক শত মাইল) গমন করিয়া কর্ণসুবর্ণ নামক, প্রাচীন জনপদে উপনীত হন। কর্ণসুবর্ণ—বঙ্গদেশের

কর্ণসুবর্ণ রাজ্য।

একটী বিভাগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। কিয়ে-লো-না-সু-ফা-লা-নো (Kie-lo-na-su-fa-la-no) নামে হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় কর্ণসুবর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণসুবর্ণের অবস্থান-সম্বন্ধে নানা মতান্তর দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—মুর্শিদাবাদের ছয় ক্রোশ উত্তরে 'কর্ণসোন-কা-গড়' নামে যে প্রাচীন জনপদ দৃষ্ট হয়, তাহাই কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষ। আর এক শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী কর্ণগড়কে কর্ণসুবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফার্গুসন বলেন,—বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ, সমগ্র বীরভূম জেলা, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর এবং প্রাচীন যশোহর কর্ণসুবর্ণের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ কর্ণসুবর্ণের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া নানা মতান্তর দেখিতে পাই। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহে বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, উড্র

প্রভৃতি রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই; কিন্তু কর্ণসুবর্ণ নামক কোনও জনপদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এমন কি, বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতায়ও কর্ণসুবর্ণ নামক স্বতন্ত্র জনপদের উল্লেখ নাই। তাই অনেকে অনুমান করেন, অন্যান্য প্রাচীন রাজ্যের তুলনায় কর্ণসুবর্ণ আধুনিক রাজ্য। আমাদের মনে হয়, পুরাণকার যে সময়ে অন্যান্য জনপদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, কর্ণসুবর্ণ হয় তো সে সময়ে বঙ্গদেশ হইতে স্বতন্ত্র হয় নাই। তাই পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা কর্ণসুবর্ণের নাম স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পাই না। কর্ণসুবর্ণের সাত শত লি দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড্র-রাজ্য বিরাজমান ছিল। ফা-হিয়ান কর্ণসুবর্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং কর্ণসুবর্ণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কর্ণসুবর্ণের পরিধি-পরিমাণ—সাত শত লি অর্থাৎ প্রায় এক শত সতের মাইল। কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর পরিমাণ কুড়ি লি। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন সময়ে এস্থান জনাকীর্ণ ছিল। বহু জাতি ও বহু সম্প্রদায়ের লোক তখন কর্ণসুবর্ণে বাস করিত। ভূমি উর্ব্বর; অধিবাসিগণ সরল, সাধু-প্রকৃতি, শান্ত, শিষ্ট, সমৃদ্ধিশালী ও বিদ্যোৎসাহী। কর্ণসুবর্ণে তখন দশ-এগারটী সঙ্ঘারাম ছিল। সেই সকল সঙ্ঘারামে প্রায় দুই সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। কর্ণসুবর্ণে তখন প্রায় পঞ্চাশটী হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ছিল। ফল, পুষ্প, ধান্য—কর্ণসুবর্ণের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।' পুরাবৃত্তে প্রকাশ,—রাজা শশাঙ্ক যখন কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করিতেন, সেই সময় কর্ণসুবর্ণ মগধের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। কর্ণসুবর্ণ-রাজ শশাঙ্ক—মগধরাজ শিলাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর পার্শ্বেই রক্তবিষ্টি নামক সঙ্ঘারাম। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং উহাকে 'লো-তো-বেই-চি' (Lo-to-bai-chi) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সঙ্ঘারামের প্রাচীরগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। হুয়েন-সাং বলিয়াছেন,—এই সাঙ্ঘারামে কর্ণসুবর্ণের প্রসিদ্ধি জ্ঞানী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ নানা বিষয়ের বিচার-মীমাংসা করিতেন। কর্ণসুবর্ণ-রাজ প্রথমে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; পরিশেষে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার একটী উপাখ্যান হুয়েন-সাং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উপাখ্যানটী আশ্চর্য্য ও কৌতূহলপূর্ণ। হুয়েন-সাং লিখিয়াছেন;—এক সময়ে কর্ণসুবর্ণবাসী সত্যধর্ম্মে (বৌদ্ধধর্ম্মে) বিশ্বাস করিতেন না। একদা দক্ষিণ ভারত হইতে এক ব্যক্তি মস্তকে প্রজ্বলিত মশাল ও উদরে তাম্রপাত্র ধারণ করিয়া কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে উপনীত হন। তিনি অপধর্ম্মাবলম্বী বা হিন্দুধর্ম্মের উপাসক ছিলেন। আগন্তুক ঘোষণা প্রচার করেন—তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত সংসারে বিরল। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহে; যাঁহার ইচ্ছা, তিনি পরীক্ষা করুন। তাঁহার অদ্ভুত বেশ-বিন্যাস দেখিয়া, কৌতূহল-চরিতার্থ-মানসে অনেকে তাঁহাকে ঐরূপ বেশ-ভূষা গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আগন্তুক তাহাতে উত্তর দেন,—'আমার জ্ঞান অপরিসীম। সামান্য উদরে এত জ্ঞানের স্থান-সঙ্কুলান হওয়া সম্ভবপর নহে। পাছে উদর বিদীর্ণ হয়, সেই ভয়ে আমি উদর তাম্রপাত্র দ্বারা আবৃত রাখিয়াছি। আর এই যে আমার মস্তকেই আলোক দেখিতেছ, তাহার কারণ,—আমি অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের দুঃখদর্শনে বড়ই

বিচর্লিত হইয়াছি। তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণ মানসে মস্তকে আলোক ধারণ করিয়াছি।” আগন্তুকের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে দশ দিনের মধ্যে কেহই তাঁহার সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না। কর্ণসুবর্ণ-রাজ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া দুঃখ প্রকাশ করেন,—আমার রাজ্যে কি এক জনও জ্ঞানী ব্যক্তি নাই, যিনি এই আগন্তুকের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করেন! আমার রাজ্য কি এত অজ্ঞানান্ধকারপূর্ণ! যদি কোনও নগণ্য স্থানেও একটী জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ধান পাই, তাঁহাকে আদর করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসি।’ রাজার এবম্বিধ বাক্য-শ্রবণে এক জন লোক বলিল,—‘মহারাজ! নিকটবর্ত্তী বনে এক শ্রমণ (সন্ন্যাসী) বাস বরেন। তিনি অধ্যয়নে যত্নপর। তিনি এক্ষণে নির্জ্জন-বাসে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই ইহাঁর সহিত তর্ক করিবার উপযুক্ত।’ রাজা তৎ-ক্ষণাৎ শ্রমণকে আমন্ত্রণ করিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। শ্রমণ বলিলেন,—‘দক্ষিণ-ভারতে আমার নিবাস; আমি দেশ-ভ্রমণোপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছি। আমি যে কোনও বিষয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছি। তবে যদি আমি তর্কে অপরাজিত থাকি, আপনাকে একটী সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য আপনার রাজ্যে প্রচারকদিগকে আহ্বান করিবার অনুরোধ করিব।’ রাজা শ্রমণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আগন্তুকের সহিত শ্রমণের তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল। শ্রমণ বিচারে জয়লাভ করিলেন; আগন্তুক পরাজিত হইয়া কর্ণসুবর্ণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। শ্রমণের গভীর জ্ঞান-দর্শনে ও উপদেশাবলী শ্রবণে কর্ণসুবর্ণ-রাজ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে সঙ্ঘারাম-সমূহ নির্ম্মিত হইল; বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সমাদরের অবধি রহিল না।

সমতট—হুয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট বঙ্গ-রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ জনপদ। তিনি ‘সান-মো-তা-চা’ (San-mo-ta-cha) রূপে উহার উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী গ্রন্থে উহা ‘সামাতাতা’ (Samatata) রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—‘সমতট-রাজ্য কামরূপ-রাজ্যের বার শত লি হইতে তের শত লি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। উহার পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত-রাজ্য; তাম্রলিপ্ত হইতে সমতটের দূরত্ব—নয় শত লি। উহার পরিধি—তিন হাজার লি (ছয় শত মাইল)। সমতট-রাজ্যের রাজধানীর নাম—সমতট; তাহার পরিধি কুড়ি লি (প্রায় তিন চারি মাইল)। সমতটে ত্রিশটী সঙ্ঘারাম আছে। সেই সঙ্ঘারাম-সমূহে প্রায় দ্বি-সহস্র বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করেন। শতাধিক দেব-মন্দিরে সমতটের শোভা-সম্বর্দ্ধন করিয়া আছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জনগণে নগর পরিপূর্ণ। ‘নিগ্রন্থ’-সম্প্রদায়ভুক্ত দিগম্বরগণের সংখ্যা এখানে অনেক অধিক। এখানকার অধিবাসীরা খর্ব্বাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা পরিশ্রমী, বিদ্যানুরাগী এবং অনুসন্ধিৎসু। এখানকার ভূমি সাধারণতঃ নিম্ন ও উর্ব্বর। এখানে নিয়মিতরূপে চাষ-আবাদ হয় এবং অপর্য্যাপ্ত শস্য ও ফল-মূল জন্মিয়া থাকে। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় আরও প্রকাশ,—‘সমতট একটী প্রধান বন্দর; এখানে অর্ণব-পোত-সমূহ সর্ব্বদা গতিবিধি করে।’ হুয়েন-সাঙের অব্যবহিত পরে, বৌদ্ধ-পর্য্যটক ইৎ-চিং সমতট রাজ্যে উপনীত হন। তিনি যখন সমতটে আগমন করেন, তখন সমতটে ‘হো-লো-শে-

সমতট বা পূর্ব্ব-বঙ্গ।

পো-তা' (Ho-lo-she-po-ta) নামক জনৈক নৃপতি রাজত্ব করিতেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই রাজা বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং বৌদ্ধ-তীর্থযাত্রিগণের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ইৎ-চিং সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন। * ইৎ-চিং-কথিত নৃপতি 'হো-লো-শে-পো-তার' প্রকৃত নাম কি, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কেহ বলেন,—তিনি হর্ষভট; কেহ বলেন,—তিনি রাজভট; আবার কাহারও মতে,—'হো-লো-শে-পো-তা' হর্ষবর্দ্ধনের নামান্তর। ইৎ-চিঙের ভারত-ভ্রমণের কিছুকাল পরে, চীনদূত মা-হুয়ান (Ma-huan) বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইউং-লো (Yung-lo) কর্ত্তৃক চীন-সম্রাট 'হুইতি' (Huiti) রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেশত্যাগী হওয়ায় তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য মা-হুয়ান পশ্চিম-মহাসাগরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি যে সকল জনপদে উপনীত হন, তদ্রচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে 'চে-তি-গান' (Che-ti-gan), 'সোণা-উর-কং' (Sona-urh-kong) প্রভৃতি নগরের এবং 'পান্-কো-লো' (Pan-ko-lo রাজ্যের) নামোল্লেখ আছে। 'চেতি-গান' যে চট্টগ্রাম, 'সোণা-উর-কং' যে সোণার-গাঁ বা সুবর্ণগ্রাম এবং 'পান-কো-লো' যে বাঙ্গালা-দেশ,—তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। মা-হুয়ান বাঙ্গালা রাজ্যের এবং বাঙ্গালার নগর-সমূহের বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে বঙ্গ-রাজ্য ধনধান্য-সম্পন্ন এবং বঙ্গের নগরগুলি প্রাচীর-বেষ্টিত সুদৃঢ় ছিল, বুঝিতে পারা যায়। হুয়েন-সাং ও ইৎ-চিঙের ভারতাগমন সময়ে আমরা 'সমতট' নামের পরিচয় পাই; কিন্তু মা-হুয়ানের ভারতাগমনকালে বাঙ্গালা নামের আভাষ প্রাপ্ত হই। বঙ্গের কোন্ অংশ পূর্ব্বে সমতট বলিয়া অভিহিত হইত, সে সম্বন্ধে অনেক বিতণ্ডা চলিয়া থাকে। ফার্গুসন বর্ত্তমান ঢাকা জেলাকে সমতট বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সমতটের রাজধানী, তাঁহার মতে, সুবর্ণগ্রাম বা সোণারগাঁ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ওয়াটার্স বলেন,—ঢাকার দক্ষিণাংশ এবং ফরিদপুরের পূর্ব্বভাগ তৎকালে সমতট নামে অভিহিত হইত। কানিংহামের মতে,—আধুনিক যশোহর প্রাচীন-কালে সমতট আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, পূর্ব্ব-বঙ্গের কতকাংশ যে তখন সমতট নামে অভিহিত হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। † বঙ্গদেশ

* ইৎ-চিং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্তিতে আগমন করেন এবং ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।

† রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় পুণ্ড্র, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন,—'Nothern Bengal was *Pundra*; Assam and the North-East formed *Kamrupa*; Eastern Bengal was *Samatata*; South-west Bengal was *Tamralipti*, and Western-Bengal was *Karnasubarna*." পুণ্ড্র দেশের রাজধানী পুণ্ড্র বর্দ্ধন বা পৌণ্ড্র বর্দ্ধন বর্ত্তমান মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষে চিহ্নিত হইয়া থাকে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে, পাণ্ডুয়া ও পুণ্ড্র-বর্দ্ধন একই স্থান। উত্তর-বঙ্গে ডিহি পুণ্ডুরিয়া নামে আর এক একটী স্থান আছে। কেহ কেহ তাহাতেও প্রাচীন পুণ্ড্র বর্দ্ধনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। যাহা হউক, মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া ও পুণ্ড্র-বর্দ্ধন যে অভিন্ন, ইহাই অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদের মত। তাঁহারা বলেন, হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া নামক যে স্থান দৃষ্ট হয়, প্রাচীন পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের বা পাণ্ডুয়ার নামানুসারেই তাহার নামকরণ হইয়াছিল। পাল-বংশীয় নৃপতিগণ পুণ্ড্র বর্দ্ধনে আধিপত্য বিস্তার করিলে, শূরবংশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক দক্ষিণ-বঙ্গের পাণ্ডুয়া নগর প্রতিষ্ঠিত হয়;—ইহাই ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত।

হইতে বিবিধ উৎপন্ন সামগ্রী পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইত, বঙ্গদেশ ধনৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল,—পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় তাহা বিশেষ-ভাবে লিখিত হইয়াছে। বঙ্গের প্রচলিত মুদ্রার বিষয়, বঙ্গের ব্যবহার-বিধির বিবরণ, বঙ্গের বিবাহাদি উৎসবের বর্ণনা, বঙ্গের শৌর্য্য-বীর্য্য ও সৈন্যবল প্রভৃতির প্রসঙ্গও সেই সকল ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দৃষ্ট হয়। পুরাণ-বর্ণিত শাস্ত্র-কথিত বঙ্গের ইতিহাস অতীতের অন্ধতম গর্ভে নিমজ্জিত থাকিলেও, ভারতে মুসলমান-দিগের আধিপত্যের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ যে সর্ব্বথা গৌরব-সম্পন্ন ও উন্নত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না।

কেহ কেহ অঙ্গ-দেশকেও প্রাচ্য-জনপদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অঙ্গদেশের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। বিষ্ণু-পুরাণে দেখিতে পাই,—স্বায়ম্ভুব মনু-পুত্র উত্তানপাদের বংশে, ধ্রুবের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষে, অঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। সেই অঙ্গের নামানুসারে অঙ্গ-রাজ্যের নামকরণ লইলে, স্বায়ম্ভুব চাক্ষুষাদি মন্বন্তরে অঙ্গ-রাজ্যের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়।

অঙ্গদেশ।

এদিকে বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে বলিপুত্র অঙ্গের নামানুসারে অঙ্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে দেখিতে পাই, অঙ্গ-রাজ্য এক সময়ে কুন্তী-পুত্র কর্ণের রাজ্য ছিল। কর্ণ রাজা নহেন বলিয়া, অর্জ্জুন তাঁহার সহিত অস্ত্র-পরীক্ষায় সম্মত হন না। দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণকে অঙ্গ-রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে অঙ্গ-দেশাধিপতি কর্ণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত আছে। রামায়ণে দেখিতে পাই, দশরথের মিত্র রোমপাদ অঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন; ঋষ্যশৃঙ্গকে আপন রাজ্যে লইয়া গিয়া তিনি রাজ্যের অনাবৃষ্টি দূর করিয়াছিলেন। শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে অঙ্গ-রাজ্যের সীমানার উল্লেখ আছে। * তাহাতে বর্ত্তমান বিহারের নিকটে অঙ্গদেশ অবস্থিত ছিল, এবং বৈদ্যনাথ হইতে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত অঙ্গরাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, এইরূপ বুঝিতে পারা যায়। স্মৃতি-শাস্ত্র মতে, তীর্থযাত্রা ভিন্ন অঙ্গদেশে গমন করিলে প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয়। † কিন্তু তন্ত্র-শাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে বিপরীত উক্তি দেখিতে পাই। মগধ-প্রসঙ্গে আমরা যে চম্পা-রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছি। কানিংহাম প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ নির্দ্ধারণ করেন, সেই চম্পা নগরী এক সময়ে অঙ্গ-দেশের রাজধানী ছিল। ফলে, বিহার এবং বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে প্রাচীন-কালে অঙ্গ-রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং সে রাজ্য সময় সময় দূর-দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল,—প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় তাহাই প্রতীত হয়।

---

* শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে লিখিত আছে,—

"বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে। তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে॥"

অর্থাৎ—বৈদ্যনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া, ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত অঙ্গদেশ। অঙ্গদেশ-গমনে কোনও দোষ নাই।

† বঙ্গ প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধেও এইরূপ উক্তি-দর্শনে কেহ কেহ যযাতি-পুত্র অণুর বংশধরগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত দেশ বলিয়া, তত্তদ্দেশকে দোষ-সম্পন্ন মনে করেন। কিন্তু হরিবংশ-মতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রভৃতি পুরুষ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কলিঙ্গ-রাজ্য।

[কলিঙ্গ-রাজ্যের প্রাচীনত্ব,—সূত্রগ্রন্থে, সংহিতা-শাস্ত্রে, রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণে কলিঙ্গ সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য ;—কলিঙ্গ-প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত,—কলিঙ্গ-রাজ্যের অস্তিত্ব-নির্দ্ধারণে প্রত্নতত্ত্ববিদগণের চেষ্টা,—হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট কলিঙ্গ-রাজ্য,—ভেঙ্গী, রাজমহেন্দ্রী, সিংহপুর,—সিংহবাহু ও সিংহল ;—উপসংহার,—কলিঙ্গ-দেশান্তর্গত জনপদ-সমূহের বিভিন্ন পরিচয়।]

বলি-পুত্র কলিঙ্গ যে রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন, সে রাজ্য কলিঙ্গ-রাজ্য নামে পরিচিত হয়। কলিঙ্গ-রাজ্য এক সময়ে বিশেষ প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

কলিঙ্গ।
(প্রাচীনত্ব)

পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রতীত হয়, বঙ্গদেশের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থান-সমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণের তৈলঙ্গদেশ পর্য্যন্ত, কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কলিঙ্গ-রাজ্যের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে সূত্র-গ্রন্থে সংহিতা-শাস্ত্রে, রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণ-পরম্পরায় অশেষ পরিচয় নিবদ্ধ আছে। * রামায়ণে, কলিঙ্গ এবং কুলিঙ্গ নামের বহু বার উল্লেখ দেখিতে পাই। কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড একচত্বারিংশ সর্গে কলিঙ্গ-দেশ দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া প্রতীত হয়। অযোধ্যা হইতে ভরতের মাতুলালয় রাজগৃহে গমনাগমনের পথে কুলিঙ্গ নামক নদী ও জনপদের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন-কালে ভরত 'একশাল নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী স্থাণুমতী-নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইয়া, বিনত নামক গ্রামে যাইয়া, তৎসমীপবর্ত্তিনী গোমতী নাম্নী নদী পার হইয়া, কলিঙ্গ-নগরে উপস্থিত হন।' ইহাতে কলিঙ্গ নগর গোমতী ও অযোধ্যার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞে কলিঙ্গ-দেশে তাঁহার সম্মান-প্রাপ্তির বিষয় পদ্মপুরাণে বিবৃত আছে। সাবর্ণি মন্বন্তরে সুরথ রাজার সহিত সমাধি নামক বৈশ্য ভগবতীর উপাসনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে দেখিতে পাই,—সেই সমাধির পিতামহ বিরাধ কলিঙ্গের রাজা ছিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে, যুধিষ্ঠিরের তীর্থ-পর্য্যটন ব্যপদেশে, কলিঙ্গ-দেশের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সেখানে কলিঙ্গ-দেশের—দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতির আভাষ পাওয়া যায়। জনমেজয়কে বৈশম্পায়ন বলিতেছেন,—'গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে গমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির পঞ্চ-শত নদী মধ্যে অবগাহন করেন। তৎপরে বীর ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদ্র-তীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন।' সেই সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দেশ-সমূহকে লক্ষ্য করিয়া লোমশ বলিতেছেন,—"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী। যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ॥" অর্থাৎ,—হে মহারাজ! এই সকল দেশকেই কলিঙ্গ-দেশ বলিয়া থাকে। এই প্রদেশে বৈতরণী-

---

* বৌধায়ন-সূত্র, ১।১।২ ; মনুসংহিতা, দশম অধ্যায় ; রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪১শ সর্গ এবং অযোধ্যা কাণ্ড ৭১শ সর্গ ; মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১১৪শ অধ্যায় ; হরিবংশ, ২৮৮ম অধ্যায়, ৫৫শ শ্লোক।

নদী প্রবহমানা।' তবেই বুঝা যাইতেছে, মহাভারতের সমসময়ে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হরিবংশের 'অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ' পাঠ দৃষ্টে তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের পার্শ্বে কলিঙ্গ-রাজ্য অবস্থিত ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ভীষ্ম-পর্ব্বে দেখিতে পাই,—কলিঙ্গ-রাজ শ্রুতায়ু কুরুক্ষেত্র-সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। * তিনি এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় ভীম-হস্তে নিহত হন। কালিদাসের রঘুবংশে কলিঙ্গ-দেশ উৎকল-সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। † 'শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্রে জগন্নাথধামের পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণা-নদী-তীর পর্য্যন্ত কলিঙ্গ-দেশ বিস্তৃত বলিয়া লিখিত আছে। কলিঙ্গ-দেশের দক্ষিণাংশ 'কালিঙ্গ' নামে অভিহিত হয়। ‡ দিগ্বিজয়-প্রকাশ' গ্রন্থ মতে,—কলিঙ্গ-দেশ ভীমকেশের রাজত্ব এবং ওড্রদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত। §

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে গ্রীসের ও রোমের প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের গ্রন্থে কলিঙ্গ-বিষয়ে বিবিধ আলোচনা দৃষ্ট হয়। মেগাস্থিনীসের বর্ণনার অনুসরণে প্লিনি ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কলিঙ্গ নামক তিনটী জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়;—(১) কলিঙ্গ (Calingae) (২) মাকো-কলিঙ্গ (Macco-Calingae) এবং (৩) গঙ্গারিদেশ-কলিঙ্গ (Gangarides-Calingae)। ** প্রাচীন শিলালিপি প্রভৃতিতে 'ত্রিকলিঙ্গ' নাম দৃষ্টে তিনটী কলিঙ্গের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। মহাভারতে কলিঙ্গ নাম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত সংযোজিত আছে, দেখিতে পাই। বিষ্ণুপুরাণের টিপ্পনীতে অধ্যাপক হোরেস উইলসন তিনটী কলিঙ্গ-রাজ্যেরই কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। ‖ কানিংহাম বলেন,—ত্রিকলিঙ্গ হইতে বর্ত্তমান 'তেলিঙ্গন' প্রদেশের উদ্ভব হইয়াছে। চেদি-রাজ্যের হৈহয়-বংশীয় (কলোচুরি) রাজগণের খোদিত লিপিতে তাঁহারা আপনাদিগকে ত্রিকলিঙ্গ এবং কলিঞ্জরপুরের অধিপতি বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন; কানিংহাম তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করেন,—বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বতীয় দুর্গই কলিঞ্জর; আর ত্রিকলিঙ্গ শব্দে (১) কৃষ্ণানদী-তীরস্থিত ধানক বা অমরাবতী রাজ্য, (২) অন্ধ্র বা ওরাঙ্গল রাজ্য, এবং (৩) কলিঙ্গ বা রাজমহেন্দ্রী রাজ্য বুঝাইয়া থাকে। প্লিনি কলিঙ্গ-দেশের অবস্থানের একটু আভাষ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে লিখিত আছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে মান্দে (Mandei), মাল্লি (Malli) এবং প্রসিদ্ধ মাল্লস্ (Mallus) পর্ব্বতের নিম্নভাগে কলিঙ্গ-

কলিঙ্গ-সম্বন্ধে বিবিধ বক্তব্য।

---

* রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৭১শ সর্গ।

† রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৩৮শ শ্লোক।

‡ শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে,—"জগন্নাথাৎ পূর্ব্বভাগাৎ কৃষ্ণাতীরান্তগঃ শিবে। কলিঙ্গ-দেশঃ সম্প্রোক্তো বামমার্গপরায়ণঃ। কলিঙ্গ-দেশমারভ্য পঞ্চাষ্টযোজনং শিবে। দক্ষিণস্যাং মহেশানি কালিঙ্গং পরিকীর্ত্তিত॥"

§ দিগ্বিজয় প্রকাশে,—"ওড্রদেশাদুত্তরে চ কলিঙ্গো বিশ্রুত ভুবি। তত্রাজাং ভীমকেশস্ত সর্ব্ব-লোকেষু বিশ্রুতম্॥"

** H. H. Wilson, in *Bishnupurana.*

‖ "The mention of Macco-Kalingae and Gangrides Kalingae by Plini, would seem to show that the 'Three Kalingas were known as early as the time of Megasthenes from whom Pliny has chiefly copied his *Indian Geography.*"—A. Cunningham, *Ancient Geography of India,* Vol. I.

দেশে অবস্থিত। প্রোক্ত 'মাল্লাস' পর্বতকে গঞ্জাম-প্রদেশস্থ 'মহেন্দ্র' পর্বত বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন-সাং যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন গঞ্জামের দক্ষিণ-পশ্চিমে চৌদ্দ শত হইতে পনের শত লি (দুই শত তেত্রিশ হইতে দুই শত পঁয়ত্রিশ মাইল) দূরে, তিনি কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার উচ্চারণে ঐ রাজধানী 'কিয়ে-লিং-কিয়া' (Kie-ling-kia) রূপে অভিহিত। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—তিনি ওড্রদেশের রাজধানী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বার শত লি (দুই শত মাইল) অগ্রসর হইয়া 'কোং-য়ু-তো' (Kong-yu-to) নামক স্থানে উপনীত হন। তৎপরে তিনি 'কিয়ে-লিং-কিয়া' নগরে গমন করিয়াছিলেন। প্রতিপন্ন হয়,—তদ্বর্ণিত 'কোং-য়ু-তো' বর্তমান গঞ্জামের নামান্তর। পরিব্রাজক লিখিয়া গিয়াছেন, দুইটী সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে ঐ নগর বিদ্যমান ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাহা হইতে নির্দ্ধারণ করেন,—চিল্কা-হ্রদ এবং সমুদ্রের নিকটস্থিত গঞ্জাম নগরই পরিব্রাজক কর্তৃক 'কোং-য়ু-তো' নামে অভিহিত হইয়াছে। গঞ্জাম হইতেই তিনি কলিঙ্গ-দেশের রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন। জুলিয়েন কলিঙ্গকে 'কন্যাধ' (Kanyadha) রূপে উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনা ও তাঁহার লিখিত দূরত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কলিঙ্গ-রাজধানীর স্থান-নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াসী হইলে, দাক্ষিণাত্যের দুইটী জনপদের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়;—(১) গোদাবরী-নদী-তীরস্থিত রাজমহেন্দ্রী এবং (২) সমুদ্র-তীরস্থিত করিঙ্গ। প্রথমোক্ত স্থান (রাজমহেন্দ্রী) গঞ্জামের দুই শত একান্ন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং শেষোক্ত স্থান (করিঙ্গ) দুই শত ছয়চল্লিশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত; দুই স্থানের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হইলেও কানিংহাম রাজমহেন্দ্রীকেই পরিব্রাজক-পরিদৃষ্ট কলিঙ্গ-নগরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কলিঙ্গ-রাজ্যের আদি রাজধানী শ্রীকাকোল বা চিকাকোল (Srikakola or Chikakol) বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ নগর কলিঙ্গ-পত্তনের কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় কলিঙ্গ-রাজ্যের পরিধি পাঁচ হাজার লি (আট শত তেত্রিশ মাইল) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কানিংহাম তাহা হইতে নির্দ্ধারণ করেন,—'কলিঙ্গ-রাজ্যের পশ্চিমে যখন অন্ধ্র রাজ্য এবং কলিঙ্গ যখন ধানাকাকাতা রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত, তখন দক্ষিণ-পশ্চিমে কলিঙ্গ-রাজ্যের বিস্তৃতি গোদাবরী পর্য্যন্ত হওয়াই সম্ভবপর; এবং উত্তর-পশ্চিমে ইন্দ্রবতী নদীর গাওলিয়া নামক শাখা পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সীমানার মধ্যবর্তী স্থানের পরিধি-পরিমাণ আট শত মাইল হইতে পারে। সুতরাং হুয়েন-সাং-দৃষ্ট কলিঙ্গ-রাজ্য এই অংশকেই বুঝাইয়া থাকে।' হুয়েন-সাং কলিঙ্গ-রাজ্যের যে রাজধানী দেখিয়াছিলেন, সে রাজধানীর পরিধি—প্রায় পাঁচ মাইল ছিল। রাজমহেন্দ্রীতে কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী-প্রতিষ্ঠা অনেকে আধুনিক ঘটনা বলিয়া মনে করেন। ৫৪০ খৃষ্টাব্দে চৌলুক্য-বংশীয় রাজগণ কর্তৃক 'ভেঙ্গী' নামক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভেঙ্গীপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। বর্তমান রাজমহেন্দ্রীর পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ইলুরের (Ellur) পাঁচ মাইল উত্তরে, ভেগী (Vegi) নামক স্থানে, ভেঙ্গীপুর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ভেঙ্গী-রাজ্য এক সময়ে উড়িষ্যার

সীমান্ত-প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে ভেঙ্গীর রাজা কলিঙ্গ অধিকার করেন। তাহার অল্প দিন পরেই রাজমহেন্দ্রীতে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। খণ্ডগিরির রাজা ঐড় কর্ত্তৃক খণ্ডগিরিতে যে খোদিত-লিপি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কলিঙ্গ নাম তিন বার উল্লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ বলেন,—সেই লিপি খৃষ্ট-জন্মের দুই শত বৎসর (বা তাহারও অধিক) পূর্ব্বে, শাক্যমুনির জীবিতকালে, খোদিত হইয়াছিল। সেই শিলালিপি পাঠে জানা যায়,—কলিঙ্গ-রাজ্য এক সময়ে সুন্দর মসলিনের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধদেবের লোকান্তরের পর কলিঙ্গাধিপতি কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবের দন্ত আনীত হয়। সেই দন্তের উপর কলিঙ্গ-রাজ একটী সুদৃশ্য স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। তদনুসারে কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী এক সময়ে 'দন্তপুর' নামে পরিচিত হইয়াছিল। কানিংহাম বলেন,—বৌদ্ধ-ঐতিহাসিকগণের লিখিত 'দন্তগুল' নাম—দন্তপুর নামের অপভ্রংশ। কলিঙ্গ-বন্দরের ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বস্থিত রাজমহেন্দ্রী সেই দন্তপুর হওয়া সম্ভবপর। বুদ্ধ-দেবের দন্তের উপর স্তূপ নির্ম্মিত হওয়ায়, কলিঙ্গের রাজধানীর নাম 'দন্তপুর' হয়। পরবর্ত্তিকালে উহা রাজমহেন্দ্রী নামে অভিহিত হইয়াছিল। কিন্তু দন্তপুর বা রাজ-মহেন্দ্রীতে কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, সিংহপুর নামে কলিঙ্গ-প্রদেশের এক প্রাচীন রাজধানীর পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের মহাবংশ-গ্রন্থে প্রকাশ,—রাজা সিংহবাহু কর্ত্তৃক সিংহপুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সিংহবাহুর পুত্র বিজয় লঙ্কা-দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কেহ কেহ বলেন,—তাঁহারই নামানুসারে লঙ্কা সিংহল এবং তদপভ্রংশে 'সিলোন' (Ceylon) নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহা হউক, সিংহবাহুর রাজধানী সিংহপুর এখন বিলুপ্তপ্রায়। গঞ্জামের পশ্চিমে, এক শত পনের মাইল দূরে, লাগুলা নদীর তীরে, সিংহপুর নামক এক প্রাচীন-নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রত্ন-তত্ত্ববিদগণ বলেন,—ঐ সিংহপুরই রাজা সিংহবাহুর রাজধানী ছিল।

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারি যুগেই যে কলিঙ্গ রাজ্যের পরিচয় পাই, এখন সে কলিঙ্গ-রাজ্যের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গ নামক দেশের অস্তিত্ব এখনও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; সে নাম এখনও লোপ পায় নাই। কিন্তু কলিঙ্গের অস্তিত্বও নাই; কলিঙ্গ নামক কোনও জনপদও এখন আর নির্দ্দিষ্ট হয় না। তবে কলিঙ্গ যে এক সময়ে ত্রিকলিঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ ত্রিকলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ (তেলিঙ্গন) মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে কলিঙ্গ-রাজ্য এক সময়ে বঙ্গ-দেশকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, যে কলিঙ্গের অঙ্গে ওড্রদেশ এক সময়ে অঙ্গ মিশাইয়া ছিল, যে কলিঙ্গ এক সময়ে দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছিল,—এখন একমাত্র তৈলঙ্গ নামেই সেই কলিঙ্গের স্মৃতি পর্য্যবসিত হইয়া আছে। কলিঙ্গের মধ্যে গঙ্গার ব-দ্বীপ ছিল; আধুনিক মান্দ্রাজের অধিকাংশ স্থান কলিঙ্গের মধ্যে পরিগণিত হইত; এমন কি, আরাকান পর্য্যন্তও এক সময়ে কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। রাজমহেন্দ্রী, কলিঙ্গপত্তন, বিশাখপত্তন প্রভৃতি নগর এবং মহেন্দ্র-পর্ব্বতের পার্শ্বস্থিত ভূভাগ পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ-রাজ্য বলিয়া পরিচিত হয়।

উপসংহার।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—:○:—

দাক্ষিণাত্যের জনপদ-সমূহ।

[প্রাচীন দাক্ষিণাত্য,—রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যের উল্লেখ,—শাস্ত্রে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র, কেরল, চোল, কলিঙ্গ, পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট প্রভৃতি জনপদের পরিচয়,—দাক্ষিণাত্যের সভ্যতার প্রাচীনত্ব ;—অন্ধ্র-রাজ্য,—অন্ধ্র-রাজ্যের অবস্থিতির পরিচয়—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বর্ণনায় অন্ধ্র-রাজ্যের নামোল্লেখ,—অন্ধ্র ও মহাঅন্ধ্র ;—চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য,— ঐ দুই রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ও সীমা-পরিমাণের পরিচয় ; দ্রাবিড়-রাজ্য,—দ্রাবিড়-রাজ্যের বিস্তৃতি,—দ্রাবিড় ও তামিল,—দ্রাবিড়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অভ্যুদয় ;—কেরল, চেরা ও কঙ্গণ-রাজ্য,—কেরলে, ব্রাহ্মণোপনিবেশ প্রতিষ্ঠা,—কেরল-রাজ্যের পরিণতি ;—হুয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট কেরল-রাজ্য,—মলয় বা মলয়কুট-রাজ্য,—কেরলের বিবিধ পরিচয় ;—মহারাষ্ট্র-রাজ্য,—মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা;—হুয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট মহারাষ্ট্র,—রাজধানী দেবগিরি ও কল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনা ;—কর্ণাট-রাজ্য ;—কচ্ছ, মালব, গুর্জ্জর প্রভৃতি অন্যান্য জনপদ।]

প্রাচীন দাক্ষিণাত্য।

সাধারণতঃ শুনিতে পাই,—দাক্ষিণাত্য অধুনিক জনপদ। দাক্ষিণাত্যে সে দিন মাত্র আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছে। কেবল জনপ্রবাদ নহে ; আধুনিক ইতিহাস-সমূহেও অনেক সময় এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। দাক্ষিণাত্যে অনার্য্য অসভ্য জাতির বাস ; দাক্ষিণাত্যবাসীরা অসভ্য বর্ব্বর ; এমন কি, সে দিনও পর্য্যন্ত তাহারা অসভ্য ছিল ;—ইহাই ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত। সাধারণের মনে এরূপ ধারণা স্থান পাইলেও এ ধারণা যে ভ্রমসঙ্কুল, নানারূপে তাহা প্রতিপন্ন হয়। শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাভিমুখে গমন—দাক্ষিণাত্যে আর্য্যগণের প্রথম পদার্পণ বলিয়াও মনে করা যায় না। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে আমরা কলিঙ্গ-রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। হিসাব মত, কলিঙ্গ দাক্ষিণাত্যেরই জনপদ। কিন্তু কলিঙ্গ যে কত প্রাচীন রাজ্য, তাহার আভাস সহজেই পাওয়া যাইবে। তার পর, দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্য, কেরল, চোল, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন জনপদের পরিচয় পাই, তৎসমুদায় কত কাল পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। যযাতি-পুত্র তুর্ব্বসুর অধস্তন দশম পর্য্যায়ে পাণ্ড্য, কেরল, কোল, চোল প্রভৃতির নাম দৃষ্ট।* বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম অন্ধ্র,—ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে। যদি পাণ্ড্য, কেরল, চোল, অন্ধ্র প্রভৃতির নাম অনুসারে দাক্ষিণাত্যের জনপদ সমূহের নামকরণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল জনপদ কত প্রাচীন সহজেই প্রতীত হয় না কি? যযাতির অধস্তন ত্রয়োবিংশ পর্য্যায়ে বলি-পুত্র অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বিদ্যমান। তাঁহাদের মধ্যে অঙ্গের নামানুসারে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই অঙ্গ-রাজ্যের রাজা, অঙ্গের বংশধর রোমপাদ, রাজা দশরথের সখা ছিলেন। তাহা হইলে অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য দশরথের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই হিসাবে পর্য্যায় আলোচনা করিয়া, পাণ্ড্য, কেরল, চোল প্রভৃতি রাজ্যের সময় নির্দ্দেশ করিতে হইলে, সেই সকল রাজ্য অতি

---

* পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠায় চন্দ্র-বংশের বংশ-লতা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গাদি রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই সপ্রমাণ হয়। কারণ, তুর্ব্বসুর অধস্তন দশম পর্য্যায়ে পাণ্ড্য প্রভৃতি অবস্থিত এবং তুর্ব্বসুর ভ্রাতা পুরুর অধস্তন দ্বাবিংশ পর্য্যায়ে অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বিদ্যমান। কেবল বংশ-পর্য্যায় আলোচনায় যে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাও নহে; পরন্তু রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের আলোচনায়ও ঐ সকল রাজ্যের প্রাচীনত্ব-তত্ত্ব বিশদীকৃত হইতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে দাক্ষিণাত্যের নৃপতিগণ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহারা দশরথের মিত্ররাজ বলিয়া গণ্য হইতেন। পুত্র-লাভের নিমিত্ত রাজা দশরথ অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ বিভিন্ন-দেশীয় নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিবার ভার প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে তিনি সুমন্ত্রকে বলিয়াছিলেন,—"দাক্ষিণাত্যান্ নরেন্দ্রাংশ্চ সমস্তানানয়স্ব হ।" * অর্থাৎ—দাক্ষিণাত্যের সমস্ত নৃপতিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিবে। তবেই বুঝা যাইতেছে, দশরথের বহু মিত্র-রাজ এ সময়ে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন। তার পর, শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে কৈকেয়ী প্রতিবাদিনী হইলে, দশরথ যে সকল মিত্র-রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেও দক্ষিণাপথের নাম দেখিতে পাই। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাভিমুখে গমনের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে যে বিশিষ্ট জনপদ-সমূহ বিদ্যমান ছিল এবং তত্রত্য রাজগণ গণনীয় আসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। হইতে পারে, অনেকানেক স্থান বন-জঙ্গলপূর্ণ ছিল; হইতে পারে, অনেকানেক প্রদেশে অসভ্য জাতি বাস করিত; কিন্তু তাহা হইলেও দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরাদি যুগেও সুসভ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। সীতার স্বয়ম্বর-কালে, দাক্ষিণাত্যের ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ স্বয়ম্বর-সভায় আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও কেহ ধনুর্ভঙ্গে পারগ হইলে, রাজর্ষি জনক তাঁহার হস্তে কন্যা সীতা-দেবীকে সম্প্রদান করিতে সম্মত ছিলেন। রামায়ণে এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে, দাক্ষিণাত্যকে কখনই অসভ্য বর্ব্বর দেশ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণ-পরম্পরায় দাক্ষিণাত্যের যে সকল জনপদের নাম উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে দ্রাবিড়, কোশল, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, তৈলঙ্গ, গুর্জ্জর, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র, পাণ্ড্য, কেরল, চোল প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। রামায়ণের মতে—মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌষিক, অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল কেরল প্রভৃতি দাক্ষিণ-দেশীয় জনপদ বলিয়া বিখ্যাত। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—

"কার্ণাটকাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ। আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চবিন্ধ্যাদাক্ষিণবাসিনঃ॥"

অর্থাৎ—বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুর্জ্জর, অন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ অবস্থিত। মৎস্য-পুরাণেও পাণ্ড্য, কেরল, চোল প্রভৃতি দক্ষিণ-দেশীয় রাজ্যের উল্লেখ বিশেষ-ভাবে দৃষ্ট হয়। মহাভারতে, ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে, সঞ্জয় ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থিত জনপদ-সমূহের নামোল্লেখ করিয়াছেন, পূর্ব্বেই (এই গ্রন্থের ৬২শ-- ৬৩শ পৃষ্ঠায়) তাহা লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ, একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন সভ্যতা বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। সে হিসাবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, পৃথিবীর

* রামায়ণ, আদি-কাণ্ড, ত্রয়োদশ সর্গ, ২৮শ শ্লোক।

অন্যান্য দেশে সভ্যতা-স্রোত বিস্তৃত হইবার বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল।

চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং দক্ষিণ-ভারতের সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিঙ্গ হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে, আঠার শত বা উনিশ শত লি (তিন শত বা তিন শত সতের মাইল) অগ্রসর হইয়া তিনি 'কিয়াও-সা-লো' (Kiao-sa-lo) বা কোশল-রাজ্যে উপনীত হন। বলা বাহুল্য, এ কোশল—দক্ষিণ কোশল। এই কোশলের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।* এই কোশল হইতে দক্ষিণাভিমুখে নয় শত লি (এক শত পঞ্চাশ মাইল) অগ্রসর হইয়া তিনি 'অন্-তো-লো' (An-to-lo) বা অন্ধ্র-রাজ্যে উপনীত হন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—ঐ রাজ্যের পরিধি তিন সহস্র লি (প্রায় পাঁচ শত মাইল); উহার রাজধানীর নাম 'পিং-কি-লো' (Ping-ki-lo)। জুলিয়েন পিঙ্কিলো হইতে ভিঙ্খিলা (Vingkhila) নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পিঙ্কিলো বা ভিঙ্খিলা নামক কোনও জনপদের অস্তিত্ব এখন নির্দ্দেশ করা দুরূহ। কানিংহাম অন্ধ্ররাজকে আধুনিক তেলিঙ্গন রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সে হিসাবে, বর্ত্তমান 'ওরাঙ্গল' (Warangal) উহার রাজধানী হওয়া সম্ভবপর। আবুল-ফজেলের গ্রন্থে 'ভীমগল' নামক তেলিঙ্গনার একটী নগরের উল্লেখ আছে। ভীমগল—'ওরাঙ্গল' নাম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাই অনেকের অনুমান। তবে হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় পারিপার্শ্বিক নগর-সমূহের সহিত অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানীর দূরত্বের যে আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে কানিংহাম 'এল্‌গাণ্ডেল' (Elgandel) নামক একটী প্রাচীন জনপদকে হুয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কানিংহামের হিসাবে, উত্তরে গোদাবরী নদী, পশ্চিমে মহারাষ্ট্র-দেশ, দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ এবং পূর্ব্বে সমুদ্র,—এতৎসীমান্তবর্ত্তী স্থানে অন্ধ্ররাজ্য অবস্থিত ছিল। তিনি বলেন, গোদাবরী এবং তাহার শাখানদী মাঞ্জিরার সঙ্গমস্থল হইতে ভদ্রচেলম পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব্বে ঐ রাজ্যের বিস্তৃতি দুই শত পঞ্চাশ মাইল; সেই সঙ্গমস্থল হইতে দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ পর্য্যন্ত উহার বিস্তৃতি এক শত মাইল; এবং হায়দ্রাবাদ ও ভদ্রচেলমের মধ্যে উহার বিস্তৃতি এক শত পঁচাত্তর মাইল। এইরূপ অনুমান করিয়াই তিনি হুয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট অন্ধ্র-রাজ্যের স্থান-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্লিনির গ্রন্থে 'আণ্ডারে' (Andarae) নামক ভারতবর্ষের এক ক্ষমতাশালী জাতির উল্লেখ আছে। প্লিনি বলিয়া গিয়াছেন,—'ত্রিশটী সুদৃঢ় নগর ঐ জাতির অধিকারভুক্ত ছিল; তাহাদের এক লক্ষ পদাতি, দুই সহস্র অশ্বারোহী এবং এক সহস্র গজারোহী সৈন্য।' পূর্ব্ববর্ত্তিকালে যে অন্ধ্ররাজগণ মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে এক সময়ে যাঁহাদের একছত্র প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল; প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করেন, দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজগণ তাঁহাদেরই শাখা-বিশেষ। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-কালে প্রাচীন অন্ধ্ররাজ্য নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্ধ্ররাজ্যের দক্ষিণে মহা-অন্ধ্ররাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল; অন্ধ্ররাজ্যের পশ্চিমে মহারাষ্ট্রগণ মস্তক উত্তোলন

কোশল ও অন্ধ্র।

* এই গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ৯৮শ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন; অন্ধ্রগণ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন জনপদে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত অন্ধ্ররাজ্য হইতে হুয়েন-সাং দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন। প্রায় এক হাজার লি (এক শত সাতষট্টি মাইল) বন-জঙ্গল ও মরুভূমি অতিক্রম করিয়া, তিনি 'তো-না-কিয়ে-শে-কিয়া' ((To-na-kie-tse-kia) নামক স্থানে উপনীত হন। জুলিয়েন সেই স্থানের নাম 'ধা-নাক-চে-কা' (Dha-nak-che-ka) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কানিংহাম বলেন, উহাই অন্ধ্র-রাজ্যের দক্ষিণস্থিত 'ধানাকাকাতা' * রাজ্য। ঐ ধানাকাকাতা রাজ্যকে অন্ধ্র-রাজ্যের অপরাংশ বলিলেও বলা যায়। ঐ রাজ্যের পরিধি ছয় সহস্র লি বা এক সহস্র মাইল। ঐ রাজ্য 'তা-আন-তা-লো' (Ta-an-ta-lo) রাজ্য বা 'মহাঅন্ধ্র' রাজ্য নামেও অভিহিত হয়। ঐ রাজ্যের রাজধানী 'ধানাকাকাতা' নগরকে অনেকে এখন 'বেদওয়াদা' বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। কানিংহামের হিসাবে, যে সীমানার মধ্যে এক্ষণে তেলেগু ভাষা প্রচলিত, সেই দেশ পূর্ব্বে মহাঅন্ধ্র নামে পরিচিত ছিল। উহার উত্তরে অন্ধ্র এবং কলিঙ্গ রাজ্য, পূর্ব্বে সমুদ্র, দক্ষিণে ত্রিপতি ও পুলিকট্ হ্রদ এবং পশ্চিমে কুলবর্গ ও পেন্নাকোণ্ডা। হুয়েন-সাং যখন মহাঅন্ধ্র দেশে গমন করেন, তখন ঐ দেশের কোনও কোনও অংশ মরুভূমিতে পরিণত ছিল এবং কোনও কোনও অংশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। ঐ রাজ্যের নগরগুলি তাদৃশ জন-কোলাহলপূর্ণ ছিল না। দেশের অধিবাসিগণ হরিদ্রাভ কৃষ্ণবর্ণ; তাহারা দুর্দ্ধর্ষ; তাহারা বিদ্যানুরাগী; কিন্তু সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব এ সময়ে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। নব্বইটী মাত্র বৌদ্ধ-মঠে অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করিতেন; আর অধিকাংশ মঠই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অন্য দিকে, শতসংখ্যক দেবদেবীর মন্দিরে নগরের শোভা-সম্বর্দ্ধন করিয়াছিল; সহস্র সহস্র হিন্দু দেবদেবীর উপাসনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। নগরের পূর্ব্বাংশে ও পশ্চিমাংশে পূর্ব্বশিলা ও অপরশিলা নামক দুইটী বৃহৎ বৌদ্ধ-মঠ হুয়েন-সাং দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই দুইটী মঠ বুদ্ধদেবের সম্মানার্থ বহু ব্যয়ে অন্ধ্ররাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। অন্ধ্ররাজগণ ভারতে যখন একছত্র-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময় চতুর্ব্বিংশ-সংখ্যক নৃপতি সেই বংশে রাজত্ব করেন। তখন আর্য্যাবর্ত্তে, মগধে, দাক্ষিণাত্যে, প্রাতিষ্ঠান্ † ও ধানাকাকাতা নগরে, তাঁহাদের দুইটী রাজধানী ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করেন, সেই অন্ধ্ররাজগণ খৃষ্ট-জন্মের ৭১ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। তৎপরে শুঙ্গ-বংশীয় রাজগণ সে রাজ্য অধিকার করিয়া লন। পরিশেষে অন্ধ্রগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে আপনাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্ধ্র-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি সম্বন্ধে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন লিখিয়াছেন,—'অন্ধ্ররাজগণ মগধের

* ধানাকাকাতা অধুনা ধরণীকোট্টা (Dharanikotta) নামে পরিচিত। এম ভিভিয়েন ডি সেণ্ট-মার্টিন বলেন,—'দণ্ডক বা দণ্ডকারণ্য নামের অপভ্রংশে ধানাকাকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বরাহ-মিহিরের বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থে কেরল, কর্ণাট, কাঞ্চীপুর, কঙ্কণ, চীনাপত্তন (মাদ্রাজ) প্রভৃতি নামের সহিত দণ্ডক নামের উল্লেখ আছে। সুতরাং ধানাকাকাতা ও দণ্ডক অভিন্ন হইতে পারে।'

† প্রতিষ্ঠান্ বা পৈথান মহারাষ্ট্র-দেশের রাজধানী বলিয়া কথিত হয়। এই পরিচ্ছেদে মহারাষ্ট্র-প্রসঙ্গে তদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য।

অন্ধ্র রাজবংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া পরিচিত। হায়দ্রাবাদের আশী মাইল উত্তর-পূর্ব্বে যে ওরাঙ্গল সহর দৃষ্ট হয়, উহাই অন্ধ্ররাজগণের রাজধানী ছিল। মগধের অন্ধ্ররাজগণের সহিত দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজগণ সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন বলিয়া কথিত হইলেও, অন্ধ্র শব্দ পারিবারিক সংজ্ঞা নহে। উহা দেশ-বিশেষ। তেলিঙ্গনের মধ্যবর্ত্তী ভূ-ভাগ এক সময়ে অন্ধ্র নামে পরিচিত হইয়াছিল। অন্ধ্রদেশের অধিবাসিগণের প্রাচীন দলিল-পত্রে উল্লেখ আছে, বিক্রমাদিত্য এবং শালিবাহন অন্ধ্ররাজগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তিকালে চোল-রাজগণ অন্ধ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। ৫১৫ খৃষ্টাব্দে যবন-নামধেয় এক জাতি কর্তৃক চোল-রাজগণ পরাজিত হন। অন্ধ্রদেশ তখন সেই যবনগণের অধিকারভুক্ত হয়। সেই যবন-বংশের নয় জন নৃপতি চারি শত আঠান্ন বৎসর অন্ধ্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের শাসনকালের অবসান হয়। তখন গণপতি-বংশীয় রাজগণ অন্ধ্রদেশে রাজত্ব বিস্তার করেন। দলিল-পত্রে এইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিলেও সাধারণতঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গণপতি-রাজগণের অভ্যুদয়ের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। কাকতি * কর্তৃক ঐ বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহারই নামানুসারে গণপতি-বংশ 'কাকতি-বংশ' নামে অভিহিত হইত। কাকতি—চৌলুক্য-নৃপতিগণের একজন কর্ম্মচারী বা করদ-রাজা ছিলেন। বাহুবলে চোল-রাজগণের উপর তিনি আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। কাকতি-বংশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল। জনপ্রবাদ,—সেই সময়ে তাঁহারা গোদাবরী-নদীর দক্ষিণস্থিত সমগ্র উপদ্বীপ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। অধ্যাপক উইল্‌সন বলেন,—অক্ষাংশের ১৫°—১৮° ডিগ্রী পরিমিত স্থান ঐ সময়ে কাকতি-বংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে বাদসাহের সৈন্যদল আগমন করিয়া তাঁহাদের রাজধানী আক্রমণ করে। সেই সময় হইতেই প্রকারান্তরে কাকতি-বংশের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। এই ঘটনার পরবর্ত্তিকালে অন্ধ্রদেশ এক সময়ে উড়িষ্যার করদ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। পরিশেষে গোলকুণ্ডার মুসলমান-রাজ্যের মধ্যে অন্ধ্ররাজ্য বিলীন হইয়া যায়।

চোল ও পাণ্ডারাজ্য।

ধানাকাকাতা ও মহাঅন্ধ্র রাজ্য হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে সহস্র লি (এক শত সাতষট্টি মাইল) অগ্রসর হইয়া হুয়েন-সাং 'চু-লী-য়' (Chu-li-ye) বা কো-লী-য় (Ko-li-ye) রাজ্যে উপনীত হন। ঐ রাজ্যের পরিধি দুই হাজার লি বা চারি শত মাইল। পণ্ডিতগণ স্থির করেন,—উহাই চোল-রাজ্য। জুলিয়েন বলেন,—'চোলীয়' চোল-রাজ্য। চোল হইতে চোরমণ্ডল বা 'করমণ্ডল' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কানিংহাম নির্দ্ধারণ করেন, বর্ত্তমান তাঞ্জোর বিভাগ প্রাচীন চোল-রাজ্যের স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার মতে,—উত্তর-পশ্চিমে

---

* কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ই, বি, কাওয়েল (E. B. Cowell) এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের ইতিহাসের টীকায় লিখিয়াছেন,—'কথিত হয়, ওরাঙ্গল নগরী ১০৮৮ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে কাকতি কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।'

সালেম নগরের নিকটবর্ত্তী সাঙ্কেরি দুর্গ হইতে উত্তর-পূর্ব্বে কাবেরী বা কোল্‌রুণ নদীর মোহানা পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে দিন্দীগল হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে কালিমের অন্তরীপ (Point Calimere) পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত। শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে চোল-রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"দ্রাবিড়তৈলঙ্গয়োর্মধ্যে চোলদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ, দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গের মধ্যবর্ত্তী স্থান চোলদেশ নামে অভিহিত হয়। হুয়েন-সাং যখন এই চোলরাজ্য দর্শন করেন, তখন ঐ রাজ্য বিশৃঙ্খলাপূর্ণ; বসতি ছিন্ন-ভিন্ন; সৈন্যগণ লুণ্ঠন-পরায়ণ; জনসাধারণ ইন্দ্রিয়াসক্ত ও নৃশংস। চোল-রাজ্যের পার্শ্বেই পাণ্ড্য-রাজ্য অবস্থিত ছিল। হুয়েনসাঙের বর্ণনায় পাণ্ড্য-রাজ্যের উল্লেখ নাই। বোধ হয়, তখন পাণ্ড্য-রাজ্য পারিপার্শ্বিক রাজ্যসমূহের মধ্যে আপন অঙ্গ মিশাইয়া ছিল। পাণ্ড্য-রাজ্য ও চোল-রাজ্য একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিম্বদন্তী আছে। পৌরাণিক ইতিহাস ভিন্ন অন্যরূপেও ঐ দুই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয় প্রচারিত হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলেন,—'ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণে যে সকল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজ্য আছে, সেই সকল রাজ্যে 'তামিল' ভাষা প্রচলিত। পাণ্ড্য ও চোল রাজ্য সেই সকল রাজ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠান্বিত। পাণ্ড্য এবং চোল নামক দুই জন কৃষিজীবী কর্ত্তৃক পাণ্ড্য ও চোল রাজ্য প্রতিষ্ঠান্বিত হয়। পাণ্ড্যের নামানুসারেই পাণ্ড্য-রাজ্যের নামকরণ হইয়াছিল। তিনি কত কাল পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পাণ্ড্যবংশের বিদ্যমানতা বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। রোম-সম্রাট অগাষ্টাসের নিকট রাজা পাণ্ডীয়ন কর্ত্তৃক দূত প্রেরিত হইয়াছিল,—টলেমির গ্রন্থে এবং 'পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। * ঐ দুই গ্রন্থে পাণ্ডীয়নকে রাজা পাণ্ড্যের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পাণ্ড্য-বংশজ পাণ্ডীয়ন, 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে প্রকাশ, মালবর উপকূলের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অধিকার অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। পশ্চিম-ঘাট গিরিশ্রেণী সাধারণতঃ পাণ্ড্যরাজ্যের পশ্চিম সীমানা বলিয়া পরিচিত হয়। পাণ্ড্যরাজ্যের পরিমাণ অধিক দূর বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এখন দাক্ষিণাত্যের যে অংশ মাদুরা ও তিন্নেভেলী জেলা নামে অভিহিত হয়, তাহাই পুরাকালে পাণ্ড্য-রাজ্য বলিয়া গণ্য হইত। পাণ্ড্য-রাজ্যের রাজধানী দুই বার পরিবর্ত্তিত হয়। পরিশেষে মাদুরায় ঐ রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। টলেমির সময়েও মাদুরাতেই পাণ্ড্য-রাজ্যের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মাদুরা পাণ্ড্য-রাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইত। † পাণ্ড্য-বংশীয় রাজগণের সহিত পারিপার্শ্বিক চোলীয়-রাজগণের সর্ব্বদাই বিবাদ-বিসম্বাদ চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। অল্প দিন পরে সে সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছিল। অতঃপর কখনও ঐ দুই রাজ্য স্বাধীন, কখনও বা করদ-রাজ্য

---

* Starbo mentions an ambassador from King Pandion to Augustus; and this appears from the 'Periplus and Ptolemy to have been the hereditary appellation of the descendants of Pandya"—Elphnistone, *History of India*.

† পাণ্ড্য-রাজ্যের ও মাদুরার প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গ চতুর্থ পরিচ্ছেদে, ৭৫শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধ্যে পরিগণিত হয়। পরিশেষে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে, পাণ্ড্য ও চোল রাজ্য আর্কটের নবাবের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।' খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে চোলবংশীয় রাজগণ একবার বিশেষ প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময়ে পহ্লব-রাজগণের অধিকৃত কাঞ্চী-রাজ্য তাঁহারা অধিকার করিয়া লন; কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চৌলুক্য-রাজ্যে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন; দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্য ও চোল রাজ্য তাঁহাদের করায়ত্ত হয়। চোলবংশের রাজেন্দ্র চোল একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এরূপ প্রতিষ্ঠান্বিত হন যে, তখন বঙ্গদেশের ও মগধের রাজগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কর-দানে বাধ্য হইয়াছিলেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ চোল-রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কয়েকটী কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—তামিল ভাষাভাষী দেশ প্রকৃতপক্ষে চোল-রাজ্য নামে অভিহিত হয়। * মিঃ এলিস বিবেচনা করেন,—'খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে চোল-রাজ্যের সীমা-পরিমাণ বিস্তৃত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চোলরাজগণ কর্ণাট ও তেলিঙ্গনার অনেক অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। নন্দীদুর্গের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে গোদাবরী নদীর তীর পর্য্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল।' যাহা হউক, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে চোল-রাজগণের উন্নতির গতি অবরুদ্ধ হয়; তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইয়া আপনাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সীমানার মধ্যে অধিকার নিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। এই অবস্থায় তাঁহারা অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। কখনও তাঁহাদিগকে বিজয়নগরের রাজার করদরাজ-রূপে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল; আবার কখনও বা তাঁহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অবশেষে বিজাপুরের মুসলমান শাসনকর্ত্তার জনৈক ভূতপূর্ব্ব মহারাষ্ট্র-কর্ম্মচারী, চোল-বংশীয় শেষ নৃপতির সহিত মিলিত হন। তৎকর্তৃক তাঞ্জোর রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এ হিসাবে, চোল-রাজ্যের অবসানে তাঞ্জোর-রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়।

দ্রাবিড়-রাজ্য।

চোল-দেশের দক্ষিণে দ্রাবিড়-রাজ্য। হুয়েন-সাং 'তা-লো-পি-চা' (Ta-lo-pi-cha) রূপে উহার উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—'তা-লো-পি-চা' বা দ্রাবিড়-রাজ্যের পরিধি—ছয় হাজার লি (এক হাজার মাইল)। উহার রাজধানীর নাম—'কিয়েন-চি-পু-লো' (Kien-chi-pu-lo), অর্থাৎ কাঞ্চীপুর। কাঞ্চীপুরের পরিধি—ত্রিশ লি বা পাঁচ মাইল। বর্ত্তমান-কালে, 'পালার' নদীর তীরে, 'কঞ্জেভেরম' (Conjeveram) নামক যে নগরী দৃষ্ট হয়, তাহাই সেই দ্রাবিড়-রাজ্যের রাজধানী কাঞ্চী বা কাঞ্চীপুরের শেষ স্মৃতি। ঐ দ্রাবিড়-রাজ্যের উত্তরে কঙ্কণ ও ধানাকাকাতা, দক্ষিণে মালাকুতা (বা মাদুরা) রাজ্য প্রভৃতি বর্ণনা দৃষ্টে, কানিংহাম প্রাচীন দ্রাবিড়-রাজ্যের একটী সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—কুন্দপুর হইতে আরম্ভ করিয়া, 'কাদু' ও ত্রিপতির মধ্য দিয়া পুলিকট হ্রদ পর্য্যন্ত রেখা অঙ্কিত করিলে, দ্রাবিড় রাজ্যের পশ্চিম সীমানা নির্দ্ধারণ করা যাইতে

* তামিল-ভাষার আলোচনা-ব্যপদেশে কল্‌ডওয়েল সাহেব তামিল-ভাষা-ভাষী দেশকে দ্রাবিড় দেশ বা তামিল-দেশ সংজ্ঞা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। দ্রাবিড়ের বিষয় আলোচনায়ও সে কথা বলা যাইতে পারে।

পারে; কালিকট হইতে কাবেরী নদীর মোহানা পর্য্যন্ত অপর একটী রেখা টানিলে, উহার দক্ষিণ সীমানা নির্দ্ধারিত হয়। হুয়েন-সাং যখন কাঞ্চীপুরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন সেখানে বহু শত সঙ্ঘারাম বিদ্যমান ছিল; সেই সঙ্ঘারাম-সমূহে দশ সহস্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজক বাস করিতেন। হুয়েন-সাং কাঞ্চীপুর হইতে 'সেং-কিয়া-লো' (Seng-kia-lo) বা 'সিংহলে' যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে সিংহলে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার সিংহল যাওয়া হয় নাই। সিংহল হইতে তখন তিন শত বৌদ্ধ-ভিক্ষু কাঞ্চীপুরে আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ৬৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে বা তাহার সম-সময়ে হুয়েন-সাং কাঞ্চীপুরে উপনীত হইয়াছিলেন। সিংহলের রাজা 'গুণামুগালান' ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। সুতরাং রাজা গুণামুগালানের হত্যাকাণ্ডে সিংহলে অশান্তি-স্রোত প্রবাহিত হওয়ায়, হুয়েন-সাঙের সিংহল-যাত্রা রহিত হইয়াছিল। হুয়েন-সাং যদিও সিংহল-দ্বীপে গমন করেন নাই; কিন্তু বৌদ্ধ-ভিক্ষুদিগের মুখে সিংহলের বিবরণ শ্রবণ করিয়া আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-গ্রন্থে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সিংহলের রাক্ষস, সিংহলের মণি-মুক্তা প্রভৃতির প্রাচুর্য্য এবং দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত লঙ্কা-পর্ব্বতের কাহিনী—তিনি উপকথার ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—দ্রাবিড় দেশ উর্ব্বর; দ্রাবিড়ে যথারীতি চাষ-আবাদ হইয়া থাকে; দ্রাবিড়ের অধিবাসিগণ সাহসী, সত্যবাদী, সাধু-প্রকৃতি এবং বিদ্যানুরাগী; দ্রাবিড়বাসীরা মধ্য-ভারতের প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করে। দ্রাবিড়-দেশ বলিতে এক সময়ে দ্রাবিড়, কর্ণাট, গুর্জ্জর, অন্ধ্র, তৈলঙ্গ,—বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণস্থিত এই পঞ্চ-দেশকেই বুঝাইত। * অন্যত্র আবার তৈলঙ্গের পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্র-দেশকে পঞ্চ-দ্রাবিড়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। † দ্রাবিড়-দেশকে সাধারণতঃ তামিল-দেশ বলিয়া থাকে। এই দেশে তামিল ভাষা প্রচলিত। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বাংশে, প্রায় সমস্ত জনপদে, এক সময়ে তামিল ভাষা প্রচলিত ছিল। সে হিসাবে, তামিল-ভাষাভাষী সমস্ত দেশ দ্রাবিড় দেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং কলিঙ্গ, অন্ধ্র, চোল, কর্ণাট প্রভৃতি যে রাজ্যই যখন প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছে, দ্রাবিড়ের নাম তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। কখনও তাই দ্রাবিড়-রাজ্যের রাজধানী কাঞ্চীপুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কখনও তাই রাজমহেন্দ্রীতে দ্রাবিড়ের রাজধানী দেখিতে পাইয়াছি। যেমন বঙ্গদেশে এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তেমনই দ্রাবিড়-দেশেও সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অভ্যুদয়ের নিদর্শন বিদ্যমান। ইতিবৃত্তের আলোচনায় তাহাই আমরা বুঝিতে পারি।

---

* স্কন্দপুরাণে আছে,—"কার্ণাটিকাশ্চৈব তৈলঙ্গা.গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ.বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥"

† বিশ্বকোষোদ্ধৃত বজ্রসূচী উপনিষদে,—"আন্ধ্রাঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জ্জরাদ্রাবিড়াস্তথা।
মহারাষ্ট্রা ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে দ্রাবিড়া স্মৃতাঃ॥"

প্রাচীন কেরল দেশ বলিতে মালব, কানাড়া, ও কঙ্কণ প্রভৃতিকে বুঝাইয়া থাকে। ঐ দেশের উৎপত্তি-সম্বন্ধে পুরাণে লিখিত আছে,—পরশুরাম সমুদ্র হইতে ঐ দেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক ঐ দেশে ব্রাহ্মণদিগের বসতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আধুনিক ইতিবৃত্তে প্রকাশ,—খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর-কেরলের জনৈক রাজপুত্র হিন্দুস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া, কেরল-রাজ্যে তাঁহাদিগকে উপনিবিষ্ট করিয়াছিলেন। মালবার এবং কানাড়ার ব্রাহ্মণগণ উত্তর-ভারতের পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত আপনাদের সম্বন্ধ-সূত্রের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। সে জন্য আধুনিক পণ্ডিতগণ কেরল-রাজ্যে ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠা বিষয়ক শেষোক্ত সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করেন। কেরল-দেশ এক সময়ে সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণগণের রাজ্য ছিল। ব্রাহ্মণগণ ঐ রাজ্যকে চতুঃষষ্টি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। অনেকটা সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালীর অনুসরণে সে রাজ্য শাসিত হইত। এক জন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ঐ রাজ্যের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইলেও, প্রতি তিন বৎসর অন্তর সেইরূপ শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইবার ব্যবস্থা ছিল; এবং চারি জন সদস্যের মতানুসারে তাঁহাকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। আবশ্যক অনুসারে শাসনকর্ত্তৃগণ এক এক জন সর্দ্দারের উপর যুদ্ধকার্য্যের ভার অর্পণ করিতেন। অনেক সময় পাণ্ড্য-বংশীয় রাজগণ দেশরক্ষা কার্য্যে তাঁহাদের সহায় হইতেন। কঙ্কণ-প্রদেশ কখনও কখনও কেরলের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কখনও বা উহা কেরল হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কেরল-রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন কেরল-রাজ্যের দক্ষিণাংশ মালবার-প্রদেশ তত্রত্য রাজপুত্রের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। রাজপুত্র মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; জনসাধারণ তাই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বিদ্রোহের ফলে মালবার-প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। পর্ত্তুগাল-দেশীয় নাবিক 'ভাস্কো ডি গামা' যে জামোরিণ রাজ-বংশের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কালিকটের সেই জামোরিণ-রাজ-বংশ—বিচ্ছিন্ন কেরল-রাজ্যের অংশেই তখন প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-কেরল যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, জামোরিণ রাজবংশের ইতিহাসে তাহা উপলব্ধি হয়। কেরলের উত্তরাংশ কানাড়া —দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। অবশেষে ঐ রাজ্য বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। কেরলের কতকাংশ বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের মধ্যেও মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। কেরল-রাজ্যের কিয়দংশ এক সময়ে চেরা-রাজ্য নামে পরিচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর, মালবারের কিয়দংশ এবং কৈম্বাটুর,—সেই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া কথিত হয়। এক দিকে পাণ্ড্য-রাজ্য, অন্য দিকে পশ্চিম-সমুদ্র,—এতন্মধ্যে চেরা-রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। টলেমির গ্রন্থে চেরার নামোল্লেখ আছে। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চেরা রাজ্যের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। এক সময়ে চেরা রাজ্য কর্ণাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চেরা রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং

কেরল, চেরা ও কঙ্কণ-রাজ্য।

পারিপার্শ্বিক দেশসমূহে উহার অস্তিত্ব মিশিয়া যায়। কঙ্কণ কখনও কেরলের মধ্যে, কখনও চেরার মধ্যে, কখনও বা স্বতন্ত্রভাবে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া ছিল। মহারাষ্ট্রগণ কর্তৃক কঙ্কণ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়,—ইহাই অনেকের সিদ্ধান্ত।

হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় কেরল-দেশের নামোল্লেখ নাই। কাঞ্চীপুর হইতে দক্ষিণাভিমুখে তিন হাজার লি (বা পাচ শত মাইল) গমন করিয়া, হুয়েন-সাং 'মো-লো-কিউ-চা' (Mo-lo-kiu-cha) নামক স্থানে উপনীত হন। হুয়েন-সাঙের জীবন-বৃত্তান্ত লেখক এম জুলিয়েন উহাকে মালাকুতা বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—ঐ রাজ্যের দক্ষিণাংশে 'মো-লো-য়া' (Mo-lo-ya) অর্থাৎ মলয় পর্ব্বত; সেই পর্ব্বতে অজস্র চন্দনকাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। তাঁহার এবম্বিধ বর্ণনা পাঠ করিলে, উপদ্বীপের দক্ষিণ-সীমান্তস্থিত 'মালবর' প্রদেশকেই মনে পড়ে। ঐ প্রদেশ এখনও 'মলয়ালম্' (Malayalam) এবং 'মলয়বর' (Malaywar) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরিব্রাজক 'মলয়কূট' নাম শ্রবণ করিয়া বোধ হয় 'মো-লো-কিউ-চা' রূপে উহার উচ্চারণ করিয়া থাকিবেন। মলয়কূট-রাজ্যের পরিধি পাঁচ হাজার লি বা আট শত তেত্রিশ মাইল। উহার দক্ষিণে সমুদ্র এবং উত্তরে দ্রাবিড়-রাজ্য। উল্লিখিত পরিমাণ-ফল অনুসারে হুয়েন-সাং-কথিত 'মো-লো-কিউ-চা' রাজ্যের স্থান-নির্দ্দেশ করিতে হইলে, কাবেরী-নদীর দক্ষিণস্থিত প্রদেশকেই মলয়কূট রাজ্য বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বাংশস্থিত তাঞ্জোর ও মাদুরা এবং পশ্চিমাংশস্থিত বৈম্বাটুর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া বুঝা যায়।* হুয়েন-সাং কথিত ঐ রাজ্যের রাজধানী সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত দৃষ্ট হয়। হয় 'মাদুরা,' না হয় 'কোলাম' উহার রাজধানী ছিল বলিয়া মনে হইতে পারে। আবুরিহাণ মালয় ও কুটাল (Malya and Kutal) নামক দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উভয় প্রদেশই ভারতবর্ষের সর্ব্ব-দক্ষিণাংশে অবস্থিত। প্রথমোক্তটী শেষোক্ত বিভাগের দক্ষিণ অংশে বিদ্যমান। ঐ দুই বিভাগ বোধ হয় এক সময়ে একত্র হইয়া মলয়কূট নাম পরিগ্রহ করিয়াছিল। কানিংহাম বলেন,—'মলয়. পাণ্ড্য-রাজ্যের অংশ ছিল; উহার রাজধানীর নাম মাদুরা। কুট বা কুটাল ত্রিবাঙ্কুরকে বুঝাইয়া থাকে; উহার রাজধানীর নাম—কোচিন।' টলেমি উহাকে 'কোটিয়ারা' (Kottiara) বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই মলয়কূট হইতে পরিব্রাজক দ্রাবিড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে দুই হাজার লি (প্রায় তিন শত তেত্রিশ মাইল) অগ্রসর হইয়া তিনি 'কং-কিয়েন-না-পু-লো' (Kong-kien-na-pu-lo) নামক স্থানে উপনীত হন। জুলিয়েন উহাকে কঙ্কণপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কঙ্কণপুরই—কঙ্কণ নামে পরিচিত। কঙ্কণের প্রাচীন রাজধানী অন্নগুন্দী (Annagundi) নামে কথিত হয়। তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তর তীরে ঐ নগরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। অন্নগুন্দী—যাদবগণের রাজধানী

হুয়েন-সাং প্রভৃতির বিবরণ।

---

* ডাক্তার বার্ণেল (Dr. Burnell) কাবেরী নদীর ব-দ্বীপকে মলয়কূট বা মালাকুতা রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ছিল বলিয়া কিংবদন্তী শুনা যায়। নদীর দক্ষিণ তীরে বিজয়নগর নামক নূতন নগর স্থাপিত হওয়ায় অনগুন্দী এখন ধ্বংসপথে অগ্রসর হইয়াছে। সপ্তম শতাব্দীতে কঙ্কণে চৌলুক্য-বংশীয় মহারাষ্ট্রগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন পশ্চিম-ঘাট পর্য্যন্ত কঙ্কণের সীমানা বিস্তৃত হওয়া সম্ভবপর। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার হ্যামিল্টন বলেন,—কঙ্কণ-দেশের অধিবাসিগণ আপনাদের দেশকে কোকন (Kokan) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। দক্ষিণ-ভারত হইতে সিন্ধু-নদের মোহানা অভিমুখে অগ্রসর হইলে পথিমধ্যে 'কোকন্দে' (Kocondae) নামক এক সম্প্রদায়ের অধিবাসীর বিষয় প্লিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহারাই কি কঙ্কণের আদিম অধিবাসি?—কেহ কেহ এরূপ সংশয়-প্রশ্নও তুলিয়া থাকেন। মলয়কূট এবং কঙ্কণের অধিবাসিগণের বিষয় হুয়েন-সাং অল্প-বিস্তর আভাষ দিয়া গিয়াছেন। মলয়কূটের অধিবাসিগণের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—তাহারা কৃষ্ণবর্ণ, দৃঢ় এবং প্রচণ্ড। তাহারা বিদ্যাচর্চ্চায় অমনোযোগী; কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ উৎসাহশীল। কঙ্কণের অধিবাসী সম্বন্ধে পরিব্রাজকের মত,—'তাহারা কৃষ্ণবর্ণ, উগ্রস্বভাব; কিন্তু বিদ্যানুরাগী।' হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রতীত হয়,—মলয়কূট রাজ্যের দক্ষিণে প্রসিদ্ধ মলয়-পর্ব্বত (মালবার-ঘাট গিরিশ্রেণীর দক্ষিণাংশ)। সেখানে প্রচুর চন্দন-কাষ্ঠ এবং কর্পূর উৎপন্ন হয়। এই গিরিশ্রেণীর পূর্ব্বভাগে পোতালক পর্ব্বত (Mount Potalaka)। তিব্বতে, চীনে এবং জাপানে আজিও যে অবলোকিতেশ্বরের উপাসনা হইয়া থাকে, এই গিরিশৃঙ্গে বুদ্ধদেবের আত্মা মহিমান্বিত সেই অবলোকিতেশ্বর কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। যাহা হউক, প্রাচীন কেরল-রাজ্য হইতেই যে মলয়কূট, কঙ্কণ প্রভৃতি জনপদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

দাক্ষিণাত্যের অপর এক প্রসিদ্ধ জনপদ—মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রের বিষয় শাস্ত্র-গ্রন্থে নানা স্থানে লিখিত আছে। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে মহারাষ্ট্র দক্ষিণ-দেশীয় জনপদ বলিয়া অভিহিত।

মহারাষ্ট্র-রাজ্য।

কোনও কোনও পুরাণে 'রাষ্ট্রবাসিনঃ' শব্দ দৃষ্ট হয়। উহা 'সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসীদিগকে বুঝাইয়া থাকে,—টীকাকারগণ এইরূপ অর্থ করেন। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-কালে মহারাষ্ট্র প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল। হুয়েন-সাং কঙ্কণ হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে চল্লিশ শত বা পঁচিশ শত লি (চারি শত মাইলেরও উপর) অগ্রসর হইয়া মহারাষ্ট্র দেশে উপনীত হন। তাঁহার উচ্চারণে ঐ রাজ্য—'মো-হো-লা-চা' (Mo-ho-la-cha) নামে উচ্চারিত হইয়াছে। কঙ্কণ হইতে মহারাষ্ট্র দেশে গমন করিবার পথ বড়ই দুর্গম বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উল্লিখিত। ঐ পথ নিবিড় অরণ্যানী সঙ্কুল এবং দস্যু ও বন্যজন্তু পরিপূর্ণ। তাঁহার বর্ণনায় মহারাষ্ট্র দেশের পরিধি ছয় হাজার লি (এক হাজার মাইল) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ রাজ্যের রাজধানীর পরিধি ত্রিশ লি অর্থাৎ পাঁচ মাইল। রাজধানীর পশ্চিম পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ নদী প্রবহমানা। হুয়েন-সাং প্রদত্ত বর্ণনার অনুসরণে কানিংহাম মহারাষ্ট্র রাজ্যের একটী সীমানা নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার মতে, উত্তরে মালব, পূর্ব্বে অন্ধ্র ও কোশল, দক্ষিণে কঙ্কণ এবং পশ্চিমে সমুদ্র,—এতৎসীমান্তর্বর্ত্তী জনপদ মহারাষ্ট্র রাজ্য হওয়া সম্ভবপর। তবে হুয়েন-সাং

মহারাষ্ট্র-দেশের যে রাজধানীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, সেই রাজধানীর অবস্থান সম্বন্ধে কানিংহাম বড়ই সংশয়াপন্ন হইয়াছিলেন। কানিংহাম বলেন,—হুয়েন-সাঙের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, গোদাবরী-তীরস্থিত 'পৈথান' বা 'প্রতিষ্ঠান' (Paithan or Pratishthana) নগর সপ্তম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র-দেশের রাজধানী ছিল। টলেমির গ্রন্থে 'বৈথান' (Biathna) এবং 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে 'প্লিথান' (Plithana) নামক নগরীর উল্লেখ আছে। ঐ দুই নাম যে 'পৈথান' তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পারিপার্শ্বিক স্থান (বরোচ) হইতে রাজধানীর যে দূরত্ব লিখিত হইয়াছে, তাহাতে হুয়েন-সাং-কথিত রাজধানীকে 'পৈথান' বলিয়া মনে করা যায় না। এম ভিভিয়েন-ডি-সেণ্ট মার্টিন বলেন,—'দেবগিরি-নগর হুয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট মহারাষ্ট্র-দেশের রাজধানী হওয়া সম্ভবপর।' কিন্তু দেবগিরি কোনও নদীর তীরে অবস্থিত নহে এবং বরোচ হইতে উহার দূরত্বের পরিমাণ হুয়েন-সাঙের বর্ণনার সহিত মিলে না। সুতরাং কল্যাণী নগরী হুয়েন-সাং-কথিত মহারাষ্ট্র-দেশের রাজধানী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঐ নগরীতে চৌলুক্যগণের প্রাচীন রাজধানী ছিল। নগরীর পশ্চিম সীমান্তে কৈলাস নামক নদী প্রবহমানা। নগরীর পার্শ্বে ঐ নদীর বিস্তৃতি অনেক অধিক। অন্নগুন্দী ও বরোচ হইতে দূরত্বের হিসাবে কল্যাণীকে হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট মহারাষ্ট্র-দেশের রাজধানী বলা যাইতে পারে। কল্যাণ বা কল্যাণী নাম অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেশে বিদেশে পরিচিত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'কল্লিয়েনা' (Kalliena) নামক স্থানে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকগণের আড্ডা ছিল, 'কসমস ইণ্ডিকো প্লেয়াষ্টেস্' নামক গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ-মতে, 'কল্লিয়েনা' (Kalliena) দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। 'কেনাড়ীর' গিরিগুহার খোদিত-লিপিতে কল্যাণ নাম দৃষ্ট হয়। সেই খোদিত-লিপি খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ব হইতে কল্যাণ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। হুয়েন সাং সম্ভবতঃ কল্যাণকেই মহারাষ্ট্র-দেশের রাজধানী-রূপে উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—'মহারাষ্ট্র-দেশের ভূমি উর্ব্বর; সে প্রদেশে যথারীতি চাষ-আবাদ হইয়া থাকে। অধিবাসিগণ সৎপ্রকৃতি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। উপকারীর প্রতি তাহারা চিরকৃতজ্ঞ; কিন্তু শত্রুর প্রতি তাহারা বড়ই নির্ম্মম। কাহারও নিকট অপমানিত হইলে, তাহারা প্রতিশোধ-গ্রহণে প্রাণদান করিতেও কুণ্ঠিত নহে। যদি কেহ বিপদে পড়িয়া তাহাদের সাহায্য-প্রার্থী হয়, তাহারা আপনা ভুলিয়া সাহায্য-কল্পে অগ্রসর হইয়া থাকে। শত্রুর উপর প্রতিহিংসা লইতে হইলে, মহারাষ্ট্রগণ প্রথমে শত্রুকে সতর্ক করিয়া দেয়। পরিশেষে, শত্রু সশস্ত্র সুসজ্জিত হইলে, তাহাকে আক্রমণ করে। তাহাদের কোনও সেনাপতি যদি যুদ্ধে পরাজিত হন, তাহারা তাঁহার প্রতি অপর কোনরূপ দণ্ডবিধান করে না; কেবল তাঁহাকে স্ত্রীলোকের বেশভূষা পরিধান করিতে দেয়, এবং তাহাতেই সেই সেনাপতি মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া আত্মত্যাগ করেন।' হুয়েন-সাং যখন মহারাষ্ট্র-দেশে গমন করিয়াছিলেন, তখন পুলিকেশি নামক জনৈক ক্ষত্রিয় নৃপতি মহারাষ্ট্র দেশে রাজত্ব করিতেন। সেই রাজার কীর্ত্তিকলাপ অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার প্রজাবর্গ

সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত। সেই সময়ে কনোজের অধিপতি শিলাদিত্য পারিপার্শ্বিক সমস্ত প্রদেশে আপনার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। শিলাদিত্য ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট যোদ্ধৃগণকে আনিয়া আপন সৈন্যদলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন; স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সৈন্য পরিচালনায় ব্রতী হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি মহারাষ্ট্র দেশ অধিকার করিতে পারেন নাই। অধিক কি, রাজা পুলিকেশিকে পরাজিত করা দূরে থাকুক, শিলাদিত্যই তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন; মহারাষ্ট্রদিগের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালেও মহারাষ্ট্র জাতি অশেষ বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। পুলিকেশির উত্তরাধিকারিগণ সহস্র বৎসর পরে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয়েও পুলিকেশির দেশবাসী মহারাষ্ট্রগণ আপনাদের প্রাধান্য রক্ষায় যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, আজিও অনেকে তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। হুয়েন-সাং মহারাষ্ট্র রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে গিরি-গহ্বরে বৌদ্ধবিহার প্রভৃতি দর্শন করিয়াছিলেন। তদ্বর্ণিত বৌদ্ধ বিহার ইলোরার গিরিগুহা বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। *

মহারাষ্ট্র-সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তব্য।

মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনায় ঐতিহাসিকগণ প্রায়ই সমস্যায় পড়িয়া আছেন। মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাস প্রণেতা গ্রাণ্ট ডাফ † বলেন,—'অন্যান্য প্রাচীন জাতির ইতিহাসের ন্যায় মহারাষ্ট্র জাতির প্রাচীন ইতিহাসও অন্ধকারাচ্ছন্ন।' মুসলমানগণ কর্তৃক মহারাষ্ট্র দেশ অধিকার হওয়ার পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশে দুই তিন বার রাজ্য-বিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণ সমূহে দৃষ্ট হয়, কাবেরী এবং গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ দণ্ডকারণ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রাবণ যখন সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর, সেই সময় তাঁহার গীত-বাদ্যকারগণকে তিনি ঐ অরণ্য দান করিয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে প্রচার,—মহারাষ্ট্র দেশের আদিম অধিবাসী—'গুরসী' (Goorsee); তাহারা নীচবংশীয়; কিন্তু গীতবাদ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল। ঐতিহাসিকগণ মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত 'টগর' (Tagar) নামক এক নগরের বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন। কথিত হয়, সেই টগর মহারাষ্ট্র দেশের রাজধানী ছিল। খৃষ্ট জন্মের আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে মিশর-দেশীয় বণিকগণ ঐ নগরে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থেও ঐ নগরের বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। সেই গ্রন্থে প্রকাশ,—গ্রীকগণ ঐ নগরকে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান বলিয়া জানিতেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রশাসন প্রভৃতিতে ঐ 'টগর' নগরের প্রাধান্যের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ নগর 'শীলার বংশীয়' কোনও রাজপুত রাজার রাজধানী ছিল;

---

* ইলোরার ও অজন্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, ৪৬৮ম—৪৭১ম পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দুগণের প্রাচীন কারুকার্য্যের উপর বৌদ্ধগণের শিল্পচাতুর্য্য ঐ সকল স্থানে বিদ্যমান আছে।

† *History of the Mahrattas* by James Grant Duff.

এবং তিনি পারিপার্শ্বিক বহু রাজাকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। * 'টগর' নগরের অস্তিত্ব এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—বর্ত্তমান 'বীর-নগরের' (Beer-nagar) উত্তর-পূর্ব্বে, গোদাবরী নদীর তীরে, টগর নগর বিদ্যমান ছিল। টগর নগরের প্রতিষ্ঠাতা রাজগণ কত দিন টগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার কোনও নিদর্শন নাই। তবে খৃষ্টীয় ৭৭-৭৮ অব্দে শালিবাহন ঐ রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। প্রচার এই,—শালিবাহন কৃষক-বংশে (মতান্তরে কুম্ভকার-বংশে) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু দেশ মধ্যে সাধারণতঃ তিনি মহাদেবের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। শালিবাহন টগর হইতে প্রতিষ্ঠানে (পৈথানে) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেই হইতে টগর নগরী ক্রমশঃ ধ্বংসপথে অগ্রসর হয়। দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের প্রতিষ্ঠান্ বা পৈথান নগর এক সময়ে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে দাক্ষিণাত্য 'দাচানাবাদেশ' (Dachanabades) রূপে, প্রতিষ্ঠান্ প্লিথান (Plithana) রূপে এবং বরোচ 'বারিগাজা' (Barygaza) রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। † পৈথান বা প্রতিষ্ঠান অধুনা গোদাবরী নদী-তীরস্থিত মুঙ্গী-পত্তন (Mungy Pyeten) নামক স্থানে চিহ্নিত হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠানে রাজ্য-স্থাপন করিয়া শালিবাহন বহু দূর পর্য্যন্ত আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। মালবের অধিপতি বিক্রমাদিত্য তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, এরূপ উক্তিও শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ আবার বলেন, 'শালিবাহন কর্ত্তৃক বিক্রমাদিতের রাজ্য আক্রান্ত হইলে, শালিবাহনের ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; সেই সন্ধি-সর্ত্তে শালিবাহন নর্ম্মদা-নদীর উত্তর-তীরস্থিত প্রদেশে এবং বিক্রমজিৎ নর্ম্মদার দক্ষিণ-তীরস্থিত প্রদেশে আধিপত্য-লাভ করিয়াছিলেন।' অনেকে কিন্তু এ ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ, বিক্রমাদিত্য খৃষ্ট-জন্মের সাতান্ন বৎসর পূর্ব্বে এবং শালিবাহন খৃষ্ট-জন্মের সাতাত্তর বৎসর পরে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। ‡ এ হিসাবে, উভয়ের রাজ্যপ্রাপ্তি-কালের ব্যবধান—এক শত পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম নহে। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বিরোধের ও সন্ধিস্থাপনের কিংবদন্তী প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয় না। শালিবাহনের রাজত্বের পর, অনেক দিন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র-দেশের রাজগণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর

* একাদশ শতাব্দীতে বোম্বাই নগরীর সন্নিকটস্থ কল্যাণের নৃপতিগণ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে কোলাপুরের নিকটস্থ পার্ণালের রাজগণ, টগর-নগরের 'শিলার'-বংশীয় রাজগণের সহিত আপনাদের সম্বন্ধের পরিচয় প্রদান করিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন।—*Vide* Elphinstone, *History of India.*

† The following are the words of the *Periplus* :—"Of those in Dachanabades itself, two very distinguished marts attract notice, lying twenty days' journey to the south from Barygaza. About ten days' journey towards the east from this is the other, Tagara a very great city. (Goods) are brought down frnm them on carts, and over very great ascents, to Barygaza; from Plithana many onyx-stones and frcm Tagar ordinary linen etc,"—*Vide* Elphinstone's *History* of *India*, Book IV. Note.

‡ শালিবাহনের ও বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন-প্রাপ্তির দিন হইতে দুইটী অব্দ প্রচলিত হয়। বিক্রমাদিত্যের অব্দ সম্বৎ নামে এবং শালিবাহনের অব্দ শকাব্দ নামে চলিয়া আসিতেছে।

প্রারম্ভে যাদব-বংশীয় রাজগণ 'দেওগড়' (Deogurh) বা 'দেবগিরিতে' নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কোনও কোনও পাণ্ডুলিপিতে শালিবাহন হইতে আরম্ভ করিয়া যাদব রামদেব রায় * পর্য্যন্ত রাজগণের রাজত্বকাল লিখিত আছে। তদনুসারে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে, মুসলমানগণ যখন মহারাষ্ট্র দেশ আক্রমণ করেন, যাদব রামদেব তখন দেবগিরিতে রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রামদেব মুসলমানদিগের করদ-রাজ মধ্যে গণ্য হন। ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্ত্তিকালে মহারাষ্ট্র-জাতি পুনরায় যে ভাবে মস্তকোত্তোলন করিয়াছিল, আধুনিক ইতিহাসে তাহা জাজ্জ্বল্যমান হইয়া আছে। মহারাষ্ট্র-ভাষাভাষী জনপদ এখন মহারাষ্ট্র-দেশ নামে পরিচিত।

কর্ণাট-রাজ্য।

কর্ণাট—দাক্ষিণাত্যের আর এক প্রাচীন রাজ্য। গরুড়পুরাণে কর্ণাট ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় দক্ষিণ-ভারতের যে সকল জনপদের নাম উল্লেখ করিতেছেন, তন্মধ্যে কর্ণাট নাম দৃষ্ট হয়। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে অবন্তী, দাসপুর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত কর্ণাট নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহৎসংহিতায় দক্ষিণ-দেশীয় জনপদ মধ্যে কর্ণাটের নাম দেখিতে পাই। † শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে কর্ণাটের সীমার বিষয় লিখিত আছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—রামনাথ হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন পর্য্যন্ত কর্ণাট-দেশ বিস্তৃত ছিল। গ্রাণ্ট ডাফ প্রণীত মহারাষ্ট্র-জাতির ইতিহাস-গ্রন্থে দাক্ষিণাত্য পাঁচটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া লিখিত আছে। সেই পঞ্চ বিভাগের নাম—দ্রাবিড়, কার্ণাটিক, অন্ধ্র বা তেলিঙ্গন, গণ্ডোয়ানা এবং মহারাষ্ট্র। † তন্মধ্যে প্রাচীন কার্ণাটিকের অবস্থিতির বিষয় তিনি লিখিয়াছেন,—মালব এবং করমণ্ডল উপকূলের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা-প্রদেশে প্রাচীন কর্ণাট-রাজ্য। পূর্ব্বঘাট এবং পশ্চিমঘাট গিরিশ্রেণী কর্ণাট রাজ্যের পশ্চিম সীমানা বলিয়া কথিত হয়। কর্ণাটের উত্তরে মাঞ্জিরা নদী; ঐ নদীকে কর্ণাটিক রাজ্যের একটী কোণ-স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। সেই কোণের পশ্চিম সীমায় মহারাষ্ট্র-রাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমানায় তেলিঙ্গন-রাজ্য। কর্ণাট-প্রদেশে কৃষ্ণ-কার্পাস উৎপন্ন হয়। শব্দশাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেন,—সেই জন্যই উহা কর্ণাট বা কৃষ্ণ-প্রদেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কর্ণাট-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংগ্রহ হওয়া দুরূহ। তবে পাণ্ড্য-বংশীয়গণ, চৌলুক্য-বংশীয়গণ, পল্লবগণ এবং কোলচুরিগণ সময় সময় কর্ণাট-দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ণাটের প্রসিদ্ধ রাজবংশের নাম—'বেলাল' বা বল্লাল-বংশ। তাঁহারা যদুবংশীয় রাজপুত বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিতেন। এই বল্লাল-বংশ এক সময়ে সমস্ত কর্ণাট-প্রদেশে আধিপত্য

* বার্ণুফ (Burnouf) ভাগবতপুরাণের স্থচনায় লিখিয়াছেন,—দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেবের সমসাময়িক।

† "There are five principal divisions, named Drawed, Carnatic, Andur or Teliganá, Gondwaneth, and Maharashtra"—Grant Duff, *History of the Mahrattas*.

বিস্তার করিয়াছিলেন; মালব, তামিল এবং তেলিঙ্গনার অংশ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১৩১০-১৩১১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ কর্ণাট অধিকার করেন। বল্লাল-বংশ মহীশূর-রাজবংশের আদিভূত। কর্ণাট-প্রদেশ মুসলমান রাজগণের অধিকার-ভুক্ত হইলে, বল্লাল-বংশীয় রাজগণ ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করেন। বল্লাল-বংশীয় কোন্ নৃপতি বিজয়নগরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন,—তাঁহার নাম বুক্কা রায়; কেহ বলেন—তাঁহার নাম হরিহর। আবার কেহ কেহ বলেন,—বুক্কা রায় এবং হরিহর উভয়ে একযোগে বিজয়নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মাধব বিদ্যানন্দ নামক জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সাহায্যে ঐ রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসনে বুক্কা রায়ের নাম দৃষ্ট হয়। তাহাতে জানা যায়, মাধবের অপর নাম—সায়ণ। সায়ণ—বেদাদি শাস্ত্রগণের টীকাকার; তিনি বুক্কা রায়ের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। দুই শত বৎসরের অধিক কাল বিজয়নগর সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল। পারিপার্শ্বিক মুসলমান রাজগণের সহিত বিজয়-নগরের নৃপতিগণ সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তখন বিজয়নগরের রাজার সৈন্য মধ্যে মুসলমান সৈনিক নিযুক্ত হইত; আবার মুসলমান 'বামনী' রাজগণ রাজপুত-সৈন্য পোষণ করিতেন। কয়েক শতাব্দী মিত্রভাবে অবস্থিতির পর, আমেদনগর, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার মুসলমান নৃপতিগণ * বিজয়নগরের হিন্দু-রাজার বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত হন। ফলে, ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে, কৃষ্ণা নদীর তীরস্থিত তেলিকোতা নামক স্থানে হিন্দু-মুসলমানে সঙ্কুল সমর উপস্থিত হয়। বিজয়নগরের নৃপতি স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে মুসলমানগণের হস্তে তাঁহাকে বন্দী হইতে হয়। মুসলমানগণ অতি নৃশংসরূপে রাজার মস্তক ছেদন করেন। বিজয়নগরের রাজার সেই ছিন্ন-মস্তক বিজাপুরের তোরণদ্বারে কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমানগণ আপনাদের বিজয়-চিহ্নরূপে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। বিজয়নগর মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইলে, বিজয়নগরের রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রগিরি-নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই চন্দ্রগিরির রাজ-বংশের জনৈক বংশধর ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে (বিজয়-নগর ধ্বংসের এক শতাব্দী মধ্যে) ইংরেজদিগকে 'ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ' (মাদ্রাজ) প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—বিজয়-নগরের রাজবংশ হইতেই মহীশূর-রাজ্যের উৎপত্তি হয়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহীশূরের যদুবংশীয় নৃপতিগণ বিজয়-নগরের করদরাজ মধ্যে গণ্য ছিলেন। বিজয়নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, মহীশূর স্বাধীনতা অবলম্বন করে। তখন শ্রীরঙ্গপত্তনে মহীশূরের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য-সমূহ সেই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন রাজবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তখন কিছুকাল মহীশূর-রাজ্য অন্তর্বিপ্লবে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে মুসলমানগণ মহীশূর-রাজ্যের শৃঙ্খলা-সাধনে যত্নপর হন। রাজ-বংশের দূর-সম্পর্কিত কৃষ্ণরায় নামক এক ব্যক্তি তখন মহীশূরের সিংহাসন লাভ করেন।

* বামনী-রাজ্য এই সময়ে আমেদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল।

কৃষ্ণরায় ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহীশূরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি অকর্ম্মণ্য বিধায় তাঁহার মন্ত্রী নন্দরাজ মহীশূরের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে হায়দর আলি নামক জনৈক মুসলমান যুবক মহীশূর-রাজ্যের সেনাপতির পদ লাভ করেন। এই যুবক তীক্ষবুদ্ধিশালী এবং কর্ম্মঠ ছিলেন। হায়দর আলি ক্রমশঃ এতই পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন যে, বৃদ্ধ রাজা তৎকর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। হায়দার মহীশূরের সুলতান বলিয়া আপনাকে পরিচিত করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণানদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ হায়দারের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। হায়দারের রাজ্যবৃদ্ধি-লিপ্সা বলবতী হওয়ায়, হায়দারের সহিত মহারাষ্ট্রগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই উপলক্ষে ইংরেজগণের*সহিতও হায়দারের যুদ্ধ বাধিয়া যায়। দ্বিতীয় মহীশূর-যুদ্ধের পরিণামে, হায়দারের অধঃপতনে, দাক্ষিণাত্যে ইংরেজের একচ্ছত্র অধিকার বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

কচ্ছ—দাক্ষিণাত্যের অন্যতম জনপদ। কখনও কখনও উহা পশ্চিম-প্রান্তস্থিত জনপদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। হুয়েন-সাং কচ্ছ-প্রদেশের নাম 'ও-তিয়েন-পো-চি-লো' (O-tien-po-chi-lo) রূপে উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। জুলিয়েন উহা হইতে 'অধ্যাভকিল' বা 'আত্যাবকেল' (Adhyavakila or Atyanvakela) নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কানিংহাম উহা হইতে 'ঔদম্বতীর' বা 'ঔদম্বর' শব্দ নিষ্পন্ন করেন। কচ্ছদেশ ঔদম্বর নামে কেন অভিহিত হইয়াছিল, অধ্যাপক লাসেন তৎসম্বন্ধে একটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কচ্ছের অধিবাসিগণ ঐ নামে অভিহিত হইত। তাই হুয়েন-সাং ঐরূপ-ভাবে দেশের নাম উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। প্লিনির গ্রন্থেও 'ওদম্বরী' (Odomborae) নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধুনা কচ্ছদেশে ঐ নামের কোনও চিহ্নই বিদ্যমান নাই। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় কচ্ছদেশের পরিধি পাঁচ হাজার লি (আট শত তেত্রিশ মাইল) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে আবু-পর্ব্বতের সন্নিহিত উমারকোট পর্য্যন্ত কচ্ছ-রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং কচ্ছ-উপসাগরের উত্তরস্থিত নগরপার্কার জেলা পর্য্যন্ত কচ্ছের সীমানায় মধ্যে পরিগণিত হইত। হুয়েন-সাঙের উচ্চারণে কচ্ছদেশের রাজধানীর নাম 'কিয়ে-সি-শী-ফা-লো' (Kie-tsi-shi-fa-lo) রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সিন্ধুদেশের রাজধানী হইতে এক হাজার ছয় শত লি (দুই শত সাতষট্টি মাইল) দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ঐ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কচ্ছের রাজধানী তখন পাঁচ মাইল পরিধিযুক্ত ছিল। হুয়েন-সাং ঐ নগরের যে নাম প্রদান করিয়াছেন, এম জুলিয়েন তাহা হইতে খাজীশ্বর (Khajiswara) এবং অধ্যাপক লাসেন 'কচ্ছেশ্বর' (Kachheswara) নাম সিদ্ধ করেন। কানিংহাম বলেন,—উহা কোটীশ্বর; কচ্ছের পশ্চিমোপকূলে কোটীশ্বর নামে যে তীর্থস্থান বিদ্যমান, তাহাই উক্তরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকিবে। কোটীশ্বর নগরের মধ্যভাগে একটী প্রসিদ্ধ শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। কানিংহাম বলেন, সেই শিবমন্দিরের পার্শ্বে কোটী শিবলিঙ্গের অবস্থিতি হেতু ঐ স্থান কোটীশ্বর নামে অভিহিত। * এম ভিভিয়েন ডি' সেণ্ট মার্টিন বলেন,—হুয়েন-সাঙ্-উচ্চারিত

* "The name of the place is derived from *Koti*+*Iswara*, or the 'ten million Iswaras',

কচ্ছ-দেশের রাজধানী করাচী বন্দর হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু আলোর হইতে ঐ রাজধানীর যে দূরত্বের বিষয় হুয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে করাচী তখন কচ্ছের রাজধানী ছিল মনে হয় না। হুয়েন-সাং কচ্ছ-দেশকে নিম্ন ও আর্দ্র দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ঐ দেশের ভূমি লবণময় বলিয়াও তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ। দেশ জল-কর্দ্দমময়, এইজন্য উহার নাম কচ্ছ। জলাভূমিতে এবং লবণময় মরুভূমিতে ঐ প্রদেশের অর্দ্ধেক পরিমাণ স্থান পরিপূর্ণ। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-কালে এই জনপদ মালব-রাজ্যের আধিপত্য স্বীকার করিত। কচ্ছের প্রাচীন রাজগণ 'শর্ম্মা' বা 'জাড়েজা' বংশ বলিয়া উক্ত হন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কচ্ছ মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়। পরিশেষে উহা ইংরেজ-রাজ্যের শাসনাধীনে আসিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের অপরাপর জনপদের মধ্যে সৌরাষ্ট্র, মালব, উজ্জয়িনী, গুর্জ্জর প্রভৃতির নামোল্লেখ দেখিতে পাই। কোনও কোনও গ্রন্থে ঐ সকল রাজ্য মধ্য-ভারতের ও পশ্চিম-ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উক্ত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান-কালে ঐ সকল জনপদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে। সৌরাষ্ট্র, উজ্জয়িনী, মালব প্রভৃতির প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হুয়েন-সাং কিরূপ অবস্থায় ঐ সকল স্থান দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারও আভাষ পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। বিক্রমাদিত্যাদি রাজচক্রবর্ত্তিগণ উজ্জয়িনী নগরে, পুলিকেশি প্রমুখ চৌলুক্য-নৃপতিগণ গুজরাট দেশে, আপনাদের যে কীর্ত্তি-স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, আজিও তাহা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের নাম বিশ্ববিশ্রুত। তিনি যেমন বীর ও স্বদেশ-প্রিয়, তেমনি ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক, সাহিত্যের উৎসাহদাতা এবং সদনুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে কালিদাস-প্রমুখ কবিগণ পরিপুষ্ট হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যকে অতুল রত্নালঙ্কারে সুশোভিত করেন। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলের নিকট তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন,—যেমন ফরাসী জাতির মধ্যে শার্লেমেন, ইংরেজের মধ্যে আলফ্রেড, বৌদ্ধগণের মধ্যে অশোক এবং মুসলমানগণের মধ্যে হারুণ অল্ রসিদ, হিন্দুর মধ্যে সেইরূপ বিক্রমাদিত্যের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া আছে। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল সম্বন্ধে অনেক মতান্তর দেখিতে পাই। বিক্রমাদিত্যের যশঃজ্যোতিঃতে বিমুগ্ধ হইয়া অনেক নৃপতি আপনাকে বিক্রমাদিত্য বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করিতেন; তাই তাঁহার শাসনকাল-নির্ণয়-বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ বলেন, তিনি ৫৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন; কেহ বলেন, তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তির স্মৃতি তৎপ্রবর্ত্তিত অব্দ দ্বারাই পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। বিক্রমাদিত্য 'যশোধর্ম্ম' নামেও পরিচিত হইয়া থাকেন। বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে ভারতবর্ষে উজ্জয়িনীর একছত্র প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। যে চৌলুক্য-বংশীয় রাজগণ কল্যাণে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া, মহারাষ্ট্র-দেশের মুখ উজ্জ্বল

and refers to the small *lingam* stones that are found there in great numbers."—A. Cunningham's *Ancient Geography of India*, Vol. I.

করিয়াছিলেন; পুলিকেশি সেই বংশে সুপ্রসিদ্ধ। ঐ বংশের চতুর্থ রাজা প্রথম পুলিকেশি সমগ্র দাক্ষিণাত্য করায়ত্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুলিকেশি (বংশের সপ্তম নৃপতি) বংশ-গৌরব-রক্ষায় পরাঙ্মুখ হন নাই। এই সকল নৃপতির প্রভাবে দাক্ষিণাত্যের রাজ্য গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যখন মগধের সিংহাসনে সমারূঢ়, দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল জনপদেই তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। অশোকের প্রচারিত ঘোষণা-লিপি-সমূহে অন্ধ্র, কেরল চোল, কলিঙ্গ, পাণ্ড্য, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে তাঁহার প্রাধান্য-বিস্তারের সমাচার বিজ্ঞাপিত রহিয়াছে। হুয়েনসাং দক্ষিণ-দেশীয় জনপদ বলিয়া যে সকল দেশের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাপ্তী এবং মহানদীর দক্ষিণস্থিত দেশকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার হিসাবে, পশ্চিমে নাসিক এবং পূর্ব্বে গঞ্জাম,—ইহাই দাক্ষিণাত্যের উত্তর সীমা। তিনি দাক্ষিণাত্যের নয়টী মাত্র জনপদের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধুনা দাক্ষিণাত্য বলিতে যে অংশকে বুঝাইয়া থাকে, এবং পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যে দাক্ষিণাত্যের পরিচয় পাই, আমরা ভারতবর্ষের সেই অংশকেই দাক্ষিণাত্য বলিয়া এতৎপ্রসঙ্গে গ্রহণ করিলাম।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ দাক্ষিণাত্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের প্রচলিত ভাষা অনুসারেও কোনও কোনও ঐতিহাসিক দাক্ষিণাত্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

দাক্ষিণাত্যের ভাষা।

দাক্ষিণাত্যে প্রধানতঃ পাঁচটী ভাষা প্রচলিত। প্রাচীনকালে সেই পাঁচটী ভাষা অনুসারে দাক্ষিণাত্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। দাক্ষিণাত্যের সেই পাঁচটী ভাষা,—(১) তামিল বা দ্রাবিড়, (২) কার্ণাটিক বা কেনারি, (৩) তেলিঙ্গন বা তেলেগু, (৪) মহারাষ্ট্র বা মারাটি, (৫) উৎকলীয় বা উড়িয়া। দ্রাবিড় বা তামিল ভাষা, দ্রাবিড় বা তামিল দেশে প্রচলিত। ভারতবর্ষের সর্ব্ব-দক্ষিণাংশ—দ্রাবিড় দেশ। মাদ্রাজের নিকটস্থ পুলিকট হইতে বাঙ্গালোরের সন্নিহিত পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বত-মালা পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া, সেই রেখা (পশ্চিম-ঘাট গিরিশ্রেণীর মালবর এবং কানাড়া পর্য্যন্ত বক্রভাবে বিস্তৃত করিয়া) সমুদ্র পর্য্যন্ত লইয়া গেলে, দক্ষিণাংশে যে জনপদ চিহ্নিত হয়, মালবর-সমন্বিত সেই জনপদে তামিল বা দ্রাবিড়ী ভাষা প্রচলিত। দ্রাবিড়ের উত্তরাংশে কর্ণাট-দেশ। তদ্দেশে কার্ণাটিক ভাষা প্রচলিত। ঐ দেশের পশ্চিম সীমায় সমুদ্র। পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া নগরী পর্য্যন্ত সেই সীমানা চিহ্নিত হয়। গোয়া হইতে পশ্চিমঘাট গিরিশ্রেণীর অনুসরণে, কোলাপুরের নিকটস্থিত দেশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে, কার্ণাটিক ভাষা প্রচলিত। যদি কোলাপুর হইতে বিদার পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করা যায়, তদ্দ্বারা কর্ণাটের উত্তর সীমা চিহ্নিত হইতে পারে। এদিকে আবার বিদার হইতে আদনি, অনন্তপুর এবং নন্দীদুর্গের মধ্য দিয়া পুলিকট এবং বাঙ্গালোরের মধ্যবর্ত্তী ঘাট পর্ব্বতের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করিলে, তদ্দ্বারা কার্ণাটিক-ভাষা-ভাষী দেশের পূর্ব্ব-সীমানা নির্দ্ধারিত হয়। কর্ণাট দেশের পূর্ব্ব সীমানা—তেলেগু-ভাষা-ভাষী তেলিঙ্গন দেশের পশ্চিম সীমানা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সেই রেখা বার্দ্ধা নদীর তীরস্থিত

চন্দা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। সেই চন্দা হইতে মহানদী তীরস্থিত শোণপুর পর্য্যন্ত রেখা অঙ্কিত করিলে, তেলেগু-ভাষা-ভাষী তেলিঙ্গন-দেশের উত্তর সীমানা নির্দ্দিষ্ট হয়। শোণপুর হইতে চিকাকোল পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া, সেই রেখা সমুদ্র তীর দিয়া পুলিকট পর্য্যন্ত (তামিল-ভাষা-প্রধান দেশের সীমা-রেখা পর্য্যন্ত) বিস্তৃত করিলে, তেলিঙ্গন-দেশের পূর্ব্ব-সীমানা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কর্ণাট এবং তেলিঙ্গন-দেশের, কার্ণাটিক এবং তেলেগু-ভাষা-ভাষী জনগণের, উত্তরাংশে মহারাষ্ট্র-দেশ; তথায় মহারাষ্ট্র ভাষা প্রচলিত। গোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, কোলাপুর ও বিদারের মধ্য দিয়া, চন্দা পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করিলে, তদ্দ্বারা মহারাষ্ট্র ভাষা-ভাষী জনগণ-অধ্যুষিত দেশের দক্ষিণ-সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। মহারাষ্ট্র-দেশের পূর্ব্ব-সীমা-রেখা বার্দ্ধা-নদী হইতে আরম্ভ করিয়া, নর্ম্মদা-নদীর দক্ষিণস্থিত সাতপুরা গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। পশ্চিমে নর্ম্মদা নদীর নিকটস্থিত নান্দোদ পর্য্যন্ত যে গিরিশ্রেণী বিদ্যমান, তদ্দ্বারা মহারাষ্ট্র-দেশের উত্তর সীমানা চিহ্নিত হয়। নান্দোদ হইতে দমন পর্য্যন্ত একটী রেখা টানিয়া সমুদ্রের ধারে ধারে গোয়া পর্য্যন্ত সেই রেখা বর্দ্ধিত করিলে, মহারাষ্ট্র-ভাষা-প্রধান দেশের পশ্চিম-সীমানা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। দক্ষিণে তেলিঙ্গন এবং পূর্ব্বে সমুদ্র,—উড়িয়া-ভাষা-প্রধান দেশের দুই দিকের দুই সীমানা। উহার পশ্চিম ও উত্তরের সীমানা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, শোণপুর হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর। দাক্ষিণাত্য-প্রচলিত এই পাঁচটী ভাষা মূলে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। এখন আবার ঐ সকল ভাষা হইতে অনেক উপভাষা ও মিশ্র-ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে এই সকল ভাষার সৃষ্টি-পরিপুষ্টি দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন সভ্যতার পূর্ণ-পরিচয় প্রদান করিতেছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা দাক্ষিণাত্যের সভ্যতাকে আধুনিক বলিয়া মনে করেন, দাক্ষিণাত্যের ভাষা প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া, তাঁহারাও খৃষ্ট-জন্মের বহু বর্ষ পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য সভ্য-সমাজে গণনীয় আসন লাভ করিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অধ্যাপক উইলসন, অনেক আলোচনার পর, তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—দাক্ষিণাত্যের সভ্যতা খৃষ্ট জন্মের দশ শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। * ডাক্তার কল্ডওয়েল বলেন,—উত্তর ভারত হইতে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই দাক্ষিণাত্যে সভ্যতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। † তিনি বলিয়াছেন,—দাক্ষিণাত্যে জনপ্রবাদ,—অগস্ত্য ঋষি দাক্ষিণাত্যবাসিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদাতা ছিলেন। কিন্তু অগস্ত্য ঋষির বিদ্যমানতা কোন্ সময়ে সম্ভবপর, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে, খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বা সাত শত বৎসর পূর্ব্বে অগস্ত্য ঋষির বিদ্যমানতা সম্ভবপর। তাই খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বা সাত শত বৎসর পূর্ব্বে দ্রাবিড়-দেশে সভ্যতা-লোক বিকশিত হইয়াছিল, অতি সঙ্কোচের সহিত তিনি এই মাত্র স্বীকার করিয়াছেন।

---

* "Professor Wilson surmises that the civilisation of the south may possibily be extended even to ten centuries before Christ."—Elphinstone, *History of India.*

† *Vide* Dr. Caldwell, *Dravidian Comparative Grammer.*

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীর-রাজ্য।

[রাজতরঙ্গিণী-মতে কাশ্মীরের প্রতিষ্ঠা, মাহাত্ম্য-তত্ত্ব ও অবস্থানাদির পরিচয়,—কাশ্মীর নামের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে বিতর্ক,—সাঙ্খ্যায়ন-ব্রাহ্মণোক্ত উত্তর-দেশ ;—কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত,—কাশ্মীর ও জম্বুর মহাভারতে তীর্থ-স্থান-রূপে উল্লেখ,—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে কাশ্মীর-রাজের পরাজয় স্বীকার,—জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বনে কাশ্মীর-রাজ গোনর্দ্দের মথুরা আক্রমণ—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে কাশ্মীর-রাজ্যের বিদ্যমানতা,—কাশ্মীরের দ্বি-পঞ্চাশৎ নৃপতির শাসনকাল ;—কাশ্মীরে বিভিন্ন-বংশীয় ১৫১ জন নৃপতির রাজত্ব-বিবরণ,—বিভিন্ন বংশ কাশ্মীরে আধিপত্য বিস্তারের পর মুসলমানগণের কাশ্মীর অধিকার ;—শিখ-যুদ্ধের পর কাশ্মীরের সহিত ইংরেজের সম্বন্ধ-সংশ্রব ;—হুয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট কাশ্মীর-রাজ্য,—কাশ্মীরের প্রাচীন নগর-জনপদ ও মন্দির প্রভৃতির বর্ত্তমান পরিচয়।]

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে কাশ্মীর আদি কাল হইতে সম্বন্ধ-যুক্ত। প্রজাপতি কশ্যপ কর্ত্তৃক কাশ্মীরের প্রতিষ্ঠা হয়, কাশ্মীর বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভ হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য। কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে কহ্লণ মিশ্র কাশ্মীরের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—'পূর্ব্বকালে কল্পের আরম্ভ হইতে ছয় মন্বন্তর পর্য্যন্ত হিমালয়ের কুক্ষিস্থিত ভূমি জলপূর্ণ হ্রদ রূপে অবস্থিত ছিল। অনন্তর এই বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রজাপতি কশ্যপ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র প্রভৃতি দেবগণকে প্রেরণ করতঃ তাহার অন্তঃস্থিত জলচরগণকে নিহত করিয়া কাশ্মীর নামে মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়াছেন।* কাশ্মীর অতি পবিত্র স্থান। নাগগণের অভিপ্রায়ানুসারে মহেশ্বর নীল ইহার রক্ষাকর্ত্তা। নীতি-সেবিত অলকার ন্যায় ইহা শঙ্খ-পদ্ম প্রভৃতি নাগগণের বসতি-স্থান। ইহাতে অগ্নি ভূ-গর্ত্ত হইতে স্বতঃ-প্রজ্বলিত হইয়া শিখাহস্তে হোতৃ-প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করেন; পাপসূদন তীর্থস্থিত উমাপতির কাষ্ঠময়ী মূর্ত্তি স্পর্শ করিলে স্বর্গ-অপবর্গ লাভ হয়; নন্দিক্ষেত্রস্থিত দেব-মন্দিরে ব্যোমচারিগণের অনুষ্ঠিত পূজার চিহ্ন চন্দন-বিন্দু অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; ভেড়-গিরি শিখরে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে; সেই পুণ্যশিখরস্থিত সরোবরে হংসরূপিণী সরস্বতী দেবী বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যাঁহার দর্শনে সদ্যঃ-কবিত্ব লাভ হয়, সেই সারদা-দেবী মধুমতী নদী-তীরে বিরাজিত আছেন। যাহার স্পর্শে পাপ নাশ ও পুণ্যের উৎপত্তি

কাশ্মীরের প্রতিষ্ঠা।

---

* 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে কাশ্মীর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

"পুরা সতীসরঃ কল্পারম্ভাৎ প্রভৃতি ভূরভূৎ। কুক্ষৌ হিমাদ্রেরর্ণোভিঃ পূর্ণা মন্বন্তরাণি ষট্॥
অথ বৈবস্বতীয়েঽস্মিন্ প্রাপ্তে মন্বন্তরে সুরান্। দ্রুহিণোপেন্দ্ররুদ্রাদীনবতার্য্য প্রজাসৃজা॥
কশ্যপেন তদন্তঃস্থং ঘাতয়িত্বা জলোদ্ভবম্। নির্ম্মমে তৎসরো ভূমৌ কাশ্মীরা ইতি মণ্ডলম্॥"

এই শ্লোকের 'জলোদ্ভব' শব্দে কেহ কেহ 'জলোদ্ভব' নামক অসুর অর্থ সিদ্ধ করেন। তাঁহাদের মতে, কাশ্মীর প্রদেশে পূর্ব্বে জলোদ্ভব নামক অসুরের বাস ছিল। কশ্যপ কর্ত্তৃক সেই অসুর নিহত হইলে, কাশ্মীর-পুরী প্রতিষ্ঠিত হয়।

হয়, সেই শৈলে অধিষ্ঠাত্রী সন্ধ্যাদেবী নিঃসলিল পর্ব্বতে বিরাজিতা রহিয়াছেন। মন্দিরে চক্রধর, বিজয়েশ্বর, কেশব ও ঈশান বিদ্যমান; সুতরাং ইহার সমুদায় স্থানই প্রায় তীর্থময়। কাশ্মীরের রমণীয়তাও তদনুরূপ। পশ্চাতে শৈল-প্রাকার; দেখিলে বোধ হয়, গরুড়-ভয়ে শরণাগত নাগগণের রক্ষার নিমিত্ত বাহু প্রসরণ করিয়া রহিয়াছে। গৌরী নদী বিতস্তা নাম ধারণ করিয়া মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। স্নান-গৃহ সকল শীতকালে উত্তাপযুক্ত। সূর্য্যকর গ্রীষ্মকালেও অতীব্র; বোধ হয়, সূর্য্য পিতৃগৌরবে এইরূপ অতীব্রভাবাপন্ন। নদীকুল নক্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু রহিত এবং বেগবাহিনী হইলেও তাহাদের তীরভূমি সর্ব্বদা অবিকৃত-ভাবে বর্ত্তমান। উচ্চ বিদ্যালয়, কুঙ্কুম, সতুষার বারি ও দ্রাক্ষা প্রভৃতি ত্রিদিব-দুর্লভ দ্রব্য অনায়াস-লভ্য। ইহা প্রবল শত্রুরও অজেয়; এজন্য অধিবাসিগণের পরলোক ভিন্ন অন্য ভয়ের কারণ নাই। ত্রিভুবন মধ্যে রত্ন-প্রসবিনী ভারত-ভূমি, ভারতের উত্তর দিক, উত্তর দিকে হিমালয়, এবং হিমালয়ে কাশ্মীর শ্লাঘনীয়।' * প্রজাপতি কশ্যপ সৃষ্টির আদিভূত। বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভে তাঁহা হইতেই সূর্য্যবংশের এবং চন্দ্র বংশের উদ্ভব হইয়াছিল। কশ্যপ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, ঐ রাজ্য 'কশ্যপ মীর' (অর্থাৎ কশ্যপ-প্রতিষ্ঠিত হিমালয়-পর্ব্বতের একটী দেশ) বা কাশ্মীর নাম পরিগ্রহ করিয়া আছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে কাশ্মীর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লিখিত হইলেও, মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণাদিতে কাশ্মীর নামের উল্লেখ দেখিতে পাই না। ইহাতে মনে হয় কাশ্মীর-দেশ যখন যে দেশের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া ছিল, তখন সেই দেশের নামেই পরিচিত হইয়াছে। তক্ষক কর্ত্তৃক তক্ষশীলা প্রতিষ্ঠার পরিচয় পূর্ব্বেই আমরা প্রদান করিয়াছি। কাশ্মীর এক সময়ে তক্ষক-রাজের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। "কাশ্মীরেষেব নাগস্য ভবনং তক্ষকস্য চ"—মহাভারতের এতদুক্তিতে 'কাশ্মীর তক্ষক-নাগের ভবন' বলিয়া পরিচিত ছিল, বুঝিতে পারি। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমন-কালে যেমন বঙ্গদেশের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না, অথচ বঙ্গদেশ তখন বিদ্যমান ছিল, মধ্যবর্ত্তিকালের কাশ্মীর সম্বন্ধে সেই কথা বলা যাইতে পারে। কাশ্মীর এক সময়ে সরস্বতী বা সারদা দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। কাশ্মীরে সতী-অঙ্গ পতিত হয় বলিয়া উহার শারদাপীঠ সংজ্ঞা হইয়াছিল। এতদ্দ্বারাও মধ্যবর্ত্তিকালে কাশ্মীর-নামের লোপ-প্রাপ্তির বিষয় উপলব্ধি হয়। পুরাকালে উত্তর দিকে ভাষাশিক্ষার জন্য—শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যপদেশে, অনেকে গমন করিতেন। সাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণের উক্তিতে এবং অন্যান্য প্রমাণ-পরম্পরায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেই উত্তর-দিক কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। সাঙ্খ্যায়ন-ব্রাহ্মণের উক্তি এবং বিনায়ক ভট্ট-প্রমুখ পণ্ডিতগণের ভাষ্য এতদুক্তির সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছে। এ সম্বন্ধে সাঙ্খ্যায়ন-ব্রাহ্মণে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রজানাৎ। বাগ বৈ পথ্যাস্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাং দিশি
প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যান্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত
আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।"

---

* রাজতরঙ্গিণী, প্রথম তরঙ্গ, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ।

এতৎসম্বন্ধে বিনায়ক ভট্টের ভাষ্য,—

"প্রজ্ঞাতত্ত্বয়া বাগুস্তে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্তে। বদরিকাশ্রমে
বেদঘোষঃ শ্রূয়তে। বাচং শিক্ষিতুং সরস্বতী প্রসাদার্থং উদক্ষে।"

সরস্বতী, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি উত্তরস্থিত প্রদেশ শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। কাশ্মীর কি নামে পরিচিত ছিল, উহাতে আভাষ পাওয়া যায়।

মহাভারতে এবং হরিবংশে কাশ্মীর রাজ্যের বিষয় বহু স্থানে উল্লেখ আছে। মহাভারতে, বনপর্ব্বে, কাশ্মীর-দেশে বিতস্তা নামে খ্যাত সর্ব্ব-পাপ-প্রমোচন তীর্থের বিষয় লিখিত হইয়াছে। সেই তীর্থে তক্ষক নাগের আলয়। তীর্থে স্নান করিলে, বাজপেয়-যজ্ঞের পুণ্যলাভ এবং সর্ব্ব পাপের শান্তি হইয়া থাকে।* কাশ্মীরের অন্তর্গত জম্বু সে সময়ে তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইত। জম্বু সম্বন্ধে বনপর্ব্বে লিখিত আছে,—'দেব, ঋষি ও পিতৃগণ সেবিত জম্বু-মার্গে গমন করিয়া মনুষ্য অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল ও সমস্ত কাম্য ফল লাভ করিয়া থাকে। তথায় পঞ্চ রজনী অধিবসতি করিলে, মানুষ পূতাত্মা হয়, উত্তম সিদ্ধি লাভ করে, দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।' † যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকালে অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। সে সময়ে কাশ্মীর-দেশীয় নৃপতি অর্জ্জুনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। ‡ মগধ-রাজ জরাসন্ধ যখন মথুরা আক্রমণ করেন, সে সময়ে কাশ্মীর-রাজ গোনর্দ্দ, জরাসন্ধের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, হরিবংশের একাধিক স্থানে এতৎ-প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ দেশের কোন্ কোন্ নৃপতি জরাসন্ধের অনুগামী হইয়াছিলেন, হরিবংশে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে,—'যে সকল মহেষ্বাস মহাবীর্য্য রাজা জরাসন্ধের প্রতাপে পরাজিত হইয়া তাঁহার নিকট অবনত ছিলেন, এবং যাঁহারা তদীয় মিত্র, জ্ঞাতি, সুহৃদ ও সহকারী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই জরাসন্ধের প্রিয় কামনায় সমুদিত সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া, তাঁহার অনুগামী হইলেন। করূষ-দেশাধিপতি দন্তবক্র, বীর্য্যবান্ চেদিরাজ, বলশালী প্রবল কলিঙ্গাধিপতি ও পৌণ্ড্রক, কৈষিক, সাঙ্কৃতি, নরাধিপ ভীষ্মক, যিনি মহারণে বাসুদেব অর্জ্জুনকে স্পর্দ্ধা করিতেন, সেই ধানুষ্ক-মুখ ভীষ্মক-নন্দন রুক্মী, বেণুদারি, শ্রুতষ্ঠা, ক্রাথ, অংশুমান, বলবান অঙ্গরাজ ও বঙ্গাধিপ, কোশলরাজ ও কাশিরাজ, দশার্ণ-দেশীয় ভূপতি, বিক্রান্ত সুহ্মেশ্বর, বিদেহরাজ, বলবান মদ্ররাজ, ত্রিগর্ত্ত-দেশের অধিপতি, বিক্রম-শালী শাল্বরাজ, মহাবল দরদ, যবনগণের অধিপতি, বীর্য্যবান ভগদত্ত, সৌবীর-রাজ শৈব্য, বলিপ্রবর পাণ্ড্য, গান্ধার-রাজ সুবল, মহাবল নগ্নজিৎ, কাশ্মীর-রাজ-গোনর্দ্দ, দরদ-দেশীয় মহীপতি এবং ধৃতরাষ্ট্র-

কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত।

---

* মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৮২ম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"কাশ্মীরেষ্বেব নাগস্য ভবনং তক্ষকস্য চ। বিতস্তাখ্যমিতিখ্যাতং সর্ব্বপাপ-প্রমোচনম্॥
তত্র স্নাত্বা নর নূনং বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিম্॥

† মহাভারত, বনপর্ব্বে, ৮২ম অধ্যায়ের অন্যত্র জম্বু-প্রসঙ্গে দৃষ্ট হয় ;—

"জম্বুমার্গং সমাবিশ্য দেবর্ষি পিতৃ সেবিতম্। অশ্বমেধমবাপ্নোতি সর্ব্বকামসমন্বিত॥
তত্রোষ্য রজনীঃ পঞ্চ পূতাত্মা যায়তে নরঃ। ন দুর্গতিমবাপ্নোতি সিদ্ধিং প্রাপ্নোতিচোত্তমাম্॥"

‡ মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২৭শ অধ্যায়, ১৭শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

দুর্জ্জন মহাবল দুর্য্যোধনাদি,—ইহাঁরা এবং অপর বলশালী মহারথ মহিপতিগণও জনার্দ্দনের প্রতি দ্বেষবশতঃ 'জরাসন্ধের অনুগামী হইলেন।' জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করিয়া সহগামী রাজগণকে এক এক দিক হইতে নগর অবরোধ করিবার জন্য উত্তেজিত করেন। সেই সময় জরাসন্ধ বলিতেছেন,—'মদ্ররাজ, কলিঙ্গ-রাজ, চেকিতান, বাহ্লীক-রাজ, কাশ্মীর-রাজ গোনর্দ্দ, করূষ-দেশাধিপতি কিম্পুরুষ, দ্রুম ও পার্ব্বতীয় দানব—ইহাঁরা সকলে মিলিত হইয়া সত্বরে নগরের পশ্চিম দ্বার অবরোধ করুন।' এইরূপে উত্তর ও পূর্ব্ব দ্বার রক্ষার ভার অপরাপর সমভিব্যাহারী নৃপতির হস্তে অর্পণ করিয়া, দরদ ও চেদিরাজকে সঙ্গে লইয়া, জরাসন্ধ মথুরার পশ্চিম দ্বার অবরোধ করেন। * কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে দেখিতে পাই,—কাশ্মীরাধিপতি পূর্ব্বোক্ত রাজা গোনর্দ্দ, জরাসন্ধের সহিত মথুরা আক্রমণ সময়ে বলভদ্রের হস্তে নিহত হন।

গোনর্দ্দের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র দামোদর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুখ-সমৃদ্ধি-পূর্ণ কাশ্মীর-রাজ্য লাভ করিয়াও দামোদর শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না; পিতৃ-বধ স্মরণ করিয়া অভিমানে তাঁহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল। একদা তিনি শ্রবণ করিলেন যে, সিন্ধু-নদের তীরবর্ত্তী গান্ধার-দেশের অধিপতির কন্যার স্বয়ম্বর হইবে; সেই উপলক্ষে বৃষ্ণিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন; শ্রবণ-মাত্র বহু-সৈন্য সমভিব্যাহারে ধূলিজালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া দামোদর সেই অদূরস্থিত শত্রুর প্রতি যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষ সন্নিহিত হইলে, ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কৃষ্ণের চক্রধারে দামোদর নিহত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণের আদেশ-ক্রমে ব্রাহ্মণগণ দামোদরের গর্ভবতী মহিষীকে কাশ্মীর-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। দামোদর-মহিষী যশোমতীর গর্ভে দ্বিতীয় গোনর্দ্দ জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় গোনর্দ্দ সিংহাসনে আরোহণ করার পর, পঁয়ত্রিশ জন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নাম কহ্লণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। রাজতরঙ্গিণীতে দৃষ্ট হয়,—দ্বিতীয় গোনর্দ্দের শৈশবাবস্থায় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শিশু বলিয়া তিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কোনও পক্ষেই যোগদান করিতে পারেন নাই। † দ্বিতীয় গোনর্দ্দের পরবর্ত্তী পঁয়ত্রিশ জন অজ্ঞাতনামা নৃপতির পর, লব, কুশেশয়, খগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, গোধর, সুবর্ণ, জনক, শচীনর, অশোক, জলৌক, দ্বিতীয় দামোদর, হুষ্ক, জুষ্ক, কনিষ্ক এবং অভিমন্যু প্রভৃতি রাজ-গণ কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছেন। প্রথম গোনর্দ্দ হইতে অভিমন্যু পর্য্যন্ত বায়ান্ন জন নৃপতির রাজত্ব কাল, কাশ্মীরের ইতিহাসে ১২৬৬ বৎসর লিখিত আছে। 'রাজতরঙ্গিণী' মতে, কাশ্মীরাধিপতি প্রথম গোনর্দ্দ কলির ৬৫৩ বৎসর পরে রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইলে এবং তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় গোনর্দ্দের অধিকার-কালে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হইলে, কলের্গতাব্দে প্রথম

গোনর্দ্দ-বংশীয় ও অন্যান্য নৃপতিগণ।

---

* হরিবংশ, ১০ম অধ্যায়ে মথুরাপুরী আক্রমণের বিষয় দ্রষ্টব্য।

† বিশ্বকোষোদ্ধৃত নীলমত-পুরাণে দ্বিতীয় গোনর্দ্দ—গোনন্দ নামে অভিহিত হইয়াছেন। সেখানে লিখিত আছে,—"......পুত্রং বালং গোনন্দসংজ্ঞিতং। বালোভাবাৎ পাণ্ডুপুত্রৈর্নানীতঃ কৌরবৈর্নবা॥"

গোনর্দ্দের সিংহাসনারোহণ সম্ভবপর নহে। * আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, খৃষ্ট-জন্মের ৩১০০ বৎসর (বর্ত্তমান অব্দের ৫০১০ বৎসর) পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র-সমরের সময়ে প্রথম গোনর্দ্দের পৌত্র দ্বিতীয় গোনর্দ্দ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে, গোনর্দ্দের বিদ্যমানতা আরও অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং জরাসন্ধের সহযোগী যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক গোনর্দ্দ খৃষ্ট-জন্মের অন্ততঃ ৩১৫০ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রতিপন্ন হয়। রাজতরঙ্গিণীর মতে কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে প্রথম গোনর্দ্দ রাজা হইয়াছিলেন এবং উল্লিখিত রাজগণ ১২৬৬ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কহ্লণ মিশ্রের গণনা অনুসারে প্রথম গোনর্দ্দ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী অভিমন্যু প্রভৃতি রাজগণের রাজত্ব-কাল নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, বলিতে হয়,—প্রথম গোনর্দ্দ † খৃষ্ট-জন্মের ২৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে এবং অভিমন্যু খৃষ্ট-জন্মের ১২১৬ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গোনর্দ্দ হইতে অভিমন্যু পর্য্যন্ত কাশ্মীরের যে নৃপতিগণের বিবরণ রাজতরঙ্গিণীতে প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কনিষ্ক বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার শাসন-সময়ে ঐ প্রদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবল হয় এবং কাশ্মীর-রাজ্য বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের লীলাভূমি হইয়া উঠে। কনিষ্কের শাসনকালে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা জন্য, চীন, তাতার, তিব্বত এবং এসিয়ার উত্তরাংশস্থিত বহু জনপদে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে,—'হুষ্ক, জুষ্ক, কনিষ্ক এই সময়ে কাশ্মীরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারা স্ব স্ব নামানুসারে এক একটী নগর নির্ম্মাণ করেন।' এদিকে আবার 'পুরুষপুরে' বা পেশোয়ারে কনিষ্কের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হইয়া হইয়া থাকে। কনিষ্কের সময়ে তাঁহার রাজ্যের সীমা যে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ বলেন,—দক্ষিণে বিন্ধ্য-পর্ব্বত এবং উত্তরে আল্‌তাই গিরিশ্রেণী, এতন্মধ্যবর্ত্তী দেশ এক সময়ে কনিষ্কের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কনিষ্ক কোন্ সময়ে কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নানা মত-বিরোধ দেখিতে পাই। রাজতরঙ্গিণীর হিসাবেই তাঁহার শাসনকাল-নির্ণয়ে গণ্ডগোল ঘটিয়া থাকে। রাজতরঙ্গিণীর লিখিত মত, প্রথম

কনিষ্ক ও শক-বংশ।

---

* এতদ্বিষয়ের আলোচনা "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ডে, মহাভারত-প্রসঙ্গে, ২৭৩ম—২৮১ম পৃষ্ঠায় এবং এই খণ্ডের মগধ-রাজ্য-প্রসঙ্গে ১৩৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† কহ্লণ মিশ্রের গণনায় প্রথম গোনর্দ্দের বিদ্যমানতা ২৪৪৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করার কারণ এই,—এক্ষণে (১৯১০ খৃষ্টাব্দে) কলির ৫০১০ বৎসর অতীত। গোনর্দ্দ যদি ৬৫৩ কলেগতাব্দে রাজ্য-প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি (৫০১০—৬৫৩) ৪৩৫৪ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর তাহা হইলে (৪৩৫৭—১৯১০) ২৪৪৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে গোনর্দ্দের সিংহাসনারোহণ সিদ্ধ হয়। কিন্তু উইলসন, প্রিন্সেপ, কানিংহাম এবং রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদগণ গোনর্দ্দ প্রভৃতির রাজ্যপ্রাপ্তির সময়কে আরও পরবর্ত্তিকালের ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উইলসনের মতে গোনর্দ্দ খৃষ্ট-জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে এবং অভিমন্যু ৪২৩ বৎসর পূর্ব্বে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। প্রিন্সেপের মতে, গোনর্দ্দ ১০৪৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এবং অভিমন্যু ৭৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রাজ্য-লাভ করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত অভিমন্যুকে খৃষ্ট-জন্মের ১০০ বৎসর পরবর্ত্তিকালের নৃপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কানিংহামের হিসাবও প্রায় এইরূপ।

গোনর্দ্দ যদি কলির ৬৫৩ বৎসর পরে (২৪৪৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) রাজা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কনিষ্কের পরবর্ত্তী অভিমন্যু খৃষ্ট-জন্মের ১১৮১ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, সপ্রমাণ হয়। সে হিসাবে, খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে কনিষ্কের বিদ্যমানতার বিষয় বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গের অন্য এক স্থলে লিখিত আছে,—'ভগবান শাক্যসিংহের নিবৃত্তির পর হইতে কনিষ্ক প্রভৃতির রাজ্যকালে দেড় শত বৎসর অতীত হইয়াছিল।' অর্থাৎ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের পর, দেড় শত বৎসরের মধ্যে, কনিষ্ক বিদ্যমান ছিলেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের কাল—৪৭৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ। তাহা হইলে, রাজতরঙ্গিণীর শেষোক্ত বর্ণনা অনুসারে কনিষ্ক ৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। এক রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ হইতেই কনিষ্কের বিদ্যমানতার দ্বিবিধ কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা আবশ্যক;—কোন্ সময়ে কনিষ্ক বিদ্যমান ছিলেন,—কোন্ হিসাব ভ্রম-প্রমাদ-পরিশূন্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—কনিষ্কের রাজত্ব-কালে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং কনিষ্ক কাশ্মীর-রাজ্যে বহু-সংখ্যক চৈত্য ও মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তিকালে তাঁহার বিদ্যমানতা সম্ভবপর। সে হিসাবে, গোনর্দ্দ হইতে কনিষ্কের রাজ্য-কালের হিসাব মধ্যেই গণ্ডগোল রহিয়া গিয়াছে, মানিয়া লইতে হয়। যে গোনর্দ্দ কলির ৬৫৩ বৎসর পরে রাজা হইয়াছিলেন; হয়, তিনি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক নহেন,—তাঁহার পূর্ব্বে কাশ্মীরে গোনর্দ্দ নামধেয় অপর কোনও নৃপতি বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহার সহিত এই গোনর্দ্দকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করায় মূলে অসামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে; নয়, গোনর্দ্দের রাজ্য-প্রাপ্তিকাল-নির্ণয়ে কহ্লণ মিশ্র ভ্রমে পড়িয়াছেন, এবং গোনর্দ্দের পরবর্ত্তী রাজগণের মধ্যে নামের ও শাসন-কালের পরিচয় বাদ পড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক, 'রাজতরঙ্গিণীর' মতে বিচার করিয়া কনিষ্কের বিদ্যমান কাল ৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও, আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অনেকেই কিন্তু এ বিষয়ে একমত নহেন। উইলসনের মতে, কনিষ্ক ৪২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন; কারণ, ৪২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অভিমন্যু রাজ্য-লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উইলসন লিখিয়া গিয়াছেন। কানিংহাম ৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের রাজ্য-প্রাপ্তি-কাল গণনা করেন। তাঁহার আর এক হিসাবে আবার ৫১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের রাজ্য-প্রাপ্তিকালের বিষয় (এই গ্রন্থের ১০৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) প্রতিপন্ন হয়। রমেশচন্দ্র আবার খৃষ্ট-জন্মের ৭৮ বৎসর পরে কনিষ্কের রাজ্য-প্রাপ্তিকাল নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। যে কনিষ্ক এক সময়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং মধ্য-এসিয়া পর্য্যন্ত যাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাঁহার রাজ্যাভিষেক-কাল তুলনায় সে দিনের ঘটনা হইলেও, তৎসম্বন্ধে এতই মতান্তর রহিয়াছে! কনিষ্ক, শক-বংশীয় (সিদীয়) নৃপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'রাজতরঙ্গিণীতে' তিনি তুরস্ক-বংশীয় বলিয়া অভিহিত। মথুরা-প্রদেশে এবং মহারাষ্ট্র-দেশে 'ক্ষত্রপ' পরিচয় দিয়া যাঁহারা রাজ্য-শাসন করিতেন, তাঁহারা কনিষ্ক-প্রমুখ শক-বংশীয় নৃপতিগণেরই প্রতিনিধি শাসন-কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। শক-নৃপতিগণ তাঁহাদের প্রচলিত মুদ্রায়

আপনাদিগকে 'দেবপুত্র' বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শক-বংশীয় নৃপতিগণ ১৯০ বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কনিষ্কের পর হুবিষ্ক (হুষ্ক), হুবিষ্কের পর বাসুদেব রাজ্য লাভ করেন। কিন্তু কনিষ্কের পর, কাশ্মীরে ঐ বংশের আধিপত্য ছিল বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ, হুষ্ক, জুষ্ক, কনিষ্কের পর অভিমন্যু নামা কাশ্মীরের রাজার পরিচয় পাওয়া যায়।

কাশ্মীরের রাজবংশ।

অভিমন্যুর পর, কাশ্মীরে পুনরায় গোনর্দ্দ-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তৃতীয় গোনর্দ্দ হইতে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত একবিংশ জন নৃপতি ৯৮৭ বৎসর ৮ মাস ২৯ দিন কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। এই সকল রাজার রাজত্ব-কালে কাশ্মীরে ধীরে ধীরে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়। অভিমন্যু কাশ্মীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার সময়েও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব বিনষ্ট হয় নাই। তৃতীয় গোনর্দ্দের শাসন-সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় প্রজার ধর্ম্ম-কর্ম্মে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, রাজা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। এই বংশের রাবণ কাশ্মীরের বটেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় গোনর্দ্দ-বংশীয় রাজগণের নাম ও রাজত্ব-কালের পরিচয় এই,—

নাম।		রাজত্ব-কাল। বর্ষ	মাস	দিন।	নাম।		রাজত্ব-কাল। বর্ষ	মাস	দিন।
তৃতীয় গোনর্দ্দ	...	৩৫	০	০	মিহিরকুল বা ত্রিকোটিহা	...	৭০	০	০
প্রথম বিভীষণ	...	৩৫	৬	০	বক	...	৬৩	০	১৩
ইন্দ্রজিৎ	...	৩৫	০	০	ক্ষিতিনন্দ	...	৩০	০	০
রাবণ	...	৩০	০	০	বসুনন্দ	...	৫২	২	০
দ্বিতীয় বিভীষণ	...	৩৫	৬	০	দ্বিতীয় নর	...	৬০	০	০
নর	...	৩৯	৯	০	অক্ষ	...	৬০	০	০
সিদ্ধ	...	৬০	০	০	গোপাদিত্য	...	৬০	০	৬
উৎপলাক্ষ	...	৩০	৬	০	গোকর্ণ	...	৫৭	১১	০
হিরণ্যাক্ষ	...	৩৭	৭	০	নরেন্দ্রাদিত্য	...	৩৬	০	১০
হিরণ্যকুল	...	৬০	০	০	যুধিষ্ঠির	...	৩৪	০	০
বসুকুল	...	৬০	০	০					

রাজা রাবণের রাজত্ব কালে শিব-পূজার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। রাজা নরের রাজত্ব-কালে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ নির্য্যাতন-গ্রস্ত হন। কিন্নর-গ্রামের বিহারস্থিত এক জন বৌদ্ধ-ভিক্ষু রাজা নরের এক বণিতাকে যোগবলে অপহরণ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নর বহু সহস্র বিহার দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশ-ক্রমে সমস্ত গ্রাম-মধ্যস্থিত মঠ ব্রাহ্মণেরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নরের অপর নাম কিন্নর; তাঁহার নামানুসারে তাঁহার রাজধানী কিন্নরপুর নাম পরিগ্রহ করিয়াছিল; দুর্নীতি-পরায়ণতা-দোষে তিনি বিনষ্ট হন। কিন্নরপুর অল্পকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হয়। নরের পুত্র সিদ্ধ নিয়ত শিবপূজায় রত থাকিতেন। তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানে তিনি সশরীরে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,—এইরূপ কিংবদন্তী আছে। বসুকুলের লোকান্তরের পর, কাশ্মীর-রাজ্য ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সেই সময়ে বসুকুলের পুত্র মিহিরকুল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। মিহিরকুল কৃতান্ত-তুল্য নৃশংস ছিলেন।

তিনি কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেন না। বৌদ্ধদিগের ধ্বংস-সাধনে তিনি দৃঢ়ব্রত ছিলেন। মিহিরকুল কর্ণাট এবং লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি যে রাজ্যে গমন করিতেন, সে রাজ্য ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইত। লঙ্কাদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি বহু নগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার নৃশংসতার কাহিনী বর্ণন করিবার সময়, ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন,—'পাপীর অঙ্গ স্পর্শ কিংবা তাহার সহিত আলাপ অথবা তাহার চরিত্র বর্ণন করিলে, পাপী হইতে হয়; এই জন্য তাঁহার অন্যান্য নিষ্ঠুরাচারের বিষয় বর্ণিত হইল না।' মিহিরকুল কর্ত্তৃক মিহিরপুর নামক একটী নগর এবং শ্রী-নগরীতে মিহিরেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া বহ্নি-প্রবেশে মিহিরকুল দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা যুধিষ্ঠিরের সময়ে কাশ্মীরে প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠির অত্যাচারী ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার পতন সংঘটিত হইয়াছিল। কবি বলেন,—'নির্ঝর জল যেমন অত্যুচ্চ স্থান হইতে গহ্বরে পতিত হয়, যুধিষ্ঠিরেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল।' যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া হর্ষ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ কিছু দিন শাসন-কার্য্য সম্পাদন করেন। পরিশেষে মন্ত্রিগণ বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতি প্রতাপাদিত্যকে কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অনেকে এই বিক্রমাদিত্যকে সংবৎ-প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বলেন,—প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতি বিক্রমাদিত্য এবং সংবৎ-প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য স্বতন্ত্র ব্যক্তি। প্রতাপাদিত্য-বংশের তিন জন নৃপতি ১০০ বৎসর কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে বিজয় নামক অন্য-বংশীয় এক ব্যক্তি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সেই দুই রাজবংশ,—

নাম।		রাজত্বকাল।	নাম।		রাজত্বকাল।
প্রতাপাদিত্য	...	৩২ বৎসর	বিজয়	...	৮ বৎসর
জলৌকা	...	৩২ "	জয়চন্দ্র	...	৩৭ "
তুঞ্জীন	...	৩৬ "	আর্য্যরাজ বা সন্ধিমান		৪৭ "

প্রতাপাদিত্য বিজ্ঞতার সহিত রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের সকলেই তাঁহাকে 'আপনার জন' বলিয়া মনে করিত। প্রতাপাদিত্যের পৌত্র তুঞ্জীনের রাজত্ব-কালে কাশ্মীরে বড় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ও পতিব্রতা রাজ্ঞী প্রজার প্রাণ-রক্ষার জন্য অশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয় না। ইতিমধ্যে রাজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তখন, 'আমারই পাপে এই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে' মনে করিয়া, রাজ্ঞী বাক্‌পুষ্টা সহমৃতা হন। অপুত্রক রাজা ও রাণী ইহলোক পরিত্যাগ করায়, বিজয় নামক এক ব্যক্তি সিংহাসন লাভ করেন। বিজয়ের পুত্র জয়চন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, সন্ধিমান নামক এক ব্যক্তি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি গুরু ঈশানের ইঙ্গিতক্রমে পরিচালিত হইতেন। তৎকর্ত্তৃক শ্মশানেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সন্ধিমান সর্ব্বদা শিবার্চ্চনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় রাজ-কার্য্যে প্রায়ই মনোনিবেশ করিতেন না। সুতরাং প্রজাবর্গ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে। এই সময় প্রজাগণ জানিতে পারে, গান্ধার-রাজ গোপাদিত্যের আশ্রয়ে গোনর্দ্দ-বংশীয় রাজা

যুধিষ্ঠিরের এক পুত্র প্রতিপালিত হইতেছেন। পুত্রের নাম—মেঘবাহন। মেঘবাহনের পক্ষ হইয়া গান্ধাররাজ কাশ্মীর-জয়ে মনস্থ করিয়াছেন। সন্ধিমানকে রাজ-কার্য্যে বীতস্পৃহ দেখিয়া প্রজাবর্গ গান্ধার হইতে মেঘবাহনকে আনয়ন পূর্ব্বক কাশ্মীরের সিংহাসন-দানে কৃতসঙ্কল্প হইল। সন্ধিমান সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। মেঘবাহন কাশ্মীরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। আবার কাশ্মীরে গোনর্দ্দ-বংশের প্রতিষ্ঠা হইল। মেঘবাহন-প্রমুখ গোনর্দ্দ-বংশীয় কাশ্মীরের সেই নৃপতিগণের নাম ও রাজত্বকাল ;—

নাম।		রাজত্বকাল।		নাম।		রাজত্বকাল	
		বৎসর —	মাস।			বৎসর —	মাস।
মেঘবাহন	...	৩৪	০	যুধিষ্ঠির (২য়)	...	২১	৩
শ্রেষ্ঠসেন বা প্রবরসেন		৩৩	০	নরেন্দ্রাদিত্য (২য়)	...	১৩	০
হিরণ্য	...	৩০	২	রণাদিত্য *	...	৩০০	৩
মাতৃগুপ্ত	...	৪	৯—৯ দিন	বিক্রমাদিত্য	...	৪২	০
প্রবরসেন (২য়) ...		৬০	০	বালাদিত্য	...	৩৭	৪

মেঘবাহন-বংশ ৫৭৭ বৎসর ৬ মাস ১ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। মেঘবাহন বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বীরবাহু প্রভাবে কাশ্মীর হইতে সিংহল-দ্বীপ পর্য্যন্ত কাশ্মীর-রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আপন রাজ্যে এবং বিজিত রাজ্য-সমূহে তিনি পশু-হিংসা নিবারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিষী কর্ত্তৃক দেশ-মধ্যে বহু-সংখ্যক বৌদ্ধ-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মেঘবাহনের পর তাঁহার পুত্র শ্রেষ্ঠসেন বা প্রবরসেন সিংহাসন লাভ করেন। প্রবরসেনের দুই পুত্র—হিরণ্য ও তোরমান। হিরণ্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তোরমান কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তোরমানের প্রবরসেন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সে পুত্র গোপনে প্রতিপালিত হইতেছিল। যাহা হউক, রাজা হিরণ্য নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, কাশ্মীরে পুনরায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তখন উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের জনসাধারণ সেই বিক্রমাদিত্যকে কাশ্মীর-রাজ্যের ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। এই সময়ে মাতৃগুপ্ত † নামক জনৈক কবি রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য সেই মাতৃগুপ্তকেই কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মাতৃগুপ্ত অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার দান-ধর্ম্মের প্রভাবে সকলেরই দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান হইয়াছিল। তিনি ৪ বৎসর ৯ মাস ৯ দিন রাজত্ব করিয়াছেন, এমন সময় শ্রেষ্ঠসেনের পৌত্র (তোরমানের পুত্র) প্রবরসেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই সময় রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের লোকান্তর ঘটিয়াছে। প্রবরসেন

* রণাদিত্যের ৩০০ বৎসর রাজত্ব-কাল অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাই কেহ বলেন,—ঐ বংশে বোধ হয় আরও কয়েক জন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন; অথবা ঐতিহাসিক অঙ্কপাতে ভুল করিয়া থাকিবেন।

† এই মাতৃগুপ্তকে কেহ কেহ কবি কালিদাস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু কহ্লণ মিশ্রের "রাজ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থে সে আভাষ কিছুই পাওয়া যায় না।

দেবতার বরে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং প্রবরসেন পিতৃ-রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কাশ্মীর-দ্বারে উপনীত হইলে, মাতৃগুপ্ত আহ্লাদ-সহকারে কাশ্মীর-রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন; বলিলেন,—'যাঁহারা অনুগ্রহে আমি রাজা হইয়াছি, সেই সুকৃতি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সূর্য্যকান্তমণি যতক্ষণ সূর্য্যের কিরণ প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণই দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে; সূর্য্য অস্তগত হইলে তাহার আর সে ক্ষমতা থাকে না; তখন সে স্বকীয় প্রস্তর-ধর্ম্ম গ্রহণ করে।' এবম্বিধ উক্তিতে বৈরাগ্য প্রকাশ করিয়া, প্রবরসেনের হস্তে কাশ্মীর-রাজ্যের শাসন-ভার অর্পণ পূর্ব্বক, মাতৃগুপ্ত সন্ন্যাসী-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। প্রবরসেন বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি সৌরাষ্ট্র-দেশ পর্য্যন্ত আপনার রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের উত্তরাধিকারী প্রথম শিলাদিত্য তাঁহার নিকট পরাজিত হন। কাশ্মীর হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য যে সিংহাসন উজ্জয়িনীতে লইয়া গিয়াছিলেন, প্রবরসেন সেই সিংহাসন পুনরায় কাশ্মীরে লইয়া আসেন। প্রবরসেনের পর যথাক্রমে পাঁচ জন নৃপতি কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাশ্মীরে পুনরায় হিন্দু-ধর্ম্মের বিজয়-নিশান উড্ডীন হইয়াছিল। বহু-সংখ্যক শিব-মন্দির ও বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রভৃতিতে কাশ্মীরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

অন্য রাজ-বংশ।

বালাদিত্যের রাজত্ব-কালের পর কাশ্মীরে গোনর্দ্দ-রাজবংশের অবসান হয়। পাছে দৌহিত্রগণ রাজ্য লাভ করে, এই আশঙ্কায় কাশ্মীর-রাজ বালাদিত্য রাজবংশে আপনার কন্যার বিবাহ প্রদান করেন নাই। তিনি পাণ্ডিত্য মাত্র দেখিয়াই কর্কট-নগরের অশ্বযাম বংশীয় কায়স্থ দুর্ল্লভবর্দ্ধনের হস্তে আপনার কন্যা অঙ্গলেখাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কি ঘটনা-চক্র! রাজা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বিধির বিধানে তাহাই সংঘটিত হইল। বালাদিত্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার একমাত্র বংশধর ইহলীলা সংবরণ করেন। সুতরাং কর্কোট (কর্কোটক) বংশীয় দুর্ল্লভবর্দ্ধনই কাশ্মীরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। দুর্ল্লভ-বর্দ্ধনের পরবর্ত্তী কর্কোট-বংশীয় রাজগণের নাম ও শাসনকাল নিম্নে প্রকটিত হইল,—

নাম।	রাজত্বকাল।			নাম।	রাজত্ব-কাল।		
	বর্ষ	মাস	দিন।		বর্ষ	মাস	দিন।
দুর্ল্লভবর্দ্ধন	৬৩	০	০	জয়াপীড়	৩১	০	০
দুর্ল্লভক বা				জজ্জ	৩	০	০
দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্য	৬০	০	০	(জয়াপীড়ের বিদেশ-গমনে)			
চন্দ্রাপীড়	৮	৮	০	ললিতাপীড়	১২	০	০
তারাপীড়	৪	০	২৪	দ্বিতীয় পৃথিব্যাপীড়	৭	০	০
কুবলয়াদিত্য	১	০	১৫	চিপ্পট জয়াপীড়	১২	০	০
বজ্রাদিত্য	৭	০	০	অজিতাপীড়	৩৬	০	০
পৃথিব্যাপীড়	৪	৪	১	অঙ্গাপীড়	৩	০	[illegible]
সংগ্রামপীড়	০	০	৭	উৎপলাপীড়	৩	০	০

দুর্ল্লভবর্দ্ধন হইতে উৎপলাপীড় পর্য্যন্ত রাজগণের রাজত্বকাল—২৬১ বৎসর ৫ মাস ২৭ দিন।

দুর্লভবর্দ্ধন শ্রীনগরে দুর্লভ নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র দুর্লভক প্রতাপাদিত্য নামে পরিচিত হইয়া প্রতাপপুর নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজা চন্দ্রাপীড়ের রাজত্ব-কালে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চন্দ্রাপীড়ের ভ্রাতা তারাপীড় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি নিষ্ঠুর ও দেবদ্বেষী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণের অভিশাপে তাঁহার অকাল-মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতা ললিতাদিত্য (মুক্তাপীড়) কাশ্মীরের প্রদেশ-বিশেষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তারাপীড়ের মৃত্যুর পর তিনি সমুদায় জম্বুদ্বীপ অধিকার করেন। ললিতাদিত্যের নাম—সুপ্রসিদ্ধ। তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে কনোজ, কলিঙ্গ, গৌড়, কর্ণাট, অবন্তী প্রভৃতি তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। কথিত হয়, তিনি সমুদ্র পার হইয়া দ্বীপপুঞ্জ সমূহ স্বাধিকারে আনিয়াছিলেন। কনোজের রাজা যশোবর্ম্মন, ললিতাদিত্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই সময় সুপ্রসিদ্ধ কবি ভবভূতি কনোজ হইতে ললিতাদিত্যের সঙ্গে গমন করেন। অনেকে বলেন,—'ললিতাদিত্য তুরস্ক অধিকার করিয়াছিলেন এবং সিন্ধুদেশের তাৎকালিক মুসলমান শাসনকর্ত্তা তাঁহার প্রাধান্য স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। লালিতাদিত্য নানা স্থানে আপনার কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ সুরম্য অট্টালিকা সমূহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাজা লালিতাদিতা কত দেবমূর্ত্তি ও কত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, অজ্ঞাত-দেশ-জয়ে বহির্গত হইয়া, পথে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন।' ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র কুবলয়াদিত্য সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি সাধু বলিয়া প্রসিদ্ধ। বজ্রাদিত্য ক্রূর-প্রকৃতি ছিলেন। লালিতাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত পরিহাসপুর রাজধানী হইতে বজ্রাদিত্য বহু ধন-রত্ন অপহরণ করেন। তিনি ম্লেচ্ছাচার প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক ম্লেচ্ছদিগের নিকট নরনারী বিক্রয় করিয়াছিলেন। অতি পাপে ক্ষয়-রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার লোকান্তরের পর, তাঁহার পুত্র পৃথিব্যাপীড় এবং পৌত্র সংগ্রামপীড় পর্য্যায়ক্রমে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সংগ্রামপীড়ের সাত দিন মাত্র রাজত্বের পর বজ্রাদিত্যের তৃতীয় পুত্র জয়াপীড় কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। জয়াপীড় বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং গৌড়দেশ অধিকার করিয়া তিনি নেপাল অধিকারে যাত্রা করেন। জয়াপীড় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পতঞ্জলি-কৃত পাণিনির টীকা জয়াপীড়ের শাসন-কালে সংগৃহীত হইয়াছিল। জয়াপীড় ব্রাহ্মণগণের প্রতি বড়ই অত্যাচার করিয়াছিলেন। সেই জন্য ব্রহ্মশাপে তাঁহার মৃত্যু হয়। জয়াপীড় বিদেশে গমন করিলে, তাঁহার শ্যালক জজ্জ কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। জয়াপীড়ের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র ললিতাপীড় সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ললিতাপীড় দ্বিতীয় পৃথিব্যাপীড় নামে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পৃথিব্যাপীড়ের পরবর্ত্তী নৃপতিগণের শাসন-কালে রাজ্যে নানারূপ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। উৎপলাপীড়ের রাজত্বকালে প্রজা-বিপ্লব উপস্থিত হইলে প্রজা-বিপ্লব শান্তির জন্য শূর নামক মন্ত্রী অবন্তিবর্ম্মা নামক জনৈক তেজস্বী পুরুষকে কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। উৎপলাপীড়ের রাজ্যাবসানে কাশ্মীর হইতে কর্কোট-

নাগ-বংশের রাজত্বের অবসান হয়। অবন্তিবর্ম্মা এবং তৎপরবর্ত্তী রাজগণ উৎপল-বংশীয় বলিয়া বিখ্যাত। নিম্নে এই বংশের রাজগণের নামের একটী তালিকা প্রকটিত হইল,—

নাম।	রাজত্ব-কাল। বর্ষ	মাস	দিন।	নাম।	রাজত্ব-কাল। বর্ষ	মাস	দিন।
অবন্তিবর্ম্মা	২৭	২	৮	নির্জ্জিতবর্ম্মা বা পঙ্গু	১	১	০
শঙ্করবর্ম্মা	১৮	৭	১১	চক্রবর্ম্মা	১১	৩	০
গোপালবর্ম্মা	২	০	০	শূরবর্ম্মা	১	০	০
সঙ্কট	০	০	১০	পার্থ (২য় বার)	০	৩	০
সুগন্ধা	২	০	০	চক্রবর্ম্মা (২য় বার)	১	১০	২৩
পার্থ	১৫	১০	১৩	উন্মত্তাবন্তী	২	১	৭

অবন্তিবর্ম্মা হইতে উন্মত্তাবন্তী পর্য্যন্ত নৃপতিগণ ৮৩ বৎসর ২ মাস ৪ দিন কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবন্তিবর্ম্মার রাজত্ব-কালে কাশ্মীরে জলপ্লাবন উপস্থিত হয়। সেই সময় সূর্য্য নামক জনৈক পূর্ত্তকার বিতস্তা-তীরে সপ্তযোজন দীর্ঘ প্রস্তরময় বাঁধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অতিরিক্ত জল-রাশি বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। সিন্ধু-নদের এবং বিতস্তা-নদীর স্রোতের গতি ফিরাইয়া দিয়া সূর্য্য কাশ্মীর-রাজ্যের বহু উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। অবন্তিবর্ম্মা মান্ধাতার ন্যায় প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তিনি কাশ্মীরের প্রথম বৈষ্ণব ভূপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। অবন্তিবর্ম্মার পুত্র শঙ্করবর্ম্মা বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি আপনার বাহুবলে গুজরাট পর্য্যন্ত রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বিশ্বাস করিতেন না; কায়স্থ সচিবগণের উপর রাজকার্য্য বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর-পরায়ণ ছিলেন। এক জন চণ্ডালের নিক্ষিপ্ত শরে শঙ্করবর্ম্মা নিহত হন। তাঁহার তিন জন রাজ্ঞী এবং দুই জন ভৃত্য তাঁহার সহিত চিতা-প্রবেশে প্রাণদান করিয়াছিলেন। শঙ্করবর্ম্মার বালক পুত্র গোপালবর্ম্মা দুই বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময় কোষাধ্যক্ষ প্রভাকরের সহিত রাজমাতা সুগন্ধার ব্যভিচারের কথা প্রকাশ পায়। প্রভাকরের কৌশলে গোপালবর্ম্মা জীবন্তে দগ্ধীভূত হন। গোপালবর্ম্মার মৃত্যুর পর তাঁহার সহোদর দশ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। দশ দিন রাজ্য-ভোগের পর তাঁহার মৃত্যু হইলে, রাণী সুগন্ধা স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই হইতে অবন্তিবর্ম্মার বংশ লোপ পায়। ইহার পর ষোল বৎসর কাল রাজ্যমধ্যে নানারূপ অশান্তি-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এদিকে 'তন্ত্রী' ও 'একাঙ্গ' সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রে নিত্য নূতন রাজা মনোনীত হইতে-ছিলেন। চক্রবর্ম্মার সময়ে কতকটা শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ঘাতক কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইয়াছিলেন। চক্রবর্ম্মার মৃত্যুর পর তন্ত্রীরা উন্মত্তাবন্তীকে রাজা করিয়া-ছিলেন। তিনি ঘোর অত্যাচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি আপন পিতা-মাতা ও ভ্রাতা-ভগ্নীকে নিহত করিয়াছিলেন। অবন্তিবর্ম্মা কর্ত্তৃক পিতৃহত্যার নৃশংসতার বর্ণনায় কহ্লণ মিশ্র লিখিয়াছেন,—'লোকে যেরূপ গোষ্ঠ হইতে মৃত বৎসকে টানিয়া বাহির করে, সেইরূপ রাজপ্রিয়গণ কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক নগ্ন অবস্থায় পার্থকে গৃহের বহির্ভাগে আনিল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। পর্ব্বগুপ্তের পুত্র দেবগুপ্ত নিহত পার্থের শরীরে ছুরিকা চালনা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজা উন্মত্তাবন্তী প্রীত হইলেন এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।' তিনি যক্ষ্মা-রোগে ইহলোক পরিত্যাগ

করিলে, মন্ত্রী প্রভাকরের পুত্র যশস্কর রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। এই বংশ কণ্টক-বংশ নামে পরিচিত। যশস্কর-বংশে স্ত্রী-পুরুষে দশ জন নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের রাজত্ব-কাল,—

নাম।	রাজত্ব-কাল। বর্ষ	মাস	দিন।	নাম।	রাজত্ব-কাল। বর্ষ	মাস	দিন।
যশস্কর	৯	০	০	অভিমন্যুগুপ্ত	১৩	১০	০
বর্ণট	০	০	৬	নন্দিগুপ্ত	১	৯	১১
বক্রাঙ্ঘ্রী-সংগ্রাম	০	৬	১	ত্রিভুবনগুপ্ত	১	১১	২৩
পর্ব্বগুপ্ত	১	৪	৩	ভীমগুপ্ত	৪	৪	১০
ক্ষেমগুপ্ত	৮	৬	৩	দিদ্দা (রাণী)	২৩	৪	২৩

যশস্কর হইতে রাণী দিদ্দা পর্য্যন্তের শাসনকাল ৬৪ বৎসর ২০ দিন। এতন্মধ্যে রাণী দিদ্দা অধিক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। দিদ্দা—ক্ষেমগুপ্তের মহিষী। ক্ষেমগুপ্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও অত্যাচারী ছিলেন। ক্ষেমগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র অভিমন্যু দিদ্দার তত্ত্বাবধানে রাজ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। অভিমন্যু যক্ষ্মারোগে পরলোক-গমন করিলে, দিদ্দার পৌত্রগণ সিংহাসনের অধিকারী হন। তাঁহাদের রাজত্বে দিদ্দা যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিতে পারেন না। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে তিনটী শিশু-রাজাকে হত্যা করিয়া তিনি নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। সংগ্রামরাজ ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের প্রায় সকলেই দিদ্দার পিতৃবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ও রাজত্বকাল,—

নাম।	রাজত্ব-কাল। বর্ষ	মাস	দিন।	নাম।	রাজত্ব-কাল। বর্ষ	মাস	দিন।
সংগ্রামরাজ	২৪	৯	৮	রড্ডক বা শঙ্খরাজ	০	০	১
হরিরাজ	০	০	২২	সহ্লণ	০	৩	২৭
অনন্তদেব	৫৩	৪	৭	সুস্সল	৮	৬	১৮
কলস	৮	০	২১	ভিক্ষাচর	০	৬	১২
উৎকর্ষ	০	০	২২	সুস্সল			
হর্ষদেব	১১	৮	৭	(২য় বার)	৬	৮	২৭
উচ্চল	১০	৪	১	জয়সিংহ	২২	০	০

উক্ত তালিকার মধ্যে রাজা হর্ষদেবের রাজত্ব-কালে কাশ্মীরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতি দিন সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। রাজা জয়সিংহের শাসন-কালে রাজতরঙ্গিণী-প্রণেতা কহ্লণ মিশ্র বিদ্যমান ছিলেন। তিনি রাজা জয়সিংহের রাজ্য-প্রাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কহ্লণ মিশ্রের লোকান্তরের পর শ্রীবর পণ্ডিত প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে আমরা আরও কাশ্মীরের চৌদ্দ জন রাজার ও রাণীর নাম প্রাপ্ত হই। কাশ্মীরের সেই কয় জন রাজার নাম ও রাজত্বকাল;—

নাম।	রাজত্ব-কাল। বর্ষ	মাস	দিন।	নাম।	রাজত্ব-কাল। বর্ষ	মাস	দিন।
পরমাণুদেব	৯	৬	১০	রামদেব	২১	১	১৩
বন্দিদেব	০	৭	০	লক্ষ্মণদেব	১০	৩	১২
ব্যোপাদেব	২	৬	০	সিংহদেব	১৪	৫	২৭
যশ্মদেব	১৮	০	১৩	সুহদেব	৩	২	১০
জগদেব	১৪	৩	০	রিঞ্চনদেব	৩	২	১৯
রাজদেব	২৩	৩	২৭	উদ্যানদেব	১৬	০	০
সংগ্রামদেব (৩য়)	১৬	১	১৫	কোটারাণী	১৬	০	০

এইরূপ গোনর্দ্দ হইতে কোটারাণী * পর্য্যন্ত ১৫৯ জন রাজা ও রাণী কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর, কাশ্মীর-রাজ্য কিছুকাল অরাজক ছিল। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে মুসলমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহমীর বা সমস্থুদ্দীন ঐ সময়ে কাশ্মীর অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে গজনীর মামুদ ১০১২ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর আক্রমণ ও অধিকার করেন। সমস্থুদ্দীনই কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান শাসনবর্ত্তা। সমস্থুদ্দীনের বংশ ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল (১৫৫৯-১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) কাশ্মীর-রাজ্য হুসেন চক প্রমুখ 'চক'-বংশীয় মুসলমাস নৃপতিগণের অধিকার-ভুক্ত ছিল। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মোগল-সম্রাট কাশ্মীর-রাজ্য অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীর মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে আমেদ সা আবদালি কাশ্মীর অধিকার করেন। সেই হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীর আফগান-জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ কাশ্মীরে আপন অধিকার বিস্তার করেন। তৃতীয় শিখ-যুদ্ধের অবসানে গোলাপ সিংহ ইংরেজের অনুগ্রহে কাশ্মীরের অধিপতি বলিয়া পরিচিত হন। তিনি ইংরেজকে এক ক্রোড় টাকা প্রদান করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। গোলাপ সিংহ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পনের বৎসর, তৎপরে রণবীর সিংহ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৭ বৎসর, পরিশেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে মহারাজ প্রতাপ সিংহ কাশ্মীরের অধীশ্বর হন। এক্ষণে কাশ্মীর ইংরেজ-রাজের মিত্র-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত।

পূর্ববর্ত্তী নৃপতিগণ কর্ত্তৃক কাশ্মীরে যে সকল নগর ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগর আজিও অতীত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ঐ নগরী গোনর্দ্দ-বংশীয় রাজা অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কহ্লণ পণ্ডিতের গণনার অনুসরণে এই অশোকের রাজত্ব-কাল ১৫৯৪ পূর্ব্বে-খৃষ্টাব্দে দাঁড়াইতে পারে। কানিংহাম অশোকের রাজত্ব-কাল ২৬৩ পূর্ব্বে-খৃষ্টাব্দ হইতে ২২৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রিন্সেপের মতেও খৃষ্ট-জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে অশোকের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। জ্যেষ্ঠ-রুদ্র নামধেয় একটী পুরাতন শিবমন্দির কাশ্মীরে আজিও চিহ্নিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরটী অশোকের পুত্র জলোক কর্ত্তৃক শ্রীনগর রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অশোকের শ্রীনগর এখন ধ্বংসপথে অগ্রসর। তাখ্‌ত-ই-সুলিমান নামক যে পর্ব্বতে ঐ মন্দির বিদ্যমান ছিল, সেই পর্ব্বত পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠেশ্বর নামে অভিহিত হইত। জ্যেষ্ঠেশ্বর শিবের নামানুসারে পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছিল। অশোকেশ্বর নামে আরও দুইটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সে দুই মন্দিরও রাজা অশোক নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রথম প্রবরসেনের রাজত্ব-কালে শ্রীনগর হইতে প্রবরসেনপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ৬৩১ খৃষ্টাব্দে চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যখন কাশ্মীরে উপনীত হন,

কাশ্মীরের প্রাচীন কীর্ত্তি-স্মৃতি।

* উদ্যানদেবের পর কোটারাণী রাজত্ব করিয়াছিলেন,—কোনও কোনও গ্রন্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহাদের রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে গণ্ডগোল রহিয়াছে।

তখন দুইটী প্রবরসেনপুর নগরের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। প্রথম প্রবরসেনপুর তখন 'পুরাতন রাজধানী' এবং নূতন প্রবরসেনপুর 'নূতন রাজধানী' বলিয়া পরিব্রাজকের গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছিল। নূতন প্রবরসেনপুর রাজা দ্বিতীয় প্রবরসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত প্রবরসেনপুর পরিশেষে শ্রীনগর নাম গ্রহণ করিয়াছিল। সেই শ্রীনগরই বর্ত্তমান শ্রীনগর বলিয়া কথিত হয়। হুয়েন সাং পশ্চিম দিক হইতে কাশ্মীর-রাজ্যে উপনীত হন। নগরের প্রবেশ-পথে তখন এক প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ-দ্বার ছিল। সেই সিংহ দ্বারে রাজার মাতুল আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। সেই নগরে যে সকল পবিত্র স্থান ছিল, তাহা দর্শন করিয়া, 'হু-সে-কিয়া-লো' (Hu-se-kia-lo) নামক মঠে হুয়েন-সাং রাত্রি-যাপন করেন। 'হু-সে কিয়া-লো' হইতে হুষ্কর বা হুষ্কপুর নাম সিদ্ধ হয়। 'রাজতরঙ্গিণীতে' হুষ্ক কর্তৃক কাশ্মীরে হুষ্কপুর-স্থাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সেই হুষ্কপুরকে আবু-রিহাণ 'উষ্কর' (Ushkara) নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'উষ্কর' এবং 'বরাহমূল' অভিন্ন। এই নগর 'বেহাৎ' নদীর পূর্ব্ব-তীরে বিদ্যমান। 'বরাহমূল' বা 'হুষ্কপুর' বেহাৎ নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। হুয়েন সাং কাশ্মীর-রাজ্যের পরিধি সাত হাজার লি (১১৬৬ মাইল) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইলে কাশ্মীর-রাজ্যের সীমানা—উত্তরে ও পশ্চিমে সিন্ধুনদ এবং দক্ষিণে ও পূর্ব্বে যথাক্রমে 'সল্ট'-গিরিশ্রেণী ও ইরাবতী নদী, নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। হুয়েন-সাঙের পরিদৃষ্ট কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত ছিল। সেই নগরীর পরিধি দশ লি (প্রায় দুই মাইল)। প্রাচীন রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে উহার অবস্থান-স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ নগরী প্রবরসেন-নির্ম্মিত নূতন শ্রীনগর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। আবু-রিহাণ উহাকে 'আদিস্থান' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—প্রাচীন রাজধানীর সন্নিকটে একটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-স্তূপ ছিল। ঐ স্তূপে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত হয়। ৬৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ স্তূপের মাহাত্ম্য দিকে দিকে প্রচারিত ছিল। কনোজাধিপতি রাজা হর্ষবর্দ্ধন কাশ্মীর-রাজ্য আক্রমণ করিয়া, স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের দন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হুয়েন-সাং যখন পঞ্জাবে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন কাশ্মীর হইতে বুদ্ধদেবের দন্ত স্থানান্তরিত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। কাশ্মীরের তাৎকালিক নৃপতি রাজা দুর্লভ হিন্দু-ধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং হর্ষবর্দ্ধনের হস্তে বুদ্ধের দন্ত প্রদান করিতে তিনি অণুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কাশ্মীরের কয়েকটী প্রাচীন নগরের নাম,—(১) প্রাচীন শ্রীনগর, (২) প্রবরসেনপুর বা নূতন শ্রীনগর, (৩) খগেন্দ্রপুর এবং (৪) খুনামুস। শেষোক্ত দুইটী নগরী কাশ্মীর-রাজা অশোকের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। (৫) শূরপুর;—বেহাৎ নদীর উত্তর তীরে, উল্লার হ্রদের পশ্চিমে, এই প্রাচীন শূরপুর নগরীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। কথিত হয়, এই নগর পূর্ব্বে 'কুম্ভ' নামে পরিচিত ছিল। অবন্তিবর্ম্মার মন্ত্রী শূর নিজ নামে এই নগরের নামকরণ করিয়া নগরের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিলেন। (৬) ঝিজিপাড়া বা পত্তাশোক;—এই নগর অশোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়েশ শিব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল। বেহাৎ-নদীর

উভয় তীরে, রাজধানীর পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে, ইহার অবস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। (৭) হুষ্কপুর, (৮) জুষ্কপুর এবং (৯) কনিষ্কপুর;—এই তিন নগর শক-বংশীয় হুষ্ক, জুষ্ক ও কনিষ্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হুষ্কপুর বেহাৎ নদীর তীরে বরাহমূল পল্লীর ধ্বংসাবশেষে, জুষ্কপুর রাজধানীর চারি মাইল উত্তরে, জুকুরু গ্রামের ধ্বংসাবশেষে, এবং কনিষ্কপুর শ্রীনগরের দশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কনিষ্কপুর অধুনা কামপুর (কণিকপুর) নামে পরিচিত হইয়া থাকে। (১০) পরিহাসপুর;—রাজা ললিতাদিত্য কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত। সম্বল গ্রামের সন্নিকটে, বেহাৎ-নদীর পূর্ব্ব-তীরে, এই নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। 'অন্তর্কোট' নামক গ্রামে, একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষে, পরিহাসপুর এক্ষণে চিহ্নিত হইয়া থাকে। (১১) পদ্মপুর;—রাজা বৃহস্পতির মন্ত্রী পদ্ম কর্তৃক পদ্মপুর নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজধানীর আট মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে, বেহাৎ-নদীর পূর্ব্ব-তীরে, পাম্পুর নামে ইহা প্রসিদ্ধ। (১২) অবন্তিপুর;—রাজধানীর সতের মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে, বেহাৎ-নদীর পূর্ব্ব তীরে, রাজা অবন্তিবর্ম্মা কর্তৃক এই নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন অবন্তিপুরের ভগ্নাবশেষ 'ওয়ান্তিপুর' (Wantipur) নামক ক্ষুদ্র গ্রামে পর্য্যবসিত। দুইটী জাঁকজমক-বিশিষ্ট মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং চারিদিকে প্রাচীরের চিহ্ন-পরম্পরা দৃষ্টে, অবন্তীপুর এককালে যে বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল, তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হয়। 'নয়ানগর' বা নূতন সহর নামক স্থান—নদীর উভয় পারের ভূ-খণ্ডকে লোকে অভিহিত করিয়া থাকে। সেই ভূখণ্ডে অবন্তীপুর বিদ্যমান ছিল, ইহাই জনসাধারণ্যে প্রসিদ্ধি। হুয়েন-সাং যখন কাশ্মীর দর্শন করেন, তখন কাশ্মীরে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর লোকই বাস করিত। সেখানে তখন এক শত সঙ্ঘারাম এবং তাহাতে পাঁচ সহস্র বৌদ্ধ-ভিক্ষু বিদ্যমান ছিল। কাশ্মীরের অধিবাসিগণ দেখিতে সু-শ্রী, কিন্তু বড়ই ধূর্ত্ত। তাহারা বিদ্যানুরাগী ও সুশিক্ষিত। তাহারা চঞ্চল ও দুর্ব্বলচিত্ত। হুয়েন-সাং কাশ্মীরের অধিবাসিগণ সম্বন্ধে উক্ত-রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীরে প্রচুর শস্য ও ফল-পুষ্প উৎপন্ন হয়; সেখানকার জল-বায়ু শীতল অথচ বিশুষ্ক; সেখানে সর্ব্বদাই বরফ পড়িয়া আছে, কিন্তু বায়ু-প্রবাহ অল্প;—কাশ্মীরের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে পরিব্রাজকের ইহাই বর্ণনা। কাশ্মীরের যে সকল নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহাদের সকলেরই রাজধানী যে বর্ত্তমান কাশ্মীরের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। কনিষ্ক প্রভৃতির রাজধানীর বিষয় আলোচনা করিলে, প্রধান রাজধানীর পরিবর্ত্তন অবশ্যই মানিয়া লইতে হয়। সে হিসাবে, কাশ্মীরের নাম ও বিস্তৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

সিন্ধু-দেশ।

[সিন্ধুদেশ.—সিন্ধুদেশের প্রাচীনত্ব.—বেদে সিন্ধুদেশের ও সিন্ধু নদীর পরিচয়—মহাভারতে ও পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে সিন্ধুদেশের বিবরণ,—সিন্ধুর প্রাচীন বিভাগ-চতুষ্টয়ের উল্লেখ,—হুয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট সিন্ধুর বিভাগ-চতুষ্টয়,—সিন্ধুদেশে আরবগণের আক্রমণ,—সিন্ধুর পরবর্তী ইতিবৃত্ত;—সিন্ধুদেশের বিভাগ,—উত্তর-সিন্ধু,—হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট উত্তর সিন্ধু—উত্তর-সিন্ধুর অন্যান্য পরিচয়;—মধ্য-সিন্ধুদেশে,—হুয়েন-সাং-দৃষ্ট মধ্য-সিন্ধু,—তদন্তর্গত প্রাচীন ও আধুনিক স্থান-সমূহের পরিচয়;—দক্ষিণ সিন্ধু-দেশ,—হুয়েন-সাং-দৃষ্ট দক্ষিণ-সিন্ধুর পরিচয়;—অন্যান্য স্থান;—'সিন্ধু' ও 'হিন্দু' শব্দ।]

সিন্ধুদেশ।
(প্রাচীনত্ব)

ভারতবর্ষের প্রাচীন জনপদ-সমূহের মধ্যে সিন্ধু-দেশের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বেদে, পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে, নানা স্থানে নানা ভাবে সিন্ধুদেশের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে, কক্ষিবান্ ঋষির উক্তিতে, সিন্ধুদেশের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋষি বলিতেছেন, 'সিন্ধু-নিবাসী ভাবযব্যের জন্য নিজ বুদ্ধিবলে বহুসংখ্যক স্তোম সম্পাদন করি। হিংসারহিত রাজা কীর্তিলাভ কামনায় আমার জন্য সহস্র সোম যাগের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।' ঋগ্বেদের আর এক স্থলে দেখিতে পাই,—'সরস্বতী, সরযূ এবং সিন্ধু এই সকল মহাতরঙ্গ-শালিনী প্রবাহশালিনী নদী রক্ষা করিতে আসুন। জলপ্রেরণকারিণী জননীস্বরূপা এই সকল দেবী আমাদিগকে ঘৃততুল্য মধুতুল্য জল দান করুন।' * অন্য এক স্থলে আবার সিন্ধুর শাখানদী সমূহেরও নাম উল্লিখিত। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, সিন্ধুদেশ এবং সিন্ধু-নদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকিতে পারে না। বেদের ব্রাহ্মণভাগ-সমূহে সিন্ধুদেশবাসিগণ 'নীচ-জাতীয়' বলিয়া অভিহিত। বৌধায়ন-সূত্রে সিন্ধুদেশবাসী জনগণ 'মিশ্রজাতি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। রামায়ণে সিন্ধুদেশের নাম একাধিক স্থানে দেখিতে পাই। দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে সিন্ধু-রাজ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; সিন্ধু-দেশের অধিপতি দশরথের অধীন রাজ্য-মধ্যে গণ্য ছিলেন;—রামায়ণের আদিকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডে, দুই স্থলে সিন্ধু-দেশের দুই পরিচয় প্রাপ্ত হই। মহাভারতে সিন্ধু এবং সিন্ধু-সৌবীর নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় ভারতবর্ষের যে সকল জনপদের পরিচয় প্রদান করেন, তন্মধ্যে সিন্ধু উত্তর-ভারতের জনপদ মধ্যে উল্লিখিত। কুরু-পাণ্ডবের মহাসমরে সিন্ধু-রাজ জয়দ্রথ কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে, গরুড়পুরাণে, মৎস্যপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে, ব্রহ্মপুরাণে, হরিবংশে সিন্ধু-দেশের নাম দেখিতে পাই। সময়ে সময়ে সিন্ধু ও সৌবীর—'সিন্ধু-সৌবীর' নামে যুক্ত-রাজ্য-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কনিষ্কের এবং ললিতাদিত্যের রাজত্ব-কালে সিন্ধুদেশ

* ঋগ্বেদ, প্রথম মণ্ডল, ১২৬শ সূক্ত, ১ম ঋক; দশম মণ্ডল, ৬৪শ সূক্ত, নবম ঋক; এবং দশম মণ্ডল, [illegible] সূক্ত ৫ম ও ৬ষ্ঠ ঋক।

তাঁহাদের করায়ত্ত হইয়াছিল,—কাশ্মীরের ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ অধিকারের জন্য অগ্রসর হইয়া প্রথমে পঞ্জাবে সিন্ধু-নদের তীরে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরু-বংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া ক্রমশঃ তিনি সিন্ধুদেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তনের পর সিন্ধুদেশ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সেই চারি ভাগের নাম,—(১) জোর (Zor), আস্কালান্দুস (Aska'andusa), সামীদ (Samid) এবং লোহানা (Lohana)। হুয়েন-সাং যখন ভারতে আগমন করেন, সে সময়েও উহা চারি ভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। হুয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট সেই চারিটী বিভাগকে কানিংহাম 'অপার' বা উত্তর সিন্ধু, 'মিড্‌ল্‌' বা মধ্য সিন্ধু, 'লোয়ার' বা দক্ষিণ সিন্ধু এবং কচ্ছ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। হুয়েন-সাং ৬৪১ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু-দেশে উপনীত হন। তখন সমগ্র সিন্ধু-দেশ একজন নৃপতির শাসনাধীন ছিল। হুয়েন-সাং তাঁহাকে 'সিউ-টো-লো' (Siu-to-lo) বা শূদ্র নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। পরিব্রাজকের স্বদেশ-প্রত্যাগমনের পরও বহু দিন পর্য্যন্ত সমগ্র সিন্ধুদেশ উত্তর-সিন্ধুর রাজা 'কচ্ছের' প্রাধান্য স্বীকার করিত। বোধ হয়, তাঁহার নামানুসারেই কচ্ছ দেশের নামকরণ হইয়াছিল। ইতিহাসে প্রকাশ,—রাজা কচ্ছ শূদ্র-জাতীয় ছিলেন। কচ্ছের রাজত্বের কিছুকাল পরেই সিন্ধুদেশে আরবগণের আক্রমণ আরম্ভ হয়। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন,—স্থলপথে আরবগণ কর্ত্তৃক সিন্ধুদেশ আক্রমণের বহু পূর্ব্বে আরব-জাতি জলপথে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময় ওমর খালিফ বোগদাদে রাজত্ব করিতেন। কাহারও কাহারও মতে, ওমর খালিফের বহু পূর্ব্বে, মেক্রাণ উপকূলের পথে, আরবগণ সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। * কিন্তু ঐতিহাসিক-গণের অনেকেই উহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে, খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে, ৭১১ খৃষ্টাব্দে, মহম্মদ বিন কাসিম সর্ব্বপ্রথম সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। তখন দাহির (ডাহির) নামা হিন্দু নরপতি সিন্ধুদেশ শাসন করিতেন; আলোরে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজা দাহিরের রাজত্ব-কালে একখানি আরব-দেশীয় অর্ণবপোত সিন্ধুদেশের 'দিভাল' বা দেবল (Dival or Dewal) বন্দরে মৈদ্রবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। খলিফা ওয়ালিদ, রাজা দাহিরকে উহা প্রত্যর্পণের অনুরোধ করেন। দেবল বন্দর তখন দাহিরের প্রাধান্য স্বীকার করিত না। রাজা দাহির খলিফাকে আপনার অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। আরবগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। ফলে, কাসিমের অধিনায়কত্বে মুসলমানগণ সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। তখন দাহিরের সহিত কাসিমের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দাহির পরাজিত হন; মুসলমানগণ মুলতান পর্য্যন্ত বিস্তৃত দাহিরের সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়া লন। কিন্তু আরবগণ অধিক দিন সিন্ধুদেশ

* সার হেনরী ইলিয়ট বলেন,—৫৩৪ খৃষ্টাব্দে, খলিফা ওমরের রাজত্বকালে, ওমান (Oman) হইতে আরবগণ জলপথে ভারতের পশ্চিম উপকূলে, সিন্ধুদেশে, আগমন করে। খলিফা ওমর দস্যুতার প্রশ্রয় দিতেন না; তাঁহার কঠোর শাসনে ভারতবর্ষে আরব-জলদস্যুগণের উপদ্রব শান্তি হয়। *Vide*, Sir H. Ellio.'s *Arabs in Sind.*

আপনাদের অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। কাসিমের মৃত্যুর পর, জেমিম নামক তাঁহার উত্তরাধিকারীর শাসন সময়ে 'সুমেরু' (Sumera) বা সৌবীর-বংশীয় রাজপুতগণ কর্তৃক ৭৬০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ হইতে মুসলমানগণ বিতাড়িত হন। * সৌবীর রাজপুতগণ প্রায় ৫০৭ বৎসর সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসনকালে, গুজরাটের চৌলুক্য-বংশীয় রাজপুতগণ বহু বার সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন; কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নসিরুদ্দীন কুবাচ নামক জনৈক আফগান সিন্ধুদেশের অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া তথায় প্রায় চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ১২১২ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে, 'জাম' উপাধি-গ্রহণে 'সোমুন' রাজপুতগণ সিন্ধু রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে এই বংশের শেষ রাজার লোকান্তর হইলে, তাঁহার উত্তরাধিকারীর মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, সিন্ধুদেশ মুসলমান-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহার পর কনোজের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়মান হুমায়ুন ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে একবার সিন্ধুদেশ-জয়ে প্রয়াসী হন। তখন হুসেন নামক 'আরঘুন বংশীয় জনৈক আফগান সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দুই বৎসরের মধ্যেই হুমায়ুনের অর্থাদি নিঃশেষ হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর সিন্ধুদেশ জয় করিয়া দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের সম সময়ে সিন্ধু-দেশে দুরাণী-বংশীয় আমেদ সা আবদালীর আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিন্ধুদেশ আফগানগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ঐ বৎসর কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সিন্ধুদেশের আফগান-গণ আমীরের সহায়তা করেন। ফলে, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস নেপিয়ার কর্তৃক সিন্ধুদেশ আক্রান্ত হয়। বেলুচিগণ অশেষ উদ্যোগে বাধা প্রদান করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সেই হইতে সিন্ধুদেশ ইংরেজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

উত্তর-সিন্ধুর বিবরণ।

সিন্ধুদেশের পূর্ব্বোক্ত বিভাগ-চতুষ্টয়ের মধ্যে 'অপার' বা উত্তর-সিন্ধু বিভাগ 'শিরো' (Siro) নামে অধুনা পরিচিত। 'শির' বা শীর্ষস্থানে অবস্থিত বলিয়া বিভাগের উক্ত নাম হওয়া সম্ভবপর। পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের গণনায় 'শিরো' বিভাগের পরিধি-পরিমাণ সাত হাজার লি বা এক হাজার এক শত সাতষট্টি মাইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন,— পশ্চিমের 'কচ্ছগন্ধা' ইহার অন্তর্ভুক্ত না ধরিলে, সিন্ধু-রাজ্যের পরিধি-পরিমাণ এতাধিক হইতে পারে না। এ হিসাবে, সিন্ধু-নদের পশ্চিমের বর্ত্তমান কচ্ছগন্ধা, কাহন, শিকারপুর ও লারকনা জেলা-চতুষ্টয় এবং নদের পূর্ব্ব-তীরের সবজল-কোট ও খৈরপুর জেলাদ্বয়

* ইলিয়ট-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এ বর্ণনা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে, ৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খলিফাগণ সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়া ছিলেন। প্রতি বৎসর তাঁহারা ঐ দেশের শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিতেন। ৮৭৫ খৃষ্টাব্দেও খলিফা মুতামদ (Mutamad) ইয়াকুব-ইবন্-লেইথ নামক জনৈক ব্যক্তিকে, সিন্ধু, বাল্খ এবং তুর্কিস্থানের শাসনকর্তৃ-পদে মনোনীত করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে, সিন্ধুদেশ মুলতান ও মানসুরা নামক দুইটী বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সিন্ধুর মানসুরা বিভাগ সমুদ্র হইতে আলোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মানসুরার সীমানার উত্তরস্থিত বিভাগ মুলতান নামে উক্ত হইত।— *Vide Sir H. Elliot's Arabs in Sind.*

উত্তর-সিন্ধুর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। উহার চতুঃসীমার পরিমাণ,—উত্তরে ৩৪০ মাইল, পশ্চিমে ২৫০ মাইল, পূর্ব্বে ২৮০ মাইল এবং দক্ষিণে ২৬০ মাইল দাঁড়াইতে পারে। আর তাহা হইলে, উত্তর-সিন্ধুর পরিধি-পরিমাণ এক হাজার ত্রিশ মাইল হয়। এ হিসাবে, হুয়েন-সাঙের গণনার সহিত উহার একটু তারতম্য দৃষ্ট হইলেও, প্রাচীন ও আধুনিক গণনায় সামঞ্জস্য হইতে পারে।' হুয়েন-সাং 'পি-চেন-পো-পু-লো' (Pi-chen-po-pu-lo) রূপে সিন্ধুদেশের রাজধানীর নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। জুলিয়েন বলেন,—উহা 'ভিছবপুর' (Vichava-pura)। ভিভিয়েন ডি' সেণ্ট মার্টিন বলেন,—উহার সংস্কৃত নাম 'বিচালপুর' (Bicpalpura) বা বিশালপুর। মধ্য-সিন্ধুর একটি নগর জনসাধারণ কর্ত্তৃক 'বিচোলো' (Bicholo) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বোধ হয়, হুয়েন-সাঙের 'পি-চেন-পো-পু-লো' এবং 'বিচোলো' বা বিচালপুর অভিন্ন। সিন্ধুদেশের এই রাজধানী-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে একটু মতান্তর দৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিকগণের মুখে এবং জনপ্রবাদে শুনিতে পাই, হুয়েন-সাঙের সিন্ধুদেশে আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে 'আলোর' সিন্ধুদেশের রাজধানী বলিয়া পরিচিত। হুয়েন-সাঙের স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের বহু পরিবর্ত্তি-কাল পর্য্যন্তও "আলোর' সিন্ধুদেশের রাজধানী ছিল। সুতরাং হুয়েন-সাঙোল্লিখিত 'পি-চেন-পো-পু-লো' নগরকে আলোর ভিন্ন অন্য কিছুই বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু আলোর ও 'পি-চেন-পো-পু-লো'কে অভিন্ন বলিলেও একটু সমস্যায় পড়িতে হয়। কারণ, হুয়েন-সাঙের মতে, সিন্ধুদেশের রাজধানী 'পি-চেন-পো-পু-লো' সিন্ধু-নদের পশ্চিম তীরে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু আলোর নগর সিন্ধুর পূর্ব্ব-তীরে চিহ্নিত হইয়া থাকে। সিন্ধুদেশে একটী প্রবাদ আছে,—'রাজা দাহিরের অপরাধে সিন্ধু-নদ আলোর পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিয়াছিলেন।' এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, প্রাচীন-কালে সিন্ধু-নদ আলোরের পূর্ব্বে প্রবাহিত হইতেছিল; ক্রমশঃ পৃথিবীর স্বাভাবিক ঘূর্ণনে নদের গতি পশ্চিম দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জন-প্রবাদ হইতে বুঝা যায়, রাজা দাহিরের রাজত্ব-কালে এই স্বাভাবিক গতি-পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—যে সকল নদী মেরু-প্রদেশ দিক হইতে বিষুব-রেখা অভিমুখে প্রবাহিত, সেই সকল নদীর গতি স্বভাবতঃ পশ্চিম দিকে পরিবর্ত্তিত হয়; আর যে সকল নদী বিষুব দিক হইতে মেরু দিকে প্রবাহিত, তাহাদের গতি পূর্ব্ব-দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। * সেই জন্যই, সিন্ধু-নদের এই স্বাভাবিক গতি-পরিবর্ত্তন হেতু, আমরা অধুনা প্রাচীন আলোরের পশ্চিম দিকে সিন্ধু-নদের প্রবাহ-বিবর্ত্তনের পরিচয় পাই। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের এতৎসিদ্ধান্ত অনুসারে হুয়েন-সাঙ-পরিদৃষ্ট সিন্ধু-দেশের রাজধানী 'পি-চেন-পো-পু-লো' এবং আলোর অভিন্ন বলিতে অণুমাত্র কুণ্ঠা বোধ হয় না। সিন্ধু-নদের প্রাচীন ধারা 'নারা' (Nara) নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

* "All streams that flow from the poles towards the equator work gradually to the westward, while those that flow from the equator towards the poles work gradually to the eastward. These opposite effects are caused by the same difference of the earth's polar and equatorial velocities which give rise to the trade winds."—*Ancient Geography of India.*

উত্তর-সিন্ধু দেশের জনপদ-সমূহের মধ্যে আলোর (Alor), রৌরি-ভাকর (Rori Bhakor) এবং লারকানার নিকটবর্ত্তী মহোর্ত্তা (Mahorta) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সময়ে উত্তর-সিন্ধু প্রদেশের কয়েকটী স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মাসানি (Missanac), সোগ্‌দি (Sogdi), মুসিকনি (Musikani) এবং প্রেষ্টি (Praesti) প্রসিদ্ধ। কানিংহাম বলেন,—মাসানি মিথুনকোটের সন্নিকটবর্ত্তী মুজার্কা, সোগদি বর্ত্তমান সেওরা, মুসিকনি বর্ত্তমান আলোর বা অরোর নগর এবং প্রেষ্টি প্রস্থল বা মহোর্ত্তা।

মধ্য-সিন্ধু প্রদেশ সাধারণতঃ 'ভিচালো' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হুয়েন-সাং এই প্রদেশের পরিধি-পরিমাণ আড়াই হাজার লি বা চারি শত সতের মাইল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কানিংহাম বলেন,—হুয়েন-সাঙের নির্দ্দেশ মত বর্ত্তমান সেওয়ান জেলা এবং হায়দ্রাবাদের ও উমারকোটের উত্তরাংশ, এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তাহা হইলে, মধ্য-সিন্ধু উত্তরে ও দক্ষিণে প্রতি দিকে ১৬০ মাইল করিয়া এবং পশ্চিমে ও পূর্ব্বে প্রতি দিকে ৪৫ মাইল করিয়া দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট হয়। এ হিসাবে, ঐ প্রদেশের পরিধি-পরিমাণ ৪২০ মাইলের অধিক হইতে পারে না। মধ্য-সিন্ধুর প্রধান নগরের নাম হুয়েন সাং-কর্ত্তৃক 'ও-ফান-চা' (O-fan-cha) রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। উত্তর-সিন্ধুর রাজধানী হইতে 'ও-ফান-চা' নগরীর ব্যবধান ৭০০ লি বা ১১৭ মাইল এবং দক্ষিণ-সিন্ধুর রাজধানী 'পীতশিলা' হইতে প্রায় ৫০ মাইল। উত্তর সিন্ধুর রাজধানীর নাম আলোর বা অরোর এবং দক্ষিণ-সিন্ধুর রাজধানীর নাম—গ্রীকদিগের মতে—পত্তল (Pattala)। এই দুই নগরী হইতে 'ও-ফান-চা' নগরের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব হিসাব করিয়া দেখিলে, 'বম্র-কাতুল' (Bambhra-ka-tul) বা বনভর নামক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে 'ও-ফান-চা' নগরীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। জনপ্রবাদ,—ঐ নগর এক সময়ে ব্রাহ্মণাবাদের একটী প্রসিদ্ধ স্থান মধ্যে পরিগণিত হইত। মধ্য-সিন্ধুর মধ্যে অধুনা সেওয়ান (Sehwan), হাল (Hala), হায়দ্রাবাদ (Haidarabad) এবং উমারকোট (Umerkot) সবিশেষ প্রসিদ্ধ। হিন্দু-রাজগণের রাজত্ব সময়ে সিন্ধু-দেশে সদুসান (Sadusan), ব্রাহ্মণ বা বামন্ব (Brahman or Bahmanwa) এবং নিরুণকোট (Nirunkot) প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া উক্ত হইত। কানিংহাম বলেন,—হিন্দু-রাজত্বের প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহ উক্তরূপ আধুনিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি নানাপ্রকার প্রমাণ-পরম্পরার উল্লেখে উক্ত সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রাচীন নিরুণকোট বা গ্রীকদিগের পাটল বা পত্তল (Patala or Pattala) বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদ নাম পরিগ্রহ করিয়া আছে। এম'মার্দ্দো (M Murdo) প্রমুখ পাশ্চাত্য-প্রত্নতত্ত্ববিদগণও ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।* ম্যাসন, বার্টন, ইষ্টউইক প্রভৃতিরও তাহাই মত। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে হুয়েন-সাং যখন পাটল-নগর দর্শন করেন, তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—তিনি কচ্ছ-দেশের রাজধানী

মধ্য-সিন্ধু ও তদন্তর্গত স্থানসমূহ।

* M' Murdo in the *Journal of the Royal Asiatic Society.*

কোটীশ্বর হইতে উত্তরদিক্স্থ ৩০ শত লি (প্রায় এক শত সত্তর মাইল) গমন করিয়া ঐ নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি পি-তো-শি-লো (Pi-to-shi-lo) রূপে ঐ নগরের নাম উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। উহা হইতে জুলিয়েন 'পিটশিলা' (Pitashila) এবং কানিংহাম 'পাটশিলা' (Patasila) বা 'পাটলপুর' (Patalpur) শব্দ নিষ্পন্ন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ বার্টনের মতে, হায়দ্রাবাদ বা নিরাণকোট প্রাচীনকালে পাটলপুর বা পাটশিলা নামে অভিহিত হইত। কেহ কেহ আবার বলেন, নিরাণকোট দক্ষিণ-সিন্ধুর মধ্যে গণনীয়। কানিংহাম বলেন,—প্রাচীন সাধুসন বা সিন্দোসন অধুনা 'সেওয়ান' নামে পরিচিত। সেওয়ান অতি প্রাচীন নগরী। * এই স্থানে প্রাচীনকালে শিউ (Seuis) বা 'সাবি' (Sabis) নামক এক জাতি বাস করিত। তাহাদের নামানুসারে সিউস্থান—'সাদুস্থান' (Sadustan) বা তাহার অপভ্রংশে 'সাদুসন নামে অভিহিত হইত। হিন্দুগণ উহাকে দেবতা শিবের নামানুসারে 'শিবস্থান' কহিতেন! ভৌগোলিক টলেমি বা পরিব্রাজক হুয়েন-সাং কেহই ঐ স্থানের নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু দেশীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন,—৭১১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কাসিম যে সময়ে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন, তখনও নগরটী 'সেওয়ান' নাম পরিগ্রহ করিয়াছিল। মুসলমানগণের শাসন-সময়ে সেওয়ান বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইত। মধ্য-সিন্ধুর অন্যতম প্রধান নগরী ব্রাহ্মণ (বামন্ব) অধুনা 'হালা' নামে পরিচিত। কথিত হয়,—সিন্ধু-রাজ্য মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইলে, ব্রাহ্মণের নাম 'মনসুর' (Mânsura) রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ বলেন,—'আবাসাইউ' বংশীয় খলিফা অল্ মনসুরের নামানুসারে, ৭৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিন্ধু-বিজয়ী কাসিমের পুত্র আমরু কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের নাম মনসুর-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক মাসুদী বলেন,—৭৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিন্ধুদেশের শাসনকর্ত্তা জামহুর কর্ত্তৃক তাঁহার পিতা মনসুরের নামানুসারে ঐ নগর স্থাপিত হয়। † আবু-রিহাণের মতে, নগরী প্রথমে বামন্ব নামে, পরিশেষে হমনাবাদ রূপে পরিচিত হইয়াছিল। তিনি বলেন,—সিন্ধুনদের পূর্ব্ব-উপকূলে বামন্ব অবস্থিত ছিল এবং উহার পরিধি-পরিমাণ চারি মাইল নির্দ্দিষ্ট হইত। সিন্ধুদেশীয় প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের বিবরণে প্রতিপন্ন হয়, রাজা দাহিরের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ সিন্ধু-দেশের রাজধানী ছিল। পরে দিলু-রায়ের শাসন-সময়ে রাজার অপকর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণাবাদ ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ‡ দিলু-রায়ের শাসনকাল সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে মতান্তর দেখিতে পাই। এম' মার্দো বলেন, তিনি ৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ব্রাহ্মণাবাদ ভূমিকম্পে ধ্বংস

---

* সেওয়ানের প্রাচীনত্ব বিষয়ে এম' মার্দো বলিয়া গিয়াছেন,—"Schvan is undoubtedly a place of vast antiquity; perhaps more so than either Alor or Bahmana."—*Vide* M'Murdo, *Journal of the Royal Asiatic Society.*

† Sir Henry Elliot's *Mahomedan Historians of India.*

‡ "The city was destroyed by some terrible convulsions of nature."—*Journal of the Asiatic Society of Bombay.*

হওয়া সম্বন্ধে রিচার্ডসন ও বেলাসিন প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন, প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে ব্রাহ্মণাবাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

দক্ষিণ-সিন্ধু ও কচ্ছ প্রভৃতি।

সিন্ধুদেশের তৃতীয় বিভাগ দক্ষিণ-সিন্ধু প্রদেশ অধুনা 'লার' (Lar) নামে পরিচিত। হুয়েন-সাঙের গণনাক্রমে এই প্রদেশের পরিধি-পরিমাণ—তিন হাজার লি (প্রায় পাঁচ শত মাইল)। হায়দ্রাবাদ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত দক্ষিণ-সিন্ধু-প্রদেশ বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বে উমারকোটের মরুভূমি এবং পশ্চিমে মঞ্জ-অন্তরীপ-সন্নিহিত পর্ব্বত-মালা—এই সীমানার মধ্যে যে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড দৃষ্ট হয়, উহাও তখন দক্ষিণ-সিন্ধুর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এ হিসাবে, দক্ষিণ-সিন্ধুদেশের চতুঃসীমানার পরিমাণ—পশ্চিম দিকের পর্ব্বত হইতে উমারকোট পর্য্যন্ত ১৬০ মাইল, উক্ত পর্ব্বত হইতে মঞ্জ অন্তরীপ পর্য্যন্ত ৮৫ মাইল, মঞ্জ অন্তরীপ হইতে সিন্ধু-নদের কোরি-শাখার মোহানা পর্য্যন্ত ১৩৫ মাইল, এবং কোরির মোহানা হইতে উমারকোট পর্য্যন্ত ১৪০ মাইল। এই সীমার পরিধি-পরিমাণ ৫২০ মাইল। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ-প্রণেতা বলেন, তাঁহার সমসময়ে মিন্নাগড়—দক্ষিণ সিন্ধুর রাজধানী ছিল। কিন্তু হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় কেবলমাত্র পীতশিলা বা পাটলের নাম দেখিতে পাই। মহম্মদ বিন কাসিমের সময়ে দক্ষিণ সিন্ধু-দেশের দেবল এবং নিরানকোট বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। আরবদেশীয় ঐতিহাসিকগণ আবার 'মঞ্জরী' নামক একটি স্থানের প্রসিদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দেবল হইতে সিন্ধু-নদের পশ্চিম দিকে দুই দিন গমন করিলে মঞ্জবারি নগরে উপনীত হওয়া যায়। নিরাণকোটের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে 'দেবল' সমুদ্রতীরস্থিত একটি বন্দর মধ্যে পরিগণিত ছিল। সার হেন্‌রি ইলিয়টের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে হাকিম আপন ভ্রাতা মুগিরাকে দেবল উপসাগর-জয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। * সিন্ধুদেশের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট মিঃ ক্রো বলেন,—করাচী ও তাতা নগরীর মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে দেবল অবস্থিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনেকেই মিঃ ক্রোর সিদ্ধান্ত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার দেবলকে বর্ত্তমান করাচী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কাহারও কাহারও মতে,—দেবল সিন্ধুনদের তীরে অবস্থিত ছিল; সুতরাং দেবল ও করাচী অভিন্ন হইতে পারে না। এইরূপ দেবলের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে আজিও নানা বিতণ্ডা দেখিতে পাই। কানিংহাম বলেন,—ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী-পরিবৃত দেবল নগরী সিন্ধুর 'ব'-দ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। পারস্য-দেশীয় পরিব্রাজক প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইবন্-বাতুতার বর্ণনায় কানিংহামের এতদুক্তির সমর্থন দৃষ্ট হয়। ১৩৩ খৃষ্টাব্দে ইবন্-বাতুতা সিন্ধুদেশে উপনীত হন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—'সিন্ধু-নদ দিয়া আমি লাহারিতে (Lahari) উপনীত হই। লাহারি—ভারত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এইখানে সিন্ধুনদ আসিয়া সাগরে মিশিয়াছে। লাহারিতে একটী প্রসিদ্ধ বন্দর আছে। পারস্য, ইয়েমেন এবং অন্যান্য স্থান হইতে সেই বন্দরে বাণিজ্যপোত-সমূহ আগমন করে। লাহারি হইতে কয়েক মাইল দূরে আর

---

* *Vide*, Sir Henry Elliotis *Arabs in Sind.*

একটী বন্দরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মনুষ্য ও পশুয়াকার প্রস্তরখণ্ড সমূহ দণ্ডায়মান। জনপ্রবাদ,—তৎপ্রদেশের অধিবাসীদিগের অনাচার ও অপকর্ম্মের জন্ম সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর তাহাদিগকে এবং তাহাদের পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলকে প্রস্তররূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।' * এতদ্বিবরণ দৃষ্টে প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম বলেন, ধ্বংসাবশিষ্ট নগরই প্রাচীন দেবল। 'আরব্য উপন্যাসে' একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। তাহা হইতেও অনেকে দেবলের স্থান-নির্দ্দেশে সচেষ্ট হইয়া থাকেন। উপাখ্যানটী এই,—'জোবেইদ নাম্নী একজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া স্ত্রীলোক বসোরা হইতে জাহাজে চড়িয়া, কুড়ি দিন পরে, ভারতবর্ষের একটি বন্দরে আসিয়া উপনীত হন। সেখানে আসিয়া তিনি দেখিতে পান, সেখানকার রাজা ও রাণী এবং সমস্ত অধিবাসী প্রস্তরে পরিণত হইয়া আছেন। দেশের একটিমাত্র লোক—রাজপুত্র—সেই সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। একজন মুসলমান ক্রীতদাসী তাঁহাকে লালন-পালন করিয়াছিল; তজ্জন্ম তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছেন।' আরব্য-উপন্যাসের এই উপাখ্যানের সহিত রাজা 'দিলু' এবং তাঁহার ভ্রাতা 'ছোট' সংক্রান্ত উপাখ্যানের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দেশীয় ঐতিহাসিকগণ দিলুর ও ছোটর বিবরণ আরব্য-উপন্যাসের ন্যায় বর্ণন করিয়া ছোটর মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সেই উপাখ্যান হইতে প্রতীত হয়, রাজা দিলুর পাপে ভূমিকম্পে ব্রাহ্মণ-নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, ছোট পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। সিন্ধু দেশের এবং পাঞ্জাবের প্রধান প্রধান নগর বিধ্বস্ত হওয়ার বিষয় প্রায়ই এইরূপ উপকথায় পরিপূর্ণ। সুতরাং 'আরব্য-উপন্যাসের' বর্ণিত প্রোক্ত উপাখ্যানে সিন্ধুদেশের বিষয়ই লক্ষ্য করা হইয়াছে, বুঝা যাইতে পারে। সিন্ধু-দেশের উপকূলে সেকালে দেবলই প্রসিদ্ধ স্থান ছিল; মুসলমান বণিকগণ প্রায়ই সেখানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। সুতরাং জোবেইদ যে নগরীর বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ যে নগরের সকল অধিবাসী প্রস্তরে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সে নগর দেবল নগর হওয়াই সম্ভবপর। এম' মার্দ্দোর গণনা অনুসারে, ৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ-নগর ধ্বংস হওয়ার বিষয় সিদ্ধান্ত হয়। জোবেইদের বর্ণিত উপাখ্যান বোগদাদের খালিফ হারুণ-অল-রসিদের সময়ের ঘটনা। হারুণ-অল-রসিদ ৭৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং সময়ের ব্যবধান অনুসারে উভয় ঘটনাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সিন্ধু-নদের প্রধান শাখা বাঘালের তীরেও কেহ কেহ দেবল নগরের অবস্থিতির বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকেন। সেখানে দিবল-সিন্ধু নামে এক নগরীর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। সিন্ধু-নদের তীরস্থিত দেবল-নগরীর ঐ নামে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর। সিন্ধু-দেশের অপর বিভাগ কচ্ছের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কচ্ছ কখনও স্বতন্ত্র জনপদ ছিল, কখনও সিন্ধু-দেশের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল। সিন্ধু-দেশের সীমানা সময় সময় বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া-

---

* ডাক্তার লি কর্ত্তৃক অনুবাদিত ইবন্‌-বাতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এতদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। *Vide*, Ibn Batuta's *Travels* by Dr. Lee.

ছিল। আবুল-ফজেল বলেন,—কাশ্মীর-প্রদেশ সিন্ধুরাজ দাহিরের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এল্‌ফিন্‌ষ্টোন এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—কাশ্মীরের ইতিহাসে দেখা যায়, ঐ সময়ে কাশ্মীরে একজন প্রবল-প্রতাপশালী নৃপতি রাজত্ব করিতেন; সিন্ধু-দেশ ভিন্ন তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দেশীয় ঐতিহাসিকগণের রচনা হইতে কাপ্তেন পটিঞ্জার কিন্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক সময়ে সিন্ধু-রাজ্য উত্তরে কাবুল এবং দক্ষিণে মাড়োয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কাপ্তেন বার্ণেস বলেন,—কান্দাহার এবং কনোজ-রাজ্য সিন্ধুদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সিন্ধু-দেশের এবং সিন্ধু-নদের নাম পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেরই সম্বন্ধ-সংশ্রব প্রথমে সিন্ধু-দেশেই আরম্ভ হইয়াছিল।

সিন্ধু ও হিন্দু।

কেহ কেহ তাই অনুমান করেন, 'সিন্ধু' শব্দ হইতেই 'হিন্দু' নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের মতে, পারসিকগণের নিকট হইতেই পাশ্চাত্য জাতিরা 'হিন্দু' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পারসীকগণ 'সপ্তসিন্ধুকে' 'হপ্তহিন্দু' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা 'স' স্থনে 'হ' উচ্চারণ করায় 'সিন্ধু' স্থলে 'হিন্দু' এবং 'সিন্ধুস্থান' স্থলে 'হিন্দুস্থান' নাম দাঁড়াইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে অস্মদ্দেশ-প্রচলিত 'সপ্তাহ' শব্দ 'হপ্তাহ' বা 'হপ্তা' রূপে উচ্চারিত হওয়ার কথাও তাঁহারা উল্লেখ করিয়া থাকেন। * পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রায়ই হিন্দু নাম দৃষ্ট হয় না। অনেকে তাই 'হিন্দু' নামকে আধুনিক বলিয়া মনে করেন। 'মেরুতন্ত্রে' হিন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি-মূলক 'হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে' ইত্যাদি পাঠ দৃষ্ট হয়; পারস্য-ভাষাভাষী জনগণ কর্ত্তৃক 'হিন্দু' সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল,—'মেরুতন্ত্র' পাঠে তাহা বুঝিতে পারি। তদ্দ্বারা 'সিন্ধু' হইতেই 'হিন্দু'-নামোৎপত্তির যুক্তির প্রাবল্য সূচিত হইতে পারে।

* 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেক মতান্তর দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন,—'হিন্দ' শব্দ হইতে 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে; 'হিন্দ' শব্দের অর্থ—'কৃষ্ণবর্ণ'। কেহ আবার বলেন,—'হীনতা'-জ্ঞাপক শব্দ—'হিন্দু'; পাশ্চাত্য জাতিরা ভারতবাসী হিন্দু-জাতিকে 'হীনজাতি' বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য 'হিন্দু' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ আবার বলেন,—'হিন্দু' শব্দে 'কাফের' বা 'অবিশ্বাসী' বুঝাইয়া থাকে; সেই জন্যই মুসলমানগণ এদেশবাসীকে 'হিন্দু' সংজ্ঞা প্রদান করেন। কিন্তু এ সকল উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। প্রতীত হয়, পারসীকগণের 'জেন্দ' ভাষার 'হিন্দব' শব্দ হইতে 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'হিন্দব' শব্দ—গৌরবার্থক সম্মান-জ্ঞাপক। ঐ শব্দ হিব্রু ভাষায় 'হুনদু' রূপে লিখিত হয়। সেখানেও ঐ শব্দ তেজোবিক্রমশক্তি-প্রকাশক। এক সময়ে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের প্রান্ত-সীমা পর্য্যন্ত হিন্দু-রাজ্য বিস্তৃত ছিল; হিন্দুগণের রাজ্যের সীমাজ্ঞাপক সেই পর্ব্বতকে গ্রীকগণ তাই 'হিন্দকোশ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'হিন্দ' শব্দ পস্তু-ভষোয় 'হুনদু' রূপ ধারণ করে। শেষে সেই শব্দ হিন্দু রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু সকল সময়েই ঐ শব্দ মহত্ব ব্যঞ্জক ও গুণগরিমার পরিচায়ক ছিল, দেখিতে পাই। এতৎ-সংক্রান্ত অন্যান্য বক্তব্য "পৃথিবীর ইতিহাস," প্রথম খণ্ডে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ১৭শ পৃষ্ঠায়, 'হিন্দু' শব্দ-তত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—•:*:•—

অন্যান্য প্রাচীন জনপদ।

[প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব-নির্ণয়ে সমস্যার কথা;—চেদিরাজ্য,—বর্ত্তমান অবস্থান;—ত্রিগর্ত্ত-দেশ,—জলন্ধর ও ত্রিগর্ত্ত-দেশের অভিন্নত্ব,—প্রাচীন ও আধুনিক বৃত্তান্ত;—ভোজ-রাজ্য,—যদুবংশীয় রাজা ভোজ এবং প্রমার-বংশীয় রাজা ভোজ,—মালব ও ভোজ,—ভোজরাজ্যের ইতিবৃত্ত;—দশার্ণ-দেশ,—মদ্রদেশ,—অবস্থিতির পরিচয়;—অন্যান্য জনপদের প্রসঙ্গ।)

ভারতবর্ষের প্রাচীন-জনপদের অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত-প্রায়। কালভেদে শাসন-ভেদে ভারতবর্ষের অধিকাংশ জনপদেরই নাম এখন পরিবর্ত্তিত। অনেকগুলির সন্ধান পর্য্যন্ত এখন পাওয়া যায় না; অনেকগুলি নামান্তরে রূপান্তরে অবস্থিত রহিয়াছে।

অন্যান্য প্রাচীন-রাজ্য।

চেদি, ত্রিগর্ত্ত, ভোজ, মদ্র, দশার্ণ প্রভৃতি রাজ্য এক সময়ে কতই প্রতাপশালী লইয়া উঠিয়াছিল! এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের সীমান্ত-প্রদেশেও কত নামে কত জাতির ও কত দেশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। পুরাণাদির বর্ণনা অনুসারে সেই সকল দেশের ও জনপদের স্থান-নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অনেক সময় বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। একই নামের একই জাতির বসতি-স্থান বা একই নামের একই দেশের অবস্থিতির পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিতে পাই। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে কম্বোজ প্রভৃতি দেশ ভাবতবর্ষের উত্তর-ভাগে অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু গরুড়-পুরাণের মতে কম্বোজ ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ত্রিগর্ত্ত-দেশ, কোনও পুরাণের মতে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর ভাগে; আবার কোনও পুরাণ অনুসারে, উহা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে বিদ্যমান। এইরূপ অনেক জনপদের অবস্থান বিষয়ে নানা মত দেখিতে পাই। সুতরাং ঐ সকল প্রাচীন-রাজ্যের স্থান-নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া এখন বিড়ম্বনা মাত্র। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, একই রাজবংশের রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে একই নামে স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর। সেই জন্যই, তৎসমুদায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় আপাততঃ বিরত রহিলাম। তবে যে কয়েকটী স্থান অধুনা চিহ্নিত হইয়া থাকে, তাহারই মধ্যে আরও কতকগুলির আভাষ আমরা এখানে প্রদান করিতেছি।

চেদি-রাজ্যের নাম মহাভারতে ও পুরাণে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত। উপরিচর বসু চেদিপতি বলিয়া অভিহিত হইতেন। দমঘোষের পুত্র শিশুপাল চেদি-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

চেদি-রাজ্য।

আবার পুরু-বংশান্তর্গত ক্রোষ্টুর বংশে চেদি নামক নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল নৃপতির রাজ্য চেদি-দেশ নামে পরিচিত। কিন্তু চেদি-দেশ কোথায় ছিল? এখন কোথায়ই বা তাহার স্থান-নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? চেদি-রাজ্য এক এক সময়ে এক এক দেশে প্রতিষ্ঠাম্বিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে কেহ বলেন, বুন্দেলখণ্ডের এবং বাঘেলখণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানে চেদিগণের রাজধানী ছিল। কেহ আবার বলেন, নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী ভূ-খণ্ডে চেদি-

রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। চেদি-বংশ—কলচুরি (কোলচুরি) ও হৈহয় নামেও পরিচিত। ত্রৈপুর (ত্রিপুর), তুম্মান, ডাহল এবং চৈত্ত প্রভৃতি নামেও চেদি-রাজ্য অভিহিত হয়। আধুনিক কালে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, নর্ম্মদার তীরদেশে, চেদি-রাজ্য বিশেষ প্রতিপত্তিশালী রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তখন কালিঞ্জরের গিরিদুর্গে চেদি-রাজগণের রাজধানী স্থাপিত হয়। ২৪৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চেদি-রাজগণ একটী সংবৎ প্রচলিত করেন। সেই সময়েই তাঁহারা কলিঞ্জর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। চেদি-রাজ্য এক সময়ে দক্ষিণে কর্ণাট এবং উত্তরে বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চান্দেল বা চন্দ্রাদিত্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ চেদিরাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। গুজরাটের 'বাঘেল'-বংশীয় রাজগণ ত্রৈপুরের চেদি-রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। পরিশেষে সে রাজ্য মুসলমানগণের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। মধ্যভারতে, জব্বলপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, তেওয়ার নামক একটী স্থান দৃষ্ট হয়। অনেকে তাহাকে প্রাচীন ত্রিপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুরাসুর দৈত্য ঐ স্থানে নিহত হইয়াছিল। সেই জন্য ঐ স্থান ত্রিপুর নামে অভিহিত। ফলতঃ, নর্ম্মদা-নদীর উৎপত্তি-স্থানের সন্নিকটে এক সময়ে চেদি-রাজ্যের রাজধানী ছিল,—ইহাই অনুমান হয়। কালে চেদি-রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। তখন এক অংশ মহাকোশল নামে এবং অপর অংশ চেদি-রাজ্য নামে পরিচিত হইয়াছিল। মধ্য-ভারতে মণিপুর নামে যে এক নগরীর পরিচয় পাওয়া যায়, সেই মণিপুর মহা-কোশলের রাজধানী ছিল। ত্রিপুর বা চেদি—চেদি-রাজ্যের রাজধানী।

ত্রিগর্ত্ত-দেশ।

ত্রিগর্ত্ত-রাজ্যের বিষয় মহাভারতের নানা স্থানে উল্লিখিত। বিরাট-রাজ্যে পাণ্ডবগণের অবস্থান-কালে ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা উত্তর-গো-গৃহ হইতে গোধন হরণ করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে যে সমরানল প্রজ্বলিত হয়, মহাভারত-পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সে ত্রিগর্ত্তদেশের আধুনিক নাম জলন্ধর। তিনটী নদী (শতদ্রু, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা) সেই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলিয়া পুরাকালে সেই দেশ 'ত্রিগর্ত্ত' দেশ নামে অভিহিত হইয়াছিল। ত্রিগর্ত্তের জলন্ধর নামও প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পদ্মপুরাণে জলন্ধর-প্রদেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে। সে উপাখ্যানে প্রকাশ—পুরাকালে ঐ স্থান পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। জলন্ধর নামক দানবের বাসের জন্য, দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্যের অনুরোধে, সাগর ঐ স্থান হইতে সরিয়া গিয়াছেন। এই উপাখ্যানের মৌলিকত্ব স্বীকার করিতে হইলে ঐ প্রদেশের আদি নাম জলন্ধর বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে জলন্ধরই ত্রিগর্ত্ত-দেশ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশেষ মতান্তর আছে। ত্রিগর্ত্ত-দেশই পরিশেষে জলন্ধর নাম গ্রহণ করিয়াছিল, ইহাই প্রসিদ্ধি। ত্রিগর্ত্ত-দেশ অনেক সময় স্বাধীন-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং উহার সীমা-পরিমাণ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন-সাং জলন্ধর-প্রদেশ দর্শন করেন। জলন্ধর তখন একটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য মধ্যে পরিগণিত। উহার দৈর্ঘ্য

পূর্ব-পশ্চিমে এক হাজার লি (এক শত সাতষট্টি মাইল) এবং বিস্তৃতি উত্তর-দক্ষিণে আট শত লি (এক শত তেত্রিশ মাইল)। কানিংহাম তাহা হইতে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, উত্তরের চম্বা, পূর্ব্বের মাণ্ডি ও সুকেত এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বের শতদ্রু প্রভৃতি তখন জলন্ধরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জলন্ধর-প্রদেশে জ্বালামুখী, জলন্ধর পীঠ প্রভৃতি তীর্থ বিদ্যমান। পুরাণে লিখিত আছে, প্রবল-প্রতাপশালী জলন্ধর দৈত্যের সংহার জন্য শিব মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। যোগিনীগণের চক্রান্তে পতিত হইয়া জলন্ধর দস্যু কুপথগামী হইলে, শিব কর্ত্তৃক তাহার সংহার-সাধন হয়। প্রস্তর চাপে দানবের দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। জলন্ধর-প্রদেশের উৎপত্তিমূলক ইতিবৃত্তে—'জলন্ধর-পুরাণে'—এইরূপ কাহিনী বর্ণিত আছে। মৃত্যুকালে জলন্ধরের মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হয়। সেই শিখা জ্বালামুখী নামে অভিহিত। সিন্ধু-নদের ব-দ্বীপে জলন্ধর দস্যুর পৃষ্ঠদেশ পতিত হইয়াছিল। সেই জন্য ঐ স্থান জলন্ধর পীঠ নামে পরিচিত। জলন্ধর দানবের আকার এতই বিরাট ছিল যে, মৃত্যুকালে তাহার দেহ দোয়াব হইতে মুলতান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। হুয়েন-সাং জলন্ধর-রাজ্যের রাজধানী জলন্ধর সহরে এক মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। 'উ-তি-তো' (U-ti-to) বা 'উদিত' নামক রাজা তখন জলন্ধরে রাজত্ব করিতেন। হুয়েন-সাঙের ভারতাগমনের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে (৮০৪ খৃষ্টাব্দে) জয়চন্দ্র নামক জলন্ধরের জনৈক নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। খোদিত প্রস্তর-লিপিতে তাঁহার ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষে 'আদিম' নামক জনৈক নৃপতির নাম আছে। হুয়েন-সাঙের 'উ-তি-তো' বা উদিত এবং আদিম যে অভিন্ন, তাহা অনেকেই অনুমান করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে ত্রিগর্ত্ত-রাজ্য কাশ্মীরের নৃপতি কর্ত্তৃক 'প্রবরেশের' নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। ১০২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীরাধিপতি অনন্ত জলন্ধরের রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের (ইন্দুচন্দ্রের) দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সে সময়ে জলন্ধর স্বাধীন রাজ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। কাঙ্গাড়া উপত্যকা তখন জলন্ধর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্ত্তিকালে জলন্ধর-রাজ্য—গুলার, যশোয়াল, দাতরপুর এবং শিব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হয়। কাঙ্গাড়ায় তখন জলন্ধরের রাজধানী ছিল। গজনীর মামুদ কর্ত্তৃক কাঙ্গাড়া আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে সেই সকল রাজ্য কাঙ্গাড়ার করদ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইত। কিন্তু কাঙ্গাড়া গজনীর মামুদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সম্পূর্ণরূপে কাঙ্গাড়ার প্রাধান্য অস্বীকার করে। দিল্লীতে যখন মোগল-বাদসাহগণের প্রবল প্রতাপ সে সময়েও অনেক দিন পর্য্যন্ত জলন্ধরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। ফরাসী-পরিব্রাজক 'থেভেনো' (Thevenot) তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দিল্লীর সম্রাটের রাজৈশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণে দেখিতে পাই, জলন্ধরের অনেকগুলি রাজা মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু 'থেভেনোর' উক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কানিংহাম প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বড়ই সন্দিহান। কারণ, কাঙ্গাড়ার রাজধানী নগরকোট গজনীর মামুদ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, আবু-রিহাণের গ্রন্থে বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিলে প্রতীত হয়,—

সেই সকল স্থানে মোগল বাদসাহদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তবে যে ভ্রমণকারী 'হাউদ' (Haoud) বা 'আউদ' (Ayoud) নামক স্বাধীন রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, পণ্ডিতগণ বলেন, তাহা হিমবৎ বা হিমালয় শব্দের অপভ্রংশ। অর্থাৎ, হিমালয়ের কোনও কোনও দুর্গম গিরি-কন্দরে মোগল-বাদসাহগণ হয় তো আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই, ফরাসী-ভ্রমণকারীর উক্তিতে তাহাই বুঝাইতে পারে। মুসলমানদিগের হস্ত হইতে জলন্ধর-প্রদেশ পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। শিখ-যুদ্ধের পর জলন্ধর ইংরেজের অধিকারে আসিয়াছে। এখন উহা পঞ্জাবের একটী বিভাগ মধ্যে পরিগণিত। কাঙ্গাড়া, হুশিয়ারপুর এবং জলন্ধর এই তিনটী জেলা সেই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন ত্রিগর্ত্ত-রাজ্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত—এমন কি নাম পর্য্যন্ত, কালে কালে এইরূপে লোপপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

মহাভারতে এবং পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে রাজা ভোজের এবং ভোজ-রাজ্যের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। ভোজ-রাজ্য কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে দ্বিবিধ মত প্রচলিত। যদুবংশে বসুদেবের এক পুত্রের নাম ভোজ। তাঁহারই নামানুসারে ভোজ-রাজ্যের নামকরণ হইয়াছিল,* অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। কেহ কেহ আবার বলেন,—প্রমার-বংশীয় রাজপুত নৃপতি রাজা ভোজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন; তাঁহারই নামানুসারে ভোজ-রাজ্যের নামকরণ হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, প্রমার-বংশীয় রাজা ভোজ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহার বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভোজ-রাজ্যের ও রাজা ভোজের প্রসিদ্ধি আছে। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় ভোজ-রাজ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে ভোজ-রাজ্য উত্তর-দেশীয় জনপদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। মৎস্যপুরাণে ভোজ-রাজ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত। সেখানে ভোজ-রাজ্য বিন্ধ্যাচলের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত জনপদ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সুতরাং অতি প্রাচীন-কাল হইতেই ভোজ-রাজ্যের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন ভোজ-রাজ্য বলিতে অধুনা ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশকে বুঝাইতে পারে? প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ নির্দ্ধারণ করেন, বিক্রমাদিত্যের সময়ে যাহা মালব বা উজ্জয়িনী-রাজ্য ছিল, অতি প্রাচীন-কালে সেই প্রদেশ ভোজ-রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইত; পরবর্ত্তিকালেও সেই প্রদেশই পুনরায় ভোজ-রাজ্য সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের সম-সময়ে বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে ভোজ-রাজ্যের নাম লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরিশেষে প্রমার-বংশীয় রাজা ভোজ কর্ত্তৃক ভোজ-রাজ্যের নাম উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যদুবংশীয় নৃপতি ভোজ কোন্ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এখন তাহা কি নামে পরিচিত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে প্রমার-বংশীয় রাজা ভোজ যে নগরে রাজত্ব করিতেন, তাহার পরিচয় এখন জাজ্বল্যমান হইয়া আছে। মালব-প্রদেশে 'ধার' নামক যে নগর দেখিতে পাই, ঐ নগরীতে রাজা ভোজের রাজধানী ছিল। প্রমার-বংশীয় রাজা ভোজ মামুদ গজনীর সম-সাময়িক। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে আবু-পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী অচলগড়

গিরিদুর্গ হইতে প্রমার-বংশীয় রাজপুত ক্ষত্রিয়গণ মালব-দেশে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। প্রমার-বংশীয় রাজা উপেন্দ্র কর্ত্তৃক ধার-নগরে তাঁহাদের প্রথম রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। উপেন্দ্রের অধস্তন পঞ্চম পুরুষে রাজা হর্ষদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে 'মান্যখেতে' রাষ্ট্রকূট-বংশের অভ্যুদয় হয়। তজ্জন্য, রাজ্য-রক্ষায় তাঁহাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। হর্ষদেবের পুত্র—মুঞ্জ। তিনি কবি এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে ধানিক, ধনঞ্জয় এবং হলায়ুধ প্রমুখ গ্রন্থকারগণ সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিপুরের চেদিদিগকে পরাভূত করেন। কল্যাণের রাজা তৈলপ তাঁহার নিকট ষোল বার যুদ্ধে পরাজিত হন। কিন্তু তৈলপের সহিত সপ্তদশ সমরে মুঞ্জ পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। পরিশেষে ৯৯৩ খৃষ্টাব্দে পলায়নের চেষ্টা করায়, মুঞ্জ প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হন। মুঞ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সিন্ধুরাজ মালবের আধিপত্য লাভ করেন। তিনি বংশ-গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। সিন্ধুরাজের পর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা ভোজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কবি ও গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। * তাঁহার শাসন-সময়ে, তাঁহার উৎসাহ-বারি-সেচনে, অলঙ্কার, জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং ব্যবহার-বিধি সংক্রান্ত গ্রন্থাদি লিখিত হওয়ায়, সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের 'বত্রিশ সিংহাসন' রাজা ভোজ উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই ভোজ-রাজকে কেহ রাজা বিক্রমাদিত্য বলিয়া মনে করেন। তদনুসারে তাঁহারা কালিদাস-প্রমুখ নবরত্নকে এই ভোজ-রাজের সম-সাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত আদৌ প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয় না। পুরাকালে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বিক্রমাদিত্য এবং ভোজ নামে বহু নৃপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্য এবং ভোজ—এক হিসাবে, সেই রাজন্যবর্গের উপাধি বলিলেও বলা যাইতে পারে। হয় তো, শেষ বিক্রমাদিত্য ভোজ নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, অথবা রাজা ভোজই বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভোজ-রাজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; সুতরাং বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহার নবরত্ন পণ্ডিত-সভা থাকাও অসম্ভব নহে। 'ভোজ-প্রবন্ধ' গ্রন্থে লিখিত আছে, ভোজরাজের পিতার নাম—সিন্ধুল, এবং মুঞ্জ তাঁহার খুল্লতাত। রাজা সিন্ধুলের মৃত্যুর পর মুঞ্জ যখন সিংহাসন প্রাপ্ত হন, ভোজ তখন বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া যশস্বী হইতেছিলেন। ইহাতে মুঞ্জের মনে সিংহাসনচ্যুতির আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ভোজকে বিনাশ করিবার জন্য তিনি নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। বৎসরাজ তখন ভোজ রাজের

* ভোজ-রাজ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে 'পাতঞ্জলি-টীকা' (পাতঞ্জল দর্শনের টীকা) বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভোজ-রাজের রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম—অমর-টীকা, চম্পূরামায়ণ, চারুচর্য্যা, সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ ও রাজবার্ত্তিক।

† 'ভোজ-প্রবন্ধ' বল্লালসেন কর্ত্তৃক ১২০০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে,—১১০০ খৃষ্টাব্দে কালিদাস উজ্জয়িনী-রাজ ভোজের সভাসদ ছিলেন। কিন্তু এই কালিদাস এবং বিক্রমাদিত্যের সভাসদ কবি কালিদাস যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ভোজ-প্রবন্ধ অনুসারে যে সকল পণ্ডিত ভোজ-রাজের সভা অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের নাম—কর্পূর, কলিঙ্গ, কামদেব, কালিদাস, গোপালদেব, জয়দেব, তারেন্দ্র, দামোদর, ধনপাল, ভবভূতি, ভাস্কর, ময়ূর, মল্লিনাথ, মহেশ্বর, মাঘ, মুচকুন্দ, রামচন্দ্র, রামেশ্বরভক্ত, বাণ, বিদ্যাবিনোদ, বিশ্ববসু, বিষ্ণুকবি, শঙ্কর, শুক, শ্রীচন্দ্র, সম্বদেব, সাতা, সীমন্ত, সুবন্ধু, সোমনাথ, হরিবংশ প্রভৃতি।

করদ-নৃপতি মধ্যে গণ্য ছিলেন। তাঁহার হস্তে ভোজের সংহার-সাধনের ভার অর্পিত হয়। কিন্তু সেই সুলক্ষণাক্রান্ত বালকের কমনীয়-কান্তি দর্শনে, বৎসরাজ তাঁহাকে সংহার করিতে কুণ্ঠিত হন। ভোজের রক্তের পরিবর্তে পশুর রক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া বৎসরাজ মুঞ্জের নিকট ভোজের নিধন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। সেই রক্ত-রঞ্জিত অসি দর্শন করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, মুঞ্জ যখন আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বৎসরাজ একটী পত্রে কয়েকটী কথা লিখিয়া রাজার হস্তে অর্পণ করেন। সে কথা কয়টী গভীর বৈরাগ্যোদ্দীপক। তাহার মর্ম্ম—'নৃপ-শিরোমণি মান্ধাতা, রাবণারি রামচন্দ্র এবং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির সকলকেই ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু ধরিত্রী কাহারও অনুগামিনী হন নাই; রাজা মুঞ্জের সহিত এবার তিনি রসাতলে গমন করিবেন।' এই কথা কয়েকটী পাঠ করিয়া, মুঞ্জের হৃদয়ে বিবেকের উদয় হয়। মুঞ্জ ভাবিতে লাগিলেন,—'জীবন নশ্বর; আমি কিসের জন্য কুমারের সংহার-সাধন করিলাম?' আবেগ-ভরে তিনি তাই বৎস-রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কুমার কি সত্যই জীবিত নাই? কুমার জীবিত থাকিলে আমি তাহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতাম।' রাজার উদ্বেগ দর্শনে বৎসরাজ সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন; ভোজকে মুঞ্জ সমীপে উপস্থিত করিলেন। ইহার পর ভোজকে তাঁহার পিতৃ-সিংহাসন প্রদান করিয়া মুঞ্জ ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে, বিবিধ সদনুষ্ঠানে, ভোজ-রাজের যশঃজ্যোতি দিগ্দিগন্তে এতই বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে, পরবর্ত্তি-কালে 'ভোজ-রাজ' নাম গ্রহণে ভোজ-রাজের পদাঙ্ক অনুসরণে, ভোজ-রাজ বলিয়া পরিচয় দিতে, মালব-দেশের নৃপতিগণ বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেন। মালব-দেশের শেষ ভোজ-রাজ যেমন বিদ্যোৎসাহী, তেমনি বীর ছিলেন। মামুদ গজনী যখন কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া রাজা ভোজ বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। চেদি এবং চৌলুক্যগণের রাজ্য সময় সময় ভোজের অধিকারভুক্ত হয়। সেই জন্য, গুজরাটের নৃপতির সহিত মিলিত হইয়া চেদি ও চৌলুক্য রাজগণ ভোজ-রাজ্য আক্রমণ করেন। সেই সময়ে, ১০৬২ খৃষ্টাব্দে, ভোজরাজের ইহলীলা সাঙ্গ হয়। তাঁহার পুত্র উদয়াদিত্য পিতৃশত্রু-সংহারে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। পৌত্র উদয়াদিত্য ১১০৪ খৃষ্টাব্দে চেদি-দিগের রাজধানী ত্রিপুর অধিকার করেন। ১২৩২ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলতমাস কর্ত্তৃক মালব আক্রান্ত এবং উজ্জয়িনী ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। তাহার পর প্রমার-রাজগণ ধার-নগরে অনেক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খিলিজীর সময়ে ভোজ-রাজ্য মুসলমান-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দশার্ণ নামক আর এক প্রাচীন জনপদের নাম মহাভারতে এবং পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। সঞ্জয়ের উক্তিতে দশার্ণ উত্তরদেশস্থিত জনপদ বলিয়া পরিচিত।

দশার্ণ ও মত্র-রাজা।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় অর্জ্জুন দশার্ণ দেশে উপনীত হইলে, তত্রত্য রাজা চিত্রাঙ্গদ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। মৎস্য-পুরাণে দশার্ণ-দেশ বিন্ধ্য-পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে। মালবের এবং ভোজ-রাজ্যের পূর্ব্বোত্তর পার্শ্বে, যমুনা-তীর পর্য্যন্ত, এই রাজ্য বিস্তৃত

ছিল, পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে বলেন,—'দশান' নাম্নী নদী ঐ স্থান দিয়া প্রবাহিত; এই জন্য ঐ স্থান 'দশান' নামেও পরিচিত। টলেমির বর্ণনায় 'দোশারোণ' নামক (Dosaron) এক জনপদের নাম দৃষ্ট হয়। অনেকে সেই জনপদকে দশার্ণ বলিয়া মনে করেন। ভোজ ও মালব রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বে, যমুনা নদীর দক্ষিণাংশে, দশার্ণ-দেশ চিহ্নিত হইয়া থাকে। উহার দক্ষিণে চিত্রকূট পর্ব্বত এবং উত্তরে পাঞ্চাল-রাজ্য। এখন আর দশার্ণ দেশের কোনও চিহ্ন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। প্রাচীন মদ্র-দেশের পরিচয়-চিহ্নও দশার্ণের ন্যায় লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন জনপদের মধ্যে মদ্র-দেশের নাম বিশেষ পরিচিত; কিন্তু প্রাচীন মদ্র-দেশের অবস্থান বিষয়ে এখন চতুর্ব্বিধ মত প্রচলিত। মহাভারতে, সঞ্জয়োক্তিতে, মদ্র-দেশ উত্তর-দেশীয় জনপদ রূপে উল্লিখিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মদ্রক নামধেয় এবং গরুড়পুরাণে মদ্র নামক ভারতের উত্তর-প্রান্তস্থিত দেশের উল্লেখ আছে। ঐ দুই পুরাণের এবং মৎস্যপুরাণের 'গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধু-সৌবীর-মদ্রকা' প্রভৃতি উক্তিতে মদ্র-দেশ গান্ধারাদির পার্শ্বে অবস্থিত ছিল, বুঝিতে পারা যায়। সে হিসাবে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইরাবতী (Ravi) ও বিতস্তা (Jhelum) নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে মদ্র-দেশ নামে পরিচিত করিয়া থাকেন। ইহাই সাধারণ মত। দ্বিতীয় মত,—বিরাট ও পাণ্ড্য-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী, পূর্ব্ব-দক্ষিণে বিস্তৃত, জনপদ মদ্র-দেশ নামে অভিহিত। শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্রে মদ্র-দেশের অবস্থিতির সেইরূপ পরিচয়ই প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—'বৈরাট পাণ্ড্যয়োর্মধ্যে পূর্ব্বদক্ষক্রমেণ তু। মদ্রদেশঃ সমাখ্যাতো মাদ্রীহা তত্র তিষ্ঠতি॥' তৃতীয় মত,—মদ্র-দেশ প্রাচীন 'মিডিয়া' রাজ্য; মদ্রদেশ পাশ্চাত্য-জাতির নিকট 'মিডিয়া' নামে পরিচিত হইয়াছিল। চতুর্থ মত,—বর্ত্তমান মাদ্রাজ নাম মদ্র-রাজ্যেরই অপভ্রংশে উৎপন্ন হইয়াছে; মদ্র-দেশের রাজধানীর নামানুসারেই মাদ্রাজ নামের সৃষ্টি; 'মদ্ররাজ' শব্দই 'মাদ্রাজ' রূপে পরিবর্ত্তিত। যাহা হউক, মদ্র-দেশ বলিতে যে ভারতবর্ষের এক প্রান্তস্থিত কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট দেশ-বিশেষকে বুঝাইত, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে, মদ্র, উত্তর মদ্র, অলিমদ্র প্রভৃতি জনপদের বিদ্যমানতার বিষয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিত হইত না। সুতরাং আমাদের মনে হয়, উত্তর-মদ্র—উত্তরে হিমাচলের পাদমূলে অবস্থিত ছিল এবং দক্ষিণ-মদ্র দাক্ষিণাত্যের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইত।

অন্যান্য দেশ প্রসঙ্গে উত্তর-কুরুর বিষয় প্রথমেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তর-কুরু নাম পুরাণেতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ; অথচ, উত্তর-কুরু কোথায় কি ভাবে অবস্থিত ছিল, তাহা উপকথার মধ্যে পরিগণিত। উত্তর-কুরু সম্বন্ধে নানা স্থানে নানা-রূপ মতান্তরের বিষয় জানিতে পারিয়া, ভিভিয়েন ডি' সেণ্ট মার্টিন উত্তর-কুরুকে কল্পিত দেশ বা কল্পনার রাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। ভাবিতে গেলে, প্রকৃতই সমস্যায় পড়িতে হয়। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৮।১৪) উত্তর-কুরুর অবস্থিতির একটু আভাষ পাই। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি গ্রন্থের আলোচনায় উত্তর-কুরুর অবস্থিতির বিষয়ে নূতন নূতন সংশয় আনয়ন করে।

উত্তর-কুরু।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ লিখিত আছে,—"যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তর কুরব উত্তর মদ্রা ইতি।" ইহাতে উত্তর-কুরুকে হিমালয়ের সন্নিহিত জনপদ বলিয়াই প্রতীত হয়। রামায়ণে (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, ত্রিচত্বারিংশ সর্গে) উত্তর-কুরু দেশের অবস্থিতির যে বর্ণনা আছে, তাহাতে উহাকে হিমালয়-স্থিত দেশ বলা যাইতে পারে। রামায়ণের বর্ণনা,—"উত্তর-কুরুদেশ শৈলোদা নাম্নী নদীর নিকটবর্ত্তী। সেই নদীর উভয় তীরে কীচক নামক যে বেণুবংশ আছে, সিদ্ধগণ তাহা দ্বারা নদী পারাপার করিয়া থাকেন। তথায় কাঞ্চনময় পদ্ম-বিশিষ্ট পদ্মিনী-সমূহে সুশোভিত নীল-বৈদূর্য্য-মণিময় পদ্মপত্র দ্বারা বিরাজিত সহস্র সহস্র সরিৎ এবং হিরণ্ময় রক্তোৎপল দ্বারা অলঙ্কৃত চপল সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবশালী জলাশয়-সমূহ শোভা পাইতেছে।' এবম্প্রকার বিবিধ বর্ণনা হইতে উত্তর-কুরুকে হিমালয়ের অন্তর্গত দেশ বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোনও কোনও পুরাণে উত্তর-কুরু সমুদ্রের অব্যবহিত দক্ষিণে অথবা সমুদ্র-পার্শ্বে অবস্থিত,—এইরূপ উক্তি দেখিতে পাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে,—

"উত্তরাণাং কুরূনাস্তু পার্শ্বে জ্ঞেয়স্তুদুত্তরঃ। সমুদ্রঃ সোর্ম্মিমালোক্য নাগ-সুরানিষেবিতাম্॥"

অর্থাৎ, উত্তর-কুরুর পার্শ্বে সুদুস্তর মহাসমুদ্র বিদ্যমান। হরিবংশেও এই ভাবের কথাই দেখিতে পাই। হরিবংশে লিখিত আছে,—"তাতোহর্ণবং সমুত্তীর্য্য কুরূণোপ্যুত্তরাণ বয়ং।" অর্থাৎ, সমুদ্র অতিক্রম করিলে উত্তর-কুরুদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। উত্তর-কুরু সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দেশ বা সমুদ্র অতিক্রম করিলে উত্তর-কুরু দেশে উপনীত হওয়া যায়,—এবম্বিধ পৌরাণিক উক্তি দৃষ্টে এক শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ নির্দ্ধারণ করেন,—উত্তর-কুরু শব্দে 'অক্সাস' নদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থিত কাস্পিয়ান সমুদ্রের ও আরল হ্রদের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের এবং রামায়ণের বর্ণনার সহিত হরিবংশের এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বর্ণনায় সামঞ্জস্য নাই। এদিকে মহাভারতে সুমেরু ও নীল পর্ব্বতের মধ্যস্থলে এবং বিষ্ণুপুরাণে মন্দর ও নীল পর্ব্বতের মধ্যে উত্তর-কুরু দেশ অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে। * এতদুক্তির সহিতও পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির সামঞ্জস্য নাই। কোথায় সমুদ্রের পারে, কোথায় পর্ব্বতের মধ্যে! যেমন পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে তেমনই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও উত্তর-কুরুর অবস্থান সম্বন্ধে মত-পার্থক্য দেখিতে পাই। "এসিয়াটিক রিসার্চ্চে", উইলফোর্ডের আলোচনায়, উত্তর-কুরু দেশ হিমালয়ের পরপারে, তিব্বতের অংশ-বিশেষে, অবস্থিত ছিল—সিদ্ধান্ত হয়। টলেমির গ্রন্থে উত্তর-কুরু 'ওত্তরকোরা' (Ottorakorra) রূপে উক্ত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণনানুসারে ঐ স্থান চীনের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। লাসেন—বর্ত্তমান 'খাসগড়ের' পূর্ব্বাংশস্থিত দেশ বলিয়া উত্তর-কুরুর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে, 'অক্সাস' নদীর সন্নিকটে উত্তর-কুরু অবস্থিত ছিল। ষ্ট্রাবো বলেন,—কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে উত্তর-কুরুর অবস্থিতি সম্ভবপর। 'আর্কটিক হোম' † গ্রন্থে কিন্তু এ বিষয়ে আর

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৫০ম অধ্যায়; হরিবংশ, ১৭০ ম অধ্যায়; মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ১৫০ ম অধ্যায়।

† B. G. Tilka's *The Arctic Home in the Vedas*, Ch. XI,

এক নূতন কথা বলিবার চেষ্টা হইয়াছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের এবং রামায়ণ-মহাভারতাদির প্রমাণ-পরম্পরা উল্লেখ পূর্ব্বক, লাসেন ও টলেমি প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তি সমর্থকরূপে গ্রহণ করিয়া, গ্রন্থকার [illegible] করিয়াছেন,—উত্তর-কুরুর প্রসঙ্গেও আর্য্য-গণের মেরু-প্রদেশে বাসের [illegible]। তাঁহার সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম,—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।১৪) লিখিত আছে, হিমবৎ-পর্ব্বতের পরপারে, উত্তর দেশে, যে সকল লোক বাস করে, তাহারা উত্তর-মদ্র ও উত্তরকুরু-দেশবাসী বলিয়া অভিহিত হয়। তাহাদের রাজ্য 'বৈরাজ্যম্' বলিয়া পরিচিত; অর্থাৎ,—সে দেশে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের অপর এক স্থলে (৮।২৩) আবার দৃষ্ট হয়,—'ঐ দেশ দেবতাদিগের দেশ; মরগণ সে দেশ কখনও জয় করিতে পারে না। সেই দেশ হইতে পুরাণাদির উদ্ভব হইয়াছে।' রামায়ণে (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, ৩৮শ ও ৪৩শ সর্গে) এই উত্তর-কুরুর উল্লেখে লিখিত আছে,—ঐ স্থান পুণ্য-কর্ম্মকারিগণের আবাস-ভূমি। উত্তর-কুরুর অধিবাসীদিগকে কেহই পরাজিত করিতে সাহসী হয় না,—মহাভারতে (সভাপর্ব্বে, অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে) অর্জ্জুনের নিকট উত্তর-কুরুর বিষয় এইরূপ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। উত্তর কুরু যে কাল্পনিক দেশ নহে, টলেমির উক্তিতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। তিনি 'ওত্তরকোররা' (Ottocorra) নামক পর্ব্বত, নগর এবং অধিবাসিগণের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় 'হাইপারবোরিয়ান'-গণের উল্লেখ দৃষ্টে, তদর্থে তিনি উত্তর-কুরুর কথাই বলিয়া গিয়াছেন,—লাসেন এইরূপ অনুমান করেন। মুইর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'সাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণে (৭।৬) যে 'পথ্যাস্বস্তি' বা বাগ্দেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতে উত্তর-দেশীয় জনপদকেই (উদীচীম দিশাম্) বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, উত্তর-দেশেই বিশুদ্ধ ভাষা প্রচলিত ছিল। উত্তর-দেশের অধিবাসীরাই বিশুদ্ধ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন; আর উত্তর-দেশেই ভাষা-শিক্ষার জন্য লোকে গমন করিত।' এইরূপ-ভাবে যুক্তি তর্ক উত্থাপনের দ্বারা "আর্কটিক হোম" গ্রন্থে উত্তর-কুরুকে উত্তর মেরু-রূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের যুক্তিক্রমে—সেই উত্তর-মেরু-প্রদেশে (বর্ত্তমান রুষ-রাজ্যের উত্তরে) আর্য্যগণের আদিম নিবাস ছিল; তুষার-সম্পাতের আধিক্য-হেতু তাঁহারা ক্রমশঃ মধ্য-এসিয়ায় ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে আগমন করেন। যাহা হউক, উত্তর-কুরু সম্বন্ধে যিনিই যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হউন, আমরা কিন্তু বিশ্বাস করি—হিমালয়ের অংশ-বিশেষ পুরাকালে এক সময়ে উত্তর-কুরু নামে পরিচিত হইয়াছিল। সে হিসাবে কেহ কেহ কাশ্মীরকেও উত্তর-কুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। * হইতে পারে, এক সময়ে কাশ্মীর-প্রদেশই উত্তর-কুরু নামে পরিচিত ছিল এবং পরবর্ত্তিকালে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কোনও স্থান উত্তর-কুরু নামে পরিচিত হইয়া থাকিবে। কারণ, রাজ-তরঙ্গিণীতে দেখিতে

---

* রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় কাশ্মীরকেই উত্তর-কুরু বলিয়া স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—"We would place the Uttara Kuru alluded to in the Aitareya Brahmana some-where north of the sub-Himalayan range, i. e., in Kashmir.—*Civilisation in Ancient India*.

পাই,—রাজা ললিতাদিত্য কতকগুলি রাজ্য (ভুখার, দরদ, ভোট্টান, স্ত্রী-রাজ্য প্রভৃতি) জয় করিলে, উত্তর-কুরুর অধিবাসীরা পার্ব্বত্য-প্রদেশে লুকায়িত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা হিমালয়ের পারিপার্শ্বিক দেশকে উত্তর-কুরু-রাজ্য বলিয়া বুঝাইতে পারে। কুরুর এবং কুরুক্ষেত্রের সহিত সৌসাদৃশ্য-বোধক শব্দ উত্তর-কুরু হিমালয়ের অঙ্কে অবস্থিত থাকাই সম্ভবপর।

খশ, হুন, প্রভৃতি।

খশ, হুন (হুণ), চীন, দরদ, পহ্লব, পারদ, কিরাত প্রভৃতি আরও বহু প্রাচীন জনপদের ও প্রাচীন জাতির নাম শাস্ত্র-গ্রন্থে উল্লিখিত। খস নামক প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব-নির্দ্ধারণের এখন আর কোনই সম্ভাবনা নাই। রাজ্যহারা খশ-জাতির বংশধরগণ এখন নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জাতি হিসাবে তাহাদের অস্তিত্ব মাত্র এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। ঘাড়োয়াল, কুমায়ুন এবং তিব্বতের পার্ব্বত্য-প্রদেশে 'খশ' জাতি অধুনা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। নেপাল-রাজ্যে তাহাদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। আচার-ব্যবহারে পার্থক্য থাকিলেও আসামের 'খাসিয়া' (খাসি) পাহাড়ের অধিবাসীদিগকে কেহ কেহ প্রাচীন খস-জাতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করেন। অনেকে এমনও বলেন, খশ-জাতির নাম হইতেই খাশী বা খাসিয়া পাহাড়ের নামকরণ হইয়া থাকিবে। বৃহৎসংহিতায় খশ-দেশ পূর্ব্ব-দেশীয় জনপদ বলিয়া অভিহিত। রাজতরঙ্গিণীতে প্রকাশ,—রাণী দিদ্দার শাসনকালে খশ জাতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিল। রাণী দিদ্দা খশ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াও কিংবদন্তী আছে। কাশ্মীর-রাজ ক্ষেমগুপ্ত খশদিগকে কতকগুলি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মিহিরকুলের রাজত্ব-কালে নরপুরে খশগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রাচীন ইতিহাসে খশদিগের সম্বন্ধে এইরূপ নানা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের রাজ্যের বা রাজধানীর নিদর্শন কিছুই বিদ্যমান নাই। হুন-রাজ্যের আদি-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে শাস্ত্রানুসারে আমরা বুঝিতে পারি,—বিশ্বামিত্রের অভিসম্পাতে তাঁহার যে পঞ্চাশ জন পুত্র ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, অথবা সগর রাজা কর্ত্তৃক যে সকল ক্ষত্রিয় ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, হুন-রাজ্য তাঁহাদেরই এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হুন-রাজ্যের অবস্থিতি সম্বন্ধে মহাভারতে এবং পুরাণে লিখিত আছে,—ঐ রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তরে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে হুনদেশ ক্ষত্রিয়-দেশ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; কিন্তু কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-সময়ে সঞ্জয়োক্তিতে ঐ দেশ 'ম্লেচ্ছদেশ' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত। তবেই বুঝা যায়, প্রথমে ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক হুন-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়; পরিশেষে সে রাজ্য ম্লেচ্ছ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া যায়। পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হুনগণের পরিচয় আছে। তত্তৎস্থলে হুনগণ প্রায়ই হিন্দুগণের সহিত সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ। আধুনিক ইতিহাসে হুনগণের প্রতিষ্ঠার নানা পরিচয় বিদ্যমান। হুনগণ এক সময়ে রোম-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, আর সেই আক্রমণের ফলে রোম-রাজ্য ধ্বংস-পথে অগ্রসর হয়;—রোম-রাজ্যের পতনের ইতিহাসে বর্ণিত আছে। * পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বলেন,—হুনগণ এশিয়া-দেশোদ্ভব। সম্ভবতঃ

---

* *Vide* Gibbon's *Decline and Fall of the Roman Empire.*

মঙ্গোলীয় বা তাতার-বংশ-সম্ভূত। সে হিসাবে, তাহারা সিদীয় (শক) এবং তুর্কগণের সহিত সংস্রবযুক্ত, এমন কি অভিন্ন বলিলেও বলা যাইতে পারে। ডি' গুইন্‌সের * মতানুসরণে ঐতিহাসিক গীবন বলেন,—যাহারা রোম-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, সেই হূনগণ 'হিয়ং-নৌ' (Hiong-nou) হইতে উৎপন্ন; চীনদেশের প্রাচীরের উত্তরাংশস্থিত অনুর্ব্বর বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডে তাহাদের আদি-বাস ছিল। খৃষ্ট-জন্মের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে হূনগণ চীন-সাম্রাজ্য লুণ্ঠন করিয়াছিল; অসংখ্য সময়ে তাহারা চীন-সম্রাটের সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া চীন-সম্রাট 'কাও-টি' (Kao-ti) আত্ম-সমর্পণে অপমানজনক সন্ধি-সর্ত্তে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৪১—৮৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে হূন-জাতি নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে হূনগণ রোম-সাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের সহিত সংঘর্ষেই রোম-সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে হূনগণ পঙ্গপালের ন্যায় ভারতবর্ষে পতিত হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে বিপুল ধনসম্পৎ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। তৎকালে ভারতবর্ষে গুপ্ত-রাজগণের প্রাধান্য। কিন্তু তাঁহারা হূনদিগের আক্রমণে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পঞ্জাবের 'সাকলা' (Sakala) নগরে হূনগণ রাজধানী স্থাপন করে। মালব এবং মধ্য-ভারত তাহাদের অধিকার-ভুক্ত হয়। গুপ্তবংশের শেষ রাজা ভানুগুপ্ত ৫১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালব-প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। হূন-সর্দ্দার তোরামান ভানুগুপ্তকে পরাজিত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে মালব-রাজ্য কাড়িয়া লন। তোরামানের পুত্র মিহিরকুল দেশবিজয়ী সম্রাট বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। মিহিরকুলের নামে এক সময়ে ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,—কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে যে মিহিরকুলের পরিচয় পাওয়া যায়, ইনিই সেই মিহিরকুল। সে বিষয়ে অবশ্য মতবিরোধ আছে। হূন-সর্দ্দার মিহিরকুল উজ্জয়িনীর অধিপতি যশোধর্ম্মদেবের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মূলতানের এবং লুনির মধ্যবর্ত্তী কোরুরের সমরাঙ্গণে যশোধর্ম্মদেবের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধই মিহিরকুলের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। এক সময়ে দক্ষিণে মালব হইতে উত্তরে পারস্য এবং তাতার পর্য্যন্ত হূনগণের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপে বাল্টিক সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত 'গথ'-দিগের রাজ্য হূনগণ অধিকার করিয়া লয়। ৪৩৪ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট রুগিলাসের মৃত্যুর পর রোম-সাম্রাজ্য হূনদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। রোম সম্রাট 'আত্তিলা' হূনগণ কর্ত্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হূনদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে গীবন এক অদ্ভুত উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। † তিনি বলেন,—সিদীয়ার 'ডাইন'-গণ, সমাজচ্যুত

* ডি গুইন্‌স্ (De Guignes) *sur les Dynasties des Huns.*

† "A fabulous origin was assigned of their form and manners—that the witches of Scythia who for their foul and deadly practices had been driven from society, had copulated in the desert with infernal spirits; and that the Huns were the offspring of this execrable conjunction."—Edward Gibbon, *Decline and Fall of the Roman Empire.*

ও দেশ হইতে বিতাড়িত হয়। মরুভূমে বিচরণ কালে নীচ-জাতীয় প্রেতের সহিত তাহাদের মিলন ঘটিয়াছিল। সেই মিলনের ফলে হূনগণ জন্মগ্রহণ করে। হূনগণের আকৃতির বিষয়ে গীবনের পুস্তকে লিখিত আছে,—সাধারণ মনুষ্য হইতে তাহাদের স্কন্ধদেশ বিস্তৃত, নাসিকা চেপ্‌টা; তাহাদের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ—যেন মস্তকের মধ্যে প্রোথিত হইয়া আছে। তাহারা শ্মশ্রু-গুম্ফ-বিহীন; সুতরাং যুবজনোচিত সৌন্দর্য্যের বা বার্দ্ধক্যোচিত সম্ভ্রমের অধিকারী নহে। হূনগণ অঙ্গ-দেশের অধিবাসী বলিয়াও পরিচিত। অঙ্গদেশ বর্ত্তমান বিহারের অংশ-বিশেষকে বুঝাইত, পূর্ব্বে আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ অঙ্গদেশ তিব্বতের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করেন। * তাঁহাদের মতে, পূর্ব্বোক্ত হূনগণ অঙ্গদেশেরই অধিবাসী ছিল। যে হূনগণ এক সময়ে অসীম প্রতাপশালী হইয়াছিল, ইউরোপ ও এসিয়া মহাদেশের অধিকাংশ জনপদ যাহাদের বীরদর্পে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, এখন তাহাদের পরিচয়-চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্র-গ্রন্থে, পুরাণে, ইতিহাসে আরও বহু প্রাচীন জনপদের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু সে সকল জনপদ এখন কোথায় কি নামে পরিচিত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সুহ্ম-দেশ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দুই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, বর্ত্তমান ত্রিপুরা প্রাচীন-কালে সুহ্ম-দেশ বলিয়া কথিত হইত। কেহ বলেন, ব্রহ্ম-দেশ, বিশেষতঃ আরাকান প্রদেশ, প্রাচীন-কালে সুহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়া গিয়াছেন, রাঢ় দেশকেই পুরাকালে সুহ্ম-দেশ বলিত। কম্বোজ-দেশ সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত প্রচলিত। কেহ বলেন,—বর্ত্তমান কাম্বোডিয়া কম্বোজের নামান্তর; কেহ বলেন,—কাবুলের প্রাচীন অধিবাসীরা কম্বোজ নামে অভিহিত হইত। পারদ ও পহ্নব বলিতে পারস্য-দেশকে, গান্ধার বলিতে কান্দাহারকে এবং অনিমা বলিতে আনামকে, বুঝাইয়া থাকে,—পণ্ডিতগণের এখন এইরূপ সিদ্ধান্ত। প্রাচীন-কালের পুরাণোক্ত কোন্ দেশ কি অভিনব নাম-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, অধুনা তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়া একরূপ বিড়ম্বনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে সাধারণতঃ যে সকল প্রসিদ্ধ প্রাচীন জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাই আমরা উল্লেখ করিলাম।

* কর্ণেল টড রাজস্থানের ইতিহাসে অঙ্গদেশ এবং হূন-জাতি সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে,—"Angades, Ongdes, or Ondes, adjoins Thibet. The inhabitants call themselves Hoongias and appear to be the Hong-niu of the Chinese authors, the Huns (Hoons) of Europe and India which prove this Taotar race Lunar, or of Boodha."—*Vide* Col. Tod's *Rajasthan*.

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

-:*:-

ভারতে জাত-বিভাগ।

[ভারতে জাতি-বিভাগ,—জাতি বিভাগে ত্রিবিধ তত্ত্ব;—জন্মগত জাতি,—শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও বিবিধ মিশ্র-জাতির উৎপত্তি-তত্ত্ব;—আচার ও ধর্ম্মের পার্থক্য অনুসারে জাতি-সৃষ্টি,—তদনুরূপ বিভিন্ন জাতির পরিচয়;—দেশগত জাতি,—ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস হেতু ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি-প্রসঙ্গ,—রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের বিভাগ বিষয়ক ইতিবৃত্তে জাতি তত্ত্ব,—পুরাণোক্ত বিবিধ জাতি।]

প্রাচীন ভারতের জাতি-বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, আমরা বেশ বুঝিতে পারি, মূলে জাতি—জন্মগত। 'জাতি'-শব্দের উৎপত্তিতেও (জন+ক্তিন্) সেই অর্থই উপলব্ধি হয়! কিন্তু সাধারণতঃ যেরূপভাবে জাতি-বিভাগ হইয়া থাকে, তাহাতে 'জাতি' শব্দ প্রধানতঃ ত্রিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। (১) জাতি—জন্মগত; (২) জাতি—আচারগত ও ধর্ম্মগত; (৩) জাতি—দেশগত। জন্মগত জাতি;—যেমন, ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয়, ইত্যাদি। আচার ও ধর্ম্মগত জাতি—যেমন, আর্য্য ও অনার্য্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি। দেশগত জাতি;—যেমন আর্য্যাবর্ত্তবাসী, দাক্ষিণাত্যবাসী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টী, পারদ, পহ্লব, কিরাত, চীন, যবন, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই ত্রিবিধ জাতি-বিভাগের মধ্যে আবার অসংখ্য উপবিভাগ আছে। জন্মগত জাতি-পর্য্যায়ে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি মূলাধার হইলেও, উহা হইতে বহু মিশ্র-জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণাদি এক এক বর্ণও আবার অসংখ্য সম্প্রদায়ে বা উপবিভাগে বিভক্ত আছেন।* আচারভেদে ও ধর্ম্মভেদে কি প্রকারে জাতি-সৃষ্টি হইয়াছে, দেশভেদে ও বস-বাসের বিভিন্নতা-হেতু কিরূপে বিভিন্ন নামধেয় জাতি-সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, পুরাতত্ত্বের আলোচনায়, অপিচ স্থূল দৃষ্টিতেই, তাহা প্রতীত হয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ জাতি-বিভাগের মধ্যে কোনও কোনও স্থলে একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। যিনি জন্মগত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, আচার বা ধর্ম্মানুসারে তিনিই আবার আর্য্য বা অনার্য্য, হিন্দু বা মুসলমান হইতে পারেন; এবং বিভিন্ন দেশে বসবাস-হেতু তাঁহাদেরই আবার পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী বা মহারাষ্ট্রী সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

জাতি-বিভাগে ত্রিবিধ তত্ত্ব।

---

* 'কায়স্থ প্রমুখ কয়েকটী প্রসিদ্ধ জাতির নাম মনুসংহিতায় উল্লেখ নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে "ব্রাত্য" পর্য্যায়ভুক্ত, তাহা অধুনা নানারূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। কায়স্থগণ যে ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়, তৎসম্বন্ধে বহুল প্রমাণ-পরম্পরা দৃষ্ট হয়। "কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ"—স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত এতদ্বচনে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে কায়স্থের জন্ম হয়, সপ্রমাণ হইতেছে। এইরূপ, মিশ্র-বর্ণ নহে, বর্ণ-শঙ্কর নহে, অথচ উপাধি দেখিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায় না,—এমন অনেক উচ্চ-জাতির অস্তিত্ব আজিও অক্ষুণ্ণ আছে। যে সকল জাতির মধ্যে বিবাহের বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই, অর্থাৎ সবর্ণের মধ্যেই বিবাহ চলিতেছে, সেই সমুদায় জাতিকে বর্ণ-শঙ্কর বলা যাইতে পারে না।

জন্মগত জাতি—শাস্ত্রানুসারে চারিটী মাত্র। সেই চারি জাতি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারি জাতি ভিন্ন পঞ্চম জাতি নাই, শাস্ত্র এ কথাও বলিয়া গিয়াছেন। সে হিসাবে, 'জাতি' শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতিকেই বুঝাইয়া থাকে; অপর কেহ সে সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না। * স-বর্ণের বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সেই বর্ণ বা জাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। দ্বিজাতি † কর্তৃক পরিণীতা সবর্ণা-গর্ভ-সম্ভূত তনয়েরা উপনয়নাদি সংস্কার প্রাপ্ত না হইলে 'ব্রাত্য' সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চতুর্ব্বর্ণের অনুলোম-প্রতিলোম ‡ সংযোগক্রমে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা 'মিশ্র' জাতি মধ্যে গণ্য। মিশ্র-জাতি অসংখ্য। 'ব্রাত্য'গণ মিশ্র বর্ণ নহেন—মনু তাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিজাতি ভিন্ন অপর কোনও জাতি 'ব্রাত্য' নামে পরিচিত হইতে পারেন না,—মনুসংহিতায় তাহাও উপলব্ধি হয়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—মূল জাতি-চতুষ্টয়ের উৎপত্তির বিষয় ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে এইরূপ-ভাবে উক্ত হইয়াছে,—

জন্মগত-জাতি।

"যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূপাদা উচ্যতে॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগলে রাজন্য, উরুদ্বয়ে বৈশ্য এবং পদযুগলে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল,—ঋগ্বেদের এই উক্তি, অথর্ব্ববেদে, তৈত্তিরীয়-সংহিতায়, বাজসনেয়-সংহিতায়, শ্রীমদ্ভাগবতে, মহাভারতে এবং কূর্ম্মপুরাণে প্রায় একই ভাবে উল্লিখিত। § তবে পার্থক্যের মধ্যে ঋগ্বেদে "উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ" স্থলে অথর্ব্ববেদে 'মধ্য তদস্য যদ্বৈশ্যঃ', মহাভারতে পুরুষ স্থলে 'কৃষ্ণ'—এই সামান্য পাঠান্তর দেখিতে পাই। মহর্ষি মনু যেন পুরুষ-সূক্তেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। জাতি-সৃষ্টি সম্বন্ধে মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—

"লোকানাস্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ। ব্রহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

---

* মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, চতুর্থ শ্লোক,—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোঃ নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত বলিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,—এই বর্ণত্রয় দ্বিজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপনয়ন-সংস্কার-বিহীন চতুর্থ বর্ণ—শূদ্র। এতদ্ভিন্ন (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন) পঞ্চম জাতি নাই। মনুর এই বাক্যের অনুসরণে পণ্ডিতগণ অনেকে চতুর্ব্বর্ণান্তর্গত ব্যক্তি ভিন্ন অপরকে জাতি বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে—'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থও ঐরূপ সীমাবদ্ধ। চতুর্ব্বর্ণ ভিন্ন অন্য কাহারও ধর্ম্ম এবং জাতি (শব্দার্থগত) নাই, ইহাই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত।

† ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,—এই তিন জাতি দ্বিজ বা দ্বিজাতি নামে পরিচিত। একবার দেহোৎপত্তি এবং একবার সংস্কার,—তাঁহাদের দুই বার লক্ষণরূপ জন্ম হয়; এই জন্য তাঁহারা দ্বিজ। মনু বলিয়াছেন,—

"মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥

অন্যত্র,—"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য প্রতিচোদনাৎ॥"

‡ উচ্চবর্ণ পুরুষের সংসর্গে নিম্নবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তাহা অনুলোমজ সন্তান এবং নিম্নবর্ণের পুরুষের ঔরসে উচ্চ বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রতিলোমজ সন্তান।

§ ঋগ্বেদ, ১০।৯।১০-১১; অথর্ব্ববেদ, ১৯।৬।৬; তৈত্তিরীয়-সংহিতা, ৭।১।৪-৯; বাজসনেয় সংহিতা, ৩১।১৬; শ্রীমদ্ভাগবত, ২য় স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়, ৩৭শ শ্লোক; মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব; কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ।

অর্থাৎ,—'পৃথিব্যাদি লোক সকলের সমৃদ্ধি-কামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ সৃষ্টি করিলেন।' কোনও কোনও স্থলে উৎপত্তির বিষয় অন্য ভাবে লিখিত আছে বটে; * কিন্তু চতুর্ব্বর্ণের [illegible] প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। তবে উচ্চ-বর্ণ সময় সময় নিম্ন-বর্ণ এবং নিম্ন-বর্ণ সময় সময় উচ্চ-বর্ণ হইয়াছেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। † চারি বর্ণ হইতেই ক্রমশঃ অন্যান্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। কতকগুলি জাতির উৎপত্তি-বিষয়ে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,— বিশ্বামিত্রের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র-পঞ্চাশৎ পিতৃ-আদেশ-পালনে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন; সুতরাং বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন; পিতৃ-অভিশাপে সেই সকল পুত্রের বংশধরেরা নীচ-জাতি বলিয়া পরিগণিত হন; বিশ্বামিত্র-বংশীয় সেই সকল নীচ-জাতির নাম—অন্ধ্র, পুণ্ড্র, সবর, পুলিন্দ, মুতিব ইত্যাদি। ‡ প্রধান চারি জাতি এবং চারি জাতি হইতে অনুলোম-প্রতিলোম-ক্রমে উৎপন্ন অন্যান্য জাতি-সমূহের বিবরণ মনুসংহিতায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—"স্বপরিণীতা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সমুৎপাদিত সন্তান—'ব্রাহ্মণ'; ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক স্বীয় পত্নী ক্ষত্রিয়ার গর্ভে-সমুৎপাদিত সন্তান— 'ক্ষত্রিয়'; বৈশ্য কর্ত্তৃক স্বপরিণীতা বৈশ্যার গর্ভ-সমুৎপাদিত সন্তান—'বৈশ্য'; এবং শূদ্র কর্ত্তৃক স্বপরিণীতা শূদ্রার গর্ভ-সমুৎপাদিত সন্তান—'শূদ্র'। এতদ্ভিন্ন অসবর্ণ পত্নীতে সমুৎপন্ন সন্তান— জনকের সহিত সবর্ণ হয় না; তাহারা নিশ্চয়ই জাত্যন্তর হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিণীতা বৈশ্যার গর্ভ-সমুৎপাদিত সন্তান 'অম্বষ্ঠ', পরিণীতা শূদ্রার গর্ভসম্ভূত সন্তানেরা— 'নিষাদ' বা 'পারশব' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক শূদ্রা-গর্ভসম্ভূত সন্তান— 'উগ্র' নাম প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত সন্তান—'সূত', বৈশ্য কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত সন্তান—'মাগধ', এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত সন্তান—'বৈদেহ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান—'আয়োগব', ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত সন্তান—'ক্ষত্তা' এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত সন্তান—'চাণ্ডাল' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। শূদ্র হইতে উৎপন্ন উক্ত বর্ণত্রয় 'বর্ণশঙ্কর' বলিয়া পরিগণিত। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উগ্র-কন্যা গর্ভসম্ভূত তনয়—'আবৃত', অম্বষ্ঠ-কন্যাগর্ভজাত তনয়—'আভীর', এবং আয়োগব-কন্যা-গর্ভজাত সন্তান—'ধিগ্বণ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিষাদ হইতে শূদ্র-কন্যাতে সম্ভূত সন্তান—

* সে মতে প্রজা-সৃষ্টির পর তাহাদের বৃত্তি নির্দ্ধারণানন্তর জাতি-মর্য্যাদা সংস্থাপিত হয়। গীতোক্ত "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগসঃ" এতদ্বাক্যেও সেই কথা আসিতে পারে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে, বিষ্ণু-পুরাণে, মৎস্যপুরাণে, মার্কণ্ডেয়পুরাণে এবং মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই ভাবের কথা লিখিত আছে। কিন্তু এতদুক্তি ধর্ম্মগত ও আচারগত জাতি বিভাগ সম্পর্কেই প্রযুজ্য।

† পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ডে, নির্ঘণ্টানুসরণে, "ব্রাহ্মণ" ও 'ব্রাহ্মণত্ব' শব্দ দ্রষ্টব্য। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ৩য় ও ৮ম অধ্যায়, ৫ম, ১ম শ্লোক এবং ১৯শ অধ্যায়, ২য় শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ২৩শ শ্লোক, ১৭শ অধ্যায়, ১০ম শ্লোক, ২০শ অধ্যায়, ৭ম শ্লোক, এবং ২১শ অধ্যায়, ২১শ শ্লোক; হরিবংশ, ১১শ, ২৯শ ও ৩২শ অধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

‡ "তস্য হ বিশ্বামিত্রস্যৈকশতং পুত্রা আসুঃ পঞ্চাশদেব জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দসঃ পঞ্চাশৎ কনীয়াংসঃ তদ্‌যে জ্যায়াংসো ন তে কুশলং মেনিরে। তননু ব্যাজহারান্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেঽন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা। বহবো ভবন্তি বিশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।'—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭। ১৮।

'পুক্কশ' এবং শূদ্রের নিষাদ-কন্যা-গর্ভজাত সন্তান 'কুক্কুটক' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'ক্ষত্তা' হইতে উগ্র-কন্যা গর্ভসম্ভূত সন্তান—'শ্বপাক' এবং বৈদেহ কর্তৃক অম্বষ্ঠ-কন্যা-সম্ভূত সন্তান—'বেণ'। দ্বি-জাতি কর্তৃক পরিণীতা সবর্ণা গর্ভসম্ভূত তনয়েরা উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত না হইলে—'ব্রাত্য' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। 'ব্রাত্য' ব্রাহ্মণের সবর্ণার গর্ভজাত তনয়—'ভূর্জ্জকণ্টক'। দেশ-বিশেষে ইহাদের চারিটী নাম আছে, যথা—'আবন্ত', 'বাটধান', 'পুষ্পধ' এবং 'শৈখ'। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা-গর্ভজ তনয় দেশ-বিশেষে সপ্তবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইযা থাকে; যথা—'ঝল্ল', 'মল্ল', 'লিচ্ছিবি', * 'নট', 'করণ,' 'খশ' এবং 'দ্রাবিড়'। ব্রাত্য-বৈশ্যের সবর্ণ-সম্ভূতা তনয় ক্রমশঃ এই কয়েকটী আখ্যা প্রাপ্ত হয়,—'ধন্বা', 'আচার্য্য', 'কারুষ', 'বিজন্মা', 'মৈত্র' এবং 'সাত্বত।" এইরূপ উচ্চ-নীচ জাতির সংশ্রবে আরও যে বহু জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, মনু তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কতক-গুলি ক্ষত্রিয় জাতি উপনয়নাদি সংস্কারের অভাবে শূদ্রত্ব লাভ করেন; যেমন পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা বাহ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহারা সাধুভাষীই হউক, আর ম্লেচ্ছ-ভাষীই হউক, 'দস্যু' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই 'দস্যু' জাতি কর্তৃক 'আয়োগব'-স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান সমুৎপাদিত হয়, তাহার নাম—'সৈরিন্ধ্র'। ইহারা কেশ-রচনাদি কার্য্যে সুচতুর; ইহারা মৃগাদি বধ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। 'বৈদেহ' জাতি কর্তৃক প্রকৃত 'আয়োগব' স্ত্রী-গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম—'মৈত্রেয়'। প্রাতঃকালে, অরুণোদয়ে, ঘণ্টাবাদন পূর্ব্বক নৃপতি প্রভৃতির স্তুতি পাঠ করাই ইহাদের কার্য্য। 'নিষাদ' কর্তৃক 'আয়োগব' স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম —'মার্গব' বা 'দাশ'। ইহারা নৌ-কর্ম্মোপজীবী। নিষাদের বৈদেহী গর্ভজাত সন্তানের নাম—'কারাবর'। ইহারা চর্ম্মচ্ছেদকারী। বৈদেহ-জাতির কারাবর স্ত্রী হইতে 'অন্ধ্র' এবং নিষাদ স্ত্রী হইতে 'মেদ' জাতি জন্মগ্রহণ করে। ইহারা গ্রামের বহির্দ্দেশে বাস করিয়া থাকে। চণ্ডাল হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে বেণু-ব্যবহারজীবী 'পাণ্ডুপাক' জাতির জন্ম এবং নিষাদ হইতে বৈদেহীতে 'আহিণ্ডীকের' জন্ম। চণ্ডালের পুক্কশী স্ত্রীর গর্ভে 'সোপাক' এবং নিষাদী স্ত্রী গর্ভজাত সন্তান—'অন্ত্যাবসায়ী' (গঙ্গাপুত্র)।" এই সকল জাতির কিরূপ আচার-ব্যবহার এবং কর্ম্মাধিকার, মনুসংহিতায় তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। † মনু ভিন্ন অন্যান্য সংহিতাও জাতি-উৎপত্তির বিষয় বিবৃত আছে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার মতে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের বর্ণের ক্রমিকত্ব অনুসারে তিনটী, দুইটী এবং একটী মাত্র ভার্য্যা হইতে পারে;—অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এবং বৈশ্যের একমাত্র বৈশ্যাই ভার্য্যা হইবে। কিন্তু পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে পরিণেত সবর্ণা হইতে উৎপন্ন পুত্র পিতার সবর্ণ হইবে; অর্থাৎ,

* এই গ্রন্থে মগধ-প্রসঙ্গে (১৬৮ম পৃষ্ঠায়) যে 'লিচ্ছবি' জাতির উল্লেখ আছে, প্রতিপন্ন হয়, তাহারাই মনু-কথিত 'লিচ্ছিবি' জাতি?

† মনুসংহিতা, দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ পিতার বিবাহিতা ব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ব্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে, ক্ষত্রিয়ের বিবাহিত ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ব্ভজাত সন্তান ক্ষত্রিয় হইবে, ইত্যাদি। এই বিষয়ে মনুসংহিতার সহিত যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার মতান্তর নাই। কিন্তু মিশ্রবর্ণ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার মত এই,—"বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম—'মূর্দ্ধাভিষিক্ত', বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম|'অম্বষ্ঠ' এবং শূদ্রজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম—নিষাদ' বা 'পারশব'। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য এবং শূদ্রজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র যথাক্রমে 'মাহিষ্য' ও 'উগ্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভোৎপন্ন পুত্রের নাম—'করণ'। পূর্ব্বোক্ত বিধি—বিবাহিত ভার্য্যা বিষয়েই প্রযুক্ত হয়। তদ্ভিন্ন, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে যে পুত্র হয় তাহার নাম 'সূত', বৈশ্যের ঔরসে যে পুত্র হয় তাহার নাম 'বৈদেহক', শূদ্রের ঔরসে যে পুত্র হয় তাহার নাম 'চণ্ডাল'। ক্ষত্রিয়া বৈশ্য-সংসর্গে 'মাগধ' এবং শূদ্র-সংসর্গে 'ক্ষত্তা' সংজ্ঞক, আর বৈশ্যা শূদ্রা-সংসর্গে 'আয়োগব' সংজ্ঞক পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। মাহিষ্য-জাতীয় পুরুষের ঔরসে করণ-জাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে 'রথকার' জন্মগ্রহণ করে।" এই সংহিতার মতে, বিশেষ বিশেষ স্থলে জন্মান্তরে জাত্যুৎকর্ষ লাভ হইতে পারে। গৌতম-সংহিতায় এবং বশিষ্ঠ-সংহিতায় এই জাতি-সৃষ্টির বিবরণ একটু রূপান্তরে পরিবর্ণিত রহিয়াছে। গৌতম-সংহিতার মত,—"অনুলোম বিবাহে অনন্তর, একান্তর এবং দ্ব্যন্তর জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরা যথাক্রমে সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দেশ্মন্ত এবং পারশব। ঐরূপ প্রতিলোম সংযোগ ক্রমে অনন্তর, একান্তর এবং দ্ব্যন্তর জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরা যথাক্রমে সূত, মাগধ, আয়োগব, ক্ষত্র, বৈদেহ এবং চণ্ডাল বলিয়া গণ্য হয়। কেহ কেহ বলেন,—ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের পুরুষযোগে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ, এবং চাণ্ডাল এই চারি প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। ক্ষত্রিয়া ঐরূপ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের যোগে যথাক্রমে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ক্ষত্রিয়, ধীবর এবং পুক্কশ এই চারি প্রকার পুত্র উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইরূপ বৈশ্যা ঐ চারি বর্ণের পুরুষ-সংযোগে ভৃজ্জকণ্ট, মাহিষ্য- বৈশ্য ও বৈদেহ এই চারি প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। শূদ্রা ঐ চারি বর্ণের পুরুষ-যোগে যথাক্রমে পারশব, যবন, করণ এবং শূদ্র এই চারি প্রকার পুত্র উৎপন্ন করে।" বশিষ্ঠ-সংহিতার মত,—"ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসোৎপন্ন সন্তান—'চণ্ডাল'। ক্ষত্রিয়ার ও বৈশ্যার গর্ব্ভে শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন মানব—'অন্ত্যাবসায়ী।' 'রামক'—বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে উৎপন্ন। 'পুক্কশ'—বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ব্ভে উৎপন্ন। 'সূত'—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে উৎপন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ঔরসে ত্র্যন্তর, দ্ব্যন্তর এবং একান্তর বর্ণ :শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন মনুষ্যগণ—'নিষাদ'। ঐ নিষাদ জাতির নামান্তর—পারশব।" মনুসংহিতার সহিত অপর সংহিতাত্রয়ের কি পার্থক্য, উদ্ধৃত অংশেই তাহা প্রতীত হইবে। এতদ্ভিন্ন পুরাণাদি গ্রন্থেও দুই এক নূতন জাতির উৎপত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। অনেক জাতির উৎপত্তি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত। সে সকল মত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া, তাহা হইতে সত্য তথ্য উদ্ধার করা সহজ-সাধ্য বলিয়া মনে হয় না। তবে মোটামুটি আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে,

উচ্চ জাতির মধ্যে কখনও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হয় নাই। ব্রাহ্মণের মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে, বৈশ্যের মধ্যে ও শূদ্রের মধ্যে বহু শাখা ও উপশাখার সৃষ্টি হইয়াছে বটে; কিন্তু অসবর্ণ-বিবাহোৎপন্ন সন্তানের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব বা শূদ্রত্ব যে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার প্রমাণ কোথায়ও পাওয়া যায় না।

আচার ও ধর্ম্মানুসারে যে জাতি সৃষ্টি হয়, তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত—'আর্য্য' ও 'অনার্য্য' শব্দ-তত্ত্বে প্রকটিত। আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের আচার-ব্যবহারে ও ধর্ম্ম-কর্ম্মে পার্থক্য ছিল, ইহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। এতৎসম্বন্ধে প্রমাণোল্লেখ অনাবশ্যক। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রের যে পঞ্চাশ জন পুত্রের জাতিচ্যুতির বিষয় দৃষ্ট হয়, তাঁহারা আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের দ্বারা নূতন নূতন নীচ-জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে এবং যজনাধ্যয়নাদির অভাবে পৌণ্ড্রক ও শকাদি জাতির নীচত্ব প্রাপ্তির বিষয় মনুসংহিতায় লিখিত আছে। ইহাও আচারভ্রষ্টতা-হেতু জাতি-সৃষ্টির দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ সগর রাজা কর্ত্তৃক আহত হইয়া জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-দর্শনাভাবে এবং ক্রিয়া-কর্ম্মের অননুষ্ঠানে তাঁহারা 'পতিত জাতি' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে এবং মহাভারতে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে। সেই সকল জাতির মধ্যে যবনগণ মুণ্ডিতমস্তক, শকগণ অর্দ্ধমুণ্ডিত, পারদগণ প্রলম্বমান কেশযুক্ত এবং পহ্লবগণ শ্মশ্রুধারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া পরিচিত হন। আচার-ভ্রষ্ট ও ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের জাতিপাত ঘটিয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে অসংখ্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারা যে যে দেশে বাস করিতেন, তাঁহাদের নামানুসারে ক্রমশঃ সেই সেই দেশ পরিচিত হইয়াছিল। পৃথিবীর যে সকল প্রাচীন এবং আধুনিক জাতি আর্য্যবংশাবতংশ বলিয়া গৌরব অনুভব করেন, তাঁহাদিগকে সেই সকল দেশত্যাগী ক্ষত্রিয়-রাজগণের বংশধর বলিলেও বলিতে পারা যায়। আচার এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা বেদ-বিহিত আচার এবং বৈদিক ধর্ম্মের বিষয়ই উল্লেখ করিতেছি। সে আচার ও সে ধর্ম্ম হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বা হিন্দুদিগের আচার, বর্ণ-ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতে পারে। তাহা হইলে, সেই ধর্ম্মের অনুসরণকারী সম্প্রদায় ভিন্ন, কত নূতন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, বুঝিতে পারা যাইবে। আচারের ও ধর্ম্মের বিভিন্নতা হেতু যে অনেক জাতির সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার উপর হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী জাতির মধ্যে আচার-ব্যবহারের তারতম্য হেতু বহু সম্প্রদায়ের (জাতির) উদ্ভব হইয়াছে। ধর্ম্ম-মতের বিভিন্নতা হেতু ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন জাতি দেখিতে পাই, তন্মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, নানক-পন্থী প্রভৃতি অসংখ্য সম্প্রদায়ের নাম করা যাইতে পারে। মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী ও জোরওয়াষ্ট্রীয়ান প্রভৃতি জাতি যে ধর্ম্ম-মতের বিভিন্নতা হেতু উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। গুণ-কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে যে জাতি সৃষ্টি হয়, এক সম্প্রদায়ের লোক বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়, তাহা

আচার ও ধর্ম্ম-গত জাতি-সৃষ্টি।

সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান। অধুনা ভারতবর্ষে শূদ্র নামে অসংখ্য জাতি বিদ্যমান। গুণকর্ম্ম অনুসারেই তাঁহারা যে সেই সেই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণের মধ্যেও এ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। একই গোত্রের একই ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এক জন পতিত এবং অপর জন উন্নত বলিয়া পরিচিত। গুণ-কর্ম্মের এবং আচারের পার্থক্য হেতুই এরূপ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুলীন, মৌলিক, কাপ, শ্রোত্রিয় প্রভৃতি যে বিভাগ, জাতিগত বিভাগ না হইলেও তৎসমুদায় যে আচার ও গুণ-কর্ম্মের তারতম্য হেতুই ঘটিয়াছে, এবং তাহাতে যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাদি ক্রিয়া পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ, আচার ও ধর্ম্মের বিভিন্নতা হেতু যে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয় এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষে যে অসংখ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কাহারও মতান্তর থাকিতে পারে না।

দেশগত জাতি।

দেশগত জাতির বা সম্প্রদায়ের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, আমরা কখনও কখনও দেখিতে পাই, এক এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামানুসারে এক একটী দেশের নামকরণ হইয়াছিল। পরিশেষে সেই সেই দেশে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা তত্তদ্দেশীয় জাতি বলিয়া পরিচিত হন। শক নামক ক্ষত্রিয়ের বংশধরগণ যে দেশে বসতি করেন, সেই দেশ 'শক' দেশ নামে প্রথমে পরিচিত হয়। পরিশেষে সেই দেশবাসী জনগণ 'শক' জাতি সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। পারদ, পহ্লব, কম্বোজ, দরদ, খশ ও যবন প্রভৃতি দেশের বিষয় আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই, সেই সেই দেশের অধিবাসীরা ক্রমশঃ সেই সেই জাতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। এ হিসাবে প্রাচীন ভারতে, ভারতেই বা বলি কেন—পৃথিবীতে যত দেশ ছিল, বা যত দেশ আছে, তত জাতির কল্পনা করা যাইতে পারে। তাই দেখিতে পাই, পুরাণে অন্ধ্রগণ, ওড্রগণ, দ্রবীড়গণ, সৌরাষ্ট্রগণ, সৈন্ধবগণ, পৌণ্ড্রগণ, চোলগণ, কেরলগণ প্রভৃতি অসংখ্য জাতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কালভেদে, রাজকীয় অধিকার-ভেদে, জাতির নাম সময় সময় পরিবর্ত্তিত হয়; তাহাতেও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাতির তালিকা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একই ধর্ম্মাক্রান্ত, একই জাতির অন্তর্ভুক্ত, এমন কি—একইরূপ আচার-ব্যবহার-সম্পন্ন জাতিগণ, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে—পারিপার্শ্বিক স্থান-সমূহে, বাস করিয়াও যেরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, দেশগত জাতি-সৃষ্টির দৃষ্টান্তে আমরা তাহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে অধুনা বিষম বিচ্ছেদ ঘটিয়া আছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। "গৌড়েশ্বর আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ গোত্রের যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ কেহ রাঢ়-দেশে এবং কেহ বা বরেন্দ্র-ভূমে বাস করিয়াছিলেন। যাঁহারা রাঢ়-দেশে বসতি করেন, তাঁহারা 'রাঢ়ীয়' এবং যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমে বাস করেন, তাঁহারা 'বরেন্দ্র' নামে অভিহিত হন। এমন কি, প্রথমে রাঢ়ীয়-বরেন্দ্র-বিভাগ-কালে পিতার এক পুত্র 'রাঢ়ীয়' এবং অন্য পুত্র 'বরেন্দ্র' বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জাগত সাণ্ডিল্য-গোত্রীয়

ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ ও দামোদর; তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ 'রাঢ়ীয়', আর দামোদর 'বরেন্দ্র'। এইরূপ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় তিথিমেধার এক পুত্র শ্রীহর্ষ রাঢ়ীয় এবং অন্য পুত্র গৌতম বরেন্দ্র। কাশ্যপ-গোত্রীয় বীতরাগের পুত্র দক্ষ রাঢ়ীয়, সুষেণ ও কৃপানিধি বরেন্দ্র; সাবর্ণ-গোত্রীয় সৌভরীর পুত্র বেদগর্ভ রাঢ়ীয়, পরাশর বরেন্দ্র। কেবল তাহাই নহে; ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ প্রথমে যখন বরেন্দ্র-ভূমে বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বরেন্দ্র বলিয়া গণ্য ছিলেন; তৎপরে যখন তাঁহারা রাঢ়দেশে গিয়া বসতি করেন, তখন রাঢ়ীয় মধ্যে পরিগণিত হন। এ সম্বন্ধে অধিক পরিচয় আর কি দিব? বরেন্দ্র-ভূমে বাস করিবার সময় ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির যে সন্তান-সন্ততি জন্মে, তাঁহারা বরেন্দ্র বলিয়া পরিচিত; এবং ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র উভয় সম্প্রদায়েরই আদি-পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্থলে এই মাত্র উল্লেখ করিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভট্টনারায়ণ রাঢ়দেশে যাইয়া বসতি করিবার পূর্ব্বে আদিগাঞি নামে তাঁহার যে পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই প্রধানতঃ সাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বরেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজের আদি-স্থানীয় এবং ভট্টনারায়ণ রাঢ়-দেশে গিয়া বসতি করার পর তাঁহার যে সন্তান-সন্ততি হয়, তাঁহারা সকলেই রাঢ়ীয় সমাজভুক্ত। পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ অনুমান করেন, ৯৫৪ শকে (৪৩৯ সালে) আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণ এদেশে সমাহূত ও প্রতিষ্ঠিত হন, এবং পরবর্ত্তিকালে ক্রমশঃ বংশ-বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের মধ্যে নানা প্রকার শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। অনেকের অনুমান, আদিশূরের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে বল্লালসেন বঙ্গ-সিংহাসনে সমারূঢ় হন; সেই সময় হইতেই রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্রের পার্থক্য বিশেষরূপে বিহিত হয়। ইতঃপূর্ব্বেও বরেন্দ্রভূমি হইতে গিয়া কেহ রাঢ়-দেশে বাস করিলে রাঢ়ীয় বলিয়া গণ্য হইতেন; কিন্তু বল্লালসেনের সময় হইতেই সে প্রথা রহিত হয়। প্রমাণ পাওয়া যায়, ভট্টনারায়ণাত্মজ আদিগাঞির বংশ-সম্ভূত অধস্তন একাদশ পুরুষ বিন্দুসারের দুই পুত্রের এক পুত্র 'জয়সাগর' বরেন্দ্রভূমে বাস-হেতু বরেন্দ্র এবং এবং অন্য সুত 'মণিসাগর' রাঢ়-দেশে গিয়া বসবাস-হেতু রাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত হন। যাহা হউক, এতৎ-পরবর্ত্তিকালে এরূপ ঘটনা আর ঘটিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, বল্লালসেন রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পাকাপাকি এক সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তাহাতে সাত শত পঞ্চাশ ঘর ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় এবং এক শত ঘর ব্রাহ্মণ বরেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত হন। তদবধি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন-মিশণ রহিত হইয়া যায়।" * গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরে বসবাস-হেতু, একই ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের একই বংশের সন্তান-সন্ততির মধ্যে, পরবর্ত্তিকালে কিরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা কে না অবগত আছেন? কেবল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নহে; কায়স্থ প্রভৃতি অন্যান্য জাতির সন্তান-সন্ততির মধ্যেও বাসস্থানের পার্থক্য-হেতু এইরূপ সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ঘটিয়াছে। দেশভেদে যে জাতি বা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়, এতাদৃশ দৃষ্টান্তে তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

---

* "শুভবিবাহ-তত্ত্ব" গ্রন্থে মল্লিখিত "বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ" শীর্ষক প্রবন্ধাংশ।

পুরাণাদি-শাস্ত্রের আলোচনা করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভিন্ন আরও যে বহু জাতির [illegible] পরিচয় পাওয়া যায়, ইষ্যাদি সংহিতায় আলোচনায় তাহা উপলব্ধি হইয়াছে।

পুরাণাদি শাস্ত্রে জাতির পরিচয়।

সংহিতা-শাস্ত্র-সমূহ অনুসন্ধান করিলে, উচ্চ নীচ শতাধিক জাতির পরিচয় পাইতে পারি। অধুনা সেই সকল জাতি সেইভাবে বিদ্যমান আছে কিনা, তাহা বলিতে পারা যায় না। কোনও উচ্চজাতি সংসর্গ-দোষে কালবশে অধুনা নিম্ন-পর্য্যায়ে পরিণত হইয়াছেন; আবার কোনও নিম্ন-জাতি অবস্থা-বশে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন;—এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু সে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন; সংহিতা-শাস্ত্র সমূহ হইতে আমরা যে সকল জাতির উৎপত্তির পরিচয় পাই, তাহার কয়েকটীর বিষয় প্রকাশ করিতেছি। বলা বাহুল্য, সংহিতা-শাস্ত্রোক্ত এই সকল জাতি জন্মগত-জাতি-পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। সেই জাতি-সমূহ,—

জাতির নাম।	পিতৃ-পরিচয়।	মাতৃ-পরিচয়।	সম্বন্ধ-পরিচয়।
ব্রাহ্মণ ...	ব্রাহ্মণ ...	ব্রাহ্মণী ...	পরিণীত
ক্ষত্রিয় ...	ক্ষত্রিয় ...	ক্ষত্রিয়া ...	,,
বৈশ্য ...	বৈশ্য	বৈশ্যা ...	,,
শূদ্র ...	শূদ্র ..	শূদ্রা ..	,,
মূর্দ্ধাভিষিক্ত ...	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়া ...	অনুলোমজ
অম্বষ্ঠ ...	ব্রাহ্মণ ...	বৈশ্যা ...	,,
মাহিষ্য ...	বৈশ্যা ...	ক্ষত্রিয় ...	,,
কুণ্ডগোলক ...	ব্রাহ্মণ ...	ব্রাহ্মণী (পরস্ত্রী)	ব্যভিচারজ
রুণ্ডগোলক ...	ব্রাহ্মণ ..	ব্রাহ্মণী (বিধবা)	,,
ভিষক বা অম্বষ্ঠ ...	ব্রাহ্মণ ...	ক্ষত্রিয়া ...	,,
সূত ...	ক্ষত্রিয় ...	ব্রাহ্মণী ...	প্রতিলোম
পারশব ...	ব্রাহ্মণ ...	শূদ্রা ...	অনুলোম
উগ্র ...	ক্ষত্রিয় ...	শূদ্রা ...	,,
ভৃজ্জকণ্ঠ ...	ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ (অনুপনীত)	ব্রাহ্মণী ...	ব্রাত্যসন্ততি
আবর্ত্তক ...	ভৃজ্জকণ্ঠ ..	ব্রাহ্মণী ...	,,
মাগধ ...	বৈশ্য ...	ক্ষত্রিয়া ...	অনুলোম
বৈদেহ ...	বৈশ্য ...	ব্রাহ্মণী ...	,,
শাখণ্ডিক ...	ব্রাহ্মণ ..	মাগধী ...	,,
আভীর ...	ব্রাহ্মণ ...	মাহিষ্যা ...	,,
নাপিত ...	ব্রাহ্মণ ...	শূদ্রা ...	,,
[illegible]নাপিত ...	মাগধ ...	উগ্রা ...	,,
[illegible] ...	ক্ষত্রিয় (ব্রাত্য) ...	শূদ্রা ...	[illegible]

সংহিতাদি শাস্ত্র গ্রন্থে এই প্রকার এক শত তেত্রিশটী জাতির জন্ম-পরিচয় পাওয়া যায়।

কোথাও কোথাও এই সকল জাতির কোনও কোনটীর উৎপত্তি-প্রসঙ্গে মতান্তরও দৃষ্ট হয়।* কুক্কুট নামক জাতি নিষাদ পুরুষের ঔরসে মেদ স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল; পুক্কস জাতি চণ্ডালের ঔরসে শূদ্র-জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; যবনগণ কুক্কুট পুরুষের শূদ্রা-পত্নী হইতে জন্মলাভ করে;—ইত্যাদি বিষয়ও সংহিতাদিতে দেখিতে পাই। ফলতঃ, পূর্ব্বে জন্মানুসারেই জাতির সৃষ্টি হইত, এইরূপ প্রতীত হইয়া থাকে। সংহিতা-শাস্ত্রে যে সকল জাতির নাম লিখিত আছে, শুক্ল-যজুর্ব্বেদে তদধিক আরও কতকগুলি নূতন জাতির নাম দৃষ্ট হয়। সেই সকল জাতি কর্ম্মানুসারে আপন-আপন জাতিত্ব লাভ করিয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। শুক্ল-যজুর্ব্বেদোক্ত জাতি-সমূহের সংখ্যা—এক শত উনষাটটী। সেই সকল জাতির মধ্যে কয়েকটীর নাম এস্থলে প্রদত্ত হইল; যথা—ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, শূদ্র, তস্কর, বৃহণ, ক্লীব, অয়োগব, হুংশ্চল ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণ যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহণ প্রভৃতির জন্য, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধকার্য্যের জন্য, বৈশ্যগণ ব্যবসায়ের জন্য, শূদ্রগণ পরিশ্রমের জন্য, তস্করগণ চৌর্য্যের জন্য, বৃহণগণ হত্যাকার্য্যের জন্য, ক্লীবগণ পাপের জন্য, ইত্যাদি এক এক কারণে এক এক জাতি পরিচিত হইয়াছিল। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠ করিলে এবং তদুক্ত সেই সকল জাতি কি জন্য তত্তন্নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল— তাহা অনুসন্ধান করিলে, তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তখন সৎ বা অসৎ যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিত, তদনুসারে তাহার জাতি-সংজ্ঞা লাভ হইত। বেদের ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক ভাগেও বিবিধ জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। তখন, সন্ন্যাস-গ্রহণে কেহ কেহ সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দেখিতে পাই। উপনিষদে এবং সূত্র-সাহিত্যেও জাতির প্রসঙ্গ অল্লাধিক উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে দেখিতে পাই,—শ্রীরামচন্দ্র বনগমন করিলে ভরত যখন তাঁহার অনুসরণ করেন, তখন অযোধ্যার বহু ব্যক্তি তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে (ত্র্যশীতিতম সর্গে) ভরতের অনুগামী ব্যক্তিবর্গের জাতি-পরিচয় লিখিত আছে। সেই সকল জাতির মধ্যে মণিকার, সুদক্ষ কুম্ভকার, সূত্র-নির্ম্মাণ-দক্ষ তন্তুবায়, শস্ত্র-নির্ম্মাণোপযোগী কর্ম্মকার, ময়ূর-পুচ্ছ-নির্ম্মিত ব্যজনাদি ব্যবসায়ী, মুক্তাদি বেধক, কূপ্যাদিকারক, দন্তব্যবসায়ী, সুধাকর, গন্ধবণিক, প্রসিদ্ধ স্বর্ণকার, বিখ্যাত কম্বলকারক, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, ধূপ-ব্যবসায়ী, শৌণ্ডিক, রজক, সীবনকার, কৈবর্ত্ত এবং গ্রাম ও ঘোষ নিবাসী প্রধান প্রধান নটগণের উল্লেখ আছে। গো-যোজিত রথ-সমূহে আরোহণ করিয়া, ব্রাহ্মণেরা ভরতের অনুগমন করিয়াছিলেন, চতুরঙ্গ সেনা ভরতের অনুগামী হইয়াছিল, ইত্যাদি বর্ণনাও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়।† শক, যবন, পহ্লব, কম্বোজ, বর্ব্বর,

---

* মনু-সংহিতার তালিকার সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকা মিলাইয়া দেখিলেই মতান্তর বুঝা যাইবে।

† বঙ্গদেশ-প্রচলিত রামায়ণে এতদুপলক্ষে যে সকল জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, বোম্বাই-প্রদেশ-প্রচলিত রামায়ণে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক জাতির নাম দেখিতে পাই। বঙ্গদেশ-প্রচলিত রামায়ণে ভরতের অনুগমনকারী জাতির সংখ্যা পঁচিশটীর অধিক নহে; কিন্তু বোম্বাই-প্রদেশ-প্রচলিত রামায়ণে ঐ উপলক্ষে অষ্টাশীটি জাতির নাম লিখিত আছে। সেই অষ্টাশীটি জাতির কয়েকটীর নাম—বৈদ্য, [illegible] [illegible], জিহ্বক, তাম্বুলিক, বাণিজ্যক, কেশকার ইত্যাদি।

দ্রাবিড়, কিরাত ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতির অস্তিত্বের পরিচয়ও রামায়ণে লিখিত আছে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাই,—সীতার অনুসন্ধানের জন্য সুগ্রীব চারিদিকে বানরগণকে প্রেরণ করিতেছেন। সেই উপলক্ষে তিনি ভারতের নানা স্থানের নানা জাতির নামোল্লেখ করেন। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের চত্বারিংশ হইতে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ পাঠ করিলে বহু দেশ এবং তত্তদ্দেশবাসী বহু জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। সে স্থলে যে সকল জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়কে দেশগত জাতি-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। মহাভারতেও জাতির প্রসঙ্গ বহু প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিবাদ প্রসঙ্গে বহু জাতির উৎপত্তির বিষয় বিবৃত আছে। শান্তি-পর্ব্বে এবং অনুশাসন-পর্ব্বে, ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে, জাতি-তত্ত্ব বিবিধ প্রকারে পরিবর্ণিত হইয়াছে। * পুরাণাদি গ্রন্থেও বিবিধ প্রকারে জাতি-তত্ত্ব বিবৃত আছে। কিন্তু সকল মতই প্রধানতঃ সংহিতা-শাস্ত্রের অনুসারী। দুই এক স্থলে, কোনও কোনও জাতির উৎপত্তি বিষয়ে মতান্তর ঘটিয়াছে মাত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে মিশ্র-জাতি-সমূহের যে তালিকা দৃষ্ট হয়, মনু-স্মৃতির সহিত অনেক বিষয়ে তাহার ঐক্য নাই। যেমন 'করণ' জাতির উৎপত্তি বিষয়ে মনু লিখিয়া গিয়াছেন,—'করণ' জাতি ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে ঐ জাতির উৎপত্তি। এইরূপ মতান্তরের কারণ এই হইতে পারে যে, হয় তো একই সংজ্ঞায় একাধিক জাতি পরিচিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উড়িষ্যার 'কারণ' উপাধি-ধারী ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়গণের এবং বঙ্গদেশের 'করণ' উপাধি-ধারী কৈবর্ত্তগণের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি।

সাধ্যগণ, দেবগণ, দৈত্যগণ, দানবগণ, যক্ষগণ, রক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ, সুপর্ণগণ, কিন্নরগণ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত কতকগুলি বংশের বা জাতির নাম পুরাণ-সংহিতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই সকল বংশ বা জাতি অধুনা কোথায় কি ভাবে বা কি নামে অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মনুসংহিতায় ঐ সকল বংশের উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ-ভাবে লিখিত হইয়াছে,—"হৈরণ্যগর্ভ মনুর মরীচ্যাদি যে সমুদায় পুত্র আছেন, সেই সমুদায় মরীচ্যাদি ঋষিগণের পুত্র সোমপ প্রভৃতি, শাস্ত্রে পিতৃগণ বলিয়া কথিত হন। তন্মধ্যে সোমসদ নামক বিরাটের পুত্রগণ সাধ্যগণের পিতৃলোক এবং ত্রিলোক-বিখ্যাত অগ্নিষাত্তা নামক মরীচি-সন্তানেরা দেবগণের পিতৃলোক। বর্হিষদ নামক অত্রি-সন্তানেরা দৈত্য, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সর্প, সুপর্ণ ও কিন্নর প্রভৃতির পিতৃলোক।" † এই সকল বংশ হইতেও অসংখ্য বংশের অসংখ্য লোকের উৎপত্তি হইয়াছে,—শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু পুরাণের রূপকে সেই সকল বংশ

* মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ষষ্টিতমাধ্যায় এবং অনুশাসনপর্ব্বের অষ্টচত্বারিংশ ও একোনপঞ্চাশৎ [illegible] জাতি এবং তাহাদের কার্য্য-বিবরণ লিখিত আছে।

† মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে, সাধ্য, দেব, দৈত্য, দানব প্রভৃতির উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত আছে। [illegible] গ্রহণে [illegible] করিলাম। পুরাণাদিতে এই উৎপত্তি-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু [illegible] [illegible]।

এখন কল্পনার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেব, দানব, রক্ষ, উরগ বা গন্ধর্ব্ব বলিতে এখন সাধারণের মনে কি ভাবের উদয় হয়? রূপকের প্রভাবে উরগ-বংশ বা নাগ-বংশ এখন সর্পরূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ বলিতে বিভীষণ বিকটাকার প্রেতমূর্ত্তির কল্পনা মানুষের মনে উদয় হইয়া থাকে। অথচ, যে যে স্থলে ঐ সকল বংশের উৎপত্তির বিষয় লিখিত আছে, সেই সকল স্থলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কথাও লিখিত রহিয়াছে। সে সকল স্থল ধীরভাবে পাঠ করিলে, দৈত্য-দানব-যক্ষ-রক্ষ-উরগ প্রভৃতি বংশকে মনুষ্য-বংশ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। মনুসংহিতার যে কয়েকটী শ্লোকে দৈত্য-দানবাদির পিতৃলোকের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরও পিতৃলোকের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। সে পরিচয়,—"ব্রাহ্মণগণের সোমপ নামে পিতৃলোক, বৈশ্যদিগের আর্য্যপ নামে পিতৃলোক এবং শূদ্রদিগের পিতৃলোক—সুকালীনগণ। ভৃগুপুত্রেরা পূর্ব্বোক্ত সোমপ নামে পিতৃলোক বলিয়া অভিহিত। অঙ্গিরার সন্তানেরা হবির্ভুজ বা হবিষ্মন্ত নামে বিখ্যাত। পুলস্ত্যের সন্তানেরা আর্য্যপ নামে এবং বশিষ্ঠের সন্তানেরা সুকালীন নামে বিখ্যাত। অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য (কবি বা ভৃগুর পুত্র), বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্তা ও সৌম্য, ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মরিচ্যাদি ঋষিগণ হইতেই পিতৃলোক উৎপন্ন হইয়াছেন, পিতৃলোক হইতে দেব, দানব এবং দেবতাসকল হইতে চরাচর জগৎ আনুপূর্ব্বিকক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে।" ব্রাহ্মণাদিই বা কোন্ বংশীয় এবং দৈত্য-দানবাদিই বা কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। পুরাণে ঐ সকল বংশের যেরূপ সম্বন্ধের ও কর্ম্মের বিবরণ বিবৃত আছে, তাহাতে ঐ সকল বংশকে মনুষ্য-বংশ ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। উরগবংশ, নাগবংশ, তক্ষকবংশ, সর্পবংশ প্রভৃতি এক-পর্য্যায়ভুক্ত। নাগ-কন্যা উলুপীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ, নাগরাজের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনায় নাগগণকে কি বলিয়া মনে হয়? অনেকেই তাই এখন নির্দ্ধারণ করেন,—'উরগবংশ, নাগবংশ, বা তক্ষকবংশ বলিতে সত্য সত্যই উরগ, নাগ, তক্ষক, বা সর্পকে বুঝায় না; কোনও মনুষ্য-সমাজ এক সময়ে সর্পের পূজা-হেতু ঐরূপ সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকিবেন।' ভারতবর্ষের নানা স্থানের অধিবাসিগণ আপনাদিগকে নাগ-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পরীক্ষিতের তক্ষক-দংশনে মৃত্যুর বিষয়ে তাঁহারা বলেন,—'তক্ষক সর্প নহে; উহারা সর্পোপাসক একটী জাতি বিশেষ। ঐ জাতির সহিত যুদ্ধে পরীক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই তক্ষক-দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুর কথা প্রচারিত হয়।' কানিংহামের মতে পঞ্জাবের 'তক্ক' জাতি এবং পুরাণের 'তক্ষক' জাতি অভিন্ন। কর্ণেল টড বলেন,—'তুরস্ক-জাতির একটী শাখার নাম—তক্ষক। উহাদের পতাকায় সর্প অঙ্কিত; বোধ হয়, তাই অনেকেই সর্পের সহিত উহাদের একত্ব-প্রতিপাদনের প্রয়াস দেখিতে পাই।' কদ্রুর গর্ভে, কশ্যপের অংশে, তক্ষক নাগ জন্মগ্রহণ করেন,—মহাভারতে এইরূপ উল্লেখ আছে। নাগগণ—তক্ষকবংশ-সম্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। [illegible]

শ্যের রাজধানী ছিল। মগধে এবং গুর্জ্জরেও তক্ষক-বংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন,—'নাগবংশ শক-বংশের একটী শাখা-বিশেষ। তাঁহারা সর্পোপাসক ছিলেন এবং তাঁহাদের মুদ্রায় সর্প-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত।' সিংহল দ্বীপে এক সময়ে নাগবংশের প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত হয়, সেই জন্য ঐ দ্বীপ 'নাগদ্বীপ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। আমেরিকা মহাদেশেও নাগবংশের প্রাদুর্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বাসুকী, তক্ষক, অনন্ত, শঙ্খ বা শেষ, পদ্ম, মহাপদ্ম, কুলীর, কর্কোটক,—নাগবংশে এই অষ্ট নাগ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে, পুরাণে বাসুকী সহস্র-ফণাযুক্ত বলিয়া উল্লিখিত। বোধ হয় বাসুকীর সহস্র ফণা রূপক মাত্র। তাঁহার সহস্র ফণা ও সেই সহস্র ফণায় পৃথিবী ধারণ বাক্যের তাৎপর্য্য—বাসুকীর দিগ্বিজয়ী সহস্র পুত্র কর্তৃক এক সময়ে পৃথিবী পরিরক্ষিত হইয়াছিল। যাহা হউক, উরগ, নাগ প্রভৃতি বংশকে সর্প-বংশ বলিয়া লোকের মনে এতদূর দৃঢ়বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, এখন আর কেহই তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই কতক কতক প্রদান করিয়াছি। তাঁহারাও এক একটী প্রবল-পরাক্রমশালী জাতি ছিলেন,—এতদ্ভিন্ন অপর কিছুই অনুমান করা যায় না। গন্ধর্ব্বগণ গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং নৃত্যাদি দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ইঁহারা গান করিতে করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 'গন্ধর্ব্ব' নামে অভিহিত হন। ভাগবতেও গন্ধর্ব্বগণ উত্তম গায়ক ও নৃত্যকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাভারতে লিখিত আছে,—গন্ধর্ব্বগণ উত্তর-দেশের অধিবাসী। রামায়ণেও গন্ধর্ব্বদিগের ঐরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই। গন্ধর্ব্বগণ এক সময়ে পাতালে গমন করিয়া নাগগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। কেহ কেহ বলেন,—"গন্ধর্ব্বগণ গান্ধার-দেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের নামানুসারেই গান্ধার দেশের নামকরণ হইয়াছিল।' কেহ আবার বলেন—'গন্ধর্ব্বগণের বাসস্থানের নাম—গন্ধর্ব্ব-নগর।' অর্জ্জুন ঐ নগর জয় করিয়াছিলেন বলিয়া, মহাভারতে প্রকাশ। এখন গন্ধর্ব্বগণের বা গন্ধর্ব্ব-বংশের পরিচয়-চিহ্ন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া সুকঠিন। নানারূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে গন্ধর্ব্বগণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়াই সম্ভবপর। কিন্নরগণ—গীতবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিম্পুরুষ বলিয়াও তাঁহারা পরিচিত। কৈলাস-শৃঙ্গে কিন্নর-কিন্নরীগণ গীতবাদ্য করিয়া বেড়াইতেন, রামায়ণে উল্লেখ আছে। কাশ্মীরের রাজগণের সভায় কিন্নর-কিন্নরীগণের নৃত্যগীতাদির পরিচয় রাজতরঙ্গিণীতে দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার 'কান' নামধেয় জাতি (মধুকান প্রভৃতি) কিন্নর-বংশ সমুদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যক্ষগণ সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন,—যু বা য়িহুদীগণ মিশরবাসী কর্তৃক 'হিক্সো' (Hykso) নামে অভিহিত হইতেন। যক্ষ শব্দই উচ্চারণ-ভেদে ঐ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল,—এইরূপ অনুমান হয়। যক্ষগণ কুবেরের ধনরক্ষক বলিয়া পরিচিত। বঙ্গদেশে 'যখের ধন' বলিয়া একটী প্রবাদ আছে। তদ্দ্বারা যক্ষগণকে কৃপণের চূড়ামণি বলিয়া বুঝা যায়। য়িহুদী বা যুগণের কেহ কেহ সেকালে কুসীদজীবী ও ঘোর কৃপণ বলিয়া পরিচিত

ছিলেন।' 'মার্চেন্ট অব ভিনিস্' নামক নাটকে মহাকবি সেক্সপীয়র 'সাইলক' নামক যে য়িহুদীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত 'যক্ষের ধন রক্ষক' কৃপণের সাদৃশ্যের অভাব নাই। বোধ হয় এই জন্যই পণ্ডিতগণ যক্ষ ও য়ু-গণকে এক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার বলেন,—হিক্স (হক) ও যক্ষ সাদৃশ্যব্যঞ্জক শব্দ বটে; কিন্তু হিক্স বলিতে য়িহুদীদিগকে বুঝায় না; মিশর দেশের একটী রাজবংশ 'হিক্স' নামে পরিচিত ছিলেন; তাঁহারাই হয় তো ভারতবাসীর নিকট যক্ষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। হিক্সগণ যে দেশ আক্রমণ করিতেন, সে দেশ মরুভূমে পরিণত হইত। দুর্দ্ধর্ষতা ও অত্যাচার-পরায়ণতার জন্যই তাঁহারা ভারতবাসীর নিকট যক্ষ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন।' কেহ কেহ আবার অনুমান করেন;—'যক্ষ ও যবন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। যাহা হউক, হিক্সগণ বা যক্ষগণ এক সময়ে মিশরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পুরাবৃত্তে তাহার প্রমাণ পাই। মিশরে যখন চতুর্দ্দশ রাজবংশ রাজত্ব করেন, হিক্সগণ সেই সময়ে মিশর অধিকার করিয়াছিলেন। মিশর দেশের স্তম্ভ-সমূহে হিক্স-বংশীয় নৃপতিগণের নাম ও শাসন-কালের বিষয় খোদিত হইয়াছিল। জোসেফাস বলেন,—উহাঁরা ইব্রীয় বা আরব।' সিন্‌কেলাস বলেন,—'ভিনিসীয় মেষপালকদিগের বংশে উহাঁরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' অপরাপর মতে, হিক্সগণ 'ইডুমেন' 'ইস্রাইলেটিস' বা 'সিদীয়'-গণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন। আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁহাদিগকে সেমিটিক বংশ-সম্ভূত বলিয়া মনে হয়। পালেস্তাইনের উত্তরাংশে, মেসোপোটেমিয়ার পার্ব্বত্য-প্রদেশে, কিস্তা নামক স্থানে, তাঁহাদের আদি-বাস ছিল,—অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। বুন্সেনের মতে ১৬৩৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, লেপ্সিয়াসের মতে ১৮৪২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এবং অপরাপর পণ্ডিতগণের হিসাবে ১৫০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মিশরে ঐ জাতির রাজত্বকালের পরিসমাপ্তি হয়। একটু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিলে, ঐ জাতি ভারতবর্ষ হইতে দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুপর্ণ শব্দের অর্থ—উত্তম-পক্ষযুক্ত। সুপর্ণ বলিতে রূপকে বিহগ-বংশ গরুড়াদিকে বুঝাইয়া থাকে। এই বংশের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করা সুকঠিন। রামায়ণে ও মহাভারতে গরুড় স্পষ্টতঃ পক্ষিরূপে পরিচিত। কিন্তু মনুষ্যের সহিত পক্ষি-জাতির কোনও সম্বন্ধ আছে কি না বা কতটুকু সম্বন্ধ আছে, প্রাণিতত্ত্ববিদগণ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন! * ফলতঃ, পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে অসংখ্য জাতির বা মনুষ্য-সম্প্রদায়ের বিবরণ রূপকে পরিবর্ণিত আছে। সেই রূপক-রহস্য ভেদ করা সহজসাধ্য নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সেই রূপক-তত্ত্ব ভেদ করিতে গিয়া সময় সময় বিশেষ বিশেষ স্থানে স্বর্গ এবং দেবগণের কল্পনা করিয়াছেন। †

---

* রূপচাঁদ নামক কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ গায়ক 'পক্ষী' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পক্ষীর খাঁচার ন্যায় একখানি গাড়িতে চড়িয়া তিনি ভ্রমণ করিতেন। রূপকের প্রভাবে, কালক্রমে, তিনি পক্ষযুক্ত ছিলেন বলিয়া প্রচারিত হওয়াও বিচিত্র নহে।

† "Adelung, the faher of C cmparative Philology, who died in 1806, placed the cradle of mankind in the valley of Cashmere, which he identified with Paradise,"—*The Origin of the Aryans* by Dr. Isaac Taylor, M. A. &c.

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

——:•:——

জাতি ও সম্প্রদায়।

[ভারতের আধুনিক জাতি-সমূহ,—আদম-সুমারী মতে জাতি-বিভাগ,—ভারতের প্রধান প্রধান জাতি-সমূহের নাম, সংখ্যা ও বাসস্থান;—ব্রাহ্মণ-বংশের বিভিন্ন বিভাগ,—গোত্র, প্রবর প্রভৃতি;—বংশভেদে ও দেশভেদে বিভাগ-সমূহের পরিচয়;—সারস্বত ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের শাখা-প্রশাখা ও আচার-ব্যবহারাদি;—কনোজীয় ব্রাহ্মণ;—মৈথিল ব্রাহ্মণ;—উৎকলীয় ব্রাহ্মণ;—গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ,—বঙ্গদেশের-ব্রাহ্মণ,—রাঢ়ী, বরেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী প্রভৃতির পরিচয়;—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ;—অন্ধ্র বা তৈলিঙ্গী ব্রাহ্মণ;—দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ,—গুর্জ্জরী ব্রাহ্মণ;—কার্ণাটিক ব্রাহ্মণ;—ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি অন্যান্য জাতি—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী জাতি-সমূহ,—তাহাদের পর্য্যায় নির্ণয় সম্বন্ধে সমস্যা;—উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য।]

পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যে ভাবে জাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, সকল জাতি সম্বন্ধে সে নিয়ম অধুনা অব্যাহত নহে। কালবশে বিবাহাদির রীতি-পদ্ধতি এখন অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এই চারি জাতি ভিন্ন, জন্মগত অন্যান্য জাতির অস্তিত্ব এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া সুকঠিন। অধুনা সে সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র।

আধুনিক জাতি-সমূহ।

দুই একটী ভিন্ন এখন ভারতবর্ষের প্রায় সকল বর্ণই—চারি বর্ণের কোনও-না-কোনও বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিয়া থাকেন। সে হিসাবে, মন্বাদি সংহিতোক্ত মিশ্রবর্ণ-সমূহ,—হয় এখন লোপ পাইয়াছেন বলিতে হইবে; না হয়, তাঁহারা চারি বর্ণের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের সকল জাতিই (মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন) আপনাদিগকে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কোনও-না-কোনও বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইলেও ভারতের জাতির সংখ্যা যে কমিয়া আসিয়াছে, কোনক্রমেই তাহা বলা যায় না। বরং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিলেও প্রকারান্তরে প্রায় সকলেই এক-একটী নূতন জাতি হইয়া আছেন। বিগত আদম-সুমারীর বিবরণীতে ভারতীয় জাতির বিষয় অনুসন্ধান করিলেই এতদুক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। আদম-সুমারীর বিবরণীতে ভারতের জাতি-সমূহকে প্রধানতঃ সাত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা,—(১) জন্মগত জাতি (Tribal Caste); অর্থাৎ যে সকল জাতি, নীচ জাতি মধ্যে পরিগণিত হইলেও, আপনাদের আদি-সংজ্ঞা বংশ-পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। গোয়ালা, আহির, ডোম, দোসাদ, গজর, জাঠ, বাগ্দী, চণ্ডাল, রাজবংশী, কোচ (রাজবংশীর), [illegible], [illegible], পাসিয়া প্রভৃতি। এই সকল জাতি প্রায়ই [illegible] [illegible]

করিয়া আছে এবং নীচজাতি মধ্যে গণ্য হইয়েও হিন্দু-সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। (২) আপন-আপন বর্ণোচিত নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুসারে যাহারা জাতিত্ব রক্ষা করিয়া থাকে; যেমন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, চামার, হাড়ি, চুনার, ডোম ইত্যাদি। (৩) সাম্প্রদায়িক জাতি; অর্থাৎ, সময় সময় নব নব ধর্ম্ম-প্রচারকের অভ্যুদয়ে, তাঁহার অনুসরণ-কারিগণের সমবায়ে যে জাতি বা সম্প্রদায় গঠিত হয়। এইরূপ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রায়ই প্রকাশ করেন,—'ঈশ্বরের-সৃষ্ট মনুষ্য-মাত্রেই সমান, সকলেরই সমান অধিকার' ইত্যাদি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বিভাগে বোম্বাই এবং দক্ষিণ-ভারতের 'লিঙ্গায়ৎ' ও 'বৈষ্ণব' সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। (৪) এক সম্প্রদায়ের পুরুষ অন্য সম্প্রদায়ের কন্যাকে বিবাহ করায়, তাহাদের সন্তান সন্ততিতে যে অভিনব জাতির উৎপত্তি। দাক্ষিণাত্যের মুণ্ডাদিগের মধ্যেই এইরূপ জাতি-সৃষ্টি প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। এক সম্প্রদায়ের মুণ্ডা অন্য সম্প্রদায়ের মুণ্ডা-কন্যাকে বিবাহ করিলে, তাহাদের সন্তান-সন্ততি পিতৃ-সম্প্রদায়ের বা মাতৃ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না; তাহাদের দ্বারা নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপে মুণ্ডাদিগের মধ্যে নয়টী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সেই নয়টি সম্প্রদায়,—খাসগড়-মুণ্ডা, খরিয়া-মুণ্ডা, কম্পট-মুণ্ডা, করঙ্গ-মুণ্ডা, মোহিলি-মুণ্ডা নাগবংশী-মুণ্ডা, ওরাওন-মুণ্ডা, সাদ-মুণ্ডা এবং শবর-মুণ্ডা। (৫) জাত্যভিমান-রক্ষণ-প্রয়াসী জাতি, অর্থাৎ যাহারা পূর্ব্বে কোনও উচ্চ-বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, কালক্রমে এখন নীচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ পূর্ব্ব-পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা পাইতেছে। এই তালিকায় নেপালের মেওয়ারিগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহারা মাঙ্গোলীয়-বংশ-সম্ভূত মিশ্র-জাতি। এককালে উহারাই নেপালের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গুর্খা পৃথ্বীনারায়ণ কর্তৃক উহারা পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হইলেও উহারা আপনাদিগকে গুর্খা বা নেপালী না বলিয়া মেওয়ারীই বলিয়া থাকে। মেওয়ারীদিগের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। (৬) স্থান-ত্যাগে নূতন জাতির সৃষ্টি; কোনও কোনও সম্প্রদায়ের লোক আপনাদের আদি-বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া অন্য এক প্রদেশে বসতি করিবার সময় আপনাদের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার চেষ্টা করে। যেমন, পশ্চিম প্রদেশের ক্ষৌরকারগণ বঙ্গদেশে আসিয়া 'খোট্টা' বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয় এবং বঙ্গদেশের নাপিতগণের সহিত বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হয়। (৭) আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে জাতি-সৃষ্টি। যেমন বিহার অঞ্চলের আউধিয়া কুর্ম্মিগণ। উহারা অখাদ্য ভক্ষণ করায় পতিত-জাতি-মধ্যে পরিগণিত হইলেও, ব্রাহ্মণগণ উহাদের জল ব্যবহার করেন। প্রধানতঃ এবম্বিধ সপ্ত বিভাগে ভারতের জাতি-সমূহকে বিভক্ত করিয়া আদম-সুমারীর কর্ম্মকর্তৃগণ ভারতের কতকগুলি প্রধান প্রধান জাতির নামোল্লেখ করিয়াছেন। সেই সকল জাতির নাম, সংখ্যা এবং তাহারা প্রধানতঃ কোন্ কোন্ দেশে বসতি করে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদান করিতেছি। তাহাতে ভারতের আধুনিক জাতি-সমূহের স্থূল স্থূল পরিচয় বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হইবে।

জাতির নাম।	জাতির লোক-সংখ্যা	প্রধানতঃ কোন্ প্রদেশে বাস।
ব্রাহ্মণ	১,৪৮,৯৩,২৫৮	অধিকাংশ প্রদেশ
ক্ষত্রিয়	১০,৩০,০৭৮	ঐ
কায়স্থ	২১,৪৯,৩৩১	ঐ
বাভন	১৩,৫৩,২৯১	বঙ্গদেশ ও যুক্ত-প্রদেশ
বেণিয়া	২৮,৯৮,১২৬	অধিকাংশ প্রদেশ
কুমার	৩৩,৭৬,৩১৮	ঐ
লোহার	২৩,৪২,২৫৭	ঐ
নাপিত (হাজাম)	১৯,৫৮,৭২২	ঐ
রাজপুত	৯৭,১২,১৫৬	ঐ
সোনার	২,৫৩,০৭০	ঐ
তেলি ও তিলি	৪০,২৫,৬৬০	ঐ
তাঁতি	৯,৭০,১৬০	আসাম ও বঙ্গদেশ
মুচী	১০,০৭,৮১২	অধিকাংশ প্রদেশ
কৈবর্ত্ত	২৬,৯৪,৩২৯	আসাম ও বঙ্গদেশ
কাহার	১৯,৭০,৮২৫	অধিকাংশ প্রদেশ
যোগী ও যুগী	৭,০৩,০৭৩	ঐ
ধোবী	২০,১৬,৯১৪	ঐ
চামার	১,১১,৩৭,৩৬২	ঐ
বাগ্দী	১০,৪২,৫৫০	আসাম ও বঙ্গদেশ
কেওট	১১,১০,৭৬৭	আসাম, বঙ্গ, মধ্য ও যুক্ত প্রদেশ
ডোম	৯,৭৭,০২৬	আসাম, বঙ্গ, পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশ
ফকির	১২,১২,৬৪৮	অধিকাংশ প্রদেশে
জাঠ	৭০,৮৬,০৯৮	ঐ
কুর্মি	৩৮,৭৩,৫৬০	বঙ্গ, মধ্য ও যুক্ত প্রদেশ ও মধ্যভারত
আহির	৯৮,০৬,৪৭৫	বঙ্গ, মধ্য ও যুক্তপ্রদেশ
আরিয় (আর্য্য)	১০,২৬,৫০৫	পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশ
বলীর	১০,৩৬,৫২০	মধ্য-ভারত ও মাদ্রাজ
বেলুচ	১১,২২,৮৯৫	বেলুচিস্থান, বম্বে ও পঞ্জাব
বর্হাই	১১,৩৩,১২৬	বঙ্গ, যুক্ত-প্রদেশ ও মধ্য-ভারত
ভাঙ্গী	৬,৫৬,৫৮৬	বম্বে, যুক্ত-প্রদেশ ও রাজপুতনা
ভীল	১১,৯৮,৮৪৩	বম্বে, মধ্য-ভারত, রাজপুতনা
বার্ম্মিজ	৬৫,১১,৭০৩	ব্রহ্মদেশ
চুড়হা	১৩,২৯,৪১৮	উত্তর-ভারত

জাতির নাম।	জাতির লোক-সংখ্যা।	প্রধানতঃ কোন্ প্রদেশে বাস।
ধাঙ্গর	১৩,২৭,০৫০	বেরার, বম্বে, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ
ধানেক	৮,৭০,৫৫৭	বঙ্গ, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও রাজপুতনা
দোসাদ	১২,৫৮,১৮৫	আসাম, বঙ্গদেশ ও যুক্তপ্রদেশ
গাদারিয়া	১২,৭২,৪১৯	বঙ্গ, মধ্য ও যুক্ত প্রদেশ
গোলা	১৩,৮৭,৪৭২	বঙ্গ, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর
গোন্দ্	২২,৮৬,৯১৩	বঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ
গাজর	২১,০৩,০২৩	অধিকাংশ প্রদেশ
হোলিয়া	৭,৭০,৮৯৯	দক্ষিণ ভারত
ইলুভন	৭,৯১,১৪৭	ঐ
জোলা	২৯,০৭,৬৮৭	বঙ্গদেশ, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ
কচ্ছী	১২,৬০,১৯১	অধিকাংশ প্রদেশ
কালোয়ার	৮,৪৩,২৫২	বঙ্গ, যুক্ত ও মধ্য প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ
কাম্মা	৯,৭৫,৩৭৪	ব্রহ্মদেশ ও মাদ্রাজ
কাম্মালন	১২,৬৩,৮৬২	বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মহীশূর
কান্দু	৬,৬৭,৯০৩	বঙ্গদেশ ও যুক্তপ্রদেশ
কাপু	৩০,৭০,২০৬	ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ
কারেণ	৭,২৭,২৮৬	ব্রহ্মদেশ
খাণ্ডাইৎ	৭,২০,৩২২	বঙ্গদেশ ও মধ্যপ্রদেশ
কেওরি	১৭,৮৪,০৪১	আসাম, বঙ্গ ও যুক্তপ্রদেশ
কোলি	২৫,৭৪,২১৩	বম্বে, পঞ্জাব, বরোদা, হায়দ্রাবাদ, রাজপুতনা
কোমাতি	৬,৮৬,৩১২	মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর
কোড়ি	১২,০৪,৬৭৮	মধ্য ও যুক্ত প্রদেশ এবং মধ্যভারত
কুন্বি	৩৭,০৪,৫৭৬	বেরার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ
কুড়ুম্বন	৮,৫৭,৯১৪	মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর
লিঙ্গাইৎ	২৬,১২,৩৮৬	বম্বে, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর
লোধা	১৬,৬৩,৩৫৪	মধ্য ও যুক্ত প্রদেশ, মধ্যভারত, রাজপুতন
মাদিগা	১২,৮৯,২৫২	মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর
মহার	২৯,২৮,৬৬৬	বেরার, বম্বে, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ
মাল	১৮,৬৩,৯০৮	বঙ্গ, মধ্যভারত, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ
মালী	১৯,১৫,৭৯২	অধিকাংশ প্রদেশ
মাপিল্লা	৯,২৫,১৭৮	দক্ষিণ ভারত
মারাঠী	৫০,০৯,০৩৪	অধিকাংশ প্রদেশ
মেও	৯,৮৯,০৩১	পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যভারত, রাজপুতনা

জাতির নাম।	জাতির লোক-সংখ্যা।	প্রধানতঃ কোন্ প্রদেশে ব
নমঃশূদ্র	২০,৩১,১২৫	আসাম ও বঙ্গদেশ
নেয়ার	১০,৪৬,১৪৮	দক্ষিণ ভারত
নুনিয়া	৮,০৭,৩৭১	অধিকাংশ প্রদেশ
ওরাওন	৬,১৪,৫০১	আসাম ও বঙ্গদেশ
পাল্লী	২৫,৭২,২৬৯	দক্ষিণ-ভারত ও ব্রহ্মদেশ
পানিক	৬,৮৪,১৪৬	অধিকাংশ প্রদেশ
পারাইয়ান	২২,৫৮,৬১১	দক্ষিণ-ভারত ও ব্রহ্মদেশ
পার্সি	১৪,০৮,৩৯২	অধিকাংশ প্রদেশ
রাজবংশী	২৪,০৮,৬৫৪	আসাম ও বঙ্গদেশ
সাঁওতাল	১৯,০৭,৮৭১	ঐ
সানান	৭,৫৯,৩৫১	দক্ষিণ-ভারত
শুঁড়ী	৭,২৪,৬৬৬	আসাম, বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ
বারথান	৭,৫৪,৪৮৫	উত্তর ভারত
ভক্কুলিগ	১৩,৯২,৩৭৫	দক্ষিণ-ভারত
ভেল্লাল	২৪,৬৪,৯০৮	ঐ
শেখ	২,৮৭,০৮,৭০৬	অধিকাংশ প্রদেশ
সৈয়দ	১৩,৩৯,৭০৪	ঐ
পাঠান	৩৪,০৪,৭০১	ঐ

এইরূপে ভারতের প্রধান প্রধান জাতির সংখ্যা চুরাশীটি মাত্র নির্দিষ্ট [illegible]ও ভারতে আরও বহু জাতি বিদ্যমান আছে। সে সকল জাতির সংখ্যা অত্যল্প বা[illegible]ই হউক, অথবা তাহারা তাদৃশ প্রতিষ্ঠাপন্ন নহে বলিয়াই হউক, উপরোক্ত তালিকায় তাহাদের নাম সন্নিবিষ্ট হয় নাই। উল্লিখিত চুরাশীটি জাতির মধ্যেও এক একটী জাতি কত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত আছে! সেই সেই সম্প্রদায়ের পরস্পর আচার-ব্যবহারে এতই তারতম্য ঘটিয়াছে যে, সেই সেই সম্প্রদায়কে এক একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিলেও বলা যাইতে পারে।

ভারতীয় জাতি-সমূহের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই কত প্রকার বিভাগ দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-গণের পরিচয় গ্রহণে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। সেই প্রশ্ন কয়েকটীর বিষয় অনুধাবন করিলেও, কি প্রকারে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিভাগ-

ব্রাহ্মণবংশ।

সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। পরিচয়-গ্রহণ-ব্যপদেশে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করা হয়,—(১) আপনার গোত্র কি, (২) প্রবর কি, (৩) বেদ ও বেদ-শাখা কি, (৪) উৎপত্তিকাল কত দিন, (৫) আপনি কোন্ শ্রেণী, (৬) কোন্ গাঁঞি, (৭) কুলীন শ্রোত্রিয় বা বংশজ, (৮) কুলীন হইলে, আপনার পটী বা মেল কি, (৯) আপনার পিতা, পিতামহ, মাতুল ও মাতামহেরই বা পরিচয় কি? এবম্বিধ প্রশ্নের উত্তর পাইলে, ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা

বিশেষভাবে জানা যাইতে পারে। প্রথম প্রশ্ন—গোত্র। গোত্র শব্দে পূর্ব্বপুরুষ বুঝাইয়া থাকে; অর্থাৎ যে ঋষির বংশে যে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি সেই ঋষির নামে আপন গোত্রের পরিচয় দিয়া থাকেন; যেমন শাণ্ডিল্য ঋষির বংশধরগণ শাণ্ডিল্য গোত্র, বাৎস্ত ঋষির বংশধরগণ বাৎস্ত গোত্র, বসিষ্ঠ ঋষির বংশধরগণ বসিষ্ঠ গোত্র, ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে গোত্রের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়। কোনও গ্রন্থে চব্বিশটী, কোনও গ্রন্থে আটত্রিশটী, কোনও গ্রন্থে বিয়াল্লিশটী এবং কোনও গ্রন্থে কোটী গোত্রের উল্লেখ আছে। সে সকল দেখিয়া মনে হয়, বংশে যে যে প্রধান পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাঁহারাই গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি মধ্যে গণ্য হন। আশ্বলায়ন সূত্রে গোত্র-প্রবর্ত্তক আট জন প্রধান ঋষির নাম দৃষ্ট হয়; যথা,—ভৃগু, অঙ্গিরস, অত্রি, বিশ্বামিত্র, কশ্যপ, বসিষ্ঠ, অগস্ত্য। সে স্থলে গৌতমকে এবং ভরদ্বাজকে অঙ্গিরস গোত্রের শাখার মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। উক্ত আট গোত্র হইতে যে সকল গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, কমলাকর ভট্টের "নির্ণয়-সিন্ধু" গ্রন্থে তাহার বিশদ তালিকা দৃষ্ট হয়। সেই তালিকা অনুসারে বুঝিতে পারা যায়,—কশ্যপ হইতে পাঁচটী গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে;—(১) কাশ্যপ (২) নৈধ্রুব, (৩) শাণ্ডিল্য, (৪) রেভ, (৫) লৌগাখ্য; বসিষ্ঠ হইতেও ঐরূপ পাঁচটী গোত্রের উদ্ভব,—(১) বাসিষ্ঠ, (২) কৌণ্ডিণ্য, (৩) ঔপমন্যু, (৪) পারাশর ও (৫) জাতুকর্ণ; অগস্ত্য হইতে আগস্ত্য, সোমভব, যজ্ঞভব, সামভব, দ্বারভব, ইধ্মভব, সম্ভব; ভৃগু হইতে জামদগ্নি, বিদ, অর্ষ্টিসেন, যাস্ক, মৈত্রেয়, বৈনেয়, সৌনিক প্রভৃতি; অত্রি হইতে আত্রেয়, ধনঞ্জয়, বাদভূতক, মৌদগল্য প্রভৃতি। আঙ্গিরস হইতে গৌতম শাখায় বামদেব, দীর্ঘতমস্, ঔশনস প্রভৃতি দশটী গোত্র; কেবল অঙ্গিরস শাখা হইতে হারীত, কাণ্ব প্রভৃতি ছয়টী গোত্র; ভরদ্বাজ শাখা হইতে ভারদ্বাজ, গার্গ্য, ঋক্ষ প্রভৃতি চারিটী গোত্র; এবং বিশ্বামিত্র হইতে কুশিক, ধনঞ্জয়, লোহিত প্রভৃতি দশটী গোত্র উৎপন্ন হইয়াছে। মৎস্তপুরাণে ভৃগু-বংশেই অন্যূন নব্বই জন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষির নাম দৃষ্ট হয়; সেই সমস্ত গোত্রের প্রবর একরূপ। অঙ্গিরস বংশেরও চৌত্রিশ জন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষির নাম মৎস্ত-পুরাণে লিখিত আছে; সেই চৌত্রিশ জনেরও প্রবর এক। ঐরূপ অত্রি-বংশে, কশ্যপ-বংশে, বসিষ্ঠ-বংশেও গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির সংখ্যা অনেক দৃষ্ট হয়। যাঁহাদের প্রবরে ও গোত্রে মিল আছে, সেই ঋষিগণের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, মূলে এক পুরুষ হইতেই বিভিন্ন গোত্রের এবং শাখার সৃষ্টি হইয়া আছে। দ্বিতীয়—প্রবর। প্রবর ও গোত্র প্রায় এক-অর্থজ্ঞাপক। তবে পার্থক্য এই যে,—গোত্র-শব্দে বংশ-প্রবর্ত্তক একজন প্রধান পুরুষকে বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু প্রবর শব্দে বংশের বা বংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অপর বংশের প্রধান প্রধান দুই, তিন, চারি বা পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রথমে ব্রাহ্মণগণ গোত্র বলিয়াই পরিচয় দিতেন। কিন্তু কালক্রমে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ, পুরোহিতের গোত্রানুসারে আপনাদের গোত্র-পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে কেবলমাত্র গোত্র বলিলে—বক্তা কোন বংশজ, তাহা বুঝিবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটে; সুতরাং প্রবরের প্রবর্ত্তন হয়। গোত্রে গোত্র-

প্রবর্ত্তক ঋষির নাম এবং প্রবরে সেই বংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আরও কয়েক জন প্রধান প্রধান পুরুষের নাম উক্ত হওয়ায়, বংশটী চিনিয়া লইবার পক্ষে কোনই অন্তরায় ঘটে না। তাই ব্রাহ্মণগণের গোত্র-সহ প্রবরের উল্লেখ—ব্রাহ্মণত্বের প্রধান পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে কয়েকটী গোত্রের এবং প্রবরের উল্লেখ করিতেছি; তাহাতে, গোত্র ও প্রবর দ্বারা কিরূপে-ব্রাহ্মণ-বংশ বিভাগীকৃত হইয়াছিল, উপলব্ধি হইতে পারিবে। যথা,—

গোত্র		প্রবর	গোত্র		প্রবর
শাণ্ডিল্য	...	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।	বাৎস্য	}	ঊর্ব্বা, চ্যবন ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্ন বৎ।
কাশ্যপ	...	কশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।	সাবর্ণ		
ভরদ্বাজ	...	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।	মৌদগল্য		
			সোপায়ন		
অগস্ত্য	...	অগস্ত্য, দধীচি, জৈমিনি।	গৌতম	...	গৌতম, আঙ্গিরস, অপ্সার বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
গোতম	...	গোতম, বসিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।	•		
শুনক	...	শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ।			
			শক্তি	}	
কাত্যায়ন	...	অত্রি, ভৃগু বসিষ্ঠ।	পরাশর		বসিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর।
বসিষ্ঠ	...	বসিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।	বৃহস্পতি	...	কপিল, বৃহস্পতি, পার্ব্বণ।
অত্রি	...	অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ।	বিষ্ণু	...	বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব।
জামদগ্ন	...	জমদগ্নি ঊর্ব্ব, বশিষ্ঠ।	কুশিক	...	কুশিক, কৌশিক, বিশ্বামিত্র।
বিশ্বামিত্র	...	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।	গর্গ	...	গার্গ্য, কৌস্তুভ, মাণ্ডব্য।
আঙ্গিরস	...	আঙ্গিরস, বসিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।	বৃদ্ধি	...	কুরু, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
কৌশিক	...	কৌশিক, অত্রি, জামদগ্ন্য।	অব্য	...	অব্য, বলি, সারস্বত।
বাসুকি	...	আস্তীক, অনন্ত, বাসুকি।	জৈমিনি	...	জৈমিনি, উতথ্য, সাঙ্কৃতি।
কাশ্বম	...	অশ্বথ, দেবল, দেবরাজ।	কাশ্ব	...	কাশ্ব, অশ্বথ, দেবল।
সাঙ্কৃতি	...	সাঙ্কৃতি, আরাত্রি, অবাহ।	আলম্যান	...	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
অবাবৃকাক	...	গার্গ্য, গৌতম, বসিষ্ঠ।	ঘৃতকৌশিক	...	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
সৌকালীন	...	সৌকালীন, অঙ্গিরস বার্হস্পত্য, অপ্সার, নৈধ্রুব।	কাণ্বায়ন	...	কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অজমীঢ়।
কৌণ্ডিন্য	...	কৌণ্ডিন্য, স্তিমিক, কৌৎস্য।	বৈয়াঘ্র	...	সাঙ্কৃতি
কৃষ্ণাত্রেয়	...	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস।	বৈয়াঘ্রপদ্য	...	"
আত্রেয়	...	আত্রেয়, শাতাতপ শাখা।	রোহিত	...	ভার্গব, নীললোহিত, রোহিত।

গোত্র ও প্রবর বিবাহাদি কার্য্যে আবশ্যক। প্রবরের ও গোত্রের মিল হইলে, এক বংশের সহিত অপর বংশের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। কোন্ কোন্ প্রবরে বিবাহ নিষিদ্ধ, মৎস্যপুরাণে তাহার অনেকগুলির উল্লেখ আছে। কোন্ গোত্রের সহিত কোন্ গোত্রের এবং কোন্ প্রবরের সহিত কোন্ প্রবরের বিবাহ বিহিত হয়, উদ্বাহ-তত্ত্বে তাহার মীমাংসা দৃষ্ট হয়। গোত্র ও প্রবর ভিন্ন ব্রাহ্মণদিগের আর এক পরিচয়—শ্রেণী। শ্রেণী শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। তন্মধ্যে বাসস্থানের পার্থক্য-হেতুই প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগণের শ্রেণি-বিভাগ হইয়াছিল বুঝিতে পারা যায়;—যেমন, রাঢ়-দেশে বাস-হেতু রাঢ়ী, বরেন্দ্র-ভূমে বাস-হেতু বরেন্দ্র, কনোজে বাস-হেতু কনোজিয়া, মিথিলায়

বাস-হেতু মৈথিলী, উৎকল-দেশে বাস হেতু উৎকলীয়, ইত্যাদি। চতুর্থ—বেদ। ঋক, সাম যজুঃ, অথর্ব্ব—এই চারি বেদে বহু বিভাগ আছে। তাহাদের এক একটা বিভাগ—স্থান, শাখা প্রভৃতি নামে অভিহিত। ঋগ্বেদের আটটি স্থান এবং চারিটী শাখা দৃষ্ট হয়। যজুর্ব্বেদে ছিয়াশীটি এবং সামবেদে সহস্রটী শাখা আছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অথর্ব্ববেদেরও নানা বিভাগ। ঋগ্বেদের শাখার মধ্যে পাঁচটী প্রধান শাখার নাম,—শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন ও মণ্ডুকায়ন। সামবেদের দুইটী মাত্র প্রধান শাখায় এখন পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের নাম—রাণায়নী ও কৌথুমী। এই দুই শাখার প্রত্যেকটীতে আবার সাতটী করিয়া ভাগ আছে। যজুর্ব্বেদের শাখার মধ্যে চক্র, মৈত্রায়ণী, মাধ্যন্দিন, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। সকল ব্রাহ্মণ সকল বেদে অধিকার লাভ করিতে পারেন না বলিয়া, এক এক বংশের ব্রাহ্মণের জন্য এক এক বেদ বা এক এক বেদের এক এক শাখা অধ্যয়নের ব্যবস্থা হয়। ব্রাহ্মণের বেদ ও শাখা বলিতে, সেই ব্রাহ্মণের পিতৃপুরুষগণ যে বেদের যে শাখা অধ্যয়ন করিতেন বা যে বেদের যে শাখার অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন, তাহাই বুঝা যায়। চতুর্থ.—ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিতে প্রধানতঃ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহণ প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। উৎপত্তি-কাল কত দিন—এ প্রশ্নের উত্তরে, আদি ব্রাহ্মণ-বংশ হইতে অথবা কোনও ক্ষত্রিয়-বংশ হইতে (যেমন বিশ্বামিত্র প্রভৃতি) উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন হয়। কুলীন, শ্রোত্রিয়, পটী বা মেল প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। পিতা, পিতামহ, মাতুল, মাতামহের পরিচয়েও, এক বংশের সহিত অন্য বংশের সম্বন্ধ ও পার্থক্য স্বভাবতঃ প্রতিপন্ন হয়। উপরোক্ত কারণ-সমূহ ভিন্ন ব্রাহ্মণগণ দেশভেদে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। সেই দুই ভাগ হইতে আবার অসংখ্য ভাগের ও অসংখ্য পরিচয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। দেশভেদে তাঁহারা যে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত হন, সেই দুই ভাগের নাম—পঞ্চ-গৌড় এবং পঞ্চ-দ্রাবিড়। পঞ্চ-গৌড় বিভাগে—বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উত্তরস্থিত পঞ্চদেশীয় ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া থাকে; এবং পঞ্চ-দ্রাবিড় শব্দে—বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণস্থিত পঞ্চদেশীয় ব্রাহ্মণগণ নির্দ্দিষ্ট হন। পঞ্চ-গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ,—(১) সারস্বত, অর্থাৎ সরস্বতী নদীর পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ-সমূহের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ; (২) কান্যকুব্জ, অর্থাৎ কান্যকুব্জ বা কনোজ-প্রদেশস্থিত ব্রাহ্মণবর্গ; (৩) গৌড়দেশীয় অর্থাৎ প্রাচীন গৌড়-প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ; (৪) উৎকলীয়, অর্থাৎ উৎকল বা ওড্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণবর্গ; (৫) মৈথিল, অর্থাৎ মিথিলা-প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণ-সমূহ। পঞ্চ-দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ,—(১) মহারাষ্ট্রীয়, অর্থাৎ মারাঠী-ভাষাভাষী দেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ; (২) অন্ধ্র বা তৈলঙ্গী, অর্থাৎ তেলেগু-ভাষাভাষী দেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ; (৪) দ্রাবিড়ী, অর্থাৎ দ্রাবিড়ী বা তামিল ভাষাভাষী দেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ; (৪) কার্ণাটক, অর্থাৎ কার্ণাটক বা কেনারী-ভাষাভাষী দেশের ব্রাহ্মণগণ; (৫) গুর্জ্জরী, অর্থাৎ গুর্জ্জরাষ্ট্রী বা গুজরাটী ভাষাভাষী দেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ। ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ উপরোক্ত দুইটী ভাগে এবং দশটী উপবিভাগে বিভক্ত হইলেও, ভারতবর্ষের সকল ব্রাহ্মণই যে ঐ ভাগের ও উপ-বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট, তাহাও বলিতে পারা যায় না। জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ-

প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল গ্রন্থেই ঐ ভাগ ও উপবিভাগের অতিরিক্ত অপর কতকগুলি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ আছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রেভারেণ্ড সেরিংস্ ভারতবর্ষের জাতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে তিনি অন্যূন দুই সহস্র ব্রাহ্মণ-বংশের উপাধি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার উইলসন ভারতের জাতি-সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতেও বহু ব্রাহ্মণ-বংশের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত বিভাগ ও উপবিভাগের বহির্ভূত ব্রাহ্মণগণের উপাধি-পরিচয়ও সেই দুই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু-জাতি সম্বন্ধে সার হার্ব্বার্ট রিজলে যে গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন, তাহাতেও সে পরিচয় প্রাপ্ত হই। * ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থ ভিন্ন, জাতিতত্ত্ব বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থেরও অসদ্ভাব নাই।

সারস্বত ব্রাহ্মণ।

পঞ্চ-গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সারস্বত ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ পঞ্চনদ-প্রদেশে (লাহোর অমৃতসর, বাতালা, গুরুদাসপুর, জলন্ধর, মূলতান, ঝাং ও সাপুর জেলায়), কাঙ্গড়া ও তাহার পারিপার্শ্বিক পার্ব্বত্য-প্রদেশে, দত্তেরপুর, হুশিয়ারপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে, জাম্মু, জাসরোতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য-প্রদেশে, সিন্ধুদেশে, রাজপুতনায়, গুজরাটে এবং দক্ষিণ-ভারতের কোনও কোনও অংশে বসতি করেন। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণও সারস্বত ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কথিত হন। সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইলেও, আচার ব্যবহারের পার্থক্য অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। এক প্রদেশের সারস্বত ব্রাহ্মণের সহিত অপর প্রদেশের সারস্বত ব্রাহ্মণের বিবাহাদি সম্বন্ধে অনেক সময় অপত্তি ঘটিয়া থাকে। ডাক্তার উইল্‌সন এক সময়ে (সিপাহী যুদ্ধের পূর্ব্বে) সারস্বত ব্রাহ্মণগণ কত সম্প্রদায়ে বিভক্ত তন্নিরূপণার্থ তাঁহাদের তালিকা-সংগ্রহে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি জানিতে পারেন, সারস্বত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অন্যূন চারি শত উনসত্তরটী বিভাগ আছে। ঐ সকল বিভাগের মধ্যে কতকগুলি বিভাগ উচ্চ শ্রেণীর সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং অপর কতকগুলি কিছু নিকৃষ্ট-পদবাচ্য। হরিদ্বারে, থানেশ্বরে এবং মথুরায় পাণ্ডাদিগের নিকট তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণগণের যে বংশ-তালিকা রক্ষিত হয়, তদ্দৃষ্টে চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের বংশের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। সারস্বত ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ শক্তি-উপাসক। আদম-সুমারীর বিবরণীতে তাঁহারা দুইটী উপবিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। সেই দুই উপবিভাগের নাম—(১) বাঞ্জোই ও (২) মহিয়াল। বাঞ্জোই ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিগণের পৌরহিত্য করিয়া থাকেন; কিন্তু মহিয়ালগণ কাহারও পৌরোহিত্য করেন না। কেহ কেহ অনুমান করেন, বহুজনের যাজকত্ব-হেতু 'বহুযাজী' বা 'বাঞ্জোই' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সারস্বত ব্রাহ্মণগণ বলেন,—বহুযাজী বলিয়া তাঁহারা বাঞ্জোই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন নাই। বাহান্ন-যাজী অর্থাৎ বাহান্ন ঘরের পৌরোহিত্য-হেতুই তাঁহারা ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বাঞ্জোই নামের উৎপত্তি

* *Vide* Dr. John Wilson, *Indian Castes*, Rev. M. A. Sherring, M. A. Lt. D. *Hindu Tribes and Castes*, Sir Herbert Risley, *The People of India*, and Dr. J. N. Bhattacharjya, *Hindu Castes and Sects*.

সম্বন্ধে তাঁহারা আরও বলেন,—'এক সময়ে দিল্লীর মোগল-বাদসাহ, তাঁহাদের সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বাদসাহের আদেশে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সেই হইতে বাঞ্জোহি বলিয়া পরিচিত হন।' সারস্বত ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ 'মিশির' (মিশ্র) উপাধিযুক্ত। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি বংশের আবার স্বতন্ত্র উপাধি আছে। পঞ্জাবে নিম্নলিখিত উপাধিধারী সারস্বত ব্রাহ্মণগণ অধুনা প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। যথা,—

	উপাধি।		উপাধি।
১। প্রধান স্তর পঞ্চজাতি	(১) মোল	২। নিম্নস্তর পঞ্চজাতি	(১) কালিয়া
	(২) তেখা		(২) মালিয়া
	(৩) ঝিঙ্গন		(৩) কুপুরিয়া
	(৪) জেতেলি		(৪) মধুরিয়া
	(৫) কুমরীয়		(৫) বাগ্‌গে

৩। অষ্টবংশ,—পাঠক, শরী, তেওয়ারী, ভুষ-ব্রাজ, জোতাসী, সন্দ্‌, কুর্দা, ভারদ্বাজ।

৪। বারোহি,—অর্থাৎ দ্বাদশ বংশ। যথা,—কোলীয়, প্রভাকর, লক্ষ্মণপাল, ঐড়ী, নাভ, চিত্রছোট, নারদ, সারদ, জলপাত্র, ভামরী, পারণতি, মানার।

৫। নিম্নস্তরের বাঞ্জাই; পূর্ব্বোক্ত চারি পর্য্যায়ের বহির্ভূত; যথা—বাসুদেও, বিজোর, রান্দে, মেহেরা, মুসলোল, সূত্রক, সুদান, তেড়ি, অঙ্গুল হস্তির।

সারস্বত ব্রাহ্মণগণ স্ববংশে বিবাহ করেন না; কিন্তু স্বগোত্রে বিবাহ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে অবশ্য সেইরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ আছে। মহিয়াল সারস্বত ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ পঞ্জাবের পশ্চিমস্থিত জেলা-সমূহে এবং কাবুলে বাস করেন। তাঁহাদের সহিত অন্যান্য সারস্বত ব্রাহ্মণগণের বিবাহ-সম্বন্ধ নিষিদ্ধ নহে বটে; কিন্তু প্রায়ই সেরূপ বিবাহ সংঘটিত হয় না। সারস্বত ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই ব্রাহ্মণদিগের কেহ বা পৌরহিত্যে ব্রতী, কেহ বা দৈবজ্ঞ, কেহ বা ভিক্ষাপজীবী। পঞ্জাবের কতকগুলি পার্ব্বত্য ব্রাহ্মণ আপনাদিগকে সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু কৃষিকার্য্য ও ভারবহন তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না। সিন্ধু-দেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। সিন্ধু-দেশীয় সারস্বত ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ পাঁচটী শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) শ্রীকর বা শিকার-পুরী; ইহাঁরা বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব; এই সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই মাংসাশী এবং বেণিয়া যজমানের পৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করেন। (২) বারি বা বারোভি; ইহাঁরা বৈষ্ণব, অথচ মাংসভোজী। (৩) বাভঙ্গাড়ী বা বায়ান্ন বংশীয়; ইহাঁরা শাক্ত; সিংহ-বাহিনীর উপাসক; ইহাঁদের মধ্যে অনেকে মদ্য-মাংস-ভোজী। (৪) শ্বেতপল; ইহাঁদের কতকগুলি শাক্ত এবং কতকগুলি বৈষ্ণব; মদ্য, মাংস ও মৎস্য ব্যবহারে ইহাঁদের অনেকেরই আপত্তি নাই। (৫) কুভচণ্ড; ইহাঁদের অনেকের আচার-ব্যবহার মুসলমানের ন্যায়। সিন্ধু-দেশীয় সারস্বত ব্রাহ্মণগণ সকলেই শুক্ল-যজুর্ব্বেদী। সিন্ধুদেশে পোখার্ণ নামে আর এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়; তাঁহারাও আপনাদিগকে সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেকেই মদ্য-মাংস ভক্ষণ করেন না। তাতিয়া

বিষ্ণুর পৌরোহিত্য করাই তাঁহাদিগের প্রধান ব্যবসায়। ব্রহ্মপুত্র এবং সিন্ধুর মধ্যবর্ত্তী বঙ্গ-প্রদেশে কতকগুলি ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা আপনাদিগকে সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা মৎস্য বা তাম্রকূট স্পর্শ করে না; কিন্তু তাঁহারা মালিয় এবং নাপিতের রন্ধন-দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণ, অনেকেরই মতে, সারস্বত ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আচার-ব্যবহারে পঞ্জাবের সারস্বত ব্রাহ্মণগণ হইতে তাঁহাদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণের সকলেই 'পণ্ডিত' উপাধি-ধারী। সার জর্জ ক্যাম্বেল, তৎপ্রণীত 'ভারতের জাতি-তত্ত্ব' নামক গ্রন্থে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—'কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা উচ্চশ্রেণীর আর্য্যগণের প্রতিকৃতি। তাঁহারা সুশ্রী ও সুন্দর; কোনও নিম্ন-শ্রেণীর সহিত তাঁহাদের সংমিশ্রণ হয় নাই।' * কিন্তু কাশ্মীরের ইতিহাস আলোচনা করিলে, এ সকল বিষয়ে ভিন্ন মত হইতে পারে। কাশ্মীরের অধিপতিরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আপনাদের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন; আবার মগধাদি দেশের রাজন্যবর্গও অনেক সময় কাশ্মীর করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎসূত্রে এক দেশের ব্রাহ্মণের অন্য দেশে গতিবিধি ও বসবাস হইয়াছিল বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে যে কাশ্মীরের অধিবাসিগণ প্রায়ই সুন্দর ও সুষ্ঠু, আবহাওয়ার প্রভাব ভিন্ন তাহার কারণ অন্য আর কি হইতে পারে? কোনও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ যদি কয়েক পুরুষ দাক্ষিণাত্যের বিষুবনিকটস্থিত প্রদেশে গিয়া বসবাস করেন, পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের আকৃতি ও বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুই শত যোলটী বংশের পরিচয় উইল্‌সনের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল ব্রাহ্মণ-বংশের উপাধি প্রভৃতির সহিত মহারাষ্ট্র-দেশের ও দক্ষিণ-ভারতের ব্রাহ্মণগণের উপাধি প্রভৃতির অনেক ঐক্য আছে। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণ চতুর্ব্বেদের অধিকারী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। কাশ্মীর-প্রদেশে ডোগ্‌রা নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। সেই সকল ব্রাহ্মণ পাহাড়ে ও উপত্যকায় বাস করেন বলিয়া ঐরূপ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন।

কনোজীয় ব্রাহ্মণ।

কান্যকুব্জ বা কনোজ-রাজ্যে যে সকল ব্রাহ্মণের বসতি ছিল, তাঁহারাই প্রধানতঃ কনোজীয় বা কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণগণের বংশ কালক্রমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও অযোধ্যার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অধুনা হামিরপুর, বান্দা, ফতেপুর, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থান, কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণগণের বাসভূমি-মধ্যে পরিগণিত। ঐ সকল স্থানের ব্রাহ্মণগণ, আদম-সুমারীর গণনাক্রমে, প্রধানতঃ তিনটী বিভাগে বিভক্ত। সেই তিনটী বিভাগকে কেহ বা অভিন্ন বলিয়া মনে করেন; কেহ বা সেই তিন বিভাগকে তিনটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। সেই তিন বিভাগের নাম—(১) কাণাকুব্জ, (২) সরযুপুরী, (৩) সনাঢ্যায়। প্রাচীন কনোজের সন্নিহিত স্থান-সমূহের ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জ, সরযুনদীর তীরস্থিত প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ সরযুপুরী, এবং মথুরায়

* *Vide* Sir George Campbell, *Ethnology of India.*

দক্ষিণ-পশ্চিমের ও কনোজের উত্তর-পূর্ব্বের ব্রাহ্মণগণ সনাধ্যায় নামে অভিহিত। কান্তকুব্জ বা কনোজীয় ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ দশটী উপাধিযুক্ত,—(১) মিশ্র, (২) সুকুল, (৩) দোবে বা [illegible] [illegible]বেদী, (৬) পাঠক, (৭) দীক্ষিত, (৮) আওস্তী,* [illegible] (১০) বাজপেয়ী। এই দশ উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের [illegible] বিভিন্ন বংশ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। [illegible] মিশ্র-উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সিরাজপুরী, মধুবাণী, তেওস্ত, বৈশী, গ্রামবাসী [illegible]; সুকুল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তিপতি, গোতমী, বারিকপুরী প্রভৃতি; দোবে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কাঞ্চনী, বারহানপুরিয়, সিনামী প্রভৃতি; পাঁড়ে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ত্রিকূল, জোড়াভার, নাটচাউর প্রভৃতি; চৌবে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নয়াপুরা, রামপুরা, গার্গোয় প্রভৃতি; পাঠক উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ভাদারি, পাঠভালীয়, সোনাউর প্রভৃতি; দীক্ষিতগণের মধ্যে দেবগাঁও, চৌধুরী, জজহোতির, কাকারী প্রভৃতি; উপাধ্যায়গণের মধ্যে হিরণ্য, দেবারৈণ্য, জৈথিয় ও গেরাট প্রভৃতি; ত্রিবেদী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সোনাধার, দীক্ষিত, গোবর্দ্ধন, সপে প্রভৃতি। বাজপেয়ীগণের মধ্যে উচ্চ ও নীচ দুইটী শ্রেণী বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত নিম্নশ্রেণীস্থ প্রায় বিংশতি পরিবারের কনোজীয় ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়। সরযূপুরী ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও নানা উপাধি ও নানা শ্রেণী আছে। সনাধ্যায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ছাব্বিশটী উপাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই উপাধি-সমূহের মধ্যে কনোজীয় ব্রাহ্মণগণের দশটী উপাধি সনাধ্যায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা,—পরাশর, গোস্বামী, ত্রিপতি, চতুর্ধুরী বা চৌধুরী, চৈনপুরীয়, বৈদ্য, ভোটীয়, উদেনীয় প্রভৃতি। কান্তকুব্জ মিশ্রগণের মধ্যে অধিকাংশই শুক্লযজুর্ব্বেদের কাণ্বায়ণ শাখার অন্তর্ভুক্ত। কেবল মধুবাণী, চম্পারণ, পাংনাল, মাতোল এবং ভাবজীয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সামবেদী। কনোজীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ঋগ্বেদীয় সংখ্যা অনেক অল্প। সুকুল, তেওয়ারী, দোবে, পাঁড়ে এবং মিশ্র ব্রাহ্মণগণ পরস্পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন। পাঠক, উপাধ্যায় ও চৌবে ব্রাহ্মণগণকে মিশ্রগণ কন্যাদান করেন; কিন্তু তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন না। সুকুলগণ শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্গত; তেওয়ারিগণ সামবেদের কৌথুমী শাখার অন্তর্ভুক্ত; দোবেগণের কতক সামবেদী ও কতক শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যায়ন শাখাভুক্ত। পাঁড়েদিগের মধ্যে সামবেদী ও ঋগ্বেদী উভয় ব্রাহ্মণই বিদ্যমান। উপাধ্যায়গণ প্রধানতঃ যজুর্ব্বেদী। চৌবে বা চতুর্ব্বেদীগণ চারিবেদের অধিকারী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সামবেদী ও যজুর্ব্বেদীই প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। দীক্ষিতগণ যজুর্ব্বেদী এবং বাজপেয়ীগণ শুক্লযজুর্ব্বেদী। রাজপুতদিগের ন্যায় কনোজীয় ব্রাহ্মণগণের কন্যা-বিবাহে ব্যয়-বাহুল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গেশ্বর আদিশূরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে কনোজীয় ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।†

---

* কনোজীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 'আওস্তি' নামক এক উপাধি দৃষ্ট হয়। অগস্ত্য ঋষির নামানুসারে ঐ উপাধির প্রবর্ত্তনা সম্ভবপর। বঙ্গদেশের 'অগস্তি' এবং উত্তর-পশ্চিমের 'আওস্তি' শব্দের অভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়।

† এই গ্রন্থের, ১৫শ পরিচ্ছেদে, ২৪৪ম ও ২৪৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মিথিলা প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ মৈথিল ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। মৈথিল ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত,—(১) শ্রোত্রিয়; অর্থাৎ শ্রুতি বা বেদ-পাঠক; (২) যোগ; শ্রোত্রিয়গণ অপেক্ষা ইহাঁরা সমাজে কিছু অল্প সম্মান প্রাপ্ত হইলেও শ্রোত্রিয়গণের সহিত বিবাহ-বন্ধন-হেতু ইহাঁরা উচ্চ-শ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত; (৩) পাঞ্জী বাধ; ইহাঁরা পণ্ডিতগণ বর্ত্তৃক সমাদৃত; (৪) নাগর; (৫) জৈবর।

মৈথিল ব্রাহ্মণ।

মৈথিল ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ আট্‌টী উপাধিতে পরিচিত আছেন;—(১) মিশ্র (২) ওঝা বা ঝা, (৩) ঠাকুর, (৪) পাঠক, (৫) পুর, (৬) পাদরি, (৭) চৌধুরী, (৮) রায়। মিশ্রগণ মীমাংসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া, ওঝা বা উপাধ্যায়গণ শাস্ত্র-শিক্ষাদান জন্য, পাঠকগণ মহাভারত ও পুরাণ পাঠ জন্য, এবং ঠাকুরগণ দেবপ্রতিম বলিয়া প্রসিদ্ধ। উল্লিখিত উপাধিসমূহ ভিন্ন মৈথিল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে খাঁ, পরিহস্ত এবং কুমার উপাধিও দেখিতে পাওয়া যায়। মিশ্র-উপাধি-যুক্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় সম্প্রদায়ই বিদ্যমান। চৌধুরী, রায়, পরিহস্ত, পুর, খাঁ এবং কুমারগণ মিশ্রগণের অন্তর্ভুক্ত। চৌধুরীগণ চারি বেদের অধিকারী বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহাদের মধ্যে সামবেদী এবং শুক্ল-যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণই দৃষ্ট হয়। রায়, পরিহস্ত এবং কুমারগণের কেহ সামবেদী, কেহ বা শুক্ল-যজুর্ব্বেদী। খাঁ-গণ শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্ভুক্ত। ওঝা বা উপাধ্যায়গণ শুক্ল-যজুর্ব্বেদী এবং শাক্ত; পুর-গণ ঋগ্বেদী; শ্রোত্রিয়গণের কতকাংশ সামবেদের কৌথুমী শাখার এবং কতকাংশ শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্ভুক্ত। ভূমিহার ব্রাহ্মণগণ মৈথিল ব্রাহ্মণেরই একটী শাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই,—পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে যে সকল ব্রাহ্মণ সেই ক্ষত্রিয়গণের ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ করেন, ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য-শাসনাদি কার্য্যে ব্রতী হন, তাঁহারাই 'ভূমিহার' ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা আদমসুমারীর তালিকায় 'বাভন' সংজ্ঞায় অভিহিত। মৈথিল ব্রাহ্মণগণ বহুদিন হইতে শাস্ত্র-চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। জনকাদি রাজর্ষিগণ মিথিলায় জ্ঞানানুশীলনের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা চির-দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মৈথিল ব্রাহ্মণগণের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন জন্য দেশ বিদেশ হইতে ছাত্রগণ আজিও মিথিলায় গমন করেন। মৈথিল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শাক্ত, বৈদিক ও স্মার্ত্তাবৎ—তিনটী সম্প্রদায় আছে। ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনার জন্য মৈথিল ব্রাহ্মণগণ এককালে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মণ্ডন মিশ্র, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

উৎকলীয় বা উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত;—(ক) দাক্ষিণাত্য; (খ) জাজপুরী। কটক, পুরী এবং তৎসন্নিকটস্থিত স্থানের ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্য উৎকলীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। জাজপুর অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ জাজপুরী সংজ্ঞায় অভিহিত। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) বৈদিক, অর্থাৎ যাঁহারা পৌরহিত্যাদি কার্য্যে ব্রতী আছেন এবং শাস্ত্রানুসারে বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর বৈদিক

উৎকলীয় ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণগণ কুলীন এবং শ্রোত্রিয় দুই ভাগে বিভক্ত। সামন্ত, মিশ্র, নন্দ, পতি, কর, আচার্য্য, সৎপথি, দেবী, সেনাপতি, পর্ণগ্রাহী, নিঃশঙ্ক, বৈণীপেতি প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ কুলীন বলিয়া পরিচিত। ভট্ট, মিশ্র, উপাধ্যায়, রাউথ, ওঁতা, তেওয়ারী, দাস, পতি, সৎপথি, প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ শ্রোত্রিয়-পদবাচ্য। কুলীনের ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কয়েকটী উপাধির মিল আছে। কুলীনগণ কর্ম্মবশে শ্রোত্রিয় হইয়াও ঐরূপ উপাধি গ্রহণ করিয়া আছেন, এতদ্দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। (২) পূজারি, অধিকারী বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ। ইহাঁদের উপাধি বৈদিক ব্রাহ্মণের ন্যায়। উড়িষ্যার প্রায় সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা শ্রীচৈতন্যের শিষ্যানুশিষ্য বলিয়া পরিচিত। বঙ্গদেশের গোস্বামী সম্প্রদায়ের সহিত ইহাঁদের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। (৩) বিষয়ী ব্রাহ্মণ। ইহাঁদের মধ্যে দুইটী থাক আছে; মহাজন-পন্থী বা পাণিগ্রাহী এবং মহাস্থানী বা মস্থানী। ইহাঁদের মধ্যে মহাপাত্রি, পাণ্ডা, সেনাপতি, পতি, পণি, পশুপালক প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। মহাস্থানী ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। পাণ্ডাগণ পুরীর মন্দিরে যাত্রিগণের পূজা প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী থাকেন। কুলীন এবং শ্রোত্রিয়গণই উড়িষ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-বংশ বলিয়া কথিত হন। কতকগুলি কুলীন ও শ্রোত্রিয় রাজদত্ত "শাসন" বা ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সমাজে বিশেষ সম্মানিত। কুলীনের সংখ্যা অল্প। তাঁহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলে শ্রোত্রিয়গণ বিশেষ গৌরব বোধ করেন। কুলীনগণের মধ্যে কেহ বা শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার, কেহ বা কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত। উড়িষ্যার জাজপুরী ব্রাহ্মণগণ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ হইতে স্ব প্রভাবাপন্ন। পূর্ব্বে যে 'শাসন' বা রাজদত্ত ভূমির বিষয় উক্ত হইয়াছে, জাজপুর সেইরূপ একখানি 'শাসন-বিশেষ'। এখানকার ব্রাহ্মণগণ তেরটী বংশে এবং ছয়টী গোত্রে বিভক্ত। তাঁহাদের ছয়টী গোত্রের নাম,—(১) কপিল, (২) কুনার, (৩) কৌশিক, (৪) কৃষ্ণাত্রেয়, (৫) কামকর্দ্দিন, (৬) কাত্যায়ন। ইহাঁদের মধ্যেও পতি, পাণ্ডা, দাস, মিশ্র, সৎপথি প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্য এবং জাজপুরী ব্রাহ্মণগণ যদিও মূলে এক-বংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ প্রচলিত নাই। ঐ দুই ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় যেন স্বতন্ত্র জাতি-রূপে বিদ্যমান।

গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিতে অধুনা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণকেই বুঝাইয়া থাকে। পুরাকালে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ শব্দে আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়কেই বুঝাইত। এক সময়ে ভারতবর্ষে গৌড় নামে পাঁচটী জনপদ ছিল। সেই পাঁচটী জনপদের নামানুসারেই পঞ্চগৌড় নাম হইয়া থাকিবে। পঞ্চগৌড় এক-সময়ে এক-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ব্রাহ্মণগণের বসতিস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। পঞ্চনদ প্রদেশস্থিত গৌড়ের ব্রাহ্মণগণ তাৎকালিক রাজন্যবর্গের (প্রধানতঃ কুরুক্ষেত্রের রাজন্যবর্গের) পৌরোহিত্য করিতেন বলিয়া প্রকাশ। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ শাখা-প্রশাখা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ায়, এবং বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যুদয়ে ভিন্ন ভিন্ন নূতন জনপদের প্রসিদ্ধি হেতু ব্রাহ্মণগণও কালক্রমে বিভিন্ন [illegible]

গৌড়ীয় বা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ।

পড়িয়াছিলেন। তখন দেশের ও বসতি-স্থানের নামানুসারে তাঁহাদের পঞ্চগৌড়াদি সংজ্ঞা হইয়াছিল। যখন পঞ্চগৌড় নামে ভিন্ন ভিন্ন জনপদ পরিচিত হয়, সেই সময়ে গৌড়দেশ বলিতে বঙ্গদেশকেই বুঝাইত;—গৌড়েশ্বর নামে বঙ্গের নৃপতিই পরিচিত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় বা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম—কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়—সপ্তশতী বা সাতশতী ব্রাহ্মণ, তৃতীয়—বৈদিক ব্রাহ্মণ। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ বঙ্গেশ্বর আদিশূর কর্তৃক বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বরেন্দ্র ও রাঢ়ী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আদিশূর যখন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করেন, সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ তখন বঙ্গদেশে বাস করিতেন। তখন তাঁহাদের সংখ্যা সাড়ে সাত শত ঘর ছিল। তাহা হইতেই তাঁহারা সপ্তশতী সংজ্ঞা লাভ করেন। এখন সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া সুকঠিন। সম্ভবতঃ তাঁহারা এখন এ দেশের ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন; অথবা নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য দুই ভাগে বিভক্ত। দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে—কুলীন, বংশজ ও মৌলিক তিনটি থাক দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের অধিকাংশই যজুর্ব্বেদী; সামবেদ, ঋগ্বেদী ও অথর্ব্ববেদীর সংখ্যা অতি অল্প। পাশ্চাত্য বৈদিকগণ অধুনা বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন। নীচকুলে কন্যাদান বা নীচকুল হইতে কন্যাগ্রহণ ইঁহাদের পক্ষে বিশেষ নিন্দনীয়। নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের বৈদিকগণ—পাশ্চাত্য বৈদিক। দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ—দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া এদেশে প্রথমে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। পাশ্চাত্য বৈদিকগণ—কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণের আগমনের পর এদেশে আসিয়া বাস করিতেছিলেন বলিয়া প্রকাশ। রাঢ়ীয় সমাজে কুলীন, শ্রোত্রীয়, গৌণ কুলীন এবং বংশজ-গণের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। কৌলীন্য মর্য্যাদা-স্থাপনের দিন যে সকল ব্রাহ্মণ বেলা আড়াই প্রহরের পর বল্লালসেনের রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন; যাঁহারা এক প্রহরের মধ্যে আসেন, তাঁহারা গৌণ কুলীন এবং যাঁহারা দেড় প্রহরের মধ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। অপরাহ্নে যাঁহারা আসেন, নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা-উপাসনাদি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আসিতে বিলম্ব ঘটিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা অধিকতর সদাচার-পরায়ণ,—এই বুঝিয়া, বল্লালসেন তাঁহাদিগকে উচ্চ কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন। ব্রাহ্মণকে শ্রেণী-বদ্ধ করিবার সময় বল্লালসেনের মুখে 'বংশজ' শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল। তাহা হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ 'বংশজ' আখ্যা প্রাপ্ত হন। যে কারণেই হউক, রাঢ়ীয় সমাজের ঐ কয় থাকের মধ্যে কালে নানারূপ পার্থক্য ঘটিয়া গিয়াছে। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয় এই তিন বিভাগ আছে। সেই সকল বিভাগের মধ্যে আবার নানা উপবিভাগ দৃষ্ট হয়। উত্তর-দেশে উত্তর-বরেন্দ্র নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বসতি করেন। বরেন্দ্রগণের সহিত তাঁহাদের আদান-প্রদান প্রচলিত নাই। তাঁহারা যেন অধুনা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় মধ্যে পরিগণিত। মেদিনীপুর জেলায়, বঙ্গদেশে ও

উড়িষ্যার মধ্যভাগে, মধ্যশ্রেণী নামে এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারাও একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত। এ সকল ভিন্ন, শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণ, আসামী ব্রাহ্মণ এবং অগ্রদানী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়। তাঁহারাও এক একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় মধ্যে পরিগণিত। শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ বিহারের দাক্ষিণাংশে বসতি করেন। পঞ্জাবস্থ সারস্বত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত। আসামী ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই আপনাদিগকে 'বৈদিক' বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে তান্ত্রিকের ও বৈষ্ণবের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের আসামীয় ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে কনোজীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কথিত হয়, আহম্-বংশীয় রাজা জয়ধ্বজ যখন ঐ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে তিনি ঐ সকল কনোজীয় ব্রাহ্মণের আদিপুরুষকে আসামে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, রাজা জয়ধ্বজের আদেশে কতকগুলি শূদ্রকও সেই সময় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহার ফল আজিও আসামে প্রত্যক্ষীভূত হয়। উত্তর আসামের যে সকল ব্রাহ্মণ কনোজীয় ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা অন্য ব্রাহ্মণের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করেন না; এমন কি, সেই সকল ব্রাহ্মণ—সম্পর্কে শ্বশুর বা মাতুল হইলেও, তাঁহাদের গৃহে অন্ন-গ্রহণে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হন। নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণের কন্যার উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইলে, পিতৃগৃহে অন্নগ্রহণ সেই কন্যার পক্ষে নিষিদ্ধ হয়। তাঁহার সন্তানগণও উপনয়নের পর মাতুল-গৃহে অন্নগ্রহণ করেন না। আজিকালি এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিতেছে বটে; কিন্তু এক সময়ে আসামে এ নিয়ম বিশেষ বলবৎ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। কতকগুলি পশ্চিমা ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বসবাস করিয়া অধুনা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। পাঁড়ে, দোবে, মিছির, তেওয়ারী, চোবে, সুকুল প্রভৃতি উপাধিতে তাঁহারা সাধারণতঃ পরিচিত। সেই সকল ব্রাহ্মণের সহিত রাঢ়ী, বরেন্দ্র, বৈদিক বা অপর কোনও ব্রাহ্মণের আদান-প্রদান প্রচলিত নাই।

পঞ্চ-দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের পাঁচটি প্রধান বিভাগ আছে। তদ্ভিন্ন, অপ্রধান বিভাগের সংখ্যাও অন্যূন পঞ্চবিংশতি। পাঁচটী প্রধান বিভাগের নাম,—(১) দেশস্থ, (২) কোঙ্কণস্থ, (৩) কার্হাডক বা কার্হাড়, (৪) কাণ্ব, (৫) মাধ্যন্দিন। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ খাস মহারাষ্ট্র দেশে (অর্থাৎ যে দেশে অমিশ্র মহারাষ্ট্র ভাষা প্রচলিত, সেই দেশে) বসতি করেন। যে সকল দেশে মহারাষ্ট্র-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, ক্রমশঃ সেই সকল দেশেও ইঁহারা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশের অধিকাংশ প্রাচীন কবি দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের অন্তর্নিবিষ্ট। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের অনেকেই বিষয়কর্ম্মানুরক্ত। ইঁহাদের উপাধি,—পন্থ, রাও, দেশাই, দেশপাণ্ডে, দেশমুখ, কুলকর্ণী, পতি প্রভৃতি। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা কোনরূপ দান-গ্রহণ করেন না তাঁহারা গৃহস্থ, এবং যাঁহারা দান গ্রহণ করেন, তাঁহারা ভিক্ষুক আখ্যা প্রাপ্ত।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের মধ্যে—বৈদিক (বেদমন্ত্র-গায়ক), শাস্ত্রী (ব্যবহার-শাস্ত্রবিৎ), যোশী (জ্যোতির্ব্বিদ), বৈদ্য (চিকিৎসক), পৌরাণিক (পুরাণ-পাঠক), হরিদাস (গায়ক ও গল্পবিৎ) এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ ঋগ্বেদী। তাঁহারা স্মার্ত্ত, ভাগবত ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সামবেদীয় ও অথর্ব্ববেদীয় সংখ্যা অতি অল্প। কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণ—প্রধানতঃ [illegible] কোঙ্কণে বসতি করেন। ইঁহারা 'চিত্তপাবন' বলিয়াও পরিচিত। ইঁহাদের [illegible] যোশী, পরাঞ্জপে, রাণাডে, আপ্তে, আথাভেল, চিতেল, আচাভেল, বাপটে, [illegible], [illegible], গাদ্রে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ স্মার্ত্ত। এই ব্রাহ্মণ [illegible] পেশোয়াগণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। পেশোয়াগণ এবং তাঁহাদের [illegible] প্রধান সর্দারগণ (পাটবর্দ্ধন, গোখেল, রাস্ত্রে প্রভৃতি উপাধিধারী) এই ব্রাহ্মণ-বংশেরই অন্তর্ভুক্ত। কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণ ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখার এবং যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অধিকারী বলিয়া অভিহিত হন। কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণের উপাধি-সংখ্যা অধুনা প্রায় তিনশতাধিক। সেতারার প্রায় পনের মাইল দক্ষিণে, কৃষ্ণা ও কোয়ন নদীর সঙ্গমস্থলে, কারার নামক যে নগর দৃষ্ট হয়, সেই নগরের নাম হইতেই কার্হাদ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কাণ্ব ব্রাহ্মণগণ শুক্ল-যজুর্ব্বেদের চরণব্যূহ শাখাভুক্ত। পুণাতে ইঁহাদের কয়েক ঘরের বসতি আছে। কোলাপুর রাজ্যে এবং মহারাষ্ট্র-দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কাণ্ব ব্রাহ্মণগণ 'প্রথম শাখী' বলিয়া পরিচিত। মাধ্যন্দিন ব্রাহ্মণগণ শুক্ল-যজুর্ব্বেদের চরণব্যূহ শাখার অন্তর্ভুক্ত। নাসিক এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়। কোলাপুরের মহারাজ এবং সেতারার প্রতিনিধি—কাণ্ব-বংশীয় ব্রাহ্মণগণের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। স্কন্দপুরাণান্তর্গত সহ্যাদ্রিখণ্ডে এই সকল মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের আদি-বাসস্থানের পরিচয় দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত পাঁচ শ্রেণীর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এক পংক্তিতে আহারাদি করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বিবাহাদির প্রচলন নাই। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে আরও কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়;—পাঢ্য, দেবারুক, পলাশ, কির্ব্বন্ত, ত্রিগুল, যাবল, আভীর, সাভস, কান্ত, কুণ্ডগোলক, রাণ্ডগোলক, ব্রাহ্মণজনী, সোপার, খিস্তী, হুশেনী, কালঙ্কী, সেনাবি বা সারস্বত, নার্ভঙ্কর, কেলস্কর, বরদেশকর, কুদালদেশকর, পেদনেকর, ভালবলকর, কুশস্থলী, খারেপু, খাজুর। ইঁহাদের মধ্যে আবার যে নানা উপবিভাগ আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। মৈত্রেয়ণীয় নামে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নাসিক প্রদেশে বাস করেন। যদিও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের আদান-প্রদান প্রচলিত নাই, তথাপি মহারাষ্ট্র-দেশে বাস-হেতু তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। বরারী বা বেরারী ব্রাহ্মণ এবং ঝারী বা নাগপুরী ব্রাহ্মণ—অনেকেই মহারাষ্ট্র-ভাষাভাষী এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয়-প্রদান-প্রয়াসী। কিন্তু তাঁহাদের সহিত মহারাষ্ট্রীয় দেশস্থ বা কোঙ্কণস্থ কোনও ব্রাহ্মণের আদান-প্রদান সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই। দেশ-শাসন-কার্য্যে তীক্ষবুদ্ধির জন্য মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্র-প্রভাব যখন দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছিল, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ তখন মহারাষ্ট্র-

...ভারত-তরণীর কর্ণধার ছিলেন। পরিশেষে, তাঁহারাই ... পরিচালনে অগ্রসর হন। পেশোয়া এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের রাজ্য... ছিলে; ব্রাহ্মণগণকেই মহারাষ্ট্র-দেশের মস্তকস্থানীয় বলিয়া প্রতীত হয়। ... রাজারা তাঁহাদেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপ পরিচালিত হইতেন মাত্র।—

আন্ধ্র-ব্রাহ্মণগণ—অন্ধ্র-দেশে বাস-হেতু ঐরূপ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। তেলেগু ... তেলিঙ্গ ভাষাভাষী দেশ—ত্রিলিঙ্গ, তৈলঙ্গ বা অন্ধ্রদেশ নামে পরিচিত। আন্ধ্র-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রধানতঃ ষোলটী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম,—বর্ণশালু; ইঁহারা ঋগ্বেদী ও স্মার্ত্ত বলিয়া পরিচিত। দ্বিতীয়,—কমরকুলু; ইঁহারা বর্ণশালুগণের ন্যায় ঋগ্বেদী; কিন্তু ইঁহাদের সহিত বর্ণশালুগণের আদান প্রদান ও পংক্তিভোজন প্রচলিত নাই। তৃতীয়,—কর্ণকম্মালু; ইঁহারাও ঋগ্বেদী ও স্মার্ত্ত। পূর্ব্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের পংক্তি-ভোজন প্রচলিত আছে বটে; কিন্তু বিবাহাদি আদান-প্রদান একেবারে নিষিদ্ধ। কথিত হয়, ইঁহারা কর্ণাট হইতে আগমন করিয়া অন্ধ্রদেশে বাস করিতে আরম্ভ করেন, এবং তদবধি আন্ধ্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। চতুর্থ,—মাধ্যন্দিন; ইঁহারা শুক্ল-যজুর্ব্বেদী। মাধ্যন্দিন শ্রেণীর মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত ইঁহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পঞ্চম,—তৈলঙ্গ বা তৈলিঙ্গিনী; ইঁহারা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানতঃ গান্টুর প্রদেশে ইঁহাদের বসবাস। ষষ্ঠ,—মুরাকানাড়ু; মুরাকা জেলায় বাস-হেতু ইঁহারা ঐ নামে পরিচিত। কৃষ্ণা-নদীর দক্ষিণ প্রদেশে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। ইঁহারা শুক্ল-যজুর্ব্বেদী। সপ্তম,—অরাধ্য; ইঁহারা যদিও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী; কিন্তু লিঙ্গায়ৎ-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া প্রধানতঃ পরিচিত। অন্য কোনও ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহাদের আদান-প্রদান নাই। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ গুরুগিরি করিয়া থাকেন। অনেক উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ইঁহাদের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত। অষ্টম,—যাজ্ঞবল্ক্য; ইঁহারা শুক্ল-যজুর্ব্বেদী। মহারাষ্ট্রদেশীয় কাণ্ব-ব্রাহ্মণগণের সহিত ইঁহাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মসলিপত্তন এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে ইঁহারা বসবাস করিয়া থাকেন। নবম,—কাষারাণকু; ইঁহারাও শুক্ল-যজুর্ব্বেদী। দশম,—ভেলানাড়ু। ইঁহারা শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদী। প্রধানতঃ নিজামাধিকৃত অন্ধ্রদেশেই ইঁহাদের বসতি। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বল্লভাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। একাদশ,—ভেঙ্গিনাড়ু; ভেঙ্গিপুর জেলার নামানুসারে ইঁহাদের নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়। ইঁহাদের অধিকাংশই যজুর্ব্বেদী। দ্বাদশ,—ভেদিনাড়ু;—ইঁহারা ঋগ্বেদী। গান্টুর ও মসলিপত্তনের সন্নিকটে ইঁহারা প্রধানতঃ বসবাস করেন। ত্রয়োদশ,—তৈলঙ্গ সামবেদী। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা অত্যল্প। ইঁহারা দ্রাহ্যায়নী শাখার অন্তর্ভুক্ত। চতুর্দ্দশ—রামানুজী। ইঁহাদের মধ্যে ভারাগাড়ালু ও তৈঙ্গাড়ালু নামক শ্রেণী আছে। সেই দুই শ্রেণীতে পংক্তিভোজন প্রচলিত, কিন্তু বিবাহাদি নিষিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী উভয়ই দৃষ্ট হয়। পঞ্চদশ,—মাধবাচার্য্য সম্প্রদায়...

বিদ্যমান। * ষোড়শ—নিয়োগী ব্রাহ্মণ ; ইহাঁরা প্রধানতঃ লেখা-কার্য্যে ব্রতী। ইহাঁদের অধিকাংশই কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদী।

তামিল-ভাষাভাষী দেশের ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। তেলিঙ্গন ও মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণে এবং কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের পূর্ব্বে যে জনপদ অবস্থিত, তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণগণই প্রধানতঃ দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন। দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে—ঋগ্বেদী, কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদী, শুক্ল-যজুর্ব্বেদী, সামবেদী, দ্রাবিড়ী-অথর্ব্ববেদী এবং মুম্বী—এই সাত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণগণ শাকল শাখার অন্তর্ভুক্ত ; তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণের আদান-প্রদান প্রচলিত। শুক্ল-যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ—মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব শাখায় বিভক্ত। এই দুই শাখার ব্রাহ্মণগণ এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করেন বটে ; কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত নাই। দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সামবেদীর সংখ্যা অতি অল্প। যাঁহারা সামবেদী, তাঁহারা অপর কোনও বেদী ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রস্তুত নহেন। মুম্বী ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা প্রধানতঃ দেবমন্দিরাদিতে পুরোহিতের কার্য্যে ব্রতী আছেন। অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই। দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্মার্ত্ত, শাক্ত ও বৈষ্ণব তিনটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। স্মার্ত্তগণ শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী। তাঁহারা স্মৃতির মতেই ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম,—বৈষ্ণব বা বীর বৈষ্ণব ; ইহাঁরা মধ্যাচার্য্যের মতাবলম্বী। ইহাঁরা স্মার্ত্তের কন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন বটে ; কিন্তু স্মার্ত্তের সহিত কন্যা বিবাহ দেন না। দ্বিতীয়,—শ্রীবৈষ্ণব ; ইহাঁরা রামানুজের মতাবলম্বী। ইহাঁরা অন্যান্য শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত পংক্তিভোজনেও পরাঙ্মুখ। তৃতীয়,—ভাগবত ; ইহাঁরা স্মার্ত্ত-বৈষ্ণব। প্রধানতঃ বিষ্ণু-মন্ত্রের উপাসক হইলেও ইহাঁরা স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তী। দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণের দ্রাবিড়-দেশে বাস-সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত হয়, তৎপ্রদেশের তাৎকালিক নৃপতি তাঁহাদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক ব্রহ্মোত্তর দানে বসবাস করাইয়াছিলেন। কেহ বলেন—তাঁহারা তৃণবল্লী (আধুনিক তিনেভেলি) হইতে, কেহ বলেন—তাঁহারা কাঞ্চী হইতে, দ্রাবিড়ে আসিয়া বাস করেন। কার্ণাট দেশের ব্রাহ্মণগণ—কর্ণাটিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণের সহিত বেদ ও শাখা সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, উভয় দেশের ঋগ্বেদী, যজুর্ব্বেদী ও সামবেদী ব্রাহ্মণগণ একরূপ আচার-ব্যবহার-সম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়। অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুণী ও নাগর ব্রাহ্মণগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুণী ব্রাহ্মণগণ কানদ, অবরতোকল, উরীচি এবং কেবোরাকুনি এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমোক্ত তিন শ্রেণী কর্ণাটদেশজ ; শেষোক্ত

দ্রাবিড়ী ও কর্ণাটিক ব্রাহ্মণ।

---

* মাধবাচার্য্য বৈদিক-ধর্ম্মের এবং রামানুজ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। মাধবাচার্য্য খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগরে এবং রামানুজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে চোল-রাজ্যের প্রাদুর্ভূত হন।

শ্রেণী কলিঙ্গদেশোৎপন্ন। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ প্রচলিত নাই; নাগর ব্রাহ্মণ-বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভট্ট, আচার্য্য, ঠাকুর, ব্যাস প্রভৃতি ইহাঁদের উপাধি। গুজরাটের 'নাগর' ব্রাহ্মণগণের সহিত ইহাঁদের সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। নাগর-ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই শৈব। ইহাদের অধিকাংশই নিরামিষাশী। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অনেক অধিক।

গুর্জ্জর বা গুর্জ্জরাষ্ট্র দেশের ব্রাহ্মণগণ—গুর্জ্জর বা গুজরাটী-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। ইহাঁদের মধ্যে 'ঔদীচ্য-ব্রাহ্মণে'র সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঔদীচ্যগণের মধ্যে—(১) সিদ্ধপুরী ঔদীচ্য, (২) শিহর ঔদীচ্য, (৩) টোলকীয় ঔদীচ্য—এই তিনটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। শাখা তিনটীর মধ্যে পংক্তিভোজন প্রচলিত থাকিলেও বিবাহ-সম্বন্ধ প্রচলিত নাই। অপর কয়েকটী ঔদীচ্য শাখার নাম—(১) কুনবিগড়, (২) মুচীগড়, (৩) দর্জ্জিগড়, (৪) গ্রন্ধ্‌পগড় (৫) কোলিগড়। এই পঞ্চ শাখার ব্রাহ্মণগণ যথাক্রমে কৃষকের, মুচীর, দর্জ্জির ও কোলের গুরুগিরি করিয়া উক্তরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাসস্থান-ভেদেও মাড়োয়ারী-ঔদীচ্য, কচ্ছী-ঔদীচ্য এবং ওগারীয়-ঔদীচ্য নামেও ঔদীচ্য-ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ঔদীচ্যগণ প্রধানতঃ সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী। এই ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে নানারূপ বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত আছেন। ইহাঁদের মধ্যে শিবোপাসকের সংখ্যাই অধিক। আনহলবরাপত্তনের (গুজরাটের প্রাচীন রাজধানীর) অধিপতি মূলরাজ এই ব্রাহ্মণগণকে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন পবিত্র স্থান হইতে আনয়ন করাইয়া গুজরাটে বসবাস করাইয়াছিলেন। তিনি যে যে স্থান হইতে যে যে পরিমাণ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, গ্রন্থাদিতে তদ্বিবরণ লিখিত আছে। সে বিবরণ এই;—গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-স্থল (প্রয়াগ) হইতে ১০৫ জন, চ্যবনাশ্রম হইতে ১০০ জন (সামবেদী), কান্যকুব্জ হইতে ২০০ শত, কাশী হইতে ২০০ শত, কুরুক্ষেত্র হইতে ২৭২, গঙ্গাদ্বার হইতে ১০০, নৈমিষারণ্য এবং কুরুক্ষেত্র হইতে ১৩২—মোট ১২০৯ জন। ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া, তাঁহাদিগের বসবাসের জন্য মূলরাজ তাঁহাদিগকে বহু গ্রাম দান করেন। শিহোর ও তৎসংলগ্ন ১০০ খানি গ্রাম এবং সিদ্ধপুর ও তৎসংলগ্ন ১০০ খানি গ্রাম এই উপলক্ষে মূলরাজ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ দান-গ্রহণে অস্বীকার করেন। তাঁহারা টোল স্থাপন করিয়া 'টোলক ঔদীচ্য' আখ্যা প্রাপ্ত হন। খাম্বাৎ (কাম্বে) এবং তৎসন্নিহিত বারখানি গ্রাম তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সিদ্ধপুরী ও শ্রীহরী ব্রাহ্মণগণও আপনাপন অংশে পাঁচ শত গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-পুরাণের অন্তর্গত 'ঔদীচ্য-প্রকাশ' অংশে এতদ্বিবরণ লিখিত আছে। ঔদীচ্য ব্রাহ্মণগণকে অনেকে পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণের শাখা বলিয়া মনে করেন। ঔদীচ্য ব্রাহ্মণগণের পরেই গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণগণের নাম উল্লেখযোগ্য। নাগর ব্রাহ্মণগণের ছয়টী শাখা বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত। গুজরাটের উপদ্বীপাংশে নাগর ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। কয়েকটী প্রধান নগরের নামানুসারে ইহাদের নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। আনহলবরাপত্তনের পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থিত ভায়নগরের নামানুসারে ভার-নাগর ব্রাহ্মণ, ভায়-নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত বিশাল-নগরের নামানুসারে বিশাল-নাগর ব্রাহ্মণ, নর্ম্মদাতীরস্থিত

শাতোদ-নগরের নামানুসারে শাতোদ-নাগর ব্রাহ্মণ, চিত্রোর-নগরের নামানুসারে চিত্রোর-নাগর ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণপুরের নামানুসারে কৃষ্ণপুর নাগর ব্রাহ্মণ, এবং প্রশ্নোর-নগরের নামানুসারে প্রশ্নোর-নাগর ব্রাহ্মণ প্রভৃতির নামকরণ হইয়া থাকিবে। নাগর ব্রাহ্মণ ভিন্ন সাচোর, উদম্বর, মর্শিপুর, ভলাদ্র প্রভৃতি নামে গুজরাটে অন্যূন এক শত ষাট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। সারস্বত, উৎকলীয়, দ্রাবীড়ী, কার্ণাটিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গুজরাটে অনেক দিন হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। গুজরাটী-ব্রাহ্মণগণের বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকটী সঙ্ঘ দৃষ্ট হয়। বিশেষ বিশেষ কয়েকটী জেলা বা গ্রাম লইয়া সঙ্ঘ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত। এক এক সঙ্ঘের বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য, গুজরাটী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নানা বেদী ও নানা শাখী ব্রাহ্মণ আছেন।

অন্যান্য ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়।

পঞ্চ-গৌড়ীয় বা পঞ্চ-দ্রাবিড়ী—কোন্ ব্রাহ্মণের অন্তর্নিবিষ্ট, তাহা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই;—অথচ, এক এক দেশে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া আছেন; ভারতবর্ষে এরূপ অনেক ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়। নেপালে ন্যূনাধিক এক শত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক কনোজীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত; অবশিষ্ট কতকগুলির সে পরিচয় পাওয়া যায় না। মধ্য-ভারতে মালভী, নিমারী, রাঙ্গারী, বাগাদি নামক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠান্বিত। ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসবাস-হেতু তাঁহারা যে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রাজপুতনায় শ্রীমালী, সাচোর, পহলবী, নন্দবন, পুষ্কর, পোখার, পারিখ, লবণ, দাকোৎ, আচার্য্য, গরুড়ীয়, বুড়াব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। ভাট, চারণ, রাজগুরু, দীব, সনাভর, কাপারি প্রভৃতি রাজপুতনার ব্রাহ্মণগণও প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। দক্ষিণ-বিহারের 'শাকলদ্বীপী' ব্রাহ্মণগণের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সারস্বত ব্রাহ্মণ-গণের ন্যায় তাঁহাদের গোত্রাদি হইলেও, সারস্বত ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। দাক্ষিণাত্যে—কোঙ্কণী, হবু, গোকর্ণ, হৈগ, তুলভ, কাবেরী, নাম্বুরী প্রভৃতি বহু শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। নাম্বুরীগণ বহু শাখায় বিভক্ত। মলয়ালম্ ভাষাভাষী দেশই নাম্বুরী ব্রাহ্মণগণের আবাস-স্থল। তাঁহারা বলেন,—তাঁহাদের বসতিস্থান কেরল-দেশ পরশুরাম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আনয়ন করিয়া পরশুরাম ঐ দেশে তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্ব্বদেশ (আদিম আবাসস্থান) পরিত্যাগের জন্য তাঁহারা 'নাম্বুতারি' (অকৃতজ্ঞ) বা তাহার অপভ্রংশে 'নাম্বুরী' নামে পরিচিত হন। কেহ কেহ আবার বলেন,—'নাম্বু' অর্থ দাঁড়। নাম্বু ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতিকে পাপার্ণব হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন, এই জন্যই তাঁহাদের ঐরূপ নাম হইয়াছে।' নাম্বুরীগণ আপনাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে অনিচ্ছুক। স্থানীয় তীর্থাদি, তাঁহাদের মতে, সমধিক পবিত্র। নাম্বুরী ব্রাহ্মণ-বংশে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এই জন্য নাম্বুরী ব্রাহ্মণগণ বিশেষ গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এককালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, শূদ্রগণ নাম্বুরী ব্রাহ্মণগণকে স্পর্শ করিতেও পারিতেন না। শূদ্রের অধিকৃত স্থানে বসিয়া পূজাহ্নিকাদি সমাপন করাও নাম্বুরী ব্রাহ্মণগণ পাপজনক বলিয়া

মনে করিতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর শূদ্র জাতিকে আপন-আপন সামাজিক অবস্থা অনুসারে নাম্বুরী ব্রাহ্মণগণের দূরে দূরে অবস্থান করিতে হইত। পুলিয়ার-গণ যদি কোনও নাম্বুরী ব্রাহ্মণকে কখনও স্পর্শ করিত, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণকে স্নান করিতে এবং উপবীত ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইত; অপিচ, বেদোচ্চারণ ভিন্ন তিনি পবিত্রতা লাভ করিতে পারিতেন না। নাম্বুরী ভিন্ন পত্তি, মুত্তা, এলেত্ত্, রামনদ, উড়িল, পরাশদ, পাওর, অম্বলবসী প্রভৃতি আরও বহু ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যে বিদ্যমান আছে।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি।

ব্রাহ্মণগণ যেরূপ নানা বিভাগ-উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের মধ্যেও সেইরূপ বিভাগ ও উপবিভাগের অবধি নাই। ক্ষত্রিয় বলিয়া এখন অনেক জাতিই আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। রাজপুতনার রাজপুতগণ এবং পঞ্জাব, বাঙ্গালা, বিহার ও বোম্বাই প্রদেশের ক্ষত্রিয়গণ (ছত্রিগণ) ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত বলিয়া অভিহিত হন; কায়স্থগণ এবং করণগণ—ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। এই সকল ক্ষত্রিয়-বংশের শাখা-সমূহের সংখ্যা গণনা করিলে, সহস্রাধিক ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। রাজপুতনায় রাজপুত-জাতির মধ্যেই অন্যূন চারি শত সম্প্রদায় বিদ্যমান। সেই সকল সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত; কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক স্থলেই বিবাহাদি নিষিদ্ধ। রাজস্থানের ইতিহাসে 'ছত্রিশ রাজ-কুল' বা ছত্রিশটি রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই রাজকুল—চন্দ্রবংশ বা সূর্য্য-বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সেই সকল রাজকুলের মধ্যে 'গিহ্লোট' কুল সুপ্রসিদ্ধ। চিতোরের মহারাণা সূর্য্যবংশীয় 'গিহ্লোট'-কুলের বংশধর। 'গিহ্লোট'-কুলের চব্বিশটি শাখা। সেই শাখা-সমূহের মধ্যে মেওয়াড়ের 'শিশোদীয়' শাখা, মাড়োয়ারের 'পিপ্পারা' শাখা এবং দঙ্গুরপুরের 'আহিরীয়' শাখা প্রতিষ্ঠান্বিত। 'গিহ্লোট' কুলের পর—যদুকুল সুপ্রতিষ্ঠিত। যদুকুলেরও আট শাখা। কেরোলীর সর্দ্দার যদুকুলের যদু-শাখার, যশল্মীরের সর্দ্দার ভট্টী-শাখার এবং কচ্ছভোজ সর্দ্দার জাবেজা শাখার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়—তুয়ার কুল। যদিও যদুকুলের একটি শাখা মধ্যে পরিগণিত, তথাপি নানারূপে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত 'তুয়ার' একটি কুল বলিয়া পরিচিত। উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য এই তুয়ার কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, তুয়ার-কুলের অনঙ্গপাল ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী পুনর্নির্ম্মাণ করেন। চতুর্থ—রাঠোর কুল। এই কুল সূর্য্যবংশের ধুরন্ধর রাজচক্রবর্ত্তী শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচিত। এক সময়ে গাধিপুর বা কনোজ-রাজ্য রাঠোর-বংশের শাসনাধীন ছিল। রাঠোর-কুলের চব্বিশটি শাখা। পঞ্চম—কুশ্বাহ। ইহাঁরাও কুশের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত। এই বংশের রাজা নল, নিউরে যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া যান, তাঁহার বংশধর-গণ সে দিনও পর্য্যন্ত (মহারাষ্ট্রগণের অভ্যুদয়ের সমসময় পর্য্যন্ত) সেই দুর্গ আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছিলেন। ষষ্ঠ—অগ্নিকুল। অগ্নিকুলে প্রমার, পুরিহর, চৌহান, এবং চালুক বা শোলাঙ্কি নামক চারিটি বিভাগ আছে। প্রমার বিভাগে পঁয়ত্রিশটি শাখা, পুরিহর বিভাগে বারটি শাখা, চৌহান বিভাগে চব্বিশটি শাখা এবং শোলাঙ্কি বিভাগে

যোলটি শাখা। প্রমার-বংশের 'মোরি' শাখায় (মৌর্য্য) চন্দ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। চৌহান-বংশের শেষ রাজা পৃথ্বীরাজের জন্ত হইতেই ভারত-সাম্রাজ্য মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়। চালুক বা শোলাঙ্কি রাজগণ গুজরাটের আনহলবরাপত্তনে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। এই অগ্নিকুলের তক্ষক শাখায় শালিবাহন জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম—চৌড় কুল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির এক সময়ে এই বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। তক্ষশীলায় ইঁহাদের রাজধানী ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। এই কয়েকটী প্রধান প্রধান রাজকুল ভিন্ন 'জিৎ, হুণ, কত্তি, বল্ল, ঝলমাচ্ছন্ন, জৈত্যা, গোহিল প্রভৃতি নামে বিভিন্ন কুল বিদ্যমান। এই সকল কুল ভিন্ন জালিয়া, পেশানি প্রভৃতি কতকগুলি রাজপুত বংশ আছে। এক রাজস্থানের রাজপুত ক্ষত্রিয়গণই এত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষত্রিয়গণের নির্ঘণ্ট করিতে হইলে, তাহা হইতে কত অসংখ্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ বৈশ্যগণ নানা দেশে নানা নামে পরিচিত হইয়া আছেন। রাজপুতনার শতাধিক বণিক জাতি 'বৈশ্য' (বৈশ্য) বলিয়া অভিহিত হন। বঙ্গদেশে অনেক দিন হইতে অনেক জাতি শূদ্র বলিয়া পরিচিত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতির অস্তিত্ব অধুনা সপ্রমাণ হইতেছে। যাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও কি বিভাগ উপ-বিভাগের অন্ত আছে! ফলতঃ, হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে, ভারতবর্ষের জাতির সংখ্যা-নির্ণয় করা বড়ই কঠিন।

শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি-চতুষ্টয় এবং তাঁহাদের শাখা-প্রশাখা ভিন্ন আরও অন্য কত জাতি কতরূপে ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছেন! ব্রাহ্মণাদি জাতি-চতুষ্টয়ের সহিত তাঁহাদের বিশেষ কোনও সম্বন্ধের পরিচয় পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে ক্বচিৎ দেখিতে পাই। বোম্বাই প্রদেশের পার্শিগণ হিন্দু-জাতির অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহারা অধুনা একটি স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে পরিগণিত। ইতিহাসে প্রকাশ,—তাঁহারা পারস্য-দেশের আদিম অধিবাসী ছিলেন। পারস্য দেশ অধিকার করিয়া মুসলমানগণ যখন তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন, ধর্ম্মনাশ-ভয়ে পার্শিগণ ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষের অধিবাসী মধ্যে পরি-গণিত। আরবে ইসলাম-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সেই হইতে ভারতবর্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থিতি। এখন তাঁহারা ভারতবর্ষের একটি জাতি মধ্যে পরিগণিত। সেই জাতি আবার সিয়া, সুন্নি প্রভৃতি সম্প্রদায়ে এবং মোগল, পাঠান, সৈয়দ প্রভৃতি সংজ্ঞায় পরিচিত আছেন। ইউরোপীয়গণ—ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ, জর্ম্মণ,—অধুনা ভারতবর্ষের এক একটি জাতি মধ্যে পরিগণিত। ভারতবর্ষে নব নব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে বৌদ্ধ, জৈন, নানকপন্থী, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, তাঁহাদিগকেও এক একটি জাতি বলা যাইতে পারে। এ সকল ভিন্ন, নাগা, মিস্‌মি, গারো, খাসী, কুকী, লেপ্‌চা, গুর্খা, জুয়াং, খোন্দ, গোন্দ, সাঁওতাল, ওরাওন, কোল, ভীল, জোয়াং, কোটা, কোই প্রভৃতি অসংখ্য জাতি ভারতবর্ষে

অন্যান্য বিবিধ জাতির বিষয়।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিচরণ করিতেছে। নাগাগণ কাছাড়ের উত্তর-পূর্ব্বে, আসামের পার্ব্বত্য-প্রদেশে বসবাস করে। প্রধানতঃ বৃক্ষপত্র এবং পক্ষীর পালকে তাহাদের দেহ আবৃত থাকে। ইহাদের কেহ কেহ জানু পর্য্যন্ত নীলবর্ণের পায়জামা পরিধান করে। সেই পায়জামার স্থানে স্থানে কড়ি ঝুলাইয়া রাখে। মৃতের অন্ত্যেষ্টি-সম্বন্ধে নাগাগণের মধ্যে এক অভিনব প্রথা প্রচলিত। কেহ অধিক দিন ব্যায়রামে ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার জন্য অন্দরাভ্যন্তরে একটি মঞ্চ প্রস্তুত হয়। মৃত্যুর লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া সেই পীড়িত ব্যক্তিকে নাগাগণ মঞ্চের উপর শোয়াইয়া রাখে। অল্প দিনের পীড়ায় কাহারও মৃত্যু হইলে, সন্নিহিত জঙ্গলের মধ্যে একটি মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া, নাগাগণ তদুপরি সেই মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদনে রাখিয়া আসে। সেখান হইতে সেই দেহ ক্রমে ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর ছয় মাস পরে মৃতের সৎকারোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। নাগাগণ ভূত-প্রেতে বিশ্বাসবান; সুতরাং ভূত-প্রেতের তুষ্টির জন্য তাহারা নানারূপ উৎসবের অনুষ্ঠান এবং বলি প্রদান করিয়া থাকে। মিস্‌মি জাতি আসামের পূর্ব্ব-প্রান্তে পার্ব্বত্য-প্রদেশে বসবাস করে। পশ্চিম চীনের ইউনান প্রদেশের আদিম অধিবাসীর সহিত ইহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রায়ই ব্যবসায়ী। মিস্‌মিদিগের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত। কন্যা-বিক্রয় প্রথা ইহাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রবল। যাহার বহু কন্যা আছে, সেই ব্যক্তিই ধনবান বলিয়া কথিত হয়। মিস্‌মিদিগের কাহারও কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহারা উপদেবতার তুষ্টি-কামনায় মোরগ বা শূকর-ছানা বলিদান করে। মিস্‌মিদিগের গ্রামের সংখ্যা অত্যল্প। তাহারা এক এক পরিবারে বা এক এক বাড়ীতে শতাধিক ব্যক্তি একত্র বসবাস করিয়া থাকে। গারো জাতি—সুরমা উপত্যকার এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পারিপার্শ্বিক পর্ব্বত-সমূহে বসবাস করে। ইহাদের সংখ্যা দেড় লক্ষের কম নহে। গারোগণ সাহসী ও কর্ম্মক্ষম। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ কেহই মস্তক মুণ্ডন করে না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার পরিধান করিতে ভালবাসে। ইহারা প্রায়ই নেঙ্‌ট পরিয়া থাকে। কখনও কখনও ইহাদের গাত্রে কম্বল ঝুলান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। গারোগণ ব্যাঘ্র-মাংস, শূকর-মাংস, কুক্কুর-মাংস এবং সর্পের ও ভেকের মাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে। অন্ন তাহাদের প্রধান খাদ্য; তাহারা কখনও দুগ্ধ স্পর্শ করে না। গারো-স্ত্রীগণ সংসারের নেতৃস্থানীয়া; বিষয়-সম্পত্তি স্ত্রীলোকের অধিকৃত; কন্যাগণ প্রধানতঃ বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী। গারোদিগের মধ্যে দাহ-প্রথা প্রচলিত; তবে শবদাহের পর মৃতাবশেষ ভস্ম কুটির-দ্বারে প্রোথিত থাকে। প্রেতের তৃপ্তি-কামনায় গারোগণ সাধারণতঃ কুক্কুর বলি দিয়া থাকে। কোনও গারো-সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে, পূর্ব্বে ইহারা কুক্কুরের পরিবর্ত্তে নরবলি দিত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে, ইংরেজগণের আধিপত্যে, গারোদেশের সে বীভৎস প্রথা লোপ পাইয়াছে। গারোদেশের পূর্ব্বভাগে খাশী জাতির বসতি। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান জলপ্রপাত জন্য খাশী-জাতির বাসভূমি চেরাপুঞ্জি সুপ্রসিদ্ধ। খাশী পর্ব্বতে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট পাথুরিয়া চুণ পাওয়া যায়। খাশী-জাতির ভাষা এক-শব্দাংশাত্মক। লক্ষাধিক লোক সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। চারি খণ্ড প্রস্তরের

মধ্যে খাশী জাতি মৃতদেহ বা দেহাবশিষ্ট ভস্মরাশি রক্ষা করিয়া, তদুপরি অপর এক খণ্ড প্রস্তর চাপাইয়া রাখে। খাশী-দেশে অধুনা বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। কুকী বা লুশাই জাতি—চট্টগ্রামের পূর্ব্বে এবং কাছাড়ের দক্ষিণে পার্ব্বত্য-প্রদেশে বসবাস করে। ইহারা স্ত্রী-পুরুষে ধূমপান করিয়া থাকে। তামাক-ভিজান জল ইহাদের উপাদেয় পানীয়। অভ্যাগত-গণকে ইহারা সেই জল পান করিতে দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া থাকে। কুকী পুরুষগণ সাধারণতঃ বৃক্ষপত্রের মাল্য পরিধান করে। ব্যাঘ্র দন্ত রৌপ্য দ্বারা বাঁধাইয়া কুকীগণ গলায় ঝুলাইয়া রাখে; তাহাদিগের বিশ্বাস—উহার দ্বারা সর্ব্ববিপদ নষ্ট হয়। লুশাইগণ পুনঃ পুনঃ ইংরেজাধিকৃত দেশ আক্রমণ করায়, এক্ষণে তাহাদের দেশে ইংরেজগণ একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কুকীগণ ক্রমশঃ সভ্য হইয়া আসিতেছে। লেপ্চাগণ—সিকিমের অধিবাসী। ইহাদের আকৃতি অনেকটা চীনাদের ন্যায়। কার্পাস-নির্ম্মিত ঘাঘরা ইহারা প্রধানতঃ ব্যবহার করে। লেপ্চা স্ত্রীলোকগণ এক প্রকার বাঁশের টুপি মাথায় দেয়। সেই টুপিতে প্রধানতঃ বৃক্ষপত্র লম্বিত থাকে। বাঁশের চোঙ্ এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত তৈজসাদি লেপ্চাদিগের নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত। গুর্খাগণ—নেপালের অধিবাসী। ইহারা প্রধানতঃ শক্তির (কালীর) উপাসক। সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য ইহারা প্রসিদ্ধ। খোন্দ্ বা খন্দ জাতি—উড়িষ্যার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে, মধ্যভারত ও মান্দ্রাজ প্রেসি-ডেন্সির পারিপার্শ্বিক জেলা-সমূহে, বসতি করে। ইহারাও পার্ব্বত্য জাতি; ইহাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ। অনেকে মনে করেন,—খোন্দ্গণ দ্রাবিড় দেশের আদিম অধিবাসী; দেড়-সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে উহারা উড়িষ্যায় আসিয়া বসবাস করিয়াছে। খোন্দ্গণ অসংখ্য দেবদেবীর উপাসনা করে। পূর্ব্বে উহারা নরবলি দ্বারা পৃথ্বী-মাতার তুষ্টি সম্পাদন করিত। উহাদের বিশ্বাস,—নরবলি দ্বারা পৃথ্বী-মাতাকে সন্তুষ্ট করিলে, প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অধুনা ইংরেজ-রাজের সুশাসনে তাহাদের সে অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত হইয়া আসিতেছে। এক সম্প্রদায়ের খোন্দ্গণ—কোই নামে পরিচিত। ইহারা দক্ষিণদিকের অধিবাসী। গোদাবরী-নদীর তীরদেশে কোই-গণ বসবাস করে। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইহারা বাস্তার হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহাদের বিশ্বাস,—মৃত ব্যক্তির আত্মা পিশাচরূপ-গ্রহণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করে। ইহাদের মতে,—মানুষের মৃত্যু নাই; কেবল শত্রুর চক্রান্তে যাদু-প্রভাবে, মানুষ নরদেহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বিন্ধ্য-পর্ব্বত ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী এবং খোন্দ্-দিগের আবাস স্থান হইতে খান্দেশ ও মালোয়া পর্য্যন্ত-বিস্তৃত ভূ-খণ্ড—গোন্দ্ জাতির আবাস-স্থান। মধ্যপ্রদেশের প্রাচীন গাণ্ডোয়ানায় এক সময়ে গোন্দগণের রাজ্য ছিল, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। গোন্দগণের সংখ্যা দশ লক্ষের কম নহে। ইহাদের মধ্যে নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিদ্যমান। কালীর উপাসনাই গোন্দগণের মধ্যে প্রধানতঃ প্রচলিত। কালীর নিকট গোন্দগণ নরবলি দিত বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বাস্তারের রাজা কালীর নিকট একযোগে একদিন পঁচিশটি নরবলি দিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। সাঁওতালগণ—গঙ্গানদীর তীর হইতে বৈতরণী পর্য্যন্ত

বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে বাস করে। পূর্ব্বোত্তরে বঙ্গদেশ, দক্ষিণে উড়িষ্যা, পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ ও বিহার,—এই সীমান্তর্গত ভূভাগ সাঁওতালগণের বসতি-স্থান। সাঁওতালগণের সংখ্যা প্রায় লক্ষের কম নহে। বাসস্থান ভেদে সাঁওতালগণের ভাষা বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই। কিন্তু হিন্দুর, এমন কি ব্রাহ্মণের, রন্ধন-দ্রব্য বা খাদ্য ইহারা অনেকে স্পর্শ করে না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে, গবর্ণমেণ্টের অন্নসত্রে ব্রাহ্মণগণ রন্ধনাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাঁওতালেরা সে খাদ্য স্পর্শ করে নাই। ফলে, বহুসংখ্যক সাঁওতাল মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাঁওতালগণ উপদেবতায় বিশ্বাসবান। ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য-প্রদেশে ওরাওন জাতি বাস করে। তাহারা প্রধানতঃ ধাঙ্গড় বলিয়া পরিচিত। ওরাওন জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ বাল্যকাল হইতেই উল্কী পড়িয়া থাকে। ইহারা সূর্য্য-দেবকে প্রধান দেবতা বলিয়া মনে করে। কিন্তু ভূতপ্রেতাদির উপর তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করে না। বনে-জঙ্গলে, পর্ব্বতে, পথে,—সর্ব্বত্রই তাহারা ভূতের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিয়া থাকে। কোলগণ—এক্ষণে প্রধানতঃ ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য-প্রদেশে দৃষ্ট হয়। মুণ্ডাকোল, লারথাকোল বা হো এবং ভূমিজীকোল,—এই তিন শ্রেণীর কোল প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ। সাঁওতালগণকে কেহ কেহ কোল-জাতিরই শাখা বলিয়া মনে করেন। কোলগণ এক সময়ে প্রাচীন মগধ-রাজ্য অধিকার করিয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। অনেক প্রাচীন দুর্গের এবং অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে কোলগণের প্রাদুর্ভাবের স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে। কোলগণ—ভল্লুক, বানর, সর্প ও ইন্দুর ভিন্ন প্রায় সকল জন্তুই ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারাও প্রধানতঃ সূর্য্যোপাসক। জিপ্‌সি বা পরিভ্রমণকারী জাতি নামে এক সম্প্রদায়ের লোক ভারতবর্ষের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ তাহাদিগকে মিশর দেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভীলগণ কোলারীয়ানগণের আদিম বংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। রাজপুতনার দক্ষিণাংশে আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে ভীলগণ এক সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল। মুসলমানদিগের সহিত সংগ্রামে তাহাদের কৃতিত্ব চিরপ্রসিদ্ধ। ভীলগণ সত্যবাদী, সরল ও সাহসী। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ প্রদেশে এখন বহু ভীল-পরিবার দৃষ্ট হয়। তোড়া বা তুড়া জাতি—নীলগিরির পার্ব্বত্য-প্রদেশে বসতি করে। ইহাদের স্ত্রীগণের বহু বিবাহ দেখা যায়। একটি স্ত্রীকে এক পরিবারের কয়েক ভ্রাতায় প্রধানতঃ বিবাহ করিয়া থাকে। তোড়াগণ জীবনে স্নানাদি বা বস্ত্র পরিষ্কার করে না। নীলগিরি পর্ব্বতে আরও চারিটি পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। তাহাদের নাম—বাদাগা, কোটা, কুড়ুম্বা, ও ইরুলা। এই প্রকার জাতি হিমালয়েরর পার্ব্বত্য প্রদেশে, বিন্ধ্য-পর্ব্বতে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানেও বসবাস করে। সে সকল জাতিই বা কোন্ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, নির্দ্দেশ করা সুকঠিন।

———•———

ভারতের ভাষা।

ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে প্রধানতঃ কোন্ ভাষা প্রচলিত, তাহার আভাষ প্রদান জন্য নিয়ে একখানি মানচিত্র প্রদত্ত হইল। মূলতঃ, ভারতে ঐ মানচিত্রাঙ্কিত ভাষা-সমূহ প্রচলিত আছে। অন্যান্য যে সকল ভাষা ভারতে বিদ্যমান দেখিতে পাই, তাহা বৈদেশিক ভাষা, অথবা ঐ সকল ভাষার শাখা-প্রশাখা মাত্র।

মানচিত্রে যে সকল ভাষার নাম লিখিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত ভাষার মধ্যে উর্দু ভাষা উত্তর-ভারতে বিশেষরূপে প্রচলিত। পঞ্জাবী-চিহ্নিত প্রদেশে গুরুমুখী অক্ষরে যে ভাষা প্রচলিত, তাহা পারসী এবং হিন্দীর সংমিশ্রণে সংগঠিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তার পর মানচিত্রাঙ্কিত হিন্দুস্থানী ভাষার স্থানে হিন্দুস্থানী যে নানারূপে বিরাজমান আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতের কোন্ প্রদেশে কি নামধেয় কত ভাষা প্রচলিত, ভারতের ভাষা-প্রসঙ্গে ৩৭৭—৩৮৪ পৃষ্ঠায় তাহা দৃষ্ট হইবে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

——০:*:০——

ভারতের ভাষা।

[ভাষার সৃষ্টি,—ভাষা অনাদি,—ভাষার অর্থ ও আবশ্যকতা;—ভাষার উৎপত্তি,—দার্শনিকগণের মত;—ভাষা অসংখ্য,—ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনায় ভাষার সংখ্যা-পরিচয়;—ভাষা-সমূহের উৎপত্তি-সম্বন্ধে সাদৃশ্য-তত্ত্ব,—গ্রীক, জর্ম্মণ, ইতালীয় প্রভৃতি ভাষার সহিত ভারতের সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য,—অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের মত;—সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতির স্তর-নির্দ্দেশে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গবেষণা,—পালি-ভাষার রূপান্তর,—সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতের সাদৃশ্য;—ভাষা-প্রবর্ত্তনের যুগ,—বিভিন্ন ভাষার সম্বন্ধ-তত্ত্ব,—পঞ্চ-গৌড় ও পঞ্চ-দ্রাবিড়,—কল্‌ডওয়েলের গবেষণা,—ভারতের প্রচলিত ও অপ্রচলিত ভাষার প্রসঙ্গ;—বর্ত্তমানে ভারত-প্রচলিত ভাষা-সমূহ,—সেই সকল ভাষার স্তর-পর্য্যায় নির্ণয়,—কোন্ ভাষা কোন্ প্রদেশে প্রচলিত, তাহা নির্দ্দেশ,—ভারতের কথিত-ভাষা ও লিখিত-ভাষার সংখ্যা-পরিচয়;—ভারত-প্রচলিত প্রাচীন ও আধুনিক প্রধান প্রধান ভাষার আদর্শ।]

যত দিন সৃষ্টি, তত দিন ভাষা। সৃষ্টির যেমন আদি-অন্ত অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, ভাষারও সেইরূপ আদি-অন্ত নির্ণয় করা অসম্ভব। বীজ ও বৃক্ষের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, দার্শনিকগণ যেমন সংশয়ান্বিত হইয়াছেন—'বীজ আগে, কি বৃক্ষ আগে'; ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়াও সেইরূপ সংশয়ে পড়িতে হয়—'সৃষ্টি আগে, কি ভাষা আগে'। নাদ বা শব্দ—ভাষার মূলীভূত। নাদ বা শব্দ—শাস্ত্রমতে ব্রহ্ম-স্বরূপ। 'নাদরূপী * ব্রহ্ম', 'শব্দরূপী ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্য শাস্ত্রগ্রন্থে প্রায়ই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভগবান ব্রহ্ম নাদ-রূপে—শব্দ-রূপে, বিদ্যমান আছেন,—ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। শাস্ত্রগ্রন্থে ভূয়োভূয়ঃ উল্লিখিত হইয়াছে,—

ভাষা কত কাল?

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদস্তস্মাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ।
নাদো বিন্দুশ্চ বীজঞ্চ স এব ত্রিবিধো মতঃ। ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরুভয়াত্মা রবোঽভবৎ॥
স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ শব্দো ব্রহ্মাভবৎ পরম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে, মহাভাগ বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে, মহাতপা মৈত্রেয় এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বেদাদির উৎপত্তি-তত্ত্ব বর্ণন করিয়া শব্দ-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"শব্দব্রহ্মাত্মনস্তস্য ব্যক্তাব্যক্তাত্মন পরঃ। ব্রহ্মা বভাতি বিততো নানাশক্ত্যুপবৃংহিত॥"

'সেই ব্রহ্মা শব্দ-মূর্ত্তি এবং ব্যক্ত অর্থাৎ বৈখরীনামিকা বাক্যরূপা ভাষা এবং অব্যক্তা অর্থাৎ প্রণব এই উভয়াত্মক। ঐ প্রণব হইতে পরিপূর্ণ-স্বরূপ পরমেশ্বর নিত্য আবির্ভূত হন।' সৃষ্টির সহিত শব্দ-ব্রহ্মের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। শব্দই ভাষা-রূপে প্রকটিত। শব্দগত অর্থের অনুসরণে বুঝিতে পারি, ভাষা (ভাষ=বলা+ভাবে অ)—ভাব-বোধক শব্দ বা স্বর।

---

* অভিধান মতে, নাদ (নদ=শব্দ করা+ঘঞ—ভাবে) অর্থ—ধ্বনি, শব্দ। আকাশ হইতে নাদ জন্মে; ঐ নাদ কোনও বস্তুন্তরের আঘাতে উৎপন্ন হইয়া, বায়ু-সংযোগে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া, শ্রবণ-প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ শুনা যায়। নাদ দ্বিবিধ—বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাত-জনিত নাদকে ব্যক্ত বা বর্ণাত্মক নাদ কহে; যেমন, বাক্যকথন। কোনও বস্তুতে অন্য বস্তুর অভিঘাতে যে নাদ অস্পষ্ট-রূপে উৎপন্ন হয়, তাহাকে ধ্বন্যাত্মক নাদ কহে; যেমন, একটা কাষ্ঠ লইয়া অন্য কাষ্ঠের সহিত টক্ টক্ শব্দ। বাস্তবিক শব্দ-মাত্রকেই নাদ বলা যায়। "চকার নাদং ঘননাদসন্নিভং।"

যে অভিব্যক্তির দ্বারা আপনার মনের ভাব অপরকে বুঝাইতে পারা যায়, তাহাই ভাষা। ভাষা—মনুষ্যের হইতে পারে; ভাষা—পশু-পক্ষীর হইতে পারে; ভাষা—কীট-পতঙ্গের হইতে পারে; আধুনিক বিজ্ঞানমতে, ভাষা উদ্ভিদেরও থাকিতে পারে। সাধারণ কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে পারি, যে শব্দ দ্বারা প্রাণিমাত্র স্বজাতির নিকট আপন মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে, তাহারই নাম—ভাষা। * প্রাণিমাত্রেই আপনার সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে প্রকারেই হউক, আবশ্যক হইলে, তাহারা সকলে পরস্পর পরস্পরের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। প্রাণি-সমূহের স্বর-যন্ত্র এরূপ-ভাবে সংগঠিত যে, তাহারা অবস্থা-বিশেষে বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণে আপনার মনোভাব অন্যকে বুঝাইতে পারে। বৎসের 'হাম্বা' রবে উন্মনা হইয়া, গাভী বৎসরে অনুসরণে ধাবমান হয়; কুক্কুটির আহ্বানে তাহার শাবকগণ দূর হইতে নিকটে ছুটিয়া আসে। যাহাদের সদসৎ বিচার-শক্তি নাই, সেরূপ অনেক প্রাণীর শিশু সন্তানের সহিত তাহাদের পিতামাতার অস্ফুট সাঙ্কেতিক শব্দ-ব্যবহারের—সুখ-দুঃখ-জ্ঞাপনের—আভাষ পাইয়া থাকি। সমজাতীয় প্রাণিগণের মধ্যেই যে কেবল শব্দ-সাহায্যে অভাবের আদান প্রদান হয়, তাহা নহে; শব্দ-সাহায্যে এক জাতীয় প্রাণী অন্য জাতীয় প্রাণীরও মনের ভাব বুঝিতে পারে। মনুষ্যের তো কথাই নাই; যে কোনও প্রাণীই তাহার প্রতি অপরের সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার —মিত্রভাব ও শত্রুভাব—শব্দ-সাহায্যে বুঝিয়া থাকে। দূর বনে সিংহের গর্জ্জন শ্রবণ মাত্র বন্য-পশুগণ ত্রস্ত, ভীত ও সঙ্কুচিত হয়; আর সমজাতীয় প্রাণীর আনন্দ-ব্যঞ্জক স্বরে তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে। প্রাণি-জগতের এ দৃশ্য প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করি। এ হিসাবে, প্রাণিমাত্রেরই ভাষা আছে; এ হিসাবে, ভাষার পর্য্যায় অসংখ্য; সংসারে যত প্রকার প্রাণীর অস্তিত্ব, তত প্রকার ভাষার কল্পনা করা যাইতে পারে। সেই সকল ভাষার মধ্যে আবার বহু প্রকার বিভাগ থাকা সম্ভবপর। অন্যান্য প্রাণীর ভাষার সহিত মনুষ্যের ভাষার সাদৃশ্য অতি অল্পই আছে। মনুষ্যের ভাষাও আবার, দেশভেদে, সম্প্রদায়-ভেদে, বয়স-ভেদে, অসংখ্য—অনন্ত। তবে অন্যান্য প্রাণীর ভাষা অপেক্ষা মনুষ্যের ভাষা যে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। মনুষ্য আপনার মনের ভাব যে প্রকারে ব্যক্ত করিতে পারে, অন্যান্য প্রাণীর তাহা ধারণার অতীত,—ইহা নানারূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ গ্রীক-দার্শনিক আরিষ্টটল বলিয়া গিয়াছেন,—'ভাষা দ্বারা মনুষ্য আবশ্যক ও অনাবশ্যক, ন্যায় ও অন্যায়, বিষয় বুঝাইতে পারে। ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে পারে বলিয়াই এবং পশ্বাদির অপেক্ষা জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনুষ্য বাক্যকথন ভাষার অধিকারী।' †

* In a more general sense, language is sometimes used to denote all sounds by which animals of any kind express their particular feelings and impulses in a manner that is intelligible to their own species".

† "Speech," says Aristotle, "is made to indicate what is expedient and what is inexpedient, and, in consequence of this, what is just and what is unjust. It is therefore given to men, because it is peculiar to them, that of good and evil, just and unjust, they only with respeet to other animals, possess a sense or feeling."

ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণ, নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ বলেন,—ভাষা দৈবী-শক্তি-সমুদ্ভূতা। ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের কাহারও কাহারও মতে, ভাষা মানব-সৃষ্ট। তাঁহারা বলেন, সৃষ্টির পর মানুষ কিছুকাল মৌনী ছিল; তখন অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা তাহারা মানসিক ভাব প্রকাশ করিত। শেষে যখন তাহারা বুঝিল, অঙ্গ-ভঙ্গীতে সকল ভাব ব্যক্ত হইল না; কাজেকাজেই তাহারা শব্দ-উচ্চারণে মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পাইল। প্রথমে তাহারা যে শব্দ উচ্চারণ করিত, সে শব্দ অসম্বদ্ধ ও অসম্পূর্ণ ছিল; তখন দুঃখ বোধ করিলে, তাহারা দুঃখব্যঞ্জক ধ্বনি 'আ' বা 'উ' উচ্চারণ করিত; আবার সুখ বোধ করিলে, তাহাদের মুখে সুখ-সূচক শব্দ উচ্চারিত হইত। মনুষ্যের প্রথম উচ্চারিত সেই শব্দগুলিকে বর্ত্তমান-কাল-প্রচলিত 'অব্যয়' শব্দ বলিলেও বলা যাইতে পারে। ক্রমশঃ সেই সকল শব্দেও মনোভাব ব্যক্ত না হওয়ায়, তাহারা দুই, তিন বা ততোঽধিক শব্দের একত্র সংযোগে নূতন নূতন শব্দ প্রস্তুত করিতে লাগিল। তাহা হইতেই মনুষ্যের ভাষার সৃষ্টি হয়। * পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে, লোক, আডাম স্মিথ, ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ মনুষ্য কর্ত্তৃক ভাষা-সৃষ্টির এইরূপ যুক্তি-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকগণ এবম্বিধ মতের পরিপোষক হইলেও, পাশ্চাত্য দেশের তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ কিন্তু এ মতে আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা বলেন,—ভাষা ঈশ্বর-সৃষ্ট; তিনিই সমস্ত দ্রব্যের নামকরণ করিয়াছেন; তাঁহার নিকট হইতেই পৃথিবীর প্রথম মনুষ্য 'আদম' শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এ মত কতকাংশে হিন্দু-মতেরই অনুসারী। কিন্তু অপর আর এক পক্ষ এই দুই মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বলেন,—'ভাষা মনুষ্যের স্বভাবজাত; মনুষ্যকে চেষ্টা করিয়া ভাষার সৃষ্টি করিতে হয় নাই; অথবা ঈশ্বর মনুষ্যকে ভাষা শিক্ষা দিয়া যান নাই; মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক গঠনানুসারে, কতকটা তাহার সামাজিক সহজ-বুদ্ধিবশে, ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। মানুষ যেমন আপনা-আপনি ভ্রমণ করিতে শিখে, আহার করে, নিদ্রা যায়; ভাষাও তেমনি আপনা-আপনি তাহার মুখ হইতে মুখরিত হইয়া থাকে। আপনার আকৃতি বা আপনার কেশের বর্ণ-পরিবর্ত্তন যেমন মানুষের আয়ত্তাধীন নহে, স্বভাব-বশেই যেমন সে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; ভাষাও তদ্রূপ মানুষের স্বভাবজ সম্পত্তি, আপনা-আপনিই তাহা পরিস্ফুট হয়। † জ্ঞান-স্ফূর্ত্তিতে অধিকন্তু সামাজিক

ভাষার উৎপত্তি-তত্ত্ব।

---

* "According to that view, which was early started and was especially elaborated and discussed by Locke, Adam Smith and Dugald Stewart, it was only after men found that their rapidly increasing ideas could be no longer conveyed by gestures of the body and changes of the countenance, that they set about inventing a set of artificial vocal signs, the meaning of which was fixed by mutual agreement."

† "Every thing, in fact, tends to show that language is a spontaneous product of human nature—a necessary result of man's physical and mental constitution (including his social instincts), as natural to him as to walk, eat or sleep, and as independent of his will as his stature or the colour of his hair."

প্রকৃতি-বশে, মানুষের হৃদয়ে ভাষার অঙ্কুর উদ্গত হইয়া থাকে। আপনার আত্মীয়-স্বজনের নিকট আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে স্বভাবতঃ জাগিয়া উঠে। ভাষার উৎপত্তির উহাই প্রথম সূত্রপাত। আপনার চিন্তা-শক্তির উন্মেষ-পক্ষে সহায়তাকে ভাষা-সৃষ্টির দ্বিতীয় স্তর বলা যাইতে পারে। আত্মার সহিত শরীরের এরূপ সম্বন্ধ—আত্মা ও শরীর পরস্পর পরস্পরের প্রতি এরূপ নির্ভর-পরায়ণ—যে, আত্মা কোনও উত্তেজনা অনুভব করিলে, শরীরে, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রে এবং বাগ্‌যন্ত্রে, তাহা প্রতিধ্বনিত হয়। তাহাতেই ভাষার উৎপত্তি। আত্মার ও শরীরের সমানুভূতি শিশুতে ও বন্য-জন্তুতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তাহা হইতে আপনা-আপনি যে স্বরের বা শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহাই ভাষা।' পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপ-ভাবে ভাষার উৎপত্তি-বিষয়ে বিবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, যে মতেরই আলোচনা করা যাউক না কেন, ভাষা যে অনাদি কাল বিদ্যমান আছে এবং ভাষার সংখ্যা নির্ণয় করা যে সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভাষা অসংখ্য।

পৃথিবীর ভাষা অনন্ত তো বটেই। এই ভারতবর্ষের ভাষারই কি সংখ্যা নির্ণয় করা যায়? প্রধানতঃ মনুষ্যের ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে;—(১) কথিত-ভাষা ও (২) লিখিত-ভাষা। লিখিত-ভাষার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব না হইতে পারে; কিন্তু কথিত-ভাষা কত প্রদেশে, কত সম্প্রদায়ের মধ্যে, কত অবস্থায়, কত ভাবে, প্রচলিত আছে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারেন? সময়ের পরিবর্ত্তনে, নব নব সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে, ভাষা কতই নূতন নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাই ভাষার তালিকা কত রূপেই প্রকটিত হইয়া আছে। বলিয়াছি তো, কথিত-ভাষার সংখ্যা-নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে। কথিত ভাষা, গ্রামান্তরে, বিভাগান্তরে পরিবর্ত্তিত হয়; কালভেদেও কথিত-ভাষার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, সহস্র বৎসরই বা বলি কেন—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এক প্রদেশের লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, আজি তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। আবার আজি মানুষ যে সকল ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কিছু দিন পরে তাহারও পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং প্রাচীনকালের কথিত-ভাষার পরিচয় দিবার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব, আপাততঃ প্রাচীন ভারতের লিখিত-ভাষার বিষয়ই উল্লেখ করিতেছি। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,—"ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মরূপী বাক্য সৃজন করিয়া, অকারাদি স্বর ও ককারাদি হল-বর্ণ এবং স্বরবর্ণের ও হলবর্ণের পরস্পর সম্মিলিত বর্ণ-সকল সৃজনান্তে ষট্‌পঞ্চাশৎ সংখ্যক ভাষা এবং বালকদিগের ভাষা-জ্ঞানের জন্য ঐ সকল ভাষায় ব্যাকরণ সৃষ্টি করিলেন।" * এই ছাপান্ন ভাষার নাম এবং পরিচয় বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণে প্রদত্ত হয় নাই বটে; কিন্তু ব্যাকরণের

---

* "অতো বাচঃ সসর্জ্জাদৌ ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ। অকারাদিস্বরাংশ্চৈব ককারাদিহলাংস্তথা॥
পরস্পরঞ্চ মিলিতান্ বর্ণানেতান্ সনাস্বজৎ। ততো ভাষাশ্চ সসৃজে পঞ্চাশৎ ষট্ চ সংখ্যয়া।
তজ্জ্ঞানায় চ বালানাং তত্ত্ব্যাকরণানি চ। পদজ্ঞানং ব্যাকরণৈরর্থজ্ঞানঞ্চ দর্শনেঃ॥"
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ২৫শ অধ্যায়, ১১-১৩শ শ্লোক।

বন্ধনী মধ্যে আবদ্ধ ছাপ্পান্নটী ভাষা এক সময়ে এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়। 'প্রাকৃত লঙ্কেশ্বর' ব্যাকরণে শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষার উল্লেখ আছে। সেই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা,—(১) সংস্কৃত, (২) প্রাকৃত, (৩) উদীচী, (৪) মহারাষ্ট্রী, (৫) মাগধী, (৬) মিশ্রার্দ্ধ-মাগধী, (৭) শকাভীরী (৮) শ্রবন্তী, (৯) দ্রাবিড়ী, (১০) ওড্রিয়া (ওড্রিয়া), (১১) পাশ্চাত্যা, (১২) প্রাচ্যা, (১৩) বাহ্লীকা, (১৪) রন্তিকা, (১৫) দাক্ষিণাত্যা, (১৬) পৈশাচী, (১৭) আবন্তী এবং (১৮) শৌরসেনী। এই সকল ভাষার লক্ষণোদাহরণও 'প্রাকৃত লঙ্কেশ্বর' ব্যাকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে।* কোন্ শ্রেণীর লোক কোন্ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, 'সাহিত্য-দর্পণে' তাহার উল্লেখ আছে। যথা,—

"পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎকৃতাত্মনাম্। শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্॥
আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ। অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্॥
চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাঞ্চার্দ্ধমাগধী। প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা॥
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যা হি দীব্যতাম্। শকারাণাং শকাদীনাং শাকারীং সংপ্রয়োজয়েৎ॥
বাহ্লীকভাষোদীচ্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রাবিড়াদিষু। আভীরেষু তথাভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু॥
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু। তথৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্॥
চেটীনামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা। বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাম্॥
উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ। ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপপ্লুতস্য চ॥
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সংপ্রযোজয়েৎ। সংস্কৃতং সংপ্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীষূত্তমাসু চ॥
দেবীমন্ত্রিসুতাবেশ্যাস্বপি কৈশ্চিত্তথোদিতম্। যদ্দেশং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশং তস্য ভাষিতম্॥
কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যো ভাষা বিপর্য্যয়ঃ। যোষিৎসখীবালবেশ্যাকিতবাপ্সরসাং তথা॥
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতঞ্চান্তরান্তরা। এষামুদাহরণান্যাকরেষু বোদ্ধব্যানি॥"

'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে লিখিত আছে, আচার্য্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধদেবকে লিপি শিক্ষা প্রদান করিতে আসিবার পূর্ব্বেই বুদ্ধদেব চতুঃষষ্টি প্রকার লিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ললিত-বিস্তর গ্রন্থ, খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বে লিখিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—খৃষ্ট-জন্মের অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সেই ললিত-বিস্তর গ্রন্থে (দশম অধ্যায়ে) বুদ্ধদেব-পরিজ্ঞাত লিপি-সমূহের এইরূপ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে,—

(১) ব্রাহ্মীং (২) খরোষ্ট্রীং (৩) পুষ্করসারীং (৪) অঙ্গলিপিং (৫) বঙ্গলিপিং (৬) মগধলিপিং (৭) মাঙ্গল্যলিপিং (৮) মনুষ্যলিপিং (৯) অঙ্গুলীয়লিপিং (১০) শকারীলিপিং (১১) ব্রহ্মবল্লীলিপিং (১২) দ্রাবিড়লিপিং (১৩) কিনারিলিপিং (১৪) দক্ষিণলিপিং (১৫) উগ্রলিপিং (১৬) সংখ্যালিপিং (১৭) অনুলোমলিপিং (১৮) অর্দ্ধধনুর্লিপিং (১৯) দরদলিপিং (২০) খাস্যলিপিং (২১) চীনলিপিং (২২) হূণলিপিং (২৩) মধ্যাক্ষরবিস্তর লিপিং (২৪) পুষ্পলিপিং (২৫) দেবলিপিং (২৬) নাগলিপিং (২৭) যক্ষলিপিং (২৮) গন্ধর্ব্বলিপিং (২৯) কিন্নরলিপিং (৩০) মহোরগলিপিং (৩১) অসুরলিপিং (৩২) গরুড়লিপিং (৩৩) মৃগচক্রলিপিং (৩৪) চক্রলিপিং (৩৫) বায়ুমরুল্লিপিং (৩৬) ভৌমদেবলিপিং (৩৭) অন্তরীক্ষদেবলিপিং (৩৮) উত্তরকুরুদ্বীপলিপিং (৩৯) অপরগোড়াদি লিপিং (৪০) পূর্ব্ববিদেহ লিপিং (৪১) উৎক্ষেপলিপিং (৪২) নিক্ষেপলিপিং (৪৩) বিক্ষেপলিপিং (৪৪) প্রক্ষেপলিপিং (৪৫) সাগরলিপিং (৪৬) বজ্রলিপিং (৪৭) লেখপ্রতিলেখ লিপিং (৪৮) অনুদ্রুতলিপিং (৪৯) শাস্ত্রাবর্ত্তলিপিং (৫০) গণনাবর্ত্তলিপিং (৫১) উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপিং (৫২) নিক্ষেপাবর্ত্ত লিপিং (৫৩) পাদলিখিত লিপিং (৫৪) দ্বিরুত্তরপদসন্ধি লিপিং (৫৫) যাবদ্দশোত্তরপদসন্ধি লিপিং (৫৬) অধ্যাহারিণী লিপিং (৫৭) সর্ব্বরুত-সংগ্রহণী লিপিং (৫৮) বিদ্যানুলোমা লিপিং (৫৯) বিমিশ্রিত লিপিং (৬০) ঋষিতপস্তপ্তাং (৬১) রোচমানধরণীপ্রেক্ষণলিপিং (৬২) সর্ব্বৌষধি-নিষ্যন্দাং (৬৩) সর্ব্বসারসংগ্রহণী (৬৪) সর্ব্বভূতরুতগ্রহণীমাষাং ভো উপাধ্যায় চতুঃষষ্টি লিপিনাং কতমাং লিপিং মাং ত্বং শিক্ষয়িষ্যসি।"

* "এতাষাং লক্ষণোদাহরণানি প্রাকৃত লঙ্কেশ্বর ব্যাকরণে দ্রষ্টব্যানি।"—শব্দকল্পদ্রুম।

যখন চতুঃষষ্টি প্রকার লিপির উল্লেখ দেখা যাইতেছে, তখন ভাষার সংখ্যা আরও কত অধিক থাকা সম্ভবপর! জৈনদিগের 'সমবায়-সূত্র' এবং 'প্রজ্ঞাপনা-সূত্র' গ্রন্থে অষ্টাদশ প্রকার লিপির বিষয় লিখিত আছে। জৈনগ্রন্থদ্বয়ে উল্লিখিত সেই কয়েকটী লিপির নাম;—

সমবায়-সূত্রে,—"(১) বম্ভী (২) যবনালীয়া (৩) দাষ উড়িয়া (৪) খরোট্টিয়া (৫) পুখরসারিয়া (৬) পাহাড়াইয়া (৭) উচ্চতুরিয়া (৮) অক্ষর পুত্থিয়া (৯) ভোগবয়ত্তা (১০) বেয়ণতিয়া (১১) নিরাহইয়া (১২) অংকলিপি (১৩) গণিতলিবি (১৪) গন্ধর্ব্বলিবি (১৫) আদস্-সলিবি (১৬) মাহেসর লিবি (১৭) দামিলিবি। (১৮) বোলিদিলিবি।"

প্রজ্ঞাপনা-সূত্রে,—"১ বম্ভী, ২ জবনালীয়, ৩ দাসপুরীয়া, ৪ খরোটঠী, ৫ পুকখর সারীয়া, ৬ ভোগবইয়া, ৭ পাহাড়াইয়া, ৮ উ য অন্তরকরিয়া, ৯ অক্ষর পুট্টিয়া, ১০ বেন্নিয়া, ১১ নিহইয়া, ১২ অংলিবি, ১৩ গণিতলিবি, ১৪ গন্ধর্ব্বলিবি, ১৫ আদস্সলিবি, ১৬ মাহেসরী ১৭ দামিলি ১৮ পোলিন্দা।"

জৈন-গ্রন্থোক্ত লিপি-সমূহের 'বম্ভী' শব্দে ব্রাহ্মী, 'দামিলী' শব্দে দ্রাবিড়ী প্রভৃতি অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল লিপির এবং বুদ্ধদেবোক্ত লিপি-সমূহের অধিকাংশের এখন কি অবস্থা, তাহা নির্ণয় করা যায় না। 'নন্দীসূত্র'-নামক জৈনদিগের অপর এক-খানি গ্রন্থেও ছত্রিশ প্রকার লিপির বিষয় লিখিত আছে। সেই সকল লিপির নাম,—হংসলিপি, ভূতলিপি, যক্ষলিপি, রাক্ষসীলিপি, উড্ডীলিপি, যাবনীলিপি, তুরক্কী লিপি, কীরীলিপি, দ্রাবিড়ীলিপি, সৈন্ধবীলিপি, মালবীলিপি, নাড়লিপি, নাগরীলিপি, পারসীলিপি, লাটীলিপি, অনিমিত্রলিপি, চানক্কীলিপি, মৌলদেবীলিপি, লাটি, চৌড়ী, ডাহলী, কানড়ী, গুজরী, সৌরঠি মরহঠী, কোঙ্কণী, খুরাসানী, মাগধী, সৈংহলী, হাড়ী, কীরী, হাম্বিরী, পরতিরি, মসী, মালবী, মহাযোধী'। এই সকল লিপির মধ্যে প্রথমোক্ত অষ্টাদশ লিপি শ্রীঋষভদেব দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত অষ্টাদশ প্রকার লিপি তাঁহার বাম হস্ত দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থসমূহে এইরূপ আরও নানা লিপির নামোল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু সেই সকল লিপির কতকগুলির বর্ত্তমান অবস্থা নির্ণয় করা সুকঠিন। সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি মূল ভাষা এবং সাতাইশটি উপভাষার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। 'প্রাকৃত-চন্দ্রিকা' গ্রন্থে প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে সেই সকল ভাষার বিষয় এইরূপ-ভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল,—

"মহারাষ্ট্রী তথাবন্তী শৌরসেন্যর্দ্ধমাগধী। বাহ্লীকী মাগধীচৈব ষড়েতা দাক্ষিণাত্যজাঃ॥
ব্রাচণ্ডো লাটবৈদর্ভাবুপনাগবনাগরৌ। বার্ব্বরাবন্ত্যা পাঞ্চালটাক্কমালবকৈকয়াঃ॥
গৌড়োড্রদৈবপাশ্চাত্যপাণ্ড্যকৌন্তলসৈংহলাঃ। কালিঙ্গ্যপ্রাচ্যকর্ণাটঃ কাঞ্চদ্রাবিড়গৌর্জ্জরাঃ॥
আভীরো মধ্যদেশীয় সূক্ষ্মভেদব্যবস্থিতাঃ। সপ্তবিংশত্যপভ্রংশো বৈড়ালাদি প্রভেদতঃ॥"

অর্থাৎ,—'দাক্ষিণাত্য-জাত মহারাষ্ট্রী, আবন্তী, শৌরসেনি, অর্দ্ধমাগধী, বাহ্লিকী ও মাগধী,—এই ছয়টি মূল ভাষা হইতে ব্রাচণ্ড, লাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, নাগর, বার্ব্বর, আবন্ত্য, পাঞ্চাল, টাক্ক, মালব, কৈকয়, গৌড়, ওড্র, দৈব, পাশ্চাত্য, পাণ্ড্য, কৌন্তল, সৈংহল, কালিঙ্গ, প্রাচ্য, কর্ণাট, কাঞ্চ, দ্রাবিড়, গৌর্জ্জর, আভীর, মধ্যদেশীয়, বৈড়াল প্রভৃতি সপ্তবিংশতি অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।'

ভারতবর্ষের ভাষা-সমূহের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বিবিধ মত প্রচলিত। প্রধানতঃ, সংস্কৃত ভাষাকেই সেই সকল ভাষার মূলীভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। সংস্কৃত ভাষাই যে ভারতীয় ভাষা-সমূহের, কেবল ভারতীয় ভাষা-সমূহেরই বা বলি কেন—পৃথিবীর ভাষা-সমূহের, জননী-স্বরূপিণী, ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করিলে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়; অন্যান্য দেশের অন্যান্য ভাষার সহিত সংস্কৃতের কি সাদৃশ্য, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। এখানে কেবল সংস্কৃত হইতে ভারতীয় প্রধান প্রধান ভাষা-সমূহের উৎপত্তির মূল-তত্ত্ব বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইব। সংস্কৃত হইতে কিরূপে ভাষা-সমূহের উৎপত্তি হয়, তদ্বিষয়ে বহু মতান্তর আছে। সংস্কৃত নামেই কতরূপ ভাষার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। বৈদিক সংস্কৃত, ব্রাহ্মণারণ্যকাদির সংস্কৃত, উপনিষদের সংস্কৃত, সূত্রগ্রন্থের সংস্কৃত, পুরাণোপপুরাণের সংস্কৃত,—এ সকলের পরস্পরের মধ্যে কতই পার্থক্য বিদ্যমান! ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ অধুনা যেরূপভাবে ভাষার বিভাগ নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে সংস্কৃতের এক একটি স্তরকে এক একটী স্বতন্ত্র ভাষা বলিলেও বলা যাইতে পারে। প্রাকৃত, পালি, হিন্দী, বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র, গুজরাটি, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইলেও, অশেষ সংশয়-সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয়। সংস্কৃতকে সকল ভাষার জননী-স্বরূপিণী স্বীকার করিলেও, কোন্ ভাষা কোন্ ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, সে তত্ত্ব নির্ণয় করা সুকঠিন। ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সে সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থে ম্যাক্সমূলার প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তি এবং প্রাকৃত হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ইউ-রোপীয় ভাষা-সমূহের উৎপত্তি-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া ভারতীয় ভাষা-সমূহের উৎপত্তির এক অভিনব সুন্দর সাদৃশ্য তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। * তিনি বলিয়াছেন,—"স্ত্রীলোকেরা লাটিন ভাষা বুঝিতে পারিত না বলিয়া, ইতালী দেশে জনসাধারণের বুঝিবার উপযোগী ভাষার সৃষ্টি হয়; দান্তের মতে,—ইতালীর সাধারণ ভাষার তাহাই মূলীভূত; সাধারণ ভাষায় গ্রন্থাদি রচনার সেই প্রথম উদ্যম। ইতালীর সেই সাধারণ ভাষার সহিত ভারতবর্ষের প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। লিখিত সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে, ইতালীয় সাধারণ ভাষা যে অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, ভারতবর্ষের

ভাষা-সমূহের উৎপত্তি-সম্বন্ধে সাদৃশ্য-তত্ত্ব।

* "Dante ascribed the first attempts at using the vulgur tongue in Italy for literary composition to the silent influence of ladies who did not understand the Latin language. Nor this vulgur Italian, before it became the literary language of Italy, held very much the same position there as the so-called Prakrit dialects in India; and these Prakrit dialects first assumed literary position in the Sanscrit plays where female characters, both high and low, are introduced as speaking Prakrit, instead of Sanskrit employed by kings, noblemen and priests. Here, then, we have the language of women, or, if not of women exclusively, at all events of women and domestic servants, gradualy entering into the literary idiom, and in later times even supplanting it altogether; or it is from the Prakrit, and not from the literary Sanskrit, that the modern vernaculars of India branched off in course of time." &c.,—*Vide*, Max Muller, *Lectures on the Science of Language*, Second Series, Sect. I.

প্রাকৃত ভাষার বিষয় আলোচনা করিলেও, প্রাকৃত ভাষারও সেইরূপ অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হই। নাট্য-সাহিত্যে প্রাকৃতের প্রথম স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। নাটকে রাজা, পুরোহিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীগণ প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। ভৃত্যাদির মুখেও প্রাকৃত ভাষা উচ্চারিত হইত। তদবধি স্ত্রীগণের এবং ভৃত্যাদির ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা সাহিত্যে স্থান লাভ করে। পরবর্ত্তিকালে ক্রমশঃ প্রাকৃত ভাষাই সংস্কৃতের স্থান অধিকার করিয়া বসে। কালক্রমে সেই প্রাকৃত হইতে তাহার শাখা-প্রশাখারূপে ভারতের আধুনিক ভাষা-সমূহের উদ্ভব হইয়াছে। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার ন্যায় একই মূল ভাষার দ্বিবিধ প্রতিকৃতি—অন্যান্য ভাষায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষার আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, অধিকাংশ মৌলিক ভাষাই প্রধানতঃ দুইটি বিভাগে বিভক্ত; একটি বিভাগ—পৌরুষসম্পন্ন; অপর বিভাগ—স্ত্রীজনোচিত কমনীয়তাপূর্ণ। একটিতে ব্যঞ্জনবর্ণের আধিক্য, অন্যটিতে স্বরবর্ণের প্রাচুর্য্য; একটি ব্যাকরণের বিভক্তি দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল, অপরটী বিভক্তির দ্বারা প্রায়শঃ পরিবর্ত্তিত হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, গ্রীক, জর্ম্মণ প্রভৃতি ভাষার বিভাগ-সমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীক ভাষা—(১) 'এওলিক' ও (২) 'আইওনিক', প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত। উহাদের প্রত্যেকটিতে আবার 'ডোরিক' ও 'আটিক' নামক দুইটি উপবিভাগ আছে। জর্ম্মণ ভাষায় 'হাই-জর্ম্মণ' এবং 'লো-জর্ম্মণ' নামক দুইটি বিভাগ দৃষ্ট হয়। কেল্‌টিক ভাষারও 'গাথেলিক' ও 'সিমরিক' নামক দুইটি শাখা। 'ভারতবর্ষের সম্বন্ধে ভাষার মধ্যে যেমন সংস্কৃত ও প্রাকৃত জর্ম্মণ ভাষার সেইরূপ 'হাই' ও 'লো' জর্ম্মণ, গ্রীক-ভাষায় 'এওলিক' ও 'আইওনিক' এবং কেল্‌টিক ভাষায় 'গাথেলিক' ও 'সিমরিক'। প্রথমোক্ত ভাষা-সমূহ—অর্থাৎ সংস্কৃত, হাই-জর্ম্মণ, এওলিক এবং গাথেলিক ভাষা—পৌরুষব্যঞ্জক। ঐ সকল ভাষা—পিতার ভাষা, ভ্রাতার ভাষা এবং সভা-সমিতির ভাষা। শেষোক্ত ভাষাসমূহ,—অর্থাৎ প্রাকৃত, লো-জর্ম্মণ, আইওনিক ও সিমরিক ভাষা—কোমল ও সরল পদবিশিষ্ট। ঐ সকল ভাষা—মাতার ভাষা, ভগ্নীর ভাষা এবং ভৃত্যগণের ভাষা।' সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে ভারতবর্ষের অপরাপর ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে,—এই মতই সাধারণ মত। ম্যাক্সমূলার এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। প্রাকৃত শব্দের অর্থোৎপত্তিতে, অভিধানকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—"প্রাকৃত সংস্কৃতং তত্র ভবং ততো আগতং বা প্রাকৃতং।" সংস্কৃতের পর প্রাকৃত; প্রাকৃতই রূপান্তরে ভারতের অন্যান্য ভাষাকারে পরিবর্ত্তিত।

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি।

কিন্তু অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—পালি-ভাষা ভারতীয় ভাষা-সমূহের আদি স্তর; পালি-ভাষাই সংস্কৃত ভাষার প্রথম সন্ততি। পালি-ভাষার ব্যাকরণে কচ্চায়ণ (কাত্যায়ন) এই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'পালি-ভাষা হইতেই অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে; পালি-ভাষাই মূলভাষা।' সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধগণ পালি-ভাষাকে মাগধী-ভাষা বলিয়া অভিহিত করেন। পল্লী মধ্যে ঐ ভাষার ব্যবহার ছিল বলিয়া, উহার নাম পালি-ভাষা

হইয়াছিল,—প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অনেকের ইহাই সিদ্ধান্ত। * বৌদ্ধগণ তাই বলেন,—

সা মাগধী মূলভাষা নরের আদি কপ্পিত। ব্রাহ্মণ সহুটলাপ সম বুদ্ধ চ্ছাপি ভাষরে॥†

অর্থাৎ,—মাগধীই মূল ভাষা; আদি-কল্পে ব্রহ্মার মুখ হইতে ঐ ভাষা নির্গত হইয়াছিল; ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণ ঐ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন; বুদ্ধদেব ঐ ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। 'পতি-সম্বিধ-অত্থুয় (পতি-সম্বিত-অত্থুয়)' নামক পালি-গ্রন্থে লিখিত আছে. —'এই ভাষা (মাগধী) দেবলোকে, নরলোকে, নরকে, প্রেতলোকে এবং পশুজাতির মধ্যে সর্ব্বস্থলেই প্রচলিত। কিরাত অন্ধক, যোনক, দামিল প্রভৃতি ভাষা পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু মাগধী আর্য্য ও ব্রাহ্মণগণের ভাষা, এজন্য অপরিবর্ত্তনীয়, চিরকাল সমানরূপে ব্যবহৃত। মাগধী ভাষা সুগম ভাবিয়া, বুদ্ধদেব স্বয়ং সর্ব্বসাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে পিটক-নিচয় এই ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।' সিংহল-দেশবাসী বৌদ্ধগণও বলেন,—পালি-ভাষা পূর্ব্বে কথিত-ভাষা ছিল। বুদ্ধদেবের সময় হইতে উহা লিখিত-ভাষা মধ্যে গণ্য হয়।

"পিতকত্তয় পালিঞ্চ তস্সা অট্‌ঠকথঞ্চ তং। মুখপাঠেন আনেচ্ছং পুর্ব্বে ভিকখু মহামতি॥

হানিং দিথান সত্তানং তদা ভিকখু সমাগতা। চিরট্‌ঠিতথং ধম্মস্স পোত্থকেসু লিখাপয়ুং॥"

অর্থাৎ,—'মহামতি ভিক্ষুগণ পূর্ব্ব-কালে ত্রিপিটক, জাতকশ্রেণী এবং বুদ্ধদেবের আদেশ-পরম্পরা কণ্ঠস্থ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সেই সকলের সত্তা বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায়, অথচ ধর্ম্মকে চিরজাগরূক রাখিবার অভিপ্রায়ে, ভিক্ষুগণ তাহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এতদনুসারে পালি-ভাষা বুদ্ধ-জন্মের পরবর্ত্তি-কালে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, এই সকল বিরুদ্ধ-ভাবাত্মক বর্ণনা দৃষ্টে অনুমিত হয়, এক সময়ে সংস্কৃত ভাষাই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল এবং দেশ-ভেদে, সামান্য রূপান্তরে, সেই সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত, পালি, মাগধী, দ্রাবিড়ী, আস্তিকা, দাক্ষিণাত্যা প্রভৃতি নাম পরিগ্রহ করিয়াছিল। এতদনুসারে মগধ-দেশ-প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা (সংস্কৃত ভাষার রূপান্তর)—মাগধী বা পালি নামে অভিহিত হওয়া সম্ভবপর। প্রিন্সেপ, মুইর, উইলসন, বার্নুফ ও লাসেন প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন,—পালি-ভাষাই সংস্কৃত-ভাষার জ্যেষ্ঠা দুহিতা; সংস্কৃত হইতে প্রথমে পালি ভাষার উৎপত্তি হয়; পরে পালি হইতে অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, ভারতবর্ষে যে ভাষা ও বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা এতদুক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ঘোষণা-লিপি প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সকল লিপির ভাষা,

* চাইল্‌ডার্স (Childers) সাহেব পালি-ভাষার যে অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে 'পালি' শব্দের অর্থ 'শ্রেণী' লিখিত হইয়াছে; তাঁহার মতে, ঐ ভাষায় বুদ্ধদেবের জাতক-শ্রেণী লিখিত হয়, এই জন্যই উহার নাম—পালি। কেহ কেহ বলেন, মগধ-রাজ্য—পালি-ভাষার জন্মস্থান; এই জন্য উহা মাগধী নামে পরিচিত।

† এই শ্লোক-সম্বন্ধে গ্রন্থান্তরে পাঠান্তর দেখিতে পাই। যথা,—

"সা মাগধী মূলভাষা নরা চেয়াদিকপ্পিকা। ব্রহ্মাণো চস্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥"

অন্যত্র,—"সা মাগধী মূল ভাষা ন রেয় কাপিতক। ব্রাহ্মণ তসুটলাপ সম বুদ্ধচ্ছাপি ভাষরে॥"

দেশভেদে সামান্য সামান্য পরিবর্তিত হইলেও, প্রায় একই প্রকার। উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যাগিরি পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদ হইতে পূর্ব্বে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত যে ভাষা জনসাধারণের বোধগম্য ছিল, সেইরূপ ভাষাতেই অশোকের ঘোষণা-লিপি লিখিত হইয়াছিল। উচ্চারণের তারতম্য-হেতু কোথাও কোথাও সে ভাষা একটু-আধটু পরিবর্তিত হইতে পারে; কিন্তু সে ভাষা যে এক ভাষা, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। জেনারেল কানিংহাম সেই ভাষাকে যদিও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; যদিও তাঁহার মতে সে ভাষা (১) পঞ্জাবী বা পশ্চিম-ভারতের চলিত ভাষা, (২) উজ্জয়িনী বা মধ্য-ভারতের চলিত ভাষা, এবং (৩) মাগধী বা পূর্ব্ব-ভারতের চলিত ভাষা,—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে; মূলে যে সে ভাষা এক, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। ঐ তিন ভাষার মধ্যে পার্থক্য,—'পঞ্জাবী'র সহিত 'সংস্কৃতে'র একটু নিকট সম্বন্ধ, 'উজ্জয়িনী'র এবং 'মাগধী'র সংস্কৃতের সামান্য একটু দূর সম্বন্ধ। পঞ্জাবীতে 'প্রিয়দর্শী', 'শ্রমণ' প্রভৃতি স্থলে 'র'কার দৃষ্ট হয়; উজ্জয়িনীতে 'র' স্থলে 'ল' 'রাজার' পরিবর্ত্তে 'লাজা', 'দশরথ' স্থলে 'দশলথ'; এবং মাগধীতে 'র' কারের সম্পূর্ণ লোপ— 'ধর্ম্মপদ' স্থলে 'ধম্মপদ' এবং 'রাজা' স্থলে 'আজা' ইত্যাদি। এই সকল পার্থক্যের বিষয় আলোচনা করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ নির্দ্দেশ করেন, ঐ তিন ভাষা—অভিন্ন ভাষা; উহাই পালি-ভাষা। প্রিন্সেপ উহাকে স্পষ্টতঃ পালি-ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই; তাঁহার মতে, উহা সংস্কৃতের ও পালির মধ্যবর্ত্তী ভাষা। উইল্‌সন কিন্তু স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—ঐ ভাষাই পালি-ভাষা। উইলসনের সহিত লাসেনের একমত। অশোকের ঘোষণা-লিপি-সমূহ যে পালি-ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাঁহার তো মতান্তর নাই-ই; অধিকন্তু তিনি বলেন,—পালি-ভাষা সংস্কৃত-ভাষার সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠা কন্যা; সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা স্থগিত হওয়ার পর, সর্ব্বপ্রথমে পালি ভাষাই উত্তর-ভারতের কথিত-ভাষা মধ্যে গণ্য হইয়াছিল; উহাই উত্তর-ভারতের প্রাচীনতম কথিত-ভাষা। মিঃ মুইরও ঐ মতের পোষকতা করেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে যে সকল বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থ সিংহলে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার ভাষার সহিত অশোকের প্রস্তর-লিপির ভাষার সাদৃশ্য দেখিয়া, তিনি বলিয়াছেন—'উভয় ভাষাই এক ভাষা এবং উহা পালি ভাষা।' পালি ভাষা সংক্রান্ত প্রবন্ধে বার্ম্মক এবং লাসেন স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন,—সংস্কৃত ভাষা হইতে অবতরণের প্রথম সোপান—পালি-ভাষা। সেই সমৃদ্ধ ভাষার উর্ব্বর-ক্ষেত্র হইতে যে সকল ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, পালি-ভাষা তাহাদের প্রথম-স্থানীয়।'

ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের কেহ কেহ ভাষা-পরিবর্ত্তনের কয়েকটী যুগ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—'বৈদিক-যুগে ঋগ্বেদের সরল সুন্দর ভাষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক-যুগের পর মহাকাব্যের যুগ। সেই যুগে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। তৎপরে ভাষার তৃতীয় অবস্থা—যুক্তি-তর্কের যুগ। সেই সময়ে বৌদ্ধ-সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়; সূত্র-সাহিত্যের পার্শ্বে কথিত-ভাষারূপে পালি-ভাষা প্রাধান্য বিস্তার করে। সেই সময়ে [illegible] লিখিত-ভাষার এ

ভাষা-পরি-
বর্ত্তনের
যুগ।

কথিত-ভাষার মধ্যে পার্থক্য সাধিত হয়। এই যুগে ব্যাকরণের বন্ধনীর মধ্যে এক দিকে সূত্র-সাহিত্য, অন্য দিকে সরল সুন্দর কথিত ভাষা বিকাশ পায়। সেই সময়েই গৌতম-বুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচার করেন; সেই সময়েই অশোকের ঘোষণা-লিপি প্রচারিত হয়। এই তৃতীয় যুগে যে কথিত-ভাষা সাধারণ্যে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহাই পালি-ভাষার আদি-স্তর;—তাহাই মাগধী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া থাকে। তৎপরবর্ত্তী চতুর্থ যুগ—তাঁহাদের মতে, পৌরাণিক যুগ। সেই সময়েই প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হয়। পালি ভাষা সংস্কৃত-ব্যাকরণের যতটুকু অনুসরণ করে, প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত-ব্যাকরণের তাদৃশ অনুসারী নহে। অশোকের সময়ের কথিত-ভাষার সহিত কালিদাসের নাটকাদিতে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষার তুলনা করিলে, প্রথমোক্ত ভাষার পরবর্ত্তিকালে যে শেষোক্ত ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রাকৃতের পৌরাণিক যুগ অতীত হইলে, সংস্কৃত ভাষা যে পঞ্চম স্তরে উপনীত হয়, সেই ভাষা উত্তর-ভারতের হিন্দী ভাষা। হিন্দী-ভাষা রাজপুত-জাতির অভ্যুদয়ে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে, প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের অবসানে, হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে, পালি-ভাষার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইলে প্রাকৃত ভাষা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে বররুচি বৈয়াকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি প্রাকৃত-ভাষায় সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। তাহাতে তিনি প্রাকৃতের চারিটী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—(১) মহারাষ্ট্রী বা প্রাকৃত, (২) মহারাষ্ট্রীর সহিত বিশেষ সাদৃশ্য-সম্পন্ন এবং সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত—শূরসেনী, (৩) পৈশাচী, (৪) মাগধী। শেষোক্ত দুই ভাষা শূরসেনী ভাষা হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া কথিত হয়। এই সকল প্রাকৃত ভাষা প্রাচীন পালি-ভাষা হইতে উৎপন্ন এবং উত্তর-ভারতে প্রচলিত ছিল।' একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, পালি ও প্রাকৃত ভাষা অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে বটে; কিন্তু সে পার্থক্যে দুইটীকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করা যায় না। বিশেষতঃ, অনেক শব্দ প্রাকৃতে ও পালি ভাষায় একই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে; দৈবাৎ কোথাও দুই একটী বর্ণে ইতর-বিশেষ ঘটিয়াছে। সাদৃশ্য-প্রদর্শনোদ্দেশ্যে আমরা নিম্নে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাঙ্গালা এবং হিন্দী প্রভৃতি ভাষার কয়েকটী শব্দের উল্লেখ করিতেছি। যথা,—

সংস্কৃত।	পালি।	প্রাকৃত।	বাঙ্গালা।	হিন্দী।
সর্ব্ব	সব্ব	সব্ব	সব	সব
অদ্য	অজ্জ	অজ্জ	আজ	আজ
পুত্র	পুত্ত	পুত্ত	পুত্র, পুৎ	পুৎ
স্বর্ণ	সণ্‌ণ	সণ্‌ণ	স্বর্ণ	স্বরণ্
মৎস্য	মচ্ছ	মচ্ছ	মাছ	মছলি
রাজন্	রাজা	রাজা	রাজা	রাজ

সংস্কৃত শব্দ নহে; কিন্তু পালি, প্রকৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত, এরূপ কতকগুলি শব্দের উল্লেখ করিতেছি, তাহাতেও ঐ সকল ভাষার সাদৃশ্য বুঝা যাইবে। যথা,—

প্রাকৃত।—ইথী, দিট্ঠি, রুক্‌খ, কণ, বিজ্জলী, মচ্ছ, ঠাণাণি, গাভণ।
পালি।—ইথি, দিট্ঠি, রুক্‌খ, কন, বিজ্জুলা, মচ্ছ, ঠানানি, গাভন।
বাঙ্গালা।—[illegible]

বৌদ্ধগণের ধর্ম্মগ্রন্থ 'ধর্ম্মপদ' হইতে দুইটী শ্লোক, তাহার অন্বয় এবং সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছি। তদ্দ্বারা সংস্কৃত, পালি ও বাঙ্গালার পার্থক্য বুঝা যাইবে। যথা,—

পালি।—ন মোনেন মুনী হোতি মূল্‌হরূপো অবিদ্দসু। যো চ তুলং ব পগ্গয্হ বরমাদায় পণ্ডিতো॥
পাপানি পরিবজ্জেতি স মুনি তেন সো মুনি। যো মুনাতি উভো লোকে মুনি তেন পবুচ্চতি॥

অন্বয়।—মূল্‌হরূপো অবিদ্দসু (নরো) মোনেন ন মুনী হোতি; যো চ পণ্ডিতো তুলং পগ্গয্হ ব বরমাদায় পাপানি পরিবজ্জেতি স মুনী, তেন সো মুনি (হোতি); যো মুনাতি তেন (সো) উভো লোকে মুনি ইতি পবুচ্চতি।

সংস্কৃত।—মূঢ়রূপঃ (অতিমূঢ়ঃ) অবিদ্বান্ (নরঃ) মৌনেন ন মুনির্ভবতি; যশ্চ পণ্ডিতঃ তুলাং প্রগৃহ্য ইব (গৃহীত্বা ইব) বরং (মঙ্গলং, পুণ্যং) আদায় পাপানি পরিবর্জ্জয়তি, স মুনির্ভবতি, তেন স মুনির্ভবতি; য মন্যতে (বুধ্যতে) তেন (জনেন) উভয়োঃ লোকয়োঃ মুনিরিতি প্রোচ্যতে।

অনুবাদ।—অত্যন্ত মূঢ় এবং মূর্খ ব্যক্তি, কেবল মৌনের দ্বারা মুনি হয় না; কিন্তু যে পণ্ডিত ব্যক্তি, যেমন তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করেন, এবং পাপ সকল বর্জ্জন করেন, তিনি মুনি হন; এইরূপ করিয়াই তিনি মুনি হন; মনন করেন, অর্থাৎ বিচার-পূর্ব্বক যিনি কার্য্য করেন, তিনি উভয় লোকে মুনি বলিয়া কথিত হন

আর একটী পালি শ্লোক, তাহার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দৃষ্টে পালির, সংস্কৃতের ও বাঙ্গালার, পরস্পরের সম্বন্ধের বিষয় বোধগম্য হইবে;—

পালি	সংস্কৃত	বঙ্গানুবাদ
ন পুপ্‌ফগন্ধো পটিবাতমেতি	ন পুষ্পগন্ধঃ প্রতিবাতমেতি	পুষ্পের গন্ধ বায়ুর বিপরীত দিকে যায় না, চন্দন কিম্বা মল্লিকার গন্ধও
ন চন্দনং তগরমল্লিকাবা।	ন চন্দনং তগরমল্লিকেবা।	বায়ুর বিপরীত দিকে যায় না।
সতঞ্চ গন্ধো পটিবাতেমতি	সতাঞ্চ গন্ধ প্রতিবাতমেতি	সৎ-লোকের গন্ধ বায়ুর বিপরীত দিকে যায়, সৎপুরুষের গন্ধ সকল
সর্ব্বাদিশা সপ্পুরিসো পবাতি॥	সৎপুরুষঃ সর্ব্বা দিশঃ প্রবাতি॥	দিকে প্রবাহিত হয়।

প্রাকৃত, সংস্কৃত এবং বাঙ্গালার সাদৃশ্য বুঝাইবার জন্য মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' হইতে রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলা প্রভৃতির কথাবার্ত্তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

রাজা।—অয়ং স যস্মাৎ প্রণয়াবধীরণামশঙ্কনীয়াং করভোরু শঙ্কসে।
উপস্থিতস্বাং প্রণয়োৎসুকো জনো ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতেহি তৎ॥—(সংস্কৃত)

রাজা।—হে করোভরু! যাহা হইতে সংস্কৃত প্রার্থনায় অসম্ভবনীয় অবজ্ঞার আশঙ্কা করিতেছ, সেই প্রণয়োৎসুক ব্যক্তি তোমার সন্নিকটেই উপস্থিত রহিয়াছে। সুন্দরি! তুমি জানিও যে, রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না; কিন্তু রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করিয়া থাকে।—(অনুবাদ)

সখ্যৌ।—অই অত্তগুণাবমাণিণি! কো ণাম সন্দাবণির্ব্বাণহেতুঅং সারদীঅং জোণ্হং আদবত্তেণ ণিবারেদি।—(প্রাকৃত)

সখীদ্বয়।—আত্মগুণাবমানিনি! কোন্ ব্যক্তি সন্তাপনিবারিণী শারদীয় জ্যোৎস্নাকে আতপত্রে নিবারণ করিয়া থাকে?—(অনুবাদ)

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের আর এক অংশের প্রাকৃত, তাহার সংস্কৃত এবং বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা ঐ তিন ভাষার সাদৃশ্য বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে। যথা,—

প্রাকৃত	সংস্কৃত	বঙ্গানুবাদ
হলা সউন্দলে! ইঅং সঅংবর-বহূ সহআরস্স তুএ কিদণামহেআ বণজোসিণি ত্তি ণোমালিআ। এদং বিসুমরিদাসি।	অয়ি শকুন্তলে! ইয় স্বয়ংবরবধূ সহকারস্য ত্বয়া কৃতনামধেয়া বনজ্যোৎস্না ইতি নবমালিকা। এনাং বিস্মৃতাসি।	অয়ি শকুন্তলে! সহকার তরুর এই স্বয়ম্বর-বধূ নবমালিকা তোমা-কর্ত্তৃক বনজ্যোৎস্না এইরূপ কৃত-নামধেয়া। তুমি কি ইহাকে বিস্মৃত হইয়াছ?

অধিক দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। কেবল সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, বাঙ্গালা বা হিন্দীর কথা বলি কেন, ভারতবর্ষের সকল ভাষাই পরস্পর সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ আছে।

এক সময়ে ভারতবর্ষের ভাষা-সমূহ 'পঞ্চ-গৌড়' ও 'পঞ্চ-দ্রাবিড়' সংজ্ঞায় প্রধানতঃ দশটী বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। স্কন্দপুরাণে পঞ্চ-গৌড় শব্দে লিখিত হইয়াছে,—"সারস্বতাঃ

পঞ্চ-গৌড় ও পঞ্চ-দ্রাবিড়।

কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চগৌড় ইতি খ্যাতা বিন্ধ্য-স্যোত্তরবাসিনঃ॥" অর্থাৎ,—বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উত্তরস্থিত সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল, উৎকল,—এই পঞ্চ-দেশ পঞ্চগৌড় নামে অভিহিত হইত। অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয়, ঐ পঞ্চ-গৌড়ে পঞ্চবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল। এইরূপ পঞ্চ-দ্রাবিড় বলিতে—("কার্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরারাষ্ট্রবাসিনঃ। আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়া পঞ্চ বিন্ধ্য-দক্ষিণবাসিনঃ॥")—বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণস্থিত দ্রাবিড়, কর্ণাট, গুজ্জরাট, মহারাষ্ট্র এবং তৈলঙ্গকে বুঝাইত। ঐ পাঁচ প্রদেশে পঞ্চবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল,—এইরূপ উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই পঞ্চ-গৌড় ও পঞ্চ-দ্রাবিড়ের দশবিধ প্রাচীন ভাষার স্বরূপ-তত্ত্ব নির্ণয় করা অধুনা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্রাবিড়ী-ভাষার ব্যাকরণ প্রসঙ্গে ডাঃ কল্‌ডওয়েল বলিয়াছেন,—'পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ভারতের প্রচলিত ভাষা-সমূহকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং তাহার প্রতি ভাগে পাঁচটী করিয়া ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। পঞ্চ-গৌড়ীয় এবং পঞ্চ-দ্রাবিড়ী নামে সেই ভাষা-সমূহ পরিচিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণের কথিত গৌড়ীয়-ভাষা শব্দে উত্তর-ভারতের ভাষা সমূহকে বুঝায়। সেই ভাষা-সমূহের মধ্যে বাঙ্গালা বা গৌড়ীয় ভাষা সর্ব্বপ্রধান। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালা, উড়িয়া, হিন্দী এবং হিন্দীর উপবিভাগ-সমূহ (অর্থাৎ হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, সৈন্ধবী, গুজরাটী এবং মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি) এই গৌড়ীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত। এই গৌড়ীয় ভাষার মধ্যে কাশ্মীরি, মাড়োয়ারী, আসামী এবং নেপালের বিচারালয়ে প্রচলিত ভাষাকে গণ্য করা যাইতে পারে। তাহাতে গৌড়ীয় ভাষার সংখ্যা পাঁচটীর পরিবর্ত্তে এগারটী দাঁড়ায়। 'পঞ্চ দ্রাবিড়ী' ভাষা বলিতে পণ্ডিতগণ তেলিঙ্গ, কার্ণাটিক, মারাটি, গুর্জ্জর এবং দ্রাবিড়ী বা তামিল ভাষাকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শব্দকল্পদ্রুমেও ঐরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাটীকে ভ্রমক্রমে ঐ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রী এবং গুজরাটী ভাষা যদিও কোনও কোনও অংশে দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত সম্বন্ধযুক্ত; যদিও মহারাষ্ট্রী ভাষার মধ্যে দ্রাবিড়ী ভাষার ধাতু-প্রত্যয় ও শব্দ সামান্য-ভাবে বিদ্যমান আছে, এবং গুজরাটী ভাষার সহিত দ্রাবিড়ী ভাষার একটু-আধটু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে দ্রাবিড়ী ভাষা যে ঐ দুই ভাষার মূল, তাহা বলা যায় না; বরং ঐ দুই ভাষাকে আধুনিক ভাষা-সমূহের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। তবে ঐ দুই ভাষার সহিত দ্রাবিড়ী ভাষার যে সামান্য সাদৃশ্য দেখিতে পাই, তাহার কারণ,—কর্ণাটিক বা কেনারি এবং তেলিঙ্গ বা তেলেগু ভাষা-ভাষী দেশের অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে ঐ দুইটা ভাষা প্রচলিত। [illegible] দ্রাবিড়ী ভাষার অন্তর্গত অপর তিনটী ভাষা (অর্থাৎ কার্ণাটিক বা কেনারি, তেলিঙ্গ বা তেলেগু এবং দ্রাবিড়ী বা তামিল, এই—যে তিনভাষা) পরস্পর এমনই সম্বন্ধযুক্ত

[illegible] ভাষার [illegible] বলিয়া মনে [illegible]

[illegible] 'তুলু' ভাষার বিষয়, বোধ হয়, অনেকেই অপরিজ্ঞাত ; [illegible] কেনারি ভাষার মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। তুড়া, কোটা, গোন্দ্ এবং খোন্দ্ [illegible] দাক্ষিণাত্যের অপর কয়েকটা ভাষার উল্লেখ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। [illegible] পণ্ডিতগণ ঐ সকল ভাষার বিষয়ে বোধ হয় অনভিজ্ঞ ছিলেন, অথবা ঐ সকল ভাষার উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই।' * পঞ্চ-দ্রাবিড়ী ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনার পর, কল্‌ড্‌ওয়েল বলিয়াছেন,—মূল দ্রাবিড়ী ভাষা হইতে নিম্নলিখিত দ্বাদশটী ভাষার (ছয়টী প্রচলিত ও উন্নতিশীল এবং ছয়টী অপ্রচলিত ও ঔৎকর্ষ-বিহীন) উৎপত্তি হ য়াছে ;—

প্রচলিত উন্নতিশীল ভাষা।	অপ্রচলিত ঔৎকর্ষ বিহীন ভাষা।
(১) তামিল।	(১) তুড়া।
(২) মলয়ালম।	(২) কোটা।
(৩) তেলেগু।	(৩) গোন্দ।
(৪) কেনারি।	(৪) খোন্দ বা কু।
(৫) তুলু।	(৫) ওরাওন।
(৬) কুড়াগু বা কুর্গ।	(৬) রাজমহল বা মালের।

কল্ডওয়েলের গ্রন্থে, দ্রাবিড়ী-ভাষা হইতে উল্লিখিত দ্বাদশটী ভাষার উৎপত্তির বিষয় লিখিত হইলেও সে মত কিন্তু সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয় নাই। মূল দ্রাবিড়ী-ভাষা হইতে যে সকল ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু গ্রিয়ারসন সাহেব † ভাষা-তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে, নিম্নলিখিতরূপ মানচিত্রে, সেই সকল ভাষার এইরূপ সম্বন্ধের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—

কল্ডওয়েলের সহিত গ্রীয়ারসনের মত-পার্থক্যের বিষয় উদ্ধৃত তালিকাদ্বয়েই প্রতীত হইবে। গ্রীয়ারসনের গ্রন্থ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রিশ বৎসরের ব্যবধানেই

* Vide Rev. Robert Caldwell, D. D. L. L. D. *A Comparitive Grammer of the Dravadian Languages.*

† George A. Grierson, M. A. C. I. E. *Linguistic Survey of India.*

[illegible]

পরিচয়ে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—নীলগিরি পর্ব্বতের 'তুদা' বা 'তুদাবস্' নামক অসভ্য জাতির ভাষা—'তুদা'। ঐ পর্ব্বতস্থিত 'কোটা' নামক জাতির ভাষা 'কোটা'। মধ্য-ভারতের আরণ্য-প্রদেশে, বিন্ধ্য-পর্ব্বত হইতে গোদাবরী নদীর তীর-মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে, যে 'গোন্দ' জাতি বাস করে, তাহাদের ভাষা 'গোন্দ'; ছোটনাগপুরে এবং তাহার পারিপার্শ্বিক স্থান-সমূহে প্রচলিত ভাষার নাম—'ওরাওন'। মালের বা রাজমহল ভাষা—পাহাড়িয়াদিগের ভাষা। কিম্বদন্তী, বাঙ্গালার রাজমহল বিভাগ হইতে কতকগুলি পাহাড়িয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়া বাস করায়, ঐ ভাষা তদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। এই সকল ভাষা ব্যতীত ভারতবর্ষের অসভ্য-জাতিগণের মধ্যে প্রচলিত আরও কয়েকটী ভাষার বিষয় কল্ডওয়েল উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে ভাষা কয়েকটি এই,—(১) হো, (২) মুণ্ডা, (৩) সবর, (৪) কোলারী, (৫) বোড়ো, (৬) ধিমাল (কুমায়ুন ও আসামে প্রচলিত) এবং (৭) নিষাদ-ভাষা। বলা বাহুল্য, কল্ডওয়েল 'দ্রাবিড়ী ভাষার ব্যাকরণ' লিখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভাষা-সমূহের বিষয়ই প্রধানতঃ লিখিত হইয়াছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভাষার বিষয় বিশদভাবে লিখিবার তাঁহার আবশ্যক হয় নাই; সুতরাং তিনি সেই সকল ভাষার তালিকা সংগ্রহের পক্ষে চেষ্টাও পান নাই। অধিকন্তু, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কল্ডওয়েলের 'দ্রাবিড়ী ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহার পর পঁয়ত্রিশ বৎসরের অনুসন্ধানে ভারতবর্ষের আরও বহু ভাষার অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে।

ভারতের বর্ত্তমান ভাষাসমূহ।

বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের 'আদম্-সুমারিতে' (Census Report) প্রকাশ,—ভারতবর্ষে অন্যূন ১৪৭টি ভাষা প্রচলিত আছে। * সেই সকল ভাষা, 'আদম-সুমারীর' কার্য্যাধ্যক্ষ রিজলে সাহেবের মতে, প্রধানতঃ সাতটী ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তিনি সেই সাত ভাগে অন্তর্গত চারি ভাগের মধ্যে আটটী উপবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া, সেই সকল উপবিভাগের কোনটীতে দুইটী, কোনটীতে দশটী, কোনটীতে উন-আশীটী পর্য্যন্ত ভাষার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তৎকৃত ভাগ ও উপবিভাগ এবং কত লোক কোন্ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, তাহার পরিচয় পৃষ্ঠান্তরে দ্রষ্টব্য।

---

* এই ১৪৭টী ভাষার উল্লেখে যে ভারতবর্ষের সকল ভাষার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা নহে। ইংরেজাধিকৃত আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, খাত, কোহিস্থান, চিত্রল, হুঞ্জা-নগর এবং ব্রহ্মদেশের কতকগুলি বন্যজাতির ভাষার নাম ঐ তালিকার অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই। অধিকন্তু কতকগুলি বন্যজাতির ভাষা সংগৃহীত হইতে পারে নাই। রিপোর্টে তাই প্রকাশ,—"The Census of 1901 does not cover the whole of India, and for some of the wildest and most polyglot tracts no language figures are available. Even allowing for this no less than 147 languages have been recorded as vernaculars in the Indian Empire."—Vide, *Census Report of 1901, India*.

যে যে ভাষাকে পূর্ব্বোক্ত বিভাগ ও উপবিভাগ-সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সেই সকল ভাষার নাম এবং ভারতের কোন্ কোন্ প্রদেশে সেই সকল ভাষা প্রধানতঃ প্রচলিত, আদম-শুমারীর কার্য্য-বিবরণী হইতে নিয়ে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল;—

বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা ও উপশাখা।	থাক	ভাষার নাম।	যে দেশে প্রধানতঃ প্রচলিত।
(A) মালয়-পোলিনিশীয় বিভাগ।	মালয় থাক	সেলুঙ বা সেলোন	ব্রহ্ম-দেশ।
		নিকোবরী	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।
(B) ইন্দো-চীন * বিভাগ।		...	...
(১) মংখমার উপবিভাগ।		মন্, তেলেং বা পেগু	ব্রহ্ম-দেশ
		পালাউঙ্	„
(২) তিব্বতী-ব্রহ্ম উপবিভাগ		ওয়া	„
		খাশী	আসাম
(ক) তিব্বতী-হিমালয় শাখা		'তিব্বতীয়' অর্থাৎ তিব্বত-দেশের 'ভুটিয়া'	যুক্ত-প্রদেশ, বঙ্গদেশ এবং কাশ্মীর
		'বাল্‌টি' অর্থাৎ বাল্‌টি-স্থানের 'ভুটিয়া'	কাশ্মীর-রাজ্য
		'লাদখী' অর্থাৎ লাদক প্রদেশের 'ভুটিয়া'	পঞ্জাব
		শার্পা ভুটিয়া	বঙ্গদেশ
		'দেন্‌জোং-কে' বা সিকিম-রাজ্যের 'ভুটিয়া'	বঙ্গের দেশীয়-রাজ্য সমূহ
		'হ্লোকে' অর্থাৎ ভুটান-রাজ্যের 'ভুটিয়া'	পঞ্জাবের দেশীয়-রাজ্য, পঞ্জাব এবং বঙ্গদেশ
		ভুটিয়া (অন্যান্য)	কাশ্মীর-রাজ্য।
		লাহুলি	পঞ্জাব
		কানাওয়ারী বা মুলতানী	„
		কামী	আসাম
		ভ্রামু	„
		পাখি, পাঠী বা পাহি	„

* ইন্দো-চীন ভাষার উৎপত্তি—চীনের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে; ইয়াং-সি-কিয়াং এবং হোয়াং-হো নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ ইন্দো-চীন ভাষার আদি-কেন্দ্র। ঐ প্রদেশ হইতে যে সকল জাতি ভারতবর্ষে এবং আসামে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের ভাষা—ইন্দো-চীন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা ও উপশাখা।	থাক	ভাষার নাম	যে দেশে প্রধানতঃ প্রচলিত।
(B) ইন্দো-চীন-বিভাগ।		হায়ু বা বায়ু	আসাম
(ক) তিব্বতী-হিমালয় শাখা		কিরান্তি (খাম্বু বা জিন্দার)	বঙ্গদেশ
(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)		কিরান্তি (যথ)	„
		কিরান্তি (অন্যান্য)	আসাম
		গুরুঙ্	বঙ্গদেশ ও আসাম
		সুনুয়ার	বঙ্গদেশ
		থামি	„
		মাজুর	বঙ্গদেশ ও আসাম
		নেওয়ারী	বঙ্গদেশ
		মুর্মি	„
		মান্ঝি	„
		রঙ্গ বা' লেপ্‌চা	„
		লিম্বু	„
		ধিমাল	„
(খ) উত্তর-আসামীয় শাখা		আকা	আসাম
		দাফ্‌লা	„
		আবোর-মিরি	„
		মিশমি	„
(গ) আসাম-ব্রহ্ম শাখা	(i) বোড়া-থাক	বোড়া বা প্লেন্‌স্ কাচরী	বঙ্গদেশ ও আসাম
		লালুং	আসাম
		দিমা-সা ও ছুটিয়া	„
		গারো	আসাম ও বঙ্গদেশ
		রাভা	আসাম
		তিপুরা বা মুরুং	বঙ্গদেশ ও আসাম
		মোরান্	আসাম
	(ii) নাগা থাক	মিকির	„
	(a) নাগা-বোড়া উপথাক	এম্পিও বা কচ্ছ-নাগা	„
		কাবুই	„
	(d) পশ্চিম-নাগা উপথাক	আংগামী	আসাম
		কেজহামা	„
		রেংমা ও সোমা	„

বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা ও উপশাখা।	থাক	ভাষার নাম।	যে দেশে প্রধানতঃ প্রচলিত।
(B) ইন্দো-চীন-বিভাগ। (গ) আসাম-ব্রহ্ম শাখা। (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)	(c) মধ্য-নাগা উপথাক	এও	আসাম
		হ্লোটা বা সোন্‌সু	,,
		থুকুমি	,,
		যুচুমি	,,
	(p) পূর্ব্ব-নাগা উপথাক	তাবুলেং	আসাম
		তামলু	,,
		মোস্থুং	,,
	(e) নাগা (শ্রেণী বহির্ভূত)	...	আসাম
	(iii) কুকী-চীন থাক (a) মেথি-উপথাক	মাম্পুরী, মেথে, কাথি বা পোনস্থ	আসাম ও বঙ্গদেশ
	(b) প্রাচীন-কুকী উপথাক	রংখোল	আসাম
		হালাম	বঙ্গদেশ
		অস্ত্রো	যুক্ত-প্রদেশ
		ক্ষার	আসাম
		চও	ব্রহ্মদেশ
	(c) উত্তর-চীন উপথাক	থাড়ো বা জংশেন	আসাম
		সেইরং	,,
	(d) মধ্য-চীন উপথাক	জাহাও	আসাম
		লুসাই বা হুলিয়েন	,,
		বাঞ্জোগি	বঙ্গদেশ
		পাংখু	,,
	(e) দক্ষিণ-চীন উপথাক	যিন্দি	ব্রহ্মদেশ
		খিয়েং	বঙ্গদেশ
		খামি, খোয়েইমি বা কুমি	ব্রহ্মদেশ
		আন্নু	,,
		থাউ	,,
	শ্রেণী-বহির্ভূত ভাষা-সমূহ	কুকি (অনির্দ্দিষ্ট)	আসাম ও ব্রহ্মদেশ
		চীন (অনির্দ্দিষ্ট)	ব্রহ্মদেশ

বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা ও উপশাখা।	থাক	ভাষার নাম।	যে দেশে প্রধানতঃ প্রচলিত।
(B) ইন্দো-চীন বিভাগ। (গ) আসাম-ব্রহ্ম শাখা। (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর।)	(iv) কাচীন থাক	কাচীন বা সিংফো	ব্রহ্মদেশ
	(a) কাচীন		
	(b) কাচীন-ব্রহ্ম মিশ্রভাষা	জি-লিপাই	ব্রহ্মদেশ
		লাশি	”
		মারু	”
		মেংথু	”
	(c) অন্যান্য মিশ্রভাষা	...	...
	(v) ব্রহ্ম থাক	ব্রু	বঙ্গদেশ ও ব্রহ্মদেশ
		বার্মিজ	ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গদেশ
(৩) শ্যাম-চীন উপবিভাগ	(i) সিমিতিক থাক	কারেন	ব্রহ্মদেশ
	(ii) তাই থাক	শ্যাম ভাষা	ব্রহ্মদেশ
		লু	”
		খুণ	”
		শান	”
		ফাকিয়াল	আসাম
		নোরা	”
		তাই-রোং	”
		ঐতোন	”
(C) দ্রাবিড়ী-মুণ্ডা বিভাগ		...	...
(১) মুণ্ডা উপবিভাগ		সাঁওতালী বা হোর	বঙ্গদেশ ও আসাম
		কোল	”
		কুয়া	বঙ্গদেশ
		খারিয়া	বঙ্গদেশ ও মধ্য-প্রদেশ
		জুয়াং বা পাটনা	বঙ্গের দেশীয়-রাজ্য
		আসুর	বঙ্গদেশ
		কোরা বা কোড়া	”
		গাড়াল	মাদ্রাজ
		শবর	”
		কোর্কু	মধ্য-প্রদেশ ও বেরার
		তামিল বা আরারা	মাদ্রাজ ও মহীশূর
		মলয়ালম্	মাদ্রাজ

বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা ও উপশাখা।	থাক	ভাষার নাম।	যে দেশে প্রধানতঃ প্রচলিত।
(C) দ্রাবিড়ী-মুণ্ডা-বিভাগ।		...	...
(২) দ্রাবিড়ী উপবিভাগ (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)		তেলেগু বা অন্ধ্র	মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ এবং মহীশূর
		কেনারি	বোম্বাই, মহীশূর, মাদ্রাজ এবং হায়দ্রাবাদ
		কোড়াগু বা কুর্গী	কুর্গ
		তুলু	মাদ্রাজ
		তোড়া	„
		কোটা	„
		গোন্দ	মধ্য-প্রদেশ, বেরার ও হায়দ্রাবাদ
		কন্ধ বা কুই	মাদ্রাজ, মধ্য-প্রদেশ ও বঙ্গদেশ
		কুরুখ বা ওরাওন	বঙ্গের দেশীয় রাজ্য
		মালহর, মাল্তো বা মালের	বঙ্গদেশ
		ব্রাহুই	বোম্বাই
D ইন্দো-ইউরোপীয় * বিভাগ		...	...
(১) এরিয়ান উপবিভাগ।			
(ক) ইরাণীয় শাখা	(i) প্রাচ্য থাক	বেলোচ	বোম্বাই ও পঞ্জাব
		পশ্তু	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাব
		জুন্জানি বা মুংগা	আসাম
(খ) ভারতীয় শাখা	(i) শিনা-খোয়ার থাক	খোয়ার, আর্নীয় বা চাত্রারি	কাশ্মীর রাজ্য
(১) অসংস্কৃত উপশাখা		শিনা	„
(২) সংস্কৃত উপশাখা	(i) সংস্কৃত থাক	সংস্কৃত	মাদ্রাজ ও মহীশূর
	(ii) উত্তর-পশ্চিম থাক	কাশ্মীরী	কাশ্মীর রাজ্য
		কোহিস্থানী	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ
		লাহণ্ডা	পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ
		সিন্ধী।	বোম্বাই

* ইন্দো-ইউরোপীয় বিভাগ (Indo-European Family) শব্দে সংস্কৃত এবং তৎসংশ্লিষ্ট ভারতীয় ভাষা-সমূহকে বুঝাইয়া থাকে; পারসীক, গ্রীক, লাটিন এবং টিউটনিক, কেল্টিক, স্লাভোনিক প্রভৃতি য়োরোপীয় ভাষা ও তাহাদের উপভাষা-সমূহ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা ও উপশাখা।	থাক।	ভাষার নাম।	যে দেশে প্রধানতঃ প্রচলিত।
(D) ইন্দো-ইউরোপীয় বিভাগ। (১) এরিয়ান উপবিভাগ। (২) সংস্কৃত উপ-শাখা। (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)	(iii) দক্ষিণ থাক	মারাটি	বোম্বাই, বেরার, মধ্য-প্রদেশ এবং হায়দ্রাবাদ
	(iv) পূর্ব্ব-থাক	উড়িয়া	বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ এবং মধ্য-প্রদেশ
		বেহারী	বঙ্গদেশ ও যুক্ত-প্রদেশ
		বঙ্গভাষা	বঙ্গদেশ ও আসাম
		আসামী	আসাম
	(v) মধ্য-থাক	পূর্ব্বদেশীয় হিন্দী	যুক্তপ্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ ও মধ্যভারত
	( ) পশ্চিম-থাক	পশ্চিম-দেশীয় হিন্দী	যুক্ত-প্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতনা, মধ্য-ভারত, মধ্য-প্রদেশ এবং হায়দ্রাবাদ
		রাজস্থানী	রাজপুতনা, মধ্য-ভারত, মধ্য-প্রদেশ, পঞ্জাব ও বোম্বাই
		গুজরাটি	বোম্বাই, রাজপুতনা, মধ্য-ভারত ও বরোদা
	গুজরাটির অন্তর্গত	ভিল	মধ্য-ভারত ও রাজপুতনা
		খান্দেশী	বোম্বাই
		পঞ্জাবী	পঞ্জাব ও কাশ্মীর
	(vii) উত্তর-থাক	পশ্চিম পাহাড়ী	পঞ্জাব, কাশ্মীর
		মধ্য পাহাড়ী	যুক্তপ্রদেশ
		পূর্ব্ব-পাহাড়ী বা নৈপালী	বঙ্গদেশ, আসাম এবং যুক্তপ্রদেশ
(E) সেমিটিক * বিভাগ		আরবী	হায়দ্রাবাদ ও বোম্বাই

* বাইবেলের মতে নোয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সেম (Sem or Shem)। সেমের বংশধরগণ যে যে দেশে বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশ সেমিটিক দেশ নামে পরিচিত। সেম-বংশীয়গণের ভাষা—হিব্রু, ফিনিসীয়, আরবী, আবিসিনীয়, কালডীয়, আসিরীয় এবং বাবিলোনীয়। ঐ সকল ভাষা বা তাহাদের উপভাষাও এই সেমিটিক (Semitic) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।

বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা ও উপশাখা।	থাক	ভাষার নাম।	যে দেশে প্রধানতঃ প্রচলিত। *
(F) হেমিটিক * বিভাগ ...		সোমালি	বোম্বাই
শ্রেণী-বহির্ভূত ভাষা	...	আন্দামানি	আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
		পরিভ্রমণকারী জাতির ভাষা-সমূহ	হায়দ্রাবাদ, বেরার, বোম্বাই, মধ্য-ভারত ও মহীশূর
		অন্যান্য	আজমীড়-মাড়োয়ার
(D) ইন্দো-ইউরোপীয় বিভাগ		...	...
	(i) ইরাণী † থাক	পারসী	বোম্বাই, পঞ্জাব ও মহীশূর
		ওয়াখী	আসাম
	(ii) আর্ম্মাণীয় থাক	আর্ম্মাণী	বঙ্গদেশ
(F) সেমেটিক বিভাগ	(i) উত্তর থাক	হিব্রু	বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও ব্রহ্মদেশ
(F) হেমেটিক বিভাগ	(i) ইথিওপীয় থাক	সিরীয়	মালবর উপকূল
		আফ্রিকার চলিত ভাষা	দুইজন মাত্র ‡
		দানকালি	বোম্বাই
		আবিসিনীয়	"
(A) ইন্দো-ইউরোপীয় বিভাগ	(i) গ্রীক থাক	গ্রীক (রোমীয়)	বোম্বাই
	(ii) রোমীয় থাক	ইতালীয়	বোম্বাই ও বঙ্গদেশ
		লাটিন	মধ্য-প্রদেশ
		মালতোজ	বোম্বাই
		রুমাণীয়	ভারতে একজন মাত্র ‡
		ফরাসী	মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও বঙ্গদেশ
		স্পেনীয়	বোম্বাই ও বর্ম্মা
		পর্ত্তুগীজ	বোম্বাই ও মান্দ্রাজ

* নোয়ার কনিষ্ঠ পুত্র হামের (Ham) বংশধরগণ—'হেমিটিক' (Hamitic) সংজ্ঞা লাভ করেন। আফ্রিকার ইথিওপীয়গণ হামের বংশধর বলিয়া কথিত হন। আফ্রিকার কপ্‌টিক (Cuptic), ইথিওপীয় (Ethiopian) ও আবিসিনীয় (Abyssinian) প্রভৃতি ভাষা ও তাহাদের উপভাষা-সমূহ 'হেমিটিক' ভাষা বলিয়া পরিচিত।

† ইরাণ (Iran) বা পারস্ত-দেশীয় জনগণের প্রাচীন ভাষা—ইরাণীয় ভাষা নামে অভিহিত। পারসীক, জেন্দ এবং তদানুসঙ্গিক ভাষা-সমূহ ইরাণীয় ভাষা বলিয়া কথিত হয়।

‡ বলা বাহুল্য, যে দিন আদম-সুমারির লোক গণনা হয়, এ সকল সেই দিনের হিসাব।

বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা ও উপশাখা।	থাক	ভাষার নাম।	যে দেশে প্রধানতঃ প্রচলিত।
ইন্দো-ইউরোপীয় বিভাগ। (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)	(iii) কেলটিক থাক	ওয়েলস্	আসাম
		গেলিক (স্কচ)	মহীশূর
		আইরিস	যুক্ত-প্রদেশ
	(iv) বাল্‌তো-শ্লাভনিক থাক	রুশীয়	বোম্বাই
		বোহেমীয় (জেচ)	মাদ্রাজ (এক জন মাত্র)
		পোলীস	বঙ্গদেশ ও মহীশূর (দুই জন মাত্র কথা কহে)
	(v) টিউটনিক থাক	ইংরেজী	সর্ব্বত্র
		দিনেমার	"
		ফ্লেমিশ	"
		নরওয়ে-দেশীয়	বোম্বাই
		সুইডিস	ব্রহ্মদেশ ও মাদ্রাজ
		ডেনিস	মাদ্রাজ ও বোম্বাই
		জর্ম্মণ	বোম্বাই, বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ ও ব্রহ্মদেশ
(B) মঙ্গোলীয় বিভাগ	(i) উরাল-আলতাই থাক	ফিনিশ	এক জন মাত্র
		হাঙ্গেরীয় (মেগিয়ার)	বঙ্গদেশ ও বোম্বাই
		তুরস্কদেশীয় চলিত ভাষা	বোম্বাই
	(ii) জাপানী থাক	জাপানী	বোম্বাই ও ব্রহ্মদেশ
	(iii) এক-শব্দাংশিক থাক	চীনা	বঙ্গদেশ ও ব্রহ্মদেশ
(B) মালয়-পোলানেশীয়	(i) মালয় থাক	জাভানি	এক জন মাত্র
		মালয়	ব্রহ্মদেশ
বান্টু বিভাগ		সোহায়িলী (জাঞ্জিবরী)	বোম্বাই
		সিদি	মধ্যপ্রদেশ

কোন্ প্রদেশে কোন্ ভাষার কোন্ শাখার প্রচলন, পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকায় তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে। তবে সে তালিকাও যে সম্পূর্ণ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। এক বঙ্গদেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই সে তত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। বঙ্গদেশে একটী প্রবাদ আছে, যোজনান্তে (দ্বাদশ ক্রোশ অন্তরে) ভাষার পরিবর্ত্তন হয়। বঙ্গদেশের কথিত-ভাষার বিষয় আলোচনা করিলে, এ প্রবাদ অনর্থক প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গবর্ণমেণ্টের বিবরণীতেই বঙ্গদেশ-প্রচলিত ভাষাকে প্রধানতঃ চতুর্দ্দশ বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সেই

ভাষা ও উপভাষা।

সকল বিভাগের মধ্যে প্রধান ছয়টী এবং অপ্রধান বিভাগ আটটি। প্রধান বিভাগ ছয়টি এই;—(১) কেন্দ্রস্থানীয় বাঙ্গালা (Central Bengalee) অর্থাৎ যে বাঙ্গালা চব্বিশ-পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী এবং হাওড়ায় প্রচলিত; (২) রাঢ়ীবুলি বা পশ্চিমা বাঙ্গালা, অর্থাৎ যে বাঙ্গালা বৰ্দ্ধমান, বীরভূম, বাকুড়া, সাঁওতাল-পরগণা, মানভূম এবং সিংহভূম জেলায় প্রচলিত; (৩) উত্তরায় বাঙ্গালা, অর্থাৎ যে বাঙ্গালা মালদহ জেলায় এবং রংপুর ও জলপাইগুড়ি ভিন্ন রাজসাহী বিভাগের সর্ব্বত্র প্রচলিত; (৪) রংপুরী বা রাজবংশী, অর্থাৎ যে বাঙ্গালা রংপুর, জলপাইগুড়ী এবং কুচবিহার রাজ্যে প্রচলিত; (৫) পূর্ব্বদেশীয় এবং মুসলমানী বাঙ্গালা, অর্থাৎ যশোহর, খুলনা, ত্রিপুরা এবং ঢাকা বিভাগে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা; (৬) চাটগাঁই, অর্থাৎ ত্রিপুরা ভিন্ন চট্টগ্রাম বিভাগে প্রচলিত বঙ্গভাষা। উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রধান ভাষা ভিন্ন বাঙ্গালায় আর যে আট প্রকার ভাষায় কথাবার্ত্তা হয়, তাহা এই,—(১) পূর্ব্ব-মধ্য প্রাদেশিক বাঙ্গালা, অর্থাৎ যে পূর্ব্বদেশীয় বঙ্গভাষা যশোহর, খুলনা এবং ফরিদপুর অঞ্চলে প্রচলিত; (২) দক্ষিণ-পশ্চিমা বাঙ্গালা, অর্থাৎ যে মিশ্রিত বাঙ্গালা মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্যবহৃত হয়; (৩) চাকমি বাঙ্গালা, অর্থাৎ যে বাঙ্গালা ব্রহ্মদেশীয় অর্দ্ধবৃত্তাকার অক্ষরে লিখিত এবং চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রচলিত; (৪) হাজাং, অর্থাৎ যে মিশ্রিত বাঙ্গালা ময়মনসিংহ-জেলার গারো-বংশীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত; (৫) কিষণগাঞ্জয়া বা শ্রীপুরিয়া, অর্থাৎ হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার মিশ্রণে পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বাঞ্চলে যে বাঙ্গালা প্রচলিত; (৬) মাল-পাহাড়িয়া, অর্থাৎ বঙ্গভাষার যে ভাঙ্গাবুলি সাঁওতাল পরগণার বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী আদিম অধিবাসী-দিগের মধ্যে প্রচলিত; (৭) খারিয়া-থার, অর্থাৎ যে অপভ্রংশ বাঙ্গালা বুলি বীরভূমের খারিয়াদিগের মধ্যে প্রচলিত; (৮) পোহিয়া-থার, অর্থাৎ মানভূম জেলায় পোহিরা জাতির মধ্যে যে বাঙ্গালা প্রচলিত। প্রধান-অপ্রধানে বাঙ্গালা-ভাষা এইরূপ চতুর্দ্দশ বিভাগে বিভক্ত হইলেও, সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, উহার মধ্যে আরও যে বহু ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই সকল ভাষার মধ্যে মাত্র দুই প্রকার ভাষা লিখিত-ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়; প্রথম, সাধারণ বাঙ্গালা; দ্বিতীয়, মুসলমানী বাঙ্গালা। সাধারণ বাঙ্গালাতেই সাহিত্যের সর্ব্ব অঙ্গ পরিপুষ্ট হইতেছে। মুসলমানী বাঙ্গালা ত প্রধানতঃ মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থাদিই প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেমন বাঙ্গালা-ভাষার মধ্যে নানা বিভাগ, হিন্দী-ভাষার মধ্যেও সেইরূপ বিভাগের অবধি নাই। হিন্দী-ভাষা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত;—(১) পশ্চিমা-হিন্দী, (২) পূর্ব্ব-দেশীয় হিন্দী, (৩) রাজস্থানী হিন্দী। পূর্ব্ব-দেশীয় হিন্দীর মধ্যে একটা শাখা—বিহারী। কিন্তু সেই বিহারী আবার কত উপবিভাগেই বিভক্ত হইয়াছে! মুদ্রিত গ্রন্থাদিতে বিহারীর তিনটী প্রধান বুলি দেখিতে পাই—(১) মৈথিলী বা তিরহুতিয়া, (২) মাগধী বা মাঘাই, এবং (৩) ভোজপুরী। মৈথিলী-ভাষা প্রধানতঃ দ্বারবঙ্গ ও ভাগলপুর জেলায় এবং পূর্ণিয়ার পশ্চিমাংশে উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত। প্রাচীন মিথিলার নামানুসারে মৈথিলী-ভাষার নামকরণ হইয়াছিল। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে গঙ্গা-নদী, পশ্চিমে গণ্ডক এবং পূর্ব্বে কুশী,—

প্রধানতঃ এই সীমানার মধ্যে মৈথিলী-ভাষা প্রচলিত। ঐ প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের আদেশে সরকারী কাগজ-পত্রে অধুনা 'কাইথি' অক্ষর প্রচলিত হইলেও, মিথিলার ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন মৈথিলী বর্ণমালার অনুসরণেই গ্রন্থ-পত্র লিখিয়া থাকেন। * মিথিলা-প্রদেশের মুসলমান-গণের মধ্যে কিন্তু মৈথিলী-ভাষার প্রচলন নাই। দ্বারবঙ্গ-অঞ্চলের মুসলমানগণের ভাষা—জোলা-বুলি ; মজঃফরপুর অঞ্চলের মুসলমানদিগের ভাষা—শেখোরি বা মুসলমানী। মাগধী বা মাঘাই—মগধের ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। হাজারিবাগ জেলার সাহাবাদ এবং পালামৌর পূর্ব্বাংশ ভিন্ন, দক্ষিণ-বিহারের প্রায় সর্ব্বত্র মাগধী বা মাঘাই ভাষা প্রচলিত। ভোজপুরী,—বিহারের পশ্চিমাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্তপ্রদেশের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত ভোজপুরী ভাষা প্রচলিত। সাহাবাদের উত্তর-পশ্চিমে, পূর্ব্বে ভোজপুর নামে একটী নগর ছিল। সেই নগর—ডুমরাওনের রাজাদিগের প্রাচীন রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিংবদন্তী এই, সেই ভোজপুরের নামানুসারেই এই ভোজপুরী ভাষার নামকরণ হইয়াছে। কেহ কেহ আবার বলেন, প্রাচীন ভোজ-রাজগণের নামানুসারে ঐ ভাষার নামকরণ হইয়া থাকিবে। বিহারের এই তিনটী প্রধান ভাষা ভিন্ন 'আউধি' (Awadhi) ভাষা পূর্ব্ব-বিহারে প্রচলিত। মুসলমানগণ এবং কায়স্থগণ প্রধানতঃ ঐ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ঐ ভাষা বিহারী হিন্দীর মধ্যে গণনীয় ছিল। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ উহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উৎকলের উৎকলীয় ভাষাও কটকে একরূপ, সম্বলপুরে অন্য আর একরূপ। মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সিতে কথিত ভাষার সংখ্যা অনূন উনত্রিশটী। সেই উনত্রিশটী কথিত-ভাষার নাম,—(১) বাদগো, (২) বেল্লারা, (৩) কেনারি, (৪) গুড়াবা, (৫) গাটটু বা গোট্টু, (৬) গোন্দি, (৭) হিন্দুস্থানী, (৮) ইরুলা, (৯) কাণ্ডভা বা কাণ্ডবা, (১০) খোন্দ, (১১) কোন্দা, (১২) কোঙ্কণী, (১৩) কোড়াগু, (১৪) কোড়াভা বা জেরুকালা, (১৫) কোটা, (১৬) কোয়া বা কৈ, (১৭) কুরুম্বা, (১৮) লাম্বাতি বা লাভানি, (১৯) ম্মল, (২০) মলয়ালম্, (২১) মারাঠী, (২২) উড়িয়া, (২৩) পাৎমুলি বা খাত্রা, (২৪) পোরোজা বা পার্জ্জা, (২৫) শবর, (২৬) তামিল, (২৭) তেলেগু, (২৮) তোড়া এবং (২৯) তুলু। † এই সকল ভাষার মধ্যে সাতটী ভাষা প্রধান। সেই সাতটী ভাষায় গ্রন্থপত্র লিখিত হইয়া থাকে, এবং সেই সাতটী ভাষার বর্ণমালা আছে। সেই সাতটী ভাষা এই,—(১) কেনারি, (২) হিন্দুস্থানী, (৩) মলয়ালম্, (৪) মারাঠী, (৫) উড়িয়া, (৬) তামিল, এবং (৭) তেলেগু। অন্যান্য ভাষার মধ্যে ম্মল-ভাষা আরবী অক্ষরে, বাদাগা-ভাষা তামিল ও কেনারি অক্ষরে, কোঙ্কণী-ভাষা রোমান ও কেনারি অক্ষরে, পাৎমুল-ভাষা পরিবর্ত্তিত দেবনাগর অক্ষরে এবং তুলু-ভাষা কেনারি অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। বৈদেশিক ভাষা-সমূহের মধ্যে মাদ্রাজে ইংরেজী

---

* ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিহারে সরকারী কাগজ-পত্রে উর্দ্দু ব্যবহৃত হইত। ঐ সময়ে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সরকারী কাগজ-পত্রে 'কাইথি' ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন।

† এতন্মধ্যে 'পোরোজা'—উড়িয়া ভাষার অংশ; 'কোঙ্কণী'—মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অংশ; 'পাৎমুলি—গুজরাটী ভাষার অংশ; এবং 'লাম্বাদি—পরিভ্রমণকারী জিপসি' দিগের ভাষা।

ভাষার প্রবল প্রচলন। মাদ্রাজের সার্দ্ধ-পঞ্চদশ সহস্রাধিক অধিবাসী ইংরেজীকে মাতৃভাষা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বোম্বাই-প্রেসিডেন্সিতে দেশীয় বিদেশীয় অন্যূন বাইটি ভাষা প্রচলিত। তন্মধ্যে পাঁচটী সমধিক প্রসিদ্ধ। সেই পাঁচটীর নাম,—(১) মারাঠী, (২) গুজরাটী, (৩) হিন্দুস্থানী, (৪) কচ্ছী এবং (৫) ইংরাজী। এই পাঁচ ভাষাতেই প্রধানতঃ গ্রন্থপত্রাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। কচ্ছী ভাষায় দশ লক্ষ লোক কথাবার্ত্তা কহিলেও, ঐ ভাষাকে, স্বতন্ত্র ভাষা না বলিয়া, গুজরাটীর মধ্যে গণ্য করা হয়। কোঙ্কণী ও গোয়ানিজ ভাষা—মহারাষ্ট্রীর অন্তর্ভুক্ত। বোম্বাই-প্রদেশে যে উর্দ্দু, হিন্দুস্থানী এবং হিন্দি ভাষা প্রচলিত আছে; তৎসমুদায় পশ্চিমা-হিন্দুস্থানীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। প্যাংনলি—গুজরাটী ভাষার অন্তর্ভুক্ত। মধ্য-ভারতে পশ্চিমা-হিন্দীর উর্দ্দু শাখা এবং পূর্ব্ব-দেশীয় হিন্দীর বাঘেলী ও ছত্রিশগড়ী শাখা প্রচলিত। মালয়ী, নিমারী, মাড়োয়ারী ও ভিলী প্রভৃতি রাজস্থানী ভাষা, এবং বেরারী, নাগপুরী, হাল্থী বা বাস্তারী ও মারাঠী প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীর ভাষা,—মধ্য-প্রদেশের স্থানে স্থানে অধিকার বিস্তার করিয়া আছে। তামিল অপেক্ষা তেলেগু ভাষা মধ্য-প্রদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। গোলারি, হোলিয়া বা কোমাতিয়া প্রভৃতি তেলেগুর শাখাসমূহ মধ্য-ভারতে প্রতিষ্ঠান্বিত। দ্রাবিড়ী ও কোলারি—দ্রাবিড়ী ভাষার এই শাখাদ্বয় এবং উড়িয়ার ভাতারি-শাখা মধ্য-ভারতে ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও সিন্ধু-প্রদেশে—হিন্দী, উর্দ্দু ও তাহার শাখা-সমূহ এবং নানা বৈদেশিক ভাষা প্রচলিত।

ভারতের এই অসংখ্য ভাষার সাদৃশ্য-তত্ত্ব নিরূপণ এতৎপ্রসঙ্গে সম্ভবপর নহে। তথাপি ভারত-প্রচলিত কয়েকটী প্রধান প্রধান ভাষার আদর্শ এস্থলে প্রদান করিবার প্রয়াস পাইতেছি। পূর্ব্বে সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতির সাদৃশ্যের বিষয় স্থূলভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ সাদৃশ্য আছে, তাহা দেখাইবার জন্যও কয়েকটী পদ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। এক্ষণে, হিন্দী, গুজরাটী উড়িয়া, মারাঠী, মৈথিলী প্রভৃতির সহিত সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালী, বাঙ্গালা প্রভৃতির কিরূপ সাদৃশ্য, এবং সেই সাদৃশ্য সত্ত্বেও ঐ সকল ভাষা পরস্পর কিরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছি। যদি কোনও ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিত এক প্রদেশের ভাষার সহিত অন্য প্রদেশের ভাষার সাদৃশ্যের ও পার্থক্যের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন, সাদৃশ্যের মধ্যেও সেই পার্থক্য কিরূপে ঘটিয়াছে, অনায়াসেই তাঁহার বোধগম্য হইতে পারে। যোজনান্তে ভাষার পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং একেবারে দূর-দূরান্তের ভাষার পার্থক্য বা সাদৃশ্য বুঝিবার চেষ্টা না পাইয়া, গ্রামের পর গ্রামে বা জেলার পর জেলায় ক্রমশঃ ভাষার কিরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেই ভাষাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। সে পার্থক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় প্রদান—এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। এখানে আমরা কেবল প্রধান প্রধান কয়েকটী ভাষার পার্থক্যের আভাষ দিবার প্রয়াস পাইতেছি। 'আমি' এবং 'তুমি' অর্থবাচক সংস্কৃতের 'অস্মদ্‌' এবং 'যুস্মদ্‌' শব্দ, একবচনে ও

বিবিধ ভাষার সাদৃশ্য।

ভারতবর্ষে যেরূপ রূপান্তর গ্রহণ করে, একই ভাব ভারতের বিভিন্ন ভাষায় যেরূপ বিভিন্ন শব্দে ব্যক্ত হয়, ভারতের কয়েকটী প্রধান ভাষার দৃষ্টান্তে তাহা উপলব্ধি হইবে।

	'অস্মদ্' শব্দ।			'যুস্মদ্' শব্দ।		
	একবচন		বহুবচন	একবচন		বহুবচন
সংস্কৃত	অহম্	...	বয়ম্	ত্বম্	...	যূয়ম্
প্রাকৃত	অহম্	...	অম্হে	তুমং	...	তুম্হে
পালি	অহম্	...	ময়ম্	ত্বম্	...	তুম্হে
হিন্দী	হাম্	...	হামে	তোম	...	তোমে
বাঙ্গালা	আমি	...	আমরা	তুমি	...	তোমরা
গুজরাটী	হুং	...	হমে	তু	...	তুমনা
মারাঠী	মী	...	আম্হী	তু	...	তুম্হা
উৎকলীয়	আম্ভে	...	অম্ভেমানে	তুম্ভে	...	তুম্ভমানে
মৈথিলী	হম্	...	হম্না, হম্রা	তুঁহ	...	তুহনা, তোহর
ভোজপুরী	হম্	...	হমনী	তু হ	...	তোহনী
ব্রজভাষা	হাম্	...	হম্রা	তুঁহু	...	তুহ্যা
তেলেগু	নেনু	...	নেমু, মনমু	নীবু	...	মীরু
তামিল	নাং	...	নাম, নাঙ্গল্	নি	...	নিঙ্গল্
কেনারি	না, নু	...	নাভু	নী, নু	...	নীভু
মলয়ালম্	ঞান্	...	নাম, নম্মল, ঞাঙ্গল	নি	...	নিঙ্গল
পঞ্জাবী	মৈং	...	অসীং	তুঁ	...	তুসীং
নেপালী	মৈং	...	হামি, হামিহেরু	তঁ	...	তিমি, তিমিহরু
কাশ্মিরী	আঃ, ঊঃ	...	আঃ-এ, ঊঃ-ইঃ	এম ন্	...	এন ান
তিব্বতী	ঙ, ঙা	...	ঙং চুহ ওয়া, ঙঃ-টঙ	খেং, খেঃ	...	খেংচুহ ক্ষেট
(শাখাভেদে)	ঙা-অং	...		খ্রিগা, য়াঃ	...	ক্ষেণট, য়েটং
কনোয়ারী	দৈং	...	হন	তু	...	তুন

প্রদেশভেদে একই সামগ্রী ভিন্ন নামে পরিচিত হওয়ায় এক ভাষাকে অন্য ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে, দেখা যায়, সকলেরই মূলে এক তত্ত্ব নিহিত আছে। মূলে এক ধাতু হইতে উৎপন্ন, অথচ দেশভেদে উচ্চারণের প্রভেদে, কত শব্দ কত রূপান্তরে অবস্থিত! কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

ধাতু।

	কৃ	স্মৃ	ভূ	দা	শ্রু	ব্রূ
সংস্কৃত	করোতি	স্মরতি	ভবতি	দদাতি	শৃণোতি	ব্রবীতি
প্রাকৃত	করই	সুমরই	হোই	দেই	সুণই	বোল্লই
উৎকলীয়	করে	স্মরে	হুএ	দেএ	শুণে	বোলে
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত কয়েকটী প্রধান ভাষার অনেকটী বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। একই কথা,—প্রদেশভেদে কিরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি-কয়েকটীতে তাহা বোধগম্য হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় আমরা যদি বলি,—

এক মনুষ্যের দুইটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল—'বাবা! আমাদের সম্পত্তিতে আমার যে অংশ হয়, আমাকে তাহা ভাগ করিয়া দেন।'

মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, উড়িয়া, হিন্দী, মৈথিলী, বিহারী প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় উহা নিম্নলিখিত-রূপে ব্যক্ত হইতে পারে; যথা,—

সংস্কৃত (আর্য্য)।—নরস্য কস্যচিদ্ দ্বৌ পুত্রাবাস্তাম। তয়োঃ কনিষ্ঠঃ পিতরমাহ, পিতর্দেহি মহ্যং রিকথস্য তমংশং যো ময়া প্রাপ্তব্য।

হিন্দী।—কিসী মনুষ্যকে দো পুত্র থে। উন্‌মেঁসে ছুটকে নে পিতাছে কহা, 'হে পিতা সম্পত্তিমেঁসে যে মেরা অংশ হোয়, সো মুঝে দীজিয়ে।'

হিন্দী (বিহারী)।—কেনো মনুখ্য-কেঁ দুই বেটা রহৈনি। ওহিসেঁ ছোটকা বাপ্‌সেঁ কহলকৈঁহি যে, 'ও বাবু ধন-সম্পৎমেঁসে যে হামার হিস্যা হোয়, সে আমারে দিয়।' *

হিন্দী (রাজস্থানী)।—এক জিনৈরৈ দোয় ডাবড়া হা। উঁ বঁ মাঁয়সুঁ নৈন্‌কিঞৈ আপ্‌রৈ বাপ্‌নৈ কয়ো কৈ, 'বাবো-ছা মারি পাঁতি-রো মাল আবৈ জিকো মনৈ দিবাবো।' †

উড়িয়া।—জনকার দুই পুআ থিলা। তাঁঙ্ক মধ্যরে যে বয়সেরে সান সে আপণা বাপকু কহিলা, 'বাপা, মো বাণ্টরে জেউ সম্পত্তি পড়িব, তাহা মোতে দিও।' ‡

তামিল।—ওরু মনুশনুক্কু ইরাণ্ডু কুমারর ইরুণ্দারগল অভর্ কল্লীল্ ইলৈয়ভন্ তকাপ্পাণেই নোক্কি, 'তকপ্পাণ-এ আস্তিয়িল এণাক্কু ভরুম পঙ্গৈক এণাক্কু তর ভেণ্ডুম এণ্ড্রাণ।' §

গুজরাটী।—এক মানস্‌নে বে দীকরা হতা। অনে তেও মাঁলা নানা-এ বাপনে কহ্যুঁ কে, 'বাপ সম্পৎনো পহোঁচ্‌তো ভাগ মনে আপ নে তেণে তেওনে পুঁজি বাঁহেচি আপি।' **

মহারাষ্ট্রী।—কোনে একা মনুষ্যাস্ দোন্ পুত্র হোতে। ত্যাঁতিল ধাকুটা বাপালা ম্হণালা, 'বাবা যো যো মালমত্তেচা বাঁটা মলা যাবা যা-চা তো দে।' ††

---

* ইহার অপর নাম—মৈথিলী। ইহা দারবঙ্গ-অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ভাষা।

† ইহার অপর নাম—মাড়োয়ারী। মাড়োয়ার রাজ্যে এই ভাষা প্রচলিত।

‡ এই ভাষা কটক-বিভাগে প্রচলিত।

§ তামিল ভাষার এই শাখা সাধারণতঃ প্রচলিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই ভাষা ব্যবহার করেন।

** গুজরাটির এই শাখা শুদ্ধ ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

†† পুণা ও [illegible] এই ভাষা প্রচলিত।

পঞ্জাবী (পূর্ব্ব-বিভাগীয়—গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত হয়)।—ইক মনক্‌খ দে দো পুত্ত ছে। অতে উনহাঁ উইচোঁ ছোটে নৈ পিতানূঁ কিহা, হে পিতা মালদা জিহ্‌ড়া হিঁসা মৈনূঁ পঁহুচদাহৈ মে দিহ্‌।

কাশ্মীরী (আদর্শ হিন্দী)।—অকিস্ মহনিবিস্ আসি্ জংহ্‌ ন্যাচিরি। তিমব্‌ মঞ্জ্‌ দপুং কুঁসি্ হী মালিস্ কি হে মালিহ্‌ ম্য দিহ্‌ ধনুক্‌ হিস্‌ য়ুস্ম্য বাতি।

সিন্ধী।—হিকিরে মাণ্হূএখে ব্বা পুট হুয়া। তিনে মোং নানঢে পিউখে চিও, এ বাবা মালমোং জে কো ভাওগো মুঁহুঞো দিয়ে।

রাজপুতানী (বিকানিরী)।—এক আদমীকা দোয় ডাবড়া ছা। ওঁর বামেংস্যুং নাঁনো আপকা বাতানেঁ কয়ো কেঁ, হে বাভা মথাকে জকো বিরাড় ম্হারা ভাগমেঁ আবেঁছেঁ উ মনেঁ দে।

মাগধী।—একঁ অদ্‌মীকা দু বেটা হলৈথন্‌। আউর উন্‌হকন্‌হিকের ছোটা আপ্‌না মহ্‌তারকে কহলথন্‌, কা, হে মহ্‌তার সংপৎকের যো বোথ্‌রা মহরা বোথরামে পর্‌ হয়্‌ উঅহ্‌ হমরা দহ্‌।

তেলেগু (আদর্শ)।—ভোকা মনুষ্যনিকি যিদ্দারু কুমারউলু। ভঁডিরি ভবিলো চিন্নভাড়ু ও তমঁডিরি অস্‌টিলো ন কু ভাচ্ছে পলু জিম্মম।

মলয়ালম।—ওরু মনুষ্যন্‌ রণ্ডু মকল্‌ উণ্ড-আয়ইবান্‌। অদিল্‌ ইলয়ভন্‌ অপ্পনোডু অপ্পা, ভাস্তকা লিল্‌-এনিক্ক ভারণ্ডুন্না পঙ্‌গু তরেণ্‌মে।

কেনারি।—ওব্ব মনুষ্য নিগে ইব্বারু মক্কলিড্ডরু অভবল্লি চিক্কভনু তান্দেগে, তন্দেযে আস্‌টিয়ল্লি ননজে বরটক্কা পালন্নু ননজে কো ডু।

তিব্বতী।—মি বিক্‌গা পুভী যোঁ-পা-রে তে দাক্‌লা ছুঙওয়া তে রংজি ফালা শুপা, ওই য়াপ ঙা থোপ্‌-পা-ই নোর-কাল ভালা নংযিক।

পূর্ব্ব-বেহারী বা নৈপালী।—কোহি মানিস্ কা দুই পুত্র থিয়া। উন্ মা কাঁছালে বাবালাই ওন্ভো, হে বাবা সম্পত্তিকো মেঁরো হুন্ছা অংশ মলাই দেউ।

উল্লিখিত এক এক ভাষা আবার প্রদেশ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। হিন্দী—মাড়বারে একরূপ, জয়পুরের একরূপ, বিহারে একরূপ, উত্তর-পশ্চিমে একরূপ। মহারাষ্ট্রীয় ভাষারও কত মূর্ত্তি পরিদৃশ্যমান! পুণায় মহারাষ্ট্রীয় ভাষার এক মূর্ত্তি, বিজাপুরে এক মূর্ত্তি, ধারোয়ারে এক মূর্ত্তি, বোম্বাই সহরে এক মূর্ত্তি! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নানা স্থানে প্রচলিত মহারাষ্ট্র-ভাষার আরও সপ্তবিধ মূর্ত্তি নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি। যথা,—

মহারাষ্ট্রী (বিজপুরী)।—কুনি যোক মন্ মালা দোন ল্যোক হোত্তে। ত্যাতলা হলানুগা বাপাস্ ম্হঠলা, 'বাবা মাজে বাঠনী চা মাল মলা দে।'

মহারাষ্ট্রী (ধারোয়ারী)।—এক মনুষ্যালা দোন মুলে হোত্তে। আণি ত্যা পৈকো ধাক্‌তা মুলগা ত্যাচা 'বাপালা ম্হণালা কী, 'বাবা জিন্দগী পৈকী মাঝে হিশালা যেন্নার ভাগ মলা দে।'

মহারাষ্ট্রী (বোম্বাই সহরে প্রচলিত—'কোলি' শাখা)।—একা মান্‌সালা দোন

লোক্‌য়ের হোতে। ত্যামন্‌চা ধাক্‌লা লোকরা বা পাসলা, জাপলা বাপুস মাজা ধনাচা বাঁটা মানদেস।

মহারাষ্ট্রী (ব.ঙ্গ-প্রদেশে প্রচলিত—'কুনবি' শাখা)।—যেকে মান্‌মালা দোন পুত হোতে। ত্যান্‌চা ধাক্‌লা পুৎ আপলে পায়স্‌লা বোৎলা, 'পায় মজা ধনাচা বাঁটা মানা ভাস।'

মহারাষ্ট্রী কেঙ্কণ-দেশ প্রচলিত—'কুনবি' শাখা)।—কোনা একা মনুষ্যালা দোন মুলগ্‌ হুবত। ত্যাতলা ধাক্‌লা বাপাস্‌নী ম্হণালা, 'বাবা জো জিনগানীচা বাটা মালা যায়্‌চা ত্যো দো।'

মহারাষ্ট্রী (দমন ও থানা, বিভাগে প্রচলিত—'পারভি' শাখা)।—কোণি এক মাংসালা দোন পোব হোতী। ত্যান্‌চা লানা বাপালো বোল্‌লা, 'বাবা জো দৌলতীচা ভাগ মালা যেয়াচা তো দে।"

মহারাষ্ট্রী (বোম্বাই-প্রদেশ প্রচলিত—'সুঙ্গমেশ্বরী' শাখা)।—একা মনুষ্যাস্‌ দোন লেক হুবতে। আনী ত্যাৎলা ধাক্‌টা আপল্যা বাপাস ম্হণালা, 'বাবা তুঝ্যা জিন্‌গীচা জা হিসা মাঝ্যা বাঁটণীস্‌ যেল, তা মলা দেস।'

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার যে অষ্টবিধ মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল, তাহার সকলগুলিই যে পুস্তকাদিতে ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। বঙ্গদেশে যেরূপ নানা স্থানে নানারূপ প্রাদেশিক ভাষার প্রচলন আছে, অথচ পুস্তকাদিতে প্রধানতঃ এক প্রকার ভাষাই ব্যবহৃত হয়, মহারাষ্ট্রীয় ভাষার সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলা যাইতে পারে। কেবল মহারাষ্ট্রীয় ভাষাই বা বলি কেন, প্রধান প্রধান সকল ভাষা সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য। এই বাঙ্গালা দেশের কয়েকটী প্রাদেশিক ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি। কেমন ধীরে ধীরে ভাষার পার্থক্য সাধিত হইয়াছে, সেই কয়েকটী দৃষ্টান্ত পাঠ করিলে, অনায়াসেই প্রতীত হইবে।

বাঙ্গালা।—এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ আপন পিতাকে কহিল,—'পিতঃ! সম্পত্তির যে ভাগ আমি পাইব, তাহা আমাকে দাও।'

বাঙ্গালা (অন্তরূপ)।—কোন মানুষের দুই পুত্র ছিল; তাহাদের মধ্যে ছোটটী বাপ্‌কে কহিল,—'বাবা, যে বিষয়ের অংশ আমার ভাগে পড়ে, আমাকে দিউন।'

বাঙ্গালা (চট্টগ্রামী)।—ওগ্‌গা মান্‌ষের দুয়া পোয়া আছিল্‌। ছোড়ুয়া তার বায়রে কইল, বায়াজি আঁর হিচ্ছার সম্পত্তি আঁরে দেয়।

বাঙ্গালা (মানভূমী)।—য়াহক নকের দুইটা হাওগা রহিলা। তাহাদের মাঝে ছটুকা বাব্বাকে কহিনাক, বাব্বা দৌলতটায় যে মহর বাঁটা হিচা তাই মহরকে দিল।

বাঙ্গালা (আসামী বাঙ্গালা বা আসামী)।—এজন মানুহর দুই পুতেক আছিল। তারে সরু জনে বাপেকত কলে, হে পিত্রি তোমার সম্পত্তির জি ভাগ মোত্ত পরে, তাকে মোক দিয়া।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ভাষা-সমূহের নাম এবং সেই সকল ভাষা পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ-যুক্ত, আদমসুমারীর তালিকায় তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। পৃথিবীর ভাষা-সমূহের উৎপত্তির বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বলা বাহুল্য, ভারতীয় ভাষা-সমূহকে সেই পদ্ধতিক্রমেই তাঁহারা শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই,—মধ্য-এসিয়ার কেন্দ্র-স্থান হইতে আর্য্যগণ যখন দেশে-বিদেশে গমন করেন, সেই সময়ে তাঁহাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তদনুসারে, মূল-ভাষাকে তাঁহারা 'এরিয়ান' বা 'ইণ্ডো-ইউরোপীয়' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইণ্ডিক, ইরাণিক, শ্লাভোনিক, কেল্‌টিক, হেলেনিক, ইটালিক, টিউটনিক—এই সাতটী ভাষা সেই মূল ভাষার সাতটী প্রধান শাখা মধ্যে পরিগণিত। সেই সাত শাখার ইণ্ডিক-শাখা হইতে প্রথমে সংস্কৃত এবং সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, পালি, বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা-সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। ইরাণিক শাখা হইতে জেন্দ, পহ্লবী, পার্সী, পশতু, আম্মাণী প্রভৃতি ভাষা; হেলেনিক শাখা হইতে গ্রীক এবং গ্রীক হইতে রোমানিক ; ইটালিক শাখা হইতে লাটিন এবং লাটিন হইতে ইতালীয়, স্পেনীয়, পর্ত্তুগীজ ; কেল্‌টিক হইতে প্রথমে গেলিক এবং কিম্‌রিক (সিম্‌রিক) নামক দুই উপশাখা উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে আবার গেলিক হইতে আইরিশ, হাইস্কচ ও ম্যাংস্ক; এবং কিম্‌রিক হইতে ওয়েলশ ও ব্রেটন। টিউটনিকের চারটী শাখা,—গথিক, স্কান্দেনেভীয়, হাই-জর্ম্মণ ও লো-জর্ম্মণ। স্কান্দেনেভীয় হইতে আইসল্যাণ্ডিক, নরওয়েজিয়ান, সুইডিস ও ডেনিস ভাষা; হাই-জর্ম্মণ হইতে জর্ম্মণ; লো-জর্ম্মণ হইতে প্রাচীন ফ্রিশিয়ান, দিনেমার, ফ্লেমিশ, স্যাক্সন ও ইংরেজি-ভাষা পর্য্যায়ক্রমে উৎপন্ন হয়। মূল এরিয়ান (আর্য্য) ভাষাকে পণ্ডিতগণ একটী বংশ বা 'ফ্যামিলি' মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ভাষার অপর একটী ফ্যামিলি বা বংশের নাম—সেমিটিক বংশ। সেই সেমিটিক-বংশের তিনটী শাখা—আরবী বা দক্ষিণ শাখা, হিব্রু বা মধ্য শাখা এবং আম্মাণীয় বা উত্তর শাখা। আরবী শাখার মধ্যে এখন আরবী ও আম্‌হারী ভাষা প্রতিষ্ঠান্বিত। হিব্রু শাখার মধ্যে জু-ভাষা এবং আম্মাণী-শাখার মধ্যে নেষ্টাসরিক ভাষা প্রাসাদ্ধসম্পন্ন। নোয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেমের নামানুসারে এই সেমিটিক ভাষার নামকরণ হইয়াছিল। নোয়ার কনিষ্ঠ পুত্র হাম এবং তাঁহার বংশধরগণ আফ্রিকা-দেশে বসবাস করিয়াছিলেন। তদনুসারে আফ্রিকা-দেশ-প্রচলিত আদিম ভাষা-সমূহ হামেটিক বা হেমেটিক ভাষা মধ্যে গণ্য হয়। হেমেটিক ভাষার অন্তর্গত সোমালি ভাষা বোম্বাই প্রদেশে দুই একটী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে—দেখিতে পাই। ভাষার প্রধান এই তিন বংশ ভিন্ন আরও বিভিন্ন বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ আপন আপন গবেষণা অনুসারে ভাষার বংশ-পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ম্যাক্স-মুলার, টেলার, ক্যাম্বেল, হুইটনি, কল্‌ডওয়েল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত মতের অর্থৎ এসিয়া মহাদেশের কেন্দ্রস্থান হইতে ভাষার বংশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল,—এই মতের, প্রবর্ত্তক ও পরিপোষক। সে মতে, আর্য্য-বংশীয় ভাষার পর্য্যায় এই—

ভাষা ও সভ্যতা।

জীবিত ভাষা।		মৃত ভাষা।		শাখা	শ্রেণী	বিভাগ
ভারতের প্রচলিত ভাষা		প্রাকৃত এবং পালি—আধুনিক সংস্কৃত—বৈদিক সংস্কৃত			ভারতীয়	দক্ষিণ বিভাগ। / ইণ্ডিয়ান ইওরোপীয় বা আর্য্য-বিভাগ।
পরিভ্রমণকারী জাতির ভাষা		পারসী—পেহেলেভি—'কুনেইফর্ম্ম' খোদিত লিপি—জেন্দ			ইরাণীয়	
পারস্য দেশীয় ভাষা	...					
আফগানিস্থানের ভাষা	...					
কুর্দ্দিস্থানের ভাষা	...					
বোখারার ভাষা	...					
আর্ম্মেণীয়ার ভাষা	...	প্রাচীন আর্ম্মেণীয়				
ওয়েল্‌সের ভাষা	...			কিম্‌রিক	কেল্‌টিক	উত্তর বিভাগ।
ব্রিটানির ভাষা	...					
†	...	কর্ণিস				
স্কটলণ্ডের ভাষা	...			গাধেলিক		
আয়লণ্ডের ভাষা	...					
মানদ্বীপের ভাষা	...					
পর্ত্তুগালের ভাষা	...					
স্পেন-দেশীয় ভাষা	...	Langue d'oc	Lingua	অস্কান	ইতালীয়	
প্রভেন্সের ভাষা	...			লাটিন		
ফ্রান্সের ভাষা	...					
ইতালীয় ভাষা	...	Langue d'oil	Vulgaris	আম্ব্রিয়ন		
গ্রিসন প্রদেশের ভাষা	...					
আলবেনিয়ার ভাষা	...				ইলিরীয়	
গ্রীসের ভাষা	...	কোটিন	ডোরিক—ইওলিক		হেলেনিক	
লিথুয়ানার ভাষা	...		আটিক—আইওনিক			
†	...	প্রাচীন প্রুশীয় ভাষা		লেটিক	উইণ্ডিক	
কুরলন্দ ও লিভোনিয়া	...	লোটিশ				
বুলগেরিয়ার ভাষা	...	ধর্ম্মযাজকীয় স্লাভোনিক ভাষা				
রুশিয়া (গ্রেট, লিটল্‌ ও হোয়াইট রুশীয় ভাষা	...					
ইলিরীয় (স্লাভনীয়, ক্রোটীয় ও সার্ভিয়)	...			দক্ষিণ-পূর্ব্ব স্লাভেনিক		
পোলণ্ডের ভাষা	...					
বোহেমীয় ভাষা স্লোভাকিয়ান লুসাটির	...	প্রাচীন বোহেমীয় ভাষা		পশ্চিম স্লাভোনিক		
		পোলাবীয়				
জর্ম্মণীর ভাষা	...	মধ্য-হাই ও প্রাচীন-হাই জর্ম্মণ		হাই-জর্ম্মণ	টিউটনিক	
†		গথিক				
ইংলণ্ডের ভাষা	...	এংগ্লো-স্যাক্সন ভাষা		লো-জর্ম্মণ		
হলণ্ডের ভাষা	...	প্রাচীন দিনেমার ভাষা				
ফ্রিসলণ্ডের ভাষা	...	প্রাচীন ফ্রিসীয় ভাষা				
জর্ম্মণীর উত্তরাংশের ভাষা	...	প্রাচীন স্যাক্সন ভাষা				
ডেনমার্কের, সুইডেনের, নরওয়ের আইসলণ্ডের ভাষা	...	প্রাচীন নোর্স ভাষা		স্কান্দেনেভিয়ান		

ইউরোপ ও এসিয়া মহাদেশের সভ্য-জাতিগণের ভাষা-সমূহ যে এক মূল-ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পণ্ডিতগণের প্রদত্ত ভাষার বংশলতায় তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ভাষা-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে ম্যাক্সমূলার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন,—ভারতের, পারস্যের, গ্রীসের, রোমের এবং শ্লাভ-গণের, কেল্ট-গণের ও জর্ম্মণ-গণের আদি-পুরুষগণ, একই স্থানে, এমন কি একই গৃহে, বসবাস করিতেন। * সেই কেন্দ্রস্থান হইতে তাঁহারা বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে, তাঁহাদের একটী স্বতন্ত্র সাধারণ ভাষা ছিল। সে এখন লোপ পাইয়াছে; এবং সেই ভাষার বীজ হইতে ভারতের, পারস্যের, গ্রীসের ও রোমের এবং কেল্টিক, টিউটনিক ও শ্লাভনিক ভাষা-সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। ইউরোপের ও এসিয়া মহাদেশের প্রাচীন ও আধুনিক জাতি-সমূহের ভাষার কতকগুলি শব্দের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে বাক্যের এবং ভাবেরও সাদৃশ্য আছে। সেই সকল সাদৃশ্য দেখিয়া ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ ঐ সকল ভাষার নিকট-সম্বন্ধ উপলব্ধি করেন। তাঁহাদের সেই যুক্তির অনুকূল প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি প্রাচীন ভাষার কয়েকটী শব্দ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে সেই সাদৃশ্যের বিষয় বিশেষরূপ বোধগম্য হইবে।

সাদৃশ্যে মৌলিক ভাষার অনুসন্ধান।

সাদৃশ্য-ব্যঞ্জক শব্দ।

সংস্কৃত শব্দ ...	পিতৃ	মাতৃ	ভ্রাতৃ	দুহিতৃ	অস্মদ	যুস্মদ	গো
(প্রথমায়)...	পিতর	মাতার	ভ্রাতার	দুহিতার	অহম	ত্বম	গো
জেন্দ ...	পদর	মদর	ব্রাদর	দুগ্‌ধর	মা	তু	গাও
লাটিন ...	পেটর	মাটর	ফ্রাট্টার	...	সাম	এস	বো
গ্রীক ...	পাটর	মাটর	ফ্রাট্রিয়া	থুগাটার	...	সু	বোভ
জর্ম্মণ ...	ফাতের	মাতের	ব্রুদের	টল্‌তের	...	...	...
ইংরেজী ...	ফাদার	মাদার	ব্রাদার	ডটার	আই	দাউ	কাউ
বাঙ্গালা ...	পিতা	মাতা	ভ্রাতা	দুহিতা	আমি	তুমি	গো

দৃষ্টান্ত—দুই চারিটী মাত্র প্রদর্শিত হইল। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে এমন সাদৃশ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটীতে সংস্কৃতের সহিত জেন্দ শব্দের, কোনটীতে গ্রীক ও লাটিন শব্দের বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। অনেক গৃহপালিত গ্রাম্য পশুর নামে বিভিন্ন ভাষায় সাদৃশ্য বিদ্যমান। সংস্কৃতের 'গো' শব্দের সহিত অন্যান্য ভাষার তদর্থবাচক শব্দের যেমন সাদৃশ্য; সংস্কৃতের 'অশ্ব', 'বরাহ', 'মেষ' প্রভৃতি শব্দের সহিতও অন্যান্য ভাষার তত্তদর্থবাচক শব্দের সেইরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়। সংস্কৃতের অশ্ব—জেন্দ ও পারসীক ভাষায় অস্প; সংস্কৃতের বরাহ—ইংরেজীর 'বোর', স্যাক্সনের 'বার', কর্ণিশের 'বোরা'। উষ্ট্রের একটী নাম—সংস্কৃতে 'ক্রমেল'; লাটিনে উহা 'ক্যামেলস্', ইংরেজীতে 'ক্যামেল'। সংস্কৃতে মেষের একটী নাম 'অবিস'; লাটিনে উহা 'অবিস', গ্রীসে 'অইস্'। সম্বন্ধ-বাচক পিতৃ

* Max Muller—*Lectures on the Science of the Languages.*

ও মাতৃ শব্দের ন্যায় শ্বশ্রূ, দেবর প্রভৃতি শব্দেও সংস্কৃতের সহিত অন্যান্য ভাষার সাদৃশ্য আছে। সংস্কৃত শ্বশুর ও শ্বশ্রূ শব্দ লাটিনে 'শশর' ও 'শক্রু' এবং গ্রীকে 'হেকুরস' ও 'হেকুরা' নামে পরিচিত; সংস্কৃত দেবের—লাটিনে 'ডেবর', গ্রীকে 'ডেবর' এবং বাঙ্গালায় দেবর। গৃহবাচক সংস্কৃত শব্দ ধাম—লাটিনে ও গ্রীকে 'ডামস', শ্লাভনিকে 'ডেমু' এবং কেল্টিকে 'ডেম'। সংস্কৃত পুরী শব্দ—গ্রীকে 'পলিস', দ্বার শব্দ—ইংরেজীতে 'ডোর', ইত্যাদি। সংস্কৃতের মাস শব্দ—পারসীকে 'মাহ', লাটিনে 'মেন্‌সিস', গ্রীকে 'মীন' এবং ইংরেজীতে 'মন্থ'; সংস্কৃতের রাজ ও রাজ্ঞী—লাটিনে 'রেগস' ও 'রেগিণা'। এই ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল শব্দের সহিত মানুষের নিত্য-সম্বন্ধ, সে সকল শব্দের অধিকাংশই পৃথিবীর সভ্যজাতি-সমূহের ভাষায় প্রায় এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য্য পূরণ-বাচক শব্দেও বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

পূরণ-বাচক শব্দ।

সংস্কৃত	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	নবম	দশম
জেন্দ	ফ্রথেম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	তুরীয়	পুগ্‌ধ	স্ত্র	হপ্তাহ	অষ্টেম	নৌম	দশেম
গ্রীক	প্রোত	দিউতেব	ত্রিত	তেতারত	পেম্পত	হেকত	হেবডোমা	ওগ্‌ডোয়া	এম্‌নোটা	ডেকাটা
লাটিন	প্রাইমা	আল্‌টেরা	তের্‌তিয়া	কোয়ার্টা	কুইন্টা	সেক্সটা	সেপ্টিমা	অকটভা	নোভা	ডেসিমা
গথিক	ফ্রুমা	আম্বারা	থ্‌ ডিয়ে	ফিড্‌ভোর্ডো	ফিম্‌টো	বৈহ্টা	সিবণ্ডো	আটুডো	নিউণ্ডো	তৈহুণ্ডো

এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের সহিতও এইরূপ একটু একটু সাদৃশ্য আছে। সংস্কৃতের দ্বি—বাঙ্গালার দুই, লাটীন ও গ্রীক প্রভৃতিতে 'দু' রূপে উচ্চারিত হয়। ক্রিয়াপদের বিভক্তিতেও অনেক স্থলে বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাই। সংস্কৃত ভাষার 'দা' (দানার্থবাচক) এবং 'অস্' (অস্ত্যর্থ-বাচক) ধাতু সংস্কৃত, জেন্দ, গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি ভাষায় যে সাদৃশ্য-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি। যথা,—

		দা ধাতু				অস্ ধাতু।		
সংস্কৃত	...	দদামি	দদাসি	দদাতি	...	অস্মি	অসি	অস্তি
জেন্দ	...	দধামি	দধাসি	দধাতি	...	অস্মি	অহি	অশ্‌তি
গ্রীক	...	দিদোমি	দিদোস	দিদোতি	...	বস্মি	এস্‌সি	এস্‌তি
লাটিন	...	দো	দাস	দাৎ	...	সাম	এস	এস্‌ৎ

সংস্কৃতের স্থাতুম্, দাতুম্, জ্ঞাতুম্, পাতুম্, এতুম্, স্ত্রাতুম্, বমিতুম্, জানিতুম্, প্রভৃতি শব্দ লাটিনে যথাক্রমে স্তাতুম, দাতুম্, নোতুম্, পোতুম্, ইতুম্, স্ত্রাতুম, ভোমিতুম, জেনিতুম প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। দেখিতে গেলে, এইরূপ বিবিধ সাদৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। * এ সকল বিষয় আলোচনার জন্য পাশ্চাত্য ভাষা-সমূহে ভাষা-বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। বোপ, সিলার, ম্যাক্সমুলার, সেস, হুইটনী ও টেলার প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ভাষা-বিজ্ঞান-বিষয়ক ও ব্যাকরণ-সংক্রান্ত গ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিলে এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষা-সমূহের সাদৃশ্যের বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ তুলনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা

* বঙ্গাক্ষরে বিভিন্ন ভাষার শব্দ প্রকাশ করায় উদাহরণের তারতম্য ঘটিতে পারে। ঘটাই সম্ভবপর।

করিলে,—পরস্পরের সম্বন্ধ-তত্ত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি হইতে পারে। * এতৎপ্রসঙ্গে আমরা তদ্বিষয়ের সামান্য আভাষ মাত্র প্রদান করিলাম। ফলতঃ, ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু অধিকাংশ পণ্ডিতেরই সিদ্ধান্ত এই যে, মূলে পৃথিবীতে এক জাতি ও এক ভাষা ছিল; ক্রমশঃ তাহা হইতে অসংখ্য জাতি ও অসংখ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এই মত যে অবিসম্বাদিত সত্যরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ এ সম্বন্ধে যে কোনরূপ আপত্তির কথা কখনও উঠে নাই, তাহা অবশ্য বলিতে পারি না। ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিয়া জর্ম্মণীর ও ফরাসী-রাজ্যের কোনও কোনও পণ্ডিত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—'মধ্য-এসিয়ার ক্ষুদ্র একটী জাতি, চারি সহস্র মাইল দূরে, ইউরোপের প্রান্তভাগে গমন করিয়া, আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে—এমন কি তদ্দ্বারা দেশের ভাষার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া যায়—ইহা অসম্ভব। সুতরাং এরিয়ান-গণ যে সভ্যজাতির ভাষা-সমূহের আদিভূত, তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না।' ম্যাক্সমূলারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদকারী ফরাসী ও জর্ম্মণ পণ্ডিতগণের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া, ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ডাঃ টেলার বলিয়াছেন,—'বাক্যের সাদৃশ্য দেখিয়াই যদি জাতির অভিন্নত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বাক্যের পার্থক্য দেখিয়া জাতির পার্থক্যই বা কেন মানিয়া না লইব! কর্ণওয়ালের যে ভাষা, এসেক্সেরও সেই ভাষা; কিন্তু এক স্থানের অধিবাসিগণ কেল্টিক-বংশোদ্ভব এবং অন্য স্থানের অধিবাসিগণ টিউটনিক-বংশোৎপন্ন। এদিকে আবার ব্রিটানীর ভাষার সহিত কর্ণওয়ালের ভাষার বিশেষ পার্থক্য আছে; অথচ, উভয় প্রদেশের অধিবাসীরা প্রায় একই বংশ-সমুদ্ভূত। ফ্রান্সের ও ইতালীর ভাষা—মূলে এক ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তাই বলিয়া ফরাসী-গণকে এবং ইতালীয়-দিগকে কখনই এক-বংশ-সমদ্ভূত বলা যাইতে পারে না। † এবম্বিধ নানা কারণে জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভাষার সহিত জাতির সম্বন্ধের বিষয় অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এক বংশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জনগণের ভাষা-সমূহ যে এক ভাষা হইতে উৎপন্ন, তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না।' হিন্দু, গ্রীক এবং টিউটন-গণ যে একই বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের আর একটী

* Max Muller (Rt. Hon'ble Frederick) *Lectures on the Science of Languages*, first and second series ; Whitney (William Dwight), *Language and the Study of Language* ; *Sayce* (A. H.), *The Principles of Comparative Philology* ; Taylor (Issac), *Origin of the Aryans* ; Bopp's *Comparative Grammer* ; Sehleicher's *Comparative Grammer*.

† "It cannot be insisted upon too strongly that the identity of speech does not imply identity of race any more than diversity of speech implied diversity of race. The language of Cornwall is the same as the language of Essex, but the blood is Celtic in one case and Teutonic in the other. The language of Cornwall is different from that of Brittany ; but the blood is largely the same. Two related languages such as French and Italian point to an earlier language from which both have descended, but it by no means follows that French and Italians, who speak those languages, have descended from common ancestors."—*The Origins of the Aryan* by Dr. Issac Taylor, M. A. D. Litt, &c.

যুক্তি এই,—'ইংরেজ সৈনিকগণের হৃদয়ে যে সাহসিকতা বিদ্যমান, কালা বাঙ্গালীর হৃদয়েও সে সাহসিকতার অভাব নাই। পরস্পরের ভাষার মধ্যেও ঐ প্রকার এক অভিনব সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং ঐ সকল জাতির ভাষা ও বংশ অভিন্ন হওয়া সম্ভবপর।' * কিন্তু এ যুক্তির বিরুদ্ধেও নানা বিতর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশপ উসারের মতের অনুসরণ করিয়া, খৃষ্ট জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্য-জাতির উৎপত্তির বিষয় মানিয়া লইয়া কোনও কোনও পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেন,—'হিব্রু ভাষাই পৃথিবীর আদি ভাষা। শিনারের সমতল ক্ষেত্রে, খৃষ্ট-জন্মের ২২৪৭ বৎসর পূর্ব্বে জাফেটের বংশধরগণ যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, সেই হিব্রু ভাষাই ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের আদিভূত। মধ্য-এসিয়া ভাষার কেন্দ্রস্থান নহে। জাফেট-বংশের লীলা-ক্ষেত্র শিনার-প্রদেশই ভাষার উৎপত্তি স্থান।' † যাহা হউক, এ বিষয়ে মতান্তরের অবধি নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেই এ বিষয়ে নানা জনে নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অনেক চিন্তা-চর্চ্চা ও গবেষণার পর ডাক্তার টেলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—বর্ত্তমান হিরাতের পার্শ্বস্থিত প্রাচীন এরিয়ানা-প্রদেশ আর্য্য-ভাষার (এরিয়ান-গণের ভাষার) আদিস্থান ছিল। আর এক জন পণ্ডিত আবার বহু গবেষণার পর কাশ্মীরের রম্য উপত্যকাকে পৃথিবীর ভাষা-সমূহের আদিস্থান বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ আবার ইউরোপকেই এরিয়ান-গণের (আর্য্যগণের) সুতরাং 'এরিয়ান' (আর্য্য) ভাষার কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আদম-সুমারীর কার্য্য-বিবরণীতে শেষোক্ত মতেরই সমর্থন দেখিতে পাই। ইন্দো-ইউরোপীয়, ইন্দো-চীন, মালয়-পোলিনিশীয়, দ্রাবিড়ী-মুণ্ডা প্রভৃতি নামে ভারতীয় ভাষা-সমূহের আদি-স্তর নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, অস্মদ্দেশ-প্রচলিত প্রাচীন মত অর্থাৎ সংস্কৃত হইতেই ভারতীয় ভাষা-সমূহের উৎপত্তি-মূলক মত পর্য্যন্ত, উপেক্ষিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ-প্রচলিত ভাষা-সমূহের মূলে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। দ্রাবিড়ী-মুণ্ডা নামে ভাষার একটী মূল বংশের পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহাতে ঐ বংশীয় ভাষার উৎপত্তি-মূলে সংস্কৃতের বা ভারতীয় অপর কোনও ভাষার যেন সংস্রব ছিল না বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদগণ বলেন,—'মিশর এবং আরব প্রভৃতি দেশ হইতে বহু সভ্যজাতি ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে পুরাকালে অর্ণব-পথে দাক্ষিণাত্যে গতিবিধি করিতেন। দ্রাবিড়ী-ভাষার মূল—সেই সকল বৈদেশিক সভ্য-জাতির সম্বন্ধ-সংস্রব। এক দিকে, স্থলপথে হিমালয় অতিক্রম করিয়া ইউরোপীয় সভ্য-জাতিরা উত্তর-ভারতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়াছিলেন; ভারতে সংস্কৃতাদি ভাষার উৎপত্তির তাহাই মূল। অন্য দিকে, সমুদ্র-পথে সমাগত সমৃদ্ধিশালী বণিক-সম্প্রদায়ের জ্ঞান-প্রভায় দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল;— কোনও কোনও পণ্ডিত তাই এমনও বলিয়া থাকেন, দ্রাবিড়ী সভ্যতা আর্য্য-সভ্যতার

* Max Muller—*Survey of Languages.*

† Gill—*Antiquity of Hebrew.*

পূর্ব্ববর্ত্তী, আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতার পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য সভ্য ও সমুন্নত হইয়াছিল;—আর তাহা হইতেই দ্রাবিড়ী প্রভৃতি ভাষার অভ্যুদয় হয়। পৃথিবীতে মিশর-রাজ্যে সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল,—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকেই এই মত সমর্থন করিয়া থাকেন। তাহাতে, মিশর হইতে জলপথে সর্ব্বপ্রথমে দাক্ষিণাত্যে সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল এবং সেই সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের ভাষা ও সাহিত্য স্ফূর্ত্তি-লাভ করিয়াছিল,—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। দ্রাবিড়ী-ভাষার বর্ণমালা এবং পদাবলী আলোচনা করিয়াও পণ্ডিতগণ ঐ মতে আস্থা স্থাপন করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, যে ভাষা বা যে বর্ণমালা যত প্রাচীন, সে ভাষা বা সে বর্ণমালা তাদৃশ অসম্পূর্ণ;—সে ভাষা সে বা বর্ণমালা তাদৃশ সৌষ্ঠবসম্পন্ন নহে। দ্রাবিড়ী-ভাষার বর্ণমালায় অনেক বর্ণের অসদ্ভাব আছে। দ্রাবিড়ী বর্ণমালা-সমূহ দেখিতেও সৌষ্ঠবসম্পন্ন নহে। ঐ ভাষা ও বর্ণমালা আদিম জাতির অস্ফুট নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এবম্বিধ নানা কারণে, আধুনিক পণ্ডিতগণ অনেকেই দ্রাবিড়ী ভাষার মৌলিকত্বে এবং প্রাচীন মিশর প্রভৃতি দেশের ভাষার সহিত তাহার সম্বন্ধের কথায় বিশ্বাস করেন।

উপসংহার।

পণ্ডিতগণের গবেষণা প্রভাবে পৃথিবীর সভ্যজাতি-সমূহের ভাষা-সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মত প্রচারিত হইয়াছে। কোনও এক কেন্দ্র-স্থানের আদি-ভাষা হইতে পৃথিবীর ভাষা-সমূহের উদ্ভব হইয়াছে, দুই এক জন পণ্ডিত এ বিষয়ে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিলেও, অধিকাংশ পণ্ডিতই এই মতের সমর্থক। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত, এমন কি—বিংশতি বৎসর পূর্ব্বেও, মধ্য-এসিয়াকেই এরিয়ান-গণের আদি-ভাষার কেন্দ্র-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। সম্প্রতি কেহ কেহ সে মত পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, এবং ইউরোপ হইতে সভ্য-জাতির ভাষার বীজ দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এ সম্বন্ধে দ্বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথম,—সভ্য-জাতির ভাষা-সমূহের একটী কেন্দ্র-স্থান ছিল। দ্বিতীয়,—সেই কেন্দ্রস্থান এই ভারতবর্ষ। কেন্দ্রস্থান একটী ছিল,—এ সিদ্ধান্তের অনেকেই সমর্থক ও পরিপোষক আছেন। সুতরাং এ বিষয়ের অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু শেষোক্ত সিদ্ধান্তে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতেই পৃথিবীর সভ্য-জাতির ও তাঁহাদের ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল—এতদুক্তিতে ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারা যায়, তাহাতে সপ্রমাণ হয়,—(১) সংস্কৃত পৃথিবীর আদি-ভাষা, (২) সংস্কৃত হইতে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। * আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি,—অতি প্রাচীন কালে ভারত-সাম্রাজ্যের সীমানা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আমরা আরও দেখিয়াছি,—ভারতবর্ষের কতকগুলি জাতি, ক্রিয়ালোপ-হেতু শক-যবনাদি নামে অভিহিত হইয়া, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বসবাস করিয়াছিল।

* "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদে, ২৩শ ও ২৪শ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত ভাষার আদিমত্বের বিষয় এবং সংস্কৃত ভাষা হইতে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি-বিষয়ক মতামত দ্রষ্টব্য।

সেই সকল জাতির আদি-ভাষা সংস্কৃত ছিল বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন দেশে আধিপত্য-বিস্তার-পূর্ব্বক সেই সেই দেশের লোকের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদের সংসর্গে, সেই সকল জাতির ভাষার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, ইহাই অনুমান হইতে পারে। বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভাষার দৃষ্টান্তে আমরা দেখাইয়াছি, প্রদেশ-ভেদে—এমন কি জেলায় জেলায়, ভাষার রূপান্তর ঘটিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, পশ্চিম-বঙ্গের কোনও লোক পূর্ব্ব-বঙ্গে গিয়া কিছুকাল বাস করিলে, তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গের পরিবর্ত্তিত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে অভ্যস্ত হন। আবার পূর্ব্ব-বঙ্গের কোনও লোক পশ্চিম-বঙ্গে গিয়া বসতি করিলে, তাঁহারও বাক্য ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপ স্থান-পরিবর্ত্তন-হেতু তাঁহাদের ভাষা—উভয় ভাষার মিশ্রণে, এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করে। তবে, ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়,—যাহা সমুন্নত সভ্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, লোকে স্বভাববশে সেই ভাষার শব্দপরম্পরা আপন ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। সংস্কৃত ভাষা এককালে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়া, অন্যান্য ভাষার উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল,—ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। কোনও কোনও সূক্ষ্মদর্শী পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের উক্তিতেও এ কথা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। বিভিন্ন ভাষার শব্দের সাদৃশ্য-সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্র তালিকা প্রদান করিয়াছি, তদ্দ্বারাও আমাদের উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। পাশাপাশি কয়েকটী শব্দের আকৃতি লক্ষ্য করিলে, সংস্কৃত মূল হইতে যে সেই সকল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। শাস্ত্রমতে,—সভ্য-সমুন্নত সমাজ যুগ-বিবর্ত্তনে দিনে দিনে নিম্নগামী হইতেছে; উন্নত ভাষা ক্রমশঃ অবনত মিশ্র-ভাষায় পরিণত; সভ্য-সমাজ ক্রমশঃ অবনতির পথে প্রধাবিত। কাল-বিবর্ত্তনে উন্নতির দিন আবার আসিতে পারে; নিম্নগত সমাজ আবার সমুন্নত শ্রেষ্ঠ পদবীতে সমারূঢ় হওয়াও অসম্ভব নহে। মনুষ্যের দৃষ্টিতে অধুনা সভ্য-সমুন্নত জাতি বলিতে যে অর্থ উপলব্ধি হয়, সেই দৃষ্টান্তেই সভ্য-সমুন্নত প্রাচীন ভারতের প্রতিচিত্র প্রতি-ফলিত হইতে পারে। আধুনিক মতে, সভ্য-সমুন্নত জাতির প্রধান লক্ষণ—তাঁহারা ভাষায়, ভাবে, চিন্তায়, সর্ব্বত্র আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে কামনা করেন। রোম-সাম্রাজ্য যখন উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, অধিকৃত রাজ্য-সমূহে রোমীয়গণ তখন আপনাদের আচার-ব্যবহার, আপনাদের ভাষা, আপনাদের বর্ণমালা প্রচার করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইংরেজ-জাতির সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলেই বা আমরা কি দেখিতে পাই? ইংরেজ-জাতি যে দেশেই আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, দেখিতে পাই, ক্রমশঃ তাঁহারা সেই দেশেই আপনাদের আচার-ব্যবহারের, আপনাদের ভাষার, আপনাদের বর্ণমালার প্রচলন-পক্ষে চেষ্টা পাইতেছেন। প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে এবং বর্ত্তমান ইংরেজ-জাতির উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিলে, আর একটী নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। আমরা দেখিতে পাই, সভ্য-সমুন্নত প্রাচীন রোম অধিকৃত দেশ-সমূহে এক-ভাষা এক-বর্ণমালা প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন; ইংরেজ-জাতিরও সে চেষ্টার

ত্রুটি নাই। সভ্য-সমুন্নত জাতির আকাঙ্ক্ষা (একটী লক্ষণ বলিলেও বলা যায়) এক-ভাষার এবং এক বর্ণমালার প্রচলন। ভারতবর্ষে কত যুগ-যুগান্ত পূর্ব্বে এক ভাষা—এক-বর্ণমালা প্রচলিত হইয়াছিল, কে তাহা অবগত নহেন? বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতির বিদ্যমানতার বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে সভ্যতার আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইবার কত পূর্ব্বে, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার অঙ্কুরোদ্গমের কত পূর্ব্বে, এই ভারতবর্ষ সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল,—কে না তাহা বুঝিতে পারেন? ঐ যে দেবভাষা আজিও বীণাধ্বনির ন্যায় ঝঙ্কৃত হইতেছে, কোন্ স্মরণাতীত কালে ভারতবর্ষে তাহার অভ্যুদয় হইয়াছিল,—কে না তাহা অবগত আছেন? ভাষা বলিতে তখন একমাত্র সংস্কৃত ভাষাকেই বুঝাইত না কি? ভাষা বলিতে তখন সেই দেব-ভাষার কথাই মনে হইত না কি? সংস্কৃত-ভাষা, সংস্কৃত-সাহিত্য, পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের যে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া রাখিয়াছে, কোনও দেশের কোনও ভাষায় তাহার তুলনা আছে কি? যে দেশের, যে ভাষার, যে সাহিত্যের, ইতিহাস অন্বেষণ করি না কেন, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের ভাষাই মৌলিকত্বে ও প্রাচীনত্বে কখনই সংস্কৃত ভাষার সমকক্ষতা-লাভে সমর্থ হইবে না। যে ভাষা সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে পৃথিবীর আদি-সভ্য-জাতির আদি-ভাষা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই দেবভাষা—সংস্কৃত-ভাষা—এক সময়ে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল;—বেদে, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। * সভ্যতার প্রামাণ্য ইতিহাস ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? এখন যে সকল ভাষা-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা—সংস্কৃত-ভাষার সন্তান-সন্ততি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে; পরন্তু এখন যাঁহারা গর্ব্ব-সহকারে বলিতেছেন,—'হিন্দী-ভাষা, মহারাষ্ট্রী-ভাষা, বঙ্গ-ভাষা প্রভৃতি দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে'; অপিচ, সেই সেই দৃষ্টান্তে যাঁহারা জগতের ভাষা-সমূহের ক্রমোন্নতির পরিচয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন;—তাঁহাদেরই যুক্তির সাহায্যে, তাঁহাদেরই দৃষ্টান্তের অনুসরণে, আমরা কি উচ্চ-কণ্ঠে বলিতে পারি না,—'ভারতবর্ষের উন্নত সভ্য সমাজ অধঃপতিত হওয়ায়, তাহার সার্ব্বজনীন ভাষা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; আর সেই বিশাল মহীরুহের বিচ্ছিন্ন শাখা-প্রশাখায় বারিবিন্দু সেচন করিয়া, তাহাতে অঙ্কুরোদ্গম দেখিয়া, জনসাধারণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে।'

* যখন সংস্কৃত ভাষার একছত্র প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তখনও যে ভারতবর্ষে অন্যান্য মিশ্র-ভাষা প্রচলিত ছিল, ঋগ্বেদে (পঞ্চম মণ্ডলে, উনত্রিংশ সূক্তে, দশম ঋকে) তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই ঋকে দস্যুগণের বিশেষণ-রূপে 'অনাসঃ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই শব্দের অর্থে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন,—'আস্য রহিতান্ আস্য শব্দেন শব্দো লক্ষ্যতে অশব্দান।' উইলসন অর্থ করিয়াছেন,—"Alluding possibly to the uncultivated dialects of the barbarous tribes." তবেই বুঝা যায়, তখনও ভারতবর্ষে অন্যান্য ভাষা প্রচলিত ছিল; কিন্তু সংস্কৃত তন্মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

ভারতের বর্ণমালা।

[বর্ণমালার আদিতত্ত্ব নির্ণয় অসম্ভব,—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে বর্ণমালা ঈশ্বর-সৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ;—শাস্ত্রে বর্ণমালার প্রসঙ্গ,—বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে বর্ণমালার উল্লেখ,—পদ্মপুরাণে বর্ণমালার আকৃতি,—প্রাচীন বর্ণমালার সংখ্যাদির বিষয়;—পাশ্চাত্য-মতে লিপি-সৃষ্টি,—মৌর্ত্তিক অক্ষর,—ভাব-চিত্র, শব্দ-চিত্র এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ বর্ণমালার উদ্ভব;—মিশরীয়, ফিনিসীয়, চীন-দেশীয়, ইবিয় প্রভৃতি বর্ণমালার প্রসঙ্গ;—বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ও আধুনিক বর্ণমালার বিবরণ,—কোন্ বর্ণমালা হইতে কোন্ বর্ণমালার সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর;—ভারত-প্রচলিত বিবিধ বর্ণমালা।]

বর্ণমালার আদি কোথায়?

যত দিন ভাষা, তত দিন বর্ণমালা। জ্ঞান-স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার স্ফূর্ত্তি হয়;—বর্ণমালায় সেই স্ফূর্ত্তি বিকাশ পায়। এই জন্য, ভাষা-সৃষ্টির যেরূপ আদি-কাল নির্ণয় হয় না, বর্ণমালারও সেইরূপ সৃষ্টি-তত্ত্ব নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। যাঁহারা বলেন, খৃষ্ট-জন্মের চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারাও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—এ কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। ফলতঃ, সৃষ্টি কত দিনের, ভাষা কত দিনের; বর্ণমালা কত দিনের,—তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। ভাষা বা বর্ণমালা বলিতে, এ ক্ষেত্রে আমরা কোনও বিশেষ ভাষাকে বা বিশেষ বর্ণমালাকে লক্ষ্য করিতেছি না। কেন না, বিশেষ বিশেষ ভাষার ও বিশেষ বিশেষ বর্ণমালার সময় নিরূপণ পক্ষে প্রায়ই অন্তরায় উপস্থিত হয় না। কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে গেলে, এ কথা নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, বর্ণমালার আদি-কাল নির্ণয় করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। আজি হয় তো এক বর্ণমালা প্রচলিত; পূর্ব্বে সে বর্ণমালা হয় তো আর এক আকারে অবস্থিত ছিল; তাহার পূর্ব্বে বর্ণমালার অপরূপ আকৃতি থাকাও অসম্ভব নহে;—এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে যতই বর্ণমালার পুরাতত্ত্বে প্রবেশ করি, ততই বর্ণমালার উৎপত্তি-বিষয়ে সংশয় ঘনীভূত হইয়া আসে। সংশয়ের ভাব কেবল যে আমাদেরই মনে উদয় হইতেছে, তাহা নহে; এ সংশয় সকল দেশে, সকল সময়েই উপস্থিত হইয়াছে। মিশর-দেশের প্রাচীন মৌর্ত্তিক অক্ষর, চীনাদিগের বর্ণমালা এবং শব্দবোধক অক্ষরের কল্পনা—পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা বর্ণমালার আদি তত্ত্ব আবিষ্কারের কোনও নির্দ্দিষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিবা ইতিহাসে, কিবা কল্পনায়, কোথায়ও বর্ণমালার প্রথম উৎপত্তির নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। তাই জনসাধারণ বর্ণমালা ঈশ্বর-প্রদত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণমালা ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। * এখন, মূল অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া, কোনও কোনও

---

* এ সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের উক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে ৩৬৪ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিতেছেন। উপরে যে আমরা বলিয়াছি; প্রাচীন মিশরের মৌর্ত্তিক অক্ষর বা চীন-দেশের বর্ণমালা প্রভৃতি পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়াও বর্ণমালার আদি-সূত্র অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, সে উক্তি—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরই উক্তি। * যে চিহ্ন বা চিত্র দ্বারা মানুষ আপনার মনের ভাব অঙ্কিত করিয়া রাখে, তাহাই বর্ণ, লিপি বা অক্ষর নামে অভিহিত হয়। কি সভ্য, কি অসভ্য,—সকল সমাজই আবহমান কাল হইতে কোনও-না-কোনও প্রকারে চিত্রাঙ্কন দ্বারা মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে;—পুরাবৃত্তে ও ইতিহাসে তাহার অশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। যাহাদিগকে আমরা 'নিরক্ষর' বলিয়া মনে করি, তাহারাও এক, দুই বা ততোধিক রেখার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ বিষয় আঁকিয়া রাখে। সুশিক্ষিত সভ্য সমাজের নিকট সেই অঙ্কন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া, অক্ষর বা বর্ণমালা সংজ্ঞা লাভ করে; অশিক্ষিত মূর্খ লোকের নিকট তাহা অস্ফুট রেখা-মাত্রে পর্য্যবসিত থাকে। ফলতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়,—সভ্য অসভ্য মূর্খ পণ্ডিত—সকলেরই স্ফুট বা অস্ফুট কোনও-না-কোনও প্রকার বর্ণমালা আছে। মনুষ্য-সৃষ্টির আদি-কাল হইতেই সেইরূপ বর্ণমালার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়।

বর্ণমালা—কত দিনের? লিপি কত কাল হইতে প্রচলিত? পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক এ তত্ত্বের অনুসন্ধানে নানা প্রকারে আলোড়িত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু কেহই যে ধ্রুব-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। আমাদের বেদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই,—'যত দিন ভাষার সৃষ্টি, ততদিন বর্ণমালা'; আমরা বুঝিতে পারি,—'যত দিন বেদ বেদান্ত, ততদিন বর্ণমালা।' সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগেই বর্ণমালা বিদ্যমান আছে। পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ ঋগ্বেদে বর্ণমালার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণে, মহাভারতে বর্ণমালার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। পুরাণ-পরম্পরায় বর্ণমালার পরিচয় তো বিশদ-ভাবেই বিবৃত হইয়াছে! ঋগ্বেদে, দশম মণ্ডলে, একসপ্ততিতম সূক্তে, বর্ণমালার ও ভাষার অস্তিত্বের বিষয় বিশেষভাবে লিখিত আছে। দশম মণ্ডলের সেই সূক্তের চতুর্থ ঋক ও তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বেদে বর্ণমালার অস্তিত্ব তাহাতেই উপলব্ধি হইবে। যথা,—

শাস্ত্রে বর্ণমালার প্রসঙ্গ।

"উতত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥"

অর্থাৎ,—কেহ কেহ কথা দেখিয়াও কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারে না, কেহ শুনিয়াও

*"The Egyptian hieroglyphics, the Chinese characters, and the supposed syllabic alphabets, have been examined, and they do not afford, as is commonly asserted, any clue to lead us to the invention of the alphabet. Since we are unable, either in history or even in imagination, to trace the origin of the alphabet, we must ascribe it, with the Rabbins, who are prepared with authenticated copies of the characters they used, and those of Seth, Enoch, and Noah to the first man, Adam; or we must say with Pliny, *"ex quo appáret æternus liternus usus,"* or we must admit that it was not a human, but a divine invention, &c."

শুনে না। যেমন প্রেম-পরিপূর্ণা সুন্দর-পরিচ্ছদ-ধারিণী ভার্য্যা আপন স্বামীর নিকট নিজ দেহ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ বাগ্দেবী কোনও কোনও ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন।' এই ঋকে লিখিত ভাষার অস্তিত্বের বিষয় বুঝিতে পারা যায়। যাহাদের বর্ণমালা-জ্ঞান নাই, তাহারা দেখিয়াও তাহা দেখিতে পায় না; যাহাদের ভাষা-জ্ঞান নাই, তাহারা শুনিয়াও তাহা বুঝিতে পারে না। ভাষার ও বর্ণমালার অস্তিত্বের ইহা প্রকৃষ্ট পরিচায়ক নহে কি? ভাষা ও বর্ণমালার বিষয় ঋগ্বেদে কিরূপভাবে আলোচিত হইয়াছে, ঐ একসপ্ততিতম সূক্তের অন্যান্য অংশ পাঠ করিলেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ সূক্তের কয়েকটী ঋকের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—'হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্ব্বপ্রথম বস্তুর নাম-মাত্র করিতে পারে; তাহাই তাহাদিগের ভাষা-শিক্ষার প্রথম সোপান। তাহাদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট নির্দ্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তাহা বাগ্দেবীর করুণা-ক্রমে প্রকাশ হয়। ১॥ যেমন চালনী দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই ভাষাতে বন্ধু অর্থাৎ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের বচন রচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী সংস্থাপিত আছে। ২॥ বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞ দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন। ঋষিদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। সেই ভাষা আহরণ পূর্ব্বক তাঁহারা নানা স্থানে বিস্তার করিলেন। সপ্তছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে। ৩॥" এতদুক্তির পরই পূর্ব্বোদ্ধৃত চতুর্থ ঋক। চতুর্থ ঋকে—কেহ কেহ কথা দেখিয়াও কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারে না, কেহ শুনিয়াও শুনে না'—এইরূপ লিখিত আছে। এ সকল আলোচনা করিলে, ঋগ্বেদের সময়ে বর্ণমালার অস্তিত্বের বিষয়ে আদৌ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, ঐ সূক্তের সপ্তম ঋকে আরও একটু স্পষ্ট করিয়াই বর্ণমালার অস্তিত্বের বিষয় উক্ত হইয়াছে, দেখিতে পাই। সেই ঋকের ভাবার্থ,—'যাঁহাদিগের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ অর্থাৎ অদ্বিতীয় ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন।' এতদ্ভিন্ন, ঋগ্বেদের নানা স্থানে মুদ্রার প্রচলন প্রসঙ্গেও বর্ণমালার অস্তিত্বের পরিচয় পাই। মুদ্রায় যে অক্ষর ছিল, তাহা নানা-রূপেই বুঝা যায়। এ দেশে লিখিত ভাষা প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,—আর্য্যগণ উত্তর-প্রদেশে ভাষা-শিক্ষার জন্য গমন করিতেন। তাহাতেই বা কি উপলব্ধি হয়? ভাষা যদি লিখিত না হইত, তাহা হইলে কি সে ভাষা শিক্ষা হওয়া সম্ভবপর? কৌষীতকী ব্রাহ্মণের সেই অংশটী এই,—

> "পথ্যাস্বস্তি রুদীচীং দিশং প্রজানাদ্ বাগ্ বৈ পথ্যাস্বস্তিস্তস্মাদ্ উদীচ্যাং দিশি
> প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত
> আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।"

অর্থাৎ—'পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিকের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। বাণীই পথ্যাস্বস্তি। এই হেতু উত্তর দিকেই বাক্য অধিকতর বিজ্ঞাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তর-দিকেই ভাষা-শিক্ষার্থ গমন করে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি ঐ দিক হইতে

আগমন করেন, লোকে তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়। কারণ, লোকে কহে, উহা বাক্যের দিক বলিয়া বিদিত আছে।' এতদুক্ত উত্তর-দেশ সম্বন্ধে অবশ্য মতান্তর আছে। আমরাও তদ্বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। * উত্তর-দেশ শব্দে যে দেশকেই বুঝা যাউক না কেন, কৌষীতকী ব্রাহ্মণের উক্তিতে বেশ বুঝিতে পারা যায়,— ঐ সময়ে ভাষা ও বর্ণমালা নিশ্চয়ই পরিপুষ্ট ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন ছিল। সামবেদের অন্তর্গত গোপথ-ব্রাহ্মণে অক্ষরের ও বর্ণের লক্ষণ লিখিত আছে। তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে অক্ষরের ও বর্ণের আভাষ পাওয়া যায়। উপনিষদে বর্ণ, স্বর, মাত্রা প্রভৃতি নাম দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে, 'শীক্ষাবল্লী' প্রকরণে, লিখিত আছে,—'বর্ণঃ, স্বরঃ, মাত্রা, বলং, সাম সন্তানঃ' ইত্যাদি। ছান্দোগ্য-উপনিষদে শ্লোক, অক্ষর, স্পর্শ-বর্ণ, উষ্মবর্ণ এবং স্বরবর্ণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যথা,—"সর্ব্বে স্বরা ইন্দ্রস্যাত্মানঃ সর্ব্ব উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ সর্ব্বেস্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষূপালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতিবক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ"; ইত্যাদি। শ্রুতি এবং স্মৃতি শব্দদ্বয়ের বিদ্যমানতায় তদতিরিক্ত লিখিত ভাষার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। বৈদিক-মন্ত্র ব্রাহ্মণেতর জাতির অধিগত না হয়,—এই উদ্দেশ্যে, এক সময়ে উহা ব্রাহ্মণগণের মুখে মুখে প্রচারিত হইত। স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইত বলিয়াই স্মৃতি নামের সার্থকতা। ইহাতে দ্বিবিধ শাস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, অনুমানে তাহাও বুঝিতে পারি; অনুমানই বা বলি কেন, শ্রুতির এবং স্মৃতির মন্ত্রের ও শ্লোকের মধ্যেও সে পরিচয় প্রাপ্ত হই। শ্রুতিতে কি ভাবে বর্ণমালার বিষয় উক্ত হইয়াছে, সে পরিচয় উপরেই প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে, স্মৃতি সংহিতা-শাস্ত্রে কিরূপ-ভাবে তদ্বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দেখিতে পাই,—

স্মৃত্যাচার ব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ। আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ॥
প্রত্যর্থিনোঽগ্রতো লেখ্যং যথাবেদিতমর্থিনা। সমামাসতদর্দ্ধাহর্নামজাত্যাদিচিহ্নিতম্॥"
শ্রুতার্থস্যোত্তরং লেখ্যং পূর্ব্বাবেদক সন্নিধৌ। ততোঽর্থী লেখয়েৎ সদ্যঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসাধনম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫ম—৭ম শ্লোক।

অর্থাৎ,—'স্মৃতি ও আচার-বিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্যবহার-দর্শকের নিকট উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করিলে, তাহা ব্যবহারের বিষয় হইবে; উক্ত নিবেদন এবং প্রতিবাদীর সমক্ষে লিখনের নাম—ভাষা, পক্ষ কিংবা প্রতিপ্রজ্ঞা। বাদী মকদ্দমা রুজু করিবার সময় যাহা বলিয়াছিল, প্রতিবাদীর সম্মুখে তাহাই লেখা, এবং সেই লেখ্যে (যথাযোগ্য) বৎসর, মাস, পক্ষ, তিথি, বারাদি ও বাদি-প্রতিবাদীর নাম-জাত্যাদি উল্লিখিত থাকিবে। ভাবার্থ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী যাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর সমক্ষে লেখাইতে হইবে। অনন্তর বাদী তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লিখিবেন।' ইত্যাদি। অন্যত্র,—

দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যঞ্চ কারয়েৎ। আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ॥
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্। অভিলেখ্যাত্মনো বংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ॥
প্রতিগ্রহপরীমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনম্। স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্॥

—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ৩১৮শ—৩২০শ শ্লোক।

* এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের ২১শ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ,—'রাজা ভূমিদান বা নিবন্ধ (কোনও বিষয়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) করিলে ভাবী সাধু রাজার পরিজ্ঞানার্থ লেখা করাইবেন। রাজা কার্পাসাদি পটে, বা তাম্রফলকে নিজ বংশ পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের, আপনার ও প্রতিগৃহীতার নাম, প্রতিগ্রহের (অর্থাৎ নিবন্ধের) পরিমাণ এবং গ্রাম-ক্ষেত্রাদি প্রদত্ত ভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ-নির্দ্দেশ, এই সকল বিষয় লিখিবেন; উক্ত পত্রে আপন হস্তাক্ষর (দস্তখৎ) থাকিবে। কালের (অর্থাৎ সন, মাস, তারিখ) উল্লেখ থাকিবে এবং উহা নিজ মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়া দৃঢ়শাসন (পাকা দলিল) করিয়া দিবেন।' মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে ব্যবহার, দর্শন, নিয়ম এবং সাক্ষি-বিবরণ প্রসঙ্গে লেখ্যাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়ের সপ্ত-চত্বারিংশ, একপঞ্চাশৎ ও দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোকত্রয়ের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। কিরূপভাবে তখন লেখ্যাদি প্রচলিত ছিল, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। শ্লোকত্রয়ের বঙ্গানুবাদ,—"উত্তমর্ণ অর্থাৎ মহাজন অধমর্ণের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকার প্রার্থনা করিয়া যদি আবেদন করে, তবে রাজা সাক্ষি-লেখ্যাদির দ্বারা প্রদত্ত ধন প্রমাণ করিয়া, অধমর্ণের নিকট হইতে ঐ ধন উত্তমর্ণকে দেওয়াইবেন। ৪৭॥ 'আমি তোমার ধারি নাই' বলিয়া উত্তমর্ণের ধন অধমর্ণ অপহ্নব করিলে পর, যদি উত্তমর্ণ সাক্ষি-লেখ্যাদির দ্বারা ধার প্রমাণ করাইতে পারে, তবে রাজা উত্তমর্ণকে ধন দেওয়াইবেন এবং অধমর্ণকে তাহার শক্তি বুঝিয়া অপহ্নবের দণ্ড করিবেন। ৫১॥ ধর্ম্মাধিকরণ সভা 'দেনা দাও' বলিলে, যদি অধমর্ণ ঐ দেনা অস্বীকার করে, তবে অভিযোক্তা—ঋণগ্রহণকালীন বর্ত্তমান সাক্ষী, লেখ্য বা অন্য প্রমাণাদি সভাতে নির্দ্দেশ করিবেন।" উদ্ধৃত অংশের মূল শ্লোকে 'লিপি,' 'লেখ্য' বা 'লিখিত' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু শ্লোকে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহার টীকায় কুল্লূক ভট্ট যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারেই শ্লোকত্রয়ের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে। তত্তৎস্থলে লিপি অর্থই যে সিদ্ধ হয়, তাহাতে সংশয় নাই। এতদ্ভিন্ন উক্ত অধ্যায়ের ১৬৮ম শ্লোকে 'লেখিত' শব্দটীও ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

"বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্ যচ্চাপি লেখিতম্। সর্ব্বান্ বলকৃতানর্থানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ॥"

অর্থাৎ,—'বলপূর্ব্বক যাহা কিছু দত্ত হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু ভুক্ত হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু লেখিত হয়, সকলই অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধ, ইহা মনু বলিয়াছেন।' বিষ্ণুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে লেখ্যপত্র বিষয়ে ত্রয়োদশটী সূত্র দৃষ্ট হয়। ত্রিবিধ লেখ্য অর্থাৎ দলিল (লেখ্যং ত্রিবিধং) তৎকালে প্রচলিত ছিল এবং কি ভাবে সেই সকল দলিল প্রস্তুত হইত, সপ্তম অধ্যায়ের সূত্র-কয়েকটিতে তাহা বিবৃত আছে। কাত্যায়ন, নারদ প্রভৃতিও লেখ্যাদি সাক্ষীর বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রামচরিত রামায়ণের রচনায়, বাল্মীকি কর্ত্তৃক রামায়ণ-গ্রন্থ 'লিখিত' হইয়াছিল—প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সীতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, হনূমান তাঁহাকে রাম-নামাঙ্কিত স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক দেখাইয়াছিলেন। রামায়ণের সময়ে বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। রামায়ণে, সুন্দর-কাণ্ডে, ষট্ত্রিংশ সর্গে, অঙ্গুরীয়ক-প্রদর্শন-বিষয়ক বর্ণনা এইরূপ-ভাবে লিখিত আছে,—

"ভূয় এব মহাতেজা হনূমান্ পবনাত্মজঃ। অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সীতাং প্রত্যয়কারণাৎ॥

বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ। রামনামাঙ্কিতঞ্চেদং পশ্য দেবাঙ্গুলীয়কম্‌।

প্রত্যয়ার্থং তবানীতং তেন দত্তং মহাত্মনা। সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ক্ষীণদুঃখ ফলা হ্যসি॥"

অর্থাৎ,—অতুল-প্রতাপশালী পবননন্দন হনুমান, সীতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, বিনীতভাবে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—'মহাভাগে! আমি যথার্থই বানর ও ধীমান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের দূত। বিশেষতঃ, তাঁহার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয়ক দেখুন। মহাত্মা রাম ইহা আমাকে দিয়াছেন; আমি আপনার বিশ্বাসের জন্য ইহা আনিয়াছি। এইবারে আপনার দুঃখের অবসান হইয়াছে; সুতরাং আপনি আশ্বস্তা হউন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ব্রাহ্মী বর্ণমালার বিষয় এবং তাহাতে বেদাদি লিখিত হওয়ার প্রসঙ্গ আছে। মহাভারতের অন্যত্র আবার দেখিতে পাই,—বেদ-বিক্রয়কারী বেদ-নিন্দক এবং বেদলেখকগণ নিরয়গামী হয়। পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ডে, ত্রিষষ্টিতমাধ্যায়ে দেব-লিপির বিষয় বিশদভাবে উক্ত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে সেখানে শম্ভু বলিতেছেন,—

পুরাণজীবী পূজার্হঃ স্বশাখাধ্যয়নঃ শুচিঃ। মীমাংসাতত্ত্ববিজ্ঞানঃ শ্রোত্রিয়োঽনৃতদূষকঃ॥

দেবেষু চ সমস্তেষু সমদৃষ্টিঃ শিবে রতঃ। শতরুদ্রীয়জাপী চ সাগ্নিকশ্চাতিবাচকঃ॥

যজুর্ব্বেদী বিশেষেণ পূজয়েৎ পুস্তকং সুধীঃ॥ শ্রীতালপত্রলিখিতং দেবলিপ্যন্বিতং শুভম্‌॥

অর্থাৎ,—পুরাণ পাঠ যাঁহার উপজীবিকা, যিনি নিজ শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি পবিত্রাত্মা ও শ্রোত্রিয়, মীমাংসা-তত্ত্বে যাঁহার সবিশেষ জ্ঞান ও সমুদায় বেদে যাঁহার সমদৃষ্টি আছে, যিনি মিথ্যার দোষ দেখাইয়া থাকেন এবং যিনি মহেশ্বরে অনুরক্ত, শত-রুদ্রীয়যাপী, সাগ্নিক, অতিবক্তা ও সুবুদ্ধিশালী, তাদৃশ পূজার্হ ব্যক্তিই সুন্দর তালপত্রে দেবাক্ষর লিখিত সুন্দর পুস্তকের পূজা করিবেন; বিশেষতঃ, তিনি যজুর্ব্বেদী হইলে আরও উত্তম হয়।" ইহাতে বুঝিতে পারা গেল, তালপত্রে লিখিত দেবলিপি শুভসূচক; অর্থাৎ, তাল-পত্রের পুঁথিতে এক সময়ে শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিত হইত এবং সেই লিপি দেবলিপি নামে অভিহিত ছিল। সেই দেবলিপির আকৃতি কিরূপ ছিল, শম্ভু তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা,—

বক্ষ্যাম্যস্তিপ্রচস্পটযুগলাৎপ্রণবাক্ষরম্‌॥ প্রাগূর্দ্ধং রেখয়োঃ প্রান্তে প্রণবস্যাগ্রযোজিকা॥

রেখৈকা তু ভবেদেব মকারস্তস্য পার্শ্বতঃ। শিরোভাগমুপক্রম্য সকোণাধঃ প্রলম্বিনী॥

আকারঃ স হি বিজ্ঞেয়ঃ পট্টিকাদক্ষরেখয়া। বামে ষড়্‌বক্রবিন্দু দ্বাবিকার ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

তস্য বামশিরোরেখালম্বিন্যা ঈ উদাহৃতঃ। সর্ব্বাক্ষরে শিরোরেখা অবক্তা প্রণবং বিনা॥

তস্যান্ত লম্বরেখা স্যাত্তদন্তে চ লবিত্রবিৎ। উকারঃ সহি বিখ্যাতো লবিত্রদ্বয়তস্তদু॥

অর্থাৎ,—"প্রথমে দুই দাঁড়ী, তৎপরে প্রণবাক্ষর; প্রথমে দুইটি বক্র রেখা (ঊর্দ্ধ ও অধোভাবে রাখিবে), সেই দুইটির প্রান্ত যেন পরস্পর মিলিত হয়; তাহার অগ্র অর্থাৎ উপরি-ভাগে আর একটি (বিন্দুযুক্ত) বক্র রেখা থাকিবে। তাহার পর আকার লিখিবে। উপর দিক হইতে রেখা টানিবে। তাহাতে কয়েকটি কোণ আছে। তৎপরে অধোদেশে একটি লম্বা-রেখা, অধোকোণ হইতে আবার উপর দিকে রেখা দিলে অকার লিখিত হয়। অকারের সর্ব্বশেষে যে রেখা টানিবে, তাহা পট্টিকা অর্থাৎ দাঁড়ি—সরল-ঊর্দ্ধ-অধোলম্বিত রেখা তাহার দক্ষিণে আর একটি ঐরূপ রেখা মিলাইয়া দিলে অকার হয়। বামভাগে দুইটি বিন্দু অর্থাৎ পুঁটুলী, চারিটি বক্র রেখা, এই ছয়টি বস্তুতে ইকার হয়। ইকারের উপরিভাগ

হইতে টানিয়া সর্ব্বনিম্নে যে বক্র-রেখা তাহাকে বামে রাখিয়া, পরে একটি বক্র লম্বমান রেখা অর্থাৎ প্রথম উর্দ্ধমুখ ও পরে অধোমুখ রেখা টানিলে ঈকার হয়। সকল অক্ষরেরই মাত্রা সরল; কেবল প্রণবের মাত্রা বক্র। অর্থাৎ ইকার ঈকার লিখিতেও মাথার বক্র রেখার নিম্নে সরল মাত্রা দিবে; কিন্তু প্রণবে তাহা দিবে না। শিরোরেখার নিম্নে একটি উর্দ্ধ-অধঃ-লম্বিত সরল রেখা, তন্নিম্নে লবিত্রবৎ অর্থাৎ কাস্তের ন্যায় বক্র-রেখা টানিলে উকার হয়। দুইটী বক্র রেখা টানিলে ঊকার হয়।” শ্লোক-কয়েকটীর অর্থ লইয়া অনেক সময় মতান্তর ঘটিয়া থাকে। শ্লোক-কয়েকটির ব্যাখ্যান্তর করিয়া, কেহ কেহ ইহা হইতেও বিভিন্ন প্রকার অক্ষরের (কেহ বা দেবনাগর অক্ষরের, কেহ বা বঙ্গাক্ষরের) দেবলিপিত্ব প্রতিপাদন করেন। * যাহা হউক, দেবলিপিতে যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়, তাহার বিবরণ শম্ভু পরিশেষে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট এইরূপ-ভাবে ব্যক্ত করেন,—

এবমন্যানি সর্ব্বানি হ্যক্ষরাণ্যাহ ভারতী। লিপ্যানয়ৈব লিখিতং পুরাণন্তু প্রশস্যতে॥
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ মার্ত্তণ্ডং নারদেরিতম্। মার্কণ্ডেয়মথাগ্নেয়ং কৌর্ম্মং বামনমেব চ॥
গারুড়ং লৈঙ্গমাখ্যাতং স্কান্দং মাৎস্যং নৃসিংহকম। তথৈব গদিতং রাম পুরাণং কাপিলং তথা॥
বারাহং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং শকুনেষু প্রশস্যতে। শৈবং ভাগবতং দৌর্গং ভবিষ্যোত্তরমেব চ॥
ভবিষ্যং চোপসংজ্ঞানি ত্বন্যানি চ বিবর্জ্জয়েৎ। বিমুচ্য পুস্তকে রর্জ্জং পীঠে নিক্ষিপ্য সংস্কৃতম্॥

অর্থাৎ—দেবী ভারতী অক্ষর-সমূহের বর্ণনা করিয়া বলেন,—দেবাক্ষরে লিখিত ব্রাহ্ম, পদ্ম, বৈষ্ণব, সৌর, নারদ, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, কৌর্ম্ম, বামন, গারুড়, লৈঙ্গ, স্কান্দ, মাৎস্য, নারসিংহ, কাপিল, বরাহ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শকুন (শুভাশুভ-সূচক চিহ্ন) জ্ঞানে প্রশস্ত। শিবপুরাণ, ভাগবত, দুর্গামাহাত্ম্য-সূচক পুরাণ, ভবিষ্যোত্তর ভবিষ্য এবং সৌর, কাপিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপপুরাণ শকুন-জ্ঞানে প্রশস্ত নহে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ব্রাহ্মী বা দৈবী অক্ষরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। গরুড়পুরাণে, পূর্ব্বে-খণ্ডে, বর্ণমালার এবং ব্যাকরণের প্রসঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়। † পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে ‘লিপি’ ও ‘লিবি’ দৃষ্টে অনেকে লিপির প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ করেন। নিষ্ক এবং রূপ্য প্রভৃতি মুদ্রাবাচক শব্দও পাণিনির ব্যাকরণে উল্লিখিত আছে। তদ্দ্বারাও প্রাচীন বর্ণমালার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। পাণিনির ব্যাকরণের প্রারম্ভে যে মাহেশ্বর-সূত্র-চতুর্দ্দশ আছে,—সেই সূত্রগুলি বর্ণমালার শ্রেণি-বিভাগ মাত্র। তাঁহার ব্যাকরণে লিপিকর শব্দ ও তাহার সাধন-প্রণালী দৃষ্টে পাণিনির পূর্ব্বে বর্ণমালার বিদ্যমানতার বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন। গোল্ডষ্টুকার (Goldstucker) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,— খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে পাণিনির ব্যাকরণ লিখিত হয়। তাহার কত কাল পূর্ব্বের গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া, পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পাণিনির পূর্ব্বে যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়ন, ব্যাস এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ গ্রন্থাদি রচনা করিয়া যান, পাণিনির সূত্রে তাহা স্পষ্টতঃ ব্যক্ত আছে। সুতরাং পাণিনির

---

* ‘তন্ত্র শাস্ত্র এবং প্রাচীন আবিষ্কৃত অক্ষর দেখিলে, বাঙ্গলা অক্ষরকেই দেবাক্ষর বলা উচিত। তজ্জন্য ব্যাখ্যান্তর পরিত্যাগ করিয়া, বঙ্গাক্ষর তাৎপর্য্যেই অনুবাদ করা হইল’—পদ্মপুরাণ, পাতাল-খণ্ড, ‘বঙ্গবাসী’ কার্য্যালয়ের অনুবাদ।

† গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ২০৯ম অধ্যায় হইতে ২১৬ম অধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

বহু পূর্ব্বে এ-দেশে লিপি প্রচলিত ছিল, সকলকেই তাহা অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হয়। 'ভারতের ভাষা' পরিচ্ছেদে, ভাষা-প্রসঙ্গে, আমরা দেখাইয়াছি,—বুদ্ধদেব চৌষট্টি প্রকার লিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচীন জৈনগ্রন্থে (নান্দীসূত্রে) ছত্রিশ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে। তার পর কত প্রকার লিপি কত দিন হইতে ভারতে প্রচলিত, অনুসন্ধিৎসু-গণের তাহা অবিদিত নাই।

ভারতে অনাদিকাল হইতে বর্ণমালার প্রচলন ছিল—ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত আলোচনায় তাহাই প্রতীত হয় বটে; কিন্তু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বর্ণমালার উৎপত্তির কয়েকটি বিশেষ স্তর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—বর্ণমালার প্রথম স্তর—মৌক্তিক অক্ষর বা বস্তু চিত্র (Hieroglyphics)। মানুষ প্রথমে প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া, বস্তু-মাত্রকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইত। তাহাদের মনের ভাব বিশেষও সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি দ্বারা প্রকটিত হইত। বলদ বুঝাইতে হইলে, তাহারা বলদের একটী প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিত; কিম্বা সংক্ষেপতঃ বলদের মুখ ও শৃঙ্গ অঙ্কিত করিয়া দেখাইত। ভাব-ব্যক্তি সম্বন্ধেও তাহারা এইরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করিত। জ্ঞানের বা দৃষ্টি-শক্তির কার্য্য বুঝাইবার জন্য, তাহারা চক্ষু আঁকিয়া দেখাইত; গতিবিধির ভাব বুঝাইবার জন্য দুই খানি পা অঙ্কন করিত। ইহাই বস্তু-চিত্র, মৌক্তিক অক্ষর বা Hieroglyphics। এই বস্তু-চিত্র ক্রমশঃ দ্বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাহার এক মূর্ত্তি—ভাব-চিত্র (Ideograph); অপর মূর্ত্তি—শব্দ-চিত্র- (Phonetics)। ভাষা-সৃষ্টির আদিকাণ্ডে ভাব-চিত্রণই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সে কত দিন পূর্ব্বের কথা, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে খৃষ্ট-জন্মের দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে শব্দ-চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছিল,—প্রাচীন স্মৃতি-স্তম্ভাদি দৃষ্টে তাহা প্রতিপন্ন হয়। শব্দ-চিত্র হইতে শব্দাংশ এবং তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে বর্ণের উৎপত্তি হয়। পণ্ডিতগণ ভাব-চিত্রকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম,—সরল ভাব-চিত্র (Simple Ideographs); অর্থাৎ যে চিত্র দ্বারা একটী মাত্র ভাব ব্যক্ত হয়। দ্বিতীয়,—বহু-ভাব চিত্র (Determinative Ideographs), অর্থাৎ যদ্দ্বারা বহু ভাব ব্যক্ত হয়। সকল অবস্থাতেই ভাব-চিত্রের পূর্ব্বে প্রায়শঃ শব্দ-চিত্রপুঞ্জ অবস্থিতি করে। লিখিত ভাষায় যে সকল ভাব প্রকাশ হয়, শব্দ-চিত্রপুঞ্জের সহযোগে ভাব-চিত্র-সমূহে সেই ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। সরল-ভাব-চিত্র সমূহের পূর্ব্বে একটি মাত্র শব্দ-চিত্র অবস্থিতি করে; বহু ভাব বুঝাইতে বহু শব্দ-চিত্রপুঞ্জের আবশ্যক হয়। ভাব-চিত্র বহুবিধ। প্রথম,—যে ভাবচিত্র প্রত্যক্ষভাবে যদ্দিষ্ট সামগ্রীকে বুঝাইয়া থাকে; যেমন—কুকুর বুঝাইতে কুকুরের মূর্ত্তি অঙ্কন। দ্বিতীয়,—উপমার দ্বারা অর্থবোধ; যেমন—কোনও স্ত্রীলোক করতাল বাজাইতেছে, এইরূপ মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া আনন্দের ভাব প্রকাশ; অর্থাৎ, কার্য্য দ্বারা মনের ভাব অনুভব। আনন্দের সময়েই করতাল বাদন সম্ভবপর; সুতরাং ঐ চিত্রে আনন্দই পরিকল্পিত হয়। তৃতীয়,—কোনও বস্তুর গুণ বুঝাইবার জন্য তদ্বস্তুর চিত্রাঙ্কনে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা; যেমন ধূর্ত্ততা বুঝাইবার জন্য শৃগালের মূর্ত্তি প্রকটন; যেমন

পাশ্চাত্য-মতে লিপি-সৃষ্টি।

মৌত্তিক অক্ষরের আদর্শ।

HIROGLYPHICS.

মিশরের প্রাচীন মৌত্তিক অক্ষর কিরূপ ছিল এবং সেইগুলি কিরূপ-ভাবে উচ্চারিত হইত, নিম্নে তাহার কয়েকটীর প্রতিচিত্র প্রদান করিতেছি। যথা,—

মূর্ত্তি	নাম	উচ্চারণ	মূর্ত্তি	নাম	উচ্চারণ
	ইগল পক্ষী	আ		সিংহের সম্মুখ-ভাগ	হে
	বাহু	য়া		জড়ান দড়ি	হি
	রিড বা শর	ঔ		হস্তি দন্ত	হু
	বকপক্ষী	ব		ছুরি	হু
	চরণ	বু		রিড় বা শরদ্বয়	আই ইউ
	—	উ-ই		দুটী বক্র রেখা	আই-ই-ইউ
	ঈগলপক্ষী-শাবক	গ		চামচে	কা, ক
	পুষ্পপাত্র	গা		পদ্মপত্র	ক্ষ
	সর্প	গি		মৎস্য বিশেষ	ক্ষা
	টুলের পয়া	হ		আশা--সোটা	খা
	গৃহ	হা-হা-হা		চালুনি	ক্ষি
	পেপিরাস বৃক্ষ	হা		ত্রিপদ	কোয়া
	গো-বৎস্য	আউ বা কাহু		তুণীরের অগ্রভাগ	স
	পোষাক	,,		রাজহ স	সা
	সিংহ	রু বা লু		পরেণ সূত্র	শা
	মুখ	,,		রিড (অন্যরূপ)	সু
	কলম	মা		তীর	সু
	ওজন	,,		কোদারার পশ্চাদংশ	শা
	গর্ব্ব	মে		বাগান	এস্হা
	পেচক	মু		পরিচ্ছদাংশ	,,
	শকুনি	,,		জলাশয়	এস্ছি
	রেখা	না		মাকু	টা
	লাল মুকুট	,,		হস্ত	টি
	পুষ্পপাত্র	নু		জড়ান দড়ি	তি
	উড্ডীয়মান হংস	পা		যাঁতা	টু
	বাঁধ	পু		হংসশাবক	উ-ই
	হাটু	কে		কোঁকড়ান দড়ি	,,

[৪০৮ পৃষ্ঠা।]

মৌর্ত্তিক অক্ষর।

পূর্ব্ব-পৃষ্ঠায় অঙ্কিত চিত্রের দুই বা ততোধিক চিত্রের একত্র সমাবেশে এক সময়ে প্রয়োজনানুরূপ বাক্য লিখিত হইত। মিশর দেশের চতুর্থ রাজবংশের রাজত্ব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশ রাজবংশের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত এই সকল চিহ্ন অক্ষররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই একবিংশতি রাজ-বংশের রাজত্ব-কালের পর ক্রমশঃ আরও প্রায় নব্বই প্রকার নূতন চিহ্ন সংযোজিত হয়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত তৎসমুদায়ের প্রচলন ছিল।

* * *

(ভাব-চিত্রের ও শব্দ-চিত্রের আদর্শ।)

(১) কুকুর বুঝাইতে এইরূপ কুকুরের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত, ইহাই ভাব-চিত্রের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বলিয়া কথিত হয়।

(২) একটী স্ত্রীলোক করতাল বাজাইতেছে; এই চিত্রে আনন্দের ভাব পরিকল্পিত। ইহাই ভাব চিত্রের দ্বিতীয় স্তর। এই চিত্রে উপমা দ্বারা অর্থ জ্ঞাপন হয়।

(৩) ধূর্ত্ততা বুঝাইতে শৃগালের মূর্ত্তি অঙ্কন; ইহা ভাব চিত্রের তৃতীয় স্তর। এখানে গুণ বুঝাইবার জন্য সেই গুণ সমন্বিত বস্তুর চিত্রাঙ্কন হইয়াছে। সদ্গন্ধ বুঝাইতে ধূনাচির চিত্রাঙ্কন এই স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

(৪) সরাসরি কার্য্য বুঝাইতে যে চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহা ভাব-চিত্রের চতুর্থ স্তর। যেমন মাছধরা বুঝাইতে পক্ষীর পদতলে মৎস্যের চিত্রাঙ্কন।

(৫) এক এ চিত্রে বহু ভাব প্রকাশের চেষ্টা। যেমন একটী উপবিষ্ট মনুষ্যের মূর্ত্তি আঁকিয়া, তদ্দ্বারা পিতা, ভ্রাতা, শাসনকর্ত্তা, পুরোহিত প্রভৃতি সর্ব্ব-শ্রেণীর মনুষ্যকে বুঝান হইয়া থাকে। মূল্যবান প্রস্তর বা প্রস্তর-নির্ম্মিত সামগ্রী প্রভৃতি বুঝাইতে এইরূপ O রিং বা অঙ্গুরীয় আঁকা হয়; গতি বুঝাইতে চরণদ্বয় অঙ্কন। সর্ব্ববিধ হস্তের কার্য্য বুঝাইতে হস্তদ্বারা যষ্ঠি-ধারণ প্রভৃতি মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত।

(৬) আসিরীয়া দেশে মনুষ্য-মাত্রের নামের পূর্ব্বে এইরূপ একটী ফলক অঙ্কিত হইত। দেশের নামের পূর্ব্বে তিনটী ফলক বক্রভাবে অবস্থিতি করিত। শৃঙ্গযুক্ত পশুর পূর্ব্বে এইরূপ একত্র-সম্বদ্ধ ফলক অঙ্কিত হইত।

(৭) চীন দেশের মৌর্ত্তিক গুণাবাচক বিশেষণ, বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয়। যেমন স্ত্রীলোক বুঝাইতে 女 (উচ্চারণ নেউ) মূর্ত্তি এবং সৎ-স্ত্রী বুঝাইতে 好 চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকে; তাহার উচ্চারণ—'হাও'।

(৮) মিশর দেশের মৌর্ত্তিক চিত্রে সময় সময় এক বস্তু বা ভাব বুঝাইতে একই সামগ্রীর চিত্র একাধিক বার ব্যববার ব্যবহৃত হইতেও দেখা গিয়াছে। যেমন স্বর্ণ বা রৌপ বুঝাইতে অঙ্গরাখা ও তাহার নিম্নে তিনটী রিং বা অঙ্গুরীয়ক অঙ্কন; পদ্মপুষ্প বুঝাইতে কাণ্ড বিশিষ্ট তিনটী পদ্মফুল অঙ্কন।

সদ্‌গন্ধ বুঝাইতে ধূপধার বা ধুনাচীর চিত্র অঙ্কন। তৃতীয়,—সময় সময় সরাসরি কার্য্য বুঝাইবার জন্য কার্য্যের অনুরূপ চিত্র অঙ্কন; যেমন একটী পক্ষী মৎস্য ধরিতেছে, এই চিত্রে সাধারণ-ভাবে মৎস্য-ধরার ভাব ব্যক্ত হয়। এইরূপভাবে এক একটী বিষয় বুঝাইতে, এক একটী চিত্রের অবতারণা করিতে করিতে চিত্রের সংখ্যা যখন অসংখ্য হইয়া পড়িল, তখন সেই অসংখ্য চিত্রের ধারণা করা লোকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া আসে। কাজেই ভাব-চিত্রের সংখ্যা কমাইয়া আনিবার জন্য, বস্তু-চিত্রের সাহায্যে এক এক চিত্রে অধিক ভাব প্রকাশের চেষ্টা চলিতে লাগিল। যেমন, একটী উপবিষ্ট মনুষ্যের মূর্ত্তি আঁকিয়া তদ্দ্বারা পিতা, ভ্রাতা, শাসনকর্ত্তা, পুরোহিত শ্রমজীবী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মনুষ্যকে বুঝাইবার ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বে ঐ মূর্ত্তিতে কেবল মনুষ্য বুঝাইত; কালক্রমে ঐ মূর্ত্তির সহিত (মূর্ত্তির পূর্ব্বে বা পশ্চাতে) অন্য চিত্র সংযোজিত হইয়া, ঐ চিত্রে নানা ভাব ব্যক্ত হইতে লাগিল। এইরূপ সর্ব্ববিধ পশু এবং সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম বুঝাইতে চর্ম্মের প্রতিকৃতি ব্যবহৃত হইত। সর্ব্ববিধ মূল্যবান প্রস্তর বা প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি বুঝাইতে 'রিং' বা অঙ্গুরীয়, গতি বুঝাইবার জন্য দুইটী চরণ এবং বাহুদ্বয়ের কার্য্য বুঝাইবার জন্য হস্ত দ্বারা যষ্টি-ধারণ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। মিশর-দেশের প্রাচীন স্তম্ভ প্রভৃতির লিপির নিগূঢ়-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া প্রধানতঃ এই সকল বিষয় আবিস্কৃত হইয়াছে। এবম্প্রকার চিহ্নের সংখ্যা মিশরে এক সময়ে ১৭৫টীর কম ছিল না। আসিরীয়-দেশে কিলাকার চিত্র সকল অঙ্কিত হইত। তাহার অঙ্কন-পদ্ধতি মিশর-দেশের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি হইতে আরও একটু স্বতন্ত্র। আসিরীয় দেশে মনুষ্য-মাত্রের নামের পূর্ব্বে একটী ফলক সরলভাবে অঙ্কিত হইত। দেশের নামের পূর্ব্বে সেইরূপ তিনটী ফলক বিনম্রভাবে চিত্রিত থাকিত। শৃঙ্গযুক্ত পশুর নামের পূর্ব্বভাগে তদ্রূপ পাঁচটী ফলক পাশাপাশি পুঞ্জাকারে স্থাপিত হইত। মিশরদেশীয় রীত্যনুসারে শব্দচিত্র-পুঞ্জের পুরোভাগে অতিরিক্ত পরিচায়ক-চিত্র অবস্থিতি করিত; সে চিত্র অঙ্কিত না হইলেও চলিত। যেমন, একটি মেষ অঙ্কন করিয়া, তাহার পার্শ্বে এক খণ্ড চর্ম্মের চিত্র অঙ্কন করিলে তদ্দ্বারা মেষ-জাতীয় পশুকে নির্দ্দেশ করিত; একটি পদ্ম আঁকিয়া তাহার পুরোভাগে তিনটি ফুল অঙ্কিত করিলে, তদ্দ্বারা সাধারণতঃ পদ্মফুলকেই বুঝাইত। চীন-দেশীয় মৌর্ত্তিক চিত্র, অনেকাংশে মিশরের মৌর্ত্তিক চিত্রের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন। মিশর-দেশীয় প্রাচীন স্তম্ভাদি হইতে যে বস্তু-চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, চীন-দেশের বর্ত্তমান অক্ষর-সমূহে সে পরিচয় আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। চীনারা এক-একটি বস্তু বা ভাব বুঝাইতে এক-একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে। চীনা-ভাষার এক-একটি অক্ষরই এক-একটি শব্দ-বিশেষ। অন্যান্য ভাষায় যেমন দুই, তিন বা ততোঽধিক অক্ষরের সমাবেশে এক-একটি শব্দের উৎপত্তি হয়, চীনা-ভাষার প্রকৃতি তদ্রূপ নহে। চীনদেশে প্রকারান্তরে এখনও চিত্র-লিপিই বিদ্যমান রহিয়াছে। দুই তিনটী মৌর্ত্তিক চিত্রের একত্র সমাবেশে বিশেষ বিশেষ বস্তু বা কার্য্য বুঝাইবার পদ্ধতি প্রাচীন চীনের মৌর্ত্তিক অক্ষরে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, স্ত্রী বুঝাইতে স্ত্রী-মূর্ত্তি এবং একগাছি সম্মার্জ্জনী, ভালবাসা বুঝাইতে স্ত্রী-মূর্ত্তি এবং একটি শিশুর প্রতিকৃতি, কারাগৃহ

বুঝাইতে একটী গৃহ এবং অন্ধকারের ছায়াপাত, অশ্রুজল বুঝাইতে চক্ষু এবং জলবিন্দু ইত্যাদি। কোনও কোনও স্থলে শান্তি বুঝাইতে নলের আকৃতি, বন্ধুত্ব বুঝাইতে দ্রাক্ষা-লতা, দ্রুতগতি বুঝাইতে উন্মুক্ত-পক্ষপুট কুক্কুট, সময় বুঝাইতে সূর্য্য, পরিবারবর্গ বুঝাইতে অগ্নিকুণ্ড অঙ্কিত করা করা হইত। সে সকল চিত্রে যে যে বস্তু বা যে যে ভাব বুঝাইবে, কতকগুলি লোকে প্রথমে তাহা স্থির করিয়া লইত এবং ক্রমশঃ পারিপার্শ্বিক জন-সাধারণ তাহা জানিতে পারিত। উত্তর-আমেরিকার নোভাস্কোশিয়া এবং নিউব্রান্সউইক দেশে মিক্‌ম্যাক্ জাতির মধ্যে সে দিনও পর্য্যন্ত এক-একটী বাক্য মৌর্ত্তিক-চিত্রে অভিব্যক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ফরাসী-দেশীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজকগণ মিক্‌ম্যাক্ জাতির ভাষায় আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক মুদ্রিত করেন; অষ্ট্রীয়া-রাজ্যের রাজধানী ভিয়েনা সহরে সেই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। সেই গ্রন্থে অন্যূন ৫৭০১টি ভাব-চিত্রের দ্বারা ফরাসী-ধর্ম্মযাজকগণ মিক্‌ম্যাক্ ভাষায় আপনাদের মনোভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমেরিকার মেক্সিকো দেশে প্রাচীন আজটেক জাতির মধ্যে মৌর্ত্তিক অক্ষর দ্বারা মনোভাব প্রকাশের দৃষ্টান্ত আজি পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মিঃ য়্যারোস্মিথ-অব-হাল (Mr. Arrowsmith of Hull) এই নামটী, তাহারা একখানি অর্ণবপোতের খোলের মধ্যে বা উপরে হাতুরী হস্তে একটি মনুষ্য মূর্ত্তি এবং একটি তীর আঁকিয়া বুঝাইয়া থাকে। * ইংরাজীর 'য়্যারো' শব্দের অর্থ তীর, 'স্মিথ' শব্দের অর্থ কর্ম্মকার এবং 'হাল' শব্দের অর্থ জাহাজের বা নৌকার খোল। বলা বাহুল্য, এইরূপ শব্দার্থ উপলব্ধি করিয়াই বস্তু-চিত্রের দ্বারা তাহারা সেই ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। নানা দেশের এবম্প্রকার মৌর্ত্তিক চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি আলোচনা করিয়া, পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—ক্রমে ক্রমে মৌর্ত্তিক চিত্রের কতকগুলি চিহ্ন বাক্যাংশ-রূপে এবং কতকগুলি চিহ্ন শব্দাংশ রূপে পরিণত হয়; এবং সেই সকল চিহ্নের সংযোগে ও বিয়োগে এক এক বস্তু বা ভাব প্রকাশ করে। বস্তু-চিত্র কি ভাবে প্রচলিত ছিল এবং তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে কিরূপ চিহ্নাদির সংযোগে কিরূপ অর্থ প্রকাশ করিত, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বর্ত্তমানকাল-প্রচলিত রোমান অক্ষরে লিখিত সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক বুঝাইতে একটি দাঁড়ি, দুই বুঝাইতে দুইটি দাঁড়ি ইত্যাদিতে রোমান অক্ষরে গণনাঙ্ক লিখিত হয়। হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির একত্র সংযোগে রোমান অক্ষরে পাঁচ বুঝাইয়া থাকে। সেই পাঁচের পূর্ব্বে বা পরে একটি দাঁড়ি যোগ করিলে যথাক্রমে চারি বা ছয় হয়। বস্তু-চিত্রের ইহাও এক আদর্শ বলিয়া মনে করিতে পারি। ধূর্ত্ততা-জ্ঞাপক শৃগালের চিত্র আঁকিয়া, তাহার পার্শ্বে মনুষ্য-মূর্ত্তি অঙ্কন করিলে, এ হিসাবে 'ধূর্ত্ত-মনুষ্য' বুঝান যাইত;— বস্তু-চিত্রের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাব-চিত্রের একটি উদাহরণ— ভাষায় আজিও প্রত্যক্ষীভূত হয়। আশ্চর্য্য-ব্যঞ্জক যে বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থকে, তাহাকে ভাব-চিত্রের শেষ স্মৃতি বলা যাইতে পারে। বস্তু-চিত্র ও ভাব-চিত্র

* "Mr. Arrowsmith of Hull is exptessed dy an arscw and a human figure holding a hammer placed within or above the hull of a vessel."

মৌর্ত্তিক অক্ষর।

(একাধিক মৌর্ত্তিক অক্ষরের সংযোগে শব্দের
উচ্চারণ-প্রণালী।)

এক একটী মৌর্ত্তিক অক্ষরের উচ্চারণ অপর মৌর্ত্তিক অক্ষর দ্বারা কিরূপে ব্যক্ত হয়, নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মূল মৌর্ত্তিক অক্ষগুটীর শক্তিরও পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। যেমন,—

এই চিত্রটীর নাম 'আউ'। মৌর্ত্তিক অক্ষরে 'আউ' ব্যক্ত করিতে হইলে, এই দুইটী চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়। ইহার প্রথম মূর্ত্তির শক্তি আ, দ্বিতীয় মূর্ত্তির শক্তি উ, উভয়ের সংযোগে 'আউ' উচ্চারণ হয়।

এই বিষয়টী বিশদ-ভাবে বুঝিতে হইলে, ইংরেজীর যে কোনও বর্ণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও উচ্চারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন, ইংরেজী বর্ণের নাম—এফ্ (ef)। উহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন F বা f; শক্তি—ফ। অর্থাৎ F (f) এফ্ বর্ণটী ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে, একটী e (ই) এবং একটী এফ্ (f) প্রয়োজন হয়; ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। মৌর্ত্তিক অক্ষরে ইহার আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এই চিত্রের উচ্চারণ 'হা' (পূর্ব্বের পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ঐ অক্ষর মৌর্ত্তিক চিত্রে ব্যক্ত করিতে হইলে, উহার সহিত একটী হংসশাবক যোগ করিতে হয়। যথা— । প্রথম অক্ষরটীর উচ্চারণ 'হা' হইলেও উহার শক্তি 'হ্'; সুতরাং উহার সহিত পক্ষী বা তাহার শক্তি 'আ' যোগ করিতে হয়। এই নু নামধেয় মৌর্ত্তিক অক্ষর বুঝাইতে এইরূপ মৌর্ত্তিক চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। এস্থলে পুষ্পপাত্রের শক্তি 'ন' এবং লাঙ্গুলহীন হংসশাবকের শক্তি 'উ'; উভয়ের সংযোগে 'নু'।

শব্দাংশ বুঝাইতেও এইরূপ একাধিক চিহ্নের সংযোগ দৃষ্ট হয়। যেমন আম (A M), অম (Am)।

ফলতঃ দুই বা ততোধিক মূর্ত্তির যোগে এক একটী শব্দ এবং সেইরূপ বহু শব্দের সমবায়ে এক একটী বাক্য সংগঠিত হইত।

৪১০ পৃষ্ঠা

হইতে যেরূপে শব্দ-চিত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, এক-একটী চিত্র বিশ্লেষণ করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্য বুঝাইতে প্রথমে তাহার মস্তক, দেহ ও হস্ত-পদ আঁকিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তি অঙ্কনের পূর্ব্বে, স্বীকার করিতে হয়, 'মনুষ্য' অভিধেয় শব্দটি অবশ্যই জানা ছিল। যেমন মস্তক, শরীর ও হস্তপদাদি বিভিন্ন অংশের সমষ্টিতে মনুষ্যের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, মনুষ্য শব্দটিও সেইরূপ বিভিন্ন বর্ণের সমষ্টিতে উৎপন্ন হয়; মনুষ্যের মূর্ত্তিকে যেমন অংশে অংশে বিভক্ত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত করিবার চেষ্টা হইতে পারে, 'মনুষ্য' শব্দটিকেও সেইরূপ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া বিচ্ছিন্ন করাই বা না যাইবে কেন?—এই ভাব মনুষ্যের মনে উদয় হওয়ার পর হইতেই বর্ণমালার কল্পনা ও সৃষ্টি হয়। এইরূপে, প্রথমে শব্দ, তার পর শব্দাংশ, পরিশেষে বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই প্রাথমিক অবস্থায় সমাজের কতকগুলি লোক এক একটি চিহ্নকে এক একটি শব্দ বলিয়া চিনিয়া লইত। তখন সেই চিহ্ন অঙ্কিত হইলে, সেহ সমাজস্থ সকল ব্যক্তি চিহ্নাঙ্কিত শব্দকে বা ভাবকে বুঝিতে পারিত। তাহারা প্রথমে যে শব্দ ব্যবহার করিত, সে শব্দকে বিভক্তি প্রভৃতি পরিশূন্য শব্দাংশ বা ধাতু বলিলেও বলা যাইতে পারে। ক্রমশঃ, কালক্রমে, সেই শব্দাংশের সহিত বিভক্তি প্রভৃতি যুক্ত হয়, এবং তদ্দারা শব্দের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া আসে। প্রথমে যে শব্দ তাহারা ব্যবহার করিত, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি; যথা—মেষশাবক বুঝাইতে 'আব', সূর্য্য বুঝাইতে 'রা' গাভী বুঝাইতে 'আউ' সিংহ বুঝাইতে 'মাউ', স্বর্গ বুঝাইতে 'পে' ইত্যাদি। অনেক প্রাচীন ভাষার উৎপত্তিস্থল বা মূল ধাতু-রূপে ঐরূপ শব্দ এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্ণমালা প্রথমে কোন্ দেশে সৃষ্ট হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে তদ্বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন,—'ফিনিসীয় জাতি সর্ব্বপ্রথমে বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতেই পৃথিবীর সভ্য-জাতি-সমূহ লিপি-কৌশল শিক্ষা করিয়াছে। গ্রীক, লাটিন, আরবী, হিব্রু প্রভৃতি প্রায় চারি শত প্রকার বর্ণমালা ফিনিসীয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল,—এইরূপ কিংবদন্তী আছে। তন্মধ্যে অধুনা পঞ্চাশৎ প্রকার বর্ণমালার অস্তিত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে।' অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিতের মত এই যে,—'মিশর-দেশই বর্ণমালার উৎপত্তির আদি-ক্ষেত্র।' গ্রীক-দার্শনিক প্লেটো শেষোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। প্লুটার্ক ও টাসিটাস প্রমুখ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। মিশর হইতে কোন্ সময়ে কি প্রকারে সেই বর্ণমালা-সমূহ ইউরোপে ও এসিয়া-খণ্ডে প্রচারিত হয়, পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ তাহারও পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—'খৃষ্ট-জন্মের উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে আব্রাহাম মিশর হইতে ইজরাইলে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে মিশরের বর্ণমালা ইব্রীয়গণের মধ্যে প্রচারিত হয়।' এতৎসম্বন্ধে আর এক মত প্রচারিত আছে। সে মতে প্রকাশ,—'খৃষ্ট-জন্মের সার্দ্ধ দ্বি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশর-দেশ সেমিটিক জাতির অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় পাঁচ শত বৎসর কাল মিশর-দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিলেন। সেই সময়ে

বর্ণমালা কোন্ দেশে প্রথম-সৃষ্ট।

সেমিটিক জাতির অত্যাচারে মিশরের অধিবাসীরা নানা স্থানে পলায়ন করে। এসিয়ার নিনাভা, ফিনিসীয়া প্রভৃতি দেশেও সেই উপলক্ষে তাহাদের বসবাস হইয়াছিল। তাহারা মিশর হইতে যে বর্ণমালা শিক্ষা করে, সেই বর্ণমালা ক্রমশঃ ঐ সকল দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইব্রীয় এবং ফিনিসীয়গণ সেই বর্ণমালার উৎকর্ষ সাধন করিয়া, পৃথিবীর চারিদিকে বর্ণমালার বীজ বপন করিয়াছিলেন।' তবে এ মতও যে সকলে এক-বাক্যে মান্য করেন, তাহা নহে। কেহ ক্রীট দ্বীপকে, কেহ বা বাবিলোনিয়াকে বর্ণমালার আদি-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে বর্ণমালার আদি-তত্ত্ব কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তবে মিশর হইতে ফিনিসীয়া এবং ফিনিসীয়া হইতে ইউরোপের ও এসিয়ার অন্যান্য প্রদেশে বর্ণমালা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশেরই এই মত।

পাশ্চাত্য-মতে আদর্শ ও বিভাগ।

বর্ণমালাসমূহ কোন্ আদর্শের অনুসরণে প্রথমে অঙ্কিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। মিশরের 'আ' নামক অক্ষর—ঈগল পক্ষীর আকৃতির অনুসরণে নির্ম্মিত হয়। সারস পক্ষীর আকৃতির অনুসরণে তাঁহাদের 'ব' অক্ষর, সিংহাসনের আকৃতির অনুসরণে 'গ' অক্ষর প্রভৃতি গঠিত হইয়াছিল। ইব্রীয় এবং গ্রীক-দিগের অক্ষরের 'আলেফ' এবং 'আল্‌ফা' (অর্থাৎ এ) অক্ষরে বৃষ শব্দ বুঝাইত; 'বেথ' এবং 'বেটা' (অর্থাৎ বি) অক্ষরে গৃহ অর্থ বুঝাইত। 'গিমেল' এবং 'গামা' (অর্থাৎ জি বা গ) অক্ষর 'উষ্ট্র' অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাই নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। কোন্ দেশের বর্ণমালার কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছে, পণ্ডিতগণ তৎসম্বন্ধে নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বর্ণমালা-সৃষ্টির আদিম পদ্ধতিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া, সেই সেই ভাগের মধ্যে পৃথিবীর বর্ণমালা-সমূহ সন্নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন; কেহ বা আদিম কালের একটী মৌর্ত্তিক অক্ষরের কল্পনা করিয়া লইয়া, তাহা হইতে বর্ত্তমান কালের বর্ণমালা-সমূহের ক্রম-পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে সকল যুক্তি-তর্ক রহস্যময়, সন্দেহ নাই; সে সকল যুক্তি-তর্ক, আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত না থাকিলেও, বঙ্গীয় পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণোদ্দেশ্যে, তদ্বিষয় উল্লেখ করিতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কল্পিত সেই পাঁচ বিভাগ এবং তদন্তর্গত উপবিভাগ-সমূহের পরিচয় এই। প্রথম,—মিশর-দেশীয় বর্ণমালা। উহা পাঁচটী উপবিভাগে বিভক্ত; যথা,—(১) স্তম্ভাদির গাত্রাঙ্কিত মৌর্ত্তিক অক্ষর, (২) ধর্ম্মযাজকগণের ব্যবহৃত বর্ণমালা বা কার্সিভ হায়েরেটিক, (৩) সেমিটিক বর্ণমালা, (৪) সাধারণের ব্যবহৃত বর্ণমালা বা কার্সিভ ডেমটিক; (৫) প্রাচীন মিশর-বাসিগণের ব্যবহৃত বর্ণমালা বা কপ্টিক। দ্বিতীয়,—কুনেইফর্ম্ম বা কিলাকার বর্ণমালা। ইহা নয়টী উপবিভাগে বিভক্ত; যথা,—(১) বাবিলন-দেশীয় রেখাময় মৌর্ত্তিক অক্ষর, (২) বাবিলন-দেশীয় কিলাকার অপ্রচলিত বর্ণমালা, (৩) বাবিলন-দেশীয় ধর্ম্মযাজকগণের বর্ণমালা (৪) সুসায়-দেশের শব্দাংশাত্মক বর্ণমালা, (৫) আসিরীয় দেশের কিলাকার বর্ণমালা, (৬) আর্ম্মেনীয় দেশের কিলাকার বর্ণমালা বা আলারোডিয়ন বর্ণমালা,

(৭) পরবর্ত্তিকালের বাবিলনীয় বা তৃতীয় একামেনীয় বর্ণমালা, (৮) প্রটোমিডিক শব্দাংশাত্মক বা দ্বিতীয় একামেনীয় বর্ণমালা, (৯) পারস্যদেশীয় কিলাকার বা প্রথম একামেনীয় বর্ণমালা। তৃতীয়,—চীন-দেশীয় বর্ণমালা। উহা পাঁচটী উপবিভাগে বিভক্ত; যথা—(১) কু-ওয়েন মৌর্ত্তিক ভাব-চিত্র, (২) চতুষ্কোণ কিয়াসিস্থ বা আদর্শ বর্ণমালা, (৩) জাপানদেশীয় কাটাকানা শব্দাংশাত্মক বর্ণমালা, (৪) চলিত কিলাকার সাউ-স্থ বা তৃণাক্ষর, (৫) জাপানদেশীয় হেরাকানা শব্দাংশাত্মক বর্ণমালা। চতুর্থ,—মেক্সিকো-দেশীয় বর্ণমালা। উহা দুইটী উপবিভাগে বিভক্ত; যথা,—(১) আজটেক জাতির মৌর্ত্তিক ভাব-চিত্র, (২) জুকাতান-দেশীয় ময়ার বর্ণমালা। পঞ্চম,—হেটাইট বর্ণমালা-সমূহ। উহা চারিটী উপবিভাগে বিভক্ত; যথা,—(১) কার্কেমিস্ মৌর্ত্তিক চিত্র, (২) এসিয়া-মাইনরের এক-শব্দাংশাত্মক বর্ণমালা, (৩) লিসীয় বর্ণমালা এবং (৪) সাইপ্রিয়ট শব্দাংশাত্মক বর্ণমালা। উল্লিখিত পাঁচ বিভাগে এবং পঁচিশটী উপবিভাগে পৃথিবীর প্রাচীন বর্ণমালা-সমূহকে বিভক্ত করিয়াও, পণ্ডিতগণ পৃথিবীর সমুদায় বর্ণমালাকে উহার অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা বলিয়াছেন,—'ঐ পাঁচ বিভাগ এবং তদন্তর্গত পঁচিশটি উপবিভাগ ভিন্ন, উত্তর-আমেরিকার বর্ণমালা, পিক্‌ট্‌স্-দিগের বর্ণমালা, লাপলাণ্ড-বাসিগণের বর্ণমালা এবং এস্কিমো-দিগের বর্ণমালা প্রভৃতি আরও বহুবিধ বর্ণমালার অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে।' এ হিসাবে ভারতীয় বর্ণমালা পূর্ব্বোক্ত ভাগ-বিশেষেরই অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষে আলেক্‌জাণ্ডারের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ-বিষয়ে ইউরোপীয় জাতিগণের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই,

পাশ্চাত্য-মতে বর্ণমালার বিদ্যমানতা।

আলেকজাণ্ডারের সময়ে বা তাঁহার পরিবর্ত্তিকালে ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যিনি যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তৎসমুদায়কেই তাঁহারা ভারতের আদি-কালের বিবরণ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের ভারতে আগমন করিবার যুগযুগান্ত পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসী যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তাহার সমাচার প্রায়ই তাঁহাদের গ্রন্থে দেখিতে পাই না। প্রাচীন ভারতের লিপির বিষয় আলোচনা করিতে হইলেও, তাঁহারা তাই প্রধানতঃ আলেক-জাণ্ডারের সময়ের এবং তাহার পরিবর্ত্তিকালের প্রসঙ্গই উত্থাপন করেন। আলেকজাণ্ডার কয়েক দিন মাত্র ভারতবর্ষের এক প্রান্তভাগে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহাতে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার কতটুকু অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভবপর! দূর অতীতে, ভারতে হিন্দুদিগের একাধিপত্য-কালে, ভারতের এক প্রান্তভাগে বসিয়া, তিনি কখনই সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। ভারতবাসিগণ কিরূপভাবে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন, কি প্রকার ও কত প্রকার লিপি তৎকালে ভারতে প্রচলিত ছিল, প্রথম-দেশ-বিজয়ে, ভারত-অধিকারে অগ্রসর হইয়া কি প্রকারে তিনি তাহা অবগত হইতে পারিবেন? সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের লিপি-সমূহের বিশেষ কোনও পরিচয় দিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে ভারতবর্ষের সহিত ক্রমশঃ তাঁহাদের সম্বন্ধ ঘনীভূত হইয়া আসিলে, একটু একটু করিয়া ভারতবর্ষের বিবরণ তাঁহারা জানিতে পারেন

এবং তাহাই গ্রীসদেশের প্রাচীন গ্রন্থ-পত্রে লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতেই তাঁহাদের গ্রন্থ-পত্রে ভারতের লিপির উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাবীর আলেকজাণ্ডার ৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব-প্রদেশের বিতস্তা-তীরে রাজা পোরসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-দেশের ইতিহাসে ভারতের সহিত ইউরোপের ইহাই প্রথম সম্বন্ধ। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর আট বৎসর পরে, ৩১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব হইতে এণ্ডেমাস প্রমুখ মাসিডোন-দেশীয় সৈন্যগণকে বিতাড়িত করেন। পঞ্চনদ প্রদেশে পুনরায় মগধের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলিউকাস সেই সময়ে চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বে তাঁহাকে প্রকারান্তরে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এমন কি, সেলিউকাস সেই সূত্রে চন্দ্রগুপ্তের হস্তে আপনার কন্যা-সমর্পণ করিয়া, সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সিন্ধুনদের পশ্চিম-তীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহ পর্য্যন্ত সেই সন্ধি-সর্ত্তে চন্দ্রগুপ্তের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে সেলিউকাসের দূতরূপে মেগাস্থিনীস বাবিলন হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পালিবোথ্‌রা নগরে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনীস রাজধানীতে আসিয়া বসবাস করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন; সুতরাং ভারতবর্ষের বর্ণমালার বিষয় তাঁহার বর্ণনায় কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ার্কাস ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। এরিয়ানের এবং ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে নিয়ার্কাসের সেই বর্ণনার কতক কতক উদ্ধৃত হইয়াছে। সে বর্ণনায় প্রকাশ,—নিয়ার্কাস কেবল যে ভারতে বর্ণমালার বিদ্যমানতার বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে; অধিকন্তু সেই সময়ে ভারতবর্ষে তূলা হইতে কাগজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইত, নিয়ার্কাস তাহাও লিখিয়া গিয়াছেন। * সুতরাং আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতে যে লিপি প্রচলিত ছিল এবং আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তি-কালে সেই লিপির বিষয় ইউরোপীয়গণ অবগত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তিকালে, গোল্ডষ্টুকার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতেই, খৃষ্ট-জন্মের ছয় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, এদেশে গ্রন্থ লিখিত হইত, সুতরাং বর্ণমালার ব্যবহার ছিল, পাণিনির ব্যাকরণে 'গ্রন্থ' শব্দের উল্লেখে, তাহা সপ্রমাণ হয়। 'কৃতে গ্রন্থে', 'গ্রন্থাতাধিকে', 'অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে' এবং 'সমুদাঙভো জনোঽগ্রন্থে' প্রভৃতি বাক্যে পাণিনি চারি স্থানে 'গ্রন্থ' শব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পাণিনি কর্ত্তৃক 'যবনানী লিপি' শব্দ লিখিত হওয়ায়, ভারতে বিভিন্ন লিপি প্রচলিত ছিল, বুঝিতে পারা যায়। বেদ-বেদান্তে লিপির বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ করিয়াও এ সকল বিষয়ের পুনরায় উল্লেখ করিতেছি, তাহার কারণ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থেই এ সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

* অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার 'প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ঠিক এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের বহু পূর্ব্বে ভারতে বর্ণমালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেন,—"This we know from Nearchus himself who ascribes to the Indians the art of making paper from cotton"—*Vide* Max Muller, *A History of Ancient Sanskrit Literature*.

রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে যে সকল লিপি প্রচলিত ছিল, খৃষ্ট-জন্মের আড়াই শত বা তিন শত বৎসর পূর্ব্বে স্তম্ভাদিতে সেই সকল লিপি খোদিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এমন কি হিমালয়ের পরপারেও তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল—অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভাদির খোদিত লিপিতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। প্রধানতঃ দ্বিবিধ প্রকার অক্ষরে অশোকের লিপি লিখিত হইয়াছিল। এক প্রকার অক্ষর বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে লিখিত হইত; অর্থাৎ, আধুনিক সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার লিখন-পদ্ধতির ন্যায়। দ্বিতীয় প্রকার অক্ষর দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে লিখিত হইত; অর্থাৎ, আরবী, পারসী প্রভৃতি অধুনা যে প্রকারে লিখিত হয়। প্রথমোক্ত লিপিকে দাক্ষিণাবর্ত্ত লিপি এবং শেষোক্ত লিপিকে বামাবর্ত্ত লিপি বলা যাইতে পারে। অশোক-প্রবর্ত্তিত ঐ দুই প্রকার অক্ষর—ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের নিকট ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত অক্ষরকে, কেহ বলেন—ইন্দো-পালি, কেহ বলেন—ভারতীয় পালি, কেহ বলেন—অশোক অক্ষর। শেষোক্ত অক্ষরকে কেহ বলেন—ইন্দো-ব্যাকট্রিয়ান, কেহ বলেন—ইরাণীয় অক্ষর। কাহারও মতে উহা এরিয়ানো-পালি, কাহারও মতে উত্তর-অশোক, এবং কাহারও মতে আর্য্য-পালি নামেও অভিহিত হয়। প্রথমোক্ত অক্ষর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং শেষোক্ত অক্ষর ভারতের সীমান্ত-প্রদেশ হইতে পারস্য পর্য্যন্ত দেশে প্রচলিত ছিল। শেষোক্ত লিপি এখন বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু প্রথমোক্ত (ভারত-প্রচলিত) লিপির পাঠোদ্ধার লইয়া এখনও পর্য্যন্ত তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক—'পিয়দসী' (রাজা প্রিয়দর্শী) নামে ঐ সকল খোদিত লিপিতে পরিচিত। তাহাতে প্রকাশ,—তাঁহার সমসময়ে এণ্টিওয়াকাস নামক যবনরাজ ভারতের প্রান্তভাগে রাজত্ব করিতেন। অশোক-প্রবর্ত্তিত লিপি-সমূহের পাঠোদ্ধারে স্থির হইয়াছে, তাঁহার সমসময়ে যোন (আইওনিয়ন) রাজা এণ্টিওক (এণ্টিওকাস থিয়াস, ২৬১-২৪৬ পূঃ খৃঃ) এবং আরও চারি জন রাজা অর্থাৎ তুরাময় (মিশর-রাজ দ্বিতীয় টলেমি), এণ্টিকিমি (মাসিদনের রাজা এণ্টিগোমস), মাকা (সাইরিনের রাজা মাগস) এবং সুন্দর (এপিরাসের রাজা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার) বিভিন্ন দেশে রাজত্ব করিতেন। * এই সকল রাজার নামের ও শাসন-কালের সহিত অশোকের রাজত্ব-কালের সম্বন্ধ-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ২৫৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে (খুব সম্ভবঃ২৫১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) অশোকের ঘোষণা-লিপি প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। অশোকের উৎকীর্ণ লিপি প্রধানতঃ দুই প্রকারে লিখিত হইলেও, উহার মধ্যে দেবনাগর অক্ষরের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়; উহার মধ্যে বঙ্গাক্ষর বিদ্যমান দেখিতে পাই; উহার মধ্যে দ্রাবিড়ী অক্ষরের সত্তাও উপলব্ধি হয়। মালয় অক্ষর, তিব্বতীয় অক্ষর, এমন কি আরবী, পারসী প্রভৃতি অক্ষরের বীজ পর্য্যন্ত উহার মধ্যে নিহিত আছে। অশোক যে ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন,

অশোকের লিপি।

---

* রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের একটী ঘোষণা-লিপির কিয়দংশের প্রতিচিত্র স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

তাহার পাঠোদ্ধারের জন্য অনেক দিন হইতে চেষ্টা চলিতেছে। সেই সকল ঘোষণা-লিপির সপ্তদশ প্রকার পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে, পর্ব্বতগাত্রে এবং স্তম্ভসমূহে অশোকের ঘোষণা-লিপি খোদিত হইয়াছিল। গিরি-গুহায় ও পর্ব্বত-গাত্রে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তৎসমুদায় যে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন-মূলক লিপি সেই সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীর এবং এলাহাবাদের ছয়টি স্তম্ভে অশোকের লিপি বিদ্যমান আছে। উক্ত স্তম্ভ-সমূহের পাঁচটির গাত্রে ২৩৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের ছয়টি আদেশ খোদিত হইয়াছিল। পর্ব্বত-গাত্রে তাঁহার যে সকল লিপি দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ের চৌদ্দটিতে রাজাদেশ লিখিত আছে। সেই রাজাদেশ-সমূহ ২৫১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে খোদিত হইয়াছিল, এরূপ প্রতিপন্ন হয়। গুজরাট প্রদেশে জুনাগড়ের সন্নিকটে, গির্ণারের (৭৫ ফিট বিস্তৃত এবং ১২ফিট উচ্চ) প্রস্তর-স্তূপে অশোকের যে লিপি দৃষ্ট হয়, তদ্বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে যে লিপি-সমূহ দেখা যায়, তন্মধ্যে আফগানিস্থানের সীমান্তে 'কাপুর-দি-গিরি' পর্ব্বতের লিপিই স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অশোকের প্রচারিত রাজাদেশ প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে, তাঁহার রাজ্য কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। সে হিসাবে, পশ্চিমে গুজরাট, পূর্ব্বে উড়িষ্যা, উত্তরে পেশোয়ার ও দক্ষিণে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির শেষ সীমা—এমন কি লঙ্কা দ্বীপে পর্য্যন্ত, তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তৎপ্রচারিত লিপি দৃষ্টে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্ধরণ করিয়াছেন,—'অশোকের রাজ্য দ্রাঘিমার ১৫° ডিগ্রী এবং অক্ষরেখার ২৭° ডিগ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।' অশোকের আদেশ বা ঘোষণাবাণী-সমূহ প্রধানতঃ পালি বা প্রাকৃত ভাষায় প্রচারিত হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—দক্ষিণাবর্ত্ত ও বামাবর্ত্ত দুই প্রকার অক্ষরে সেই সকল ঘোষণা লিখিত হইয়াছিল। অশোকের রাজত্বের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'কাপুর-দি-গিরি' নামক পর্ব্বত-গাত্রে যে লিপি উৎকীর্ণ হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, তাহা ইরাণীয় বা ইন্দোব্যাকৃত্রিয় অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। অন্যান্য স্থানে যে অক্ষর ব্যবহৃত হয়, তাহা ভারত-প্রচলিত বর্ত্তমান বর্ণমালার সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। অশোক-প্রচারিত ঘোষণা-লিপি-সমূহের পাঠোদ্ধারের জন্য পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বহু দিন হইতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। অবশেষে প্রিন্সেপ সাহেব অশোক-লিপির পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য্য হন। প্রাচীন সাচী নগরে, মন্দিরস্থিত একটী স্তম্ভের ঘোষণা-লিপির প্রতি পংক্তির শেষ ভাগে তিনি দুইটী একইরূপ অক্ষর দেখিতে পান। তদ্দৃষ্টে তাঁহার মনে হয়, ঐ দুই অক্ষরে দান-পত্রের পরিচায়ক 'দানম্' শব্দ হওয়াই সম্ভবপর। এই মনে করিয়া তিনি যেখানেই ঐ অক্ষর দুইটী মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন, সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সেই দুই অক্ষরের পূর্ব্বের অক্ষর যে 'স', তাহাও তিনি নির্দ্ধারণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে 'পিয়দসী' ও 'দানম্' শব্দ-দ্বয়ের উদ্ধার হইল। দিল্লীর স্তম্ভের খোদিত লিপির সহিত মিলাইয়া দেখিতে গিয়াও তাঁহার সেই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি নানা স্থানের লিপি-সমূহের পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন। প্রিন্সেপের আদর্শের অনুসরণে জেনারেল কান্নিংহাম ও উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতের লিপি-

সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই আলোচনার ফলে অধুনা আমরা অশোকের প্রচারিত লিপি-সমূহের যথার্থ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি। এদেশে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উৎকীর্ণ লিপি-সমূহের পাঠোদ্ধার-কল্পে চেষ্টা চলিয়াছিল। ইলোরার গিরি-গহ্বরে যে খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌টনাণ্ট উইল্‌ফোর্ড সেই লিপির পাঠোদ্ধারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, 'পাণ্ডবদিগের মৌনব্রতাবলম্বন-কালে সাঙ্কেতিক চিহ্ন-ব্যবহারে তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত হইত। ইলোরার গিরি-গুহাস্থিত লিপি-সমূহ তাহারই পরিচয়। মহাভারত সংক্রান্ত বহু প্রয়োজনীয় বিষয় তাহাতে লিখিত আছে।' উইলফোর্ডের এই সিদ্ধান্ত, বলা বাহুল্য, পরবর্ত্তিকালে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। উইল-ফোর্ডের পর, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে, সার উইলিয়ম জোন্স ভারতের খোদিত লিপি-সমূহের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে, তিনি ভারতীয় বর্ণমালা-সমূহকে সেমিটিক বর্ণমালার সন্ততি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, ষ্টার্লিং নামক জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত উড়িষ্যার খণ্ডগিরি দর্শন করিয়া তত্রত্য খোদিত-লিপি-সমূহকে গ্রীক-বর্ণমালার অনুরূপ বলিয়া প্রচার করেন। সেই সময়ে কেহ কেহ প্রাচীন স্তম্ভাদিকে গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডারের কীর্ত্তি-স্তম্ভ বলিয়াও মনে করিয়াছিলেন। অবশেষে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, জেমস্ প্রিন্সেপ পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের অসারত্ব প্রমাণ করেন। খণ্ডগিরি, দিল্লী এবং এলাহাবাদ প্রভৃতির খোদিত-লিপি-সমূহ রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের শাসন-সময়ে লিখিত হইয়াছিল এবং ঐ লিপি-সমূহ ভারতবর্ষেরই বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত,—প্রিন্সেপ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া যান। ১৮৩৭ এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণাল পত্রে, প্রিন্সেপের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। প্রথমোক্ত খৃষ্টাব্দের পত্রিকায় তিনি লিপি-সমূহের প্রতিচিত্র প্রকাশ করিয়া, তাহার পাঠোদ্ধার-বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; শেষোক্ত বৎসরের পত্রে তিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত সময়ের বর্ণমালা-সমূহের পর্য্যায় আলোচনা করিয়া কোন্ বর্ণমালার পর কোন্ বর্ণমালার সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর,—তাহা অঙ্কন করিয়া দেখাইয়াছেন। শেষোক্ত বর্ষের পত্রে, দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভের লিপির পাঠোদ্ধারে, তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। * জেনারেল কানিংহাম ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তি-স্মৃতির পরিমাপ-সংগ্রহে ব্রতী হন। সেই উপলক্ষে তাঁহার 'আর্কিয়লজিকাল সার্ভে-অব-ইণ্ডিয়া' এবং 'কার্পাস ইনস্ক্রিপশনাম্ ইণ্ডিকেরাম্' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি অশোকের লিপি-সমূহের প্রতিচিত্র এবং বিভিন্ন রূপ পাঠ প্রকাশ করিয়া, তৎসম্বন্ধে আপনার অশেষ গবেষণার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতে মৌর্ত্তিক চিত্র ছিল এবং মৌর্ত্তিক চিত্রের আদর্শে অশোকের

* Tacsimiles of Ancient Inscriptions lithographed by James Prinsep—*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. VI (1838); Alphabets from 5th Century B. C. up to their present state.—*Ibid* Vol. VII (1838); Delhi Iron-pillar explained.—*Ibid.*

লিপি-সমূহ গঠিত হইয়াছিল, সেই গ্রন্থে কানিংহাম তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। অশোক লিপি ব্যতীত ভারতবর্ষের, প্রাচীন প্রস্তর-ফলকে, তাম্রশাসনে এবং স্তম্ভাদিতে আরও নানা সময়ের নানা প্রকার লিপি দৃষ্ট হয়। বল্লভী-রাজগণের, চালুক্য-রাজগণের, গুপ্তান্ধ্র-বংশের এবং অন্যান্য নানা প্রাচীন রাজবংশের নিদর্শন-চিহ্ন সেই সকল লিপিতে অধুনা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এক লিপির উপর অন্য লিপি খোদিত হইয়াছিল, একই প্রস্তর-গাত্রে বা স্মৃতি-স্তম্ভে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। গির্ণার পর্ব্বতে রাজা অশোকের লিপিও দৃষ্ট হয়; আবার ক্ষত্রপ-বংশীয় রাজা রুদ্রদামের লিপিও উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রস্তর-গাত্রে, স্তম্ভাদিতে এবং তাম্র-শাসন-সমূহে খোদিত-লিপি ভিন্ন, প্রাচীন মুদ্রাদিতেও নানা প্রকার লিপির পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান। অধুনা কেহ কেহ শ্রীরামচন্দ্রের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা পাইলেও এবং সে চেষ্টা নিষ্ফল চেষ্টা বলিয়া মনে হইলেও, উজ্জয়িনীর প্রাচীন রাজগণের, সৌরাষ্ট্রের প্রাচীন রাজগণের এবং ব্যাক্ট্রিয়ার সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ-সূত্রের পরিচায়ক মুদ্রাদি আবিষ্কারের বিষয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে সৌরাষ্ট্র ও উজ্জয়িনী প্রভৃতির রাজগণের মুদ্রার প্রতিচিত্র প্রকাশিত আছে। * প্রাচীন মুদ্রা-বিষয়ক পুস্তকে ভিন্সেণ্ট স্মিথ এবং কানিংহাম প্রমুখ অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বহুবিধ মুদ্রার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। † কত প্রকার ও কি প্রকার লিপি ভারতবর্ষে কোন্ সময়ে কিরূপে বিদ্যমান ছিল, সেই সকল মুদ্রার প্রতিচিত্র দর্শন করিলে, অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে।

অশোক-প্রচারিত দ্বিবিধ (বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত) লিপির বিষয় আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি অভিনব সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—'অশোক-প্রচারিত ঐ দুই প্রকার অক্ষর সৃষ্টির পূর্ব্বে উহাদের আদিভূত দুই প্রকার বর্ণমালার অস্তিত্ব সম্ভবপর। সেই দুই প্রকার বর্ণমালা হইতেই ঐ দুই বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। আদিভূত সেই দুই প্রকার বর্ণমালার বর্ণ-সংখ্যা ভাব অভি-ব্যক্তি পক্ষে অসম্পূর্ণ ছিল। সেই দুই আদি-বর্ণমালা হইতে অশোকের প্রবর্ত্তিত দ্বিবিধ বর্ণমালা উৎপন্ন হইয়াছে। সেই আদি বর্ণমালা নিশ্চয়ই বিভিন্ন-প্রকৃতি-সম্পন্ন ছিল। অশোক-প্রচারিত ইন্দো-ব্যাক্ট্রিয় ও ইন্দো-পালি বর্ণমালা-দ্বয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ইন্দো-ব্যাক্ট্রিয় বর্ণমালা বক্র, কিলাকার, অসম ও বিশৃঙ্খল। ঐ বর্ণমালার কোনও অক্ষরই প্রায় নিম্নাভিমুখী নহে, এবং উহার বিশেষ লক্ষণ—উহা দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে লিখিত হয়। ইন্দো-পালি বা ভারত-প্রচলিত অশোকাক্ষর বামভাগ হইতে দক্ষিণভাগে পরিচালিত। উহা শৃঙ্খলাবদ্ধ,

পাশ্চাত্য-মতে ভারতীয় লিপির আদি।

* Coins of Shaurastra Kings and Bactrian Kings and coins of Ujjain Kings—*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. VII (1838)

† Alexander Cunningham, *Coins of Ancient India*; Vincent Smith, *Anceini Indian Coins.*

সরল এবং উহার অধিকাংশই নিম্নাভিমুখী। ফলে, ইন্দো-ব্যাকৃত্রিয় ও ইন্দো-পালি এই দুই প্রকার অক্ষরের মধ্যে সাদৃশ্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' কিন্তু যে দুই বর্ণমালা হইতে ইন্দো-ব্যাকৃত্রিয় ও ইন্দো-পালি বর্ণমালার উদ্ভব হয়, সেই দুই আদি বর্ণমালা যে কিরূপ ছিল, তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই। সুতরাং ভারতীয় বর্ণমালার আদিতত্ত্ব-নির্ণয়-সম্বন্ধে এখন নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। প্রিন্সেপের মত এই যে, ভারতীয় বর্ণমালা-সমূহ গ্রীক-বর্ণমালার আদর্শ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। অট্-ফ্রায়েড মুলার সেই মতের সমর্থন করিয়াছেন। এন্ সেনার্ট ও এম্ জোসেফ্ হালেভি সেই মতেরই পরিপোষক। ডাক্তার উইলসন অনুমান করেন, অশোকের বর্ণমালা-সমূহ গ্রীক বা ফিনিসীয় বর্ণমালার আদর্শে উৎপন্ন হইয়াছে। সার উইলিয়ম জোন্স্, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে, ভারতীয় বর্ণমালাকে সেমিটিক বর্ণমালার সন্ততি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কোপ-প্রমুখ পণ্ডিতগণ জোন্সের মতেরই সমর্থন করেন। সার উইলিয়ম জোন্সের সমর্থন করিয়া, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লেপসিয়ুস এক প্রবন্ধ লেখেন। তৎপরে ওয়েবার তদ্বিষয়ে বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন। বেন্‌ফি, পট, ওয়েষ্টারগার্ড বুলার, ম্যাক্সমুলার, ফ্রেডারিক মুলার, সেস্, হুইটনি এবং লেনারমট প্রমুখ ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ অল্প-বিস্তর সন্দেহের সহিত ভারতীয় বর্ণমালার আদিতে সেমিটিক প্রাধান্যের পোষকতা করিয়া যান নাই। * তবে ওয়েবারের অপেক্ষা অধিক যুক্তি-তর্ক প্রদর্শনে অপর কেহ যে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। সম্প্রতি ডাক্তার ডিকি অনেক তর্ক-বিতর্কের পর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—'আসিরীয় দেশীয় কিলাকার বর্ণমালা হইতে, দক্ষিণ-সেমিটিক বর্ণমালার আনুকূল্যে, ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে।' ডাক্তার বার্ণেল আবার বলেন,—'ভারতীয় বর্ণমালা, আরামেন বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই বর্ণমালা এক সময়ে পারস্যে ও বাবিলনে প্রচলিত ছিল।' বেন্‌ফির সিদ্ধান্তানুসারে—ফিনিসীয় বর্ণমালা হইতে ভারতীয় বর্ণমালার বীজ সরাসরি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এইরূপ প্রতিপন্ন হয়। মিঃ টেলার তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। টেলার † বলেন,—"বেন্‌ফির যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভারতবর্ষের সহিত ফিনিসীয়দিগের বাণিজ্য-সম্বন্ধ সলোমনের রাজত্ব-কালে সংস্থাপিত হইয়াছিল। ৮০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। যদি সলেমানের সময়ে ফিনিসীয়ার অক্ষর ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে সেই সময় হইতে অশোকের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত, সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে, ভারতে অসংখ্য লিপির উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু অশোকের রাজত্বকালে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, আমরা পশ্চিম-ভারতে এক প্রকার আকৃতি-সম্পন্ন লিপি মাত্র দেখিতে পাই। আরও, অনুসন্ধানে প্রতি-পন্ন হয়, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে কোনও প্রকার লিপি প্রচলিত

* সেমিটিক বর্ণমালার আদর্শে ভারতের বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে বলিয়া যাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের একটা প্রধান যুক্তি এই যে, সেমিটিক বর্ণমালার একটা বর্ণ অন্য বর্ণে যুক্ত হইলে, তাহার যেমন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ভারতীয় বর্ণমালায়ও সেইরূপ সাঙ্কেতিক-চিহ্ন ব্যবহারের পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ,—অস্মদ্দেশীয় আকার অন্য বর্ণে যুক্ত হইলে যেমন তাহার চিহ্ন "া" এইরূপ হয়, সেমেটিক জাতীয় বর্ণমালায়ও কতকটা সেই পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

† *Vide* Dr. Issac Taylor, *The History of the Alphabet*, Vol. II.

ছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে প্রমাণাভাব। অধিকন্তু ফিনিসীয় বর্ণমালার সহিত অশোক-লিপির সাদৃশ্যও অনুভূত হয় না।' বাবিলন বা পারস্য দেশ হইতে অশোক-লিপির বীজ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল,—ডাক্তার বার্ণেল যে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, ডাঃ টেলার তাহারও উক্তরূপ প্রতিবাদ করেন। এইরূপে ফিনিসীয় বর্ণমালা হইতে সরাসরি ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি হয় নাই প্রমাণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, ফিনিসীয় বর্ণমালার সন্ততি সেবীয় বর্ণমালা হইতে ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে। টেলারের মতে;—'প্রাচীন ইরাণীয় (পারস্যের) বর্ণমালা—আরামীয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হয়। সেই বর্ণমালার বক্ররেখা-সমূহ অসংযুক্ত; অর্থাৎ, তাহার বন্ধনীর এক দিকের না, এক দিকের মুখ উন্মুক্ত। কিন্তু অশোকের বর্ণমালার বক্ররেখাগুলি প্রায়ই সংযুক্ত, তাহার মুখ কোনও দিকে উন্মুক্ত নহে।' তিনি আরও বলেন,—'ইরাণীয় বর্ণমালা আফগানস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আগমন করে। কাপুর-দি-গিরি নামক পর্ব্বত-গাত্রে তাহার নিদর্শন-স্বরূপ ইন্দো-ব্যাক্ট্রিয় বর্ণমালা দেখিতে পাই। পঞ্জাব-প্রদেশের ইন্দো-ব্যাক্ট্রিয় বর্ণমালা এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা-প্রদেশ-প্রচলিত অশোক-লিপি সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। সেই দুই লিপি যে এক ইরাণীয় লিপির বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহাদের একটি স্থলপথে ব্যাক্ট্রিয়া দিয়া ও অপরটি পারস্য উপসাগরের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা কোনমতেই স্বীকার করা যায় না।' এইরূপে বার্ণেল, বেন্‌ফি প্রভৃতির যুক্তি খণ্ডন করিয়া, টেলার বলিয়াছেন,—'আরেবিয়া ফেলিক্সের * প্রাচীন বর্ণমালা হইতেই ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তিমূলক যুক্তি সমীচীন বলিয়া মনে হয়। জলপথে ও স্থলপথে দ্বিবিধ সূত্রে ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডের সম্বন্ধ ছিল। উত্তর-ভারতের অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের ইন্দো-বাক্ট্রিয় অক্ষর খাইবারের পার্ব্বত্য পথে ভারতে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতের বর্ণমালা-সমূহ, অর্থাৎ ভারতের পশ্চিম উপকূল প্রদেশের খোদিত লিপি-সমূহ, সমুদ্র পথে আসিয়াছিল বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দশম শতাব্দী হইতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত আরবের ইয়েমেন সহর বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল। সেই বন্দরে ভারতের পণ্যদ্রব্য-সমূহের সহিত পাশ্চাত্য-দেশের পণ্যদ্রব্যের বিনিময় হইত। মিশর হইতে বস্ত্র, কাচ ও কাগজ-নির্ম্মাণোপযোগী পেপিরাস নামক বৃক্ষবিশেষ, সিরিয়া হইতে মদ্য, তৈল ও পিতল, এবং ফিনিসীয়া হইতে অস্ত্রাদি, বিক্রয়ের জন্য সেই বন্দরে আনীত হইত; এদিকে ভারতবর্ষ হইতে গজদন্ত, স্বর্ণ, বহু প্রকার মূল্যবান পণ্যদ্রব্য পোতযোগে বিনিময়ার্থ সেই বন্দরে বণিকগণ লইয়া যাইত। অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে ইয়েমেন বন্দরে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিয়াছিল। প্রধানতঃ সোবমানগণই সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এই বাণিজ্য-

* বর্ত্তমান ইয়েমেন সহরের উত্তরে 'আরেবিয়া ফেলিক্স' (Arabia Felix) বা প্রাচীন ইয়েমেন প্রদেশ অবস্থিত ছিল। ঐ প্রদেশের প্রধান নগরের নাম—'সেবা'। সেই দেশের রাণীর নামানুসারে ঐ নগরের নামকরণ হইয়াছিল। ফিনিসীয়ার রাজা সলোমনের জ্ঞান-গরিমার প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, সেবা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান;—পরিশেষে সলোমনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া যায়। সেই সূত্রে ফিনিসীয় বর্ণমালার বীজ সেবিয়ায় উপনীত হয়।

ব্যবসায়ে সেবিয়ান-গণের ঐশ্বর্য্য-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। মিশরের সহিত ইয়েমেনের এই বাণিজ্য-সম্বন্ধ খৃষ্ট-জন্মের আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এবং ইয়েমেনের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ খৃষ্ট-জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অব্যাহত ছিল। টলেমিবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালেও ভারতবর্ষের সহিত মিশরের সরাসরি বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। তখনও সেবিয়াণ-গণই উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায় চালাইতেন। বৃহদাকার বাণিজ্যপোত-সমূহের সাহায্যে সেবিয়ানগণ নানা স্থানে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন। লোহিত-সাগরে, পারস্য-উপসাগরে, আফ্রিকার উপকূল-প্রদেশে এবং প্রধানতঃ সিন্ধু-নদের মোহানায়, সেবিয়ান-গণের বাণিজ্য-পোত সর্ব্বদা গতিবিধি করিত। পেরিপ্লাস-গ্রন্থ হইতেও অবগত হওয়া যায়,—এক সময়ে এডেন-বন্দর বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সোমালি উপকূলের নিকটস্থ ডাওকোরিডেস দ্বীপে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য-সমূহের সহিত অন্যান্য দেশের পণ্যদ্রব্যের বিনিময় হইত। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, সেবিয়ানগণের বর্ণমালা ভারতে আসিবার পক্ষে অশেষ সুবিধা পাইয়াছিল। ঐ বর্ণমালা—ফিনিসীয় বর্ণমালার শাখা-বিশেষ। খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে সেবিয়ান দিগের বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সহিত সেবিয়ান-গণের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের সময়েই, অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেই, ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর। বৈদিক সূক্ত, মন্বাদি সংহিতা এবং পাণিনির ব্যাকরণ প্রভৃতির আলোচনায় অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ও ডাউসন প্রমুখ ভাষাবিদ্‌গণ, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে ভারতবাসীর বর্ণ-মালার ও লিপিজ্ঞানের বিষয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।' এইরূপে সেবিয়ান-গণের বর্ণমালা হইতে ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া ডাঃ টেলার বর্ণমালার একটী বংশলতা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বংশলতায় নানাদেশীয় 'ম' বর্ণের পূর্ব্ব-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সে হিসাবে ভারতের বর্ণমালা মিশরের মৌর্ত্তিক অক্ষরের বংশধর মধ্যে পরিগণিত। সে হিসাবে শেবীয় বর্ণমালা ভারতীয় বর্ণমালার পিতৃপুরুষ-রূপে পরিকীর্ত্তিত। ফলে, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অধিকাংশেরই নিকট ভারতীয় বর্ণমালার মৌলিকত্ব উপেক্ষিত হইয়াছে; এবং কোন-না-কোনও পাশ্চাত্য দেশের বর্ণমালার আদর্শে বা অনুসরণে ভারতীয় বর্ণমালা গঠিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

বর্ণমালার উৎপত্তি-বিষয়ক পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের এই সকল মত, আমরা কিন্তু আদৌ অনুমোদন করি না। আমাদের মত,—ভারতবর্ষই বর্ণমালার আদি-উৎপত্তি-ক্ষেত্র; ভারতীয় বর্ণমালার আদর্শেই অন্যান্য দেশের বর্ণমালা সৃষ্ট হইয়াছিল। কেবল আমরাই বা বলি কেন, প্রাচীন ভারতের লিপির বিষয় যিনিই একটু সংযতচিত্তে নিগূঢ়-ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তিনিই আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন করিবেন। প্রথমতঃ, যাঁহারা বলেন—'সেমিটিক বর্ণমালা হইতে ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আমরা বলিতে পারি—'না, তাহা কখনই নহে।' উভয়বিধ বর্ণমালায় যদিও সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহারের পদ্ধতি

ভারতীয় বর্ণমালাই আদিভূত।

বিদ্যমান; কিন্তু সেমিটিক বর্ণমালার সাঙ্কেতিক চিহ্নের সহিত ভারতীয় বর্ণমালার সাঙ্কেতিক চিহ্নের আকাশ-পাতাল পার্থক্য! ব্যঞ্জন-বর্ণের সহিত যুক্ত হইলে, স্বরবর্ণের যে আকৃতি ভারতীয় বর্ণমালার সচরাচর দৃষ্ট হয়, আরবী, পারসী প্রভৃতি সেমিটিক জাতীয় ভাষায় কি সেই পদ্ধতি অবলম্বিত? ভারতীয় ভাষার—সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতির —'অ' 'আ' প্রমুখ স্বরবর্ণের প্রকৃতির সহিত সেমিটিক জাতীয় 'আলিফ', 'আয়েন' প্রভৃতির কি সাদৃশ্য আছে? আমাদের অ-কারাদির হিসাবে 'আলিফ', 'আয়েনকে' স্বরবর্ণই বলা যাইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য ভিন্ন সাদৃশ্য অল্পই দৃষ্ট হয়। * তার পর উভয় বর্ণমালার লিখন-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র প্রকার; ভারতীয় বর্ণমালা বাম হইতে দক্ষিণদিকে লিখিত হয়। সেমিটিক বর্ণমালা দক্ষিণ হইতে বামভাগে পরিচালিত। এইরূপ বিবিধ কারণে সেমিটিক বর্ণমালাকে ভারতীয় বর্ণমালার আদি বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। বলা বাহুল্য, ম্যাক্সমুলার প্রমুখ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অনেকে তাই সেমিটিক-সংক্রান্ত মতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ;—মৌর্ত্তিক অক্ষরকেও আমরা বিশুদ্ধ ভারতীয় বর্ণমালার আদি বলিয়া স্বীকার করি না। তবে যদি কেহ জিদ করিয়া বলেন,—মৌর্ত্তিক অক্ষরই বর্ণমালার আদিভূত, আমরা দেখাইতে পারি, বহুকাল পূর্ব্বে মৌর্ত্তিক অক্ষর ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। জেনারেল কানিংহাম অশোকের অক্ষরের মধ্যে মৌর্ত্তিক অক্ষরের ছায়াচিত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত "কর্পাস ইন্‌স্ক্রিপশনাম ইণ্ডিকেরাম" গ্রন্থ পাঠ করিলে, আমাদের এতদুক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। সেই গ্রন্থে কানিংহাম প্রমাণ করিয়াছেন, অশোকের লিপি-সমূহ প্রাচীন ভারতীয় মৌর্ত্তিক চিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু কত কাল পূর্ব্বে সেই মৌর্ত্তিক চিত্র ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহা তিনি নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই যখন স্বীকার করিতেছেন, প্রাচীন ভারতে মৌর্ত্তিক অক্ষর বিদ্যমান ছিল এবং সেই অক্ষর হইতে অশোকের অক্ষর গঠিত হইয়া থাকিবে; তখন আমরা কি বলিতে পারি না,—ভারতের সেই মৌর্ত্তিক অক্ষরই এক সময়ে মিশরে, বাবিলনে এবং ফিনিসীয়ায় বিস্তৃত হইয়াছিল? অন্য দেশ হইতেই আসিবে, আর এ দেশ হইতে যাইতে পারে না,—ইহাই বা কি প্রকারে স্বীকার করিত পারা যায়? তৃতীয়তঃ;—যাঁহারা বলেন, অন্য দেশের বণিকগণ (বিশেষতঃ সেবিয়ান-গণ) এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তাই তাঁহাদের বর্ণমালার আদর্শে এদেশের বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে; তাঁহাদের যুক্তির উত্তর আমরাও বলিতে পারি, পুরাকালে অন্যান্য জাতির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের প্রাধান্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। তখন ভারতবর্ষে নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে নানা প্রকার বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, এবং ভারতবর্ষের প্রভাব-প্রতিপত্তির সহিত ভারতবর্ষের বর্ণমালা-সমূহ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্তৃত হয়। তবে এস্থলে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে,—'ভারতবর্ষের বর্ণমালার সহিত অন্যান্য দেশের বর্ণমালার

* ম্যাক্সমুলারের প্রণীত "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" বিষয়ক গ্রন্থে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থের বর্ণমালা-সংক্রান্ত অংশ এতদুক্তির প্রমাণ বলিয়াও বলিতে পারি।

নানারূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় কেন? ভাষা-পরিচ্ছেদে আমরা দেখাইয়াছি, যোজনান্তে ভাষার পরিবর্তন হয়। বর্তমান কাল-প্রচলিত ভারতীয় বর্ণমালা-সমূহ শ্রেণী-বদ্ধরূপে পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেও দেখিতে পাই, দেশ-ভেদে বর্ণমালা এক-একটু রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। কোনও কোনও স্থলে এক বর্ণমালার সহিত অন্য বর্ণমালার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে বটে; কিন্তু প্রায়ই ইতর-বিশেষ ঘটিয়াছে। মেদিনীপুরে বঙ্গাক্ষর এবং তাহার পার্শ্ববর্তী বালেশ্বরে উৎকলাক্ষর। স্বর-ব্যঞ্জনান্তর্গত একই অক্ষর পারিপার্শ্বিক দুই স্থানে দুই মূর্তি গ্রহণ করিয়া আছে। স্বভাবের একটী ধর্ম্ম পার্থক্য-সাধন। সকলেই আপনাপন অভিনব অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমুৎসুক। তাই বঙ্গ ও উৎকল যখন দুই রাজার রাজ্য হইয়াছিল, আপন-আপন স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য দুই রাজ্যে তখন দুই প্রকার বর্ণমালার প্রচলন হয়। এই স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার চেষ্টার ফলেই, আমরা বিশ্বাস করি, ভারতীয় বর্ণমালা হইতে বিভিন্ন বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছিল। বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত লিপি—সেই স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ভারতের পশ্চিম-সীমান্তের জাতি-সমূহের সহিত যখন ভারত-সাম্রাজ্যের সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে সেই দেশের অধিবাসিগণ বর্ণমালার গতি-পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। আমরা দেখাইয়াছি, ভারতের কতকগুলি ক্ষত্রিয় জাতি, আচার ও ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হওয়ায়, ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বেশভূষা ও আচার-ব্যবহার বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছিল;—শাস্ত্রাদিতে তাহার প্রমাণ পাই। প্রকৃতি ভিন্নরূপ হইয়া পড়িলে, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভিন্নরূপ হইলে, সেই সকল জাতি বর্ণমালা লিখনেরও যে বিপরীত পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হইতে পারে না কি? বর্ণমালার পর্য্যায়-পরিবর্ত্তন, বর্ণমালার লিখন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন-সাধন, আমাদের মনে হয়, মানুষের প্রকৃতির বৈপরীত্য-হেতুই ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিশুদ্ধ বর্ণমালার পর্য্যায় ও লিখন-পদ্ধতির আলোচনায় প্রতীত হয়, ঐ পদ্ধতি বিজ্ঞান-সম্মত ও স্বাভাবিক। এমন কি, পৃথিবীর প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই ঐ পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অন্য দেশে সেই পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত। অস্মদ্দেশ-প্রচলিত বর্ণমালার প্রথমে স্বরবর্ণ এবং পরিশেষে ব্যঞ্জনবর্ণ শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত আছে। কিন্তু অন্য দেশীয় বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরস্পর বিশৃঙ্খলভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। ভারতীয় হিন্দুজাতি হইতে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য, ভারত হইতে বিতাড়িত জাতি-সমূহ বর্ণমালার পর্য্যায়-পদ্ধতির ঐরূপ পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়া লইয়াছিলেন,—বর্ণমালার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিলে, তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারা যায়। দুই দিক হইতে দুই ভাবে বর্ণমালা-লিখনের পদ্ধতিও সেই ভেদ-বুদ্ধির ফল ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? ভারতবাসী হিন্দুগণের বর্ণমালায় স্বরবর্ণের পর ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিত হয়; সুতরাং আপনাদের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য সে পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া, স্বর-ব্যঞ্জনে যেমন মিশাইয়া লওয়া হইয়াছিল, বামাবর্ত্ত লিপির প্রবর্ত্তনায়ও সেইরূপ ভেদবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না কি? হিন্দুগণ বামদিক হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে অক্ষর-সমূহ লিখিয়া থাকেন, আমরা দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিকে লিখিয়া যাইব, আর

তাহা হইলেই স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা হইবে;—পারদ, পহ্লব, শক, জবন প্রভৃতি জাতির মনে, ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া, বিদ্বেষবশে এই ভাবের উদয় হওয়া অসম্ভব কি? আরও, ঐ পদ্ধতির মধ্যে যে কোনও অভিনবত্ব আছে, তাহাও বলিতে পারি না; ঐ পদ্ধতিও যে অন্য দেশের মৌলিক পদ্ধতি, তাহাও স্বীকার করিতে পারি না। 'বামাবর্ত্ত' ও 'দক্ষিণাবর্ত্ত'—দ্বিবিধ লিপি-কৌশলই ভারতবর্ষে আবহমান-কাল প্রচলিত আছে। 'অঙ্কস্য বামাগতি'—অঙ্কের মূল বামদিক হইতে নির্দ্ধারিত হয়, এ কথা কে না অবগত আছেন? 'বেদেন্দু-পক্ষযুতে' এই বাক্যের অর্থ করিতে হইলে, গণিত শাস্ত্রের নিয়মানুসারে উহার অর্থ হয়—২১৪; অর্থাৎ শেষ অঙ্ক পক্ষ বা ২ প্রথমে আসে, মধ্যাঙ্ক ইন্দু বা ১ তৎপরে বসে এবং প্রথমাঙ্কের বেদ বা ৪ সর্ব্বশেষে স্থাপিত হয়। ইহাই নিয়ম। ভাস্করাচার্য্য লিখিত 'নন্দা-দ্রীন্দুগুণাঃ' বাক্যে তাই ৩১৭৯ অঙ্ক নিষ্পন্ন হয়; ৯৭১৩ অঙ্ক সিদ্ধ হয় না। গণিত শাস্ত্রের আলোচনায় আমরা আরও দেখিতে পাই,—যোগে, বিয়োগে, পূরণে, গণিতে অঙ্কের গতি বামদিকে পরিচালিত হয়। কোনও একটী অঙ্কের বিষয় মনে করিলেই এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। যেমন, ২৫ এর সহিত ১২ যোগ দিতে হইলে, প্রথমে ৫ ও ২ যোগ করিয়া, ৭ এর অঙ্কপাত পূর্ব্বক তাহার বামভাগে ২ ও ১ এর যোগফল ৩ রাখিতে হয়, ইত্যাদি। দুই একটী বর্ণের সংযোগ বিষয়েও বামভাগে অক্ষর পরিচালনার পদ্ধতি যে প্রচলিত নাই, তাহাও নহে। যেমন, বর্গের কোনও বর্ণের সহিত 'র' ফলা যোগ করিতে হইলে, তাহার গতি বামদিকে ধাবিত হইয়া থাকে;—প+র=প্র। কয়েকটী স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে, তাহার চিহ্ন বামদিকে ন্যস্ত হইয়া থাকে; যেমন, ক+এ =কে, ক+ই=কি, ক+ঐ=কৈ, ইত্যাদি। যে দেশের বর্ণমালা বামাবর্ত্ত, সে দেশের বর্ণমালার লিখন-পদ্ধতি যে অস্মদ্দেশীয় প্রোক্ত পদ্ধতির অনুসরণে পরিচালিত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? সাধারণ ভাষায় সর্ব্বথা প্রচলিত ছিল না বলিয়া বিরুদ্ধবাদিগণ এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া আপনাদের মৌলিকত্ব প্রদর্শন পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, ইহাই মনে হইতে পারে। ফলতঃ, দেখিতে গেলে, বর্ণমালার আদিও ভারতবর্ষে, বর্ণমালার সর্ব্বপ্রকার লিখন-পদ্ধতির মূল-সূত্রও ভারতবর্ষে। যাঁহারা বর্ণমালার আকৃতি দেখিয়া উহার উৎপত্তি-স্থানের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগকে দেখাইতে পারা যায়, এই ভারতবর্ষেই সকল প্রকার অক্ষরের সকল প্রকার আকৃতির বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষে সকল আকৃতির অক্ষরই বিদ্যমান। সুতরাং যাঁহারা বলেন,—সরল-রেখা-মূলক অক্ষর হইলেই সেই অক্ষরের মৌলিকত্ব অবিসম্বাদিত, তাঁহাদিগকে দেখাইতে পারি, ভারত-বর্ষের বঙ্গাক্ষর অধিকাংশই সরল রেখার সমষ্টিতে সংগঠিত। তিন-চারিটী সরল রেখার সংযোগে ত্রিকোণাকার 'ব', 'ক', 'দ' এবং দুইটী সরল রেখার সংযোগে 'এ' প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। অশোকাক্ষরের 'ক' প্রভৃতির সরলতায় (+ অনুরূপ মূর্ত্তিতে) সকল দেশের সকল অক্ষরের সরলতাকে পরাভূত করিতে পারে। অক্ষরের বক্রগতিতে যদি কেহ মৌলিকত্ব দেখিতে চাহেন, 'ঞ', 'ঈ' প্রভৃতিতে তাহাও দেখিতে পাইবেন। ফলতঃ, ভারতের বর্ণমালা কল্পতরু-বিশেষ। যে দেশের যে অক্ষরই যিনি দেখাইবেন, তাহার অনুরূপ মৌলিক অক্ষর ভারতের

কোনও-না-কোনও দেশে কোনও-না-কোনও সময়ে প্রচলিত ছিল, অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইতে পারে। মিঃ টেলার বর্ণমালার যে বংশলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের এই বক্তব্যই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। টেলারের উদ্ভাবিত 'ম' বর্ণের বংশ-লতার প্রতিচিত্র এই স্থলে প্রকাশ করিতেছি। সেই বংশলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারিবে। টেলারের সেই বংশলতা এই,—

বিভিন্ন দেশের 'ম' বর্ণ।

মিশর-দেশীয়
ফিনিসীয়
গ্রীক
সেমিরীয়
আরামীয়
সেবীয়
রোমান
পিউনিক
কপটিক
এসট্রাংঘেলো
হিব্রু
প্রাচীন-ভারতীয়
ইথিওপীয়
ইংরেজী
সিরীক
তামিল
তিব্বতীয়
বার্মিজ
জেন্দ
মঙ্গোলীয়
প্রাচীন-আরবী
সংস্কৃত
জাভানী
আর্মাণীয়
মাঞ্চু
আধুনিক-আরবী
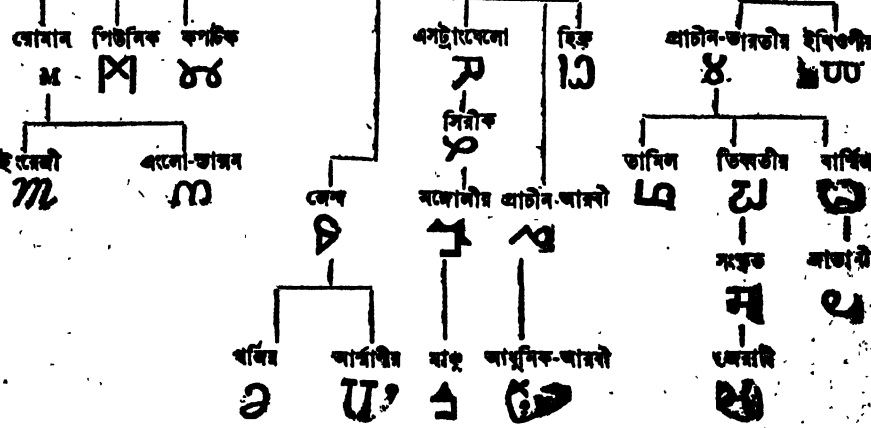
উল্লিখিত বংশলতায় প্রকাশিত নানা ভাষায় 'ম' রূপে উচ্চারিত অক্ষরগুলির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন বর্ণ কি প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনও বর্ণমালার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না? যাঁহারা প্রাচীন ভারতের অক্ষর-সমূহ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই সকল আকৃতির বর্ণমালা ভারতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরই আবিষ্কৃত কয়েকটী ভারতীয় বর্ণমালার প্রতিচিত্র আমরা এস্থলে প্রদান করিতেছি। যিনি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-সম্পন্ন,

তিনি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন,—এই দুই প্রকার বর্ণমালার পরস্পরের মধ্যে কি সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতের কয়েকটী বর্ণমালার এইরূপ আকার দেখিতে পাওয়া যায়—

ന ᓄ ꓘ ന ๑ ന ঘ ৪ ᑭ ᗯ ।৯

বাহুল্য-হেতু অধিক বর্ণমালা উদ্ধার করিলাম না। স্থানান্তরে নানা প্রদেশের বর্ণমালার প্রতিচিত্র প্রকাশ করিয়াছি। তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও টেলার-কল্পিত বংশলতার অনুরূপ অনেক অক্ষর দেখিতে পাওয়া যাইবে। উপরে প্রকাশিত বর্ণমালা কয়েকটীর মধ্যে সেবীয়গণের 'ম' আর আমাদের 'খ' মিলাইয়া দেখুন। খ-কারের মাত্রাটী কাটিয়া, সেই অক্ষরকে সেবীয়গণ আপনাদের 'ম' অক্ষরে পরিণত করিয়াছেন, এ কথা আমরা বলিতে পারি না কি? পতাকার ন্যায় দণ্ডায়মান ফিনিসীয়গণের 'ম' অক্ষরটীতে গুজরাটি ভাষার 'থ' অক্ষরই রূপান্তরে অবস্থিত নহে কি? মিশর-দেশের বিহগচিত্রাঙ্কিত 'ম' মূর্ত্তির সহিত বুদ্ধ-গয়ার প্রস্তর-গাত্রে খোদিত (উদ্ধৃত বর্ণের প্রথম অক্ষর) 'ম' অক্ষরের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন নহে কি? ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া গিয়া পাখীর মূর্ত্তি কল্পনা করা অসম্ভব কি? প্রথমে যিনি ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া গিয়া মিশরে উহার আকৃতির বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি হয় তো বলিয়াছিলেন,—'অক্ষরটী পাখীর মত।' সেই কথা শুনিয়াই চিত্রকর পাখীর মূর্ত্তি আঁকিয়া ঐ অক্ষরের কল্পনা করিয়াছিলেন। এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না কি? দেখিতে গেলে, এইরূপ প্রত্যেক অক্ষরটীকে ভারতের এক একটী অক্ষরের অনুকৃতি বলিয়া মনে হয়। মিশরের বর্ণমালা পরিবর্ত্তন-প্রবাহের মধ্য দিয়া এদেশে আসিয়াছে—যে যুক্তিবলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, আমরা সেই যুক্তিবলেই এ দেশের অক্ষরের আদর্শ অন্য দেশে গৃহীত হইয়াছিল বলিতে পারি। আমরা দেখাইয়াছি,—এদেশের সভ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং উহা যুগযুগান্ত পূর্ব্বে অন্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন,—এ দেশে, দাক্ষিণাত্যে এবং সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী স্থানে, ফিনিসীয় ও সেবীয় বণিকগণ বাণিজ্য করিতে আসিতেন; গুর্জ্জর-প্রদেশের সহিত তাঁহাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। গুজরাটী 'থ' তাই দেখিতে পাই, ফিনিসীয়ার অভিনব 'ম' মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সিরিয়া-দেশের 'ম' অনেকটা 'ু' (উ-কারের) সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। জেন্দ ভাষার 'ম' দেখিলে বঙ্গভাষার চ-কারের মাত্রা গোল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না কি? হিব্রু-ভাষার 'ম'—বঙ্গীয় ৯-কারের বামভাগে একটী দাঁড়ী। অধুনা-প্রচলিত ভারতীয় বর্ণমালার কোনও কোনও অক্ষর ইংরেজী বর্ণমালায় অবিকল বিদ্যমান। ইংরেজীর (S) এবং তেলেগু-বর্ণমালার 'ক' অক্ষর দুইটী পাশাপাশি রাখিয়া মিলাইয়া দেখিলেই আমাদের কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ বর্ণমালার বংশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বর্ণমালার বংশ-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা একটী বংশলতা প্রকাশ করিতেছি; ভারতীয় যে 'ম' অক্ষরকে সেবীয় 'ম' অক্ষরের সন্ততি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইবে, ভারতীয় ম-অক্ষর সেবীয় বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন হয়

নাই ; বরং বঙ্গীয় বর্ণমালার 'ঘ' অক্ষর, গুজরাটী বর্ণমালায় তার মস্তকহীন হইয়া, সেবীয়ায় 'ম' রূপে, ফিনিসীয়ায় পতাকা-রূপে এবং মিশরে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া প্রবেশ করিয়াছে।
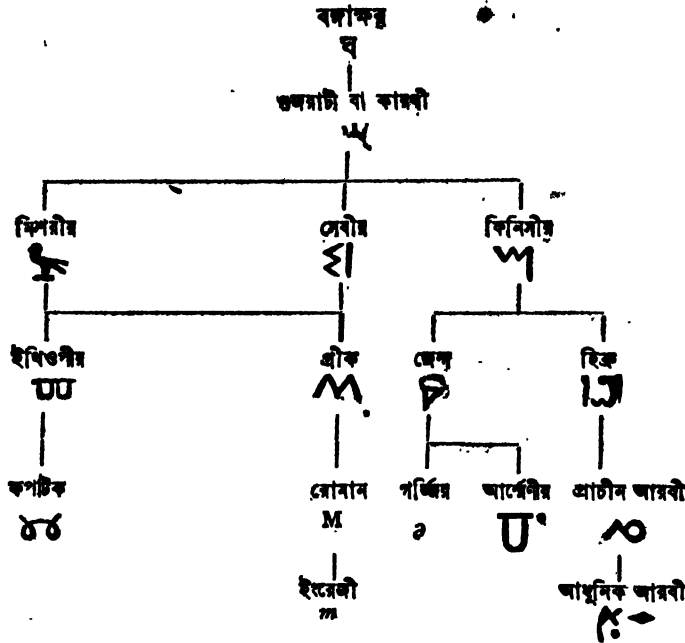
গুজরাটী বা কায়থী অক্ষর মাত্রাশূন্য। পঞ্জাবের গুরুমুখী বর্ণমালাও মাত্রাহীন। সেবীয় বণিকগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে ঐ সকল প্রদেশে গতিবিধি করিয়া বাঙ্গালার 'ঘ' অক্ষরটাকে মাত্রাশূন্য করিয়া, আপনাদের 'ম' অক্ষর মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছিলেন। সেবীয় 'ম' উল্টাইয়া ধরিয়া, তাহার দক্ষিণের রেখাটি বাদ দিলেই গ্রীকদিগের 'ম' অক্ষর পাওয়া যাইবে। তাহা হইতে রোমান এবং রোমান হইতে ইংরেজী কিরূপে গঠিত হইতে পারে, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক হইবে না। মাত্রাহীন 'ঘ' অক্ষরের সহিত (বিশেষতঃ প্রস্তর লিপির 'ঘ' অক্ষরটির সহিত) মিশরের পক্ষীর সম্বন্ধ কিরূপ সূচিত হইতে পারে, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গালা ঘ-কারের দক্ষিণ পার্শ্বের লম্ব রেখাটি বাদ দিয়া, উহার মাত্রাটিকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া, নিম্নস্থিত রেখাটিকে ঊর্দ্ধভাবে টানিয়া মাত্রার সহিত মিলাইয়া দিলে, পক্ষীর আকৃতি ধারণ করে কিনা, একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে। ইথিওপীয় 'ম' অক্ষরটিকে দুই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। 'ঘ' অক্ষরটি উল্টাইয়া ধরিয়া, তাহার মাত্রা ও নিম্নের রেখা বাদ দিয়া, দক্ষিণদিকের সরল রেখাটাকে উপরে জুড়িয়া দাও ; ইথিওপীয়ার 'ম' আপনিই হইয়া আসিবে। অন্যদিকে আবার, পাখীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনও কোনও অংশ বাদ দিলেও ঐ মূর্ত্তি দাঁড়াইতে পারে। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ভারতের কোনও-না-কোনও অক্ষরের সহিত অন্য দেশের অক্ষরের সাদৃশ্য আছে। এতাদৃশ সাদৃশ্য সত্ত্বে কি করিয়া আর প্রতীচ্যের বাগ্‌বিতণ্ডা অনুমোদন করিতে পারি ? পণ্ডিতগণের আর এক যুক্তি—যে ভারতের বর্ণমালায়

সংখ্যা যত কম, সে ভাষা তত অসম্পূর্ণ, সে ভাষা তত প্রাচীন ও আদিম ভাষা। এই যুক্তির সাহায্যেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকে দ্রাবিড়ী বা তামিল ভাষাকে ভারতের একটী আদিম ভাষা (এমন কি, সংস্কৃত প্রভৃতি অপেক্ষাও প্রাচীন ও আদিম) বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। আমরা কিন্তু পণ্ডিতগণের এ যুক্তিরও সারবত্তা দেখিতে পাই না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই,—বর্ণমালার সংখ্যা-হ্রাসের পক্ষে দিন দিনই চেষ্টা চলিতেছে। অনেক পণ্ডিত অধুনা বঙ্গীয় বর্ণমালা হইতে দুইটা 'শ', একটা ব এবং ড়, ঙ, প্রভৃতিকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিলে শান্তি অনুভব করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে 'সর্টহাণ্ড' বা সংক্ষেপে বাক্য-লিখন-প্রণালী প্রচলিত করিবার পক্ষে কতমতেই চেষ্টা চলিয়াছে। অধুনা ঐরূপ সংক্ষেপ-করণ-পদ্ধতি গুণের মধ্যে গণনীয়। এরূপ প্রক্রিয়ার ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় কি না, সে মীমাংসায় উপনীত হইবার ইহা প্রকৃষ্ট স্থান নহে। তবে মানুষ যতই সভ্য বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে, ততই সে তাহার বর্ণমালার প্রসার কমাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে,—ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এই কথা মানিয়া লইতে হইলে, বলিতে পারা যায় না কি,— 'ভারতের বর্ণমালার সংখ্যা কমাইয়া লইয়া অন্যান্য জাতি ক্রমশঃ আপনাদের বর্ণমালার সংগঠন করিয়া লইয়াছিলেন ?' তাই ভারতীয় বর্ণমালার স্বরবর্ণের সংখ্যা চৌদ্দটার কম নহে; ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ছত্রিশটারও অধিক। কিন্তু ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার বর্ণমালায় স্বর-ব্যঞ্জনের মোট সংখ্যা—ছাব্বিশটির অধিক নহে। এবম্বিধ বিবিধ কারণে আমরা ভারতীয় বর্ণমালাকেই সকল বর্ণমালার আদিভূত বলিয়া মনে করি। দুই এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও মনে মনে যে এ ভাব অনুভব করিতে পারেন নাই, তাহা নহে। অধ্যাপক ডাউসন বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন,—'ভারতের বর্ণমালা অন্যান্য দেশের বর্ণমালা হইতে কখনই উৎপন্ন হয় নাই; এ বর্ণমালা আপনিই উদ্ভূত হইয়াছে।' * জেনারেল কানিংহাম বহু তর্ক-বিতর্কের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,—'ভারতের বর্ণমালা ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কারণ, তাহাদের সহিত এমন কোনও জাতির সম্বন্ধ ছিল না, যাহাদের নিকট হইতে ভারতবাসীরা ঐ বর্ণমালা পাইতে পারে।' † কানিংহাম অবশ্য ইন্দো-পালি বা ভারত-প্রচলিত অশোকাক্ষরকে লক্ষ্য করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কারণ, এই বিষয়ে তাঁহার একটা প্রধান যুক্তি,—'ভারতবাসীদিগের সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ প্রতিবেশী বলিতে 'এরিয়ানা' ও পারস্যের অধিবাসীদিগকেই বুঝাইয়া

---

* "The peculiarities of the Indian alphabet demonstrate its independence of all foreign origin, and it may be confidently urge that all probabilites and inferences are in favour of an independent invention.'—*Vide* Prof. John Dowson, *Journal of the Royal Asiatic Society*, New Series, Vol XIII.

† "It (Indian Alphabet) must have been the local invention of the people themselves for the simple reason that there was no other people from whom they could have obtained it". Alexander Cunningham, *Corpus Inscriptionum Indicarum.*

থাকে। কিন্তু তন্মধ্যে এরিয়ানার অধিবাসীরা প্রধানতঃ সেমিটিক বর্ণমালা ব্যবহার করেন; সে বর্ণমালা দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে লিখিত হয়। পারস্যের অধিবাসীদিগের মধ্যে কিলাকার বর্ণমালা প্রচলিত; ভারতের বর্ণমালার সহিত উহাদের কোনই সাদৃশ্য নাই।' ভারত-প্রচলিত অশোক-লিপি যে সেমিটিক বর্ণমালার আদর্শে গঠিত হয় নাই, মিঃ টমাস তৎসম্বন্ধে ত্রিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেন। 'প্রথম,—উভয় লিপির লিখন-প্রণালী পরস্পর বিভিন্ন;—একটী দক্ষিণাবর্ত্ত, একটী বামাবর্ত্ত। দ্বিতীয়,—উভয় বর্ণমালার আকৃতিগত সাদৃশ্য অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তৃতীয় সেমিটিক বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত ইন্দো-ব্যাকৃট্রিয় বর্ণমালা, ভারতবর্ষের ভাষার শব্দোচ্চারণ পক্ষে, অশোকের প্রবর্ত্তিত ভারতীয় বর্ণমালা হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট।' * যদি বিশেষ কোনও বর্ণমালার মৌলিকত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা বঙ্গাক্ষরকে অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারি। বঙ্গাক্ষরের 'ব', 'ক', 'এ', 'দ' ও প্রণব নিশ্চয়ই মৌলিক অক্ষর।

বিচার-বিতর্ক দ্বারা ভারতীয় বর্ণমালার মৌলিকত্ব সপ্রমাণ হইলেও সে সিদ্ধান্ত যে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইবে, সেরূপ আশা করিতে পারি না। প্রাচীন ভারতের পুরাতন কাহিনী কীর্ত্তন করিতে করিতে যিনি সময়ে সময়ে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন, সেই ম্যাক্সমুলারের ন্যায় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতও এ বিষয়ে বিষম সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে,—খৃষ্ট-জন্মের পনরের শত বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় বটে; কিন্তু খৃষ্ট-জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যে লিপির প্রচার ছিল, এ কথা স্বীকার করিতে তাঁহার লেখনী কম্পিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—'মধ্যের সহস্র বৎসর কাল বেদবাণী কণ্ঠে কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল; তখন উহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই।' বর্ত্তমান কালের কোনও গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি যদি এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার স্পর্দ্ধার পরিচয় বলিয়া গণ্য হইত। সহস্র বৎসর তো দূরের কথা, এ কালে সহস্র দিন তো নহে-ই,—সহস্র দণ্ড পর্য্যন্তও, কোন্ গ্রন্থ মুখে মুখে প্রচলিত ছিল—পরন্তু লিপিবদ্ধ হইবার অবসর পায় নাই—এ কথাটুকু বলিতেও কেহ সাহসী হইতেন না। কিন্তু প্রাচীন ভারতের, পুরাতন বিষয়ের, এখন পিতা-মাতা নাই; তাই যাঁহার যাহা মনে আসে, তিনি সেই কথাই বলিয়া থাকেন। আমরা একই বিষয়ে শত শত গ্রন্থ, শত শত মত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি; তাহাতে বুঝিয়াছি,—যিনিই যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই বক্তব্য একমাত্র অনুমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ম্যাক্সমুলারও সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই তুলনায় ভারতীয় লিপির আধুনিকত্ব সপ্রমাণে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার যুক্তির একটু আভাষ প্রদান করিতেছি। তিনি বলেন,—'ফ্রেডরিক আগাষ্টাস উল্ফ্ নামধেয় জনৈক জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মনে এক সময়ে দুইটী প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। সে প্রশ্ন দুইটী,—গ্রীকদিগের স্মৃতি-স্তম্ভে, মুদ্রায়, অস্ত্ররোধকে এবং চুক্তি-নামায় যে লিপি ব্যবহৃত হইত, কোন্

সিদ্ধান্তে মতান্তর।

* Vide, Prinsep's Essays, Vol. II.

সময় কোথা হইতে তাহারা সে লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং গ্রীকগণের পুস্তকাদিতে ব্যবহৃত লিপিই বা তাহারা কি প্রকারে প্রাপ্ত হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রীকদিগের সাহিত্যের আদিম অবস্থা অবগত হওয়া যায়। গ্রীসের ইতিহাসে লিখিত আছে,—আইওনিয়ানগণ * ফিনিসীয়গণের নিকট লিপি-শিক্ষা করিয়াছিলেন। আল্‌ফাবেট (Alphabet) শব্দ ফিনিসীয়দিগের নিজস্ব বলিয়া অবগত হওয়া যায়। এসিয়া-মাইনর-বাসী আইওনীয়-গণের সহিত ফিনিসীয় বণিকগণের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। বাণিজ্য-সংক্রান্ত চুক্তিনামার আবশ্যক বিধায়, ফিনিসীয়গণ আইওনীয়-গণকে বর্ণমালা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অর্ণব-পোত পরিচালনের জন্য পেরিপ্লাস † অর্থাৎ সমুদ্র-পথে পৃথিবী পরিভ্রমণ নামক গ্রন্থ-পত্র ব্যবহৃত হইত। উদ্যমশীল নাবিকগণ সেই পেরিপ্লাস গ্রন্থ-পত্রের সাহায্যে এক দেশ হইতে অন্য দেশে অর্ণবপোত পরিচালনা করিতেন। পেরিপ্লাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ জন্যও আইওনীয়-গণের বর্ণমালা শিক্ষার প্রয়োজন হয়। ফিনিসীয় বণিকগণের নিকট তাহারা সে শিক্ষাও লাভ করে। আইওনীয়গণ প্রথমে অপরিষ্কৃত পশ্বাদির চর্ম্মের উপর লিখিতে আরম্ভ করে। সেই চর্ম্ম ডিপথেরা নামে অভিহিত হইত। পরিশেষে পার্চ্চমেণ্টের আবিষ্কার হইলে, তাহারা তাহাতেই লিখিতে আরম্ভ করে। আইওনিয়ান-গণের মধ্যে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঐরূপ লিখন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহিত্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার তাহাই আদিস্তর। সেই সময়কে গদ্য-সাহিত্যেরও আদিকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। লিখন-প্রক্রিয়া তখন অশেষ আয়াস-সাপেক্ষ ছিল। কেবল কোনও গুরুতর উদ্দেশ্য-জন্যই তৎকালে লিপি ব্যবহৃত হইত। অধুনা 'মারের হ্যাণ্ডবুক' বলিতে যে গ্রন্থের বিষয় মনে উদয় হয়, সেকালে চর্ম্মের উপরে প্রথমে যাহা কিছু লিখিত হইত, তাহাতেও সেই ভাব আসিতে পারে। চর্ম্মের উপর লিখিত সেই সকল গ্রন্থ বা পত্র পেরিয়জেসিস্ (Periogesis) বা পেরিওডস (Periodos) নামে অভিহিত হয়। ঐ সকল পত্র যখন সমুদ্র-ভ্রমণে পথ-নির্দ্দেশকরূপে সহায়তা করে, তখন উহার নাম—পেরিপ্লাস অর্থাৎ নগর বা দেশ-ভ্রমণে ভ্রমণকারীর সাহায্য-বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রীস-দেশের প্রধান ঐতিহাসিক হেরোডেটাস (৪৪৩ পূঃ খৃঃ) এসিয়া মাইনর-বাসী আইওনিয়ান-গণের ভাষায় ব্যবহৃত বহু শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। এসিয়া মাইনরে ধীরে ধীরে যে লিপির ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ক্রমে চারি দিকে

---

* এসিয়া-মাইনরের একটী প্রাচীনতম দেশ আইওনিয়া নামে পরিচিত ছিল। সেই দেশের অধিবাসিগণ 'আইওনীয়' বা 'আইওনিয়ান' সংজ্ঞা-প্রাপ্ত। প্রাচীন গ্রীসের চারিটি প্রধান জনসমাজের একটী প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহারা পরিগণিত হন। আইওনীয়-দিগের ভাষা প্রাচীন গ্রীসের একটী প্রধান ভাষা ছিল। গ্রীসদেশের পুরাবৃত্তে প্রকাশ,—'আইওন' নামে অ্যাপোলোর এক পুত্র ছিল। এথেন্সের রাজকন্যা ক্রুসার গর্ভে 'আইওন' (Ion) জন্মগ্রহণ করে। আইওনের সন্তান-সন্ততিগণ 'আইওনীয়' বা 'আইওন'-বংশীয় নামে অভিহিত। পণ্ডিতগণ 'আইওনিয়ান' (Ionion) ও যবন (Jawan) শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

† "The useful little sheet called *Periplus or Circumnavigations* which at that time were as precious to sailors as maps were to the adventerous seamen of the middle ages."

তাহা বিবৃত হইয়া পড়ে। পরিব্রাজকেগণের সাহায্যকারী, দেশ-বিদেশের অবস্থিতি-নির্ণায়ক, গ্রন্থ হইতে ক্রমে জীবন-গতি নির্ণায়ক দার্শনিক গ্রন্থ-সমূহ রচিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সূত্রে আইওনীয় দেশীয় অ্যানাক্সিমান্দার (৬১০—৫৪৭ পূঃ খৃঃ) এবং সেবীয়-দেশীয় ফেরিকেডাস প্রভৃতির নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। গ্রীস-দেশে একিলিসের সময়ে (৫০০ পূঃ খৃঃ) লিপি স্ফূর্তি-লাভ করিয়াছিল,—গ্রীসের কবিতা প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় বিদ্যমান। এইরূপে বুঝা যায়, ভারতবর্ষে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের আবির্ভাবের পূর্ব্বে (খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে) ভারতবর্ষে যে কোনরূপ লিপির প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেই সময়ে যে সকল লিপি খোদিত হইয়াছিল, তাহাই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। অশোক ২৫৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২২২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভারতে লিপির প্রবর্ত্তনা—সেই সময়েই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।' ম্যাক্সমূলারের উক্তিতে স্থূলতঃ এইরূপ মন্তব্যই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আর এক স্থলে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—"পৃথিবীর যে কেহ যে কোনও বর্ণমালা ব্যবহার করেন, সকল বর্ণমালাই রোমান এবং গ্রীক বর্ণমালার নিকট ঋণী। গ্রীকগণ ফিনিসীয় বর্ণমালার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন; আর ফিনিসীয়গণ মিশর হইতে বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছিলেন।" * আমাদের মতে, এ সকলও অনুমান-সাপেক্ষ। বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির বিষয় স্মরণ করিতে হইলে সকলের সকল যুক্তিই ফুৎকারে উড়িয়া যায়। আইওনীয়-দিগের কয়েকখানি 'সিট' বা পত্র মাত্র অবলম্বন করিয়া যে যুক্তির পোষকতা হইতেছে, আমাদের দেশে তাৎকালিক সহস্র সহস্র গ্রন্থের বিদ্যমানতায় সে যুক্তি নিতান্ত অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যে দেশে স্মরণাতীত কাল হইতে অসংখ্য গ্রন্থ বিদ্যমান, সে দেশে লিপির প্রচলন ছিল না;—আর যে দেশে 'সবে ধন নীলমণি' দুই এক খানি সিট বা পত্র মাত্র বিদ্যমান ছিল, তাহাই লিপির আদি স্থান হইল! বর্ণমালা শিক্ষাদান পক্ষে আইওনীয়-গণ ইউরোপের শিক্ষকের আসন লাভ করিতে পারেন; কিন্তু ভারতের সম্বন্ধে সে কথা কখনই প্রযোজ্য নহে। ভারতের বর্ণমালা, বহু হাত ঘুরিয়া-ফিরিয়া ইউরোপে গিয়াছিল—ইহা ভিন্ন অন্য কোনও মত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পুনশ্চ, প্রাচীন মিশরে মৌর্ত্তিক অক্ষরের সত্তা উপলব্ধি হয়; সুতরাং মিশরই বর্ণমালার জন্মদাতা,—এ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার পূর্ব্বে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে আর একবার ভারতের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে বলি। ভারতের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি রাশি-সমূহ, আবহমান কাল হইতে ভারতে মৌর্ত্তিক অক্ষরের নিদর্শন-রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। মৌর্ত্তিক অক্ষরের আদর্শ ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? † তাই বলিতেছি—পূর্ব্বেও বলিয়াছি,

---

* "Every one who writes a letter owes his alphabets to the Romans and Greeks; the Greeks owed their alphabet to the Phoenicians, and the Phoenicians learnt it in Egypt."—Max Muller, *India: What can it teaches us.*

† ভারতে মৌর্ত্তিক অক্ষরের বিষয় আবিষ্কার যে দৃষ্টান্ত [illegible], এ দৃষ্টান্ত [illegible] পরিস্ফুট। (এই গ্রন্থের ৪২২-৪২৩ পৃষ্ঠায় আবিষ্কার কল্পিত ভারতীয় মৌর্ত্তিক চিত্রের [illegible]।)

আবারও বলিতেছি—ভারতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ব্যবহারের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বর্ণমালা-সমূহ (মৌর্ত্তিক অক্ষরই বল, আর অন্য যাহাই বল) বিদ্যমান ছিল, এবং সেই বর্ণমালা-সমূহের অনুসরণেই অন্যান্য দেশের বর্ণমালা-সমূহ গঠিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামধেয় ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির একই বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, অধুনাও ভারতবর্ষে তদ্রূপ বিভিন্ন আকৃতির একই বর্ণমালার অসদ্ভাব নাই। যে সকল বর্ণমালায় অধুনা পুস্তকাদি মুদ্রিত হয়, তাহার প্রকার-ভেদ অধিক না হইলেও, বর্ণমালার লিখিত আকৃতি এখনও ভারতে অল্প প্রকারের নহে। ভারত-প্রচলিত হস্তলিখিত বর্ণমালার বিষয়ে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীর বাটাভিয়া সহরে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে ভারত-প্রচলিত ১৯৮ প্রকার আধুনিক ও প্রাচীন বর্ণমালার পরিচয় সংগৃহীত হইয়াছিল। বার্জ্জেস প্রণীত 'আর্কিয়লজিকাল সার্ভে' গ্রন্থেও ভারত-প্রচলিত বিবিধ লিপির পরিচয় পাই। * ডাকবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ হাচিন্সন প্রথমে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এবং পরিশেষে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারত-প্রচলিত হস্তলিখিত বর্ণমালা-সমূহের একটী আদর্শ-সংগ্রহে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সেই তালিকায় উপলব্ধি হয়, ভারতে অন্যূন ষাট প্রকার বর্ণমালায় চিঠিপত্র লিখিত হইয়া থাকে। কোন্ বর্ণমালা কোন্ দেশের লিখন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, ইংরাজী বর্ণমালা-ক্রমে তিনি তাহার একটী তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় লিখিত ভারতীয় বর্ণমালা-সমূহের নাম;—'অরোরা (সিন্ধুদেশে), আসামী (আসামে), বেণিয়া (শির্শা ও হিশারে), বাঙ্গালা (বঙ্গদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ প্রধান নগরসমূহে), ভাওয়ালপুরী (ভাওয়ালপুরে), বিশাতি (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে), দেবনাগর (হিন্দী ভাষায়), দোগরী (কাশ্মীরে), গ্রন্থম্ (তামিল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে) গুজরাটী (গুজরাটে ও রাজপুতানায়), গুরুমুখী, (পাঞ্জাবের শিখগণের মধ্যে), কায়থী (অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের হিন্দুগণের মধ্যে), কেনারি (কানাড়ায় ও মহীশূরে), কাড়ারী (সিন্ধুদেশের বেণিয়াগণের মধ্যে), খোজা (খোজা এবং দেশীয় রাজ্যের সওদাগরগণের মধ্যে), লামাবাসী (পিভীতে), লুণ্ডী (শিয়ালকোটে), মলয়ালম (মালবরে ও ত্রিবাঙ্কুরে), মারাঠী, (গোয়ালিয়রে ও ইন্দোরে), মাড়োয়ারী (রাজপুতনায় সওদাগরগণের মধ্যে), মোদি (অযোধ্যায়), মুলতানী (মুলতানে), মণিপুরী (মণিপুরে), মুরিয়া (বিহারের সওদাগরগণের মধ্যে), নেপালী (নেপালে), নিমারী (মধ্য-প্রদেশে), ওঝা (বিহারের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে), পাহাড়ী (কুমায়ুন ও গড়োয়ালে), পারাচী (ভেরায়), রোড়ি (পঞ্জাবের মহাজনগণের মধ্যে), সহীশ (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভৃত্যগণের মধ্যে), স্বরাফী (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মহাজনগণের মধ্যে), সারিকা (পঞ্জাবের দেরাজাত প্রদেশে), শিকারপুরী (উত্তর সিন্ধুপ্রদেশে), তামিল (মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশে), তেলেগু (মান্দ্রাজের উত্তরাংশে), থল (পঞ্জাবের দেরাজাতে),

* এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ জানিতে হইলে মিঃ বার্জ্জেসের আর্কিয়লজিকাল সার্ভে, (Burges's *Archaeological Survey*, Vol. IV) এবং মিঃ হোল কর্তৃক সংগৃহীত বর্ণমালা সংক্রান্ত গ্রন্থ (The useful collection of 198 indian Alphabets, ancient and modern, compiled by Holle—*Tabel van ond en neiuw Indische Alphabettum*) দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষের বর্ণমালা।

-:○:-

ভারতবর্ষে অধুনা যে ভাষার যে বর্ণমালা প্রচলিত আছে, তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটী ভাষার কতকগুলি বর্ণের প্রতিচিত্র নিম্নে প্রকটিত হইল। যথা,—

বঙ্গাক্ষর ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

দেবনাগর [illegible]

বঙ্গাক্ষর প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ অ ই উ এ আ

দেবনাগর [illegible]

বঙ্গাক্ষর ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঞ ট ঠ ঢ ণ ত থ দ ধ ন

আসামী(প্রাচীন) [illegible]

বঙ্গাক্ষর প ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ অ ই উ এ আ

আসামী(প্রাচীন) [illegible]

বঙ্গাক্ষর ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

কুটিল [illegible]

বঙ্গাক্ষর প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ অ ই উ এ আ

কুটিল [illegible]

বঙ্গাক্ষর ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

কেনারি [illegible]

বঙ্গাক্ষর প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ অ ই উ এ আ

কেনারি [illegible]

বঙ্গাক্ষর প ফ ব ভ ম য র ল ব শ হ অ উ এ আ

গুরুমুখী [illegible]

৪৩৩ পৃষ্ঠা।

ভারতবর্ষের বর্ণমালা

বঙ্গাক্ষর — ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ণ ত দ ধ ন

গুজরাটি — [illegible]

বঙ্গাক্ষর — প ফ ব ভ ম য র ল ব শ স হ অ ই উ এ আ

গুজরাটি — [illegible]

বঙ্গাক্ষর — ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ঢ ণ ত থ দ ধ ন

সিন্ধী — [illegible]

বঙ্গাক্ষর — প ফ ব ভ ম য র ল ব স হ অ ই উ

সিন্ধী — [illegible]

বঙ্গাক্ষর — ক খ গ চ ছ জ ড ণ ত থ দ ধ ন

মুলতানী — [illegible]

বঙ্গাক্ষর — প ফ ব ম য র ল ব স হ অ ই উ

মুলতানী — [illegible]

বঙ্গাক্ষর — ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

তেলেগু — [illegible]

বঙ্গাক্ষর — প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ অ ই উ এ আ

তেলেগু — [illegible]

বঙ্গাক্ষর — ক ঙ চ ঞ ট ণ ত ন

তামিল — க ங ச ஞ ட ண த ந

বঙ্গাক্ষর — প ম য র ল ব অ ই উ এ আ

তামিল — ப ம ய ர ல வ அ இ உ எ ஆ

বঙ্গাক্ষর — ক খ গ ঙ চ জ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

তুলু — [illegible]

বঙ্গাক্ষর — প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ অ ই উ এ আ

উড়িয়া — [illegible]

তিব্বতী (তিব্বতে), তুলু (মাঙ্গালোরে), উড়িয়া (উড়িষ্যায়)। এতদ্ভিন্ন বার্ম্মিজ, শ্যাম, লেয়স্, কম্বোজ, পেগুয়ান এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ও যবদ্বীপের বর্ণমালা-সমূহ—হাচিন্সনের সংগ্রহের অন্তর্নিবিষ্ট আছে। * ভারত-প্রচলিত বৈদেশিক ভাষার উল্লেখ করিতে গেলে, বর্ণমালার সংখ্যা যে আরও অধিক হইয়া পড়ে, তাহা বলাই বাহুল্য। আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার বর্ণমালা বিবিধ প্রকারে লিখিত ও মুদ্রিত হওয়ার বিষয়ও এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারত-প্রচলিত বিবিধ বর্ণমালার শৃঙ্খলা-পদ্ধতি অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই, বর্ণমালা-মাত্রেই প্রধানতঃ দুই প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ। কোনও কোনও বর্ণমালায় প্রথমে স্বরবর্ণ-সমূহ ও তৎপরে ব্যঞ্জনবর্ণ-সমূহ সজ্জিত আছে; কোনও কোনও বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জন মিশ্রিতভাবে একত্র সমাবিষ্ট। প্রথমোক্ত পদ্ধতি—সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া, গুজরাটী, তেলেগু, তামিল প্রভৃতি ভাষার বর্ণমালায় পরিগৃহীত; শেষোক্ত পদ্ধতি—আরবী, পারসী, ইংরেজী, গ্রীক প্রভৃতি ভাষার বর্ণমালায় প্রচলিত। পণ্ডিতগণ প্রথমোক্ত বর্ণমালাকে 'আলিকালি' নামে এবং শেষোক্ত বর্ণমালাকে 'আল্ফাবেট' † নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সংস্কৃত ভাষায় বর্ণমালা-সমূহ যে প্রণালীতে সজ্জিত হয়, তাহা এই,—(স্বরবর্ণ) অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ; (ব্যঞ্জনবর্ণ) ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ। বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় বর্ণমালার সমাবেশে প্রধানতঃ এই পদ্ধতি পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তবে এই সকল ভাষার কোনও ভাষায় কোনও বর্ণ নাই বা কোনও ভাষার কোনও বর্ণমালার দুই একটী বর্ণের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গাক্ষরের মধ্যে য়, ড়, ং, ঃ, ঁ, ৎ প্রভৃতির সমাবেশ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় ঐ সকল শব্দের উচ্চারণ য, ড, ঢ, অং, অঃ প্রভৃতির দ্বারা সাধিত হইত। কিন্তু সাধারণের শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গাক্ষর-মধ্যে ঐ কয়েকটী নূতন বর্ণের অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে 'ক্ষ' অক্ষরটী ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যুক্তাক্ষরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে মূল বিষয়ে যে কোনও গণ্ডগোল ঘটিয়াছে, তাহা মনে হয় না। যাহা হউক, এই পদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহু দেশে পরিগৃহীত হইয়াছে। সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, কোরিয়ায়, শ্যামরাজ্যে, তিব্বতে এইরূপ ভাবেই অক্ষর-সমূহ সুসজ্জিত। তবে বিশেষ বিশেষ দেশে বিশেষ বিশেষ অক্ষর পরিত্যক্ত হইয়াছে,—এই যা একটু পার্থক্য। ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি দেশের অক্ষরে ঋ, ৠ, ঌ,

---

* Hutchinson (W. C.)—*Specimens of various Vernacular characters passing through the Post Offices in India, Calcutta,* 1877.

† প্রথমে 'আল্ফা' ও পরে 'বেটা' এই প্রণালীতে পাশ্চাত্য দেশের বর্ণমালা সজ্জিত বলিয়া উহার নাম—'অলফাবেট' হইয়াছে। আলি শব্দে শ্রেণী বুঝায়। 'অ'+আলি=আলি অর্থাৎ অ-কারাদি স্বর-বর্ণের শ্রেণী এবং ক+আলি=কালি অর্থাৎ ক-কারাদি ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রেণীর এই অর্থেই স্বর, ও ব্যঞ্জনবর্ণের পর পর সমাবেশে 'আলিকালি' নাম হইয়াছে। বৈয়াকরণগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ঌ, ঐ, ঔ, শ, ষ, ক্ষ, অং, অঃ প্রভৃতি নাই। কিন্তু দুইটা 'ল' আছে; তাহার একটার উচ্চারণ ভিন্নরূপ। তিব্বতীয় বর্ণমালায় ঋ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ব, ভ, ষ, ক্ষ প্রভৃতি অক্ষর নাই; কিন্তু চ, ছ, ঝ, দুইটা করিয়া এবং 'ঞ' তিনটা দেখিতে পাই। বলা বাহুল্য, উহাদের পরস্পরের উচ্চারণে একটু একটু পার্থক্য আছে। তামিল ভাষায় স্বরবর্ণের সংখ্যা বারটা এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা আঠারটা। স্বরবর্ণের মধ্যে ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, নাই; কিন্তু দুইটি 'এ' ও দুইটি 'ও' আছে। স্বরবর্ণ কয়টির নাম—অনা, আওনা, ইনা, ঈওনা, উনা, উওনা, এনা, এওনা, ঐওনা, ওনা, ওওনা, ঔওনা। ঋ, ঌ না থাকিলেও হ্রস্ব এ-কার ও দীর্ঘ এ-কার এবং হ্রস্ব ও-কার ও দীর্ঘ ও-কার লইয়া স্বরবর্ণ বারটিতে দাঁড়াইয়াছে। তামিল ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণ একটু বিশেষ বৈচিত্র্যময়। উহাতে বর্গের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ আদৌ নাই। পাঠ-পদ্ধতিও অভিনব! যথা,—'ক' পরিবর্তে কনা; 'ঙ' পরিবর্তে ঙনা; এবং চনা, ঞনা, টনা, ণনা, পনা, মনা, অনা বনা, লনা, বনা, ভনা, অড়না, ইড়ানা, আড়ানা, অনানা। তামিল ভাষার আর একটু বিশেষত্ব—ঐ ভাষায় তিনটি ড-কার আছে। তাহাদের উচ্চারণ ডনা, অড়ানা, ইড়ানা; অর্থাৎ, তিনটী ড-কারের কোনটি ড-কারবৎ, কোনটি ড়-কারবৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে। তেলেগু ভাষায় দুইটি এ-কার ও দুইটি ও-কার আছে। অধিকন্তু ঋ, ৠ, ঌ ও ৡ বিদ্যমান। ঐ ভাষায় ল দুইটি, জ তিনটি; পাঠ-পদ্ধতি—(স্বরবর্ণের) অকারমু, আকারমু, ইকারমু, ঈকারমু, উকারমু, ঊকারমু, রু, রূ, লু, লূ, একারমু ইত্যাদি; * (ব্যঞ্জনবর্ণের)—কু, খু, গু, ঘু, ইত্যাদি। 'জ' তিনটার উচ্চারণের একটু পার্থক্য আছে; পারসী ও আরবীর জাল্, জাদ প্রভৃতির সহিত তাহাদের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাই। উৎকলীয় বর্ণমালার সমাবেশ-পদ্ধতি, প্রায় সর্বাংশে, বঙ্গীয় বর্ণমালার অনুরূপ। কেবল ঋ, ৠ, ঌ, ৡ এই চারিটী বর্ণের পাঠ-পদ্ধতি—তেলেগু ভাষার ন্যায়—রু, রূ, লু, লূ; নচেৎ, আর কোনও বিশেষত্ব নাই। অন্যান্য বর্ণমালার মধ্যে মুলতানী বর্ণমালায় ঘ, ঙ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ঢ, ভ, শ, ষ প্রভৃতি বর্ণ নাই; গুরুমুখী বর্ণমালার মধ্যে একটী মাত্র শ দৃষ্ট হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালায় অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। সেই সকল ভাষায় শব্দ-বিশেষের উচ্চারণে বা লিখনে দুইটি বা ততোধিক বর্ণের আবশ্যক হইয়া থাকে। সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, কাশ্মীরী, তেলেগু, তামিল, মলয়ালম্, কেনারি, গ্রন্থম্, আসামী, সিংহলী, তিব্বতী, উড়িয়া, বার্ম্মিজ, শ্যামদেশী, কোরিয়াদেশী প্রভৃতি ভাষায় এবং যবদ্বীপে ও ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অ-কার, ক-কারাদি অক্ষর রূপান্তরে প্রচলিত আছে। ঐ সকল দেশের বর্ণমালাকে 'আলিকালি' বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। হিব্রু, গ্রীক, ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্ণমালার সহিত আরবী, পারসী প্রভৃতি বর্ণমালার লিখন-

---

* সংস্কৃতে অ-কার, ই-কার প্রভৃতি বলিবার পদ্ধতি আছে। সংস্কৃত-মতে পুংলিঙ্গান্ত শব্দ-রূপে ঐ সকল বর্ণ উচ্চারিত হইয়া থাকে। তেলেগু ভাষায় প্রথমে উহা ক্লীবলিঙ্গ শব্দের ন্যায় 'অকারম্' ইত্যাদি রূপে উচ্চারিত হওয়া সম্ভবপর এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ 'অকারমু' ইত্যাদি রূপে উচ্চারিত হইতেছে, কেহ কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

পদ্ধতি ভিন্নরূপ হইলেও, ঐ সকল বর্ণমালা প্রধানতঃ 'আল্‌ফাবেট' সংজ্ঞায় পরিচিত। এক হিসাবে, ঐ সকল বর্ণমালার সমাবেশ-পদ্ধতি অভিন্ন বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। 'আল্‌ফাবেট' শ্রেণীভুক্ত কয়েকটী বর্ণমালার নাম উল্লেখ করিতেছি, তাহাতে এতদ্বিষয় সম্যক্‌ উপলব্ধি হইবে। হিব্রু অক্ষর-সমূহের নাম,—আলেফ্‌, বেথ্‌, গিমেল্‌, ডালেথ্‌, হে, ভৌ, ঝয়িন, খেথ্‌, থেথ্‌, যোদ্‌, কাফ্‌, লমেদ্‌, মেম্‌, নুন্‌, সামেথ্‌, আয়েন, পে, চদেই, কাফ্‌, রেষ, সিন্‌, তৌ। গ্রীক-বর্ণমালা-সমূহের নাম—আল্‌ফা, বেটা, গামা, ডেল্টা, এপ্‌ছিলন, ভৌ, ঝিটা, ইটা, থেটা, আইওটা, কপ্পা, লম্বোডা, মু (মাই), নু (নাই), সিগ্‌মা (ক্সি), অমিক্রন্‌, পি, কোপ্পা, রো, সান্‌ (সিগ্‌মা), ভৌ, ইপ্‌সিলন, ফি, চি, প্সাই, প্সি, ওমেগা। ইংরাজী বর্ণমালা-সমূহের নাম,—এ, বি, সি, ডি, ই, এফ্‌, জি, এইচ্‌, আই, জে, কে, এল, এম, এন্‌, ও, পি, কিউ, আর, এস্‌, টি, ইউ, ভি, ডব্লিউ, এক্স, ওয়াই, জেড। আরবী অক্ষর-সমূহের নাম,—আলিফ, বে, পে, তে, টে, বা, টা, সে, জিম, চে, হে, খে, দাল, ডা, জাল, রে, রা, যে, ঝে, সিন, শিন, স্বড, যাদ, টো, ঝো, আয়েন, গায়েন, ফে, কাফ্‌, খাপ্‌, গাফ্‌, লাম, মিম নুন্‌, ওয়া, হে, ইয়ে। ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র এখন এ, বি, সি, ডি প্রভৃতি নামধেয় বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়; আলিফ্‌, বে প্রভৃতি বর্ণমালা সামান্য রূপান্তরে আরব, পারস্য ও তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত।

একই নামধেয় বর্ণমালা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার পরিগ্রহ করিয়া আছে। বঙ্গীয় বর্ণমালার সহিত দেবনাগর বর্ণমালার প্রধান পার্থক্য—দেবনাগর বর্ণমালা অনেকটা বক্রভাব বিশিষ্ট; কিন্তু বঙ্গীয় বর্ণমালা প্রায়শঃই সরল-রেখার সংযোগে সংগঠিত। দেবনাগর বর্ণমালার ক, ব, প, থ, দ, চ প্রভৃতি অক্ষরের সহিত বঙ্গীয় বর্ণমালার আকার মিলাইয়া দেখিলেই এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। উৎকলীয় বর্ণমালার বিশেষত্ব এই—উহার মাত্রা সরল নহে। উহার বর্ণ-সমূহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রায়ই বক্র-রেখা-বিশিষ্ট অর্থৎ গোলাকার। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ মনে করেন,—তালপত্রে লোহ-নির্ম্মিত লেখনীতে উৎকলীয় অক্ষর-সমূহ প্রধানতঃ লিখিত হইত; সেই জন্য সরল রেখার সমাবেশ অল্পই হইয়াছে এবং পত্র ছিন্ন হইবার আশঙ্কায় উহার মাত্রা গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে। গুরুমুখী বর্ণমালার আকৃতি প্রায়ই দেবনাগর বর্ণমালার অনুরূপ; পার্থক্য এই যে, গুরুমুখী বর্ণমালার মাত্রা নাই; দেখিলে মনে হয়, যেন দেবনাগর বর্ণমালার মাত্রাগুলি কাটিয়া ফেলিয়া ঐ বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে। কায়থী এবং গুজরাটী বর্ণমালা প্রায় একই আকৃতিবিশিষ্ট। দেবনাগর এবং রঞ্জাক্ষর ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ঐ দুই বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উহাদেরও মাত্রা নাই। দেবনাগর বর্ণমালার সহিত উহার পার্থক্য—উহার আকৃতি কিঞ্চিৎ লম্বভাবাপন্ন। উৎকলীয় বর্ণমালার সহিত তেলেগু বর্ণমালার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বক্রভাব ও গোলাকৃতি তেলেগু বর্ণমালায় উৎকলীয় বর্ণমালা অপেক্ষা অনেক অধিক। দুই একটী বর্ণের আকৃতি উৎকলীয় ও তেলেগু ভাষায় অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। প্রায় এক লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত প্রদেশের এক কোটি সত্তর লক্ষের অধিক লোক তেলেগু ভাষা ও

বর্ণমালার আকৃতি-গত পার্থক্য।

তেলেগু বর্ণমালা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেনারী বর্ণমালা তেলেগু বর্ণমালার সহিত বিশেষ সাদৃশ্য-সম্পন্ন। কেনারি ভাষা প্রাচীন ও আধুনিক দুই ভাগে বিভক্ত। প্রায় ৬৫ হাজার বর্গ-মাইল প্রদেশের ৯০ লক্ষ অধিবাসী, এই ভাষা ও বর্ণমালা ব্যবহার করেন। তামিল বর্ণমালায় বক্র ও সরল রেখা উভয়েরই সমাবেশ আছে। ঐ বর্ণমালার 'অ'—অনেকটা বঙ্গীয় বর্ণমালার মাত্রা-শূন্য অ-কারের অনুরূপ। তামিল বর্ণমালার 'ক'—দেব-নাগর বর্ণমালার 'ক' এর অনুরূপ; কেবল নিম্নভাগ পরিবর্জ্জিত। কেহ কেহ মনে করেন, তামিল অক্ষর প্রাচীন দেবনাগর অক্ষর হইতে উৎপন্ন; কেহ আবার মনে করেন, গিরিগুহার প্রাচীন খোদিত লিপি-সমূহের আদর্শে তামিল বর্ণমালা-সমূহ প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই গিরিগুহার বর্ণমালা-সমূহ, তাঁহাদের মতে, দেবনাগর অক্ষর অপেক্ষাও বহু প্রাচীন। তামিল বর্ণমালার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। অগস্ত্য কর্তৃক তামিল বর্ণমালার সৃষ্টি হয়, অগস্ত্য ঋষিই প্রথম তামিল ব্যাকরণ লিখিয়া যান,—ইহাই প্রচার। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও তামিল ভাষা ও তামিল বর্ণমালাকে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করেন। বাইবেলে 'তুকাই' নামক তামিল ভাষার একটী শব্দ দৃষ্ট হয়। সলোমনের রাজত্বকালে ফিনিসীয় বণিকগণের বাণিজ্য-পোত দ্রাবিড়দেশে গতিবিধি করিত। সেই সময়ে হিরামের অর্ণবপোতে কতকগুলি ময়ূর সলোমনের নিকট সংবাহিত হয়। সেই ময়ূর—'তুকাই' নামে অভিহিত হইয়াছিল। তামিল ভাষায় ময়ূরের নাম—টোগাই (Togai)। টোগাই শব্দের অপভ্রংশে হিব্রু ভাষায় তুকাই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল। * ইহাতে তামিল ভাষা, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে, প্রাচীন ভাষা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তামিল দেশে সংস্কৃত ভাষা লিখিবার জন্য প্রধানতঃ 'গ্রন্থম' নামধেয় অক্ষর ব্যবহৃত হয়। সেই অক্ষর হইতেই 'মলয়ালম' অক্ষর উদ্ভূত হইয়াছে। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক মলয়ালম ভাষার অক্ষর ব্যবহার করেন। মালবার উপকূলের 'মাপ্পিলা' বা 'মোপ্লা' নামধেয় মুসলমানগণ এবং লাক্ষাদ্বীপের অধিবাসীরা যে মলয়ালম ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা আরবী অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। তামিলের কয়েকটি অক্ষর তেলেগুর কয়েকটি অক্ষরের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন। † অধুনা-প্রচলিত আসামী বর্ণমালা সর্ব্বাংশে বঙ্গাক্ষরের ন্যায়; কেবল 'ব' প্রভৃতি দুই-একটি অক্ষরের সামান্য পরি-

---

* "The Tamil alphabet exhibits forms which Dr. Burnell has traced to the *Vattelutu*, a very ancient Drvidian alphabet of obscure origin....The peacocks *tuki* brought by Hiram's ships to Solomon, are designated by a loan-word obtained from Tamil *togai*."—*See* Burnell, *South Indian Palaeography*.

† দ্রাবিড়ী জাতীয় ভাষার মধ্যে তামিল ভাষা ও তামিল বর্ণমালাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া কথিত হয়। এই বর্ণমালা ও এই ভাষা প্রায় ৬০ হাজার বর্গমাইল্ পরিমিত দেশে প্রচলিত। সে তুলনায় তামিল-ভাষা-প্রধান দেশ পরিমাণে ইংলণ্ড ও ওয়েলস উভয়ের সমান বলিয়া প্রতীত হয়। মান্দ্রাজের ২০ মাইল্ উত্তরস্থিত পুলিকট হইতে আরম্ভ করিয়া, দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপের কিয়দংশ প্রদেশ পর্য্যন্ত তামিল অক্ষর ও তামিল ভাষা প্রচলিত। পূর্ব্বে সমুদ্র এবং পশ্চিমে ঘাট পর্ব্বতমালায় ইহার সীমানা নিবদ্ধ। প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ লোক তামিল ভাষা ও তামিল বর্ণমালা ব্যবহার করেন। লঙ্কাদ্বীপের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী তামিল-ভাষাভাষী। পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তামিল ভাষায় শতকরা চল্লিশটী সংস্কৃত শব্দ আছে।

বর্ত্তন দৃষ্ট হয়। এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, মূল এক; কিন্তু দেশভেদে, লিখন-পদ্ধতির তারতম্যানুসারে, বর্ণমালার আকৃতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আরবী বা পারসী অক্ষর-সমূহের আকৃতি, দেবনাগর বা বঙ্গীয় বর্ণমালার অনুরূপ নহে বটে; তবে কোনও কোনও অক্ষরের অঙ্কনে একেবারে যে সাদৃশ্য নাই, তাহাও বলিতে পারি না। বিশেষতঃ, তেলেগু, তামিল, মলয়ালম প্রভৃতি অক্ষরের দুই একটী অক্ষর যেন উহাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সকল বর্ণমালায় ভারতে অধুনা গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইতেছে, তন্মধ্যে বঙ্গাক্ষর, দেবনাগর, গুরুমুখী, গুজরাটি, বার্ম্মিজ, কায়থী, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল, মলয়ালম, কেনারী, আরবী, পারসী, লেপ্‌চা প্রভৃতি অক্ষর সাধারণতঃ প্রচলিত। সাঁওতাল প্রভৃতি কয়েকটি অসভ্য জাতির ভাষা, অধুনা রোমান ও বঙ্গীয় বর্ণমালা—উভয় প্রকার অক্ষরেই লিখিত হইতেছে। সংস্কৃত ভাষারও অনেক গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকে। দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ভাষা, হিন্দী ভাষা, মারাঠী ভাষা, * গুর্খাদিগের নেপালী ভাষা এবং কাশ্মীরী প্রভৃতি ভাষা লিখিত হয়। মারাঠী ভাষায় যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহৃত হয়, তাহার দুই একটী অক্ষরে সামান্য পার্থক্য আছে; নচেৎ, সকল অক্ষরই দেবনাগরের ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন। মারাঠী ভাষায় ব্যবহৃত দেবনাগর সাধারণতঃ 'বাল-বোধ' অক্ষর বলিয়া পরিচিত। মহারাষ্ট্র দেশে যে বর্ণমালায় সাধারণতঃ চিঠি-পত্রাদি লিখিত হয়, তাহা 'মোদি' অক্ষর নামে অভিহিত। গুরুমুখী অক্ষর কেবল পঞ্জাবের শিখ-দিগের গুরুমুখী ভাষায় ব্যবহৃত হয়। কায়থী বর্ণমালা প্রধানতঃ বিহারে প্রচলিত। উর্দ্দু, হিন্দী, সিন্ধী ও পশ্‌তু প্রভৃতি ভাষায় আরবী ও পারসী অক্ষর প্রচলিত। উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, কেনারি, মলয়ালম প্রভৃতি বর্ণমালা স্ব স্ব নামধেয় ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অল্প দিন হইল, লেপ্‌চাদিগের ভাষার অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছে। খাসী, মিস্‌মি, খোন্দ প্রভৃতি জাতীয় ভাষা অধুনা রোমান অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। তুলু ভাষা—তামিল ও কেনারীর মধ্যবর্ত্তী ভাষা। তুলু ভাষার কোনও বর্ণমালা নাই; প্রধানতঃ কেনারী অক্ষরে ঐ ভাষা লিখিত হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশের পারসীগণের ভাষা প্রধানতঃ পারসী গুজরাটী নামে অভিহিত। ঐ ভাষায় গুজরাটি অপেক্ষা পারসী বর্ণমালার অধিক প্রচলন। উহা দ্বিবিধ অক্ষরেই লিখিত হইয়া থাকে। সিন্ধুদেশের সিন্ধী-ভাষা—পারসী ও হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত। হিন্দুগণ সিন্ধী বর্ণমালায় ঐ ভাষায় লিখিয়া থাকেন; মুসলমানগণ আরবী অক্ষর (সিন্ধী-শব্দের উচ্চারণের জন্য দুই একটি অতিরিক্ত অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া লইয়া) ব্যবহার করেন। সিন্ধী ভাষার কোনও কোনও পুস্তক গুরুমুখী অক্ষরেও মুদ্রিত হইয়াছে। গবরমেণ্ট এখন সিন্ধী ভাষায় পরিবর্ত্তিত দেবনাগর অক্ষর চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সিন্ধু এবং পঞ্জাব প্রদেশের প্রায় ৪০ চল্লিশ লক্ষ লোক সিন্ধী ভাষা ব্যবহার করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিন্দী ভাষা দেবনাগর অক্ষরে লিখিত হয়। গ্রন্থাদিতে দেবনাগর ব্যবহৃত হইলেও, বস্তু

* মহারাষ্ট্র ভাষা—এক লক্ষ দশ হাজার বর্গ মাইল- বিস্তৃত দেশের এক কোটী সত্তর লক্ষাধিক লোকের মধ্যে প্রচলিত।

লিখিবার জন্য হিন্দী ভাষায় কায়থী বর্ণমালা প্রচলিত। ব্যবসায়ীরা যে হিন্দীতে সর্ব্বদা লেখাপড়া করিয়া থাকেন, তাহার নাম 'সরাঠি' বা 'মহাজনী' হিন্দী। আড়াই লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত দেশের প্রায় সাত কোটি অধিবাসী হিন্দী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। প্রদেশ-ভেদে হিন্দী যে নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে, সে আভাষ পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। বারাণসী প্রদেশের হিন্দী, সংস্কৃতের অনুরূপ; আগ্রা অঞ্চলের হিন্দী, পারসীর অনুসারী। হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু ভাষা—হিন্দী, পারসী ও আরবীর সংমিশ্রণে গঠিত হয়। মুসলমানগণের ভারতাধিকার সময়ে, মুসলমানগণের ভাষা পারসী ছিল; তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুগণ হিন্দী ভাষা ব্যবহার করিতেন। জেতা ও বিজেতার মধ্যে কথোপকথনের আবশ্যক-হেতু ক্রমশঃ উর্দ্দু ভাষার উৎপত্তি হয়। উর্দ্দু ভাষা প্রধানতঃ পারসী অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে এবং উর্দ্দু ভাষার পুস্তকাদি আরবী অক্ষরে মুদ্রিত হয়। অধুনা রোমান অক্ষরেও উর্দ্দু ভাষা লিখিবার ব্যবস্থা চলিয়াছে। হিন্দুগণ অপেক্ষা মুসলমানগণই উর্দ্দু ভাষার অধিক অনুরাগী। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রায় আড়াই কোটী লোকের মধ্যে উর্দ্দু ভাষা প্রচলিত। তিব্বতী ভাষার বর্ণমালা অনেকাংশে দেবনাগর বর্ণমালার অনুরূপ। তিব্বতীয়গণের প্রার্থনা বা মন্ত্র-মূলক যে লিপি প্রচলিত, তাহা সম্পূর্ণ-রূপ দেবনাগর বর্ণমালার ও সংস্কৃত ভাষার সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। তিব্বত দেশে উপাসনার সময়ে যে চক্র ঘূর্ণন করা হয়, তাহার গাত্র-লিখিত 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' বাক্য দর্শন করিলেই এ বিষয় উপলব্ধি হইতে পারে। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই, লিখিত লিপির সংখ্যা প্রায় দুই শত প্রকার হইলেও, ইউরোপীয় বর্ণমালা ভিন্ন ভারতবর্ষে প্রায় বিংশতি প্রকার বর্ণমালায় গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইয়া থাকে।

আধুনা যে প্রণালীতে মুদ্রণ-কার্য্য সম্পাদিত হয়, সে প্রণালীর মূল-সূত্র অনেক পূর্ব্বে প্রত্যক্ষীভূত হইলেও, তুলনায় তাহা অল্প দিন মাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মুদ্রণ-পদ্ধতির মূল-সূত্রে—ছাঁচ গ্রহণ। বস্তু-বিশেষের বা মূর্ত্তি-বিশেষের ছাঁচ লওয়ার প্রথা পৃথিবীর প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে বিদ্যমান ছিল প্রমাণ পাওয়া যায়। কাষ্ঠে বা কোনও কঠিন দ্রব্যের উপর কোনও বিষয় খোদিত করিয়া লইয়া, মৃত্তিকা বা মোমের উপর ছাঁচ লওয়া হইত, এরূপ প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। আমাদের দেশের প্রাচীন মন্দির-গাত্রে দেবদেবীর মূর্ত্তি-সমন্বিত যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক স্থলে তাহা ছাঁচ হইতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীন আসিরীয় জাতির অট্টালিকা প্রভৃতির ভগ্ন-স্তূপে ছাঁচের নিদর্শন নানারূপে বিদ্যমান আছে। ব্যাবিলনের প্রাচীন নগরের ও প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষে যে অখণ্ড ইষ্টক-সমূহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; সেই ইষ্টক-গাত্রে মৌর্ত্তিক অক্ষর এবং অনুরূপ (বৃক্ষ ও প্রাণী প্রভৃতির) চিত্র পরিদৃষ্ট হয়। ঐ সকল সামগ্রী হইতে মুদ্রণ-কৌশলোদ্ভাবনের অস্ফুট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জ্ঞান হইতেই কাষ্ঠের উপর অক্ষর খোদাই করিয়া চর্ম্মের বা পাত্রের উপর তাহার প্রতিচিত্র লইবার ব্যবস্থা হয়। পণ্ডিতগণ তাহাকে মুদ্রণ-যন্ত্রাবিষ্কারের দ্বিতীয় স্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

মুদ্রা-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অক্ষরের উপর চাপ দিয়া লওয়ার প্রথম পদ্ধতি কোন্ দেশে প্রথম প্রচলিত হয়, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্ণয় করেন, চীনদেশেই প্রথমে ঐ পদ্ধতির আবিষ্কার হইয়াছিল। খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৫০-৯৩০ অব্দের মধ্যে চীনদেশের রাজমন্ত্রী মঙ্-তাঁওং প্রথমে ঐ প্রণালীতে মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাষ্ঠের উপর এক সঙ্গে আবশ্যকমত বহু অক্ষর খোদিয়া লইয়া, তাহা হইতে ছাপিবার প্রথা এখনও বহু দেশে প্রচলিত। প্রথমে এক কাষ্ঠে, এক সঙ্গে আবশ্যকমত বাক্যাবলী কাটিয়া লওয়া হইত; পরিশেষে একটি একটি অক্ষর স্বতন্ত্র-ভাবে কাটিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ইউরোপে প্রথমে কাষ্ঠ-ফলকে ছাপিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে কাষ্ঠ-ফলকের সাহায্যে ইউরোপে বাইবেল ছাপা হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে প্রকাশ আছে। পৃথক পৃথক অক্ষর প্রস্তুত করিয়া গ্রন্থাদি ছাপিবার প্রণালী, ইউরোপে ১৫৫০ হইতে ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়। মুদ্রাযন্ত্র ঐ সময়ে যে আকারে নির্ম্মিত হইত, এখন দিন দিন সে আকার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পরিবর্ত্তনই যেন জগতের নিয়ম! ভারতবর্ষে পুরাকালে ছাঁচের প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালীর মুদ্রাযন্ত্র ছিল কি না, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হেষ্টিংসের শাসন সময়ে, বারাণসীর সন্নিকটে, মৃত্তিকা মধ্যে, একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মুদ্রণ-যন্ত্র পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু সে মুদ্রণ-যন্ত্র —ইউরোপে মুদ্রণ-যন্ত্রের নির্ম্মাণের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ইতিহাসের আলোচনায় বুঝিতে পারি, প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর হইল, ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জেসুইট * সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজকগণ প্রথমে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ইউরোপের কোন্ প্রদেশে কোন্ শিল্পী কর্ত্তৃক প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তুলনায় সে দিনের ঘটনা হইলেও, তদ্বিষয়েই মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন দিনেমারগণ, কেহ বলেন জর্ম্মণগণ, প্রথম মুদ্রাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দিনেমারদিগকে যাঁহারা মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মত এই যে, ১৪২০ হইতে ১৪২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লরেন্স কষ্টার নামক জনৈক শিল্পী দিনেমার দেশে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা জর্ম্মণদিগকে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আদিভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মত এই যে, গটেনবর্গ-বংশীয় জোহান জান্সফ্লেস কর্ত্তৃক ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম নির্ম্মিত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি জন গটেনবর্গ বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিত। বহু তর্ক-বিতর্কের পর ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ জন গটেনবর্গকেই মুদ্রা-যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। জর্ম্মণীর

* রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একটী শাখা 'জেসুইট' নামে অভিহিত। ষোড়শ শতাব্দীতে ইগ্নেটিয়াস লয়লা কর্ত্তৃক ঐ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। প্রটেষ্টাণ্ট এবং রোমান-ক্যাথলিক-দিগের মধ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত ঘোর শত্রুতা চলিয়াছিল।

মেঞ্জ সহরে গটেনবর্গ জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তাঁহার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কাষ্ঠনির্ম্মিত অক্ষরে মুদ্রণ-কার্য্য সমাহিত হইত। পরিশেষে জন ফষ্ট এবং পিটার স্কফার তাঁহার অংশীদার হন। সেই সময়ে (১৪৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) সীসার অক্ষর ঢালাই-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। ১৪৫০ হইতে ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গটেনবর্গ বাইবেল মুদ্রিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই বাইবেল এখন দুর্লভ। ফষ্ট ও স্কফার ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম যে পুস্তক প্রচার করেন, তাহার নাম—'লিটারি ইণ্ডাল্‌জেণ্টিয়ারাম নিকোলাই (Literae Indulgentiaram Nicholai V.)। এক খণ্ড পার্চ্চমেণ্টের উপর উহা মুদ্রিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে, ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারে, ক্যাক্সটন কর্ত্তৃক প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সেই মুদ্রাযন্ত্র হইতে 'গেম অফ চেস্‌' (Game of Chess) নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থই ইংলণ্ডের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের সহিত ইউরোপীয়গণের সম্বন্ধ-সূত্র দৃঢ়ীভূত হইয়া আসে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। পূর্ব্বে যে জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজক-গণের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাঁহারাই প্রথম গোয়া-নগরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মুদ্রাযন্ত্রে প্রথমে রোমান বর্ণমালায় গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ভারতীয় বর্ণমালার অক্ষর-সমূহ নির্ম্মিত হয়। ফাদার এষ্টেভো (ওরফে ষ্টিফেন্স নামক জনৈক ইংরেজ) ১৬০০ খৃষ্টাব্দে বলিয়া গিয়াছেন,—'তখন একমাত্র রোমান বর্ণমালায় কোঙ্কনী প্রভৃতি ভাষার পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল।' কিন্তু অন্যান্য প্রমাণে সে উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোয়ানগরে জেসুইটগণের দুইটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি মুদ্রাযন্ত্র গোয়ানগরের সেণ্টপল কলেজে এবং অপরটি তাঁহাদের বাসস্থান রাচোলে স্থাপিত হয়। এতদ্দেশীয় ভাষার অক্ষরের মধ্যে প্রথমে মালবার-তামিল বা মলয়ালম ভাষার অক্ষর খোদিত হইয়াছিল। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কোচিন সহরে জোয়ানেস গন্সাল্‌ভাস্‌ কর্ত্তৃক প্রথমে মলয়ালম ভাষার বর্ণমালা প্রস্তুত হয়। জোয়ানেস গন্সাল্‌ভেস—জেসুইট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহার খোদিত অক্ষরে যে গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তাহার নাম 'ডক্‌ট্রি না ক্রিশ্চিয়ানা' (Doctrina Christiana); অর্থাৎ খৃষ্ট-ধর্ম্মের নীতি। ঐ গ্রন্থ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। পর বৎসর 'ফ্লোস সাংটোরাম' (Flos Sanctorum) নামক দ্বিতীয় গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে 'তামিল ভাষার প্রথম অভিধান' গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। * বঙ্গাক্ষরে সর্ব্ব-প্রথম যে গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তাহার নাম—'হাল্‌হেড্‌স্‌ গ্রামার' (N. B. Halhed's Grammar) অর্থাৎ হাল্‌হেড প্রণীত ব্যাকরণ।' † ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী সহরে ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। সার চার্লস উইলকিন্স নামক বঙ্গীয় সেনাদলের জনৈক লেফ্‌টেনাণ্ট

* Dr. Caldwell.—*A Comparitive Grammar of the Dravidian Languages.*

† "The first Bengali types. ever used in India were those employed in 1778, in priniing Halhed's Bengalee Grammer at a press in Hugli of which no record now remains".—John C. Marshman, *The life and times of Carey, Marshman and Ward, embrasing the history of Serampore Mission*, 1859.

ঐ গ্রন্থ মুদ্রণের জন্ত বঙ্গাক্ষর খোদিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে পঞ্চানন নামক শ্রীরামপুরের জনৈক কর্ম্মকার অক্ষর খোদাই কার্য্য শিক্ষা করেন। পঞ্চাননের প্রতি অক্ষর এক সময়ে পাঁচ সিকা মুল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। পাদরি কেরি সাহেব কর্তৃক বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদিত 'মাথু-লিখিত সুসমাচার' নামক খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা পঞ্চাননের খোদিত অক্ষরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী ঐ গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য সমাধা হয়। ইহার পর, 'নিউ টেষ্টামেণ্ট' অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। মার্সম্যান, ওয়ার্ড, গ্রাণ্ট, ব্রান্সন ও কেরি প্রমুখ মিশনরিগণ শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া ঐরূপে গ্রন্থ-সমূহ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সে সময়ে বিভিন্ন খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ বিদ্বেষভাব বিদ্যমান ছিল; সুতরাং মিশনরিগণকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় আশ্রয় দেন নাই। শ্রীরামপুর তখন দিনেমারদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। দিনেমার গবরমেণ্টের সহায়তা পাইয়া সেখান হইতেই মিশনরিগণ পুস্তকাদি প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রথম-সংবাদপত্র—১৮১৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। বঙ্গভাষার সেই প্রথম-সংবাদপত্রের নাম—'বাঙ্গালা গেজেট।' * ঐ সংবাদপত্র গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক এক বৎসর পরিচালিত হইয়াছিল। ইহার পর, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, মার্সম্যান সাহেব শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার-দর্পণ' সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ঐ সংবাদপত্র একুশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময় 'বেঙ্গল গেজেট' নামক ইংরাজী সংবাদপত্র এদেশে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। জেমস্ আগাষ্টাস হিকি নামক একজন সাহেব ঐ সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। হিকির নামানুসারে ঐ সংবাদপত্র 'হিসিজ্ গেজেটিয়ার' নামেও প্রসিদ্ধ। বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষর প্রায় সাড়ে চারি কোটি লোকের মধ্যে প্রচলিত। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ভাষার দ্বিতীয় গ্রন্থ কলিকাতা হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু সে গ্রন্থও এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থকে কেহ কেহ বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গদ্য-গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" পত্রে, পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরে বঙ্গভাষায় ২৭ খানি বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার বিষয় লিখিত আছে। সেই দশ বৎসরে ঐ সকল পুস্তকের পনের সহস্র খণ্ড এদেশীয়গণের মধ্যে বিক্রীত হইয়াছিল ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে প্রথম দেবনাগর অক্ষর প্রস্তুত হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তেলেগু বর্ণমালায় গ্রন্থাদি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের প্রায় কুড়িটি ভাষায় বাইবেল অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

* বাঙ্গালা গেজেট—প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র কিনা, এ বিষয়ে অনেক মতান্তর আছে। ইংরেজদিগের গ্রন্থে 'সমাচার-দর্পণকে' প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র এবং 'হিকির গেজেটকে' প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র বলিয়াপ্র ধানতঃ উল্লেখ দেখিতে পাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।

[ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ ;—ধর্ম্ম ও 'রিলিজিয়নে' কি বুঝায়,—ধর্ম্মের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে সংশয়-সমস্যা, পরস্পর-বিরোধী ভাবেও ধর্ম্ম শব্দের অর্থ উপলব্ধি,—গীতোক্ত ধর্ম্মের দৃষ্টান্তে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব নির্ণয়-চেষ্টা,—বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ধর্ম্ম-মতের বিভিন্নতা,—হিন্দুর ধর্ম্ম, অন্য জাতির ধর্ম্ম,—হিন্দুর ধর্ম্মে ও অন্য জাতির ধর্ম্মে পার্থক্য ;—শাস্ত্রমতে ধর্ম্মের লক্ষণাদি,—ধর্ম্মের লক্ষণ, অঙ্গ ও আধার-স্থান প্রভৃতির আলোচনায় ধর্ম্ম শব্দের অর্থ-নির্ণয় ;—ধর্ম্মে ঈশ্বরের প্রয়োজন,—উপাসনা, পূজা-পদ্ধতি, দেব-দেবী প্রভৃতি ;—বিভিন্ন জাতির মধ্যে উপাসনার প্রাচুর্য্য ও অসদ্ভাব ;—ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সংগঠনের কারণ,—সামান্য সামান্য মত-পার্থক্য-নিবন্ধন নব নব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ; হিন্দু-ধর্ম্মের শাখা-প্রশাখা,—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর নামধেয় শাখা-পঞ্চক,—এক এক শাখায় উৎপন্ন উপশাখা-সমূহের উৎপত্তি-তত্ত্ব।]

ধর্ম্মের সহিত জীবনের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। যেখানেই জীবন, সেখানেই ধর্ম্ম। যেমন বারি বিনা মীন বাঁচিতে পারে না ; ধর্ম্ম বিনাও তেমনই মনুষ্যের জীবন ধারণ অসম্ভব। 'ধর্ম্ম'—শব্দ-তত্ত্বের আলোচনায় সেই অর্থই প্রতীত হয়। ধর্ম্ম-শব্দের মূল—'ধৃ' ধাতু ; 'ধৃ' ধাতুর অর্থ—ধারণ করা। যাহা ধারণ করে বা রক্ষা করে, তাহাই ধর্ম্ম ;—'ধরতি লোকান্ ধ্রিয়তে পুণ্যাত্মভিরিতি।" অর্থাৎ, যাহা লোক-সমূহকে ধারণ করিয়া আছে, বা যদ্দ্বারা পুণ্যাত্মগণ ধৃত বা সংরক্ষিত হন, তাহাই ধর্ম্ম। আমরা তাহাকেই ধর্ম্ম বলি,—যদ্দ্বারা লোক রক্ষা হয়, সংসার রক্ষা হয়, সৃষ্টি রক্ষা হয়, আত্মরক্ষা হয়। ধর্ম্ম শব্দের মূল অর্থ ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সম্পর্কেই, যে সংজ্ঞায়ই হউক, 'ধর্ম্ম' শব্দ এতদর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

'ধর্ম্ম' শব্দার্থ।

সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে ধর্ম্ম-শব্দের মূল অর্থ পূর্ব্বোক্তরূপ নির্দ্দিষ্ট হইলেও, অধুনা ধর্ম্ম শব্দে নানা অর্থ সূচিত হইয়া থাকে। শতাব্দীর পর যতই শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে, ধর্ম্ম শব্দের অর্থও ততই পরিবর্ত্তিত হইতে বসিয়াছে। এমন কি, পরিবর্ত্তনের প্রবাহে পড়িয়া সময়ে সময়ে উহা দ্বারা বিপরীত ভাব পর্য্যন্ত ব্যক্ত হইতেছে। তাই দেখিতে পাই, আজ একরূপ অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত, কাল অন্যরূপ অর্থে উহা প্রচলিত। তাই দেখিতে পাই,—ধর্ম্ম শব্দের অর্থ কেহ বলিয়াছেন—'যাগযজ্ঞ,' কেহ বলিয়াছেন—'অহিংসা,' কেহ লিখিয়াছেন—'নীতি,' কেহ লিখিয়াছেন—'প্রীতি-ভক্তি।' কেহ ধর্ম্ম বলিতে 'উপাসনাকে' বুঝাইয়া থাকেন ; কেহ ধর্ম্ম বলিতে 'নৈতিক উন্নতি' অর্থ সিদ্ধ করেন। আবার কাহারও মতে, ধর্ম্মই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। কেবল আমাদের দেশে নহে ; ধর্ম্ম বা ধর্ম্মভাবমূলক শব্দ সম্বন্ধে সকল দেশেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ সূচিত হইয়া থাকে। যেমন আমাদের দেশে ধর্ম্ম শব্দ লইয়া, সেইরূপ ইউরোপে 'রিলিজয়ন' শব্দের অর্থ নির্ণয়েও বহু দিন হইতে বিতণ্ডা

ধর্ম্ম ও 'রিলিজিয়ন।'

চলিয়াছে। সেই বিতণ্ডার ফলে বড় বড় পণ্ডিতগণও ধর্ম্ম বা 'রিলিজিয়ন' শব্দ-দ্বয়ের অর্থ নির্দ্দেশ করা অসম্ভবপর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'রিলিজিয়ন' শব্দ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত আলোচনা করিতেছি। লাটিন 'রিলিজিও' (Religio) শব্দ হইতে 'রিলিজিয়ন' (Religion) শব্দের উৎপত্তি। লাটিন ভাষার কেন্দ্রস্থল রোম সাম্রাজ্যেই ঐ শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে মতান্তর দেখিতে পাই। সিসিরো বলেন,—লাটিন 'রিলিজিও' শব্দ 'রিলেজার' (Relegere) হইতে উৎপন্ন; উহার অর্থ—চিন্তা করা, বিবেচনা করা, পুনর্গ্রহণ করা ইত্যাদি। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন,—রিলিজিয়ন শব্দ 'রিলিগেয়ার' (Religare) শব্দ হইতে উৎপন্ন; উহার অর্থ—'বন্ধন করা', 'ধরিয়া রাখা', 'বাধা দেওয়া' ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ দার্শনিক কাণ্টের মতে,—'রিলিজিয়ন' বা ধর্ম্ম শব্দে 'মরালিটি' অর্থাৎ নীতি বুঝায়। যে অবস্থায় আমরা আমাদের সকল নীতি-সঙ্গত কর্ত্তব্য কর্ম্মকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মনে করি, তিনি মনে করেন, তাহাতেই ধর্ম্ম নিহিত আছে। ফিশি বলেন,—'রিলিজিয়ন' বা ধর্ম্ম অর্থ জ্ঞান। উহার সহিত কার্য্যের কোনও সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্ম দ্বারা মানুষের অন্তর্দৃষ্টি মার্জ্জিত হয়, মনুষ্য উচ্চ প্রশ্ন-সমূহের উত্তর দানে সমর্থ হয়; তাহা হইতে মনে পবিত্রতা আনয়ন করে। শ্লেয়ার-মেয়ারের (অন্যতর জর্ম্মণ দার্শনিকের) মত অন্যরূপ। তিনি বলেন,—'রিলিজিয়ন বা ধর্ম্ম অর্থ—পরাধীনতা। কোনও বস্তুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর-পরায়ণতা-মূলক অনুভূতিই রিলিজিয়ন বা ধর্ম্ম। যাঁহার প্রতি আমরা ঐরূপ নির্ভর-পরায়ণ হইয়া থাকি, তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি বা না পারি, তিনি আমাদের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত আছেন।' কিন্তু হিগেল আবার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,—'রিলিজিয়ন শব্দে স্বাধীনতা বুঝাইয়া থাকে। রিলিজিয়ন অর্থে অধীনতা হওয়া তো দূরের কথা, উহাতে সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনতা অর্থই সূচিত হয়। কারণ, এতদ্দ্বারা সীমাবদ্ধ আত্মাকে উপলক্ষ করিয়া স্বর্গীয় আত্মা আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন।' ফরাসী-দেশীয় দার্শনিক কোমৎের মতে,—'রিলিজিয়ন' বা ধর্ম্ম অর্থ লোকানুরাগ। তিনি বলেন,—'মানুষের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ; তাহারা মানুষ ভিন্ন উচ্চতর অসীম কোনও বস্তুর ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং মনুষ্যই মানুষের নিকট ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় জ্ঞানের ও উপাসনার প্রকৃত বস্তু। সে অনুরাগ বা উপাসনা ব্যক্তিগত নহে; উহা মনুষ্যজাতির প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় লোকানুরাগ উপাস্য ও উপাসক উভয়কেই বুঝাইতে পারে।' জর্ম্মণীর অন্যতম দার্শনিক ফিউয়ারবাক্ এই ভাব আর একটু রূপান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'আত্মপ্রীতিই (Self-love) ধর্ম্ম। জীবনে আত্মপ্রীতি আবশ্যক। উহা অবিনশ্বর; উহাই সার্ব্বজনীন নীতি ও নিয়ম। সকল প্রকার প্রীতি-প্রেমের সহিত উহার অবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। মানুষ যখনই আপনাকে ভালবাসিতে না শিখিয়াছে, তখনই সংসারে শত অশান্তি, শত বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।' নানা জনের এইরূপ নানা মত দেখিয়া, ম্যাক্সমূলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'রিলিজিয়ন শব্দের অর্থ নিষ্পন্ন করা দুঃসাধ্য।' নানা কালে নানা অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কখনও ঐ শব্দ দ্বারা 'বিশ্বাস' এবং পূজা বুঝাইয়াছে।

কখনও বা ঐ শব্দে 'কর্ত্তব্য-বিষয়ক জ্ঞান', কখনও 'আনন্দময় স্মৃতি' বুঝাইয়া থাকে। কখনও বা ঐ শব্দ দ্বারা ভয় ও আশা, কখনও বা অনুমান ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সূচিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা নয় বা উহা নয়, অথবা কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট সামগ্রী বা প্রক্রিয়া যে ঐ শব্দে বুঝাইয়া থাকে, তাহা বলিতে পারা যায় না। অসভ্য বন্য জাতি হয় তো শব্দটি অবগত নহে; কিন্তু সে যখন যুক্ত করে, কাতর কণ্ঠে, দেবতার উদ্দেশ্যে, প্রার্থনা জ্ঞাপন করে, সৎ বা অসৎ যে প্রার্থনাই হউক, তাহাই তাহার নিকট ধর্ম্ম-কর্ম্ম। যখন কোনও অপরাধী, ঊর্দ্ধ নয়নে, আকাশের পানে চাহিয়া, বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক প্রার্থনা করে,—'হে পরমেশ্বর! এই পাপীর প্রতি সদয় হও'; তাহার পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম। যাঁহারা বলেন—সর্ব্বত্র ঈশ্বর, যাঁহারা বলেন—জগৎ ব্রহ্মময়; যাঁহারা বলেন—চারিদিকে দেবদেবী বিরাজমান; যাঁহারা বলেন—'যত্র জীব তত্র শিব'; তাঁহারাও ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাসবান; আবার বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষ যখন দেবদেবীর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাহাও তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ভিন্ন কি বলিতে পারি? উপনীত ব্রাহ্মণ-যুবক দণ্ড গ্রহণ করিয়া, তন্ময় ভাবে যখন হোমাগ্নি পার্শ্বে একান্তে বসিয়া, সূর্য্যদেবের উপাসনা করেন, তখনও তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান; আবার বৃদ্ধ বয়সে, ধ্যানযোগে সমাসীন হইয়া, পরমাত্মায় আত্মলীন করিয়া, যখন তিনি সর্ব্ব কর্ম্মে বিরত হন, তাহাতেও তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান সূচিত হয়। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া, ধর্ম্ম কি বা ধর্ম্মের স্বরূপ কি—তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া, পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই সমস্যায় পড়িয়া থাকেন। সেই সমস্যায় পড়িয়াই সিলার বলিয়াছেন,—'তিনি কোনও ধর্ম্ম মান্য করেন না।' 'কেন মান্য করেন না'—তাহার উত্তরে তিনি বলেন—'ধর্ম্মই তাঁহাকে এই শিক্ষা দিয়াছে।' এবম্বিধ বিবিধ বিপরীত ভাবের অভিব্যক্তি হয়,—ধর্ম্ম-শব্দের সেরূপ সংজ্ঞা কি প্রকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? এ সমস্যায় রিলিজিয়ন বা ধর্ম্ম শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করা কি প্রকারেই বা সম্ভবপর! *

পরস্পর-বিরোধী ভাবে ধর্ম্ম।

আমাদের দেশে যাঁহারা শাস্ত্র-শাসন মান্য করিয়া চলেন, তাঁহাদের মধ্যে এ সংশয় কখনও উপস্থিত হয় নাই। কারণ, শাস্ত্র ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ কর্ম্ম-বিভাগ দ্বারাই নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে যে সংশয় সময় সময় পণ্ডিতগণের মনে উদয় হয়, সে কেবল সম্প্রদায়-ভেদে কর্ম্ম-ব্যবহারের পার্থক্য-নিবন্ধন। শাস্ত্র এক এক প্রকার অধিকারীর জন্য এক এক রূপ কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষ ভ্রান্ত-বিশ্বাসে এক একটী কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন; আর তাহাতে একের সহিত অন্যের বিরোধ অনুভূত হয়। শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করিলে, কোথাও দেখিতে পাই,—অহিংসাকে ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; আবার কোথাও দেখিতে পাই,—হিংসাও ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। দুইটী পরস্পর-বিরোধী ভাব, তবেই বুঝা যায়, ধর্ম্ম শব্দের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম শব্দের

---

* "How, then, shall we find a definition of religion sufficiently wide to comprehend all these phases of thought?...With regard to religion, it is no doubt extremely difficult to give a definition".—Max Muller, *Lectures on the Origin of Religion*.

মূল অর্থ রক্ষা করিয়া ঐ দুই বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য সাধন হয় না কি? সৃষ্টি-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা, লোক-রক্ষা, আত্ম-রক্ষা প্রভৃতিতে হিংসা অহিংসা দুই-ই আবশ্যক নহে কি? দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—সংসার-রক্ষায়, আত্ম-রক্ষায়, সমাজ-রক্ষায় নিত্য প্রয়োজন হয়। দুষ্টের দমনে হিংসা, শিষ্টের পালনে অহিংসা—দুই-ই কি ধর্ম্ম নয়? গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া দস্যু সর্ব্বস্ব অপহরণ জন্য পীড়ন করিতেছে; সেই দস্যুকে যদি বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হয়, হিংসা শব্দে অভিহিত হইলেও, সে হিংসা ধর্ম্ম বই অন্য কিছুই নহে। মানুষ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রাঘাতে তাহার সংহার সাধন করিল; সে হিংসা—হিংসা না ধর্ম্ম? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে তাই দুই বিপরীত ভাবই ধর্ম্ম নামে অভিহিত। ফলতঃ, অহিংসাও ধর্ম্ম, আবার হিংসাও ধর্ম্ম; সত্যও ধর্ম্ম, আবার অসত্যও ধর্ম্ম; কামনাও ধর্ম্ম, আবার নিষ্কামও ধর্ম্ম। সুতরাং যতই বিপরীত ভাবে বুঝাক না কেন, ধর্ম্ম শব্দের আমরা যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার মধ্যে সকল ভাবই তিষ্ঠিতে পারে। যাঁহারা ধর্ম্ম শব্দের কোনও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, অথবা ধর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা সেই কথাই বলিতে পারি। ধর্ম্মের জন্য মনুষ্য যাহা কিছু করে, তাহা তাহার ধর্ম্ম-সাধন, ধর্ম্ম-পালন বা ধর্ম্মানুষ্ঠান। সেই সাধন, পালন বা অনুষ্ঠানের পদ্ধতি সংসারে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়; আর সেই পদ্ধতির বিভিন্নতা-হেতু ধর্ম্ম শব্দের ব্যাখ্যাও বিভিন্ন প্রকার হইয়া পড়িয়াছে। একটুকু বুঝিতে না পারায়, ধর্ম্ম শব্দের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে সচরাচর মতান্তর ঘটিয়া থাকে। হিন্দুর ধর্ম্ম যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অপরের ধর্ম্ম সর্ব্বথা সে ভিত্তির উপর গঠিত নহে। তাই হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহারও ধর্ম্ম আছে বলিয়া কেহ কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না। হিন্দুর ধর্ম্ম দশবিধ সংস্কারের এবং বিবিধ আচারের ভিত্তির উপর সংগঠিত। দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হওন এবং বিবিধ আচার প্রতিপালন, হিন্দুর ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। হিন্দু ভিন্ন অপর কাহার সংস্কার ও আচার নাই; অন্ততঃ সংস্কার ও আচার বলিতে হিন্দু যাহা বুঝিয়া থাকে, অন্য কেহ তাহা বুঝে না। সে হিসাবে, ধর্ম্ম, সংস্কার আচার প্রভৃতি শব্দ হিন্দুদিগেরই নিজস্ব। সে হিসাবে, অন্য কোনও ধর্ম্ম—মুসলমানের ধর্ম্ম, খৃষ্টানের ধর্ম্ম প্রভৃতি বাক্য পর্য্যন্ত অসিদ্ধ। আমরা কিন্তু এতৎপ্রসঙ্গে সেরূপ সীমাবদ্ধ অর্থে 'ধর্ম্ম' শব্দ প্রয়োগ করিলাম না। বিভিন্ন ভাষার প্রতিশব্দ একার্থবোধক না হইলেও, ধর্ম্ম শব্দ দ্বারা আমরা সকল সম্প্রদায়ের শ্রেয়ঃ-বিধানমূলক অর্থই গ্রহণ করিলাম। সংসারের, সৃষ্টির ও আপনার কল্যাণ-কামনায় বা শ্রেয়ঃ-বিধানের জন্য যে চেষ্টা বা অনুষ্ঠান, এস্থলে তাহাকেই ধর্ম্ম সাধন নামে অভিহিত করা হইল। সে চেষ্টা বা সে অনুষ্ঠান সকলের মধ্যে সমান ভাবে বিদ্যমান না থাকিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মের কোনও-না-কোনও অঙ্গ মনুষ্য-সমাজের সকলের মধ্যেই স্ফুট বা অপরিস্ফুটরূপে বিদ্যমান আছেই আছে। সে হিসাবে, কাহারও ধর্ম্ম বা আত্মরক্ষার পদ্ধতি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন, কাহারও ধর্ম্ম বা আত্মরক্ষার পদ্ধতি হয় তো অসম্পূর্ণ। সেই হেতু হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন, মুসলমান বা

খৃষ্টানগণের ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে; মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন, মুসলমানেতর অন্য জাতি কাফের পদবাচ্য; খৃষ্টানগণও অন্যান্য জাতিকে মুক্তির অধিকারী নহেন বলিয়া প্রচার করেন। আর সেই জন্যই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বা অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ধর্ম্ম-সাধন বা ধর্ম্ম-পালন বিষয়ে বিভিন্ন পন্থা ও বিভিন্ন প্রক্রিয়া হেতু বিভিন্ন সমাজের ও বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিই এইরূপ বক্তব্যাবক্তব্য শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রমতে ধর্ম্মের লক্ষণাদি।

শাস্ত্র-মতে ধর্ম্ম যুগভেদে একরূপ, ধর্ম্ম জাতিভেদে একরূপ। মহর্ষি মনু বলেন,—'সত্যযুগের ধর্ম্ম এক প্রকার, ত্রেতায় ধর্ম্ম আর এক প্রকার, দ্বাপরে অন্য প্রকার এবং কলিযুগের ধর্ম্ম পৃথকরূপ। ফলতঃ যুগহ্রাস অনুসারে ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। সত্যযুগেই তপস্যাই ধর্ম্ম, ত্রেতায় জ্ঞানই প্রধান, দ্বাপরে যজ্ঞ প্রধান এবং কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম। তার পর, বর্ণ-ধর্ম্ম আশ্রম-ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, গুণ-ধর্ম্ম, নৈতিক-ধর্ম্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম-সমূহ মহর্ষি মনু কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতে প্রতীত হয়,—মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহা কিছু করণীয় আছে, সমস্তই তাহার ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের জন্য যে বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম বিহিত রহিয়াছে, তাহার পালনই বর্ণ-ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়; যেমন,—ব্রাহ্মণের উপনয়নাদিই তাঁহার বর্ণ-ধর্ম্ম। [illegible] এক আশ্রম অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই আশ্রম-ধর্ম্ম; যেমন,—গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ইত্যাদি আশ্রমের পালনীয় কর্ত্তব্য। বর্ণ ও আশ্রম গ্রহণ করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম; যেমন,—মেখলাদি ধারণ। যে ধর্ম্মে গুণ প্রকাশ প্রায়, তাহাই গুণ-ধর্ম্ম; যেমন,—প্রজাপালন প্রভৃতি। নিমিত্ত আশ্রম করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত, তাহাই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম; যেমন,—প্রায়শ্চিত্তাদি। এইরূপে সাধারণ ভাবে ধর্ম্মের বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়া, কাহার কি ধর্ম্ম, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—ব্রাহ্মণের একরূপ ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের একরূপ ধর্ম্ম, বৈশ্যের একরূপ ধর্ম্ম এবং শূদ্রের একরূপ ধর্ম্ম ইত্যাদি। ধর্ম্মের অঙ্গ, ধর্ম্মের লক্ষণ, ধর্ম্মের মূল, ধর্ম্মের আধার-স্থান, ধর্ম্মের অগম্য স্থান, দেবাদির ধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের বিবিধ অবস্থা পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। তদ্বিভাগে সকল শাস্ত্রে যে ঐকমত্য দৃষ্ট হয়, তাহা নহে। মনু যাঁহাকে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পদ্মপুরাণে ঠিক সে লক্ষণ লিখিত হয় নাই। আবার বিষ্ণু-সংহিতাতে তদ্বিষয়ে আর এক মত প্রকটিত হইয়াছে। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধ দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

অর্থাৎ,—ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (শক্তি সত্ত্বে অপকারীর প্রত্যপকার না করা), দম (বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার), অস্তেয় (অন্যায়পূর্ব্বক পরধন হরণ না করা), শৌচ (যথাশাস্ত্র মৃজ্জলাদি দ্বারা দেহশুদ্ধি), ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ (স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্ত্তন করা), ধী (প্রতিপক্ষ সংশয়াদি নিরাকরণ পূর্ব্বক সম্যক্ জ্ঞান লাভ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য (যথার্থ জ্ঞান) এবং অক্রোধ,—এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। কিন্তু

পদ্ম-পুরাণের উত্তর-খণ্ডে, ধর্ম্মের ষড়্‌বিধ লক্ষণ পরিকীর্ত্তিত আছে। সেই লক্ষণ-সমূহ,—

"পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্। শ্রদ্ধাবলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্‌বিধং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

বিষ্ণু-সংহিতায় ধর্ম্মের চতুর্দ্দশ প্রকার লক্ষণ লিখিত আছে। সেই লক্ষণ-সমূহ এই,—

"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ। অহিংসাগুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনং। অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে॥"

মনু ধর্ম্মের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, বিষ্ণু-সংহিতায় তাহার কয়েকটী লক্ষণ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অতিরিক্ত কয়েকটী লক্ষণ উহাতে বিদ্যমান। অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থেও ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশে এইরূপ মতান্তর দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়,—ধর্ম্মের অঙ্গ। ধর্ম্মের অঙ্গ দশবিধ; যথা,—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে। দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ॥
অহিংসয়া সুশান্ত্যা চ অস্তেয়েনাপি বর্দ্ধতে। এতদ্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ॥"

এতদুক্ত ধর্ম্মাঙ্গের সহিত পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাদির মিল দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মের মূল বলিতে যাহা উপলব্ধি হয়, তাহারও কয়েকটী লক্ষণের মধ্যেই উক্ত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে ধর্ম্মমূলং,—

"অদ্রোহশ্চাপ্য লোভশ্চ দমো ভূতদয়াতপঃ। ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ॥
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্॥"

ইহাতেও সেই একই ভাব। ধর্ম্মের আধার-স্থান কীর্ত্তনে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণব, যতি, ব্রহ্মচারী, পতিব্রতা নারী, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, বাণপ্রস্থাবলম্বী ভিক্ষু, ধর্ম্মশীল নৃপ, সৎ ব্যক্তি, সদ্বৈশ্য, সৎসংসর্গস্থিত দ্বিজসেবী শূদ্র প্রভৃতিতে ধর্ম্ম বিরাজ করেন। যে স্থলে বেদাদি অধ্যয়ন হয়, যেখানে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, যে স্থানে যজ্ঞ কর্ম্ম সমাহিত হয়, ধর্ম্ম সেখানে সর্ব্বদা বিরাজমান। তুলসী, বিল্ব, বট প্রভৃতি বৃক্ষকে এবং গোষ্ঠ, গোষ্পদ-ভূমি এবং গো-গৃহকেও ধর্ম্মের আশ্রয়-স্থান বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মের অগম্য স্থান সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি—ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও তাহার গৃহ, নরহত্যাকারীর গৃহ, নীচ, মূর্খ, খল, নরঘাতী এবং গুরু, দেবতা ও প্রতিপাল্য ব্যক্তির ধনাপহরণকারী প্রভৃতির গৃহে ধর্ম্ম নাই। ধূর্ত্ত, চোর, অসৎ নর প্রভৃতি আরও বহু ব্যক্তি ধর্ম্মের অধিকারী নহেন বলিয়া শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্র রূপকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বংশাবলী প্রকটন করিয়াছেন। শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, বুদ্ধি, লজ্জা, বিনয়, মেধা প্রভৃতি ধর্ম্মবংশীয় এবং হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, মদ প্রভৃতি অধর্ম্ম-বংশজ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ধর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদির বিষয় এইরূপে আলোচনা করিয়া আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? আমরা বুঝিতে পারি না কি,—যাহা কিছু সদ্‌গুণ, যাহা কিছু সৃষ্টি-রক্ষার, শান্তি-রক্ষার, শৃঙ্খলা-রক্ষার, সমাজ-রক্ষার, আত্ম-রক্ষার উপযোগী,—তাহাই ধর্ম্ম-শব্দের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে? যেখানে অহিংসাকে ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, সেখানে অহিংসা দ্বারা যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে; যেখানে হিংসাকে ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, সেখানে হিংসা দ্বারাও সেই নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ধর্ম্ম শব্দ দ্বারা যখন দুই বিপরীত-ভাবাত্মক ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করা হয়, অথচ উভয় কার্য্যেই সমফল উৎপন্ন হইয়াছে দেখিতে পাই, তখন ধর্ম্ম শব্দের যে অর্থ আমরা নির্দ্দেশ করিলাম, তাহাই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অনুষ্ঠানই যখন ধর্ম্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে পরিকল্পিত হইল, তখন ধর্ম্মের সহিত ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা দেবদেবীর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? বিষয়টী এতই জটিল যে, সহসা এই প্রশ্নই মানুষের মনে উদয় হয়। যাঁহারা এরূপ সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারি, প্রতি কর্ম্ম-সম্পাদনেই ভগবদনুগ্রহ একান্ত আবশ্যক। আপনার শক্তি প্রয়োগ করিয়া মানুষ যখন কোনও কর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ না হয়, সে তখন আপনার অপেক্ষা শক্তিশালী অপর কাহারও সাহায্য পাইবার আশা করে। সংসারে তাই দেখিতে পাই,—যখন কোনও প্রাণপ্রিয় আত্মীয় পীড়িত ও শয্যাশায়ী হয়, গৃহস্থ, আপনার সামর্থ্যে তাহার শান্তিবিধানে সমর্থ না হইলে, বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে; বৈদ্যের নিকট কোনও সুফল লাভ না হইলে, পরিশেষে বৈদ্যের যিনি বৈদ্য, গৃহস্থ তাঁহার শরণাপন্ন হয়। ধর্ম্ম-পালনে, ভগবদনুসরণে, স্থূলভাবে এই যুক্তির অবতারণা করিতে পারি না কি? আপনার অসামর্থ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, ক্রমশঃ মহৎ, মহত্তর, পরিশেষে মহত্তমের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়। সেই আকর্ষণের ফলই ভগবদারাধনা; সেই আকর্ষণের ফলেই মানুষ ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে শিক্ষা করে। তখন আর আপনার শক্তি, আপনার ক্ষমতা, আপনার কার্য্য বলিয়া মনে করে না। তখন সর্ব্ববিষয়েই ভগবৎ-নির্ভরতা আসিয়া পড়ে; তখন সকল কার্য্যই ভগবানের কার্য্য বলিয়া মনে হয়। এই ভাবে উপনীত হইবার নানা স্তর আছে। দেশভেদে, কালভেদে যে কর্ম্ম-পদ্ধতি বা উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত আছে, তৎসমুদায়কে সেই স্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। তাহাই অধিকার-ভেদ। যাহার যেরূপ জন্ম, যেরূপ শিক্ষা, যেরূপ প্রকৃতি, যেরূপ মতিগতি, সে ব্যক্তি সেইরূপ ভাবের সেই স্তরে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া থাকে। যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা সেই স্তরের সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইয়া জগৎকে ঈশ্বরময় দেখিতে পান; যাঁহারা ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাঁহারা ভেদবুদ্ধিবশে নানা ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন। ইহ-সংসারে যত কিছু যাগ-যজ্ঞ, উপাসনা বা পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সকলকেই সেই স্তর-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। ধর্ম্মের লক্ষণ, ধর্ম্মের অঙ্গ প্রভৃতিতে মনুষ্যের অনুষ্ঠেয় যে সকল কর্ম্মের পরিচয় পাইয়াছি, সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা ধীরে ধীরে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম, স্তরে উপনীত হওয়া যায়; এবং তাহাতে ভগবৎ সন্নিকর্ষ লাভ সুগম হইয়া আসে। ঐ সকল কর্ম্মকে তাঁহার অনুকম্পা-লাভের সোপান-স্বরূপ বলিলেও বলিতে পারা যায়। যেমন বর্ণমালা পরিচয়ের পর, সেই বর্ণমালা সংগঠিত ব্রহ্ম শব্দটী মানুষ অনায়াসে চিনিতে পারে, সেইরূপ বিহিত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, সেই সৎকর্ম্ম-পরিবৃত সৎ-স্বরূপ পরমেশ্বরও মানুষের জ্ঞানগম্য ও প্রত্যক্ষীভূত হন। তখন মানুষ বুঝিতে পারে,—কোন্ শক্তি সাহায্যে কি কার্য্য সাধিত হইতেছে, আর কোন্ ক্রিয়াবশে কোন্ শক্তি সঞ্চিত হয়। তাহা বুঝিতে পারিলে এবং সেই বুদ্ধি অনুসারে পরিচালিত হইলে, ধর্ম্মের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে; সৃষ্টি-রক্ষায়, লোকরক্ষায়, আত্ম-রক্ষায় মানুষ আর তখন অন্তরায় দেখিতে পায় না। এই ভাব হইতেই উপাসনা;

ধর্ম্মে ঈশ্বরের প্রয়োজন।

এই ভাব হইতেই ঈশ্বর, পরমেশ্বর, দেব-দেবী প্রভৃতির পূজা; এই ভাব হইতেই সংসারে যত কিছু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা। এই ভাব হইতেই ভক্ত—পুষ্প-বিল্বদল-তুলসী-চন্দন লইয়া, একান্তে বসিয়া, অভীষ্ট দেবতার পূজারাধনা করিতেছেন; এই ভাব হইতেই ব্রাহ্মণ-সন্তান গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সবিতৃ-দেবতার আরাধনায় মগ্ন রহিয়াছেন; এই ভাব হইতেই দেব-মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদে সান্ধ্য আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে; আর এই ভাব হইতেই মন্দিরে, মস্‌জিদে, গীর্জ্জায়, অরণ্যে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে কত জনে কত ভাবে বিভোর হইয়া আছেন।

পাশ্চাত্যমতে সেই প্রয়োজনীয়তা।

ধর্ম্মসাধনে ঈশ্বরের আবশ্যকতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও প্রকারান্তরে প্রোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া থাকেন। * তাঁহারা বলেন,—'ধর্ম্মের নানা অঙ্গ বটে; কিন্তু সকল ধর্ম্মেরই মূল লক্ষ্য—কোনও উচ্চতর শক্তির উপাসনা। বাক্যে, কার্য্যে, আচারে, শিক্ষা-পদ্ধতিতে মানুষের যে মানসিক ভাবের অভিব্যক্তি, তদ্দারা অমানুষিক শক্তিতে মানুষের বিশ্বাসের বিষয় সপ্রমাণ হয়। সেইরূপ অভিব্যক্তিতে মানুষ অমানুষিক শক্তির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য সর্ব্বথা প্রয়াস পায়। উপাসক বিশ্বাস করেন,—তাঁহার অপেক্ষা কোনও উচ্চতর শক্তির বা শক্তি-সমূহের অস্তিত্ব আছে; তদ্দারা তাঁহার ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। এইরূপ বিশ্বাস এবং পূজা-পদ্ধতির আবশ্যকতা হইতেই সভ্য ও অসভ্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে রিলিজিয়ন বা ধর্ম্মের উৎপত্তি। মানুষ যতই ব্যভিচারী ও নীচ-প্রকৃতি-বিশিষ্ট হউক, তাহার মনে কোনও-না-কোনও প্রকারে ধর্ম্মের ভাব জাগরিত আছে;—কোনও-না-কোনও প্রকারে, মানুষ একরূপ-না-একরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পৃথিবীর কোনও জাতি আপনার অপেক্ষা উচ্চতর শক্তি-বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ-জনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন নাই, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।' গ্রীস-দেশীয় প্রচীন লেখক পুলুটার্ক বলিয়া গিয়াছেন,—'তোমরা হয় তো এমন রাজ্য অনেক দেখিতে পাইবে,—যে রাজ্যে প্রাচীর নাই, বিধি-বিধান নাই, মুদ্রার প্রচলন নাই, লিপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই; কিন্তু এমন মানব কোথাও দেখিতে পাইবে না,—যে মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান নহে, ঈশ্বরের উপাসনা করে না, অথবা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কোনরূপ ক্রিয়া-কলাপে অভ্যস্ত নহে।' রোমদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক সিসিরো উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—'পৃথিবীতে যত সৃষ্ট প্রাণী আছে, তাহাদের মধ্যে এক মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণীর ঈশ্বর-জ্ঞান নাই। মানুষ যতই বর্ব্বর ও অসভ্য হউক, ঈশ্বর কি—তাহা না বুঝিলেও, তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসবান।' এই জন্যই, কার্লাইল বলিয়াছেন,—

* ইংরেজী ভাষার বহু গ্রন্থে এ সকল বিষয় বিভিন্নরূপে আলোচিত হইয়াছে। ম্যাক্সমুলার, মনিয়র উইলিয়ম্‌স্, মুইর, টাইল, মেঞ্জিস, ওল্‌ডেনবর্গ, বার্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গ্রন্থে সেই সকল মত দৃষ্ট হইতে পারে। *See*, Max Mnller's *The Origin and Growth of Religion and An Introduction to the Science of Religion*; Muir's *Sanskrit texts*; Tiele's *Science of Religion*; Menzie's *History of Religion*; Bernouf, *Science of Religions*; Baring-Gould's *The Origin and Development of religious Belief*; Andrew Lang's *The Making of Religion.*

'কোনও মানুষ বা জাতির স্বরূপ জানিতে হইলে, আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি—তাহাদের ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মানব-জাতির ইতিহাসের সার-সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিন্তাই তাহাদের কৃত-কার্য্যের জনক। তাহাদের অনুভূতিই তাহাদের সেই চিন্তার জনয়িতা। অদৃষ্ট ঐশ্বরিক ভাবই তাহাদের বাহ্য এবং অন্তরের পরিচয় দেয়। সেই পরিচয়ই তাহাদের ধর্ম্মের পরিচয়!' অন্য এক জন পাশ্চাত্য-দেশীয় দার্শনিক বলিয়া গিয়াছেন,—'মানুষ যে বস্তুর, যে সামগ্রীর উপাসনা করে, সেই সামগ্রীর আদর্শ তাহাতে প্রতিফলিত হয়। উপাসক উপাস্য দেবতার অনুগ্রহ কামনা করে এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসারী হইতে প্রয়াস পায়। তাহাতে উপাসকের প্রকৃতি-পরিচয় আপনা-আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে।' দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রাচীন জর্ম্মণীর রণদেবতা 'ওদিন' বা 'উদেনের' উপাসকগণের বিষয় উল্লেখ করেন। সেই দেবতা যুদ্ধে পরিতুষ্ট হন। যুদ্ধে যাহারা দেহত্যাগ করে, তিনি তাহাদিগকে স্বর্গের 'ভালহাল্লা' নামক উৎকৃষ্ট স্থানে লইয়া যান। সেই স্বর্গলোকের অধিবাসীরা দিবসে যুদ্ধ-কার্য্যে ব্রতী থাকে এবং রাত্রিকালে নৃত্যামোদে মদ্যপানাদিতে আনন্দলাভ করে। এই বিশ্বাস-বশে, 'ওদিন' দেবতার উপাসক প্রাচীন জর্ম্মণগণ যুদ্ধকার্য্যকেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া মনে করিত। অন্যপক্ষে যে দেবতা নরশোণিত-পাতে ঘৃণা বোধ করেন, জনসাধারণের হিতসাধনে আনন্দিত হন, সেই দেবতার উপাসকগণ তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। ফলতঃ, ভাবের বিভিন্নতা হইতেই বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ও বিভিন্ন উপাসকের উৎপত্তি হইয়াছে।

মূল বিষয়ে অনেক স্থলে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয় বটে; কিন্তু অনেক স্থলে আবার মত-পার্থক্যও দেখিতে পাই। অনেক সময়ে পাশ্চাত্য যাহাকে বর্ব্বরতা বলিয়া মনে করেন; প্রাচ্য তাহাতে উচ্চ ভাব দেখিতে পান। আবার অনেক সময়ে পাশ্চাত্য যাহাকে উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে করেন, প্রাচ্য তাহাতে অধোগতির লক্ষণ প্রতিভাত দেখেন। এ মত-পার্থক্য—অস্বাভাবিক নহে। একই দেশের একই বংশের একই ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে যখন মতদ্বৈধ দেখিতে পাই; তখন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে মত-পার্থক্য ঘটিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। সংসারে দেখিতে পাই, এক শ্রেণীর লোক যখন কোনও একটী প্রস্তর-বিশেষকে বা একটী বৃক্ষ-বিশেষকে পূজা করে, অথবা যখন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীর উপাসনায় রত হয়; অপর শ্রেণীর লোক তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া থাকে। আবার অন্য দিকে দেখিতে পাই, এক শ্রেণীর লোক পার্থিব বস্তু-বিশেষকে পরিত্যাগ করিয়া, কল্পনায় ঈশ্বরকে ভজনা করে; আর অপর শ্রেণীর লোক তাহাদিগের কল্পনাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ—যে কোনও সম্প্রদায়ের, অপর সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যবহারের বিষয় লক্ষ্য করিলেই এ দৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হইবে; দেখিতে পাওয়া যাইবে, এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের কি কারণে কিরূপ বিদ্বেষভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। যিনি প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, তিনি কিন্তু এরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে পারেন না। হিন্দু-ধর্ম্মের অধিকারভেদ-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম

উপাসনার প্রাচুর্য্য ও অসদ্ভাব।

হইলে, হিন্দুর মধ্যে এ বিদ্বেষভাব কখনই আসিতে পারে না। শাস্ত্র—অধিকারিভেদে প্রতি জনের উপাসনা-পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। 'যত ভক্ত, তত দেব,'—হিন্দুর এই উক্তিতে কি সার্ব্বজনীন অবিরোধের ভাব বিদ্যমান! যিনি এক খণ্ড প্রস্তর বা ইষ্টক লইয়া পূজা করিতেছেন, তিনিও যেমন; আবার যিনি সমগ্র সংসারকে হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়াছেন, তিনিও তেমন। ধূলার ঘর করিয়া, ধূলার প্রতিমা গড়িয়া, ধূলার নৈবেদ্য দিয়া, বালক তাঁহার পূজা করে। সে অবস্থায় তাহার ভাবী জীবনের ছায়া-চিত্র দেখিতে পাই না কি? অসভ্য বর্ব্বর জাতির কার্য্যকলাপকেও অনেক সময় বালকের ক্রীড়া বলিয়া মনে হয়। বালক আপনার খেলার পুতুল লইয়া যখন ভাবে বিভোর হয়, সে তখন মনে করে,—তাহার সেই পুতুলটীও তাহার মত জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন। কখনও যদি কোনও সামগ্রী তাহার সেই পুতুলটীর শরীরে আঘাত করে, বালক ক্রোধবশে সেই সামগ্রীটীকে প্রহার করে। তাহার মনে হয়, তাহার যেমন বিবেচনা শক্তি আছে, সেই জড়বস্তুটীও সেইরূপ বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন। অজ্ঞ বর্ব্বর জনের অবস্থাও বালকের প্রায়। কোনও প্রাণীর সহায়তা ভিন্ন কোনও বস্তুর গতিশক্তি যেখানেই সে দেখিতে পায়, সে মনে করে, উহার মধ্যেও জ্ঞান বা জীবনী শক্তি আছে; কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয় সে শক্তি ধারণা করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর অনেক সামগ্রীতেই, তাহার দৃষ্টিতে, গতি-শক্তি আছে। নদী বহিয়া যাইতেছে; মেঘপুঞ্জ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত হইতেছে; পত্রাবলী কাঁপিতেছে; সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র-সমূহ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গতি-বিধি করিতেছে;—দেখিয়া, তাহার মনে হইতেছে, ইহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোনও শক্তি আছে, যদ্দ্বারা ইহারা পরিচালিত হয়। কেবল গতিশক্তি দেখাইয়াই যে তাহারা জীবন আছে মনে করে, তাহাও নহে। পাহাড়ে, পর্ব্বতে, জীব-জন্তুতে সর্ব্বত্রই প্রাণ ও বিচার-শক্তি আছে,—ইহাই তাহাদের ধারণা। সভ্য সমাজ নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুকে যেরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকেন, অসভ্যজাতি সেরূপ চক্ষে দেখিতে জানে না; সে জানে,—তাহাদেরও ভাষা আছে, তাহাদেরও আত্মা আছে। পরস্পর-বিরোধী বাক্যাবলীতেও তাহারা কদাচ বিচলিত হয় না। তাহাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই; তাহারা মনে করে,—সকলই সম্ভব, সকল জিনিষ হইতেই সকল জিনিষের উৎপত্তি হইতে পারে। প্রায় সকল জিনিষকেই তাহারা অভিনব শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে; আর তাহা হইতেই তাহারা পৃথিবীর প্রায় সকল বস্তুকেই উপাসনা করিতে অভ্যস্ত হয়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে সামান্য একটা মৃৎপাত্র এবং শস্যচূর্ণোপযোগী প্রস্তরখণ্ড উপাসনার সামগ্রী। তাহারা মনে করে,—ঐ সকল জিনিষের মধ্যে জীবনীশক্তি আছে; আবশ্যক হইলে উহারা কথা কহিতে পারে, কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং উহারা উপাসনার সামগ্রী। দক্ষিণ-সমুদ্রের কোনও কোনও দ্বীপের অধিবাসীরা নারিকেল বৃক্ষকে ঐরূপ আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করে। প্রত্যেক বস্তুতেই জীবন আছে যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের ধর্ম্মের নাম—ইংরেজী ভাষায় 'য়্যানিমিজ্‌ম্' (Animism)। এই ধর্ম্মের উচ্চ স্তরের উপাসকগণ বিশ্বাস করেন,—'জীবনী-শক্তি ইচ্ছাক্রমে এক দেহ হইতে অন্য দেহে গতিবিধি করিয়া থাকেন; কখনও তাঁহারা

পৃথিবীতে, কখনও তাঁহারা বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করেন; যখন যেখানে ইচ্ছা হয়, সেইখানেই তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। এই বিশ্বাসবশেই 'ফ্যানিমিজম্' ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ ইষ্টক, প্রস্তর প্রভৃতি সকল সামগ্রীরই উপাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার সংখ্যার ও বাহুল্যের অন্ত নাই। আমেরিকার মিশৌরী নদীর তীরবর্ত্তী হিদাৎসা-জাতীয় আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে উপাস্য দেবতার অতি-বাহুল্য দৃষ্ট হয়। আমরা যে বলিয়াছি, অনেক অসভ্য জাতি যাহা কিছু চারিদিকে আশ্চর্য্যজনক দেখিতে পায়, তাহারই উপাসনা করে; অনেকে বলেন, হিদাৎসাগণ তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কোনও কোনও অসভ্য জাতির মধ্যে উপাসনার অতি-বাহুল্য দৃষ্ট হয়; আবার অন্য কোনও শ্রেণীর অসভ্য জাতিরা আদৌ উপাসনায় অনুরক্ত নহে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের 'য়্যানৃথ্রপলজিক্যাল সোসাইটীর জর্ণালে' শেষোক্ত বিষয়ের একটী দৃষ্টান্তের পরিচয় পাওয়া যায়;—'পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার নিউ নার্সিয়া প্রদেশে, সোয়ান নদীর তীরে, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের বেনিডিক্টাইন মঙ্ক-গণ কর্ত্তৃক একটী ধর্ম্ম-মন্দির স্থাপিত হয়। সেই মন্দিরটী পার্থ-সহরের রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রধান ধর্ম্মযাজক বিশপের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সেই ধর্ম্মালয় সংশ্লিষ্ট বেনিডিক্টাইন সম্প্রদায়ভুক্ত মঙ্ক-গণ সেই দেশের আদিম অধিবাসীদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরিচয়-গ্রহণে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহারা সেই দেশের অধিবাসিগণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনই অভিজ্ঞতা-লাভে সমর্থ হন না। তিন বৎসর ক্রমাগত অনুসন্ধানের পর, মন্সিগ্নর সালভাডোর নির্দ্ধারণ করেন,—ঐ দেশের অধিবাসীরা সত্য বা মিথ্যা কোনরূপ দেবতার উপাসনা করে না। তবে তাহারা এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে; বলে—তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার নিশ্বাসে স্বর্গ মর্ত্ত্য সকলই সৃষ্টি হয়। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, শক্তিসম্পন্ন এবং জ্ঞানী; তাঁহার নাম—মটোগন (Motogon)। পৃথিবী সৃষ্টি করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন,—পৃথিবী আইস। এই বলিয়া তিনি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন; অমনি পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছিল। সূর্য্য, চন্দ্র, বৃক্ষাবলী এবং প্রাণি-সমূহও তৎকর্ত্তৃক সেইরূপভাবে উৎপন্ন হয়। মটোগন যেমন শুভ দাতা, চিয়েঙ্গা (Cienga) সেইরূপ অমঙ্গল-বিধায়ক। চিয়েঙ্গা হইতেই ঘূর্ণিবায়ু এবং ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের উৎপত্তি; চিয়েঙ্গা হইতেই সন্তান-সন্ততি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই জন্য ঐ দেশের অধিবাসীরা তাঁহাকে ভীতি-বিহ্বল-নেত্রে দর্শন করিয়া থাকে। দেশবাসীর বিশ্বাস, মটোগন অনেক দিন মরিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার উপাসনার প্রয়োজন নাই। চিয়েঙ্গার উপাসনাও ফলদায়ক নহে বলিয়া তাহারা তাঁহার উপাসনা করিতে প্রস্তুত নহে। ঐ দেশের অধিবাসীদিগের প্রকৃতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মযাজক বলিয়া গিয়াছেন,— 'নিউ নার্সিয়ার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে কোনরূপ বাহ্য উপাসনার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তাহারা মনে মনেও যে কোনও দেবতার উপাসনা করে, তাহারও নিদর্শন পাই নাই।' ফলতঃ, সংসারে দুই দিক, দুই ভাব পরিদৃশ্যমান। এক ভাবে উপাসনার প্রাচুর্য্য, অন্য ভাবে উপাসনার চিহ্ন মাত্র নাই। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এই যে দুই ভাব দেখিতে পাই,

ঐ দুই ভাব সংসারে দুইটী প্রকৃষ্ট উপাসনা-পদ্ধতির আদি স্তর বলিয়া অনেকে মনে করেন। যে দুই বিশাল মহীরুহের কলচ্ছায়ায় উন্নত সভ্য সমাজ শান্তি লাভ করেন, অসভ্য দুই জাতির পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থা তাহার অঙ্কুর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। সংসারে কেহ যে সর্ব্বত্র ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন, তাঁহাদের মধ্যে শেষোক্ত ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে; আর যাঁহারা সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগে ভগবানে আত্মলীন হইয়াছেন, তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ঐ দুই ভাবই স্তরে স্তরে নানা অবস্থায় নানা নামে পরিকল্পিত হয়।

ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সংগঠন।

একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে কালবশে যেমন অসংখ্য বৃক্ষের উদ্ভব হইয়া থাকে, একটী মনুষ্যের বংশে যেমন কালে কালে বহু বংশধর আবির্ভূত হইয়া থাকেন; মূল উদ্দেশ্য এবং মূল লক্ষ্য অভিন্ন হইলেও, ধর্ম্ম সেইরূপ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যদিও সকল ধর্ম্মেরই বীজ এক, একই উৎপত্তি স্থান, কিন্তু তাহার শাখা-প্রশাখা কতই বিপরীত দিকে, বিপরীতভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে! সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, সকলই এক বটে; বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, আবার সেই ফল হইতে বীজ উৎপন্ন হয়; ধর্ম্মেরও মূল-তত্ত্ব সেইরূপ বুঝিতে হইবে। তবে যে এক এক ধর্ম্মে পার্থক্য বা বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়, তবে যে এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন, তাহার কারণ—ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতা ভিন্ন অন্য আর কি বলা যাইতে পারে? সেই অনভিজ্ঞতা কেন আসে, সেই ভ্রান্তির কেন উৎপত্তি হয়, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি। মনে করুন, এক জন কখনও দুগ্ধ দেখেন নাই; তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'দুধ কি প্রকার?' এক জন বলিলেন—সাদা; একজন বলিলেন—তরল; আর এক জন বলিলেন—গাঢ়। যিনি বলিলেন সাদা, তিনি উপমা দ্বারা বুঝাইবেন—'বকের মত সাদা।' যিনি বলিলেন তরল, তিনি বুঝাইলেন,—'জলের ন্যায় তরল।' যিনি বলিলেন গাঢ়, তিনি বুঝাইলেন,—'বটবৃক্ষের আটার ন্যায় গাঢ়।' উপমা দ্বারা বুঝাইতে গিয়া ক্রমেই প্রমাদ ঘটিতে লাগিল। যিনি বলিয়াছিলেন,—'দুগ্ধ বকের মত'; তাঁহাকে আবার বক কেমন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন,—'বক কাস্তের মত।' কাজেই প্রশ্নকর্ত্তা বুঝিলেন,—'দুগ্ধ কাস্তের মত।' যিনি বলিয়াছিলেন,—'দুগ্ধ জলের মত।' তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল,—'জল কেমন?' তিনি বলিলেন,—'কাকচক্ষুর মত।' প্রশ্নকর্ত্তা বুঝিলেন,—'দুগ্ধ কাক-চক্ষুর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।' যিনি বলিয়াছিলেন,—'দুগ্ধ বটের আটার ন্যায়'; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল,—'বটের আটা কিরূপ?' তিনি উত্তর দিলেন,—'বটের আটা বটবৃক্ষে জন্মে।' প্রশ্নকর্ত্তা বুঝিলেন,—'দুগ্ধ বুঝি বা কোনও বৃক্ষবিশেষ।' এরূপ প্রশ্ন, উত্তর ও ব্যাখ্যার তারতম্যে এবং বুঝিবার ভ্রান্তিতে ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের মনে যে নানারূপ কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়, তাহা সদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। নচেৎ, এক সম্প্রদায়ের এক সনাতন ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াও হিন্দুর মধ্যেই বা এত বিবাদ-বিসম্বাদের সূত্রপাত কেন হইল? শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের

মধ্যে সময়ে সময়ে যে বিদ্বেষানল জলিয়া উঠিয়াছিল, এতদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাহা উল্লেখ করিতে পারি। যিনি যে শাস্ত্রেরই অনুসরণ করুন না কেন, তাঁহার সেই শাস্ত্র হইতেই দেখাইতে পারি, সকলেরই মূল এক—সকলেরই ইষ্ট এক। তবে কেন এ বিরোধ উপস্থিত হয়? কেবল আমাদের দেশে, হিন্দুর মধ্যে, এ বিরোধ নহে; এ বিরোধ পৃথিবীর সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখিতে পাই। এখনও এক শত বৎসর অতীত হয় নাই;—ইউরোপে বিভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কি বিষম বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল! আর, সেই অনলে কত প্রাণী কিরূপে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন! সে কথা স্মৃতি-পটে উদয় হইলে, আজিও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রটেষ্টাণ্ট এবং রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শত্রুতাচরণের নিদর্শন ইতিহাসের পৃষ্ঠা রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, এতৎপ্রসঙ্গে আমরা সেই কথারই অবতারণা করিতেছি। ধর্ম্মমতের পার্থক্য-হেতু, কত নর-নারী, কত বালক-বালিকা, কত যুবক-যুবতী জীবন্তে দগ্ধীভূত হইয়াছিলেন,—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। * মুসলমানদিগের মধ্যেও সিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব-ব্যপদেশে এই চিত্র পরিদৃশ্যমান। একই ধর্ম্ম-মতাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই যখন এতাদৃশ্য পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-মতাবলম্বী জনসাধারণের মধ্যে, কিরূপ পার্থক্য সম্ভবপর, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। সামান্য সামান্য বিষয়ে মত-পার্থক্য-হেতু পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে এবং দিন দিনই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য ঘটিতেছে। হইতে পারে, কেহ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত; হইতে পারে, কেহ ধ্বংসের পথই প্রশস্ত করিতেছেন; কিন্তু তাহা হইলেও সকলেরই লক্ষ্য যে এক, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। সৃষ্টি-রক্ষা, সংসার-রক্ষা, অন্ততঃ আত্ম-রক্ষা,—এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মের উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে? যাঁহারা স্বর্গাদি সুখভোগের কামনা করেন, তাঁহারাও যেমন আত্মরক্ষার প্রয়াসী; যাঁহারা নিঃশ্রেয়স, মুক্তি বা নির্ব্বাণ-লাভে সমুৎসুখ, প্রকারান্তরে তাঁহারাও কি আত্মরক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত নহেন?

পৃথিবীতে যত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সকলরই মূল ভরতবর্ষে। পৃথিবীতে এমন কিছুই নূতন নাই, ভারতবর্ষে যাহার অস্তিত্বাভাব। দেশে-ভেদে, ভাষা-ভেদে, উচ্চারণের তারতম্য-হেতু, বিষয়-বিশেষের সংজ্ঞা বা নাম স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু মূলে সাদৃশ্য প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান্। যাহা হউক, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি; প্রথম হিন্দু, দ্বিতীয় অহিন্দু। হিন্দুগণের বসতি-স্থান এই ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; আর যাঁহারা অহিন্দু-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বহির্দ্দেশে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বসবাস করেন। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিষয় বিবৃত করিতে হইলে, কাজেকাজেই হিন্দু এবং অহিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের কথাই

ধর্ম্ম-মূল। ভারতবর্ষে।

* রেভারেণ্ড জন ফক্স প্রণীত 'ধর্ম্মের জন্য প্রাণদান' বিষয়ক গ্রন্থে, (*History of Christian Martyrdom* by Rev. John Fox, M. A.) এই লোমহর্ষণ কাহিনী ভীষণভাবে বিবৃত আছে।

অল্প-বিস্তর বলিবার প্রয়োজন হয়। তবে হিন্দুগণই ভারতবর্ষের অস্থি-মজ্জা-মেরুদণ্ড; আর তাঁহারা একমাত্র ভারতবর্ষেরই অধিবাসী। সুতরাং তাঁহাদের বিষয় একটু বিশেষ ভাবেই আলোচনা করার আবশ্যক অনুভব করি। হিন্দুর মধ্যে একেশ্বর-বাদ এবং বহু ঈশ্বরের উপাসনা উভয়ই বিদ্যমান। হিন্দুর মধ্যে সাকার উপাসনা ও নিরাকার উপাসনা উভয়ই প্রচলিত। আজি-কালি বলিয়া নহে, চিরদিনই এই ভাব প্রত্যক্ষীভূত হয়। অনেকে বলেন,—'বেদের সময় ধর্ম্মমত এক প্রকার ছিল; পুরাণের সময় এক প্রকার ছিল; তন্ত্রের সময় এক প্রকার ছিল; সত্যযুগে একরূপ ছিল; ত্রেতায় একরূপ ছিল; কলিতে একরূপ আছে।' আমরা কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সে মতের সমর্থন করি না। এক এক সময়ে এক এক ধর্ম্মমত প্রবল হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া, 'এই মত ছিল' বা 'এই মত ছিল না',—এ কথা আমরা বলিতে পারি না। যতদূর ধ্যান-ধারণা হয়, তাহাতে বুঝিতে পারি, সকল ভাবই সকল সময়ে পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। তবে কোনও ভাব সুপ্ত, কোনও ভাব জাগ্রৎ;—এই মাত্র পার্থক্য। যেখানে বীজ আছে, বৃক্ষ নাই; অথবা যেখানে বৃক্ষ আছে, বীজ নাই; সেখানে একের বিদ্যমানে অন্যের বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী। সকল ধর্ম্মমত সকল অবস্থাতেই, সুপ্ত বা জাগ্রৎ যেরূপ ভাবেই হউক, পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। অথবা, অতি-ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া ঘূর্ণায়মান অতি-বৃহৎ গোলকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, গোলকের সামান্য সামান্য অংশ যেমন এক এক বার দৃষ্টিপথে পতিত হয়; পৃথিবীতে ধর্ম্ম-মতের ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আবির্ভাবও তিরোভাব সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। মানুষের দৃষ্টি যখন যে অংশের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, মানুষ তখন সেই অংশের অস্তিত্ব ভিন্ন অন্য অংশের অস্তিত্ব অনুধাবন করিতে পারিতেছে না। তাই দেখিতে পাই, কেহ বলেন,—'বেদে একেশ্বর-বাদ প্রচারিত;' কেহ বলেন,—'বেদে বহু দেবদেবীর উপাসনা পরিকল্পিত।' তাই দেখিতে পাই, অনেকে বলেন,—'বৈদিক কালে এইরূপ ধর্ম্ম ছিল না; পৌরাণিক যুগে এরূপ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে।' তাই দেখিতে পাই, অনেকে বলেন,—'বেদে এ কথা নাই; অধুনা উহা প্রচলিত হইতেছে।' কিন্তু যাঁহারা একটু নিগূঢ় ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—'বেদে সকল তত্ত্বই নিহিত আছে; বেদেও যাহা, পুরাণেও তাহা, তন্ত্রেও তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে।' শাস্ত্রাদির আলোচনায় আমরাও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত। ইহাতে কেহ বলিতে পারেন,—'পুরাণে শিব, দুর্গা, কালী, তারা, মহেশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীর পূজা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে; কিন্তু বেদে তাহা দেখিতে পাই কৈ?' এ প্রশ্ন অনেক সময় অনেক স্থলেই শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। ঋগ্বেদে যে সকল দেবদেবীর স্তুতি-মূলক সূক্ত প্রকটিত আছে, তাঁহাদের নাম,—অগ্নিদেবতা, বায়ু প্রভৃতি দেবতা, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা, ইন্দ্রদেবতা, মরুদ্গণ দেবতা, ঋতু প্রভৃতি দেবতা, ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি দেবতা, ঋভুগণ দেবতা, বরুণ দেবতা, সবিতা দেবতা, পূষা দেবতা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা, উষা দেবতা, সূর্য্য দেবতা, বিশ্বদেবগণ দেবতা, বহু দেবতা, সোম দেবতা, সকল দেবগণ

দেবতা, মিত্র দেবতা, দান দেবতা; মিত্রাবরুণ দেবতা; আগ্রী দেবতা, বিষ্ণু দেবতা; দাবা৷ প্রভৃতি দেবতা, অশ্ব দেবতা, বাক্ দেবতা, শকধূম দেবতা, কাল দেবতা স্বরস্বতী দেবতা, সাধ্যায় দেবতা, প্রজাপতি দেবতা, পিতৃ দেবতা, বৃহস্পতি দেবতা; জল দেবতা, তৃণ দেবতা, রাকা দেবতা, সিনীবালী দেবতা, ইন্দ্রাণী দেবতা, বরুণানী দেবতা, অপাংনপাং দেবতা, মধু দেবতা, মাধব ও ত্বষ্টা দেবতা, সূচী দেবতা, নভঃ দেবতা, নভস্ত দেবতা, দ্রবিণদা দেবতা; কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতা, বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা, যূপ দেবতা, শ্যেন দেবতা, দধিক্রা দেবতা, ক্ষেত্রপতি দেবতা, শুন দেবতা, শুনাসীর দেবতা, সীতা দেবতা, জল দেবতা, গো-দেবতা, ঘৃত দেবতা, অত্রি দেবতা, মন দেবতা, বৈকুণ্ঠেন্দ্র দেবতা, পরমাত্মা দেবতা, বিশ্বাবসু দেবতা, বিশ্বদেবা দেবতা, মায়া দেবতা, লক্ষ্মী, ইলা, ভারতী, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি দেবতা। উদ্ধৃত তালিকায় মহাদেব নাম নাই বা শিব নাম দৃষ্ট হয় না; তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে—মহাদেবের বা শিবের আরাধনা অধুনা পরিকল্পিত? তালিকায় দুর্গা বা কালী নাম নাই; তাই বলিয়া কি বলিব—উঁহাদের উপাসনা আধুনিক? আমরা তাহা বলিতে পারি না। যিনিই শিব, তিনিই রুদ্র, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই মহাদেব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই সব,—এতদুক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না কি? যিনিই বিষ্ণু, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই বাসুদেব, আবার তিনিই হরি,—এ পরিচয়ই বা কোথায় নাই? যিনিই শক্তি, তিনিই কালী, তিনিই দুর্গা, তিনিই ইন্দ্রাণী, তিনিই পৃথিবী, তিনিই সব,—শাস্ত্রে এতদুক্তিরও কি অসদ্ভাব আছে? আবার যিনিই বিষ্ণু, তিনিই রুদ্র, তিনিই শক্তি, তিনিই কালী,—এ উক্তিই বা কোথায় না দেখিতে পাই? তবে কেন 'শাস্ত্রে অমুক দেবতার নাম নাই, অমুক দেবতার নাম আছে' বলিয়া বৃথা বিতণ্ডা করি? একে সব, সবে এক,—এ তত্ত্ব কোথায় পরিস্ফুট নহে? পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে একই বিষয়ে ভিন্ন মত দৃষ্ট হয় বলিয়া, অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। শৈবপুরাণে মহাদেব—ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর সৃষ্টিকর্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; বৈষ্ণব পুরাণে, ভাগবতাদিতে, বিষ্ণু—মহাদেবের ও ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্তা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; শক্তিপুরাণে, দেবী ভগবতী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের জননীরূপে অভিহিত। এইরূপ সৌরপুরাণে সূর্য্যদেবের, গাণপত্য পুরাণে গণপতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে, ঐরূপ বিরোধের কারণ—কল্পভেদ; অর্থাৎ, এক এক কল্পে এক এক দেবতার প্রাধান্য হইয়াছিল, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্নরূপ বর্ণনায় কোনই পার্থক্য দেখিতে পান না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তাঁহাদের দৃষ্টিতে, সকলই এক; এক বলিয়াই, এক হইতে অপরের উৎপত্তি-বিষয়ে তাঁহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হয় না। তিনিই অনন্ত, আবার তিনিই সান্ত। অনন্তের ধারণা সীমাবদ্ধ-জ্ঞান মানবের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া, অধিকারী বুঝিয়া, শাস্ত্র এক এক জনের ধারণার অনুরূপ উপাস্য সামগ্রী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাই প্রকারান্তরে, যত মনুষ্য, তত দেবদেবী সংসারে প্রকাশমান আছেন। অনন্তের যিনি যে অংশ দেখিয়াছেন, যিনি যে ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়-পটে সেই মূর্ত্তি সেই ভাব মাত্র প্রকটিত হইয়াছে।

যাঁহারা সৃষ্টিকর্তৃরূপে ভগবানকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা প্রজাপতি বা ব্রহ্মার উপাসনায় ব্রতী হইয়াছেন। যাঁহারা পালন-কর্তৃরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা জগৎ-পালক বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার উপাসনায় মন নিবিষ্ট করিয়াছেন। আর যাঁহাদের নিকট তাঁহার ভীষণ সংহার-মূর্ত্তি প্রতিভাত হয়, তাঁহারা সংহার-কর্ত্তা মহেশ্বর বা রুদ্র বলিয়া তাঁহার আরাধনা করেন। মনুষ্য তাঁহার শুভ-সূচক রূপ গণপতি-মূর্ত্তিতে, তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তী রূপ ইন্দ্র-মূর্ত্তিতে দেখিতে পান। তিনি যখন শত্রু-সংহারিণী খর্পরধারিণী বরাভয়প্রদায়িনী, তখনই তিনি দুর্গা দনুজদলনী। তাঁহার নামের, রূপের, মহিমার অন্ত আছে কি? সেই নাম, রূপ ও মহিমার অনুসরণ করিয়াই সংসারে অসংখ্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এক এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিবিধ শাখা-প্রশাখা দৃষ্ট হয়, তাহাও সেই কারণেই ঘটিয়া থাকে। হিন্দু-ধর্ম্মের শাখা-প্রশাখা অসংখ্য। সেই সকল শাখা-প্রশাখার মধ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর নামধেয় শাখা-পঞ্চক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। ঐ পাঁচটী প্রধান শাখায় দিনে দিনে যে সকল উপশাখার সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতবর্ষে এখন তৎসমুদায়েরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুর উপাসকগণ বৈষ্ণব, শক্তির উপাসকগণ শাক্ত, শিবের উপাসকগণ শৈব, গণপতির উপাসকগণ গাণপত্য এবং সূর্য্যের উপাসকগণ সৌর নামে অভিহিত। শাস্ত্রে শাক্ত-বৈষ্ণবাদি এক এক সম্প্রদায়ের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে। তন্ত্র-শাস্ত্রে মহাদেব শাক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—

হিন্দু-ধর্ম্মে সম্প্রদায়-ভেদ।

"শাক্তোঽপি শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্মস্বরূপতাক্। আরাধিতা যেন কালী তারা ত্রিভুবনেশ্বরী॥
ষোড়শী চৈব মাতঙ্গী ছিন্না চ বগলামুখী। আরাধিতা মহেশানি স শিবো নাত্র সংশয়ঃ॥"

শৈব প্রথমে আচার-বিশেষ মধ্যে গণ্য ছিল। যাঁহারা অষ্টাঙ্গ-যোগ-সংযুক্ত হইয়া বিধান-মতে দেবীর উপাসনা করিতেন, তাঁহারাই শৈব নামে পরিচিত ছিলেন। লক্ষণ, যথা,—

"অষ্টাঙ্গ-যোগ-সংযুক্তা যজেদ্দেবীং বিধানতঃ। যাবদ্ধ্যানং সমাধিঃ তাবৎ শৈব প্রচক্ষতে॥"

মহাদেব শৈব অপেক্ষাও শাক্তের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,— 'স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, কোথাও শাক্তের সমান আমার পরম প্রিয়জন নাই।' তদুক্তি,—

"মদংশাশ্চৈব যে ভূতাস্তে শৈবা নাত্র সংশয়। তদংশাশ্চৈব শাক্তাশ্চ সত্যং বৈ গিরিনন্দিনি॥"

শিব ও শক্তির উপাসকগণ যথাক্রমে শৈব ও শাক্ত নামে পরিচিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল বর্ণই শিব ও শক্তির পূজারাধনায় শৈব ও শাক্ত নামে পরিচিত হইতে পারেন। বিষ্ণুর উপাসকগণ বৈষ্ণব। শাস্ত্র বৈষ্ণবের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—

"গৃহীতো বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুসেবাপরো নরঃ। বৈষ্ণবশ্চাত্র সংগ্রাহ্য স্কন্দাদ্যুক্তানুসারতঃ॥"

সূর্য্য-দেবকেই যাঁহারা পরব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই সৌর এবং গণপতিই যাঁহাদের ইষ্টদেবতা, তাঁহারাই গাণপত্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনা-আপন ইষ্ট-দেবতাকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করেন। কিন্তু এক এক সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবগণের মুখে অপর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার গুণকীর্ত্তনেরও অবধি নাই। শিব বিষ্ণুকে, বিষ্ণু মহেশ্বরকে,—এইরূপ এক জন অপর জনকে জগৎ-কারণ-রূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সে সকল উক্তি পাঠ করিলে সকলকেই অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

[বৈষ্ণবগণের বিদ্যমানতা,—কলিযুগে চারি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি প্রসঙ্গে,—পরবর্ত্তিকালে অসংখ্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি;—রামানুজী বা শ্রী-সম্প্রদায়,—শঙ্করাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মমত-সমূহের পরিচয়,—রামানুজের জন্ম, শিক্ষা ও ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তনা,—রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশেষ লক্ষণ,—বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তনা,—বেদাগালা ও তেঙ্গালাই শাখাদ্বয়,—মর্কট ন্যায় ও মার্জ্জার ন্যায়,—আচারী শাখা;—রামানন্দী, রামাবৎ বা রামাৎ সম্প্রদায়,—তাঁহাদের উপাস্য দেবদেবী, রামানন্দ কর্ত্তৃক রামানন্দী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনার কারণ,—ঐ সম্প্রদায়ের লক্ষণ, শাখা-প্রশাখা সমূহ;—কবীরপন্থী সম্প্রদায়,—কবীরের অদ্ভুত জন্ম-বৃত্তান্ত ও ধর্ম্মমত প্রচার,—হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা,—তাঁহার অলৌকিক লোকান্তরে হিন্দু ও মুসলমানের দ্বিবিধ স্মৃতি-রক্ষা;—রায়দাসী, সেনাপন্থী, মুলুকদাসী, খাকী, দাদুপন্থী, রামসনেহি প্রভৃতি রামানুজ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ;—মধ্বাচারী বা ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি,—মাধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ও ধর্ম্মমত প্রচার,—তাঁহাদের উপাসনার অঙ্গ প্রভৃতি,—বল্লভাচারী বা রুদ্র-সম্প্রদায়,—বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাব ও বালগোপাল মূর্ত্তির উপাসনা-প্রবর্ত্তন,—বল্লভাচার্য্যের ধর্ম্মমত,—তাঁহার অলৌকিক লোকান্তর,—শ্রীনাথদ্বার প্রভৃতির মাহাত্ম্য-কথা,—মীরাবাই শাখা-সম্প্রদায়;—সনকাদি সম্প্রদায়,—নিমাবৎ বা নিমাৎ—ইঁহাদের ধর্ম্মমত,—শাখা-প্রশাখা;—চৈতন্য-সম্প্রদায়,—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব,—ধর্ম্মমত,—তাঁহার অবতারত্ব,—চৈতন্য-সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা—অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।]

বিষ্ণুর উপাসকগণ প্রধানতঃ বৈষ্ণব নামে পরিচিত। বিষ্ণুর পূজা, বিষ্ণুর উপাসনা বেদে দেখিতে পাই। বিষ্ণুর উপাসনা উপনিষদাদিতেও দৃষ্ট হয়। পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, গরুড়-পুরাণ, নারদীয় পুরাণ প্রভৃতিতে বিষ্ণুর মহিমা বিশেষ ভাবে পরিকীর্ত্তিত। তবেই বুঝা যায়,—সকল যুগে, সকল সময়েই বিষ্ণুর পূজা প্রচলিত ছিল; সুতরাং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও আবহমান কাল বিদ্যমান আছেন। তবে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগত্রয়ে বৈষ্ণবগণ কত সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন, তাহার নিদর্শন পাওয়া সুকঠিন। পদ্মপুরাণে দেখিতে পাই,—

বৈষ্ণব সম্প্রদায়-সমূহ।

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥"
শ্রীমাধ্বীরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ দেবী সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাঃ॥"

অর্থাৎ,—যাঁহারা সম্প্রদায়-বিহীন বা কোনও সম্প্রদায়-ভুক্ত নহেন, তাঁহাদের মন্ত্র ফলদায়ক হয় না। এই জন্য কলিকালে শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র ও সনক এই চারি জন ক্ষিতি-পাবন বৈষ্ণব আবির্ভূত হইয়া চারিটী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিবেন। ভক্তমাল-গ্রন্থে দেখিতে পাই,—

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ। শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

অর্থাৎ,—শ্রী (লক্ষ্মী) রামানুজকে, চতুর্ম্মুখ (ব্রহ্মা) মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র (মহাদেব) শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন (সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার) নিম্বাদিত্যকে আপন আপন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে স্বীকার করেন। এই চারি সম্প্রদায় হইতে অসংখ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বিষ্ণু সকলেরই মূল উপাস্য দেবতা হইলেও, কালক্রমে

তাঁহার এক এক অবতারের এবং এক এক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক গুরুর উপাসনাই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রে প্রকাশ,—বিষ্ণু যুগে যুগে অবতার-রূপ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পাপভার লাঘব করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাই,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

শাস্ত্র-কথিত রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতার বিষ্ণুরই অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। অবতার অসংখ্য; বিষ্ণু অসংখ্য অবতারে অসংখ্য কর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীতে সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। সুতরাং তাঁহার অসংখ্য অবতারের অসংখ্য ক্রিয়া-কলাপ দর্শনে লোকে তাঁহার অসংখ্য রূপ কল্পনা করিয়া অসংখ্য ভাবে উপাসনা করিয়া থাকে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেই হেতু নানা বিভাগের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। বেদব্যাসের সমসময়ে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কত ভাগে কত নামে বিভক্ত ছিল, শাস্ত্রে তাহার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। অন্ততঃ, এখন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে সকল নামে পরিচিত, তখন যে সেই সকল নামধেয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে পদ্ম-পুরাণে ভবিষ্য চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে দেখিতে পাইয়াছি,—কলিকালে শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র, এবং সনক এই চারি জন বৈষ্ণবের আবির্ভাবে পৃথিবী পবিত্র হইবেন। কিন্তু এই চারি জনের চারি সম্প্রদায় হইতে অধুনা যে অসংখ্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দ্বাবিংশ সম্প্রদায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—(১) রামানুজী, (২) রামানন্দী, (৩) কবীরপন্থী, (৪) খাকী, (৫) মুলুকদাসী, (৬) দাদুপন্থী, (৭) রায়দাসী, (৮) সেনানী বা সেনাপন্থী, (৯) বল্লভাচারী, (১০) মিরাবাই, (১১) মধ্বাচারী, (১২) নিমাবাৎ, (১৩) বঙ্গদেশীয় চৈতন্য-সম্প্রদায়, (১৪) রাধাবল্লভী, (১৫) সখীভাবক, (১৬) চরণদাসী, (১৭) হরিশ্চন্দ্রী, (১৮) সাধনপন্থী, (১৯) মাধবী, (২০) সন্ন্যাসী, (২১) বৈরাগী, (২২) নাগা। এতন্মধ্যে রামানুজ-সম্প্রদায়—শ্রী-সম্প্রদায় বা শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত; বল্লভাচারিগণ—রুদ্র-সম্প্রদায়ী; মধ্বাচারিগণ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী এবং নিমাৎ-গণ সনকাদি সম্প্রদায় বলিয়া কথিত হয়। অর্থাৎ, পদ্মপুরাণোক্ত চারিটী ভবিষ্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়—রামানুজ, বল্লভাচারী, মধ্বাচারী ও নিমাবৎ সম্প্রদায় বলিয়া এখন অভিহিত। *

রামানুজী বা শ্রী-সম্প্রদায়।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া যখন অদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠা করেন, তখনও শ্রীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য যে সকল ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে তৎসমুদায়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল সম্প্রদায়ের নাম—শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, ভাগবত, পঞ্চরাত্র, জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক, চাণ্ডালক, অগ্নিবাদী, বৈখানস্, মহা গণপতি, উচ্ছিষ্ট-গণপতি, সৌগত, মল্লারি, বিশ্বক্‌সেন, শূন্যবাদী, গুণবাদী, ঐন্দ্র, বারুণ, গারুড়, কৌবের, মান্মথ,

* মৎসম্পাদিত শ্রীভক্তমালা-গ্রন্থে এই সকল সম্প্রদায়ের বিবরণ দৃষ্ট হইবে।

যোগী, পিলু, চান্দ্র, ক্ষপণক, সিদ্ধ, ভূত-বেতাল ইত্যাদি। তবেই দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করাচার্য্যের সম-সময়ে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিলেন বটে; কিন্তু তদন্তর্গত রামানুজ-সম্প্রদায় তখনও সংগঠিত হয় নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজ আবির্ভূত হন। ১১২৭ খৃষ্টাব্দে, দাক্ষিণাত্যের চোল-রাজ্যে (বর্ত্তমান মাদ্রাজের পশ্চিমোত্তরে), পেরুম্বু গ্রামে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কর্ণাট-ভাষায় লিখিত 'দিবাচরিত' গ্রন্থে লিখিত আছে,— তাঁহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য এবং মাতার নাম ভূমিদেবী। কাঞ্চীপুরে (কাঞ্জেভরম নগরে) রামানুজ বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্ত হন। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়া, তিনি শ্রীরঙ্গ-পত্তনে আসিয়া, শ্রীরঙ্গনাথ নামক বিষ্ণু-মূর্ত্তির উপাসনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি কয়েকখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু তখন দাক্ষিণাত্যে শৈব-সম্প্রদায়ের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ; শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের নামে দাক্ষিণাত্য মাতোয়ারা; সুতরাং বৈষ্ণব-মত প্রতিষ্ঠার জন্য রামানুজকে অশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত তিনি তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বহু শৈব সম্প্রদায়ের নেতৃগণকে তর্কে পরাভূত করেন; এবং সেই পরাভবের ফলে অনেক শৈব-মন্দির বৈষ্ণব-মন্দিরে পরিণত হয়। ত্রিপতির শিব-মন্দিরে এই সময়ে বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া রামানুজ যখন শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রত্যাবৃত্ত হন, সেই সময়ে শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। চোল-দেশীয় তাৎকালিক নৃপতি কেরিকল চোল (পরবর্ত্তী নাম কৃমিকোণ্ড চোল) শিবোপাসক ছিলেন। তিনি দেশের ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া শৈব-ধর্ম্মের প্রাধান্যমূলক এক অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লন। কিন্তু রামানুজ রাজার বশ্যতা-স্বীকারে পরাঙ্মুখ হন; সুতরাং রামানুজকে ধৃত করিবার জন্য রাজা সশস্ত্র সৈন্যদল প্রেরণ করেন। সেই সংবাদ অবগত হইয়া, শিষ্যগণের কৌশলে শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে পলায়ন করিয়া, রামানুজ ঘাট-পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে মহীশূরের জৈনধর্ম্মাবলম্বী নৃপতি বিঠলদেব (ভেল্লাল রায়) তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। কথিত হয়, মহীশূরাধিপতির কন্যা তৎকালে পীড়িতা ছিলেন। রামানুজের চিকিৎসাগুণে রাজকুমারী রোগমুক্তা হন। তাহাতে মহীশূর-রাজ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণানন্তর মহীশূর-রাজ বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। রামানুজের মহীশূরে অবস্থিতি-কালে মহীশূর-রাজ কর্ত্তৃক যাদবগিরি পর্ব্বতের উপর এক বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ মন্দির 'মৈলখুঠি' নামে এবং মন্দিরস্থিত বিগ্রহ 'চবনরায়' নামে অভিহিত। রামানুজ দ্বাদশ বৎসর কাল মহীশূরে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে চোল-রাজ লোকান্তরে গমন করেন। তখন আবার শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, রামানুজ জীবনের অবশিষ্টাংশ একান্তে বিষ্ণুর উপাসনায় অতিবাহিত করেন। দাক্ষিণাত্যে রামানুজের নামে অসংখ্য মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদিনও ডাঃ বুকানন হিসাব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—'রামানুজ দাক্ষিণাত্যে সাত শত মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে মাত্র চারিটী মঠ অধুনা বিদ্যমান।' তাঁহার প্রধান মঠের নাম—মৈলকুঠি বা দক্ষিণ বদরিকাশ্রম। রামানুজের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র এখনও দাক্ষিণাত্যে বিদ্যমান। সেই

অধিষ্ঠানক্ষেত্রে বা 'গদীতে' এক এক জন বৈষ্ণব গুরুপদে নির্ব্বাচিত হইয়া আসন প্রাপ্ত হন। তাঁহারা রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ বলেন,—রামানুজ আপন শিষ্যদিগের মধ্য হইতে ৭৪ জনকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পুরুষানুক্রমিক গুরু মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে—রামানুজ-নির্ব্বাচিত গুরুর সংখ্যা ৮৯ জন। তন্মধ্যে পাঁচ জন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের এবং অবশিষ্ট ৮৪ জন গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের গুরু। সেই গুরুগণের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে গুরুপদ লাভ করিয়া আসিয়াছেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ প্রধানতঃ বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া থাকেন। নারায়ণ বা লক্ষ্মী কিম্বা লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম বা সীতা অথবা সীতারাম এবং কৃষ্ণ ও রুক্মিণী প্রভৃতি তাঁহাদের উপাস্য দেবতা। ঐ সকল দেবদেবী নানা নামে অধুনা পরিচিত। রামানুজ সম্প্রদায়ের তীর্থ-সমূহের মধ্যে, দক্ষিণে—রঙ্গনাথ, রামনাথ, লক্ষ্মী-বালজী, উত্তরে—হিমালয় প্রদেশে বদরীনাথ, পূর্ব্বোপকূলে উড়িষ্যায় জগন্নাথ এবং পশ্চিমে কাথি-বাড় উপকূলে দ্বারকাধামে দ্বারকানাথ সুপ্রসিদ্ধ। ভগবান্ বিষ্ণু যেন চারি মূর্ত্তিতে ভারত-বর্ষের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছেন। স্বপাক রন্ধন এবং নির্জ্জনে আহার—রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব বলিয়া কথিত হয়। কার্পাস-বস্ত্র-পরিধানে অন্ন ভোজন করা, ইঁহাদের মতে, নিষিদ্ধ। ইঁহারা বলেন,—কার্পাস বস্ত্রে ভোজন করিলে অশুচি হইতে হয়। পশমের বা রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি ইঁহাদের নিকট শুদ্ধ। আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি অপর কাহারও দৃষ্টি পতিত হইলে, তাঁহারা আহার পরিত্যাগ করিয়া, আহারীয় দ্রব্যাদি মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'আবরণী' এবং 'অনাবরণী' দুইটী থাক আছে। আবরণী থাক প্রধানতঃ আবরণের মধ্যে আহারের অর্থাৎ নির্জ্জনাহার-সংক্রান্ত ঐ কঠোর বিধি পালন করেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের কেহ 'ওঁ রামায় নমঃ', কেহ বা 'ওঁ নমঃ নারায়ণায়' মন্ত্রে দীক্ষিত হন। মন্ত্র-গ্রহণ-কালে বৈষ্ণবগণ 'দাসোঽস্মি' অথবা 'দাসোঽহং' বলিয়া আচার্য্যগণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। ব্রাহ্মণগণই কেবল গুরুপদে অভিষিক্ত হইবার এবং মন্ত্র দান করিবার অধিকারী। তিলক ধারণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অঙ্গ। দ্বারকা অঞ্চলের বৈষ্ণবগণ গোপীচন্দনের তিলক ধারণ করেন। ইঁহাদের তিলক দেখিতে অনেকটা ত্রিশূলাকৃতি। কপালে কেশ-মূল হইতে আরম্ভ করিয়া দুইটী শ্বেত লম্বরেখা নাসামূলে ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থলে আসিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সম্মিলিত হয়। সেই সম্মিলন-স্থান হইতে একটী রক্ত বা পীত-বর্ণের ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ললাটে, কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, কর্ণমূলদ্বয়ে, হৃদয়ে, নাভিমূলে, শিরোমধ্যে এবং পৃষ্ঠদেশে গোপীচন্দন মৃত্তিকা দ্বারা ইঁহারা শঙ্খচক্রগদাপদ্মাদি চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া থাকেন। তুলসী-মাল্য-ধারণ, ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়-চিহ্ন মধ্যে গণ্য। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ—বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বরাহ-পুরাণ এবং ভাগবতপুরাণ এই ছয় খনি প্রামাণ্য [illegible] বলিয়া স্বীকার করেন। অবশিষ্ট দ্বাদশ পুরাণ, তাঁহাদে[illegible] [illegible]শ্রীভাষ্য, গীতাভাষ্য, বেদার্থ-সংগ্রহ, বেদান্ত-প্রদীপ, বেদান্তসার প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ আদরণীয়। বেঙ্কটাচার্য্য প্রণীত স্তোত্রভাষ্য, শতদূষণী, নারদপঞ্চরাত্র, চণ্ডমারুতবৈদিক, ত্রিংশদ্ধ্যান প্রভৃতি

গ্রন্থও এই সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরের সামগ্রী। দাক্ষিণাত্য-প্রচলিত ভাষায় রামানুজ সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ প্রচারিত আছে। তন্মধ্যে 'গুরুপর' গ্রন্থে রামানুজের জীবনচরিত পরিবর্ণিত হইয়াছে। মহীশূরের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ কালে ডাঃ বুকানন ঐ গ্রন্থের উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন। রামানুজ সম্প্রদায় বিষ্ণুকেই পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের মতে,—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র বিষ্ণুই বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই কারণ স্বরূপ; তাঁহা হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। যদিও রামানুজী বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু এবং জগৎকে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু বেদান্ত-মতের সহিত তাঁহাদের মতের বিরোধ দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু ও জগৎ অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলেও, বিষ্ণু যে গুণ ও আকৃতি পরিশূন্য, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—বিষ্ণুই পরমাত্মা, সর্ব্বকারণ কারণ; আবার তিনিই কার্য্য, তিনিই বিশ্ব, তিনিই অণু-পরমণু। বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমেই সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি অদ্বিতীয়; তিনি আপনাকে বহু রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বহু রূপে প্রকাশমান হইবার ইচ্ছা-হেতু তিনি স্থূল, দৃষ্ট ও জড় শরীর গ্রহণ করিলেন। মৃত্তিকার দ্বারা যেমন নানা আকৃতির নানা বস্তু নির্ম্মিত হইতে পারে; তিনিও সেইরূপ নানা রূপে নানা মূর্ত্তিতে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন ঘটের মধ্যে মৃত্তিকা আছে, অথচ ঘট ও মৃত্তিকা স্বতন্ত্র বলিয়া পরিচিত হয়; তিনিও সেইরূপ বিশ্বরূপে বিরাজমান; অথচ, বিশ্ব ও তিনি পরস্পর বিভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত। বৈদান্তিকগণ জড় ও জীবাত্মাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু রামানুজগণ বলেন,—'প্রাণীর যেমন দেহ ও জীবন, সংসারে তিনিও সেইরূপ দেহ ও জীবন। হস্তপদাদি-বিশিষ্ট ভৌতিক দেহের মধ্যে যেমন জীবাত্মা আছেন; জড় সংসারের মধ্যেও পরমাত্মা বিষ্ণু সেইরূপ ভাবে বিরাজমান।' রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ রূপ-গুণের সমাবেশে বিষ্ণুকে এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকেন; এই জন্য, অদ্বৈতবাদী হইয়াও, তাঁহারা 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী' নামে অভিহিত। জগৎ ও ব্রহ্ম অভিন্ন ভাবিয়াও, জগৎ হইতে ব্রহ্মের প্রাধান্য কীর্ত্তনে তাঁহারা অগ্রসর। রামানুজ সম্প্রদায়ের মতে তিনটী পদার্থে বিশ্ব সংগঠিত,—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ বা আত্মা, ভোক্তা বলিয়া অভিহিত; অচিৎ বা জড় বস্তু (অন্নাদি), ভোগ্য মধ্যে পরিগণিত; ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম বিষ্ণু, উভয়ের নিয়ামক ও পরিচালক বলিয়া পরিচিত। ভোক্তা এবং ভোগ্য—চিৎ এবং অচিৎ, ঈশ্বরেরই অবয়বস্বরূপ। সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্ট পদার্থ রূপে তিনি ব্যক্তাব্যক্তরূপে বিরাজমান। সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্ট পদার্থ এই দুই ব্যক্তা-ব্যক্তরূপ ব্যতীত সৃষ্ট প্রণালীর মঙ্গলার্থ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি বিশেষ বিশেষ রূপ-গুণে প্রকাশমান হন। তাঁহার সেই রূপ-গুণের মধ্যে রামানুজ সম্প্রদায় তাঁহার পঞ্চবিধ মূর্ত্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন,—(১) অর্চ্চা, অর্থাৎ অর্চ্চনার সামগ্রী প্রতিমাদি; (২) বিভব, অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতার; (৩) ব্যূহ, অর্থাৎ চিত্ত, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃ রূপে বিরাজমান বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন; (৪) সূক্ষ্ম, অর্থাৎ ষড়-গুণের সম্পূর্ণতা; (সেই ষড়্গুণ—বিরাজ বা রজোগুণের অভাব, বিমৃত্যু বা অমরত্ব, বিষ বা শোকাদি দুঃখাভাব, বিজীঘিংসা বা ক্ষুৎপিপাসারাহিত্য, সত্যকাম বা সত্যের প্রতি অনুরাগ;

সত্যসঙ্কল্প বা সত্যের অনুষ্ঠান।) সেই ষড়্‌বিধ সূক্ষ্ম ভাব বিষ্ণুর স্বরূপ বলিয়াও কীর্ত্তিত হয়। (৫) অন্তরাত্মা বা অন্তর্য্যামী অর্থাৎ জীবের নিয়ন্তা জীবাত্মা মূর্ত্তি বিশেষ। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ মূর্ত্তির বা ভাবের উপাসনা করিতে করিতে ভক্ত পরব্রহ্মের সামীপ্য লাভ করেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের মতে উপাসনা পাঁচ প্রকার,—(১) অভিগমন, অর্থাৎ দেবমন্দিরাদি পরিষ্কার ও বিগ্রহের পবিত্রতারক্ষণ; (২) উপাদান, অর্থাৎ পূজার উদ্দেশ্যে পুষ্প ও গন্ধ-দ্রব্যাদি সংগ্রহ; (৩) ইজ্যা, অর্থাৎ বলিদান ভিন্ন যাগযজ্ঞাদি পূজোপহার; (৪) সাধন বা স্বাধ্যায়, অর্থাৎ মন্ত্র-জপ, স্তোত্র-পাঠ, নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতি; এবং (৫) যোগ অর্থাৎ ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি দ্বারা পরমাত্মায় লীন হইবার চেষ্টা। এবম্বিধ উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা ভক্ত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন এবং বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া নিত্য-সুখে সুখী হইয়া থাকেন। রামানুজ সম্প্রদায় শৈবগণের চির-বিদ্বেষী। উত্তর-ভারতে রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের সংখ্যা অতি অল্প। যাঁহারা তৎপ্রদেশে বসবাস করেন, তাঁহারা 'শ্রীবৈষ্ণব' নামে পরিচিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানুজ সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এক বিভাগ 'বেদাগালাই' নামে এবং অপর বিভাগ 'তেঙ্গালাই' নামে পরিচিত হয়। প্রথমোক্ত বিভাগ উত্তর-দেশীয় এবং শেষোক্ত বিভাগ দক্ষিণ-দেশীয় বলিয়াও প্রসিদ্ধ। কঞ্জেভেরাম নগরে (প্রাচীন কাঞ্চীপুরে), ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, বেদান্তাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হয়। তিনি রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি প্রচার করেন,—'রামানুজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ব্যভিচার দোষ ঘটিয়াছে। সুতরাং ঐ সম্প্রদায়ের সংস্কার-সাধনের জন্য বিষ্ণু কর্তৃক তিনি মর্ত্ত্যে প্রেরিত হইয়াছেন।' তিনি আরও বলেন,—'দাক্ষিণাত্যের রামানুজ সম্প্রদায় অপেক্ষা উত্তর-ভারতের (আর্য্যাবর্ত্তের) শ্রী-সম্প্রদায় সমধিক পবিত্রতা-সম্পন্ন; তাঁহারা ধর্ম্ম-পালনে ন্যায়ানুমোদিত প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া আছেন; কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রামানুজ সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।' বেদান্তাচার্য্যের এতদুক্তির ফলে, পূর্ব্বোক্ত দুইটী শাখা-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। বেদাগালাই বা উত্তর-দেশীয় শাখা সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। শেষোক্ত শাখা আপনাদের জন্য তামিল-ভাষার চারি সহস্র কবিতাযুক্ত এক খানি নূতন বেদ সঙ্কলন করিয়া লন। শেষোক্ত সম্প্রদায় প্রচার করিতে থাকেন, তাঁহাদের তামিল ভাষার বেদই আদি বেদ। সুতরাং সেই বেদের কবিতাই তাঁহাদের মন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ বেদ 'নালায়িরু' নামে পরিচিত এবং উপনিষদের অংশ-বিশেষের মর্ম্মাবলম্বনে উহা সংগ্রথিত। যাহা হউক, 'বেদাগালাই' এবং 'তেঙ্গালাই'—এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্ষণে ঘোর মত-বিরোধ। বেদাগলাই সম্প্রদায় বলেন,—'আপনার কর্ম্মবলে, অধ্যবসায়ের ফলে, মনুষ্যের আত্মা (জীবাত্মা) পরমাত্মার সামীপ্য-লাভে সমর্থ হয়; যেমন, বানর-শিশু আপনার মাতার দেহ ধারণ করিয়া ঝুলিয়া থাকে, মানুষকেও সেইরূপ-ভাবে কার্য্য দ্বারা পরমেশ্বরকে আকর্ষণ করিয়া থাকিতে হইবে।' কিন্তু তেঙ্গালাই বৈষ্ণবগণ বলেন,—'মানুষ আবার কি করিতে পারেন? পরমাত্মা কার্য্য না করাইলে, তিনি না উত্তোলন করিয়া লইলে, কে তাঁহার সমীপস্থ হইতে সমর্থ হয়? বিড়াল-শিশু

একান্তে পড়িয়া থাকে; তাহার জননী আসিয়া তাহাকে মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া যায়। মানুষও সেইরূপ নির্ভর-পরায়ণ হইয়া থাকুন; তিনিই মানুষকে তুলিয়া লইবেন।' বেদাগালাই সম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি 'মর্কট ন্যায়' নামে এবং তেঙ্গালাই-দিগের যুক্তি 'মার্জ্জার ন্যায়' নামে অভিহিত হয়। এই দুই সম্প্রদায়ের তিলক-চিহ্ন দ্বিবিধ। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের তিলকের রেখাদ্বয় নাসামূলে বৃত্তাকারে মিলিয়া গিয়াছে; আর শেষোক্ত সম্প্রদায়ের তিলক-চিহ্ন ভ্রূ-মূলে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। খাদ্য-দ্রব্য কেহ দেখিতে না পায়, দেখিলে দৃষ্ট-দোষ হয়, উভয় সম্প্রদায়েরই এই ধারণা। কোনও উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত কাহারও খাদ্য-দ্রব্য দেখিতে না পান, এমনই সন্তর্পণে তাঁহারা খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। রামানুজ সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্রাহ্মণগণের উপাধি—আয়েঙ্গার, আচার্য্য, চার্লু এবং আচার্লু। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণে সংগঠিত রামানুজ সম্প্রদায়ের একটী শাখা আছে। তাহার নাম—'আচারী' শাখা। ইঁহারা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বিষ্ণুর উপাসনা করেন। ইঁহাদের তিলকের মধ্যরেখা পীত বর্ণ। ইঁহারা অন্য সম্প্রদায়ের পৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন না। বহু স্থানে ইঁহাদের দেবমন্দির বিদ্যমান। বৃন্দাবনে রঙ্গজীর মন্দির—রঙ্গাচার্য্য নামক জনৈক আচারী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎকলে, জগন্নাথ-ক্ষেত্রে এবং মুর্শিদাবাদে ও চন্দ্রকোণায় আচারী-সম্প্রদায়ের অনেক দেবালয় মঠ দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যেই ইঁহাদের প্রাধান্য। এক হিসাবে, এই সম্প্রদায়ই রামানুজ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-মত অবিকৃত-ভাবে পালন করিয়া আসিতেছেন। আচার্য্য হইতেই আচারী নামের উদ্ভব হইয়াছে।

রামানন্দী সম্প্রদায়—রামাবৎ বা রামাৎ বলিয়াও বিখ্যাত। এই সম্প্রদায় শ্রীরামচন্দ্রকেই বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বিষ্ণুর সকল অবতারই তাঁহাদের সম্মানার্হ বটে কিন্তু তাঁহারা বলেন,—রাম অবতারই সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ। রাম, সীতা অথবা সীতারাম এবং হনুমান প্রভৃতির পূজা এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত। রামানুজী-গণের ন্যায় ইঁহারা শালগ্রাম এবং তুলসী পত্রকে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন। দাক্ষিণাত্যে যেরূপ রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, উত্তর-ভারতে সেইরূপ রামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। রামানন্দ কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া, ইহার নাম রামানন্দী সম্প্রদায়। কেহ কেহ বলেন,—রামানন্দ, রামানুজের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু মতান্তরে আবার প্রতিপন্ন হয়, রামানুজের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের সম-সময়ে রামানন্দ আবির্ভূত হন। রামানুজের শিষ্য এবং উত্তরাধিকারীর নাম দেবানন্দ (ভক্তমালের মতে দেবাচার্য্য)। দেবানন্দের শিষ্য ও উত্তরাধিকারী হরিনন্দ; হরিনন্দের পর রাঘবানন্দ। রাঘবানন্দের পর রামানন্দ, রামানুজের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কেহ বলেন,—রামানন্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন; কাহারও মতে—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। রামানন্দী সম্প্রদায়ের সৃষ্টির ইতিহাস এইরূপ,—রামানন্দ এক সময়ে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, তিনি যখন

রামানন্দী বা রামাৎ সম্প্রদায়।

আপনাদিগের মঠে প্রত্যাবৃত্ত হন, তাঁহার সতীর্থগণ তাঁহার সহিত একত্র আহার করিতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন,—'অপরের সমক্ষে আহার করা রামানুজ সম্প্রদায়ের রীতি-বিরুদ্ধ। রামানন্দ নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সে রীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে অন্য স্থানে স্বতন্ত্র-ভাবে আহার করিতে হইবে।' মঠাধিকারী রাঘবানন্দও শিষ্যগণের সহিত ঐ বিষয়ে একমত হইয়া রামানন্দকে স্বতন্ত্র-ভাবে অন্য স্থানে আহার করিতে আদেশ করেন। রামানন্দ ইহাতে অপমান বোধ করিয়া, মঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন; আপনি স্বতন্ত্র মঠ স্থাপন করিয়া, অভিনব ধর্ম্ম-মত-প্রচারে প্রয়াস পান। বারাণসী নগরে, পঞ্চগঙ্গা ঘাটে, রামানন্দের মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প দিনের মধ্যে অনেকেই রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কথিত হয়, মুসলমান নৃপতিগণের আধিপত্যকালে রামানন্দের মঠ-সমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যে স্থানে রামানন্দের আদি মঠ বিদ্যমান ছিল, সেখানে রামানন্দের পদচিহ্ন-সমন্বিত এক প্রস্তর-স্তূপ অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। উত্তর-ভারতে রামানন্দী সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য, কাশীধামে রামনন্দী-গণের একটী সদস্য-সভা পঞ্চায়ৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই সভার মতানুসারে রামনন্দীদিগের ক্রিয়া-কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। রামানন্দী সম্প্রদায়ের ইষ্ট-দেবতা—রামচন্দ্র। সুতরাং 'শ্রীরাম' মন্ত্রই ইঁহাদের ইষ্ট মন্ত্র। 'জয় শ্রীরাম', 'জয় রাম' অথবা 'সীতারাম' বলিয়া ইঁহারা অভিবাদন করিয়া থাকেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের কঠোর বিধি-বিধান রামানন্দ শিথিল করিয়া দেন। নির্জ্জনে আহারের ব্যবস্থা অথবা স্নান সম্বন্ধে কোনরূপ কঠোর নিয়ম প্রতিপালন রামানন্দের সময় রহিত হইয়া যায়। তাঁহার শিষ্যগণ—সেই বন্ধন-মোচন-হেতু, মুক্ত বা 'অবধূত' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। রামানন্দী সম্প্রদায় হইতে বহু নূতন নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল। রামানন্দের দ্বাদশ জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। সেই দ্বাদশ শিষ্যের নাম,—আশানন্দ, কবীর, রায়দাস, পীপা, সুরানন্দ, সুখানন্দ, ভবানন্দ, ধন্না, সেনা, মহানন্দ, পরমানন্দ, শ্রী-আনন্দ। ভক্তমাল গ্রন্থে রামানন্দের ঐ দ্বাদশ শিষ্যের নাম অন্যরূপ লিখিত আছে; ভক্তমাল-গ্রন্থোল্লিখিত রামানন্দের শিষ্যগণের নাম,—রঘুনাথ, অনন্তানন্দ, জীব, পদ্মাবৎ, পীপা, ভবানন্দ, রুইদাস, ধন্না, সেনা, সুরাসুর। অন্য মতে, রামানন্দের উত্তরাধিকারিগণ—রঘুনাথ, অনন্তানন্দ, যোগানন্দ, শ্রীরঙ্গ, নরহরি নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। শিষ্যের মধ্যে কবীর তাঁতী ছিলেন; রায়দাস চর্ম্মকার, পীপা রাজপুত, ধন্না জাঠ এবং সেনা নাপিত বলিয়া পরিচিত। রামানন্দ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকল জাতিরই প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। সুতরাং তাঁহার শিষ্য-দলে সকল জাতিই প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে রামানন্দের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—'রামানন্দ সকল জাতিকেই কোল দিয়াছিলেন; তিনি জাতিভেদ রহিত করিতে প্রয়াসী ছিলেন; তাঁহার মতে, ভক্তে এবং ভগবানে কোনই প্রভেদ নাই; ভগবান যখন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, প্রভৃতি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তখন ভক্তই বা চামার, কোলি, চিপি প্রভৃতি নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে না পারিবেন কেন?' সেই জন্য তাঁহার শিষ্যের মধ্যে সকল জাতিই দৃষ্ট হয়। তবে

রামানন্দের রচিত যে সকল গ্রন্থের বা টীকার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতিকে ধর্ম্মোপদেষ্টার আসনে স্থান দান করেন নাই। তিনি সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তাঁহার শিষ্যগণ অন্যান্য ভাষায় গ্রন্থ-সমূহ রচনা করিয়া ঐ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে সকল জাতির আশ্রয়-স্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন গৃহী ও সন্ন্যাসী দ্বিবিধ শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, রামানন্দী-সম্প্রদায়েও তাহার অসদ্ভাব নাই। এই সম্প্রদায়ের অনেকগুলি মঠ আছে; সেই মঠ-সমূহের এক একটীর অধিকারী 'মোহান্ত' এবং তাঁহার শিষ্যগণ 'চেলা' বলিয়া পরিচিত। এক একটী মঠ এক একটী রাজ্য বা জমীদারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামানন্দের শিষ্যগণের মাহাত্ম্য-কথা ভক্তমাল গ্রন্থে পরিবর্ণিত হইয়াছে। রামানন্দী-সম্প্রদায় প্রধানতঃ এলাহাবাদের পশ্চিমাংশে গঙ্গা ও যমুনার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে বসবাস করেন। আগ্রা অঞ্চলের অধিকাংশ লোক রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত।

রামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে কবীর, রায়দাস ও সেনা—এই তিন জন বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের তিন জনের নামানুসারে তিনটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সংগঠিত হয়। সেই তিন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নাম যথাক্রমে—কবীরপন্থী, রায়দাসী ও সেনাপন্থী। এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কবীরপন্থী অধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। কবীরের বিদ্যমান-কালে ভারতবর্ষে মুসলমানগণের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ। তখন হিন্দুগণের সহিত মুসলমানগণের বিরোধের অবধি ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই কবীর আপনার বশে আনিয়াছিলেন। কবীরের সম্বন্ধে বহু আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তিনি তিন শত বৎসর (১১৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) জীবিত ছিলেন; দিল্লীর পাঠান সম্রাট সেকেন্দর লোদী তাঁহাকে জলে ডুবাইয়া দিলেও তিনি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন; সম্রাটের আদেশে অনলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও তিনি দগ্ধীভূত হন নাই;—তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কতই আশ্চর্য্য কাহিনী প্রচারিত আছে। ভক্তমালে প্রকাশ,—তিনি এক বালবিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গুরু রামানন্দকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় রামানন্দ বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করেন,—'মা তুমি পুত্রবতী হও!' সেই আশীর্ব্বাদের ফলে কবীর জন্মগ্রহণ করেন। কবীরের জন্মের পর, লোকাপবাদ-ভয়ে তাঁহার মাতা শিশুকে এক স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসেন। এক জোলা শিশুকে প্রাপ্ত হইয়া গৃহে লইয়া যায় এবং নিজ পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করিতে থাকে। কবীরপন্থীরা বলেন,—'কাশীর নিকটে 'লহরতলাও' সরোবরে পদ্ম-পত্রের উপর কবীর ভাসমান ছিলেন। নুরী নামক জোলা এবং তাহার পত্নী নিমা সেই অবস্থায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। কবীর সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার।' জোলার গৃহে প্রতিপালিত হইয়া কবীরের মনে প্রতিনিয়তই অনুতাপ উপস্থিত হইত। পূর্ব্ব-সংস্কার-বশে এক এক বার তিনি ভাবিতেন,—'আমার উদ্ধারের উপায় কি? এ নীচ জন্ম হইতে আমি কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করিব?' সেই সময়ে এক জন সাধু তাঁহাকে রামানন্দের শরণাপন্ন হইতে পরামর্শ দেন।

কবীর-পন্থী সম্প্রদায়।

রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য কবীর এক দিন প্রত্যুষে তাঁহার গৃহদ্বারে আসিয়া বসিয়া থাকেন। গৃহ হইতে রামানন্দ বাহিরে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ কবীরের গায়ে তাঁহার পা ঠেকিয়াছিল। রামানন্দ অমনি, 'রাম রাম—ম্লেচ্ছ স্পর্শ করিলাম' বলিয়া, শিহরিয়া উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে 'রাম রাম' নাম উচ্চারণ করিয়া কবীর তাঁহার শরণাপন্ন হন। সেই হইতেই রাম-নাম-মন্ত্র কবীরের জপমালা হয়; কবীর দিন দিন ভক্তি-মার্গে অগ্রসর হন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রভা দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন হিন্দু-মুসলমান সকলেই কবীরকে আপনার জন বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতে আরম্ভ করেন। কালক্রমে কবীর সকল সম্প্রদায়েরই এতদূর সম্মানভাজন হইয়াছিলেন যে, মুসলমানগণ তাঁহাকে মুসলমান বলিতে গৌরব অনুভব করিতেন এবং হিন্দুগণ তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া গৌরবান্বিত হইতেন। কবীরের অন্ত্যেষ্টির ইতিহাস স্মরণ করিলে, এই পরিচয় বিশেষরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিহাসে প্রকাশ,—তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দুগণ তাঁহার শব দাহ করিবার জন্য এবং মুসলমানগণ তাহা কবরে প্রোথিত করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে, হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ উপস্থিত হইলে, কবীর সহসা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন; বলেন,—'আমার শবাবরণ বস্ত্রখানি উন্মোচন করিয়া দেখুন; তার পর তাহার অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করিবেন।' এই বলিয়া কবীর অন্তর্দ্ধান হন। তখন বস্ত্রোত্তোলন করিয়া হিন্দু মুসলমান সকলেই দেখিতে পান,—বস্ত্রের মধ্যে শব নাই; তৎপরিবর্ত্তে তাহার মধ্যে রাশি রাশি পুষ্পস্তবক সজ্জিত রহিয়াছে। সেই পুষ্পস্তবকের অর্দ্ধাংশ, বারাণসীর তাৎকালিক অধিপতি রাজা বীরসিংহ বারাণসীতে লইয়া আসেন এবং অপরার্দ্ধাংশ, পাঠান-সর্দ্দার বিজ্‌লি খাঁ লইয়া যান। বারাণসীতে যে অর্দ্ধাংশ আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহা অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত করা হয়। বারাণসীর যে স্থানে সেই পুষ্পস্তবক ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই স্থান 'কবীরচৌর' নামে অভিহিত। কবীরপন্থীগণ সেই স্থানটীকে পরম পবিত্র ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন। এদিকে পাঠানগণ যে অর্দ্ধাংশ লইয়া যান, গোরক্ষপুরের নিকটস্থিত মাগর পল্লীতে উহা সমাহিত হয়। কথিত হয়, ঐ মাগর পল্লীতেই কবীর দেহ-ত্যাগ করেন। কবীরের স্মৃতি-রক্ষার জন্য মন্‌সর আলি খাঁ, মাগরের পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম দান করিয়া গিয়াছেন। কবীর, রামানন্দের শিষ্য ছিলেন বলিয়া, কবীরপন্থী সম্প্রদায় সকল দেবতার মধ্যে বিষ্ণুকে প্রধান আসন প্রদান করিয়া থাকেন। যদিও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের আচার-ব্যবহারের বিষম পার্থক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু কবীরপন্থীগণ, বৈষ্ণবগণের সহিত—বিশেষতঃ রামাৎ বৈষ্ণবগণের সহিত—মিত্রতা রক্ষায় সমুৎসুক। কবীরপন্থীদিগের মতে দেবদেবীর পূজা নিষিদ্ধ। পূজার মন্ত্র বা অভিবাদন ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। ইঁহারা অদৃশ্য কবীর দেবকে ভজনা করেন। ভজন-গানই ইঁহাদের উপাসনা। কবীরপন্থীদিগের মধ্যে যাঁহারা গৃহী, তাঁহারা হিন্দুর ন্যায় দেব-দেবীর উপাসনা করেন বটে; কিন্তু যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারা কোনও দেবতার অর্চ্চনা করেন না। তুলসী-মাল্য ধারণ বা তিলক-সেবা, তাঁহাদের মতে, আড়ম্বরের মধ্যে গণ্য। কতকগুলি দোঁহা কবীরের নামে প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, কবীর সেই দোঁহাগুলি রচনা করিয়া-

ছিলেন; কেহ বলেন, তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সেই সকল দোঁহা রচিত হইয়াছিল। দুইটী দোঁহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে কবীর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-মতের আভাষ পাওয়া যাইবে।

মন্‌কা ফেরত জনম্ গয়ো গয়ো নমন্‌কা ফের। করকা মন্‌কা ছোড় কর মন্‌কা মন্‌কা ফের॥ ১॥
সব্‌সে হিলিয়ে সব্‌সে মিলিয়ে সব্‌কা লিজিয়ে নাঁউ। হাঁজী হাঁজী সব্‌সে কিজিয়ে বসে আপ্‌নে গাঁউ॥২॥

অর্থাৎ,—'জপমালার গুটিকা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া জীবন কাটিয়া গেল; কিন্তু মনের ঘোর কাটিল না। অতএব হাতের গুটিকা পরিত্যাগ করিয়া, মনের গুটিকা ঘুরাইয়া দেও।১॥ সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া নাম গ্রহণ করিবে; 'হাঁ জী, হাঁ জী' সকলেই বলিবে; কিন্তু আপন স্থান পরিত্যাগ করিবে না।২॥' এই দুইটী দোঁহা পাঠ করিলে কোনও ধর্ম্মের প্রতিই কবীরের বিদ্বেষ ভাব ছিল না বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়; এবং বাহ্য পূজা অপেক্ষা অন্তরের পূজাই তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন, প্রতীত হয়। দেশের দুরবস্থা দর্শনে কবীরের প্রাণ কিরূপ কাঁদিয়াছিল, নিম্নোক্ত দোঁহায় পরিব্যক্ত॥

"বাহ্মণ টানন্ মূরখ্ ভয়ে শূদ্র পড়ে গীতা। ঠগ্ ঠগর বন্দ্ আচ্ছা খাবে দুঃখ পাব পণ্ডিতা॥
সাঁচ্চাকো মারে লাত্যা ঝুটা জগৎপিতায়। গোরস গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠ বিকায়॥
সতাকো না মেলে ধোতি গস্তান পহরে খাসা। কহে কবিরা দেখ ভাই দুনিয়াকা তামাসা॥"

অর্থাৎ,—'ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণ মূর্খ হইল; শূদ্রে গীতা পাঠ আরম্ভ করিল! প্রবঞ্চক শঠগণ উত্তম ভক্ষ্য ভোজন করিতেছে; কিন্তু পণ্ডিতগণের দুঃখের অবধি নাই! লোকে সাঁচ্চার (ন্যায়ের) মস্তকে পদাঘাত করিয়া, ঝুঁটাকে (অন্যায়কে) পিতার ন্যায় আদর করিতেছে। পথে পথে ফিরিয়া গো-দুগ্ধ বিক্রয় করিতে হয়; আর সুরা দোকানে বসিয়াই আদরে বিক্রীত হয়! সতী স্ত্রীর বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ কঠিন হইয়া উঠে; কিন্তু দুশ্চারিণী রমণী উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া থাকে।' তাই দুঃখ করিয়া কবীর বলিতেছেন,—'ভাই দুনিয়ার কি তামাসা দেখ।' কবীর জাতি-ভেদের বিরুদ্ধবাদী এবং একাকারের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, শেষোক্ত দোঁহায় তাঁহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। কবীরের ধর্ম্মমত বুঝাইবার জন্য আরও কয়েকটী দোঁহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"পণ্ডিত বাদ্ বদে সো ঝুঁঠা। রামকে কহে জগৎ গৎ পাবে খাঁড় কহে মুখ মীঠা॥
পাবক্ কহে পাঁও যো ডাড়ে জল কহে তৃষা বুঝাই। ভোজন কহে ভুখ্ যো ভাগে তো দুনিয়া তর যাই॥
বিন্ দেখে বিন্ দরশ পরশ বিন্ নাম লিয়ে কা হোই। ধনকে কহে ধনী যো হোবে নির্ধন রহে ন কোই॥
নরকে সাথ সুআ হরিবোলে হরি প্রতাপ নহি জানে। যো কবহী উড়ি যায় জঙ্গলকো তৌ হরিস্মরতি ন জানে॥
সাঁচা দেহ বিষয় মায়া সঙ্গ হরি ভকুনকি হাঁসী। কহে কবির রাম ভজে বিন্ বাঁধে যমপুর যাসী॥ ১॥
পাথর পূজে হরি মিলে তো হাম পূজে পহাড়। মালা ফেরে হরি মিলে তো হর্ম্ভি ফেরেঁ ঝাড়॥
নীকী নীকী বাৎ করো হক্ না হক করতে দুঁদা। কাঁঠ বাঁধে হরি মিলে তো বন্দা বাঁধৈ কুঁদা॥ ২॥"

'পণ্ডিতগণের বাদানুবাদ মিথ্যা। রাম নাম উচ্চারণ করিলেই যদি জীবের পরিত্রাণ হয়, তবে তো খাঁড় বলিলেই মুখ মিষ্ট হইতে পারে! অগ্নি বলিলেই যদি পা পুড়িয়া যায়, জল বলিলেই যদি তৃষ্ণা দূর হয়, ভোজন বলিলেই যদি ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে রাম বলিলেই জীব পরিত্রাণ হইতে পারে। কিন্তু দর্শন স্পর্শন ভিন্ন কেবল নাম-গ্রহণে কি ফল হইতে পারে! ধন বলিলেই যদি ধনী হওয়া যায়, তাহা হইলে কেহ আর নির্ধন থাকে

না। শুক পক্ষী মানুষের সঙ্গে থাকিয়া হরিনাম বলে বটে, কিন্তু হরির মাহাত্ম্য অবগত হয় না। তাই সে যখন বনে উড়িয়া যায়, তাহার আর হরিনাম স্মরণ থাকে না। বিষয়-মায়াময় এই দেহকে সৎ (সত্য) বলা হরিভক্ত জনের নিকট উপহাসের বিষয়। কবীর বলেন,—,শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা বিনা মানুষ বাঁধা পড়িয়া যমপুরে গমন করে ॥ ১॥ পাথর পূজায় যদি হরি মিলিত, তাহা হইলে আমি পাহাড় পূজা করিতে পারি। মালা ঘুরাইলেই যদি হরি মিলিত, তাহা হইলে আমি গাছের ঝাড় ফিরাইব। গলায় কণ্ঠি বন্ধন করিলে যদি হরি মিলিত, এ বন্দা (অধীন) গলায় কাঠের কুঁদা বাঁধিত। সত্য বাক্য বল, বৃথা অড়ম্বরে বৃথা চীৎকারে কি ফল আছে ? ২॥' কবীরের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের মূল লক্ষ্য—সর্ব্ব জীবে সমভাব। জীব যখন আপনার উৎপত্তি-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তখনই তাহার মুক্তি হয়। কবীরপন্থীদিগের মতে অকপটে জীবের হিত-সাধন একটী প্রধান ধর্ম্ম। তাঁহাদের মতে—'এই পৃথিবীতেই স্বর্গ, আবার এই পৃথিবীতেই নরক। সংসার-ত্যাগে চিত্তশুদ্ধি হয়; চিত্ত-শুদ্ধিতেই শান্তি আনয়ন করে। সত্যানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।' সেই জন্যই তাঁহারা সত্য-পরায়ণ হইতে সকলকে উপদেশ দেন। কবীরপন্থী-সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহ প্রধানতঃ হিন্দী-ভাষায় বিরচিত। সেই সকল গ্রন্থের নাম—সুখ-নিধান, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠি, কবীর-পঞ্জী, বালখ্ কী রমৈয়িনী, রামানন্দকী গোষ্ঠি, আনন্দরাম-সাগর প্রভৃতি। কবীর-পন্থী সম্প্রদায় নানা শাখায় বিভক্ত; তন্মধ্যে বারটী শাখা প্রসিদ্ধ। কবীরের দ্বাদশ শিষ্যের নামানুসারে সেই দ্বাদশ শাখার উৎপত্তি হয়। সেই দ্বাদশ শাখা-প্রবর্ত্তকগণের নাম,—(১) শ্রুতগোপাল দাস; ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ বারাণসীর চৌড়ে মাগরের সমাধিতে এবং জগন্নাথ ও দ্বারকার গদিতে সমাসীন। (২) ভগদাস; ইঁহার উত্তরাধিকারীরা ধনৌতি নামক স্থানের অধিবাসী। (৩) নারায়ণ দাস এবং (৪) চূড়ামণ দাস; চূড়ামণের উত্তরাধিকারিগণ জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী বান্ধু নামক স্থানে অধিষ্ঠিত; নারায়ণ দাসের বংশ এখন লোপপ্রাপ্ত। (৫) জগদাস; কটকের গদিতে ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ প্রতিষ্ঠিত। (৬) জীবন-দাস; ইনি সৎনামী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। (৭) কমলদাস; ইনি কবীরের পুত্র বলিয়া পরিচিত। বোম্বাই সহরে ইঁহার আসন ছিল। ইঁহার মতাবলম্বীরা যোগানুষ্ঠনের প্রাধান্য স্বীকার করেন। (৮) তাকশালী; বরোদা-রাজ্যে ইনি প্রতিষ্ঠিত। (৯) জ্ঞানী; সাসারামের (সহস্রমীক) সন্নিকটস্থ মাজনীতে ইঁহার গদী ছিল। (১০) সাহেব দাস; ইনি কটকে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ 'মূলাপন্থী'-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা করেন। (১১) নিত্যানন্দ ও (১২) কমলানন্দ; ইঁহারা দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। উল্লিখিত বারটী শাখা ভিন্ন হংসকবীরী, দানকবীরী এবং মঙ্গলকবীরী প্রভৃতি আরও কয়েকটী শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। কালবশে প্রত্যেক শাখারই আচার-ব্যবহার ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বারাণসীতে কবীরচৌড় নামে যে মঠ আছে, কাশীনরেশ বলবন্ত সিংহ সেই মঠের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বলবন্ত সিংহের পুত্র চৈৎ সিংহ সেই মঠের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। চৈৎ সিংহের সময়ে কবীরপন্থী-সম্প্রদায়-ভুক্ত

জনগণের একটী সংখ্যা-নির্দ্দেশের চেষ্টা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে কবীর-চৌড়ায় একটী মেলায় অধিবেশন হয়। সেই মেলায় অনূ্যন পঁয়ত্রিশ সহস্র কবীরপন্থীর সমাগম হইয়াছিল। কবীরপন্থী-সম্প্রদায় প্রধানতঃ পশ্চিমাঞ্চলে এবং মধ্য ভারতে বসবাস করেন।

রায়দাস—রুইদাস, রয়দাস, রবিদাস প্রভৃতি নামে বিখ্যাত। রায়দাস চর্ম্মকারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত হয়, পূর্ব্ব-জন্মে তিনি রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। ভিক্ষায় গমন করিয়া তিনি কোনও এক বণিকের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য রামানন্দ যখন ভগবানকে নিবেদন করিতে যান, তখন ধ্যানে ভগবানের দর্শন পান না। সুতরাং রামানন্দের মনে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের বিশুদ্ধতা বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন,—ঐ দ্রব্য নীচ-বংশীয় বণিকের গৃহ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তখন রামানন্দ ক্রোধে 'হা চানার' বলিয়া শিষ্যকে ভর্ৎসনা করেন। গুরু-বাক্যে শিষ্য চর্ম্মকার-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চর্ম্মকার-গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও শিশুর পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কার দূর হয় নাই। ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু গুরু দর্শন ভিন্ন দুগ্ধপানে পরাঙ্মুখ হয়; সুতরাং তাঁহার পিতা-মাতা, রামানন্দকে সেখানে অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন করেন। রামানন্দ শিশুর কর্ণে মন্ত্রদান করিলে, শিশু পান-ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। সেই শিশুই পরিবর্ত্তিকালে রায়দাস নামে পরিচিত হইয়াছিল। তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়—'রায়দাসী' সম্প্রদায় নাম অভিহিত। ভক্তমাল গ্রন্থে রায়দাসের (রুইদাসের) অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় নানারূপে বর্ণিত আছে। চিতোরের রাজমহিষী ঝালি তাঁহার নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ বিদ্রোহী হন। রায়দাস এক দিবস ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করাইয়া, আপনি বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহাদের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ভোজন-পংক্তিতে বসিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণই দেখিতে পান, আপনাদের পার্শ্বে এক এক জন রায়দাস বসিয়া আছেন। কিম্বদন্তী,—এই হইতে বহু ব্রাহ্মণ রায়দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচারই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। রামানন্দের অন্যতম শিষ্য সেনা কর্ত্তৃক সেনাপন্থী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। সেনা গণ্ডোয়ানার অন্তর্গত বন্ধগড়ের রাজার ক্ষৌরকার ছিলেন। বিষ্ণুপূজায় তন্ময় হওয়ায় এক দিন তিনি যথা সময়ে রাজার নিকট আসিতে পারেন নাই। কিন্তু রাজার ক্ষৌর-কার্য্যের সময়ে সেনা-নাপিতের বেশে, রাজার নিকট আসিয়া বিষ্ণু স্বয়ং রাজার ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিয়া যান। এদিকে, পূজা শেষ হইলে, সেনা যখন রাজার ক্ষৌরকার্য্যের জন্য আগমন করেন, তখন আর কোনও কথাই রাজার জানিতে বাকি থাকে না। তদবধি সেনাকে রাজা গুরুপদে বরণ করেন। সেনা ও তাঁহার বংশধরগণ রাজার ও তাঁহার বংশধরগণের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই হইতেই সেনাপন্থী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। রামানন্দী সম্প্রদায় হইতে আরও নানা শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। কিল নামক জনৈক বৈষ্ণব খাকী-শাখার প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায় ভস্ম ও মৃত্তিকায় আপনাদের অঙ্গ বিভূষিত করেন। শৈবগণের ন্যায় ইঁহাদের মস্তকে জটাভার বিলম্বিত। রাম-সীতার উপাসনা এবং হনুমানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ, ইঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম। অযোধ্যার নিকট হনুমান-গড়ে

রামানন্দী সম্প্রদায়ের শাখা উপশাখা।

ইঁহাদিগের প্রধান মঠ। জয়পুরে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কিলের গদী প্রতিষ্ঠিত। ফরক্কাবাদ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে বহু খাকী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বসবাস করেন। কিলের শিষ্য মুলুকদাস হইতে মুলুকদাসী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইঁহারা গৃহস্থ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায়ের উপাস্য-দেবতা—শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে ইঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। এলাহাবাদ জেলার পরমাণিকপুরে, নদীর তীরে, এই সম্প্রদায়ের মঠ আছে। রামানন্দী-সম্প্রদায়ের মধ্যে দাদুপন্থী, রামসনেহী প্রভৃতিও বিশেষ প্রসিদ্ধ। দাদু নামক এক ব্যক্তি—দাদুপন্থী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। নাগা, বিরক্ত ও বিস্তরধারী—এই সম্প্রদায়ের তিনটী উপশাখা। নাগারা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, বিরক্তগণ বিষয়-স্পৃহাশূন্য, বিস্তরধারীরা ব্যবসায়ী বলিয়া প্রখ্যাত। আজমীড়, মাড়োয়ার প্রভৃতি স্থান দাদুপন্থী-সম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র। কবীরের অধস্তন ষষ্ঠ পর্য্যায়ে দাদু আবির্ভূত হন। দাদুপন্থীগণের ধর্ম্ম-নিয়ামক গ্রন্থ-দ্বয়ের নাম—'বিশ্বাসকা অঙ্গ ও বিচারকা অঙ্গ।' রামচরণ নামক জনৈক রামাবৎ কর্ত্তৃক রামসনেহী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। রামচরণ—প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় রামচন্দ্রকে দেবতা বলিয়া মনে করেন বটে; কিন্তু রামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তির পূজা করেন না। রাজোয়ারার অন্তর্গত সাহপুরে ইঁহাদের প্রধান মঠ প্রতিষ্ঠিত। বুন্দী, কোটা, চিতোর, যোধপুর, জয়পুর প্রভৃতি স্থানেও এই সম্প্রদায়ের উপাসনা-মন্দির আছে। মিবার এবং আলোয়ার প্রদেশে এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক বসতি করেন। বোম্বাই, গুজরাট, সুরাট, হায়দ্রাবাদ, পুনা প্রভৃতি স্থানেও এই সম্প্রদায়-ভুক্ত জনগণের বসবাস দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে জয়পুর-রাজ্যের সুরসেন গ্রামে রামসনেহী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামচরণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামসনেহী-সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ বিদেহী ও মোহিনী নামক দুইটী বিভাগে বিভক্ত। বিদেহীগণ সম্পূর্ণরূপ উলঙ্গ থাকে; মোহিনীগণ রক্তবর্ণের দুই খণ্ড বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহারা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত জলাধার ব্যবহার করেন এবং মৃৎপাত্রে বা প্রস্তরে ভোজন করিয়া থাকেন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রী বা রামানুজ-সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা রূপে, রামানন্দী, কবীরপন্থী, খাকী, মুলুকদাসী, দাদুপন্থী, রামসনেহী, রায়দাসী, সেনাপন্থী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

মধ্বাচারী বা ব্রহ্ম সম্প্রদায়—মধ্বাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্বাচার্য্য ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে (১১২১ শকাব্দে) দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত তুলব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।* তাঁহার পিতার নাম—মধীজি ভট্ট। অনন্তেশ্বরের মঠে বিদ্যাভ্যাস করিয়া, নবম বর্ষ বয়সে, মধ্বাচার্য্য সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরু অচ্যুতপ্রোচ সনকের (ব্রহ্মার পুত্র) বংশধর বলিয়া অভিহিত হন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ-কালে মধ্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভগবদগীতার এক ভাষ্য প্রণয়ন করেন। কথিত হয়, সেই ভাষ্য দর্শন করিয়া স্বয়ং ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং

মধ্বাচারী বা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়।

---

* মধ্বাচার্য্যের অপর নাম আনন্দতীর্থ। তাঁহার জন্মস্থান উদীপি নামেও অভিহিত হয়। ম্যাঙ্গালোরের ৬০ মাইল উত্তরে, দক্ষিণ-কানাড়ায়, উদীপি অবস্থিত। মধ্বাচার্য্য কানাড়া-দেশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।

মধ্বাচার্যকে তিনটী শালগ্রাম শিলা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। উদীপি, মধ্যতল এবং সুব্রহ্মণ্য নামক তিন স্থানের তিনটী মঠে সেই শালগ্রাম-শিলাত্রয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উদীপিতে মধ্বাচার্য্য এক কৃষ্ণ মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণ-মূর্ত্তি অর্জ্জুনের নির্ম্মিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। দ্বারকা হইতে মালবর উপকূলে গতিবিধি-কালে সেই কৃষ্ণ-মূর্ত্তি-সহ একখানি বাণিজ্যপোত জলমগ্ন হইয়াছিল। ধ্যান-বলে মধ্বাচার্য্য তাহা জানিতে পারিয়া, সেই মূর্ত্তি উত্তোলন-পূর্ব্বক উদীপিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে উদীপি বৈষ্ণবগণের প্রধান তীর্থস্থান মধ্যে গণ্য হয়। আপন জন্মভূমি তুলবেও মধ্বাচার্য্য আটটী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সকল মঠের একটীতে রাম ও সীতা, একটীতে সীতা ও লক্ষ্মণ, একটীতে চতুর্ভুজ কালীয়-মর্দ্দন, একটীতে দ্বিভুজ কালীয়মর্দ্দন, একটীতে সুবিতল, একটীতে শূকর, একটীতে নৃসিংহ এবং একটীতে বসন্তবিতল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পদ্মনাভ তীর্থ নামক জনৈক শিষ্যের সাহায্যেও তিনি অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। মধ্বাচার্য্য অন্যূন সাঁইত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে—ঋগ্‌ভাষ্য, সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, দশোপনিষদ্ভাষ্য, ভাগবত তাৎপর্য্য, তন্ত্রসার, কৃষ্ণনামামৃত মহার্ণব প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসিগণ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্রাভ বস্ত্রে অঙ্গ আবরণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। ইঁহাদের তিলক-রেখার বিশেষত্ব—তিলকের মধ্য-রেখা কৃষ্ণ বর্ণে অঙ্কিত হয়। মধ্বাচারী সম্প্রদায় নারায়ণকে সর্ব্বকারণ-কারণ ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নত্ব স্বীকার করেন না। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বলেন,—'পরমেশ্বর হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বটে; কিন্তু জীব ও পরমেশ্বর স্বতন্ত্র।' দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহারা বলেন,—

"যথা পক্ষী চ সূত্রঞ্চ নানা বৃক্ষরসা যথা। যথা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ শুদ্ধোদলবণে যথা॥
চোরপহার্য্যৌ যথা যথা পুংবিষয়াবপি। তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্ব্বদৈব বিলক্ষণৌ॥"

অর্থাৎ—'পক্ষী ও সূত্র, বৃক্ষ ও রস, নদী ও সমুদ্র, বিশুদ্ধ জল ও লবণ, চোর ও অপহৃত দ্রব্য, পুরুষ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পরস্পর যেরূপ বিভিন্ন; জীব ও ঈশ্বরের মধ্যেও সেইরূপ পরস্পর বিভিন্নতা বিদ্যমান। একটী কারণ, অপরটী কর্ম্ম; একটী কর্ত্তা, অপরটী ক্রিয়া; ঈশ্বর ও জীবে এইরূপ সম্বন্ধ।' পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে ভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া, মধ্বাচারিগণ দ্বৈতবাদী নামে পরিচিত। তাঁহারা বলেন,—'আত্মা অদ্বিতীয় অবিনশ্বর বটে; কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে পরমাত্মার আয়ত্তাধীন। তাঁহার সহিত আত্মা অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সম্বন্ধযুক্ত বটে; কিন্তু তাঁহার সহিত অভিন্ন নহে।' ইঁহারা মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়সের প্রয়াসী নহেন। ইঁহাদের মতে,—'মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স লাভ মানুষের আয়ত্তাধীন নহে। নারায়ণ গুণাতীত; মায়ার সংযোগে সত্ত্ব-রজোস্তম গুণত্রয় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-রূপ গ্রহণ করিয়া সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করেন।' ইঁহাদের উপাসনা-প্রণালী ত্রিবিধ। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। দেহে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাদি চিহ্ন-ধারণ—অঙ্কন মধ্যে পরিগণিত। বিষ্ণুর নামানুসারে পুত্র-পৌত্রাদির নামকরণ—ইঁহাদের উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ নামকরণ মধ্যে গণ্য। ভজন দশবিধ,

অর্থাৎ,—সত্য, বাক্য, হিতকথা, প্রিয়ভাষ, স্বাধ্যায়, দান, পরিরক্ষণ, দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা। বিষ্ণুর অনুগ্রহ-লাভ, তাঁহার উৎকর্ষ-বিষয়ে জ্ঞান প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের চরম লক্ষ্য। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র এবং মধ্বাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থাদি এই সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরের সামগ্রী। বিষ্ণু-মূর্ত্তি ইঁহাদের প্রধান আরাধ্য। এই সম্প্রদায়ের সহিত শৈবগণের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ, ইঁহাদের দেবালয়ে শিব ও বিষ্ণু একত্র পূজা-প্রাপ্ত হন। মধ্বাচারী-সম্প্রদায়ের গুরুগণ এবং শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী গোসাঞিগণ পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করিয়া থাকেন। শৃঙ্গেরী-মঠের মোহান্তগণকে উদীপিতে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে, এবং মধ্বাচারী গুরুগণকে শৃঙ্গেরী-মঠে গিয়া শিবের উপাসনা করিতে, অনেক সময়ই দেখা গিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের অনেকেই উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা শরীরে শঙ্খ-চক্রাদির চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া থাকেন। শ্রুতির উপদেশ—'অতপ্তুতনুর্নতদা মোক্ষমশ্নুতে।' শঙ্করাচার্য্য এই শ্রুতি-বাক্যের ব্যাখ্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—'তপস্যা দ্বারা যাঁহার শরীর পবিত্র হয় নাই, তিনি মোক্ষ-লাভের অধিকারী নহেন।' কিন্তু মধ্বাচারী-সম্প্রদায় সে অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন,—'তপ্ত-শলাকা দ্বারা গাত্রে শঙ্খচক্রাদি অঙ্কনই ঐ শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্য। রামানুজ-সম্প্রদায়ের ন্যায় মধ্বাচারীরা প্রধানতঃ দুইটী বিভাগে বিভক্ত। একটী বিভাগের নাম—ব্যাসকূট; অপর বিভাগের নাম—দাসকূট। এই দুই বিভাগের বৈষ্ণবদিগকে প্রধানতঃ মহীশূর প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাসকূট-সম্প্রদায়—মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের উপদেশ-সমূহ কেনারী ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের উপাসনাদিতে কেনারী ভাষাই ব্যবহৃত হয়। দাসকূটগণ সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করেন। এ বিষয়ে রামানুজ-সম্প্রদায়ের তেঙ্গালাই ও বেদাগালাই-দিগের সহিত ব্যাসকূট ও দাসকূট সম্প্রদায়-দ্বয়ের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

বল্লভাচারী বা রুদ্র-সম্প্রদায়।

বল্লভাচারী বা রুদ্র-সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা—বালগোপাল। এই সম্প্রদায়ের গুরুগণ 'গোকুলস্থ গোসাঞি' বলিয়া অভিহিত হন। বল্লভাচার্য্য কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়; এই জন্য ইহার নাম—বল্লভাচারী-সম্প্রদায়। বল্লভাচার্য্যের জন্মের বহু পূর্ব্বে বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামী এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিকে বিষ্ণুস্বামী শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার ধর্ম্মমত প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল। বিষ্ণুস্বামীর পর জ্ঞানদেব, তৎপরে নামদেব ও ত্রিলোচনদেব যথাক্রমে রুদ্র-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যান। পরিশেষে বল্লভস্বামী রুদ্র-সম্প্রদায়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। বল্লভস্বামীর পিতার নাম—লক্ষ্মণ ভট্ট। তিনি তৈলঙ্গ-দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বল্লভস্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মথুরার তিন ক্রোশ পূর্ব্বভাগে, যমুনা নদীর পর-পারে, যে লোক-প্রসিদ্ধ গোকুল দৃষ্ট হয়, বল্লভস্বামী প্রথমে সেই গোকুলেই বাস করিতেন। গোকুলে কিছু দিন বসবাস করিয়া, বল্লভস্বামী তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। ভক্তমাল গ্রন্থে প্রকাশ,—তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া

বল্লভস্বামী বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায়ের রাজসভায় উপনীত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদেবকে অনেকে কৃষ্ণরায়ালু বলিয়া অভিহিত করেন। কৃষ্ণরায়ালু ১৫২০ খৃষ্টাব্দে বিজয়-নগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিজয়-নগরের স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণগণের সহিত বল্লভস্বামীর বিষম বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচারে জয়লাভ করিয়া, বল্লভস্বামী বৈষ্ণবগণের আচার্য্য মধ্যে পরিগণিত হন। সেই হইতে বল্লভস্বামীর নাম—বল্লভাচার্য্য। বিজয়-নগর হইতে বল্লভাচার্য্য উজ্জয়িনীতে গমন করিয়া, শিপ্রা নদীর তীরে একটি পিপ্পল বৃক্ষমূলে, কিছু কাল অবস্থিতি করেন। কথিত হয়, সেই বৃক্ষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই স্থান আজিও বল্লভস্বামীর বৈঠক নামে পরিচিত হইতেছে। বল্লভস্বামীর গতি-বিধির নিদর্শন আরও নানা স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। মথুরায়, যমুনার তীরে, একটি ঘাটে, বল্লভস্বামীর একটি বৈঠক দেখিতে পাওয়া যায়। চুণার দুর্গের দুই মাইল উত্তরস্থিত 'আচার্য্য কূয়া' তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। তত্রত্য মঠ, মন্দির এবং কূপ প্রদর্শন করাইয়া, লোকে বলিয়া থাকে,—'এই স্থানে বল্লভাচার্য্য বাস করিতেন।' নানা স্থান পর্য্যটনানন্তর বল্লভাচার্য্য বৃন্দাবনে আসিয়া উপনীত হন; সেই সময়ে, তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন, বালগোপাল বা গোপাললালের উপাসনা শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন। তদবধি বল্লভাচার্য্যের ধর্ম্মমত—বালগোপালের পূজা-পদ্ধতি—জগতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। শেষ জীবনে বল্লভাচার্য্য বারাণসী-ধামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বাসস্থান 'জেঠনবারে' আজিও একটী মঠ বিদ্যমান আছে। বারাণসী-ধামেই বল্লভাচার্য্য ইহ-জীবন পরিত্যাগ করেন। তাঁহার লোকান্তর—সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী। এক দিন হনুমান-ঘাটে স্নান করিতে গিয়া, হঠাৎ তিনি জলমধ্যে অদৃশ্য হন। যেখানে তিনি অবগাহন করেন, সেখান হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। অসংখ্য দর্শক আকাশের পানে চাহিয়া দেখেন,—'বল্লভাচার্য্য সশরীরে স্বর্গে গমন করিতেছেন।' বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের মতে,—শ্রীকৃষ্ণই জগতের সার; তাঁহার গোপাল রূপই শ্রেষ্ঠ রূপ; গোপাল হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। সুতরাং গোপালের উপাসনা করিলেই মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী। সৃষ্টি দিন দিন লয়-প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, গোলক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণ-সমন্বিতা প্রকৃতি বা মায়ার সৃষ্টি করেন। সেই প্রকৃতি বা মায়া হইতে সংসারের উৎপত্তি।' এই সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ—বল্লভাচার্যব কৃত সুবোধিনী টীকা-সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবত। বল্লভাচার্য্য ব্যাস-সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সিদ্ধান্ত-রহস্য, ভাগবত-লীলারহস্য ও একান্তরহস্য নামক গ্রন্থ-সমূহও প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপাদ, ব্রজবিলাস, অষ্টছাপ এবং বার্ত্তা প্রভৃতি হিন্দী-ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-সমূহ বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের শাস্ত্র-মধ্যে পরিগণিত। বল্লভাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-ভাব স্বীকার করিতেন। বল্লভাচার্য্যের লোকান্তরের পর, তাঁহার পুত্র বিঠলনাথ এই সম্প্রদায়ের নেতৃ-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি শ্রীগোসাঞিজী নামে পরিচিত। বল্লভাচার্য্যের চুরাশী জন শিষ্য ছিলেন। বার্ত্তা-গ্রন্থে তাঁহাদের বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে প্রকাশ,—বল্লভাচার্য্য চারি বর্ণের স্ত্রী-পুরুষকেই আপনার শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুজরাটের এবং মালবের ধনী

সওদাগরগণের অনেকেই বল্লভাচারী সম্প্রদায়-ভুক্ত। ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের মন্দির দৃষ্ট হয়। মথুরা এবং বৃন্দাবনে বল্লভাচারী বৈষ্ণবগণের শত শত দেবালয় বিদ্যমান আছে। বারাণসীতে লালজীর মন্দির এবং পুরুষোত্তম-জীর মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। বারাণসীর বণিক এবং সওদাগরগণ ঐ দুই মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ আপনাদের ব্যবসায়ের দৈনিক আয় হইতে টাকা প্রতি নির্দ্দিষ্টরূপ বৃত্তি দান করিয়া থাকেন। জগন্নাথক্ষেত্র এবং দ্বারকা এই সম্প্রদায়ের তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। আজমীঢ় সহরে শ্রীনাথদ্বার নামধেয় যে বিগ্রহ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। ঐ শ্রীনাথদ্বার বিগ্রহ প্রথমে মথুরায় বিদ্যমান ছিলেন। মোগল-বাদসাহ আওরঙ্গজেব সেই বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ দেন। গোসাঞিগণ তাহা জানিতে পারিয়া, বিগ্রহ লইয়া আজমীঢ়ে পলায়ন করেন। শ্রীনাথদ্বার বিগ্রহ এবং তাঁহার মন্দির বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের সকলেরই দ্রষ্টব্য সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত। বল্লভাচারী বৈষ্ণবগণ জীবনে একবার শ্রীনাথদ্বার দর্শন করিয়া শ্রীনাথদ্বার-দর্শনের প্রমাণ-পত্র * প্রাপ্ত হইলে, আপনাদিগকে ধন্য বলিয়া মনে করেন। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের গুরুগণ 'মহারাজ' নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে অধুনা প্রায় সপ্ততি-সংখ্যক মহারাজ বা গুরু আছেন। ভাতিয়া, বেণিয়া এবং সওদাগরগণের অধিকাংশ সেই মহারাজদিগের শিষ্য। গুজরাটে, বোম্বাই সহরে, কচ্ছ-প্রদেশে, কাথিবাড়ে, মধ্য-ভারতে, মথুরায়, বৃন্দাবনে এবং বারাণসীতে মহারাজগণের শিষ্য-সম্প্রদায়ের আধিক্য দৃষ্ট হয়। এক বোম্বাই সহরেই অন্যূন পঞ্চাশ সহস্র বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বসতি করেন। বরোদা-রাজ্যে উঁহাদের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের মহারাজ বা গুরুগণ অনেক স্থলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে সেইরূপভাবেই পূজা করিয়া থাকেন। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ে দিবসে আট বার শ্রীকৃষ্ণের সেবা-পদ্ধতি প্রচলিত। সূর্য্যোদয়ে মঙ্গলারতি—তাম্বুলাদি সহ শ্রীকৃষ্ণের জলপানের ব্যবস্থা; চারি দণ্ড বেলায় শৃঙ্গার—তৈল-চন্দনাদি মাখাইয়া তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করণ; ছয় দণ্ড বেলায় তাঁহাকে গোচারণের বা গোয়ালা-বেশে সজ্জিত করণ; মধ্যাহ্নে রাজভোগ—নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যে তুষ্টিকরণ; অপরাহ্নে উত্থাপন—তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ বৈকালিক ভোগ; সন্ধ্যায় বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন; ছয় দণ্ড রাত্রির পর শয়ন—জল-তাম্বুলাদি নিকটে রাখিয়া তাঁহাকে শয্যায় সংস্থাপন। বল্লভাচারী সম্প্রদায় হইতে স্বামী-নারায়ণী এবং মীরাবাই নামক দুইটী নূতন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। মীরাবাই উদয়পুরের রাণার সহিত পরিণীতা হন। তাঁহার পিতা—মেরতা নামক স্থানের রাজা ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, মোগল বাদসাহ আকবরের সমসময়ে, মীরাবাই প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের রণছোড় মূর্ত্তির উপাসক। তাঁহার শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী, দেবীর উপাসনা করিতেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায়, মীরাবাইকে গৃহত্যাগিনী হইতে হয়। মীরাবাই বৃন্দাবন, দ্বারকা

* শ্রীনাথদ্বার দর্শন করিলে, সেখানকার গোস্বামী-গণ নাথজী দর্শনের প্রমাণ-পত্র প্রদান করেন। মঠের ব্যয়-সংকুলানের জন্য কিছু অর্থ দান করিয়া সেই প্রমাণ-পত্র গ্রহণ করিতে হয়।

প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণে গমন করিলে, উদয়পুরের রাণা তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার আদেশ দেন। দ্বারকায় মীরা যখন ইষ্টদেবের আরাধনা করিতেছিলেন, উদয়পুরের প্রহরিগণ তখন তাঁহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা করেন। সেই সময় মীরার প্রার্থনায় কৃষ্ণমূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত হয়; মীরা তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। মূর্ত্তিমধ্যে মীরার প্রবেশ-মাত্র, মূর্ত্তি পূর্ব্বাকৃতি প্রাপ্ত হয়; কেহই আর মীরাবাইর সন্ধান পান না; মীরাবাই ভগবানে লীন হন। সেই হইতেই মীরার মাহাত্ম্য দিকে দিকে পরিকীর্ত্তিত। যে উদয়পুরে মীরা নির্য্যাতন-গ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই উদয়পুরে এখন রণছোড় কৃষ্ণমূর্ত্তির পার্শ্বে মীরাবাইর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূজিত হইয়া থাকে। স্বামী-নারায়ণ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি—উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের সংস্কার-সাধন জন্য স্বামী-নারায়ণ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি গোস্বামী মহারাজদিগের বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার দল-পুষ্ট করিয়াছিলেন। স্বামী-নারায়ণ সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যগণের প্রত্যেককে ছয় জন করিয়া নূতন শিষ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে, এইরূপ বিধি আছে। কাজেকাজেই এই সম্প্রদায়ের শিষ্য-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে অনূন দুই লক্ষ লোক স্বামী-নারায়ণের সম্প্রদায়ভুক্ত। লক্ষ্ণৌ সহরের ১২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, চাপাই গ্রামে, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে, স্বামী-নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম—সাহাজানন্দ। তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান। রামানন্দ স্বামী নামক জনৈক গুরুর নিকট জুনাগড়ে তিনি দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহম্মদাবাদের বার মাইল দক্ষিণস্থিত জেতালপুর—তাঁহার ধর্ম্মমত-প্রচারের কেন্দ্রস্থল। তৎকর্ত্তৃক ওয়ারতাল পল্লীতে লক্ষ্মী-নারায়ণের এবং রাধা-কৃষ্ণের নামে দুইটী মন্দির নির্ম্মিত হয়।

সনকাদি-সম্প্রদায়—নিমাবৎ বা নিমাৎ নামে প্রসিদ্ধ। নিম্বাদিত্য কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার আদি নাম—ভাস্করাচার্য্য। তিনি বৃন্দাবনের সন্নিকটে বসতি করিতেন। এক দিন তাঁহার গৃহে জনৈক দণ্ডী (জৈন সন্ন্যাসী বা যতি) অতিথি হইয়াছিলেন। সেই অতিথির সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে সারাদিন তাঁহার তর্ক-বিতর্ক চলে। তর্কের শেষ হয় না; কিন্তু দিবা অবসান প্রায় হয়। যিনি অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি রাত্রিকালে আতিথ্য-গ্রহণে পানাহারে অসম্মতি প্রকাশ করেন; বলেন,—'রাত্রিকালে পানাহার সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে।' অতিথি বিমুখ হইলে, ধর্ম্ম নষ্ট হইবে,—এই আশঙ্কায়, ভাস্করাচার্য্য বড়ই চিন্তান্বিত হন। নিকটে নিম্ববৃক্ষ ছিল; তিনি সূর্য্যদেবকে সেই বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলেন। যে পর্য্যন্ত অতিথির আহার না হয়, ভাস্করাচার্য্যের আদেশ সূর্য্যদেব সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অতিথির আহার সমাপন হইলে, ভাস্করাচার্য্যের অভিমত-ক্রমে, সূর্য্যদেব যথাস্থানে গমন করেন। ভাস্করাচার্য্যের আদেশে সূর্য্যদেব নিম্ববৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া ভাস্করাচার্য্য নিম্বাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায় কৃষ্ণ ও রাধাকে উপাস্য দেবতা বলিয়া মনে করেন। ভাগবত তাঁহাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ। তুলসী-মাল্য-ধারণ এবং গোপীচন্দন বা শ্বেত-মৃত্তিকার তিলক (মধ্য রেখা কৃষ্ণবর্ণ) ইঁহাদের পরিচয়-চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়। নিম্বাদিত্য বেদভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু এই

সনকাদি বা রামাবৎ সম্প্রদায়।

সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত। কথিত হয়, মোগল বাদসাহ আওরঙ্গজেব যখন মথুরা-নগর বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, সেই সময় তৎসমুদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কেশব ভট্ট এবং হরিব্যাস নামে নিম্বাদিত্যের দুই জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা 'বিরক্ত' ও 'গৃহস্থ' নামধেয় দুইটী বিভাগের সৃষ্টি করেন। হরিব্যাস নিম্বাদিত্যের গদী অধিকার করিয়াছিলেন। মথুরার সন্নিকটে যমুনার তীরে, ধ্রুবক্ষেত্র নামক স্থানে, সেই গদী প্রতিষ্ঠিত। গদীর মোহান্ত বলেন,—অন্যূন চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উত্তর-ভারতের বহু স্থানে, বিশেষতঃ মথুরার সন্নিকটে, এবং বঙ্গদেশে নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয়-নিশান উড্ডীন হইয়াছিল। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাস-প্রসঙ্গে সে পবিত্র কাহিনী সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া, যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, দেশের অধিকাংশ নরনারী এখন সেই বন্যায় ভাসমান। তিনি, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্য্যের সহযোগে, ভারতে যে ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, বঙ্গদেশের এক-তৃতীয়াংশ নরনারী এখন সেই মতের উপাসক। শ্রীচৈতন্য—ভগবানের অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার অংশ-মধ্যে পরিগণিত। জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীচৈতন্য যে পথ প্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ সরল, সুগম, প্রশস্ত পথ অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। চৈতন্যদেব শিখাইয়া গিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

আর শিখাইয়া গিয়াছেন,—প্রেমেই মুক্তি, প্রেমেই স্বর্গ, প্রেমেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি। শাস্ত্র-মতে প্রেমের যে পাঁচ ভাগ,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য—তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে মাধুর্য্য ভাব, শ্রীচৈতন্য সেই ভাবেই মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। সনকাদি যোগীন্দ্রগণ শান্ত-ভাবে উপাসনা করেন। সাধারণ ভক্তগণের দাস্যভাব। অর্জ্জুনাদি সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন। বাৎসল্য-ভাবে নন্দ-যশোদা, আর মাধুর্য্যভাবে শ্রীরাধিকা শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * রাধিকার ন্যায় মাধুর্য্য-ভাবে উপাসনার পথ প্রশস্ত করিবার জন্যই যেন চৈতন্যাবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য দেখাইয়া গিয়াছেন,—শ্রীরাধার ন্যায় সর্ব্ব সমর্পণ করিয়া যে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারে, সেই ধন্য, সেই দেববাঞ্ছিত পদ প্রাপ্ত হয়। নাম-সংকীর্ত্তন সেই মাধুর্য্য ভাব—শ্রেষ্ঠ প্রেমভাব—হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়; তাই শ্রীচৈতন্য পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন,—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য-লীলায়, সাধ্য-নির্ণয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। মহাপ্রভু

* বৈষ্ণব শাস্ত্র-মতে সেই ত্রিবিধ ভাবের পরিচয়,—

"শান্তভক্ত নব যোগীন্দ্র সনকাদি আর। দাস্যভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন। বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন॥
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ। মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥"

শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তরে সেখানে অল্প কথায় ধর্ম্ম-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর এবং রায় রামানন্দের সেই প্রশ্নোত্তর এই:—

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।।
প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর। রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্ব সাধ্যসার।।
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি সাধ্যসার।।
প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর। রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।।
প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর। রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার।।
প্রভু কহে এহো হয়, আগে কহ আর। রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।।
প্রভু কহে এহো হয়, আগে কহ আর। রায় কহে দাস্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।।
প্রভু কহে এহো হয়, আগে কহ আর। রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।।
প্রভু কহে এহোত্তম, আগে কহ আর। রায় কহে বাৎসল্য-প্রেমসর্ব্বসাধ্যসার।।
প্রভু কহে এহোত্তম, আগে কহ আর। রায় কহে কান্তভাব প্রেম সাধ্যসার।।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়।।
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে সর্ব্ব রসে। শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য মধুরেতে বৈসে।।
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে।।"

শান্ত-দাস্যাদি রস স্তরে স্তরে পরিপুষ্ট হইয়া মাধুর্য্য-রসে পরিণত হয়। রামানন্দ রায় পঞ্চতন্মাত্রের দৃষ্টান্তে তাহা বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন। এখানে সাঙ্খ্য-দর্শনের সৃষ্টি-তত্ত্বের কথা মনে আসিতে পারে। সাঙ্খ্য মতে, নিত্য পদার্থ পঞ্চতন্মাত্র;—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ। আকাশের গুণ—শব্দ; বায়ুর গুণ—স্পর্শ ও শব্দ (শব্দ আকাশ হইতে গৃহীত); তেজের গুণ—রূপ, শব্দ ও স্পর্শ (শব্দ ও স্পর্শ—আকাশ ও বায়ু হইতে গৃহীত); জলের গুণ—রস, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ (শব্দ আকাশ হইতে, স্পর্শ বায়ু হইতে, রূপ অগ্নি হইতে গৃহীত); ক্ষিতির গুণ—গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জল হইতে গৃহীত)। আকাশাদির গুণ পর পর ভূতে সংযুক্ত হইয়া পঞ্চতন্মাত্রের সমাবেশে যেমন তাহার চরম পরিণতি সাধিত হইয়াছে, মাধুর্য্যে সেইরূপ সকল রসের সমাবেশ আছে,—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের এবং রামানন্দের প্রশ্নোত্তরে তাহাই প্রতীত হয়। পণ্ডিতগণ তাই দেখাইয়াছেন,—শান্তরসে নিষ্ঠা; দাস্যরসে সেবা ও নিষ্ঠা; সখ্যরসে বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সেবা; বাৎসল্য-রসে পালন (মমতা), বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সেবা; এবং মধুর রসে আত্ম-সমর্পণ, মমতা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, সেবা। ফলতঃ, মাধুর্য্য-রসে সকল ভাবের পূর্ণ সমাবেশ। শ্রীচৈতন্য সেই মাধুর্য্য ভাবেরই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় অধুনা যে ভাবে যে কর্ম্মই করুন না কেন, শ্রীচৈতন্য অবতার মাধুর্য্য-ভাবে বিষ্ণুর বা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অলৌকিক শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাহিনী। শ্রীহট্টে জগন্নাথ মিশ্র নামে জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বসতি করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম—শচী দেবী। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পত্নী গঙ্গাতীরে বস-বাসের জন্য নবদ্বীপে আগমন করেন। নবদ্বীপে অবস্থিতি-কালে, ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে (১৪০৭ শকে) ফাল্গুন মাসে, পূর্ণিমার সান্ধ্য রজনীতে, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। তাঁহার জন্মকালে অনেক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ত্রয়োদশ

মাস গর্ভে অবস্থান করিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন; দ্বিতীয়তঃ; তাঁহার জন্মমুহূর্তে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে নবদ্বীপ মহামহোৎসবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। * শ্রীচৈতন্যের অসংখ্য নাম। তন্মধ্যে বিশ্বম্ভর, নিমাই, গৌরাঙ্গ এবং চৈতন্য নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। অন্নপ্রাশনের সময় তিথি-নক্ষত্র মিলাইয়া, তাঁহার যে রাশি-নাম হইয়াছিল,—সেই নাম বিশ্বম্ভর। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে,—"সর্ব্ব লোকের করিব ইহোঁ ধারণ পোষণ। বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার এই তো কারণ॥" শচীদেবীর কয়েকটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র ইহলীলা সম্বরণ করেন। সেই জন্য অদ্বৈতাচার্য্যের ভার্য্যা সীতাঠাকুরাণী শ্রীচৈতন্যকে নিমাই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে,—"ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই॥" শ্রীচৈতন্য উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন, এই জন্য তাঁহার নাম গৌরাঙ্গ বা গৌরহরি। সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে তিনি শ্রীচৈতন্য নামে অভিহিত হন। শ্রীচৈতন্যদেব আটচল্লিশ সৎসর ইহলোকে বিদ্যমান ছিলেন। সেই আটচল্লিশ বৎসরের স্থূল বিবরণ কৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে এইরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি। অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস। নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্ত্তন বিলাস।
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস। চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে। কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসাইলা সকলে॥"

শ্রীচৈতন্যের জন্মের অল্প দিন পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্যের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীচৈতন্যের বিবাহ হয়। চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি সংসারের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। সংসারাশ্রমে অবস্থান-কালে তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; বহু প্রকারে আপনার অমানুষিকী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের (১৪৩১ শকের) উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন তিনি কাটোয়ায় গমন করিয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ছয় বৎসর কাল মথুরা এবং জগন্নাথ তীর্থে অতিবাহিত করিয়া, তিনি আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বহু নরনারী তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত অবলম্বনে অগ্রসর হন। ছয় বৎসর নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, তিনি বার বৎসর নীলাচলে, জগন্নাথে, উপাসনায় ব্রতী ছিলেন। সেই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ বঙ্গদেশের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নেতৃস্থান প্রাপ্ত

* শ্রীচৈতন্যের জন্মকাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপে পরিবর্ণিত হইয়াছে,—

"চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন। পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণ॥
সিংহ-রাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ। ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন। সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন॥"

চূড়ামণি দাসের মতে দশ মাস গর্ভে থাকিয়াই শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হইয়াছিলেন এবং রূপ ও সনাতন মথুরা প্রদেশে শ্রীচৈতন্তের ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিলেন * এই সময়ে নানা দেশের পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্তের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে নীলাচলে গমন করিতেন। নীলাচলে অবস্থিতি-কালে, পুরোভাগে বারিনিধির বক্ষে গোপীগণ-পরিবৃত্ত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দরশন করিতে করিতে, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে (১৪৪৫ শকে) তাঁহার অন্তর্দ্ধান সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্ত, অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ 'প্রভু' বলিয়া পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ছয় জন গোস্বামীকে আপনাদের আদি-গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই ছয় জন গোস্বামীর নাম,—রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস এবং গোপাল ভট্ট। এতদ্ব্যতীত, শ্রীচৈতন্যের সম-সাময়িক এবং সহকারী বলিয়া শ্রীনিবাস, গদাধর পণ্ডিত, শ্রী-স্বরূপ, রামানন্দ এবং হরিদাস সম্মানিত আসন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়-কালে বৈষ্ণবগণের মধ্যে বহু মহাজনের আবির্ভাব হইয়াছিল। তৎকালে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়, ভারতবর্ষের সাহিত্যে তৎসমুদায় উচ্চ আসন লাভ করিয়া আছে। চৈতন্ত-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এখন অসংখ্য শাখা-উপশাখায় বিভক্ত। দ্বারকা, বৃন্দাবন এবং জগন্নাথে এই সম্প্রদায়ের কয়েকটী মন্দির আছে। সেই সকল দেবালয় ভক্ত-মাত্রেরই উপাসনার স্থান। এদিকে, বঙ্গদেশে, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্তের নামে, অম্বিকায় নিত্যানন্দের নামে এবং অগ্রদ্বীপে গোপীনাথের নামে যে মন্দিরত্রয় উৎসর্গীকৃত, কোন্ বৈষ্ণব না তাহার উদ্দেশে অভিবাদন করিয়া থাকেন?

চৈতন্ত-সম্প্রদায়ের শাখা উপশাখা।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু শাখা আছে। চৈতন্ত-সম্প্রদায় হইতে স্পষ্টদায়ক, বাউল, ন্যাড়া, সহজী, গৌরবাদী, দরবেশ, সৎনাম, সাঁই, কর্ত্তাভজা, আউল, খুসী-বিশ্বাসী প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। স্পষ্টদায়কগণ গুরুকেই সর্ব্বে সর্ব্বা বলিয়া বিশ্বাস করেন। কর্ত্তাভজাদিগেরও প্রায় সেই মত। ২৪-পরগণা জেলায় ঘোষপাড়ায় রামশরণ পাল নামে এক সদ্গোপ কর্ত্তা-ভজা-সম্প্রদায়ের মত প্রচার করেন। কিংবদন্তী এই,—আউলে নামক জনৈক উদাসীন এই মতের প্রবর্ত্তক। রামশরণ তাঁহারই নিকট এই ধর্ম্মমত প্রচারের উপদেশ পাইয়া-ছিলেন। ইঁহাদের গুরুগণ 'মহাশয়' নামে পরিচিত। বৈষ্ণবগণের নিকট যেমন মহাপ্রভু

* পরম কৃষ্ণভক্ত অদ্বৈতাচার্য্য নদীয়া জেলার শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। চৈতন্তের জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ সেই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন। অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্ত-দেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সংসার-ত্যাগী হন। নিত্যানন্দ—শ্রীচৈতন্তের অন্যতম সহচর তিনি বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করিলে, তিনি নবদ্বীপে আগমন পূর্ব্বক, পুত্র-শোকাতুরা শচীদেবীকে মাতৃ-সম্বোধনে তাঁহার পুত্রশোক নিবারণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য এবং নিত্যানন্দ হরিভক্তগণের অগ্রণী। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার নিত্যানন্দকে বলরাম এবং চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। দুই জনে যেন দুইটী ছোট বড় ভাই ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তিতে তাহাই মনে হয়,—"অতএব প্রভুর তেঁহ হইল বড় ভাই। কৃষ্ণ-বলরাম দুই চৈতন্য নিতাই।" তবে চৈতন্য-চরিতামৃতের ঐ উক্তির সহিত উহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উক্তির সামঞ্জস্ত রাখিয়া পাঠ করিলে, বিশ্বরূপ যে নিতাই নামে পরিচিত ছিলেন, তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের নিকট সেইরূপ মন্ত্রদাতা 'মহাশয়' সম্পূজিত হন। এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস—গুরুই পরম পুরুষ; মানুষ-গুরুতে এবং পরমেশ্বরে কোনই প্রভেদ নাই। ঘোষপাড়ায় এই সম্প্রদায়ের গদী আছে। রামশরণের উত্তরাধিকারিগণ গুরুপদে অভিষিক্ত। নানা স্থানের নর-নারী তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের আদর্শে রামবল্লভী, সাহেবধনী প্রভৃতি কয়েকটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। গৌরবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা গৌরাঙ্গকে উচ্চ আসন প্রদান করিয়া থাকেন। সৎনামী-সম্প্রদায় পরমেশ্বরকে সৎনাম বলিয়া পূজা করেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। ইঁহাদের গৃহিগণ রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত। নেপাল, মূলতান এবং অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে এই সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ইঁহারা হনুমানজীউর, সত্যপুরুষের এবং অজরের ব্রত করিয়া থাকেন। নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র কর্ত্তৃক ন্যাড়া-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহাদের মতে, রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মানব-দেহেই বিদ্যমান। দরবেশ ও সাঁইগণ হিন্দু-মুসলমান উভয়কে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম-সঙ্গীতে 'আল্লা' ও 'গৌরাঙ্গ' উভয়ের মাহাত্ম্য পরিকর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইঁহাদিগকে দেখিলে মুসলমান বলিয়াই মনে হয়। বৃন্দাবনে রাধাবল্লভী-সম্প্রদায় নামে এক বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছেন। তাঁহাদের মতে, শ্রীরাধার উপাসনাই সার উপাসনা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতানুসারে তাঁহারা রাধাকে ইচ্ছাশক্তি বা প্রকৃতি বলিয়া পূজা করেন। হরিবংশ নামক জনৈক গোস্বামী কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে হরিবংশ বৃন্দাবনে শ্রীরাধাবল্লভ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা আজিও বিদ্যমান আছে। সখীভাবক-সম্প্রদায় এই রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়েরই শাখা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করেন। জয়পুরে তাঁহাদিগের প্রধান আড্ডা। বারাণসীতে এবং বঙ্গদেশে এই সম্প্রদায়-ভুক্ত দুই চারি জন বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী এবং আপনাদিগকে সখী বলিয়া মনে করায়, ইঁহারা সখীভাবক নামে পরিচিত। চরণদাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় চরণদাসী নামে প্রসিদ্ধ। দিল্লী সহর ইঁহাদের আদি-স্থান। দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকালে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। তুলসী বা শালগ্রাম-শীলা ইঁহাদের উপাসনার সামগ্রী নহে। এ সকল ভিন্ন হরিনন্দী, সাধনপন্থী, মাধবী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, নাগা—বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আরও অনেক সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। রামবল্লভী, জগন্মোহিনী, হরিবোলা, রাতভিখারী, বলরামী, সাধ্বিনী বিন্দুধারী, অতিবড়ী, কবিরাজী, সৎকুলী, অনন্তকুলী, যোগী, গিরি, গুরুবাসী, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, খণ্ডিত-বৈষ্ণব, গোপ-বৈষ্ণব, কারণ-বৈষ্ণব, বিন্দুকত, অভ্যাহত, নিহঙ্গ, কালিন্দী, বড়গল, ডিঙ্গল, বিখল, ভক্ত, মার্গী, অপাপন্থী, পল্টুদাসী চুহড়পন্থী, কুড়াপন্থী, হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, পঞ্চধুনী, বৈষ্ণব-তপস্বী,—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংখ্যা নির্দ্দেশ করাই সুকঠিন। মূলে বিষ্ণুর উপাসনা; কিন্তু সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরিচিত হইয়াছেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাক্ত ও শৈব।

[শাক্ত-সম্প্রদায়,—শক্তির উপাসনা কত কাল প্রচলিত,—শক্তি-উপাসনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য ;—শাক্তগণের উপাস্য দেবতা,—দুর্গা, কালী ও দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি ;—কালী ও কৃষ্ণ,—বলিদান ও তাহার নিগূঢ় অর্থ ;—শৈব-সম্প্রদায়,—শিবোপাসনা কত কাল প্রচলিত,—লিঙ্গ ও শিব-মূর্ত্তির পূজা,—শাস্ত্রমতে লিঙ্গ-পূজার তাৎপর্য্য ;—শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য,—শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শৈব-ধর্ম্ম,—চারিটী প্রসিদ্ধ মঠ ;—শিবোপাসক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়াদির বিবরণ ;—কোন্ পীঠস্থানে দেবী ও মহেশ্বর কি ভাবে বিরাজমান।]

শক্তির উপাসকগণ শাক্ত নামে পরিচিত। যিনি শক্তিরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"—সংসারে কে না তাঁহার উপাসনা করেন? যিনি যে নামে যে ভাবেই ভগবানের উপাসনা করুন না কেন, সকলেই কোনও-না-কোনও প্রকারে শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে শক্তি নানা নামে নানা সংজ্ঞায় পরিচিত। তিনিই সাত্বিকী, রাজসী, তামসী; তিনিই গৌরী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী; তিনিই ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, মহেশ্বরী; তিনিই সাবিত্রী, প্রকৃতি, সরস্বতী; তিনিই দুর্গা, কালী, তারা, মহাবিদ্যা, ভুবনেশ্বরী। তাঁহার কি নাম-রূপের পরিসীমা আছে? শক্তি-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে তাই মহাদেব বলিতেছেন,—

শক্তি-উপাসক শাক্ত।

"শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ। শক্তি যুক্তো যদা দেবী শিবোঽহং সর্ব্বকামদঃ॥
শক্তিযুক্তং জপেন্মন্ত্রং ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ। সাবিত্রী সহিতো ব্রহ্মা সিদ্ধোঽভূন্নগনন্দিনি॥
দ্বারবত্যাং কৃষ্ণদেবঃ সিদ্ধোঽভূত সত্যয়া সহ। ঈশ্বরোঽহং মহাদেবী কেবলং শক্তিযোগতঃ॥"

বেদ, পুরাণ—সর্ব্ব-শাস্ত্রেই শক্তির প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত। শক্তি-মাহাত্ম্য ও শক্তির প্রাধান্য-কীর্ত্তন—পঞ্চম-বেদ আগম-শাস্ত্রের সারভূত। শক্তির উপাসনা সৃষ্টির আদি-কাল হইতে বিদ্যমান। তন্ত্র-শাস্ত্রে প্রকাশ—'শক্তিসেবক-গণই দ্বিজপদ-বাচ্য; গায়ত্রী-মন্ত্র শক্তির উদ্দেশ্যেই প্রযোজিত।' শাস্ত্রে প্রায় সর্ব্বত্রই শক্তিকে পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে, প্রকৃতি-খণ্ডে, নারদের প্রশ্নের উত্তরে, নারায়ণ সেই তত্ত্ব এইরূপভাবে বিবৃত করিয়াছেন,—"নারদ কহিলেন, সৃষ্টি-কার্য্যে দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী এই পঞ্চ প্রকার প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠা সেই প্রকৃতি আবির্ভূতা হইলেন কেন? তাঁহার লক্ষণ কি এবং কেনই বা তিনি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইলেন? নারায়ণ তাহাতে উত্তর দেন,—"প্র শব্দে প্রকৃষ্টার্থ বুঝায় এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি। অতএব সৃষ্টি-কার্য্যে যিনি প্রকৃষ্টা, তিনিই প্রকৃতি দেবী। শ্রুতিতে প্র শব্দে প্রকৃষ্ট সত্ত্ব গুণ, কৃ শব্দে রজোগুণ এবং তি শব্দে তমোগুণ—এইরূপ কথিত আছে। তাহা যিনি ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বশক্তিসম্পন্না এবং সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রধানা, তাঁহাকেই প্রকৃতি বলে। প্র শব্দের অর্থ প্রথম এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি। অতএব যিনি সৃষ্টির আদিভূতা, তিনিই প্রকৃতি।" পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তরে উপলব্ধি হয়,—পরব্রহ্ম মূল-প্রকৃতি নামে অভিহিত এবং তিনিই দুর্গাদি পঞ্চ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। নারায়ণের উত্তরের অন্যত্র আবার

দেখিতে পাই,—'প্রধান পুরুষ পরমাত্মা যোগের দ্বারা স্বয়ং দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার অঙ্গের দক্ষিণ ভাগ পুরুষ এবং বামভাগ প্রকৃতি স্বরূপ হইল।' সামবেদেও প্রকৃতি পুরুষের এই অবস্থা পরিবর্ণিত। সামবেদে আছে,—তিনি জগৎ-সৃষ্টির অভিলাষী হইয়া, আপনি পুরুষ-প্রকৃতিরূপে দ্বিধা বিভক্ত হন এবং তাহা হইতেই সংসার উৎপন্ন হয়।' ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেও ঐ ভাবের একটী-সূক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে, বুঝিতে পারা যায়, কেবল নাম-রূপের প্রভেদ; নচেৎ, যিনি পরব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তিনিই মূলা প্রকৃতি, তিনিই শক্তি, তিনিই দুর্গা, কালী, রাধা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী প্রভৃতি। তন্ত্র-শাস্ত্রে শক্তি উপাসনার তত্ত্ব বিশেষভাবে পরিবর্ণিত আছে। অধিকারি-ভেদে যাহার যেরূপ উপাসনা শ্রেয়ঃ, তন্ত্র-শাস্ত্র তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আচার-তত্ত্ব এবং ভাব-তত্ত্ব উপলব্ধি হইলে, তদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তন্ত্রমতে আচার নববিধ (মতান্তরে সপ্তবিধ)। কৌলাচার—আচার-সমূহের প্রকৃষ্ট স্তর মধ্যে পরিগণিত। কৌলাচারের—

"দিক্কালনিয়মো নাস্তি তীর্থাদি নিয়মো ন চ। নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্যসাধনে॥
কচিৎ শিষ্টঃ কচিৎ ভ্রষ্টঃ কচিৎ ভূতপিশাচবৎ। নানাবেশধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্ন মিত্রেশত্রৌ তথা প্রিয়ে। শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে॥
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিত।"

অর্থাৎ,—'হে দেবেশি! যাঁহাদের দিক্কালের নিয়ম নাই, তির্থাদির নিয়ম নাই, মহামন্ত্র সাধনের নিয়ম নাই; যাঁহারা কখনও শিষ্ট, কখনও ভ্রষ্ট, কখনও ভূত-পিশাচবৎ; যাঁহারা নানা বেশ ধারণ করিয়া মহীতলে বিচরণ করেন, হে প্রিয়ে! কর্দ্দমে ও চন্দনে যাঁহাদের ভেদ জ্ঞান নাই; শত্রু-মিত্রে, শ্মশানে-ভবনে, স্বর্ণে ও তৃণে যাঁহাদের অভেদ ভাব; তাঁহারাই কৌলাচারী।' সাধক কোন্ অবস্থায় উপনীত হইলে, কৌলাচারী হন, উপরোদ্ধৃত তন্ত্রোক্তিতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিরূপভাবে ঐ অবস্থায় সাধক উপনীত হইতে পারেন, অন্যান্য আচারের বিহিত-কার্য্য-কলাপের পরিচয়ে তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। তন্ত্রে যে ভাবত্রয়ের বিষয় উক্ত হইয়াছে, সেই ভাবত্রয়ের নাম—দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাব। ঐ তিন ভাবকে জীবনের তিনটী স্তর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। দিব্য ভাবে সাধক ভাবিতেছেন,—"বিশ্বঞ্চ দেবতারূপম্;" দেখিতেছেন,—স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং পুরুষং শিবরূপিণম্।" ফলতঃ, সর্ব্ববিষয়ে যাঁহারা ভেদবুদ্ধি রহিত, তিনিই দেবভাব সম্পন্ন,—"অভেদে চিন্তয়েদ্ যস্তু স এব দেবতাত্মকঃ।"

দুর্গা, কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি শাক্তগণের উপাস্য দেবতা। কত কাল হইতে ইহাঁদের উপাসনা এদেশে প্রচলিত আছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

শাক্তে উপাস্য দেবতা।

পুরাণে দেখিতে পাই,—সাবর্ণি মন্বন্তরে সুরথ রাজা প্রথমে দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। তার পর, ত্রেতাযুগে রাবণ-বধের জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার অর্চ্চনা করেন। মঙ্গল নামা জনৈক নৃপতি লক্ষ্মীর পূজা করিয়াছিলেন; তার পর ত্রিভুবনে দেবমানব সকলেই লক্ষ্মীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। সরস্বতী দেবীর পূজা প্রথমে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে দেবমানব সকলেই তাঁহার পূ-

করিতেছেন। মহিষাসুর বধের পর শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেবতাগণ ভগবতীর সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছিলেন। দৈত্যদিগের উৎপীড়ন হইতে দেবতাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবতী কালী-মূর্ত্তি ধারণ করেন। সেই হইতেই কালী-মূর্ত্তির পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত। কিন্তু এ সকল কত কালের ঘটনা, কে নির্ণয় করিতে পারেন? মন্বন্তরের পরিবর্ত্তনে, যুগে যুগে, মন্বন্তরে, মন্বন্তরে, ভগবতীর এবম্বিধ আবির্ভাব কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন্ দিন হইতে এই উপাসনার প্রবর্ত্তনা হইয়াছে, কেহই তাহা বলিতে পারিবেন না। দুর্গারূপে দেবীর পূজার প্রসঙ্গ, মার্কণ্ডেয় পুরাণে, দেবী-ভাগবতে, দেবী-পুরাণে, কালিকাপুরাণে, কাশীখণ্ডে পরিবর্ণিত রহিয়াছে। দুর্গার সহস্র নাম। তাঁহার সকল নাম সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়ার আশা করা যায় না। যাঁহারা ঋগ্বেদাদিতে দুর্গা নাম নাই বলিয়া দুর্গা পূজাকে আধুনিক বলেন, তাঁহারা যদি দেবীর অন্যান্য নামের সন্ধান লন, তাঁহাদের ভ্রম বিদূরিত হইতে পারে। শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা নাম দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, উমা ও হৈমবতী নাম লিখিত আছে, নারায়ণ উপনিষদে দুর্গা-গায়ত্রীতে দুর্গা নাম স্পষ্টতঃ উল্লিখিত। দুর্গা নামে নানা অর্থ সূচিত হয়। দুর্গা (দুর্গ বা দুর্গম) নামক অসুরকে বধ করিয়া দেবীর দুর্গা নাম হইয়াছিল; দেবগণের শত্রুশঙ্কট দূর করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি দুর্গা নামে অভিহিত হন; দুর্গা নাম জপ করিলে, জীবের দুর্গতি দূর হয়—এই জন্য দুর্গা নাম হইয়াছে; ইত্যাদি। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—দুর্গাপূজা হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য! আলস্য বা মোহবশে এ পূজা না করিলে, সকলকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। যে রূপে দুর্গার পূজা হয়, ধ্যানে সেই রূপ ও মহিমার বিষয় পরিব্যক্ত রহিয়াছে। সেই ধ্যান,—

"জটাজূট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং। লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং। নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাং। ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং॥
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাং। ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ। খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ। অধস্তান্মহিষং তদ্বচ্ছিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনং। হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং॥
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং। বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননাং॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া। বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতং। কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামাঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং। প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাং॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা॥
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা। আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং॥
চিন্তয়েৎ সততং দুর্গাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং॥"

চণ্ডবধ-কালে দেবী কালিকা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন। তিনি দশমহাবিদ্যার আদিভূতা। কালী, তারা, মহাবিদ্যা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশ মূর্ত্তিতে মহামায়া দশ দিকে প্রকাশমানা হইয়াছিলেন।

দেবীর দশমহাবিদ্যা মূর্ত্তি ধারণ সম্বন্ধে তন্ত্র-শাস্ত্রে নানা মত দৃষ্ট হয়। কিন্তু মহাভাগবত পুরাণে প্রকাশ,—'দক্ষযজ্ঞে সতী গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মহাদেব নিষেধ করেন। দেবী তখন দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ করিয়া দশ দিকে দশ মূর্ত্তিতে মহাদেবকে ভীতি-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তন্ত্র-মতে দশমহাবিদ্যাই দশাবতার-রূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর পাপভার লাঘব করিয়াছিলেন। তন্ত্র-শাস্ত্রে মহাদেব বলিতেছেন,—

"তারাদেবী মীনরূপা বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিকা। ধূমাবতী বরাহ স্যাৎ ছিন্নমস্তা নৃসিংহিকা॥
ভুবনেশ্বরী বামনঃ স্যান্মাতঙ্গী রামমূর্ত্তিকা। ত্রিপুরা জামদগ্ন্যঃ স্যাদ্বলভদ্রশ্চ ভৈরবী॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেদ্বুদ্ধ দুর্গাস্যাৎ কল্কিরূপিণী। স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমূর্ত্তিসমুদ্ভবা॥
ইতি তে কথিতং দেব্যবতারং দশমেব হি। এতাষাং পূজনাদ্দেবি মহাদেব সম ভবেৎ॥"

সেই একত্ব, সেই অভিন্নত্ব, এখানেও প্রকটিত। বৈষ্ণব যাঁহার কৃষ্ণ রূপ দেখিয়া বিভোর হইয়াছেন, শাক্ত তাঁহার কালীরূপে মুগ্ধ হইয়া আছেন। গোকুলে শ্রীরাধার লজ্জাপবাদ নিবারণ জন্য কৃষ্ণ কালীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যিনিই কালী, তিনিই কৃষ্ণ—সাধক এই ভাবেই তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন। চণ্ডীতে কালীর মূর্ত্তি যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বত্রাসকারিণী সংহারিণী মূর্ত্তিই প্রকটিত,—

"কালীকরালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী, বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। অতিবিস্তারবদনা, জিহ্বাললনভীষণা॥
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥"

এখন সর্ব্বত্র যে এই মূর্ত্তিরই আরাধনা হয়, তাহা নহে। সাধক যখন যে ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তন্ত্র-শাস্ত্রে তাঁহার সেইরূপ রূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাই চণ্ডী-বর্ণিত কালী মূর্ত্তির সহিত শবাসনা শ্যামা মূর্ত্তির পার্থক্য দেখিতে পাই। শাক্তগণের মধ্যে যে বিভাগ দৃষ্ট হয়, তাহাকে আচারগত বিভাগ বলা যাইতে পারে; যেমন—দাক্ষিণাচারী, বামাচারী ইত্যাদি। বলি-প্রথার পার্থক্য-হেতু কোথাও কোথাও বামাচারী এবং দাক্ষিণাচারী সম্প্রদায়ের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাচারী সম্প্রদায় রক্তপাতে জীব-বলিদানের পক্ষপতী নহেন। বামাচারিগণের পূজায় জীব-বলির প্রশস্ততা দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ-ভারতে কাঞ্চুলীয় নামধেয় এক শ্রেণীর শাক্ত আছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও আচার-ব্যবহার বিকৃত হইলেও, মূল লক্ষ বামাচারী বা কৌলাচারীদিগের অনুরূপ বলিয়াই প্রতীত হয়। কারারী নামধেয় আর এক সম্প্রদায়-ভুক্ত শাক্তগণের বিদ্যমানতার বিষয় গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই। তাঁহারা 'অঘোরঘণ্ট' বা কাপালিক নামেও পরিচিত। অনেকে বলেন,—সাত শত বা আট শত বৎসর পূর্ব্বে কালী, চামুণ্ডা এবং ছিন্নমস্তা প্রভৃতির নিকট তাঁহারা নরবলি প্রদান করিতেন। শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থে কাপালিকগণ উচ্ছিষ্ট-গণপতি বা হৈড়ম্ব সম্প্রদায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহাদের বহু অপকীর্ত্তির কথা নানা রূপে অধুনা প্রচারিত হইয়া থাকে। হইতে পারে, কোনও সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তি বা কোনও শাখা কখনও উচ্ছৃঙ্খল বা ব্যভিচার-দোষগ্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইলেও কোনও সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ কখনও কলুষিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। বলিদান বা রক্তপাতের জন্য বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় যে শাক্তগণের নিন্দাপবাদ ঘোষণা করেন, তদ্বিষয়ে

শাক্তগণের মধ্যেও দুই মত প্রচলিত। এক মতে—জগন্মাতার নিকট দেহ দান করিলে মোক্ষলাভ হয়; অপর মতে—সে বলি পার্থিব শরীর বলি নহে; সে বলির অর্থ—কাম-ক্রোধাদি রিপুর বলিদান। শাস্ত্রে সকল ভাব, সকল কথাই আছে। উপযুক্ত গুরুর নিকট উপযুক্ত অধিকারী হইয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, সকল তত্ত্বই অধিগত হইতে পারে।

শিবের উপাসকগণ শৈব। শিবের উপাসনাও আবহমান-কাল প্রচলিত। বেদে, উপনিষদে, তন্ত্রে, পুরাণে—শিবোপাসনার মাহাত্ম্য কোথায় না পরিকীর্ত্তিত? সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য্যে পরব্রহ্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বর-রূপে পৃথিবীতে প্রকাশমান। সৃষ্টির সহিত সংহারের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। সুতরাং সৃষ্টি যত কাল, সৃষ্টি-কর্ত্তার পূজা যত কাল, সংহার-কর্ত্তা রুদ্রের উপাসনাও তত কাল প্রচলিত।

শিবোপাসক শৈব।

শাস্ত্র বলেন,—'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সে কেবল নামভেদ; নচেৎ, যিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর। এক এক কার্য্যে তিনি এক এক রূপে প্রকাশমান। নচেৎ—"ন ব্রহ্মা ভবতু ভিন্ন ন শম্ভুর্ব্রহ্মণস্তথা। ন চাহং যুবয়োর্ভিন্নো হ্যভিন্নত্বং সনাতনম্॥" তিনি শম্ভু নামে রুদ্র নামে, মহাদেব নামে প্রভৃতি সহস্র সহস্র নামে সম্পূজিত হইয়া থাকেন। প্রধানতঃ দ্বিবিধ মূর্ত্তিতে তিনি পূজা প্রাপ্ত হন;—(১) লিঙ্গ মূর্ত্তিতে, (২) শিব-রূপে। লিঙ্গ-মূর্ত্তি নানা সম্প্রদায়ে নানা প্রকারে প্রচলিত। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ লিঙ্গ-মূর্ত্তির লক্ষণ কীর্ত্তিত আছে। লিঙ্গ শব্দের অর্থও নানা শাস্ত্রে নানারূপ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে যথা,—

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবীতস্য পীঠিকা। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

এতদর্থে, বিশ্ব-সংসার লিঙ্গ-রূপে অবস্থিত। লিঙ্গ-পূজায় সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরেরই পূজা বুঝায় না কি? যাঁহারা শিব-মূর্ত্তি বা লিঙ্গ-মূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারা সেই বিশ্ব-পতিরই পূজা করিয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদের 'শতরুদ্রীয়' উপাসনায় রুদ্র বা মহাদেবের শত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি সংহার-কর্ত্তা, তিনি মুক্তিদাতা, তিনি ক্ষুদ্র, তিনি বৃহৎ, তিনি ভক্তের রক্ষক, তিনি পতিতের উদ্ধার-কর্ত্তা। তাঁহার বেশভূষা এবং সাঙ্গোপাঙ্গ প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, মনে হয়—তাঁহার ন্যায় অধমতারণ অন্য আর কে আছেন! ঋগ্বেদে যে রুদ্রের মহিমা ও উপাসনা দেখিতে পাই, সেখানেও তিনি সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধকারী, সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত এবং অতি মহান্ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। রামায়ণে এবং মহাভারতে শিবের মহিমা নানারূপে প্রকটিত। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি—বিষ্ণুর মহিমা-প্রকাশক পুরাণ চারি খানি; ব্রহ্মার মহিমা-প্রকাশক পুরাণ দুই খানি (পদ্ম ও ব্রহ্মপুরাণ); অগ্নিপুরাণে অগ্নির এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সূর্য্যদেবের মহিমা প্রকটিত আছে। কিন্তু অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে শিব-মহিমা-প্রকাশক পুরাণের সংখ্যা দশ খানি,—শিবপুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, বামনপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এক বাক্যে স্বীকার করেন, শিবের উপাসনা অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। এক এক সময়ে এক এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাবে এক এক ধর্ম্মমত যেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, শিবোপাসকগণের মধ্যে সেরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

শঙ্করাচার্য্য।—শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য—বেদবিহিত ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদে বেদবিহিত ধর্ম্ম যখন লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল, শঙ্করাচার্য্য সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে অনেক মতান্তর আছে। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত-মতে, ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। এদিকে তাঁহার কোষ্ঠী প্রভৃতির বিচার করিয়া অনেকে তাঁহার জন্মকাল ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধেও দুই মত প্রচলিত। এক মতে,—তিনি মালবর উপকূলে কেরল দেশে, জন্মগ্রহণ করেন। অন্য মতে,—মাদ্রাজের দক্ষিণস্থিত আর্কট জেলার অন্তর্গত চিদাম্বরম গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। শঙ্করাচার্য্য বত্রিশ বৎসর মাত্র ইহলোকে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই অল্প দিনের মধ্যেই তিনি জগতে আপনার অক্ষয় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। শঙ্কর-চরিত, শঙ্কর-কথা, শঙ্কর-দিগ্বিজয় এবং কেরলোৎপত্তি প্রভৃতি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের জীবন-কাহিনী পরিবর্ণিত আছে। তাঁহার শিষ্য আনন্দগিরি এবং বিজয়-নগরের রাজার মন্ত্রী মাধবাচার্য তাঁহার যে জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন (শঙ্কর-দিগ্বিজয় এবং সংক্ষেপশঙ্করজয় নামক গ্রন্থদ্বয়), শঙ্করের জীবনচরিত সম্বন্ধে সেই দুই খানিই প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। শঙ্করাচার্য্য নাম্বুরী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মাধবাচার্য্যের 'শঙ্করজয়' গ্রন্থের মতে, শঙ্করাচার্য্যের পিতার নাম শিবগুরু এবং মাতার নাম শচীদেবী। শৈশবেই শঙ্করের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। অলৌকিক প্রতিভা প্রভাবে, অসাধারণ মেধা বলে, শৈশবেই তিনি সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। পঞ্চম বর্ষ বয়সে শঙ্করের উপনয়ন হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই তিনি দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রীয় তর্কে মুগ্ধ করিতে থাকেন। শৈশবে শঙ্করের পিতৃবিয়োগ হয়; তাঁহার জ্ঞাতিগণ তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি নানারূপ নির্য্যাতন আরম্ভ করেন। জ্ঞাতিগণের অসদাচরণে, মনের দুঃখে, শঙ্করাচার্য্য কিছুদিনের জন্য দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার জননী কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়িনী হন। প্রবাসে অবস্থিতি-কালে জননীর পীড়ার সংবাদ অবগত হইয়া শঙ্করাচার্য্য একবার গৃহে ফিরিয়া আসেন; গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিতে পান—জননী আসন্ন-মৃত্যুশয্যাশায়িনী; আত্মীয়-স্বজন কেহ একবার তাঁহার প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। সেই অবস্থায়, শঙ্কর-জননী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তখনও গ্রামস্থ জনপ্রাণী শঙ্করের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। শঙ্কর একাকী গৃহ-প্রাঙ্গনেই জননীর সৎকার-কার্য্য সমাপন করিতে বাধ্য হইলেন। শঙ্কর জননীর সৎকার বিষয়ে এই-রূপ কিংবদন্তী আছে,—ব্রাহ্মণগণ কেহই যখন শঙ্করের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না, জ্ঞাতিগণ যখন মুখাগ্নির জন্য তাঁহাকে অগ্নিদানেও কুণ্ঠিত হইলেন, শঙ্করাচার্য্য তখন আপনার বাহুমূল হইতে অগ্নি উৎপাদন করিলেন এবং আপনার গৃহ-প্রাঙ্গনেই শবদেহ ভস্মীভূত করিয়া অভিশাপ দিলেন,—'এ দেশের ব্রাহ্মণগণ কদাচ আর বেদ-পাঠে

শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য।

সমর্থ হইবেন না; এ দেশে সন্ন্যাসিগণের ভিক্ষা মিলিবে না; সন্ন্যাসী অতিথিগণ এ দেশের প্রতি বিমুখ হইবেন; মৃতদেহ লোকের আপনাপন গৃহ-প্রাঙ্গনেই ভস্মীভূত হইবে।' শঙ্করের এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্ত্তিকালে সফল হইয়াছিল বলিয়াই জানিতে পারা যায়। জননীর সৎকার-কার্য্য সমাপন হইলে শঙ্করাচার্য্য চিরতরে জননী জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কুজ্ঝটিকা-জালে হিন্দু-সমাজ সমাচ্ছন্ন। কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল,—শঙ্কর! ঐ কুজ্ঝটিকা অপসৃত কর। বৈদিক-ধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতিতে দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত হউক।' শঙ্করাচার্য্য তাহাতে বৈদিক-ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার-মানসে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নানা স্থানে নানা সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। তিনি বেদান্ত-ভাষ্য, গীতাভাষ্য, মোহমুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া, বৈদিক-ধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার জ্ঞান-সূর্য্যের উজ্জ্বল-দীপ্তি প্রভাবে জীবের অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা দূরীভূত হইতে লাগিল। যাঁহারা জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইতে চাহিলেন, তাঁহারা তাঁহার বেদান্ত-ব্যাখ্যার 'সোঽহং' তত্ত্বে সে পথ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। * যাঁহারা কর্ম্মমার্গ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাঁহারা 'শঙ্করঃ শিবোঽহয়ং' বলিয়া শঙ্করের চরণতলে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। শঙ্কর—শিবের অবতার বলিয়া পরিচিত হইলেন। দেশ দেশে গ্রামে গ্রামে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের যে ঝঞ্ঝাবাতে হিন্দু-ধর্ম্মের সুরম্য সৌধ একবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সে ঝঞ্ঝাবাত প্রশমিত হইল; অট্টালিকার ভিত্তিভূমি দৃঢ় দৃঢ়তর হইয়া দাঁড়াইল। আজি যে ভারতবর্ষের দিকে দিকে 'জয় শিব-শঙ্কর'-ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে, আজি যে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত শিব নামে মাতিয়া উঠিয়াছে, শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যই তাহার মূলাধার। শৈব-ধর্ম্মের বিজয়-নিশান-স্বরূপ তিনি ভারতবর্ষের চারি প্রান্তে চারিটী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই চারিটী মঠ আজিও সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। ঐ যে উত্তরে হিমগিরি-শিরে বদরিকাশ্রমে যোশি মঠ, ঐ যে পশ্চিমে মহাসমুদ্র-কূলে দ্বারকাধামে সারদা মঠ, ঐ যে দাক্ষিণাত্যে ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তে শৃঙ্গেরি মঠ, আর ঐ যে পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধন মঠ,—শঙ্করাচার্য্যের কীর্ত্তির স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। প্রায় দ্বাদশ শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, শঙ্করাচার্য্য ঐ সকল মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু পরিবর্ত্তনের সহস্র প্রবাহের মধ্যেও, ধর্ম্ম-বিপ্লবের শত ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও, তাহাদের উন্নত শির আজিও আকাশ চুম্বন করিয়া আছে। সত্য সত্যই শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাই আজিও তাঁহার নামে মানবের হৃদয়ে আনন্দের ও ভক্তির প্রবাহ প্রবহমান। অনেকে বলেন,—'শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্যেই আপনার প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন; আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার প্রভাব তাদৃশ বিস্তৃত হয় নাই।' কিন্তু সে কথা স্বীকার করিতে পারি না। ভারতবর্ষের কোথায় শৈব মত প্রচলিত নাই? বারাণসী-ধামে বিশ্বেশ্বরের উপাসনায় কোন্

* শঙ্করাচার্য্যের ধর্ম্মমত তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে বিশদ প্রকটিত। সে মতের আভাস বেদান্ত-দর্শন প্রসঙ্গে (পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১১৭—১৩১শ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।

হিন্দুর প্রাণ উন্মত্ত নহে? যেখানে শক্তি, সেখানেই শিব। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া, তাঁহার দেহাংশ যে যে প্রদেশে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান পীঠস্থান নামে অভিহিত হয়। দেবী সেই সেই স্থানে বিদ্যমান আছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব-রূপে শিবও সেই সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। সেই সকল পীঠস্থানের বিষয় আলোচনা করিলে, ভারতবর্ষের কোথায় যে শাক্ত-মত ও শৈব-মত প্রচলিত নাই, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ফলতঃ শাক্ত ও শৈব ভারতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। শঙ্করাচার্য্য শৈব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রধানতঃ পরিচিত। কিন্তু একটু বিশেষ-ভাবে দেখিতে গেলে, তাঁহাকে শৈব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা না বলিয়া, হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তিনি যে কেবল শৈব মত সংস্থাপনের জন্যই প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—তিনি যে কেবল শিবের উপাসনা বিষয়েই হিন্দু সমাজকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে; শিব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণপতি সকলেরই পূজা-মাহাত্ম্য তৎকর্ত্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার বেদান্ত-মত একেশ্বরবাদ-মূলক। প্রকৃতির সাহায্যে পরব্রহ্ম বিশ্বরূপে প্রকাশমান, ইহাই তাঁহার ধর্ম্মমতের মূল ভিত্ত বটে; কিন্তু তিনি কখনও দেব-দেবীর উপাসনায় কাহাকেও বিরত করেন নাই। তিনি কিংবা তাঁহার শিষ্যগণ, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধ-পরিকর হইয়া, কোথাও শিবোপাসনার মাহাত্ম্য-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন; কোথাও বা শক্তি-উপাসনার বীজমন্ত্র জনসাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থে শঙ্করের শিষ্য আনন্দ-গিরি গুরুদেবের যে দিগ্বিজয়-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই বা আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই না কি—এক দিকে তাঁহার শিষ্য লক্ষ্মণাচার্য্য এবং হস্তমলক ভারতের পূর্ব্ব-পশ্চিম-প্রান্তে পরিভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেন; অন্য দিকে, পরমাল কালমাল প্রমুখ শিষ্যবর্গ দাক্ষিণাত্যে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে শৈব-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। তবেই বুঝা যায়, তিনি শিব-শক্তি-সূর্য্য-গণপতি-বিষ্ণু-ব্রহ্মা সকলকেই সমদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন। অধুনা ভারতবর্ষে, হিন্দুগণের মধ্যে, শিব-শক্তি-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সূর্য্য-গণপতি সকলেরই উপাসনা যে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাই, তাহারও কারণ, আমাদের মনে হয়, শঙ্করাচার্য্যের শিক্ষা-প্রভাব। তাই আমরা দেখিতে পাই,—যিনি শক্তি পূজা করিতে বসিয়াছেন, যিনি দুর্গা দশভুজার পূজার আয়োজন করিয়াছেন, তিনি সেই সঙ্গে গণপতির পূজাও করিতেছেন, সূর্য্যের উপাসনাও করিতেছেন, এমন কি—ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহার নিকট পূজা পাইতেছেন। কোনও হিন্দু এক দেবতাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য দেবতাকে পূজা করেন, এ দৃশ্য আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণ-সন্তান গায়ত্রী জপ করেন, সূর্য্যার্ঘ্য দেন, শিবের আরাধনা করেন, নারায়ণের পূজা দেন, সিদ্ধিদাতা গণপতির চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন,—শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবের সকল ভাবই হিন্দুর মধ্যে প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই। শঙ্করাচার্য্যের কতকগুলি শিষ্য শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত আছেন বলিয়া, শঙ্করাচার্য্য যে কেবল শৈব-মতই প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

দক্ষিণ-ভারতে শৈব-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসিগণের মধ্যে দণ্ডী এবং দশনামী দণ্ডিগণ শঙ্করাচার্য্যের অনুশাসন মান্য করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। দণ্ডিগণ প্রধানতঃ মঠাদিতে অবস্থিতি করেন। তাঁহারা শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বেদান্ত-মতেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে শিবাবতার বলিয়া মান্য করেন; সুতরাং তাঁহাদের মতে সকল দেবতার উপরে শিবের আসন প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের ললাটে বিভূতিভূষণ ত্রিপুণ্ড্রক শোভমান। তাঁহাদের বীজ-মন্ত্র "নমঃ শিবায়" বা "ওঁ নমঃ শিবায়।" দণ্ডিগণের মধ্যে কেহ বা নির্গুণ নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেহ আবার শিব-মূর্ত্তির উপাসক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—ত্রিবর্ণ ই দণ্ডগ্রহণে দণ্ডিপদবাচ্য হইতে পারেন। দশনামী দণ্ডিগণ শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য-সম্প্রদায় হইতে সমুৎপন্ন। শঙ্করাচার্য্যের প্রধান প্রধান শিষ্যের পরিচয় সম্বন্ধে যদিও মতান্তর আছে; পদ্মপাদ, হস্তমূলক, সুরেশ্বর বা মণ্ডণ এবং তোটক সর্ব্ব-সুপরিচিত। পদ্মপাদের দুই শিষ্য—তীর্থ ও আশ্রম; হস্তমলকের দুই শিষ্য—বন এবং অরণ্য; সুরেশ্বর বা মণ্ডণের তিন শিষ্য—সরস্বতী, পুরী এবং ভারতী; তোটকেরও তিন শিষ্য—গিরি বা গির, পর্ব্বত এবং সাগর। শঙ্করার্য্যের চারি জন প্রধান শিষ্যের উল্লিখিত দশ জন (তীর্থাদি) শিষ্য হইতে 'দশনামী' সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত শৈব-মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাঁহারা দশনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক দশজন গুরুর নামে আপনাদের উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও বর্ণ ঐ সকল উপাধির অধিকারী নহেন। শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত আনন্দ-গিরি, মাধব বিদ্যারণ্য, পূরণ গিরি প্রভৃতি নামে ঐ পরিচয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। শৃঙ্গেরী-মঠের গুরুগণ আজি পর্য্যন্ত 'ভারতী' উপাধিতে ভূষিত আছেন। পূর্ব্বোক্ত দশবিধ উপাধিযুক্ত দণ্ডিগণের মধ্যে অধুনা চতুর্ব্বিধ উপাধিধারী দশনামী দণ্ডী ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের উপাধি—তীর্থ বা ইন্দ্র, আশ্রম, সরস্বতী এবং ভারতী। তাঁহারা প্রধানতঃ শঙ্করদণ্ডী বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের অনেকে এক্ষণে বারাণসী প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করেন। তাঁহারা প্রায়ই বেদান্তে সুপণ্ডিত। এই দণ্ডীগণের অনেকে সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাপন্ন। শঙ্করাচার্য্য এবং মাধব-বিদ্যারণ্য বহু গ্রন্থ ও বহু ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। দশকুমার-চরিত-রচয়িতা, অমরকোষের টীকাকার রামশ্রম, যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর,—ইঁহারা সকলেই শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত দণ্ডী ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দণ্ডিগণের অনেকেই যোগ-বিদ্যায় পারদর্শী। ইঁহাদের যৌগিক-ক্রিয়া দর্শনে, 'দেবীস্থানের' গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন,—'এক জন দণ্ডধারীকে তিনি তিন দিন কাল নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। সেই দণ্ডী শিরা হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়াছিলেন; চুল দিয়া হাড় কাটিয়াছিলেন এবং অতি সঙ্কীর্ণ-মুখ বোতলের মধ্যে অখণ্ড ডিম্ব প্রবেশ করাইয়াছিলেন।' দশনামী দণ্ডিগণের অবশিষ্ট ছয় উপাধিধারী দণ্ডিগণ পরবর্ত্তিকালে 'অতীত' অর্থাৎ 'মুক্ত' বলিয়া পরিচিত হন। প্রথমোক্ত চারি শ্রেণীর

বিবিধ শৈব-সম্প্রদায়।

সহিত তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহারের অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহারা বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, অলঙ্কারাদি পরিধান করিতেন, অর্থাদি লইয়া ব্যবসায় করিতেন এবং হিন্দু-সমাজভুক্ত যে কোনও ব্যক্তিকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইতেন। অতীত দণ্ডিগণ মঠেও বাস করেন বটে; কিন্তু সংসারের কাজকর্ম্মেও ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, ধন-সম্পত্তি-সঞ্চয়ে চেষ্টা পান এবং দেব-দেবীর মন্দিরে পৌরহিত্যে ব্রতী থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ আবার বিবাহ-বন্ধনেও আবদ্ধ হন। তবে বিবাহিত ব্যক্তিগণ 'অতীত' নামে পরিচিত না হইয়া 'সমযোগী' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বারানসী-ধামে অন্নপূর্ণার মন্দিরে যিনি পৌরহিত্য করেন, তিনি 'অতীত'-দণ্ডি-সম্প্রদায়ভুক্ত। দণ্ডিগণ প্রথমে শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্য-পরম্পরা-প্রচারিত বেদান্ত-মতানুসারেই পরিচালিত হইতেন। কালে কেহ কেহ পতঞ্জলির অনুবর্ত্তী হইয়া যোগশাস্ত্র অভ্যাস করেন। পরিশেষে কেহ কেহ তন্ত্রমতানুসারেও পরিচালিত হইতেছেন। দণ্ডিগণ শঙ্করাচার্য্যকে যেরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকের নিকট দত্তাত্রেয়ও সেইরূপ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। দত্তাত্রেয় যোগি-প্রধান এবং বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। কালক্রমে শৈবগণের মধ্যে আরও বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে এক নূতন মত প্রচারিত হয়। সেই মতকে 'শৈব-সিদ্ধান্ত' মত বলা যাইতে পারে। অষ্টাবিংশ আগম-শাস্ত্রের প্রাধান্য—এই মতে পরিকীর্ত্তিত। বেদান্তের একেশ্বরবাদ শৈব-সিদ্ধান্ত-মতাবলম্বিগণ অগ্রাহ্য করেন। তাঁহারা বলেন,—'শৈব-দর্শন তিনটী মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই তিন ভিত্তির নাম—পতি, পশু এবং পাশ। পতি—পরমেশ্বর, পশু—জীবসত্ত্ব, পাশ—বন্ধন। বন্ধন ত্রিবিধ—অলয় বা ব্যসন, মায়া বা মিথ্যা এবং কর্ম্ম। এই ত্রিবিধ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মানুষ জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করে। চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, মানুষ সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। সেই চারি কর্ম্ম—(১) সারীয়, অর্থাৎ দেব-মন্দিরাদি পরিষ্কার-করণ-রূপ ধর্ম্ম-কর্ম্ম, (২) ক্রিয়া অর্থাৎ শিবপূজা, (৩) যোগ, অর্থাৎ পরব্রহ্মের ধ্যান, এবং (৪) জ্ঞান, অর্থাৎ পরমাত্মার তত্ত্ব-নিরূপণে অভিজ্ঞতা-লাভ।' সিদ্ধান্ত-সম্প্রদায় ভিন্ন, যোগী (কাণফাট যোগী), লিঙ্গধারী জঙ্গম, পরমহংস, অঘোরী, ঊর্দ্ধবাহু, নাগা, অবধূত, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিবিধ শৈব-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। রামানুজ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যেরূপ রামানন্দ কর্তৃক বিভাগী-কৃত হইয়াছিলেন, গোরক্ষনাথ কর্তৃক শৈব-সম্প্রদায় সেইরূপ এক অভিনব সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। গোরক্ষনাথের সেই সম্প্রদায়ের নাম—যোগী বা কাণফাট যোগী। শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত শৈব-সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ উচ্চ আসন লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু গোরক্ষনাথ চারি বর্ণকেই আপনার দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, কবীরের সমসময়ে, পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী গোরখ্-ক্ষেত্রে নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত হয়, বর্ত্তমান গোরক্ষপুর তাঁহারই নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল। গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত যোগিগণের দীক্ষা-সময়ে কর্ণ-বেধ হইত। সেই

জন্য তাঁহারা কাণফাট যোগী নামে পরিচিত। কাণফাট শৈবগণ হিন্দু নৃপতিগণের সৈন্যদলে ভুক্ত হইয়া, অনেক সময়ে রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। বারাণসী ধামে ভৈরবের পুরোহিতগণ কাণফাট যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথের মন্দির এই সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ মধ্যে পরিগণিত। লিঙ্গোপাসকগণ—লিঙ্গায়ৎ, লিঙ্গাবন্ত, লিঙ্গধারী এবং জঙ্গম সম্প্রদায় নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে বাসব নামক জনৈক শৈব কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। তিনি শ্রীশৈলাধিপতির মন্ত্রী ছিলেন। শৈব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। মাদুরা সহরের প্রসিদ্ধ জৈন-মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে জৈনগণ যে সকল মূর্ত্তি খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, বাসব সেই সকল মূর্ত্তির ধ্বংস-সাধন করেন। মুসলমানগণের ভারতাক্রমনের পূর্ব্বে লিঙ্গধারী বা জঙ্গম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা যে দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিহাসে তাহার বহুল প্রমাণ বিদ্যমান আছে। মামুদ গজনী যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন দ্বাদশটী লিঙ্গমূর্ত্তি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই দ্বাদশ লিঙ্গমূর্ত্তির একটী মূর্ত্তি—সোমনাথ বা সোমশঙ্কর। মামুদের ভারত-আক্রমণ কালে, গুজরাট প্রদেশে যে সোমনাথের মন্দির বিলুণ্ঠিত হয়, সেই মন্দির লিঙ্গায়ৎ বা জঙ্গম সম্প্রদায়ের একটী প্রধান মঠ মধ্যে পরিগণিত ছিল। অবশিষ্ট একাদশটী মন্দিরের নাম—(১) মল্লিকার্জ্জুন বা শ্রীশৈল; (২) উজ্জয়িনীর মহাকাল; সুলতান আলতামস যখন উজ্জয়িনী বিধ্বস্ত করেন, সেই সময়ে (১২৩১ খৃষ্টাব্দে) এই লিঙ্গ-মূর্ত্তি তিনি দিল্লীতে লইয়া গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। 'তাবকৃতি আকবরীর' মতে, উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দির ঐ ঘটনার অন্ততঃ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; (৩) ওঙ্কারনাথ; কেহ বলেন, এই মন্দির উজ্জয়িনীতে ছিল; কেহ বলেন, নর্ম্মদা-নদীতীরস্থ ওঙ্কার মান্ধাতার মন্দির এই নামে পরিচিত; (৪) অমরেশ্বর; উজ্জয়িনী প্রদেশে এই মূর্ত্তির বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়; (৫) বৈদ্যনাথ; বঙ্গদেশে, দেওঘরে, এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত; (৬) রামেশ; সেতুবন্ধে, লঙ্কা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে রামেশ্বর-দ্বীপে এই মন্দির অবস্থিত। লঙ্কা-সমর বিজয় কালে, শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মন্দির ভারতবর্ষের মধ্যে এক প্রধান দ্রষ্টব্য সামগ্রী। ইহার সিংহদ্বার শতাধিক ফিট উচ্চ; (৭) ভীমশঙ্কর; রাজমহেন্দ্রী জেলার ভীমেশ্বর মন্দিরকে অনেকে ভীমশঙ্কর নামে অভিহিত করেন; (৮) কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি; (৯) গোমতী তীরস্থিত ত্র্যম্বক; (১০) গৌতমেশ; (১১) হিমালয় পর্ব্বতস্থিত কেদারনাথ। দাক্ষিণাত্যে মহীশূর প্রদেশে এবং প্রাচীন কানাড়া ও তেলিঙ্গন দেশে লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তেলেগু ভাষায় বাসবেশ্বর-পুরাণ, প্রভুলিঙ্গলীলা প্রভৃতি তাঁহাদের বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। লিঙ্গায়ৎ সন্ন্যাসীগণ 'বেদার' বা প্রভু বলিয়া পরিচিত। কুটিবর, বহূদক, হংস, পরমহংস—কাহারও কাহারও মতে—সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের এই চারি স্তর। এই সকল শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরমহংসগণ উচ্চ স্তরে অবস্থিত। তাঁহারা আপনাদিগকে 'শিবোহহং' বলিয়া মনে করেন। বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরির নামানুসারে ভর্ত্তৃহরি সম্প্রদায়ের,

শারঙ্গ ধারণ করিয়া হরপার্ব্বতীর গুণানুকীর্ত্তন করেন বলিয়া শারঙ্গী সম্প্রদায়ের, মৎস্যেন্দ্রের (গোরক্ষনাথের গুরু) নামানুসারে মচ্ছেন্দ্রী সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নাগা, উর্দ্ধবাহু, অবধূত প্রভৃতি আরও বিভিন্ন শৈব-সম্প্রদায় বিদ্যমান আছেন। সামান্য সামান্য বিষয়ে এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের পার্থক্য নিবন্ধন তাঁহাদের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

যেখানেই শক্তি, সেইখানেই শিব। তাই দেখিতে পাই, যেখানেই পীঠ, যেখানেই দেবীর অধিষ্ঠান, সেখানেই ভৈরব মূর্ত্তিতে শিব বিরাজমান। তন্ত্রচূড়ামণিতে, দেবী-ভাগবতে, কালিকা-পুরাণে এবং বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থে, পীঠস্থান-সমূহের বিস্তৃত পরিচয় আছে। কোন্ পীঠস্থানে দেবী কি নামে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং কোন্ পীঠস্থানে মহাদেবই বা ভৈরব মূর্ত্তিতে কিরূপ-ভাবে বিরাজমান আছেন শাস্ত্রে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লিখিত। সেই সকল পীঠস্থানের বিষয় স্মরণ করিলে, শিবশক্তির আরাধনায় এখনও যে ভারতের কত নর-নারী নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাহা সহজেই প্রতীত হইতে পারে। পীঠস্থানের সংখ্যা কোনও মতে একান্নটী, কোনও মতে এক শত আটটী। কোনও মতে কতকগুলি পীঠ,—আর কতকগুলি উপপীঠ বলিয়াও পরিচিত। সকল পীঠস্থানের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে গেলে, পীঠস্থানের সংখ্যা দুই শতাধিক দাঁড়াইতে পারে। তবে যে একান্ন পীঠ প্রধান বলিয়া পরিচিত, নিম্নে অকারাদি-ক্রমে সেই পীঠ-সমূহের নাম, বর্ত্তমান অবস্থিতি এবং অন্যান্য পরিচয় প্রদত্ত হইল।

পীঠস্থান-সমূহ।

পীঠস্থান।	কোথায় অবস্থিত।	অঙ্গ বা অঙ্গভূষণ।	দেবীর নাম।	ভৈরবের নাম
অট্টহাস	বীরভূম, আমেদপুরে	ওষ্ঠ	ফুল্লরা	বিশ্বেশ
উজ্জয়িনী (উজানী)	বর্দ্ধমান, গুস্করায়	কর্পূর	মঙ্গলচণ্ডিকা	কপিলাম্বর
উৎকল (বিরজাক্ষেত্র)	উড়িষ্যা	নাভিদেশ	বিমলা	জগন্নাথ
করতোয়াতট (ভবানীপুর)	বগুড়া জেলায়	তল্প	অপর্ণা	বামনভৈরব
কন্যাশ্রম	অনির্দ্দিষ্ট	পৃষ্ঠ	সর্ব্বাণী	নিমিষ
কর্ণাট	কর্ণাটদেশ	কর্ণ	জয়দুর্গা	অভীরু
কাঞ্চী	কঞ্জেভরমে *	অস্থি	দেবগর্ভা	রুরু
কামগিরি	কামরূপ (আসাম)	যোনিদেশ	কামাখ্যা	উমানন্দ
কালমাধব	অনির্দ্দিষ্ট	নিতম্ব	কালী	অসিতাঙ্গ
কালীপীঠ	কালীঘাট	দক্ষিণ-পাদাঙ্গুলি	কালিকা	নকুলীশ
কাশ্মীর	কাশ্মীর-রাজ্য	কণ্ঠদেশ	মহামায়া	ত্রিসন্ধ্যেশ্বর
কিরীট	অনির্দ্দিষ্ট	কিরীট	বিমলা	সম্বর্ত্ত
কুরুক্ষেত্র	থানেশ্বরের নামান্তর	গুল্ফ	সাবিত্রী	স্থাণু
গণ্ডকী	গণ্ডক-নদী-তীরে	গণ্ডস্থল	গণ্ডকী	চক্রপাণি
গোদাবরী-তীর	গোদাবরী তীরে	গণ্ড	বিশ্বেশী	দণ্ডপাণি

* মতান্তরে বীরভূম জেলায় বোলপুরে নির্দ্দিষ্ট হয়।

পীঠস্থান।	কোথায় অবস্থিত।	অঙ্গ বা অঙ্গভূষণ।	দেবীর নাম।	ভৈরবের নাম।
চট্টল	আসাম সীতাকুণ্ডু	দক্ষিণ-বাহু	ভবানী	চন্দ্রশেখর
জয়ন্তী	খাশিয়া-পাহাড়ে	বাম-জঙ্ঘা	জয়ন্তী	ক্রমদীশ্বর
জনস্থল	অনির্দ্দিষ্ট	চিবুকদ্বয়	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ
জালন্ধর	জলন্ধরে	স্তন	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ
জ্বালামুখী	জলন্ধরে	মহাজিহ্বা	সিদ্ধিদা	উন্মত্তভৈরব
ত্রিপুরা	ত্রিপুরা জেলায়	দক্ষিণপদ	ত্রিপুরসুন্দরী	ত্রিপুরেশ
ত্রিস্রোতা	জলপাইগুড়ী-জেলায়	বামপদ	ভ্রামরী	ভৈরবেশ্বর
নলহাটী	বীরভূম জেলায়	নলা	কালিকাদেবী	যোগেশ
নন্দীপুর	সাঁইথিয়ার নিকট	কণ্ঠহার	নন্দিনী	নন্দীকেশ্বর
নেপাল	নেপালে	জানু	মহামায়া	কপালী
পঞ্চসাগর	অনির্দ্দিষ্ট	অধোদন্ত	বাহারী	মহারুদ্র
প্রভাস	দ্বারকার সন্নিকটে	উদর	চন্দ্রভাগ	চন্দ্রতুণ্ড
প্রয়াগ	এলাহাবাদে	হস্তাঙ্গুলি	ললিতা	ভব
বক্রেশ্বর	বীরভূম, আমেদপুরে	মন	মহিষমর্দ্দিনী	বক্রনাথ
বহুলা	কাটোয়ার নিকট	বামবাহু	বহুলাদেবী	ভীরুক
বারাণসী	বারাণসীধামে	কর্ণকুণ্ডল	বিশালাক্ষী—মণিকর্ণি	কালভৈরব
বিভাস	মেদিনীপুর, তমলুক	বামগুল্ফ	কপালিনী	সর্ব্বানন্দ
বিরাট *	বিরাট-রাজ্যে	পদাঙ্গুলি	অম্বিকা	অমৃত
বৃন্দাবন	বৃন্দাবনে	কেশপাশ	উমা	ভূতেশ
বৈদ্যনাথ	দেওঘরে	হৃদয়	জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ
ভৈরব-পর্ব্বত	অনির্দ্দিষ্ট	ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ	অবন্তী	লম্বকর্ণ
মগধ *	পাটনা-জেলায়	দক্ষিণ-জঙ্ঘ	সর্ব্বানন্দকরী	ব্যোমকেশ
মণিবন্ধ	অনির্দ্দিষ্ট	মণিবন্ধদ্বয়	গায়ত্রী	সর্ব্বানন্দ
মানস	তিব্বতে	দক্ষিণহাত	দাক্ষায়ণী	অমর
মিথিলা	ত্রিহুত, জনকপুরে	বামস্কন্ধ	উমা	মহোদয়
যশোহর	যশোহর-জেলায়	পাণি-পদ্ম	যশোরেশ্বরী	চণ্ড
যুগাদ্যা	অনির্দ্দিষ্ট	দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ	ভূতধাত্রী	ক্ষীরখণ্ডক
রত্নাবলী	ঐ	দক্ষিণ-স্কন্ধ	কুমারী	শিব
রামগিরি	চিত্রকুট-সন্নিকটে	অন্তস্তন	শিবানী	চণ্ড-ভৈরব
লঙ্কা	সিংহলে	নূপুর	ইন্দ্রাক্ষী	রাক্ষসেশ্বর
শর্করার	করবীরপুরে	তিনচক্ষু	মহিষমর্দ্দিনী	ক্রোধীশ
শুচি	অজ্ঞাত	ঊর্দ্ধ দন্ত	নারায়ণী	সংহার

* এই দুইটী পীঠের নাম, কোনও কোনও গ্রন্থে, একান্ন পীঠের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই।

পীঠস্থান।	কোথায় অবস্থিত।	অঙ্গ বা অঙ্গভূষণ।	দেবীর নাম।	ভৈরবের নাম।
শোণদেশ	শোণ-নদীর নিকটে	নিতম্বক	নর্ম্মদা	ভদ্রসেন
শ্রীপর্ব্বত	অজ্ঞাত	দক্ষিণ-গুল্‌ফ	শ্রীসুন্দরী	সুন্দরানন্দ
শ্রীশৈল	শ্রীহট্টে	গ্রীবা	মহালক্ষ্মী	শম্বরানন্দ
সুগন্ধা	বরিশাল-জেলায়	নাসিকা	সুনন্দা	ত্র্যম্বক
হিঙ্গুলা	করাচীর নিকটে	ব্রহ্মরন্ধ্র	কোট্টরীশা	ভীমলোচন

এই সকল পীঠ-স্থান এবং তৎসমুদায়ের অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক মতান্তর দৃষ্ট হয়। কালিকা-পুরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—'সতী-শরীরের অবয়ব সকল দেবগণ কর্ত্তৃক তিল তিল খণ্ডিত হইয়া পবন-বেগে আকাশ-গঙ্গাতে গমন করিল। তখন যেখানে যেখানে সতীর পদাদি অঙ্গ পতিত হইল, তথায় তথায় মহাদেব সতী-স্নেহবশে বিমূঢ় হইয়া স্বয়ং লিঙ্গরূপে অবস্থিত হইলেন। দেবকূটে সতীর পদযুগে অবস্থিত জগদম্বা মহাদেবী, যোগনিদ্রা মহাভাগা নামে অভিহিত। উড্ডীয়ানে কাত্যায়নী, কামরূপে কামাখ্যা, পূর্ণগিরিতে পূর্ণেশ্বরী এবং জালন্ধরে চণ্ডী নামে দেবী প্রসিদ্ধি-সম্পন্না। কামরূপের পূর্ব্বভাগে অবয়বাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম দিক্করবাসিনী; আর শেষভাগে অঙ্গাধিষ্ঠাত্রী যোগ-নিদ্রার নাম ললিতকান্তা।' দেবীভাগবতে আবার আর এক ভাবে এতদ্বিবরণ পরিবর্ণিত আছে। সপ্তম স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ে তদ্বিবরণ দৃষ্ট হইবে। যাহা হউক, অসংখ্য স্থানে অসংখ্য রূপে শক্তিরূপিণী দেবী যে বিরাজমান আছেন, শাস্ত্রগ্রন্থে পুনঃপুনঃ তদ্বিষয় উক্ত হইয়াছে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সৌর ও গাণপত্য।

[সূর্য্য ও গণপতির উপাসকগণের মূল লক্ষ্য,—হিন্দু-সমাজে সূর্য্যের ও গণপতির পূজা-প্রসঙ্গ,—শঙ্করাচার্য্যের সমসময়ে সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা,—তন্ত্র-শাস্ত্রে সূর্য্যের ও গণপতির উপাসনা-পদ্ধতি,—সূর্য্যের এবং গণেশের ধ্যান।]

সূর্য্যোপাসকগণ সৌর এবং গণপতির উপাসকগণ গাণপত্য নামে পরিচিত। অধুনা ভারতবর্ষে হিন্দুগণ প্রায় সকলেই কোনও-না-কোনও আকারে সূর্য্যের এবং গণপতির উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং সৌর এবং গাণপত্য নামে এখন আর ভারতবর্ষে কোনও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে বলিয়া বুঝা যায় না। যদিও কোথাও সেরূপ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় তাঁহাদের, সংখ্যা নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে সূর্য্যদেবকে এবং গণপতিকে জগৎপতি বলিয়া পূজার পদ্ধতি সৃষ্টির আদি হইতেই বিদ্যমান আছে, নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বেদে সূর্য্য—আদিত্য, অর্য্যমা, সূর প্রভৃতি নামে সম্পূজিত। উপনিষদে গণপতি 'তত্ত্বমসি'

সৌর ও গাণপত্য

প্রভৃতি বাক্যে এবং কোনও কোনও শাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতির অধিপতি বলিয়া অভিহিত। শঙ্করাচার্য্যের সমসময়ে সৌর এবং গাণপত্যগণ যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন, শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে মতে, তাৎকালিক সৌরগণের এবং গাণপত্যগণের প্রত্যেকের মধ্যে ছয়টী করিয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের সৌরগণ প্রাতঃ-সূর্য্যকে ব্রহ্মা বা সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া উপাসনা করিতেন; দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৌরগণ মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকে ঈশ্বর অর্থাৎ ধ্বংস-কর্ত্তা ও পুনঃ-সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার উপাসনায় ব্রতী হইতেন; এবং তৃতীয় সম্প্রদায় অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যকে রক্ষা-কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেন। চতুর্থ সম্প্রদায় প্রাতঃ-সূর্য্য, মধ্যাহ্ন-সূর্য্য এবং সায়ং-সূর্য্য—সূর্য্যের ত্রিবিধ অবস্থাকে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা ত্রিমূর্ত্তি জ্ঞানে, তিন অবস্থারই আরাধনায় রত হইতেন। পঞ্চম সম্প্রদায়ের সৌরগণ কেশ-শ্মশ্রু-সমন্বিত সূর্য্যের মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহার পূজা করিতেন। সৌরগণের ষষ্ঠ সম্প্রদায় মানস-চক্ষে সূর্য্য মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া মনে মনে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর সৌরগণের ললাটে, বাহুদ্বয়ে এবং বক্ষঃস্থলে উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা বৃত্তাকার চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত। ষড়বিধ সৌর-সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন প্রায় কোনও সম্প্রদায়ই দৃষ্ট হয় না। তবে এখন যাঁহারা আপনাদিগকে 'সৌরপৎ' বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহারা ললাটে রক্ত-চন্দনের রেখা অঙ্কিত করেন এবং গলদেশে স্ফটিক-মাল্য ধারণ করেন। সৌরগণের আর এক বিশেষত্ব,—তাঁহারা রবিবারে আহার্য্য দ্রব্যের সহিত লবণ ভক্ষণ করেন না; সংক্রান্ত্যাদির দিন তাঁহারা উপবাসী থাকেন এবং পর দিন সূর্য্য-দর্শন না হইলে কোনরূপ ভক্ষ-দ্রব্য গ্রহণ করেন না। ষড়বিধ গাণপত্য গণের পার্থক্য এই যে, তাঁহাদের এক এক সম্প্রদায় এক এক নামধেয় গণপতির উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ মহাগণপতির উপাসক, কেহ হরিদ্রা গণপতির বা ঢুণ্টিরাজের উপাসক কেহ উচ্ছিষ্ট গণপতির, কেহ স্বর্ণগণপতির, কেহ বা সন্তান গণপতির উপাসক। উচ্ছিষ্ট-গণপতির পূজকগণ 'হৈড়ম্ব' নামেও পরিচিত। অধুনা সাধারণতঃ যে গণপতির পূজা হইয়া থাকে, তিনি ঢুণ্টিরাজ গণপতি নামে অভিহিত। কেহ কেহ বক্রতুণ্ডগণপতিরও পূজা করিয়া থাকেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে উক্ত দুই গণপতির উপাসনাই প্রচলিত। তন্ত্র-শাস্ত্রে সূর্য্য এবং গণপতির নানা মূর্ত্তি এবং নানারূপ পূজার প্রক্রিয়া সন্নিবদ্ধ আছে। সূর্য্য এবং গণপতির যে ধ্যানাদি প্রচলিত, তাহাতেই তাঁহাদের মূর্ত্তির পরিচয় প্রকটিত। সূর্য্যের ধ্যান; যথা,—

"রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্য-মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥" ইত্যাদি।

তন্ত্রে পঞ্চাশ গণপতি এবং তাঁহার পঞ্চাশ শক্তি পরিকীর্ত্তিত আছে। যথা, নাম—বিঘ্নেশ, শক্তি—হ্রী; নাম—বিঘ্নরাজ, শক্তি—শ্রী, ইত্যাদি। গণেশের ধ্যান যথা,—

"খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলং।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং। বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং॥"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

-:•

বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।

[জৈন-ধর্ম্ম,—প্রাচীনত্ব,—তীর্থঙ্করগণ,—তাঁহাদের গুণের পরিচয়,—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈন,—শ্রাবক ও যতির প্রসঙ্গ,—তীর্থ-স্থানাদি ;—বৌদ্ধ-সম্প্রদায়,—বুদ্ধদেবের জন্ম ও তাঁহার ধর্ম্মমত ;—খৃষ্ট-সম্প্রদায়,—যীশু-খৃষ্টের আবির্ভাব ও তাঁহার ধর্ম্মমত ;—মুসলমান-সম্প্রদায়,—মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মমত-প্রচার ;—পার্শীদিগের 'জোরওয়াষ্ট্রিয়ানিজ্‌ম্' ধর্ম্ম, য়িহুদীদিগের 'জুডাইজম' ধর্ম্ম এবং 'শিখ' প্রভৃতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ; —উপসংহার।]

শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত হিন্দুধর্ম্মরূপ মহান্ মহীরুহের পার্শ্বে আর আর যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে জৈন-ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। জৈন-ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং পরিপুষ্টি-সম্বন্ধে অনেক মতান্তর আছে বটে; কিন্তু জৈন-ধর্ম্ম যে অন্যান্য অনেক ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কোনও কোনও পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন,—বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-দর্শন হইতে জৈন-ধর্ম্মের ও জৈন-দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধের জন্মের পরবর্ত্তি-কালে যে সকল জৈন-দর্শন লিখিত হয়, তাহার কোথাও কোথাও বৌদ্ধ-দর্শনের ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে; আর সেই জন্যই বৌদ্ধ-দর্শন হইতে জৈন-ধর্ম্মের উৎপত্তি-বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু নিগূঢ় অনুসন্ধান করিলে, জৈন-ধর্ম্মকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী বলিয়া কখনই মনে করা যায় না। জৈন-ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—জৈনগণের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বুদ্ধদেবের গুরু ছিলেন; মহাবীরের নিকট বুদ্ধদেব যে বীজমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কালে তাহাই পরিস্ফুট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মরূপে প্রকটিত হয়। যাহা হউক, কোন্ ধর্ম্ম হইতে কোন্ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, সে জটিল বিষয়ের আলোচনার স্থল ইহা নহে। এখানে কেবল জৈন-ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত মাত্র আমরা সন্নিবিষ্ট করিয়াই নিরস্ত হইব। জিন (অর্থাৎ বিশ্ববিজয়ী) হইতেই 'জৈন' শব্দের উৎপত্তি। 'জিন' (জিন = জয় করা + ন বা নক অর্থাৎ যিনি তপস্যা দ্বারা ভুবন জয় করিয়াছেন) শব্দে বিষ্ণুকে বুঝায়, অমর দেবতাগণকে বুঝায়, ইত্যাদি। জিন শব্দের এইরূপ আরও নানা অর্থ হইতে পারে; কিন্তু প্রধানতঃ জিন শব্দে চব্বিশ জন পবিত্রাত্মা বা মহাপুরুষকে বুঝাইয়া থাকে। তাঁহাদের অপর নাম তীর্থঙ্কর। তীর্থঙ্কর শব্দ দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয়; প্রথম—তীর্থ (শাস্ত্র) যিনি করেন অর্থাৎ শাস্ত্রকার; দ্বিতীয়—তীর্থ (সংসার-সমুদ্র) হইতে যিনি পার করেন, তিনিই তীর্থঙ্কর (তীর্থং সংসারসমুদ্রতরণং করোতি)। জৈন-শাস্ত্রের মতে, চব্বিশ জন অবতার ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহারাই তীর্থঙ্কর নামে পরিচিত। তীর্থঙ্করগণের নাম ও সংখ্যা সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যেমন এক এক মন্বন্তরে এক এক দেবতার প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন

জৈন-সম্প্রদায়।

অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন; জৈনদিগের আগম-শাস্ত্রেও অনেকটা সেই ভাব দেখিতে পাই। তাঁহাদের মতে,—যে কাল গত হইয়াছে, সেই কালের নাম উৎসর্পিণী এবং যে কাল এক্ষণে চলিতেছে, তাহার নাম অবসর্পিণী। উৎসর্পিণীতে যে নামের তীর্থঙ্করগণ বিদ্যমান ছিলেন, অবসর্পিণীতে সে নাম পরিবর্ত্তিত। আবার জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র যে পঁচিশ জন তীর্থঙ্করের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামের সহিত প্রোক্ত দুই কালের তীর্থঙ্করগণের নামের অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। নিম্নে সেই বিভিন্ন-মতোক্ত ভিন্ন ভিন্ন কালের তীর্থঙ্করগণের নাম যথাপর্য্যায়ে প্রদত্ত হইল। যথা,—

হেমচন্দ্রের মতে।		উৎসর্পিণী-কালে।		অবসর্পিণী-কালে।	
১। অর্হণ	১৩। তীর্থকর	১। কেবলজ্ঞানী	১৩। সুমতি	১। ঋষভদেব	১৩। বিমলনাথ
২। জিন	১৪। জিনেশ্বর	২। নির্ব্বাণী	১৪। শিবগতি	২। অজিতনাথ	১৪। অনন্তনাথ
৩। পারগত	১৫। স্যাদ্বাদ্য	৩। সাগর	১৫। অস্তাগ	৩। সম্ভবনাথ	১৫। ধর্ম্মনাথ
৪। ত্রিকালবিৎ	১৬। অভয়দ	৪। মহাযশ	১৬। নেমীশ্বর	৪। অভিনন্দ	১৬। শান্তিনাথ
৫। ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা	১৭। সার্ব্ব	৫। বিমলানাথ	১৭। অনিল	৫। সুমতিনাথ	১৭। কুন্থুনাথ
৬। পরমেষ্ঠী	১৮। সর্ব্বজ্ঞ	৬। সার্ব্বানুভূতি	১৮। যশোধর	৬। পদ্মপ্রভ	১৮। অরনাথ
৭। অধীশ্বর	১৯। সর্ব্বদর্শী	৭। শ্রীধর	১৯। কৃতার্থ	৭। সুপার্শ্ব	১৯। মল্লিনাথ
৮। শম্ভু	২০। কেবলী	৮। দত্ত	২০। জিনেশ্বর	৮। চন্দ্রপ্রভ	২০। মুনিস্নুব্রত
৯। স্বয়ম্ভু	২১। দেবাধিদেব	৯। দামোদর	২১। শুদ্ধমতি	৯। সুবিধিনাথ	২১। নমনাথ
১০। ভগবান	২২। বোধিদ	১০। সুতেজ	২২। শিবকর	১০। শীতলনাথ	২২। নেমিনাথ
১১। জগৎপ্রভু	২৩। পুরুষোত্তম	১১। স্বামী	২৩। স্যন্দন	১১। শ্রেয়াংসনাথ	২৩। পার্শ্বনাথ
১২। তীর্থঙ্কর	২৪। বীতরাগ, আপ্ত*	১২। মুনিব্রত	২৪। সংপ্রতি	১২। বাসপূজ্য	২৪। মহাবীর *

জৈন-শাস্ত্রে লিখিত আছে, অষ্টাদশ-বিধ দোষ-পরিশূন্য মহাপুরুষই তীর্থঙ্কর বা জিন-পদবাচ্য হইতে পারেন। সেই অষ্টাদশ দোষের একটী দোষ থাকিলেও কেহ জিন হইতে পারেন না।

"অন্তরায়দানলাভবীর্য্য ভোগোপভোগগাঃ। হাসো রত্যরতীভীতির্জুগুপ্সা শোক এব চ॥
কামো মিথ্যাত্বমজ্ঞাননিদ্রা চাবিরতিস্তথা। রাগদ্বেষশ্চ নো দোষাস্তেষামষ্টাদশাপ্যমী॥"

অর্থাৎ—দানগ্রহণ, ব্যবসায়ের লাভ, বীর্য্য, ভোগ, উপভোগ, প্রভৃতি অন্তরায়, হাস, রতি, অরতি, ভীতি, জুগুপ্সা, শোক, কাম, মিথ্যাত্ব, অজ্ঞান, নিদ্রা, অবিরতি, রাগ, দ্বেষ, প্রভৃতি অষ্টাদশ-বিধ দোষ পরিশূন্য ব্যক্তিই জিন, অর্হণ বা তীর্থঙ্কর। বর্ত্তমান (অবসর্পিণী) কালের তীর্থঙ্করগণই অধুনা সম্পূজিত হইয়া থাকেন। উল্লিখিত চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের বর্ণ আকৃতি এবং জীবিত-কালের পরিমাণ-বিষয়ও জৈন-শাস্ত্রে লিখিত আছে। প্রথম জিন ঋষভদেবের পিতার নাম নাভি, মাতার নাম মরুদেবী। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় ছিল। তিনি রাজা বলিয়া কথিত হইতেন। তাঁহার শরীরায়তন ৫০০ ধনু (৪ হস্তে এক ধনু) অর্থাৎ প্রায় দুই সহস্র হস্ত। তিনি চুরাশী লক্ষ বৎসর জীবিত ছিলেন দ্বিতীয় জিন অজিতনাথ। ঋষভদেব হইতে তিনি আয়তনে ৫০ ধনু কম ছিলেন। এবং বার লক্ষ বৎসর কম জীবিত ছিলেন। এইরূপে আকৃতি ও জীবিত-কালের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় দ্বাবিংশ জিন

* আপ্ত—পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক তীর্থঙ্কর নামে পরিচিত। নেমিনাথের অপর নাম অরিষ্টনেমি এবং মহাবীরের অপর নাম বর্দ্ধমান।

নেমিনাথের দেহায়তন দশ ধনুতে দাঁড়াইয়াছিল এবং তিনি সহস্র বৎসর জীবিত ছিলেন। সে হিসাবে, শেষ দুই তীর্থঙ্কর (পার্শ্বনাথ এবং মহাবীর) মানুষ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। পার্শ্বনাথের শরীরায়তন নয় ধনু এবং জীবনকাল এক শত বর্ষ। মহাবীরের শরীরায়তন সাত ধনু এবং জীবনকাল ৭২ বৎসর। শ্রীমদ্ভাগবতে বিষ্ণুর অবতার ঋষভদেবের নাম এবং ভগবানের চতুর্ব্বিংশ অবতারের বিষয় লিখিত আছে। অনেকে তাই মনে করেন, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সেই ঋষভদেবই জৈনগণের আদি-তীর্থঙ্কর। এ বিষয়ে জৈন-শাস্ত্রে যে বিশেষ কোনও প্রমাণ আছে, তাহা আমাদের মনে হয় না। শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্ম ও সংসার-ত্যাগ বিষয়ে জৈন শাস্ত্রে লিখিত আছে,—মহাবীরের পিতার নাম সিদ্ধার্থরাজ, মাতা ত্রিশলাদেবী। ত্রিশলা—বৈশালীর রাজা কেতকের ভগ্নী ছিলেন। সিদ্ধার্থরাজ কুন্দগ্রামের সর্দ্দার বলিয়া পরিচিত। মহাবীরের অবির্ভাব-কাল খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে রাত্রিতে মহাবীরের জন্ম হয়, সে রাত্রিতে অনেক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। উনত্রিশ বৎসর বয়সে মহাবীর গৃহ-ত্যাগী হন। গৃহত্যাগ-কালে তিনি দরিদ্রগণকে স্বর্ণরৌপ্যাদি নানা উপহার দান করিয়া-ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর অরণ্য-বাসের পর, তীর্থঙ্কর বা মুক্ত যোগীপুরুষ বলিয়া মহাবীর পরিচিত হন। ত্রিশ বৎসর তিনি দেশে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। ৭২ বৎসর বয়সে মহাবীর ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। জৈন-সম্প্রদায় প্রধানতঃ দুইটী বিভাগে বিভক্ত,—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। দিগম্বরগণ বলেন,—'লজ্জায় পাপের অভিব্যক্তি। যাহার পাপ নাই, তাহার লজ্জাও নাই। বিশুদ্ধ-আচরণে জীব অবিনশ্বর সুখ প্রাপ্ত হয়।' দিগম্বর-সম্প্রদায় তাই লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রাদি পরিধান করেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস,—'যাহার পাপ নাই, তাহার আবার লজ্জাই বা কি, আর লজ্জা—নিবারণের প্রয়োজনই বা কোথায়?' শ্বেতাম্বরগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন। শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতেন বলিয়াই শ্বেতাম্বর নামের উৎপত্তি। শ্বেতাম্বরগণ প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একসম্প্রদায়ের নাম মন্দিরমার্গী বা ডেরাবাসী। ইঁহারা তীর্থঙ্করগণের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নাম স্থানকবাসী। অন্য সম্প্রদায় বিদ্রূপ করিয়া ইঁহাদিগকে ধুন্দিয়া বলিয়া অভিহিত করেন। স্থানকবাসিগণের প্রধান লক্ষণ—তাঁহারা প্রতিমা-পূজার বিরোধী। রাজপুতানায় মাড়য়ার, মেওয়ার প্রভৃতি স্থানে, মধ্যভারতে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ভিন্ন ভিন্ন নগরে, বেরারে, দাক্ষিণাত্যে, পাঞ্জাবে এবং যুক্তপ্রদেশে ইঁহাদের বসতি আছে। মধ্য-প্রদেশে, নিজাম রাজ্যে, দক্ষিণ ভারতে, বঙ্গদেশে এবং ব্রহ্মদেশে ইঁহাদের কতক কতক লোক বাস করেন। মন্দির-বাসী বা ডেরাবাসী শ্বেতাম্বরগণ জিন বা তীর্থঙ্করগণের নগ্ন মূর্ত্তি, দেখিতে ইচ্ছা করেন না। ইঁহাদের দেবমূর্ত্তি সুতরাং বসন-পরিহিত। দিগম্বরগণ স্ত্রী-গণকে আপনাদের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করেন না; কিন্তু শ্বেতাম্বরগণের তদ্বিষয়ে কোনও আপত্তি নাই। অধুনা দিগম্বরগণ রঙ্গীণ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকেন; কিন্তু কথিত হয়, আহারের সময় তাঁহারা সে বস্ত্র পরিত্যাগ করেন। ভারতবর্ষে অন্যূন পনের লক্ষ জৈনের বসতি আছে। দিগম্বর, মন্দিরমার্গী ও স্থানকবাসী—এই তিন সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। সন্ন্যাসী ও

সংসারী হিসাবে জৈনগণ—শ্রাবক ও যতি দুই ভাগে বিভক্ত। যতিগণ জিতেন্দ্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ। কোনরূপে জীবহিংসা না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ সতর্ক থাকেন। শ্রাবকগণ সিদ্ধপুরুষের ও তীর্থঙ্করগণের পূজায় এবং সম্প্রদায়স্থিত পুণ্যবান ব্যক্তিগণের প্রতি ভক্তি-প্রকাশে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। তাঁহাদের চারিটী প্রধান গুণ—দান, বিনয়, দয়া ও কঠোর-নিয়ম-প্রতিপালন। জৈন যতিগণ দেবালয়ে শাস্ত্র পাঠ করেন। জৈনদিগের 'আগম' নামক পঞ্চাশ-খানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে। অহিংসা জৈনদিগের পরম ধর্ম্ম। এ বিষয়ে বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও জৈনগণ কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল পশুশালা দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় জৈনগণেরই প্রতিষ্ঠিত। কোনও প্রাণী কোনরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত না হয়, জৈনগণ নিয়ত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। জৈনগণের মন্দির-সমূহ অশেষ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। পরেশনাথ পর্ব্বত, আবু পর্ব্বত, শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত, ইঁহাদের তীর্থস্থান-মধ্যে পরিগণিত। পরেশনাথে তাঁহাদের দশ জন তীর্থঙ্কর নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, পার্শ্বনাথের নামানুসারে ঐ পর্ব্বতের নাম পরেশনাথ হইয়াছে,—জৈনশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। কাথিবাড়ের অন্তর্গত গির্ণার পাহাড় জৈনদিগের মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। রাজপুতনায়, পশ্চিম-ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক জৈন বসতি করেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং কলিকাতায় জৈনগণ অনেকেই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। তাঁহাদের অনেকেরই আচার, বিনয়, অহিংসা এবং ধর্ম্মানুরাগ চিরপ্রসিদ্ধ। *

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়।

গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইলেও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যে অতি প্রাচীন ধর্ম্ম, শাস্ত্রাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধ নামে পরিচিত অবতারগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শাস্ত্রে তাহার নিদর্শন পাই। বৌদ্ধগণের ধর্ম্মশাস্ত্রে চব্বিশ জন অবতারের কথা লিখিত আছে। সে মতে—কপিলাবস্তুর বুদ্ধদেব শেষ বুদ্ধ। বুদ্ধদেব চারিটী প্রধান সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সেই চারিটী সত্য,—(১) জীবনধারণই দুঃখ, (২) জীবনধারণের কামনাই দুঃখের আদিভূত, (৩) জীবনধারণের কামনা ধ্বংস করিতে পারিলে, দুঃখের ধ্বংস-সাধন হয়; (৪) অষ্টবিধ উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে। সেই অষ্টবিধ উপায়—সৎ-বিশ্বাস, সৎ-প্রতিজ্ঞা, সৎ-বাক্য, সৎ-কর্ম্ম, সৎ-জীবন, সৎ-চেষ্টা, সৎ-চিন্তা, সৎ-উপাসনা। জীবনধারণই দুঃখের কারণ; তাই ধর্ম্মবিশ্বাসী বৌদ্ধগণ জপ-মালার গুটিকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে মনে মনে বলিয়া থাকেন—অনিত্য, দুঃখ, অসত্য; অর্থাৎ, জীবন অনিত্য, সকলই দুঃখময়, সংসার অসত্য; শাপগ্রস্ত হইয়াই জীবনধারণ করিতে হয়; মনুষ্যমাত্রেরই নির্ব্বাণ বা লয়-কামনা কর্ত্তব্য। বৌদ্ধদিগের মধ্যে উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত নাই; বৌদ্ধগণ সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন,—'কর্ম্মই সর্ব্বনিয়ন্তা; কর্ম্মবশেই জন্ম-জরা-মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে হয়। বুদ্ধদেব কাহারও উপাসনা শুনিতে পান না; কারণ, তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।' বুদ্ধদেব

* এস্থলে সংক্ষেপে জৈন-সম্প্রদায়ের বিষয় লিখিত হইল। আবশ্যক অনুসারে অন্যত্র এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার বাসনা আছে।

শাক্যকুলে কপিলাবস্তু-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শুদ্ধোদন এবং মাতার নাম মায়াদেবী। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে কোলি-রাজকন্যা যশোধরার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ২৯ বৎসর বয়সে তিনি সংসার পরিত্যাগ করেন। সংসার-ত্যাগের পর, মগধের রাজধানী রাজগৃহে গমন করিয়া, জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট তিনি দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে শান্তি না পাইয়া, পরিশেষে গয়ার নিকটস্থিত উরুবেলার জঙ্গলে গিয়া কঠোর যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হন। ছয় বৎসর কাল নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়া, তিনি বুদ্ধগয়ায় আগমন করেন। নৈরঞ্জন নদীর তীরে, বোধিবৃক্ষমূলে তাঁহার সিদ্ধি লাভ হয়। ইহার পর বুদ্ধদেব বারাণসী-ধামে গমন করিয়া আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ৪৫ বৎসর ধর্ম্মমত প্রচারের পর, আশী বৎসর বয়সে তাঁহার নির্ব্বাণ-লাভ হইয়াছিল। নানা মতান্তর থাকিলেও গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব-কাল সাধারণতঃ ৫৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর বহু নরনারী এক্ষণে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। ভারতবর্ষ যদিও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান; কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা অন্যান্য দেশে—এসিয়ার পূর্ব্বাংশে, চীন-জাপান প্রভৃতিতে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের সংখ্যা অনেক অধিক। *

তুলনায় অল্প দিন হইল ভারতবর্ষে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। যীশু খৃষ্টের নামানুসারে খৃষ্টান ধর্ম্ম ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের ১৯১৪ বৎসর পূর্ব্বে এশিয়া মাইনরে, পালেস্তাইন প্রদেশের নাজারেথ নগরে, কুমারী মেরীর গর্ভে, যীশু খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া পরিবর্ণিত। তাঁহার জন্মকাল হইতে যে অব্দ প্রচলিত, তাহাই খৃষ্টাব্দ নামে প্রসিদ্ধ। যীশু খৃষ্টের জন্মকালে, পালেস্তাইন প্রদেশ রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং অগাষ্টাস সিজারের শাসনাধীন ছিল। সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে হেরড-বংশীয় হেরড এন্টিপাস জুডিয়া-প্রদেশ শাসন করিতেন। সেই সময়ে ঐ প্রদেশে 'জুডাইজম্' † নামক য়িহুদী-দিগের ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। সেই ধর্ম্ম নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন—এই ভাব প্রকাশ করিয়া, যীশু খৃষ্ট নবধর্ম্মমত-প্রচারে প্রবৃত্ত হন। জুডিয়া-প্রদেশবাসী য়িহুদীগণ তাহাতে যীশু খৃষ্টের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠেন। কথিত হয়, যীশু খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে, তিনি প্রচলিত ধর্ম্ম মতের বিরুদ্ধবাদী হইবেন বলিয়া কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হেরড শৈশবকালেই যীশু খৃষ্টকে হত্যা করিবার জন্য

খৃষ্ট-সম্প্রদায়।

---

* 'বৌদ্ধ-দর্শন' প্রসঙ্গে (প্রথম খণ্ড, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে) বৌদ্ধ-ধর্ম্মের স্থূল তত্ত্ব পরিবর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় বিশদভাবে পরবর্ত্তী খণ্ডে আলোচিত হইবে।

† আব্রাহামের বংশধরগণ জু বা য়িহুদী নামে পরিচিত। আব্রাহাম—ইউফ্রেতিজ নদীর পশ্চিম তীরস্থিত চালডিস রাজ্যের 'অর' হইতে আসিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থিত 'কানান' বা পালেস্তাইনে বসতি করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ মিশরে গমন করিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। মোজেস তাঁহাদের উদ্ধার-সাধন করেন। মোজেস কর্ত্তৃক তাঁহারা কানানে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হন। মোজেস 'জেহোবা' নামক ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ঘোষণা করেন। আব্রাহামের বংশধরগণ ক্রমশঃ মোজেসের মতানুবর্ত্তী হন। জেহোবা—সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া সম্পূজিত হইয়া থাকেন। যীশুখৃষ্টকে য়িহুদীগণ পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তাই তাঁহাদের নিকট যীশুখৃষ্ট নির্য্যাতনগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছিলেন। হেরডের সেই সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া, যীশু খৃষ্টকে মিশরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে যীশু খৃষ্ট সংসার ত্যাগ করেন। সেই সময়ে য়িহুদী-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিয়া 'জনের' নিকট তিনি ধর্ম্ম-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যীশু খৃষ্ট ধর্ম্ম-সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তৎপরে তিন বৎসর আপন ধর্ম্মমত প্রচার করেন। সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার দ্বাদশ জন শিষ্য হইয়াছিল। কিন্তু য়িহুদী-গণ তাঁহার প্রতি এতই বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়াছিলেন যে, যীশুর প্রাণবধের জন্য চারিদিকে চক্রান্ত চলিতেছিল। এক জন শিষ্যের ষড়যন্ত্রে যীশু খৃষ্ট য়িহুদীদিগের হস্তে বন্দী হন। য়িহুদীগণ ক্রুশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করে। যে দিন যীশু খৃষ্টের সংহার সাধন হইয়াছিল, সেই দিনের নাম—'গুডফ্রাইডে'। সেই হইতে খৃষ্টানগণ আজি পর্য্যন্ত সেই দিন স্মরণ করিয়া আসিতেছেন। কথিত হয়, মৃত্যুর তিন দিবস পরে যীশু খৃষ্ট কবর হইতে উত্থান করিয়া মেরি প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। খৃষ্টান ধর্ম্ম—য়িহুদীদিগের প্রাচীন 'জুডাইজম্' ধর্ম্মের নূতন সংস্করণ বলিয়া কথিত হয়। য়িহুদী-বংশেই যীশু খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন; য়িহুদীদিগের জুডাইজম ধর্ম্মের বিলোপ-সাধনে যে তিনি কোনরূপ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহার বাক্যাবলীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'মাউণ্ট' পর্ব্বতে ধর্ম্মোপদেশ কালে যীশু খৃষ্ট স্বয়ং সেই কথাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি কোনও ধর্ম্মমত ধ্বংস করিতে আসি নাই; ধ্বংস করা অপেক্ষা পূর্ণ করাই আমার অভিপ্রায়। "যীশুখৃষ্ট-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত প্রধানতঃ দুইটী নীতি এবং দুইটী কর্ত্তব্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই নীতি দুইটী—(১)—ঈশ্বরকে পিতৃরূপে দর্শন, এবং (২) মনুষ্য-মাত্রকে ভ্রাতৃরূপে গ্রহণ। কর্ত্তব্য দুইটী—(১) ঈশ্বরে ভক্তি, (২) মনুষ্যে প্রেম। মূলে খৃষ্টান-ধর্ম্মের ইহাই সার মর্ম্ম বটে; কিন্তু এক্ষণে উহার নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাই এখন রোমান ক্যাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট, জেসুইট, সিরীক, নেষ্টারিক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। সামান্য সামান্য মত-পার্থক্য হেতু ঐ সকল সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ আগমন করেন। পোর্ত্তুগাল-রাজ ইমানুয়েল এবং তাঁহার পুত্র 'জন' ভারতবাসীদিগকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা পাইয়াছিলেন। খৃষ্টান সমাজে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যীশু খৃষ্ট—জিসাস ক্রাইষ্ট (Jesus Christ) অর্থাৎ 'ঈশ্বর-প্রেরিত পরিত্রাণকর্ত্তা' নামে অভিহিত হন।

মুসলমান-সম্প্রদায়।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ, আরব দেশের মক্কা নগরে, ৫৭০ খৃষ্টাব্দে, জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লা, মাতার নাম আমিনা। কোরেশ-বংশে তাঁহার জন্ম হয়। মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পিতামহ তাঁহার লালন-পালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মহম্মদের আত্মীয়-স্বজন তাদৃশ ধনবান ছিলেন না। বাল্যকালে মহম্মদকে নানারূপ সাংসারিক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে খাদিজা নাম্নী জনৈক সম্পত্তি-শালিনী বিধবার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মুসলমানগণের ধর্ম্মগ্রন্থে প্রকাশ—মহম্মদের

জন্মগ্রহণ-কালে আরব-দেশ নানারূপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেই কুসংস্কার দূর করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্ত মহম্মদ মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হন। চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি আপন ধর্ম্মমত-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মক্কাবাসী কোরেশগণ সকলেই মহম্মদের বিরুদ্ধাচারে অগ্রসর হন। সেই সময়ে তাঁহার স্ত্রী খাদিজা ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার প্রতি দেশবাসীর শত্রুতাচরণের জন্ত, সেই সময়ই মহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৫ এ জুন এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা পলায়নের স্মৃতি 'হিজিরা' নামক অব্দে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। মদিনায় আগমনের পূর্ব্বে মহম্মদের দুইটী মাত্র অনুচর ছিল। মদিনায় আগমন-মাত্র বার জন ধর্ম্মযাজক তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। তার পর ক্রমে ক্রমে অধিবাসীরা দলে দলে মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মের নাম ইস্‌লাম ধর্ম্ম। 'ইস্‌লাম' অর্থ—ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর-পরায়ণতা। মুসলমানগণের মতে,— 'আল্লা ভিন্ন অন্ত ঈশ্বর নাই। আল্লার উপাসনাই প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা। যাহারা আল্লার উপাসনা না করে, তাহারা কাফের বা বিধর্ম্মী।' ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বিগণের জন্ত প্রধানতঃ পাঁচটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই পাঁচটী কর্ত্তব্য কর্ম্মের নাম—'ইরকান-ই-দিন' অর্থাৎ ধর্ম্মের ভিত্তি বা স্তম্ভ। সেই পাঁচটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম—(১) কালেমা পাঠ, (২) নমাজ (৩) রোজা, (৪) জাকাৎ, (৫) হজ। কালেমা-পাঠে অবগত হওয়া যায়—'সংসারে ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত কোনও দেবতা নাই। একমাত্র মহম্মদই ঈশ্বরের প্রেরিত দূত।' নমাজ অর্থে প্রার্থনা। প্রতিদিন পাঁচ বার মক্কা অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া নমাজ পড়িতে হয়। প্রতি শুক্রবারে বিশেষ প্রার্থনা আবশ্যক। রোজা অর্থ রমজানের ত্রিশ দিন দিবাভাগে অনাহার; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং সূর্য্যাস্তের পরে আহার করাই রোজার বিশেষ কার্য্য। জাকাৎ শব্দে পবিত্র-হওন। ভিক্ষাদানে এই পবিত্রতা সাধিত হয়। হজ অর্থাৎ মক্কায় তীর্থযাত্রা। মুসলমান-শাস্ত্র-মতে, ক্ষমতাপন্ন প্রত্যেক মুসলমানেরই হজ-যাত্রা একান্ত কর্ত্তব্য। মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম কোরাণ। যাঁহারা কোরাণের মতের অনুবর্ত্তী, তাঁহারাই মুসলমান অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত। কোরাণ আরবী ভাষায় পদ্যচ্ছন্দে লিখিত। মহম্মদের মুখ হইতে যে কোরাণের বাক্যাবলী নির্গত হইয়াছিল, তাঁহার শিষ্যগণ ২৩ বৎসর কাল চেষ্টা করিয়া কোরাণরূপে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কোরাণ ১১৪ সুরা বা অধ্যায়ে বিভক্ত। কোরাণে ৬৬১৬ আয়াৎ বা কবিতা, ৭৭৯৪৩টী শব্দ এবং ৩৩৮৬০৬টী অক্ষর আছে। মহম্মদ যেরূপে কোরাণ প্রাপ্ত হন, তাহার ইতিহাস এই—এক দিন রাত্রিকালে মহম্মদ হীরা পর্ব্বতে নিদ্রিত ছিলেন। সেই সময় স্বর্গীয় দূত জিব্রিল তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন; এবং গোল করিয়া বাঁধা কতকগুলি লেখা কাগজ তাঁহাকে প্রদর্শন করেন। মহম্মদ তখন লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু স্বর্গীয় দূতের স্বর্গীয় শক্তি-প্রভাবে তিনি তাহা পড়িতে পারেন। জিব্রিল-প্রদর্শিত যে লিপি মহম্মদ পাঠ করেন, পরিশেষে তাহাই তাঁহার মুখ হইতে কোরাণ-রূপে নির্গত হইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্মে বহু ঈশ্বরের এবং মূর্ত্তির পূজা নিষিদ্ধ। কোরাণ শিক্ষা দেন—'ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্ত্তা। মানুষ তাঁহার পূজা করিতে

সাধ্য; ঈশ্বরের আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার ইচ্ছার নির্ভর করাই মানুষের কর্ত্তব্য। মনুষ্যের পাপের অবধি নাই। সুতরাং ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা সর্ব্বদা প্রয়োজন। ঈশ্বর আপনার আদেশ জ্ঞাপন করিবার জন্যই মহম্মদকে মর্ত্ত্যভূমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শেষ বিচারের দিন সকলকেই তাঁহার নিকট আপন-আপন কার্য্যাকার্য্যের পরিচয় দিতে হইবে।' মুসলমান সম্প্রদায় এক্ষণে সিয়া, সুন্নি প্রভৃতি নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

ভারতবর্ষে আর আর যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছেন, তন্মধ্যে পার্শীদিগের ধর্ম্ম, শিখদিগের ধর্ম্ম, য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্শীদিগের ধর্ম্ম—জোরওয়াষ্ট্রীয়ান (Zoroastrianism) বা জোরওয়াষ্টার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের লক্ষাধিক অধিবাসী এই ধর্ম্মাবলম্বী। অতি প্রাচীন-কালে জোরওয়াষ্টার বা জারাথুস্ত্র ইরাণ-দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জোরওয়াষ্টার-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত এই যে,—'সৎ ও অসৎ আত্মার চির-বিরোধ চলিয়াছে। সৎ-আত্মা—অহুর-মজ্‌দ্ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ প্রভু নামে অভিহিত হন। সংক্ষেপে তিনি হর-মজ্‌দ্ নামে পরিচিত। তিনি স্বর্গের এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার সহকারিগণ 'আমেস্পেন্তা' বা পবিত্রাত্মা ও অমর বলিয়া অভিহিত; তাঁহারাই স্বর্গের অধিবাসী। তাঁহাদের নিম্ন স্তরে 'যাজাত'-দিগের অবস্থিতি। তাঁহারা প্রাকৃতিক পদার্থ-সমূহের তত্ত্বাবধায়ক। 'অতর' অর্থাৎ অগ্নি—অহুর-মজ্‌দের পুত্ররূপে সম্পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি পবিত্রতার আদর্শ। 'মিথ্‌্রা' অর্থাৎ মিত্র বা সূর্য্যদেবতাও অগ্নির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন। অন্য দিকে অসৎ আত্মার অধিপতির নাম—আবরো-মইন্যু বা আর-ইমান। অহুর-মজ্‌দের বাসস্থানের বিপরীত দিকে অন্ধকারময় স্থানে তিনি বাস করেন। অহুর-মজ্‌দের সৃষ্ট পৃথিবীতে তাঁহা হইতেই পাপের প্রবর্ত্তনা হইয়াছে; তাঁহা হইতেই সংসারে কাম, অপকার ও মৃত্যু প্রভৃতি স্থান লাভ করিয়াছে। তিনি সততার ও পবিত্রতার উচ্ছেদ-প্রয়াসী। অহুর-মজ্‌দ যেমন সৎ পদার্থ-সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন; আর-ইমান সেইরূপ অসৎ-পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। সৎ এবং অসতের মধ্যে দ্বন্দ্ব বার হাজার বৎসর চলিবে। সেই বার হাজার বৎসর অতীত হইলে, অসতের পরাজয়ে সতের প্রতিষ্ঠা হইবে।' পার্শীগণ আপনাদের উপাসনা-মন্দির মধ্যে সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত রাখেন। অগ্নির প্রতিই তাঁহাদের বিশেষ ভক্তি; সেই জন্য তাঁহারা অগ্নির উপাসক বলিয়া পরিচিত। অগ্নির উপাসনা, পার্শীদিগের মধ্যে জোরওয়াষ্টারের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, প্রতিপন্ন হয়। পার্শীদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থের নাম 'জেন্দ-আভেস্তা'। অনেকে বলেন, জোরওয়াষ্টারের ধর্ম্মমত ঐ গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে। আভেস্তা শব্দের অর্থ জ্ঞান; জেন্দ শব্দের আদি অর্থ—ভাষ্য। এখন উহার অর্থ—ভাষাবিশেষ। সুতরাং জেন্দ-আভেস্তা শব্দের অর্থ—জেন্দ-ভাষায় লিখিত জ্ঞানমূলক ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত,—(১) যস্ন (২) ভেন্দিদাৎ, (৩) যস্থ। যস্ন অর্থে যজ্ঞের ভাব, ভেন্দিদাৎ শব্দে বিধিবিধান এবং যস্থ শব্দে প্রার্থনা ও উপাসনা বুঝাইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ সময়ে ধর্ম্মযাজকগণ এবং জনসাধারণ

বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।

মিলিত হইয়া প্রার্থনা দ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন। পার্শীগণ মৃতদেহ দাহ বা কবরে প্রোথিত করেন না। তাঁহারা বলেন,—'মৃতদেহ প্রোথিত করিলে পৃথিবী কলুষিত এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিলে অগ্নি অপবিত্র হন।' সেইজন্য পার্শীগণ অত্যুচ্চ 'টাওয়ারে' বা প্রাসাদ-চূড়ায় মৃতদেহ রক্ষা করিয়া থাকেন এবং সেখান হইতেই সেই দেহ গৃধ্রাদি কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জোরওয়াষ্টার-প্রবর্ত্তিত পার্শী-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—সৎ কার্য্যে আনুরক্তি এবং অসৎ কার্য্যে ঘৃণা প্রকাশ। য়িহুদীদিগের ধর্ম্মের নাম 'জুডাইজম্' (Judaism)। তাঁহাদের মতে সৃষ্টিকর্ত্তার নাম—জোহোবা বা জোভ। তিনি স্বর্গে অবস্থিত আছেন। তিনি অক্ষয়, অব্যয়; তিনিই প্রভু; তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনিই ধ্বংসকর্ত্তা। অনেকে বলেন, জুডাইজম্ খৃষ্টধর্ম্মের জনয়িতা এবং জুডাইজম্ হইতেই খৃষ্টানগণ একেশ্বরবাদ শিক্ষা করিয়াছেন। ইতিহাসে প্রকাশ,—'আব্রাহামের বংশধর য়িহুদীগণ যখন মিশর দেশে বাবিলনে আবদ্ধ ছিলেন, সেই সময়ে পৌত্তলিকগণ তাঁহাদের প্রতি বড়ই অত্যাচার করেন। তাহাতে পৌত্তলিকতার প্রতি য়িহুদীগণের বিশেষ ঘৃণা জন্মে। ৪৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে কতকগুলি য়িহুদী বাবিলন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এজরা তাঁহাদিগকে স্বদেশে লইয়া আসেন। সেই সময়েই জেরুজিলামের প্রাচীর-সমূহ পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। এজরা ধর্ম্ম-যাজক-সংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ওল্ড-টেষ্টামেণ্ট নামক খৃষ্ট-ধর্ম্মগ্রন্থ এজরার চেষ্টায় ঐ সময়েই সঙ্কলিত হয়। পূর্ব্বে মোজেস যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যান, এজরা তাহার সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।' জেহোবার উপাসনা, তাঁহার উদ্দেশে বলিদান এবং সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ-ভাব রক্ষা—য়িহুদী সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য। ইহাঁদের শাস্ত্র-গ্রন্থে লিখিত আছে—ঈশ্বরের পুত্র এক সময়ে আবির্ভূত হইবেন। খৃষ্টানগণ তাঁহাকেই যীশুখৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। গুরু নানক কর্ত্তৃক শিখ-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের নিকট ইরাবতী নদীর তীরস্থিত তলবন্দ গ্রামে ক্ষত্রি-বংশে নানকের জন্ম হয়। উপনয়নের সময় নানক উপবীত-গ্রহণে আপত্তি করিয়া বলেন,—'উপবীত অর্থে সূত্র-ধারণ নহে। উপবীত অর্থে জগৎপিতার গুণানুকীর্ত্তন। সেই উপবীত ধারণ করিলেই মানুষ পরমেশ্বরের নিকট উপনীত হইতে পারে।' একেশ্বরবাদ প্রচার—নানকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ঈশ্বরই সর্ব্বনিয়ন্তা; কোনও মনুষ্যের কিছু করিবার সমর্থ্য নাই; ঈশ্বরে নির্ভরই শ্রেয়ঃ-লাভের একমাত্র উপায়—ইহাই নানকের মত। শিখদিগের ধর্ম্মপুস্তকের নাম—গ্রন্থ বা আদি-গ্রন্থ। নানকের ধর্ম্মমত সেই গ্রন্থে প্রকটিত। নানক-প্রচারিত ধর্ম্মমতের অনুসারিগণ 'নানকপন্থী' নামেও পরিচিত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই গুরু নানকের সম্মান করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে হিন্দু বলিতে এবং মুসলমানগণ তাঁহাকে মুসলমান বলিতে গৌরব অনুভব করিতেন। নানকের উত্তরাধিকারিগণ গুরু নামে প্রসিদ্ধ। তেগ বাহাদুর, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি গুরুগণের নাম শিখ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। অনুসন্ধান করিলে, ভারতবর্ষে যে আরও নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের

যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যে মহান্ আদর্শই চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হউক না কেন, ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম্মে—বৈদিক-ধর্ম্মে তাহার কোনও আদর্শেরই অসদ্ভাব নাই। যে একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তনার জন্য পরবর্ত্তি-কালে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের কোন্ শাস্ত্রে সে মত পরিবর্ণিত নাই? 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—অদ্বৈতবাদের এই ঘোষণা-বাণী প্রথমে কোন্ দেশে কোন্ কণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছিল,—কে না তাহা অবগত আছেন? রূপান্তরে নামান্তরে যে দেবদেবীর উপাসনায় পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারী আবহমান-কাল নিমগ্ন আছেন;—ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন্ দেশেই বা তাহার স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই? যে 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম আজিও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ নরনারীর ধর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত; সেই অহিংসা-পরম-ধর্ম্ম রূপ উপদেশ বাণী আমাদিগের শাস্ত্রগ্রন্থে কি তৎপূর্ব্বে বিঘোষিত হয় নাই? বেদে, উপনিষদে, দর্শনে—নানা স্থানে অহিংসা রূপ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে দেখিতে পাই। যে নীতি যীশুখৃষ্ট প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যে নীতি বুদ্ধদেবের কণ্ঠে নিনাদিত হইয়াছিল, যে নীতির প্রচার জন্য মহম্মদ প্রতিষ্ঠান্বিত,—সে সকল নীতির সারভূত কোন্ নীতি হিন্দুশাস্ত্রে পরিবর্ণিত হয় নাই? হিন্দু তাই স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন,—কোনও দেশের কোনও জাতি এমন কিছু নূতন দেখাইতে পারিবেন না—ভারতবর্ষের শাস্ত্রগ্রন্থে যাহার কোনও না কোনও পরিচয় দৃষ্ট হয় না! ভারতবর্ষে যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যে ভাব-পরম্পরা প্রস্ফুট হইয়া সুপ্ত অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তাহারই অংশবিশেষ সময়ে সময়ে বিকাশ প্রাপ্ত হওয়ায়, তদ্দৃষ্টে জনসাধারণ সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন। যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন,—এই ভারতবর্ষে সকলই ছিল, সকলই আছে, আবার সকলই উদ্ভূত হইবে। অদৃষ্ট-চক্রের পরিবর্ত্তনে কখনও কোনও ভাব সুপ্ত, কখনও কোনও ভাব জাগ্রৎ,—এই মাত্র পার্থক্য।

উপসংহার।

নির্ঘণ্ট।

অ

অক্ষয়বট ১২৫, ১২৭, ১২৮; রামায়ণে প্রাগবট নগরের নামে অক্ষয়বটের বিদ্যমানতার আভাষ ১২৫; হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট বৃহৎ বৃক্ষের প্রসঙ্গে ১২৬; যামি-উত্তারিথ গ্রন্থে ১২৭; আকবরের রাজত্ব-কালে আবুল-কাদিরের উক্তিতে ১২৭; কানিংহামের বর্ণনায় ১২৮।
অক্ষর—'বর্ণমালা' দ্রষ্টব্য; দূরত্ব অনুসারে অক্ষরের আকৃতির পার্থক্য ৪২৩; মৌর্ত্তিক অক্ষর ৪০৮-৪১১; নানা ভাষার অক্ষর ৪২৩-৪৩৫; প্রথম অক্ষর খোদাই ৪৩৯; ভারতবর্ষে প্রথম অক্ষর (তামিল) খোদাই ৪৪০; বঙ্গাক্ষরে প্রথম গ্রন্থ ও সংবাদপত্র ৪৪০; শ্রীরামপুরে অক্ষর খোদাই ৪৪১; দেবনাগর, তেলেগু প্রভৃতি অক্ষর খোদাই ৪৪১
অক্ষস (অক্ষাস) ২০, ৩৬
অগাষ্টাস সিজার ৫০১
অগ্নিকুল ৩৫৬
অগ্নিতীর্থ ১৩৭
অগ্রদানী ৩৫০
অঘোরঘণ্ট ৪৮৫
অঙ্গ ২৫৯
অঙ্গদ ১০৩
অঙ্গদিয়া ১০৩
অঙ্গদেশ ২৫৯; অঙ্গদেশের সীমানা ২৫৯।
অজন্তা ১৬০
অজমীঢ় ২৭
অজাতশত্রু ১১৮,১১৯,১৬৯,১৭০
অজিতনাথ ৪৯৮
অঞ্জসী ১১
অতর (আতার) ৩০, ৫০৪
'অতিক্রদাব'—তাৎপর্য্য ১৭, ১৮
অতীত (সম্প্রদায়) ৪৯১
অদীন বা ওদিন ৪১, ৪৫০
অদ্বৈতাচার্য্য ৪৭৭, ৪৭৯, ৪৮০
অনঙ্গপাল ৩৫৬
অনঙ্গভীমদেব ২৩৫
অনুবৈণেয় ১৯৯
অনোমা ১৯৭—২০০; বুদ্ধদেবের মস্তক-মুণ্ডণে ও সন্ন্যাস-গ্রহণে প্রসিদ্ধি ১৯৮।
অনোলা ১৯৯
অন্নগুন্দী ২৭৩, ২৭৫
অন্ধ্র (দেশ বা রাজ্য) ২৬৬—২৬৮; হুয়েন-সাঙের পরিদৃষ্ট দেশ ও অধিবাসিগণ ২৬৭। (আন্ধ্র দ্রষ্টব্য।)
অবন্তিবর্ম্মা ২৯৬; তদ্বংশীয় রাজগণ ও তাঁহাদের রাজত্ব কাল ২৯৫; কাশ্মীরে জলপ্লাবন ও বাঁধ-নির্ম্মাণ ২৯৫; তদ্বংশীয়গণের রাজ্য অবসানে রাজ্যে অশান্তি উপদ্রব ২৯৫।
অবন্তী-রাজ্য ২০৩-২০৫; মালব ও উজ্জয়িনী দ্রষ্টব্য।
অবমী ১৯৮
অব্দ—নেওয়ার ১৯৪; সংবৎ ও শকাব্দ ৩৭৭; খৃষ্টাব্দ ৫০১; হিজিরা ৫০৩।
অভিমন্যু (কাশ্মীর-রাজ) ২৯০
অমরহ্রদ ২৩৭
অমরাবতী ৯৯
অমিয়র (হ্রদ) ১৯৮
অম্বা ১১৯
অম্বালিকা ১১৯
অম্বিকা ১১৯
অযুত ২০১
অযুতো ১২৬
অযোধ ২০১
অযোধ্যা ৯১—৯৭; নামের হেতু ৯১; রামায়ণের বর্ণনায় ৯১; অযোধ্যার ধ্বংস ও পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ৯২—৯৩; হুয়েন-সাঙের পরিদৃষ্ট ৯৪, ৯৭; আইন-ই-আকবরীর বর্ণনায় ৯৬; সাকেত ও (অযোধ্যার অভিন্নত্ব ৯৭।)
অরস্তক ১৩৮
অর্ব্বুদ ২১৩
অলকট—(কর্ণেল) সংস্কৃত-ভাষা সম্বন্ধে ২৭
অশোক ২৮২, ২৯৭, ৩৬৯; তাঁহার লিপি ৪১৫—৪১৮; লিপির পাঠোদ্ধারে প্রিন্সেপ প্রভৃতি ৪১৬—৪১৭।
অশোকসেন ২৪৬
অশ্মনবতী ১১
অষ্টনগর ১০৫
অসি ১২০, ১২১
অসিক্নী ১১
অসুর ৩৫
অন্তেজ ১০৫
অস্থিপুর ১৩৮
অহিক্ষেত্র ১৪০
অহি-চি-টা-লো ১৪০
অহিচ্ছত্রা ১৪০—১৭২; প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিংবদন্তী ১৪০; একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে কাপ্তেন হগসনের

মতে উহার অবস্থান ১৪১; কানিংহামের মতে উহার অবস্থান ১৪১।
অস্থুর-মজ্দ্ ৩০, ৫০৪

আ

আইওনিয়ান ৪১৫, ৪৩০
আউদ (হায়ুদ) ৩১২
আকবর-নগর ২২১
আকৃতি (ভারতবর্ষের)—মহাভারতে ৮১; নীলকণ্ঠের টীকায় ৮২, ৮৩; কানিংহামের মতে ৮১; বায়ুপুরাণে ৮২; দেবীভাগবতে ৮২; বৃহৎসংহিতায় ৫২; এরাটোস্থেন্স, ষ্ট্রাবো পেট্রোক্লাস প্রভৃতির মতে ৮৪, ৮৫; হুয়েন-সাঙের মতে ৮৭; চীন দেশীয় গ্রন্থ মতে ৮৭; টলেমির বর্ণনায়।
আচারী (সম্প্রদায়) ৪৬৪
আচার্য্যকুয়া ৪৭৪
আজেনর ৩৩
আডাম স্মিথ—ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে ৩৬৩
আদম ৩৬৩
আদি—গ্রন্থ ১০; বাসস্থান (আর্য্যগণের) ১০; ভাষা ২৩, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৯৭; সভ্যতা ২৫; মনুষ্য-সৃষ্টি বিষয়ে ২৭
আদিকোট ১৪০
আদিনা মুসজিদ ২৪৬
আদিম (ত্রিগর্ত্তরাজ) ৩১১
আদিশূর ২৪৪—২৪৫; কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্বন্ধে মতান্তর ঐ; তাঁহার রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে আলোচনা ২৪৫; কৌলীন্য বিষয়ক ৩২৭—৩২৮।
আনক (আনকদুন্দুভি) ৩৩
আনন্দ ১৬৯
আনন্দগিরি ৪৮৯, ৪৯০
আনন্দপুর ২১১, ২১২
আনহলবরাপত্তন ৩৩৭, ৩৫৪
আন্ধ্র (ব্রাহ্মণ) ৩৪২; তাঁহাদের বাসস্থান ও যোলটি বিভাগ ৩৫২—৩৫৩; (দেশ) অন্ধ্রদেশ দ্রষ্টব্য।
আপয়া ১১
আবিসিনীয়া—নামের উৎপত্তি (হীরেণের মতে) ২৯
আবু ২১৩, ৫০০
আবুহসীন ২৯
আবুরিহাণ ১০৪, ২৯৮, ৩১১
আবুলফজেল ৩০৮
আব্রোমইন্যু ৫০৪
আব্রাহাম ৫০১, ৫০৫
আভেস্তা ৫০৪
আমিণ্টাস ৮৫
'আয়ত' — শব্দে, ভারতের ত্রিকোণত্ব প্রমাণ প্রয়াসে ৮২, ৮৪।
আয়ু ৪৩
আরইমান ৫০৪
আরবী (অক্ষর) ৪৩৫
আরিষ্টটল—জোরওয়াষ্টার সম্বন্ধে ৩২; ভাষা সম্বন্ধে ৬৩২
আরেবিয়া ফেলিক্স ৪২০
আর্জ্জিকিয়া ১১
আর্য্য—শব্দের উৎপত্তি ৩১; তাঁহাদের বিভাগ ১২; তাঁহাদের রক্ষক ১৪; তাঁহাদের আচার-ব্যবহার ১৪; তাঁহাদের ভাষা (ইন্দ্রালয়ে অবস্থিতি-কালে) ১৪; তাঁহাদের আদি-বাসস্থান ১৮—২৪ সরস্বতী প্রভৃতির প্রসঙ্গে ১৮; মরুদ্গণের প্রসঙ্গে ১৯; যক্ষু, কৃশম প্রভৃতির প্রসঙ্গে, ২০, ২১; ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় ২৩—২৪; তাঁহাদের উপনিবেশ ২৬—৪৭; তাঁহাদের সভ্যতা ২৫—২৭; জোরণস্ জারণার মত ২৬; থরণটনের মত ৪৭; ভাষা-শিক্ষার জন্য উত্তর-দেশে গমন-প্রসঙ্গ ২১—২৩; তাঁহাদের আদি-বাসস্থান — কর্জ্জনের মতে ২২—২৩; মুইরের মতে ২২; তাঁহাদের আধিপত্য-বিস্তার ২৫ — ৪৭; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গতি-বিধি ২৫—২৬; জোরওয়াষ্টার ধর্ম্মের উৎপত্তি-তত্ত্ব আলোচনায় পারস্যের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ প্রসঙ্গ ৩১; ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে তাঁহাদের আধিপত্য ৪৬; টড ও এল্ফিনষ্টোনের মত ৪৬
আর্য্যনিবাস (প্রাচীন) ১০—২৪; মতান্তরে ১২—১৪
আর্য্যপালি ৪১৫
আর্য্যাবর্ত্ত ৫৬
আর্স (গ্রীকদেবতা) ১৯
আলফাবেট (Alphabet) ৪৩৩; শব্দের অর্থ ৪৩৩; আবিষ্কর্ত্তা ফিনিসীয়গণ ৪৩৩; নামধেয় বর্ণমালা ৪৩৫।
আলতমাস ৩১৪
আলবারুণি ১০৪
অলাউদ্দিন ২৪৬, ২৪৭, ৩১৪
আলিকালি—শব্দের অর্থ ৪৩৩; ঐ নামধেয় বর্ণমালা-সমূহ ৪৩৩—৪৩৪।

আলিবর্দ্দী ২৪৭
আলেকজাণ্ডার —— তৎকর্ত্তৃক ভারত-আক্রমণ-প্রসঙ্গ ৭২; তৎকর্ত্তৃক ভারতের ভৌগোলিক-তত্ত্ব সংগ্রহ ৮৪; তৎকর্ত্তৃক সিন্ধু-নদে সেতুনির্ম্মাণ ৮৫; তাঁহার ভারতবর্ষে আগমন ১৬৭; তাঁহার সময়ে ভারতের বর্ণমালার প্রসঙ্গ ৪১৩—৪১৪।
আলেকজাণ্ডার ব্রিজ ৮৫
আলোর ৩০৩; অবস্থিতি সম্বন্ধে প্রাচীন উপাখ্যান ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ৩০৩।
আল্লাহাবাদ ১২৬
আসাম ২২৩
আসামী—ব্রাহ্মণ ৩৫০; ভাষা—৩৮২।
আসিরীয়া ৩৪—৩৬; প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বাইবেলের বিবরণ ৩৫; আসিরীয়া বা আসুরীয়া নামের তাৎপর্য্য ৩৫; আদিম রাজা ও রাজ্য-প্রাতষ্ঠা ৩৫; রাজ্যের বিস্তৃতি ৩৬
আহিরীয় (জাতি) ৩৫৬

ই।

ইংরেজী—ভাষা ৩৮৪, ৩৯৩; বর্ণমালা ৪৩৫।
ইউক্রেটাইডস্ (দি গ্রেট) ১০৮; তাঁহার সম্বন্ধে ষ্ট্রাবোর মত ১০৮।
ইউচেণ্টা ১৬০
ইউফ্রেতেজ (নদী) ৩১
ইউসেবিয়াস ২৯
ইডুমেন ৩৩৪
ইথিওপীয়া ২৮—৩০; ভারতের সহিত সম্বন্ধ— ঐ; তৎসম্বন্ধে জেন্স্, ফিলস্ট্রেটাস, ইউসেবিয়াস, আফ্রিকেনাস প্রভৃতির মত ২৯—৩০
ইদার ২১২, ২১৬
ইন্দরপথ ১৩৪
ইন্দরালয় ১৩, ১৬
ইন্দো-ইউরোপীয়—ভাষা-প্রসঙ্গে ৩৭৬, ৩৮০, ৩৮১; তাহার শাখা-সপ্তক ৩৯২, ৩৯৭।
ইন্দো-এরিয়ান—ভাষা-প্রসঙ্গে ৩৭১, ৩৮২, ৩৮৬।
ইন্দো-চীন—ভাষা-প্রসঙ্গে ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৯৭।
ইন্দো-পালি ৪১৫, ৪১৮, ৪১৯
ইন্দো-ব্যাকত্রিয়—বর্ণমালা-প্রসঙ্গে ৪১৫, ৪১৮, ৪১৯।
ইন্দ্র ১৩—১৬; জেন্দ আভেস্তার মত ৩০।
ইন্দ্রদ্বীপ ৫২, ৫৫
ইন্দ্রপ্রস্থ ১৩৪
ইন্দ্রশীলাগুহা ১৮৪
ইন্দ্রালয় ১৩, ১৪, ১৬
ইবন বাতুতা ২১৪, ৩০৬
ইমারেথিয়া ৩৪
ইয়েমেন—৩০৬; ফিনিসীয়া, মিশর, সিরীয়া প্রভৃতির সহিত বাণিজ্য-ব্যাপারে তাহার প্রসিদ্ধি ৪২০।
ইরাক আরাবী ৩৪
ইরাণ ৩০, ৩১; পারস্য দ্রষ্টব্য।
ইরাণীয় অক্ষর ৪১৫, ৪২০
ইরাবতী ১১
ইরিথ্রা ৩৩
ই-লান-না-পো-ফা-তা ১৮৫
ইলিয়ট—সিন্ধুদেশ সম্বন্ধে তাঁহার মত ৩০২, ৩০৬
ইলোর ২৭৬
ইল্লাহাবাদ ১২৬, ১২৮
ইসলাম—'মুসলমান'
ইসিগিলি ১৮১
ইস্মেলাইটিস ৩৩৪

ঈজিপ্ত—২৮, মিশর দ্রষ্টব্য।
ঈশানপুর ২৪৯

উ।

উইলকিন্স ৪৪০
উইলফোর্ড—উত্তর কুরু সম্বন্ধে ৩১৬; লিপি-সম্বন্ধে ৪১৭।
উইলসন (ডাঃ)—জাতি সম্বন্ধে ৩৪৩
উইলসন (এচ্, এচ্)—পালি ও সংস্কৃত ভাষার আদিমত্ব বিচারে ৩৬৯; অশোক-সম্বন্ধে ৩৭০
উগ্রসেন ১৫১, ১৫২
উ-চ ২৩৭
উচ্ছিষ্ট-গণপতি ৪৮৫, ৪৯৬
উজৈন ২০৫
উজ্জন্তা ১১৬, ১৬০
উজ্জয়িনী—গ্রাম ১১৪; রাজ্য ২০৩—২০৯; ষষ্ঠ শতাব্দীর ২০৭—২০৯; মেঘদূতের বর্ণনানুসারে ২০৭—২০৯; হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট ২০৬; মৃচ্ছকটিকের বর্ণনায় ২০৭-২০৯; রাজা বিক্রমাদিত্যের [illegible]-কালে ২০৫—২০৬
[illegible]ন ১১৫
উড়িয়া (ভাষা) ৩৮২; উৎকল দ্রষ্টব্য।
উতিতো (উদিত) ৩১১
উৎকল—রাজ্য ২৩১—২৩৭; পুরাতত্ত্ব ২৩১—২৩২; শ্রীচৈতন্যের আগমন-প্রসঙ্গে

২৩৬; তত্রত্য তীর্থ-স্থানাদি ২৩২; ইতিবৃত্ত ২৩২—২৩৭; রাজন্যবর্গ ২৩৪—২৩৫; হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট ওড্রদেশ ২৩৭
তৎকালীন ব্রাহ্মণ ৩৪২; ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ও বিভাগ-দ্বয় ৩৪৭; তাঁহাদের শ্রেণি-বিভাগ ৩৪৭, ৩৪৮; তাঁহাদের গোত্র ৩৪৭; মধ্য-শ্রেণী ৩৫০।
—বর্ণমালা ৪৩৪; ভাষা ৩৮২, ৩৮৬; ভাষার আদর্শ ৩৮৮, ৩৮৯।
উত্তরকুরু ১৪; অবস্থিতি বিষয়ে আলোচনা ৩১৫—৩১৮; উইলফোর্ডের মতে ৩১৬।
উত্তর কুরুবর্ষ ১৩
উত্তর কোশল ৯৮, ১০১
উত্তর দণ—আর্য্যগণের ভাষা-শিক্ষার্থ গতিবিধি প্রসঙ্গে ২১—২৩।
উত্তর মগধ ১২
উৎপল-বংশ ২৯৪
উৎপলাপীড় (কাশ্মীর-রাজ) ২৯৪; তাঁহার রাজত্বে কর্কোটক বংশের অবসান ২৯৫; কাশ্মীরে উৎপল-বংশের প্রতিষ্ঠা ২৯৪।
উৎপলারণ্য ২০১, ২০২
উদম্বর (ব্রাহ্মণ) ৩৫৫
উদয়গিরি ১৮১, ২৩২
উদয়ন ১২৯, ২০৫
উদয়াদিত্য ৩১৪
উদাসী ১৬৪
উদেন ৪৫০
উন্মত্তাবন্তী (কাশ্মীর-রাজ) ২৯৫; তাঁহার নৃশংসতার কাহিনী ২৯৫
উপরিচর বসু ৩০৯
উপাখ্যান—(বিবিধ)—কবীরের লোকান্তর বিষয়ে ৪৬৭; কর্ণ-সুবর্ণ-রাজের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে ২৫৭; কান্যকুব্জ বা কন্যা-কুব্জ নামের উৎপত্তি বিষয়ে ১৮৮, ১৮৯; কোশম পল্লীতে কৌশাম্বী নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে ১৩০; জয়াপীড়ের গৌড়ে অবস্থান বিষয়ে ২৫১—২৫২; জলন্ধর প্রদেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে ৩১০; তাম্রলিপ্তের নামকরণ সম্বন্ধে ২৫৩; নরকাসুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে ২১৬—২২৭; পুণ্ড্র রাজের সম্বন্ধে ২৪১; বুদ্ধদেবের সাঙ্কাশ্যায় অবতরণ সম্বন্ধে ১১৪; মীরাবাইর ভগবানে লীন হওয়া সম্বন্ধে ৪৭৬; মুঞ্জের বৈরাগ্য সম্বন্ধে ৩১৪; সিন্ধুদেশের রাজধানী দেবল সম্বন্ধে ৩০৭; সিন্ধু-রাজ দিলু ও ছোট সংক্রান্ত ৩০৭; হূণগণের উৎপত্তি বিষয়ে ৩১৯-৩২০।
উভারো ১৮১
উ-শে-এন-না ২০৭

ঋ।

ঋগ্বেদ—তদুক্ত নদ-নদী ও নগর-জনপদাদির প্রসঙ্গে আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান নির্ণয় ১০-১২; প্রস্কোকাদি শব্দের আলোচনায় আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান প্রসঙ্গ ১২-১৮; ঋগ্বেদোক্ত সরস্বতী নদীর প্রসঙ্গে ১৮-১৯; 'মরুদ্গণ' শব্দের আলোচনায় ১৯; মনু, রুশম প্রভৃতির প্রসঙ্গে ২০; বেদোক্ত অন্যান্য তত্ত্বের আলোচনায় ২১-২৩; বেদের শাখা, স্থান প্রভৃতির পরিচয়ে ব্রাহ্মণের পরিচয়-প্রসঙ্গ ৩৪২; বেদী ও শাখী শব্দে ব্রাহ্মণের গোত্রাদির পরিচয় ৩৪২; সাকার, নিরাকার, একেশ্বর ও বহু দেবদেবীর উপাসনা ৪৫৫; বেদোক্ত দেবদেবীর নাম ৪৫৫—৪৫৬
ঋণঞ্জয় ২০, ২১
ঋষভ ৯২
ঋষভদেব ৪৯৮

এ।

একগিরি ১৮৪
এগবার্টানা ৩৫
এগিরিয়ম ১৭২
এজুরা ৫০৫
এণ্টিওক ৪১৫
এণ্টিওকাস ৪১৫
এণ্টিকিমি ৪১৫
এণ্টিওকাস সোটার ৮৪, ৮৫
এণ্টিপাস (হেরড) ৫০১, ৫০২
এদ (ধর্ম্মপুস্তক) ৪১
এন-মো-লো ২৪৯
এরাটোস্থেনস—ভারতবর্ষের আকৃতি সম্বন্ধে ৮৪
এরিয়ান—(ভাষা) ৩৯২
এরিয়ানা ৩৯৭
এরিয়ানো-পালি ৪১৫
এলিফিনষ্টোন — আর্য্যগণের ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপ-পুঞ্জ অধিকার সম্বন্ধে ৪৬; কাশ্মীরের সম্বন্ধে ৩০৮; কনোজ-সম্বন্ধে ১৯১

এলাহাবাদ ১২৪-১২৭; প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত ১২৬; অশোক স্তম্ভ ১২৬।
এন্ঠেভো (কাদার) ৪৪০
এসিয়স ৩৯
এসিয়া—নামের হেতু ৪৭

ঐ।

৩১
ঐতান ৩১

ও।

ও-ই-মু কি ১২৬
ও-চা-লি ২১২
ওজিনি ২০৫, ২০৬
ওড় ২৩৭
ওড্র ২৬, ২৩১, ২৩৭, উৎকল দ্রষ্টব্য।
ওতরকোরা ৩১৬
ওদম্বর ২১৩
ও-নন-তো-পু-লো ২১২
ওয়াস্তিপুর ২১৯
ওয়ার্ড ৪৪১
ওয়ালিদ (খলিফা) ৩০১
ওরাওন ৩৬০, ৩৭৫
ওরাতুরে ২১৩
ওরাতে ২১৩
ওল্ড টেষ্টামেণ্ট ৫০৫

ঔ।

ঔড্র ২৫
ঔদম্বতীর ২৮০
ঔদম্বর ২৫০
ঔদীচ্য (ব্রাহ্মণ) ৩৫৪
ঔমী ১৯৭—১৭৯
ঔর্ণনাভ ১৪, ১৫

ক।

কংস ১৫১, ১৫২
ককশুক ২০৫
ককুরা ১৯৫
কঙ্ক ১৪৪
কঙ্কণ—কোঙ্কণ দ্রষ্টব্য
কচ্চায়ন ৩৯৮
কচ্ছ—রাজ্য ২৮০-২৮২; নামকরণ সম্বন্ধে লাসেনের যুক্তি ২৮০
কচ্ছেশ্বর ২৮০
কঞ্জেভরম ২৭০
কণ্টক (বংশ) ২৯৬
কনিষ্ক ১৫৪, ২৮৮; বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার প্রসিদ্ধি ২৮৮-২৮৯; তাঁহার রাজত্বকাল নির্ণয়ে রাজতরঙ্গিনীর পরস্পর বিরোধী দ্বিবিধ উক্তির সামঞ্জস্য বিধানে ২৮৯; গোনর্দ্দের রাজত্বকাল নির্ণয়ে অসামঞ্জস্য-হেতু
কনিষ্কের রাজত্বকাল-নির্ণয়ে অসামঞ্জস্য ২৮০—২৯০
কনোগিজ ১২৩
কনোজ—রাজ্য ১৮৮—২০২; পুরাবৃত্ত ১৮৮-১৮৯; রামায়ণে ১৮৮; অবস্থানাদির প্রসঙ্গ ১৯৮-১৯২; এলফিনষ্টোন প্রভৃতির মত ১৯১; হুয়েন-সাঙের মতে ১৯১; ফেরিস্তা গ্রন্থে ও টডের রাজস্থানে ১৯১; আবুজাইদের মতে ও মাসুদির বর্ণনায় ১৯২; প্রাচীন ও আধুনিক ১৯২-১৯৩; ভিন্ন ভিন্ন নাম ১৮৮; কান্যকুব্জ বা কনোজীয় ব্রাহ্মণ ৩৪২; তাঁহাদের বাসস্থান ও তিনটী প্রধান বিভাগ ৩৪৫; দশটী প্রধান উপাধি ৩৪৬; ভিন্ন ভিন্ন উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ৩৪৬
কন্নকুব্জ, কন্যাকুব্জ ১৮৮, ১৮৯
কপালমোচন ২৫৩
কপিথা ১১৬
কপিলনগর ১৯৫
কপিলবস্তু ১৬৮, ১৯৫-১৯৭; হুয়েন-সাঙের পরিদৃষ্ট ১৯৫
কপিশা ১০৩
কপোতিকা (মঠ) ১৮৫
কবীর ৪৬৫-৪৭০; জন্মবৃত্তান্ত ৪৬৬; রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ ৪৬৭; অলৌকিক লোকান্তর ৪৬৭; তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের আগ্রহ ৪৬৭; কবীরপন্থী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ৪৬৭; কবীর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত ও তাঁহার দোঁহা ৪৬৮; সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ ৪৬৯; কবীরের দ্বাদশ শিষ্য হইতে দ্বাদশ শাখার উৎপত্তি ৪৭০
কবীর-চৌর (কবীর-চৌড়) ৪৬৯, ৪৭০
কবীরপন্থী ৪৬৭; কবীর দ্রষ্টব্য।
কমলাকর ভট্ট ৩৪০
কম্বোজ ২৬, ১৮৬, ৩২০
করণ ৩২৪, ৩৩১
করতোয়া ২২৬, ৪৯৩
করমণ্ডল ২৮৬
করাচী ২৮১, ৩০৬
কর্ণসুবর্ণ (রাজ্য) ২৪৮, ২৫৫—২৫৭; হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় ২৫৫, ২৫৬; অবস্থান সম্বন্ধে মতান্তর ২৫৫
কর্ণাট—রাজ্য ২৭৮—২৮০; গ্রাণ্ট ডাফের বর্ণনায় কর্ণা-

টের অবস্থিতি প্রসঙ্গ ২৭৮; প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ২৭৮; অন্যান্য ২৭৯, ২৮০; ব্রাহ্মণ (কার্ণাটিক) ৩৪২; ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান এবং তাঁহাদের বিভাগ ৩৫৩; ভাষা (কার্ণাটিক বা কেনারি) ২৮২; ভাষার আদর্শ ২৯০
কর্ণাবতী ২১৭
কর্ত্তাভজা ৪৮০—৪৮১
কর্ণাল ১৪৪
কলিঙ্গ—দেশ ৭৩, ২৩১; রাজ্যের বিবরণ ২৬০—২৬৩; মেগাস্থিনীস ও প্লিনির বর্ণনায় ২৬১, হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় ২৬২; কলিঙ্গের বিভিন্ন নাম ২৬২; কানিংহামের সিদ্ধান্ত ২৬১; অন্যান্য ২৬৩
কলিনিপক্স ১৯২
কল্ডওয়েল—ভাষা-প্রসঙ্গে ৩৭৩; তৎকর্ত্তৃক দ্রাবিড়ী-ভাষার দ্বাদশটী বিভাগ ৩৭৪; গ্রিয়ার্সনের সহিত তাঁহার মত-পার্থক্য ৩৭৪—৩৭৫; দ্রাবিড়ী-ভাষার অপ্রচলিত শাখা-সমূহের পরিচয়ে ৩৭৫; অসভ্য-জাতিগণের ভাষার উল্লেখে ৩৭৫; মধ্য-এসিয়া হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভাষার বিস্তৃতি বিষয়ে ৩৯২
কল্যাণদেবী ২৫১, ২৬১
কল্যাণী ২৭৫
কল্লিয়ানা ২৭৫
কষ্টার ৪৩৯
কসেরুমান ৫১, ৫৫
কাইথি (বর্ণমালা) ৩৮৬
কাওটি (চীনরাজ) ৩১৯
কাকজোল ২২১
কাকতি ২৬৮
কাকুপুর ২০১, ২০২
কাজুরহ ২১৪, ২১৫
কাঞ্চীপুর ২৭০, ২৭১; কঞ্জেভরম দ্রষ্টব্য।
কাণ্ডুলীয় ৪৮৫
কানফাট (যোগী) ৪৯১, ৪৯২
কাহুঙ্গি ১৯২
কাণ্ব (ব্রাহ্মণ) ৩৫০, ৩৫১
কানাড়া ২৭২
কানান ৫০১
কানিংহাম—প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক জ্ঞান বিষয়ে ৯০; প্রাচীন ভারতের জনপদাদির অবস্থান বিষয়ে ৫৫; অযোধ্যা প্রসঙ্গে ১০১; তক্ষশীলা সম্বন্ধে ১০৯; বিদেহ প্রসঙ্গে ১১৫; সাঙ্কিসা প্রসঙ্গে ১১৭; প্রয়াগ প্রসঙ্গে ১২৭; বারাণসী প্রসঙ্গে ১২২; থানেশ্বর প্রসঙ্গে ১৩৬; অহিচ্ছত্র প্রসঙ্গে ১৪১; বিরাট প্রসঙ্গে ১৪৬; গুর্জ্জর প্রসঙ্গে ১৬০; মগধ প্রভৃতির প্রসঙ্গে ১৭৭; কনোজ প্রসঙ্গে ১৯৩; কপিলবস্তু প্রভৃতির প্রসঙ্গে ১৯৬; পুণ্ড্র বর্দ্ধন প্রসঙ্গে ২২১; ওড্রদেশ প্রসঙ্গে ২৩৭; তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে ২৫৫; কলিঙ্গ প্রসঙ্গে ২৬২; সিন্ধুদেশ প্রসঙ্গে ৩০৪; ত্রিগর্ত্ত রাজ্য প্রসঙ্গে ৩০৭; ভাষা ও লিপি বিষয়ে ৩৭০, ৪১৬, ৪১৭, ৪৩১; প্রাচীন মুদ্রার প্রসঙ্গে ৪১৮; বর্ণমালার প্রসঙ্গে ৪২২, ৪২৮
কান্দাহার ১২, ৩২০
কান্যকুব্জ ১৮৮, ১৮৯; ব্রাহ্মণ ও ভাষা—কনোজ দ্রষ্টব্য।
কাপালিক ৪৮৫
কাপুরদিগিরি ৪১৬
কাবুল ১১
কামরূপ—(রাজ্য) ২২৩—২৩১; রাজ্যের ইতিবৃত্ত ২২৬—২২৯; হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় ২২৯; তীর্থাদির পরিচয় ২৩০-২৩১; পীঠ ৪৯৩
কামাখ্যা (দেবী)—মন্দির-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কিংবদন্তী ২৩০; কালাপাহাড় কর্ত্তৃক ধ্বংসের ইতিবৃত্ত ২২৮; পীঠস্থিতা দেবী ৪৯৩
কামাতিপুর ২২৮, ২৪৭
কাম্পিল্য ১৪০—১৪২; অহিচ্ছত্র দ্রষ্টব্য
কাম্বোডিয়া ২৬
কায়স্থ ৩২১, ৩৫৬
কারারি (ব্রাহ্মণ) ৪৮৫
কার্ণাটিক—ভাষা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সম্বন্ধে 'কর্ণাট' দ্রষ্টব্য
কার্থেজ ৩৩
কার্হতক (কার্হার ব্রাহ্মণ) ৩৫০, ৩৫১
কালডিয়া ৩৪
কালডীয় ৩৪
কালযবন ১৫২, ১৫৩
কালাপাহাড় ২২৮, ২৩৬, ২৪৮
কালিকাবর্ত্ত ১৫৭
কালিঞ্জর (কলিঞ্জর দুর্গ) ২১৭, ২১৮, ৩১৬
কালী—নদী ১৯৩
কালী—আবির্ভাব ও উপাসনা ৪৮৩—৪৮৫; চণ্ডীতে মূর্ত্তি ৪৮৫
কালিদাস ২০৫, ৩১৩
কাশাই (জাতি) ২৩
কাশায় (স্তূপ) ২০০
কাশাপুর ১৩১

কাশী (রাজ্য) ১৩৩; শাস্ত্রাদিতে বিস্তৃতি প্রভৃতি ১১৮, ১২১; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে কাশীর অবস্থা ১২১, ১২২; কাশীতে বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্ম্মমত প্রচার ১২১; কাশীর ধ্বংস ও তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ১২৩; টলেমির গ্রন্থে কাশীর উল্লেখ ১২৩; হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় ১২২; পুরাবৃত্ত ১২২—১২৩।
কাশীদা ১২২
কাশীদিয়া ১২২
কাশীনাথ ১৪৪
কাশীপুর ১৪৩, ১৪৪
কাশীয় (বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ স্থান) ২০২
কাশেয়র ২০০
কাশ্মীর—রাজ্য ১৯, ২৮৪—২৯৯; উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকা ২৮৪; নামের তাৎপর্য্য ২৮৫; পথ্যাস্বস্তির প্রসঙ্গে মহাত্ম্য কথা ২৮৫; পুরাণাদিতে ২৮৬; জরাসন্ধের অনুগামী নৃপতিগণের প্রসঙ্গে কাশ্মীর রাজ গোনর্দ্দের উল্লেখ ২৮৬; কাশ্মীরে ম্লেচ্ছাধিপত্য ২৯০; প্রজা-বিদ্রোহ ২৯১; দুর্ভিক্ষ ২৯১; হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় ২৯৮; অধিবাসিগণ ও প্রাকৃতিক অবস্থা ২৯৯
কাসিম (মহম্মদ বিন) ৩০১
কাস্পিয়ান ৪৭
কিউ-কিউ-চ-পো-থো ১৭৮
কি-উ-চে-লো ১৫৯
কিয়া-ই ১৭৬
কিউ-পি-শ্বাং-না ১৪৩
কিয়া-ও-সা-লো ৯৮, ১০০
কিয়া-মো-লিউ-পো ২২৯
কিয়া-পি-থা ১১৬
কিয়া-সে-পু-লো ১৩১
কি-য়ে-চা ২১২
কিয়েন-টো-লো ১০৪
কিরাত সাগর ২১৮
কিরাত সিংহ ২১৭
কিল ৪৭০
কি-লো-না-সু-ফা-লা-না ২৪৮
ক্লিশোবোরস ১৫৩, ১৫৭
কীকট ১২
কীচক ১৪৫
কুকি ৩৫৯
কীর্ত্তিবর্ম্মা ২১৮
কুকুরা কটাচকা ২৩০
কুক্কুটপাদ ১১৮, ১১৯
কুচবিহার ২২৮, ২২৯
কুটাল ২৭৩
কুণ্ডণপুর ১৮৩
কুণ্ডিণ নগর ১৮৩
কুবলয়পীড় ১৫২
কুবলয়াদিত্য ২৯৪
কুভা ১১
কুমাররাজ ২২৮
কুরক বিহার ১৭৮
কুরকিহার ১৭৮
কুরু ১৩২, ১৩৩;
কুরুক্ষেত্র ১০, ১৩২-১৩৩; নামের কারণ ও সীমানার পরিচয় ১৩৩; তদন্তর্গত তীর্থস্থানাদি ১৩৩, ১৩৭; দ্বিতীয় গোনর্দ্দ প্রসঙ্গে যুদ্ধের কাল ২৮৫
কুরুজাঙ্গাল ১৩৩
কুলীন ৩৪৯
কুলিশী ১১
কুশ-বিহার ২২৮, ২২৯;
কুশ ১২৮, ১৩১, ১৮১, ১৮৮, ১৮৯
কুশদ্বীপ ৬৯
কুশনাভ ১২৯, ১৮৮, ১৮৯
কুশপুর ১৩১
কুশভবনপুর ১৩১
কুশস্থলী ১৮৮ (কুশাবতী দ্রষ্টব্য)
কুশাগড়পুর ১৭৯, ১৮২
কুশাগ্রপুর ১৭৯
কুশাবতী ৯২, ১০০, ১৫৩, ১৫৮
কুশাম্ব ১২৯
কুশীনগর ২০১, ২০২
কুশী ব্রাহ্মণ ৩৫৩
কুড়ুম্বা ৩৬০
কুসুমপুর ১৭০
ক্রমিকোণ্ড-চোল ৪৬০
কৃষ্ণ বন্দ্যো—প্রশ্লোক-সম্বন্ধে ১৪
কৃষ্ণ-রায় ২৭৯, ২৮০, ৪৭৪
কৃষ্ণা (প্রদেশ) ২৭৮
কেকয় রাজ্য ১০৯—১১১; কানিংহামের মতে ১১১; রামায়ণে তাঁহার রাজধানী প্রসঙ্গ ১১৯।
কেনারি ২৭৫;
—ভাষা সম্বন্ধে কার্ণাটিক দ্রষ্টব্য; আদর্শ ৩৯০
কেরল (রাজ্য) ২৭২—২৭৩; তত্রত্য সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী ২৭২; উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান ২৭২; হুয়েন-সাঙের বর্ণনা ২৭৩।
কেরি ৪৪১
কেণ্ট ৪২, ৩৯২, ৩৯৩
কেশব ভারতী ৪৭৯
কেশবাচার্য্য ৪৬০
কেশরী (বংশ) ২৩৪
কৈয়োরা ২১৪
কোকনদ ২৭৪
কোঙ্কণ—রাজ্য ৩৭২; তৎপ্রদেশের আদিম অধিবাসী

২১৪ ; কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ ৩৫০, ৩৫১
কোঙ্কণ—ব্রাহ্মণ ৩৫০, ৩৫১
—ভাষার নমুনা ৩৯১
কোঙ্কণপুর ২৭৩
কোচিন ২৭৫
কোট্টিয়ারা ২৭৩
কোটীশ্বর ২৮০
কেটা ৩৬০, ৩৭৫
কোরাণ ৫০৩, ৫৬৩
কোরুর ৩১৯
কোল ৩৬০
কোলারি ৩৭৫
কোলচিস ৩৪
কোলি (কোলীয়) ১৬৮, ১৯৬
কোশল—রাজ্য ৯১—১১২ ; প্রাচীনতম রাজধানী ৯১, ৯২ ; দক্ষিণ, পূর্ব্ব, উত্তর ও মহাকোশল ৯৬—১০১ ; দাক্ষিণাত্যের রাজ্য ২৬৬-২৬৮ ; হুয়েন-সাং প্রভৃতির পরিদৃষ্ট দাক্ষিণাত্যের কোশল ৯৮-৯৯ ; কানিংহামের বর্ণনায় দক্ষিণ-কোশল ৯৯
কোসম ১২৮, ১৩১
কোহানা ১৯৬
কৌরব ১৩৪
কৌলাচার ৪৮৩
কৌলাম ২৭৩
কৌলীন্য প্রথা ২৪৫
কৌশ ১৮৮
কৌশাম্বী ১২৮—১৩১, ২৫০
ক্যাক্সটন ৪৪০
ক্যাম্বেল—মধ্য এসিয়া হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভাষার বিস্তৃতি সম্বন্ধে ৩৯২
ক্রকুচণ্ড ১৯৫, ১৯৬
ক্রমু ১১
ক্রো—দেবত্বের অবস্থিতি সম্বন্ধে মত ৩০৬
ক্ষত্রপ ১৫৪
ক্ষত্রিয় ৩২৩ ; ব্রাত্য ৩২১, ৩২৯, ৩৩৭, ৩৫৬
ক্ষেমগুপ্ত ২৯৬

খ।

খণ্ডগিরি ২৩২
খনদ (খন্দ) ৩৫৯
খশ (জাতি) ২৫, ২৬, ৩১৮
খাকী (সম্প্রদায়) ৪৭৬
খাশিয়া ৩১৮
খাসী ৩৫৮
খৃষ্ট (সম্প্রদায়) ৫০১—৫০২ : যীশু খৃষ্টের জন্ম ও জীবন-বৃত্তান্ত, তাঁহার ধর্ম্মমত ৫০১ ; বিবিধ খৃষ্ট-সম্প্রদায় ৫০২।
খৃষ্টান—খৃষ্ট-সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য।
খেড়া ২১১, ২১২
খোরাসান ৫১ ৫২
খোজা ২৪৭

গ।

গঙ্গা ১০—১২
গঙ্গাদ্বার ১৪২, ১৪৩
গঙ্গা-বংশ ২৪৫
গটেনবর্গ ৪৩৯
গণপতি—তাঁহার উপাসকগণ ৪৫৭, ৪৯৫ ; তাঁহার নাম ৪৯৬ ; তাঁহার ধ্যান ৪৯৬।
গণ্ডা ১০১, ২৫০
গণেশ—রাজা ২৪৬
„—দেবতা, গণপতি দ্রষ্টব্য।
গথ ৩১৯
গন্ধর্ব্ব—দেশ ৫২, ১০৩, ১০৬ ; ষ্ট্রাবো ও টলেমির বিবরণে ২০৩।
—জাতি ৩৩১, ৩৩৩
গন্ধর্ব্ব-নগর ৩৩৩
গন্ধহস্তী ১৭৮
গন্ধার (গান্ধার) ১২
গন্সালভেস (জোয়ানেস)
গভস্তিমান ৫২
গভীষণ ১৪৩ ১৪৪
গয় ১৭৪, ১৭৫
গয়া ১৭৩—১৭৭ ; শা… পত্তি প্রসঙ্গ ২৭৪ ; ১৭৫ ; হুয়েন-সাঙের ১৭৫-১৭৭ ; কানিং… বর্ণনায় ১৭৬—১৭৫ … দেবের নির্ব্বাণ-লাভে…
গাজিপুর ১১৩, ১৪৪
গাণপত্য ৪৫৭ ; সপ্ত… লক্ষণ ৪৫৭ ; ষড়বিধ… পত্য সম্প্রদায় ৪৯৬
গাধিপুর ১৮৮, ১৯০
গান্ধারাইটিস ১০৩
গান্ধার ১৩, ১০৩, ৩২০ ; … সীমানা (কানিং… মতে) ১০৪ ;
গারো ৩৫৮
গির্জাক ১০১, ১৮৪
গির্ণার (গিরিণার) ১৬০,
গিরিএক ১৮৪
গিরিব্রজ ১০৯—১১১, ১…
গীবন—হূণদিগের উ… সম্বন্ধে ৩১৮—৩১৯
গুইন্দ (ডি') ৩১৯
গঙ্গেশ উপাধ্যায় ৩৪৭
গার্গ্য ১৫৩
গিহ্লোট (কুল) ৩৫৬
গুডফ্রাই-ডে ৫০২
গুণামতী ১৭০, ১৭৬
গুরুপাদগিরি ১৭৮
গুরুশি ২৭৬
গুর্খা ৩৩৬, ৩৫৯
গুর্জ্জর—দেশ ১৬৯, ১…
—ব্রাহ্মণ ৩৪২ ; তাঁহ…

বসতি-স্থান ও বিভাগ-সমূহ ৩৫৪।
গৈয়া ৩৯
গোকুলস্থ গোসাঞি ৪৭৩
গোতম ৪১
গোত্র ৩৪০; গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিগণ ৩৪০; প্রবরের সম্বন্ধ ৩৪০; প্রবর-প্রবর্ত্তক ঋষি-গণ ৩৪১
গোন্দ—জাতি ৩৫৯; ভাষা ৩৭৫
গোনর্দ্দ (কাশ্মীর-রাজ) ২৮৬; জরাসন্ধের অনুগমনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে বল-রামের হস্তে তাঁহার মৃত্যু ২৮৭; সিংহাসনারোহণের কাল-নির্ণয়ে বিতর্ক ২৮৭-২৮৮; রাজ্যকাল-নির্ণয়ে অসামঞ্জস্য ২৮৯; তন্মীমাংসা ৩৯০; উইলসন ও তাঁহার অনুসরণকারিগণের উক্তির অসামঞ্জস্য ২৮৯;—দ্বিতীয় ২৮৭; তদ্বংশীয় নৃপতিগণ ও তাঁহাদের রাজত্ব কাল ২৮৭-২৮৮;—তৃতীয় ২৯০; তাঁহার বংশধরগণের নাম ও শাসনকাল ২৯০
গোপাল—পালবংশের প্রতি-ষ্ঠাতা ২৪৩
গোবর্দ্ধন ১৪৭;—মঠ ৪৮৯
গোবি ৫২
গোবিন্দ বিদ্যাধর ২৩৬
গোমতি ১১, ১২
গোরক্ষনাথ ৪৯১; তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ৪৯১
গৌড়—দেশ (গঙ্গাজেলায়) ১০১; (বঙ্গদেশ) ২২৯; পুরাবৃত্ত ২৫০-২৫১, তন্ত্র-মতে সীমানা ২৫০; পঞ্চ-গৌড় প্রসঙ্গ ২৫০, ৩৪৯; কাশ্মীর-রাজ জয়াপীড়ের গৌড়ে আগমন প্রসঙ্গ ২৫২
গৌড়ীয়—ব্রাহ্মণ ৩৪২; শব্দের অর্থ ও তাঁহাদের বসতি-স্থান ৩৪২, ৩৪৮; তাঁহা-দের শ্রেণীত্রয় ৩৪৯; পঞ্চ-গৌড় প্রসঙ্গ ও বঙ্গদেশে বাস ৩৪৯।
গৌরী ১১
গ্রন্থিক ১৪৫
গ্রহবর্ম্মা ৩৬
গ্রাণ্ট ৪৪১
গ্রিয়ারসন—দ্রাবিড়ী ভাষার বিভাগ-সমূহের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ৩৭৪
গ্রীক—শব্দের উৎপত্তি ৩৮;—বর্ণমালার নাম ৪৩৫
গ্রীস (দেশ)—নামকরণ ৩৮; শব্দ-তত্ত্ব আলোচনা ৩৭; লিপিস্ফূর্ত্তি ৩৩১, ৪৩০

চ।

চক্রতীর্থ ১৩৮
চণ্ড ১৯৯
চণ্ডক-নিবর্ত্তন ১৯৯
চণ্ডাবর্ত্ত ১৯০
চন্দৌলি ২০০
চন্দ্রকেতু ১০৩
চন্দ্রগুপ্ত ৩৭, ১৬১, ১৬৭, ৩৫৭; তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি ৬৭
চন্দ্রবক্ত্রা ১০৩
চন্দ্রবর্ম্মা ২১৬, ২১৭
চন্দ্রাপীড় ২৯৪
চম্পা ১৬৭; প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে উপাখ্যান ১৮৭; অবস্থান ১৮৬; ফা-হিয়ান পরিদৃষ্ট চম্পা ২৪৮
চম্পাপুরী ১৮৬
চয়ণদাসী ৪৮১
চরিত্রপুর ২৩৭
চাইল্ডার্স—পালি ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নে ৩৬৯
চাকমি ৩৮৫
চান্দা ৯৯
চান্দেল (বংশ) ১১৬
চারুদত্ত ২০৯
চিকাকোল ২৬২
চি-চি-টো ২১৩, ২১৫
চিনাব ১১
চিয়েঙ্গা ৪৫২
চীন—রাজ্য ৪২; নামের উৎ-পত্তি ৪৩; তৎসম্বন্ধে হীরেণের মত ৪৩; অর্জ্জু-নের সহিত ভগদত্তের যুদ্ধে তদ্দেশবাসী চীনাগণের যোগদান ৪২;—উৎপত্তি সম্বন্ধে সু-কিং গ্রন্থের মত ৪৩; চীনাদিগের বাসস্থান (মহাভারতের বর্ণনায়) ৯০;—ভাষা ৩৮৪; মৌক্তিক অক্ষর ৪০৯
চু-শা-শি-লো ১০৮
চূড়াপতিগ্রহ ২০০
চূড়ের ২০০
চেকুম্বনা ১১৫
চেক্কু ১১৬; জুলিয়ানের সিদ্ধান্ত ১১৪
চেদি—দেশ ১২; রাজ্য ৩০৯; অবস্থিতি সম্বন্ধে মতান্তর ৩০৯-৩১০; বিভিন্ন প্রদেশে স্থান-নির্দ্দেশে ৩১০; চেদি ও ত্রিপুর ৩১০
চেন-পো ১১৭
চেন-কো ২৪৮
চেরা-রাজ্য ২১১
চে-লি-টা-লো-চিং ২৩৭
চৈতন্য—শ্রীচৈতন্য দ্রষ্টব্য।
—সম্প্রদায় ৪৮৭—৪৮৯;

শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠা ৪৭৭; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য ও তত্তদ্ভাবের উপাসকগণ ৪৭৭; ধর্ম্ম-মতে মাধুর্য্য ভাবের শ্রেষ্ঠ ৪৭৭
চৈৎসিংহ ৪৬৯
চোল ২৬৮-২৭০
চৌড়কুল ৩৫৭
চৌহান কুল ৩৫৬

ছ।

ছত্রি ৩৫৬
ছান্দড় ৩২৮
ছুটিয়া ২২৮
ছোট (সিন্ধুরাজ) ৩০০

জ।

জগদীশপুর ১৮৪
জগন্নাথ ২৩৫; মন্দির নির্ম্মাণের প্রসঙ্গ ২৩৫
জগন্নাথ মিশ্র ৪৭৭
জঙ্গম (সম্প্রদায়) ৪৯২
জজহোতি—রাজ্য ২১৩-২১৬; শব্দার্থ ২১৫; অবস্থান (কানিংহামের মতে) ২১৪-২১৫; ব্রাহ্মণ ২১৪-২১৫
জনক ১১৩, ১১৮
জনকপুর ১১৩, ১১৫
জবন ২৬, (আইওনিয়ান) ৪৩০
জম্বুদ্বীপ—৪৮-৫০, ৫৫, ৬৮ ৭০; আকার ৪৯; বরাহ পুরাণের ও গরুড় পুরাণের মতে আকার ৪৯
জয়ধ্বজ ৩৫০
জয়ন্ত ২১১, ২৫১
জয়াপীড় ২৫১, ২৫২; তাঁহার দিগ্বিজয় ২৯৪; পাণিনির টীকা-সংগ্রহে তাঁহার রাজত্বকালের প্রসিদ্ধি ২৯৪
জরাসন্ধ ১৫২
জর্ম্মণ ৪১; প্রাচীন জর্ম্মণদিগের রীতি ৪১; জর্ম্মণগণের ও শকগণের সম্বন্ধ ৪১; পুরাকালীন সীমা ৪০
জলন্ধর ৩১০; দৈত্য ও তৎসম্বন্ধে উপাখ্যান ৩১১; রাজ্যের পরিচয়, বিভাগ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য ৩১০-৩১২।
জলপ্লাবন ১৭
জলৌক (রাজা) ২৯৭
জহ্নাবী ১১
জাতি (ভারতের)—ব্রাহ্মণ-দর্শনে বঞ্চিত ২৬; মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় ৭৪; বৌদ্ধদিগের ভেদ-প্রথা ২৩৩; বিষ্ণু-পুরাণোক্ত কতকগুলি জাতির পরিচয় ৫৬; শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও পর্য্যায়-নির্দ্দেশ ৩২১; জন্মগত জাতি ৩২১, ৩২২; দেশগত জাতি ৩২১, ৩২৭; আচার ও ধর্ম্মগত জাতি ৩২১, ৩২৬; শাস্ত্রমতে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি-তত্ত্ব ৩২২-৩২৩; মনুমতে ৩২৩; বিভিন্ন বর্ণের পরস্পর অনুলোম প্রতিলোম. বিবাহে বিভিন্ন নামধেয় জাতি সৃষ্টি ৩২৩-৩২৫, ৩২৯; বিভিন্ন জাতির ক্রিয়া-নির্দ্দেশ ৩২৪; পুরাণাদিতে পরিচয় ৩২৯; কর্ম্মানুষ্ঠানে জাতি-গঠন ৩৩০; বিভিন্ন গ্রন্থে জাতির উল্লেখ ৩৩০; রামায়ণোক্ত জাতি-সমূহ ৩৩০; জাতির সামাজিক অবস্থা পুরাণ ও স্মৃতি প্র জাতির বিষয় ৩৩১; নিক জাতিসমূহ আদম-সুমারীর সপ্তক ৩৩৫-৩৩৬; সুমারীতে উল্লিখিত তের জাতিসমূহ ৩৩৭· ব্রাহ্মণ ৩৩৯-৩৪০; ৩৫৬; কায়স্থ ৩২৩, করণ ৩৫৬; শাশী বৈশ্য ও শূদ্র ৩৫৬, নাগা, মিশমি. গারো, ৩৫৮; কুকী, লুশাই, গুরখা, খোন্দ, সাঁওতাল ৩৫৯; ও কোল, জিপসি, বাদাগা, কোটা, কুড়ুম্ব
জাফেট ৩৯৭
জার্ম্মাণিয়া ৪০
জারাথুস্ত্র ৫০৪
জারিয়াস্পা ৩৬
জালালপুর ১১১
জিজহাওয়াতি ১৫৪
জিন্ট ৮৩
জিতবন ১০১, ১০২
জিন—তীর্থঙ্কর দ্রষ্টব্য।
জিপ্সি (জাতি) ৩৬০
জুডাইজ্‌ম্ (ধর্ম্ম) ৫০১, ৫
জুনাগড় ১৬০
জুপিতর ১৩
জুয়াণ্টু (Yuan-ta) ৮৬
জুষ্ক (কাশ্মীর-রাজ) ২৮৮,
জেন্দ আভেস্তা ৫০৪
জেসুইট ৪৩৯; ভারতে দের মুদ্রাযন্ত্র ৪৩৯, ৫০২
জোহোবা ৫০১
জৈন (ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়) ৩৫ ৪৯৭; জৈন-দর্শনের উ

পত্তি, জিন ও জৈন শব্দের অর্থ, জিন বা তীর্থঙ্করগণ ৪৯৭; শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায় ৪৯৯; জৈনগণের ধর্ম্ম-গ্রন্থ ৫০০; তাঁহাদের গুণাদির পরিচয় ও তীর্থস্থান ৫০০।
জোন্‌স্ (সার উইলিয়ম)— ইথিওপীয়া সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য ২৯—৩০; লিপি সম্বন্ধে ৪১৭; বর্ণমালা বিষয়ে ৪১৯
জোবেইদ ৩০৭
জোভ ৫০১
জোয়ানেস ১৫৩
জোরওয়াষ্টার—ধর্ম্মের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে ৩১, ৩২; তাঁহার বিদ্যমানতার কাল-নিরূপণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিভিন্ন মতের আলোচনা ৩১—৩২; তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে ৫০৪; তাঁহার ধর্ম্ম-মত ৫০৪।
জোরওয়াষ্ট্রীয়ানিজম ৫০৪; জোরওয়াষ্টার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তনা ৫০৪; জোরওয়াষ্টারের ধর্ম্মমত ৫০৪—৫০৫।
জোসেফাস ৩৩৫

ঝ।

ঝলমাচ্ছন্ন ৩৫৭
ঝল্ল (জাতি) ৩৫৭

ট।

টগর ২৭৬, ২৭৭
টড—আর্য্যগণের ভারত মহা-সাগরীয় দ্বীপাধিকারে ৪৬
টলেমি—ভারতের ভৌগোলিক তত্ত্বের আবিষ্কারে তাঁহার গ্রন্থ ৭২; দশার্ণ-দেশের পরিচয় প্রসঙ্গে ৩১৫; আর্য্যগণের উত্তর মেরু-বাসের যুক্তির প্রমাণ-স্বরূপে ৩১৭; তদ্বংশীয় রাজগণের সম-সময়ে ভারতের সহিত মিশরের বাণিজ্য-সম্বন্ধে ৪২১
টিউটন ৪০, ৪২
টেলার (ডাঃ আইজাক)— মধ্য এসিয়া হইতে ভাষার বিস্তৃতি-বিষয়ে ৩৯২, ৩৯৫; মূলে এক জাতি ও এক ভাষার বিদ্যমানতা বিষয়ে ম্যাক্সমূলারের যুক্তির প্রতিবাদে ৩৯৬; এরিয়ানার আর্য্য-ভাষার আদি-স্থল নির্ণয়ে ৩৯৭; বর্ণমালা বিষয়ে ৪১৯, ৪২০; তৎ-প্রকটিত 'ম'-বর্ণের উৎপত্তি-মূলক বংশলতা ৪২৫; বর্ণেল প্রভৃতির যুক্তি-খণ্ডনে ভারতীয় বর্ণমালার মূলে সেবীয় প্রভাব বিদ্য-মানতার যুক্তির উল্লেখে ৪২০

ড।

ডাইওনিসাস ৩৭
ডাউসন (অধ্যাপক)—ভারতীয় বর্ণমালার মৌলিকত্ব বিষয়ে ৪২৮
ডিকি—বর্ণমালা-সম্বন্ধে ৪১৯
ডিকো—(ফিনিসীয়ার রাণী) ৩৩
ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট—ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে ৩৬৩
ডেরাবাসী (জৈন-সম্প্রদায়) ৪৯৯

ত।

তক্ষ ১০৬, ১০৭
তক্ষক ১০৬, ১০৭; দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু কানিং-হামের সিদ্ধান্ত ১০ বংশ ৩৩২, ৩৩৩, ৩৫৭
তক্ষশীলা ১০৩, ১০৬—১০৭; কানিংহামের মতে ১০৯; রামায়ণে ও মহাভারতে ১০৩, ১০৬।
তথশীলা ১০৮
তন্ত্রিপাল ১৪৫
তমলুক ২৫৪
তম্বান ২০৬
তাইমুর ২৪২
তা-কা-শি-লো ১০৮
তাক্সিলা ১০৮
তামিল—দেশ ২৭১; ভাষা কোন্ দেশে প্রচলিত ২৮২-২৮৩, ৩৭৩, ৩৮৬; ভাষার আদর্শ ৩৮৯; আদিম ভাষা ৪২৮; বাইবেলে তামিল-শব্দ ৪৩৬; বর্ণমালা ৪৩৪; প্রাচীনত্ব-প্রসঙ্গ ৪৩৬
তাপ্রোবেন (বা লঙ্কাদ্বীপ) ৭৫
তাম্রধ্বজ ২৫৪
তাম্রপর্ণ ৫২
তাম্রবর্ণ ৫২
তাম্রলিপ্ত (প্রাচীন) ২৫২—২৫৪; হুয়েন-সাঙের বর্ণ-নায় ২৫২; শব্দের ব্যুৎপত্তি ২৫২; নামকরণ সম্বন্ধে উপাখ্যান ২৫৩; কপাল-মোচন নামের হেতু ২৫৩; পরিমাণ ২৫৩—২৫৪; ইৎ-চিঙের বিবরণ ২৫৫
তারাপীড় ২৯৪
তিব্বতীয় বর্ণমালা ৪৩৪
তিরাস্তান ২০৬
তিরাভুক্তি ১১৫
তিরাহুতি ১১৫
তিলারা ১৭৬
তিলোদক ১৭৬

তি-লো রে-কিরা ১৭৬
তি-লো শি-কিরা ১৭৬
তীর্থঙ্কর—বিভিন্ন মতে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর ৪৯৮; শব্দের তাৎপর্য্য ৪৯৭; অষ্টাদশ দোষ-রাহিত্যে তীর্থঙ্কর উপাধি ৪৯৮; তাঁহাদের বর্ণ ও আকৃতি প্রভৃতির আভাস ৪৯৮; (জিন দ্রষ্টব্য)।
তীর্থস্থান (ভারতবর্ষের) ৬৫, ৬৬
তুড়া (জাতি) ৩৭৫
তুড়াবর ৩৭৫
তুয়ার (কুল) ৩৫৬
তুরস্ক ৪৪
তুরাণ ৩০, ৪৪
তুরস্কু ৩৩০
তুর্কিস্থান ৪৪
তৃষ্টামা ১২
তেজ্জালাই ৪৬৩, ৪৭৩
তেলিকোকোড়া ২৭৯
তেলিঙ্গণ ২৬১, ভাষা ২৮২,২৮৩
তেলেগু ২৮২, ২৮৩
তৈলঙ্গ ২৬৩
তোটক ৪৯০
তো-মো-লি-তি ২৪৮
তোরমান ২৯২, ৩২৯
ত্রিলিঙ্গ ২৬১, ২৬৩
ত্রিগর্ত্ত—রাজ্য ৩০৯; প্রাচীনত্ব ৩১৯; বিবিধ জ্ঞাতব্য ৩১০-৩১২; ত্রিগর্ত্তে ইংরেজাধিকার ৩১২
ত্রিহুত ১১৫

থ

থানেশ্বর ১২৫-১৩৭; উত্তর সীমা, দক্ষিণ সীমা, দুর্গাদি ও সীমা পরিমাণ ১৩৬; অশোকের স্তূপ ১৩৬
থিব্বাংটু ৮৬
থেভেনো ৩১১

দ।

দক্ষ ৩২৮
দক্ষিণ কোশল ৯৭-৯৯
দক্ষিণ দেশে (রামায়ণে) ২৬৫
দক্ষিণাচারী ৪৮৫
দাক্ষিণাবর্ত্ত (লিপি) অন্যান্য দেশের ৪১৫-৪১৬ ভারত-; বর্ষের ৪২৩, ৪২৪
দণ্ডকারণ্য ২৭৬
দণ্ডিয়া খেড়া ১২৬
দণ্ডী ৪৯০, তাঁহাদের যৌগিক ক্রিয়া ৪৯০; (দশনামী দ্রষ্টব্য)
দধীচি ১৩৭
দন্তপুর ২৬৩
দবির খাশ ১৫৭
দরবেশ ৪৮১
দরিয়স (হিষ্টাসপেস) ৩২
দশনামী (দণ্ডী) ৪৯০; তাঁহাদের উপাধি ৪৯০; অতীত ও মুক্ত দণ্ডী ৪৯১
দশমহাবিদ্যা ৪৮৪, মহাভাগবতে আবির্ভাব বিষয়ক মত ৪৮৫; তন্ত্র মতে দশ অবতারের সহিত সাদৃশ্য প্রসঙ্গ ৪৮৫
দশার্ন—রাজ্য ৩০৮, প্রাচীনত্ব ৩১৪, অবস্থিত ও বিস্তৃতির বিষয় ৩১৫
দাক্ষিণাত্য ৬৪, জনপদ সমূহ ২৬৪-২৮৩, প্রাচীনত্ব ২৬৪-২৬৬, ভাষা ২৮২, ইংরেজের একছত্র অধিকার ২৮০, সভ্যতা ও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ২৮৩
দাচানাবাদেশ ২৭৭
দাদু—দাদুপন্থী-সম্প্রদায় ৪৭১
দানবগণ ৩৩১
দান্তে—ভাষার সাদৃশ্য সম্বন্ধে তাঁহার মত ৩৬৭
দামাস্কস ৪৫
দামোদর (কাশ্মীররাজ) কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু ২৮৭
দাশ ৩২৪
দাসকূট ৪৭৩
দাহির ৩০১
দিক্করবাসিনী ২২৬
দিক্কু (নদী) ২২৬
দিগম্বর (জৈন) ৪৯৯, তাঁহাদের মতে পাপ ও লজ্জা ৪৯৯
দিদ্দা (কাশ্মীরের রাণী) ২৯৬, তাঁহার পিতৃবংশীয় রাজগণ ২৯৬, খশ-বংশে তাঁহার জন্ম-প্রসঙ্গ ৩১৮
দিলু ৩০৭
দীর্ঘযজ্ঞ ৯৭
দুর্গা ৪৫৬, পূজার প্রবর্ত্তনা ৪৮৩, নাম ও নামের তাৎপর্য্য ৪৮৪, ধ্যান ৪৮৪, পীঠস্থানে দেবীর নাম ৪৯৩—৪৯৫
দুর্গাচার্য্য ১৫
দুর্লভ ২৯৮
দুর্লভবর্দ্ধন (কাশ্মীর-রাজ) ২৯৩, তৎকর্ত্তৃক কাশ্মীরে কর্কোটক বংশের প্রতিষ্ঠা ও তদ্বংশীয় রাজগণ ২৯৩
দৃষদ্বতী ১০, ১২
দেওগড় ২৭৮
দেওয়ানী ১৯৭, ১৯৮, ২০১
দেবকী ১৫২
দেবগণ ২৯৫, ৩৩১
দেবগিরি ২৭৫, ২৭৮
দেবগুপ্ত ২৯৫
দেবদেবী—ঋগ্বেদে ৪৫৫-৪৫৬,

ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর প্রাধান্য ৪৫৬
দেবপাল ২৪৩
দেবপুত্র ২৯০
দেবরক্ষিত ৯৮
দেবরাষ্ট্র ১৪৮
দেবল ৩০১, ৩০৭; অবস্থিতি সম্বন্ধে মতান্তর ৩০৬-৩০৭; করাচীর সহিত অভিন্নত্ব প্রতিপাদন চেষ্টা ৩০৬; কানিংহামের মতে ৩০৭
দেশস্থ (ব্রাহ্মণ) ৩৫০, ৩৫১
দৈত্যগণ ৩৩১
দৈববাণী—যযাতির জরাগ্রহণ সংক্রান্ত ২৪১
দোশারণ ৩১৫
দোঁহা (কবীরের) ৪৬৮
দ্বাদশবন ১৫১
দ্বারকা ১৫৮-১৫৯, ২৪৯
দ্বারকাপুরী ১০০
দ্বারাপতি ২৪৯
দ্বারাবতী ৫৩, ১৫৩, ১৫৮, ১৫৯, ২৪৯
দ্যুপিত্তর ১৩
দ্রাবিড়—রাজ্য ২৭০; রাজধানী ২৭১; সীমা পরিমাণ ২৭০
দ্রাবিড়ী—(ব্রাহ্মণ) তাঁহাদের বসতিস্থান, বিভাগ সপ্তক ও অন্যান্য পরিচয় ৩৫৩; দ্রাবিড় দেশে বাস-সম্বন্ধে কিংবদন্তী ৩৫৩; পঞ্চ-দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ ৩৪২;—ভাষা ২৮২, ২৮৩; ভাষা-পঞ্চক ৩৭৩; মূল ভাষার দ্বাদশ বিভাগ ৩৭৪; কল্ড-ওয়েলের মত ৩৭৩-৩৭৪; বিভাগ-সমূহের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে গ্রিয়ারসনের মত ৩৭৪; অপ্রচলিত বিভাগের পরিচয়ে কল্ডওয়েলের মত ৩৭৫; ভাষার আদি-মত্ব প্রসঙ্গ ৪২৮; বাইবেলে দ্রাবিড়ী (তামিল) শব্দ ৩৩৬; ভাষার নমুনা ৩৮৯, ৩৯০
দ্রাবিড়ী-মুণ্ডা— ভাষা ৩৭৪; উৎপত্তির মূলে বৈদেশিক প্রভাব ৩৯৭
দ্রুপদ ১৩৯, ১৪০
দ্রোণ সাগর ১৪৪
দ্রোণাচার্য্য ১৩৯

ধ।

ধনঞ্জয় ৩১৭
ধর্ম্মপদ—সংস্কৃত, পালি ও বাঙ্গালা পরস্পরের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনে ৩৭২
ধরণীকোটা ৯৯
ধর্ম্ম—শব্দের অর্থ ৪৫২, ধর্ম্ম ও রিলিজিয়নে পার্থক্য ৪৪৩; পরস্পর-বিরোধী ভাবে (গীতার দৃষ্টান্তে) ৪৪৩-৪৪৪; শাস্ত্র-মতে ধর্ম্মের লক্ষণ ৪৪৬-৪৪৭; ধর্ম্মে ঈশ্বরের প্রয়োজন ৪৪৮, ঈশ্বরের উপাসনা-সম্বন্ধে প্লুটার্ক, কার-লাইল, সিসিরো প্রভৃতির মত ৪৪৯-৪৫০, উপাসনার প্রাচুর্য্য ও অসদ্ভাব ৪৫০, ৪৫৩, সম্প্রদায় সংগঠনে ৪৫৩, সমান্য সামান্য মত-পার্থক্যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ৪৫৫-৪৫৪, ধর্ম্মের মূল ভারতবর্ষে ৪৫৪ ৪৫৬, হিন্দুধর্ম্মের সম্প্রদায়-ভেদে ৪৫৭, শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ৪৫৯
ধর্ম্মপাল ২২৬
ধর্ম্মারণ্য ১২৯
ধানাকাকাতা ৯৯
ধানিক ৩১৭
ধামেক ১২১, ১২২
ধামাল ৩৭৫
ধুন্দিয়া (জৈন) ৪৯৯

ন।

নওয়াল ২০১
নগর ১৯৫
নগর সমূহ (প্রাচীন ভারতের) ৫২—৫৪; দেশ ও জনপদ দ্রষ্টব্য।
নগরহার ১৮৬
নজ্যতা ৩০
নদনদী-সমূহ (ভারতের)—বেদোক্ত ১০—১২, পুরাণোক্ত ৫৬—৬২
নন্দরাজ ২৮০
নন্দীগ্রাম ১১২
নবদেবকুল ২০১
নবল ২০১
নর ২৯০
নরকাসুর ২২৬, ২২৭, ২৩০
নরনারায়ণ ২২৮
নরবলি (প্রয়াগ-প্রসঙ্গে) ১২৮
নরে ২১৩
নসরত সা ২৪৭
নাংনিহার ১০৪
নাইনস ৩৬
নাগ (বংশ)—তাৎপর্য্য ৩৩৩, নাগপূজা হেতু জাতির নাম প্রাপ্তি ৩৩২-৩৩৩
নাগদ্বীপ ৫২
নাগর (ব্রাহ্মণ) ৩৫৩-৩৫৫, তাঁহাদের নামকরণের পরিচয় ৩৫৪ ৩৫৫, (অক্ষর) দেব-নাগর দ্রষ্টব্য।
নাগহ্রদ ১৪০, ১৪১

নাগা ৩৫৮
নাঙ্গালোহালো ১০৪
নাজারেথ ৫০১
নাদ ৩৬১
নানক ৫০৫
নানকপন্থী ৩৫৭, ৫০৫
রাণপুর ১৪৮
নারাণা ১৪৮
নারায়ণ পাল ২৪৪
নালান্দা ১১৬, ১৮২-১৮৪, হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় ১৮২, অবস্থান-সম্বন্ধে মতান্তর ১৮২-১৮৪, নামকরণসম্বন্ধে কিংবদন্তী ১৮৪
নালো ১৮৩
নিগ্রন্থ (সম্প্রদায়) ২১০
নিত্যানন্দ ৪৭৯, ৪৮০
নিনিভে (নিনাস, নাইনাস) ৩৫
নি-পো-লো ১৯৪
নিমরড ৩৪
নিমাবৎ (বা নিমাৎ) ৪৭৬
নিমারী (ব্রাহ্মণ) ৩৫৫
নিম্বাদিত্য—তাঁহার আদি-নাম ৪৭৬, তাঁহার অতিথি সৎ-কারের অলৌকিকত্ব ও নিম্বাদিত্য নামের হেতু-বাদ ৪৭৬
নিয়ারকাস—বর্ণমালা-প্রসঙ্গে ৪১৪
নিরুণকোট ৩০৪
নির্ণয় সিন্ধু ৩৪০
নি-লিয়েন-সেন ১৭৬
নিষাদ (ভাষা) ৩৭৫
নীপ ১৯৪
নীল ২৭, নদ ২৭
নীলাজন ১৭৭
নুম্বি (ব্রাহ্মণ) ৩৫৩
নেওয়ার (অব্দ) ১৯৪
নেপাল—রাজ্য ১৯৩ ১৯৪
নেমিনাথ ৪৯৯
নৈরঞ্জন ১৭৭, ৫০১
ন্যগ্রোধ ২০০
ন্যাড়া (সম্প্রদায়) ৪৮১
ন্যায়পাল ২৪৪

প।

পক্ষধর মিশ্র ৩৪৭
পঞ্চগৌড়—দেশ, ২৫০, ৩৭৩ (গৌড় দ্রষ্টব্য), ভাষা ৩৭৩ কল্ডওয়েলের মতে ভাষার বিভাগ ৩৭৩।
পঞ্চদ্রাবিড়—দেশ ২৭১, ৩৭৩ (দ্রাবিড় দ্রষ্টব্য), ভাষা ৩৭৩, কল্ডওয়েলের মতে ভাষার বিভাগ-সমূহ ৩৭৩, দ্বাদশ বিভাগ ও তৎ-সম্বন্ধে গ্রিয়ারসনের মত ৩৭৪, অপ্রচলিত বিভাগ-সমূহ সম্বন্ধে কল্ডওয়েলের মত ৩৭৫
পঞ্জাব ১১
পটিঞ্জার—সিন্ধুরাজ্যের সীমা-নির্দ্দেশ ৩০৮
'পথ্যাস্বস্তি'—আর্য্যগণের প্রাচীন বাসস্থান প্রসঙ্গে ২৮৫
পদর-বন ২০২
পদ্মপাদ ৫৯০
পরমর্দ্দি ২১৭
পরমহংস ৪৯২
পরশুরাম ৩০, তাঁহার পারস্ত-জয় ৩০, ৩১, তৎকর্তৃক নাম্বুরী ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে কিংবদন্তী ৩৫৫
পরাশ ১৭৩
পরাশর ১০৮
পরেশনাথ ৫০০
পরাশোয়ার ১০৪, ১০৫
পরুষ্ণি ১১
পর্ব্বগুপ্ত ২৯৫
পলাশ ১৭৩
পলাশপুর ১০৪, ১০৫
পহ্নব ৩৩০
পহ্লব ৩৩০
পাঞ্চাল (রাজ্য) ১৩৯-১৪০
পাটল ৩০৪
পাটলপুর ৩০৫
পাটলিগ্রাম ১৬৯, ১৭৩
পাটলিপুত্র ১৬৯-১৭৩। প্রতি-ষ্ঠার ইতিহাস ১৭২-১৭৩, হুয়েন-সাং দৃষ্ট ১৭০-১৭১; ডাইডোরাসের মতে, বায়ু-পুরাণে, মহাবংশে ১৭২; ষ্ট্রাবো ও কানিংহামের সিদ্ধান্ত ১৭১; মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় ৭৩, ১৭১
পাণ্ডব (সংজ্ঞা) ১৩৪
পাণ্ড্য (রাজ্য) ৭৪-৭৫, ২৬৮-২৭০
পাথরঘাটা ১৮৭
পান-না-ফা-তান-না ২২১
পাবনা ২২১
পারা ২০২
পারদ ২৬, ৩২, ৩২০
পারয়ত্র ১৪৮
পারস্ত ২৬, ৩০, ৩১; নামের উৎপত্তি ৩০, ৩১; ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান ৩৬; (ইরাণ দ্রষ্টব্য)
পার্থলিস ৭৩
পার্শি (পার্শী)—জাতি ৩৫৭, তাহাদের ধর্ম্ম ৫০৪
পার্শ্বনাথ ৪৯৮, ৪৯৯
পালবংশীয় রাজগণ ২৪৩
পালি (ভাষা) ৩৬৭, অন্যান্য ভাষার আদি-সম্বন্ধে কচ্চা-য়ণের মত ৩৬১, মাগধীর সহিত অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে ৩৬৮-৩৬৯, বৌদ্ধমতে পালি ভাষার মৌলিকত্ব ৩৬৯, তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত ৩৬৯,

সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ মত ৩০৯ ; অশোক লিপির সাদৃশ্যে আদিমত্ব নির্দ্ধারণ ৩৭০ ; অন্যান্য ভাষার সহিত সাদৃশ্য প্রদর্শনে ৩৭১, ৩৭২, ৩৮৮
পালিবোথ ১৭১
পালেস্তাইন ৫০১
পিউ-কে-লাও-টিস ১০৫
পিউকেলাস ১০৫
পি-চেন-পো-পু-লো ৩০৩
পিটশীলা ৩০৫
পিপ্পলবন ২০০
পিলাসকাস ৩৯
পি-লো-মি-লো ১৬০
পীঠস্থান ৪৮৯ ; একান্ন পীঠ, তৎসমুদায়ের নাম ও বর্ত্তমান অবস্থানাদির পরিচয় ৪৯৩-৪৯৫ ; কালিকা পুরাণের মতে ৪৯৫
পীতশীলা ৩০৪
পুক্কস ৩২৫
পুক্কলাওতি ১০৫
পুণ্ড্রবর্দ্ধন—রাজ্য ২১৯-২২১ ; বিবিধ শাস্ত্রে ২১৯ ; হুয়েন-সাং দৃষ্ট ২২০ ; প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত উপাখ্যান ২৪
পুরাণ—বিষ্ণুর, শিবের, সূর্য্যের অগ্নির ও গণপতির মহিমা-প্রকাশক ৪৫৬-৪৮৬।
পুরিহর (ব্রাহ্মণ) ৩৫৬
পুরুরবা ২৫
পুরুষ ও প্রকৃতি ৪৮২, ৪৮৩
পুরুষপুর ১৫৪
পুলক ১৬৩
পুলিকেশী ২৭৫, ২৭৬, ২৮৫, ২৮৬
পু-লু-শা পু-লু ১০৪
পুষ্করদ্বীপ ৬৯
পুষ্কলাবতী ১০৩-১০৫ ; রামায়ণে ১০০ ; হুয়েন-সাঙের ও এরিয়ানের বর্ণনায় ১০৫
পূর্ব্ব-কোশল ৯৭
পূর্ব্ববঙ্গ ২৫৭, ২৮৯ ; সমতট দ্রষ্টব্য।
পৃথিবী—এরাটোস্থেন্স কর্ত্তৃক সর্ব্ব-প্রথম সীমা-পরিমাণ নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গ ৮৪ ; গোলত্ব-বিষয়ে আর্য্য-হিন্দুগণের অভিজ্ঞতা ৮৯ ; অবস্থান ও বিভাগ সম্বন্ধে পুরাণের মত ৬৮, ৭০ ; সপ্তয়োক্তিতে গোলত্বের পরিচয় ৭০।
পৃথূদক ১৩৮
পৃথ্বীনারায়ণ ৩৩৩
পৃশ্নি ১৯
পেরিপ্লাস ২৭৬,২৭৭,৩০৬,৪২১ ; শব্দের অর্থ ৪৩০
পেলাস বা পলাশ ৩৯
পেলাসজি ৩৯
পেশোয়ার ১০৫,১০৮,১৫৪
পেহোয়া ১৩৮
পৈথান ২৮৫, ২৭৭
পোতালক (পর্ব্বত) ২৭৪
পো-লি যে-টো-লো ১৪৮
পো-লো-নি-শ ১২২
পৌণ্ড্র (রাজ্য)—রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ২২০
প্রকৃতি ও পুরুষ ৪৮২, ৪৮৩
প্রজ্ঞাপনা-সূত্র ৩৬৬
প্রটেষ্টাণ্ট ৫০২
প্রণব ৩৬১
প্রতিষ্ঠান ১২৪, ১২৫, ২৭৫, ২৭৭
প্রত্নোক ১৩-১৮
প্রত্যগ্র ১৪০
প্রবর ৩৪০ ; তৎপ্রবর্ত্তক ঋষি-গণ ৩৪০ ; গোত্রের সহিত সম্বন্ধ ৩৪০ ; বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন প্রবর প্রবর্ত্তক ঋষির নাম ৩৪১
প্রবরসেন ২৯২, ২৯৩, ২৯৭
প্রবরসেনপুর ২৯৭
প্রভাকরবর্দ্ধন ১৩৬
প্রভাস ১৫৯
প্রমার-বংশ ৩১২ ; কুল ৩৫৬
প্রয়াগ—রাজ্য ১২৪-১৩১ ; রামায়ণে ১২৫ ; বৌদ্ধ-প্রাধান্যে ১২৫-১২৭ ; পরিধি প্রভৃতি ১২৮
প্রয়াগ ব্রাহ্মণ ১২৮
প্রসেনজিৎ ১০১
প্রাকৃত (ভাষা) ৩৬৭ ; মৌলিকত্ব বিষয়ে আলোচনা ৩৬৮ ; শব্দের অর্থোৎপত্তি ৩৬৮ ; ভাষার উদ্ভবকাল নির্ণয়ে ৩৭১ ; কালিদাসের নাট-কাদির তুলনায় ৩৭১ ; সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ ৩৭১ ; বররুচি কর্ত্তৃক বিভাগ চতুষ্টয় ৩৭১ ; অন্যান্য ভাষার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য-প্রদর্শন ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৯
প্রাকৃত-চন্দ্রিকা ৩৬৬
প্রাকৃত-লঙ্কেশ্বর (ব্যাকরণ) ৩৬৫
প্রাগ্‌জ্যোতিষ ২২২-২২৫ ; কাম-রূপ দ্রষ্টব্য।
প্রাগ্‌বট ১২৫
প্রাগ্‌বোধি ১৭৭
প্রাচীন—আর্য্য-নিবাস ৯-২৪ ;
প্রাচীন ভারতের আকার ৮১-৮৬ ;
প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক-তত্ত্ব ৪৮-৭০
প্রাচ্য (জনপদ) ২২১-২৫৯
প্রাসী ১৭৩
প্রিন্সেপ—রাজা অশোকের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে ২৯৭ ; সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি বা মাগধী ভাষার মৌলিকত্ব বিষয়ে ৩৬৯ ; অশোক-লিপির পাঠোদ্ধারে ৪১৬-৪১৭ ; গ্রীক-আদর্শে ভার-তীয় বর্ণমালার উৎপত্তি বিষয়ে ৪১৯

প্রিয়দর্শী (পিয়দসী) ৪১৫
প্লক্ষদ্বীপ—৬৮
প্লিনি—জোরওয়াষ্টার সম্বন্ধে ৩২

ফ।

ফয়জাবাদ ৯৭
ফাল-লা-পি ১৫৯
ফা-হিয়ান ৭৩
ফিনিসীয়া ৩২, ৩৩; তাহার প্রথম রাজা ও রাণী ৩৩; আনক বা আনক-দুন্দুভি কর্ত্তৃক উপনিবেশ-স্থাপন প্রসঙ্গ ৩৩; হেরোডোটাসের বিবরণ ও অধঃপতনের কারণ ৩৩; ভারতের সহিত বাণিজ্য ৩৩, ৪২০; ভাষার বিস্তৃতি ৩৩; বর্ণমালা বিষয়ে ৪১৯-৪৩৬, ভারতীয় বর্ণমালার আদিভূত ৪১৯, তদ্বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ ৪২০-৪২১, বর্ণমালার আদর্শ ৪২৫, ৪২৭, আইওনিয়গণের বর্ণমালা শিক্ষাদান প্রসঙ্গে ৪৩০, ম্যাক্সমূলারের মতে ৪৩১, তাঁহাদের 'আলফাবেট' শব্দ ৪৩০, দ্রাবিড়-দেশে বাণিজ্য প্রসঙ্গে ৪৩৬
ফে-শি ১৪৭
ফো ২৪৮
ফো-লি-শি ১১৫

ব।

বংশ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির ৩২১-৩৩১, নাগ, উরগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, দানব প্রভৃতির ৩৩১-৩৩৪,
বংশজ (ব্রাহ্মণ) ৩৪৯
বাধিনালা ২০২
বখ্‌তাবাদ ২৫১
বঙ্গ—রাজা ২৪১,
বঙ্গদেশ ২৩৭-২৫০, শাস্ত্রাদিতে প্রাচীনত্ব বিষয়ে আলোচনা ২৩৭-২৩৯, পুরাবৃত্ত ২৪১-২৪৮, হুয়েন-সাং ও ফা-হিয়ানের প্রসঙ্গে ২৪৮, মেগাস্থিনীস, মার্কোপোলো, ম্যানরিক, বার্ণিয়ার প্রভৃতির বর্ণনায় ২৪৯-২৫০, বঙ্গ ও গৌড় ২৫০-২৫১,
বঙ্গভাষা ৩৮২, চতুর্দ্দশ বিভাগ ৩৮৪-৩৮৫, প্রাদেশিক ভাষার নমুনা ৩৯১-৪০০, প্রথম সংবাদপত্র ৪৪১, প্রথম গ্রন্থ ৪৪০, প্রথম অক্ষর ৪৪১,
বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।
বজ্রদত্ত ২২৩
বড়গাঁ ১৮৩
বড়-নগর ২১২
বৎসপত্তন ১২৯
বৎসরাজ ৩১৩, ৩১৪
বরণা ১১৯-১২১
বররুচি—প্রাকৃতের প্রথম ব্যাকরণ রচনায় এবং ভাষার বিভাগ-চতুষ্টয়ে ৩৭১
বরাহমিহির ৫৪, বৃহৎ-সংহিতায় ভারতবর্ষের বিভাগ ৫২-৫৪
বরেন্দ্র (ব্রাহ্মণ) ২৪৫, ৩২৮
বরোচ ২৭৫, ২৭৭
বর্ণমালা—বেদে বর্ণমালার অস্তিত্বাভাব ৪০২, আদি-তত্ত্ব নির্ণয় ৪০১, শাস্ত্রাদিতে বর্ণমালার প্রসঙ্গ-৪০২-৪০৮, পাশ্চাত্য-মতে লিপিসৃষ্টি ৪০৮-৪১২, কোন্ দেশে প্রথম সৃষ্টি ৪১১, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত ৪১১-৪১২, আদর্শ ও বিভাগ ৪১২-৪১৩, ভারতবর্ষে বিদ্যমানতা (পাশ্চাত্য মতে) ৪১২-৪১৩, সেলিউকাস, মেগাস্থিনীস ও নিয়ার্কাস প্রভৃতির সময়ে ভারতের বর্ণমালা ৪১৪, গোল্ডষ্টুকারের মতে ভারতের বর্ণমালা ৪১৪, নিয়ার্কাস-পরিদৃষ্ট ভারতে তুলার কাগজ ও বর্ণমালা ৪১৪, পাণিনির গ্রন্থে বর্ণমালার প্রসঙ্গ ৪১৪, অশোকের লিপি ৪১৫-৪২০, প্রাচীন ভারতবর্ষে মৌর্ত্তিক অক্ষরের বিদ্যমানতা ৪২৭, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে মৌর্ত্তিক অক্ষরের নিদর্শন ৪৩১, ভারতীয় লিপির আদিমত্ব বিষয়ে বিভিন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত ৪১৮-৪২১, বর্ণমালার বংশলতা, ৪২৫-৪২৭, ভারতীয় বর্ণমালায় সেমিটিক প্রাধান্য-মূলক মত ৪১৯, ইরাণীয় বর্ণমালা, ৪২০, সেবীয় বর্ণমালাই ভারতীয় বর্ণমালার মূল বিষয়ক মত ৪২০-৪২১, সেবীয় ও সেমিটিক মতের প্রতিবাদ ৪২১-৪২৯, দূরত্ব অনুসারে পার্থক্য ৫২৩, বিভিন্ন দেশের বর্ণমালার সহিত ভারতের অক্ষরের সাদৃশ্য ৪২৬-৪২৯, ডাউসন, কানিংহাম প্রভৃতির মতে ভারতীয় বর্ণমালার মৌলিকত্ব ৪২৮, সংখ্যা-হ্রাসে আদিমত্ব প্রসঙ্গ ৪২৮, মৌলিক বর্ণমালা ৪২৯, তদ্বিষয়ে

মতান্তর ৪২৯-৪৩১ ; আমাদের মত ৪৩১ ; ভারতীয় বর্ণমালা-সমূহ ৪৩২-৪৩৫ ; বর্ণমালা-সমূহের নাম ৪৩২ ; বার্জেস কর্তৃক সংখ্যানির্দ্দেশ ৪৩২ ; বিভিন্ন নামধেয় বর্ণমালার পরিচয় ৪৩৩-৪৩৫ ; সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্ম প্রভৃতিতে ভারতীয় বর্ণমালার প্রভাব ৪৩৩ ; বর্ণমালার আকৃতি-গত পার্থক্য ৪৩৫-৪৩৬ ; তামিলের প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গ ৪৩৬ ; গ্রন্থমুদ্রণে ব্যবহৃত ভারতীয় বর্ণমালা ৪৩৭-৪৩৮ ; তিব্বতীয় বর্ণমালার ও দেবনাগরের সাদৃশ্য ৪৩৮ ; কোন্ ভাষা কোন্ বর্ণমালায় লিখিত ৪৩৭-৪৩৮ ; অসম্পূর্ণতার ভাষার আদিমত্ব প্রতিপাদনে পাশ্চাত্য মত ৩৯৮
বর্হিষদ ৩৩১
বলভদ্র ১৫৯, ১৬০
বলরাম ১৫২
বলি (বোল বা বেল)—আসিরীয়া রাজ্যের আদিম রাজা ৩৫, ৩৬ ; তাঁহার রাজ্য বিস্তার ৩৭
বলিদান— বিবিধ তাৎপর্য্য ৪৮৫, ৪৮৬
বলীদ্বীপ—তথায় হিন্দুগণের প্রাধান্যের নিদর্শন ৪৬
বল্লভ ১৪৪
বল্লভাচার্য্য—(রুদ্র সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য) ; তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত ৪৭৩, তাঁহার গ্রন্থাদির ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিবরণ ৪৭৩-৪৭৬ ; তাঁহার অলৌকিক লোকান্তর ৪৭৪ ; তাঁহার শিষ্যবর্গ ৪৭৪
বল্লভী ১৫৯, ১৬০
বল্লালসেন ২৪৫ ; তৎকর্তৃক কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তন ২৪৫ ; তৎকর্তৃক বঙ্গদেশ বিভাগ ২৪৬ ; তৎকর্তৃক রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র বিভাগ ৩২৮
বসন্তসেনা ২৮৯
বসু (উপরিচর) ৩০৯
বসুদেব ১৫২
বসুবন্ধু ১০২
বস্তুচিত্র—মৌর্ত্তিক অক্ষর দ্রষ্টব্য।
বাকুল ১৩০
বাগুড় ২০১
বাঙ্গালা—বঙ্গ দ্রষ্টব্য।
বাঙ্গালা গেজেট ৪৪১
বাদাগা ৩৬০
বানায়োধ ১০১
বাপ্পা ২১৩
বাবিলন ৩৪
বাভন ৩৪৭
বামাচারী ৪৮৫
বামাবর্ত্ত (লিপি) ৪১৫, ৪১৬ ; ভারতের ৪২৩, ৪২৪
বারাণসী—১১৯, ১২৩ (কাশী দ্রষ্টব্য।)
বারিজাগা ২৭৭
বরুণ ৫২
বার্জেস -- বর্ণমালার সংখ্যা নির্দ্দেশে ৪৩২
বার্ণেল—দেবগিরির রাজার বিষয়ে ২৭৮ ; পালি, সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতির মৌলিকত্ব বিষয়ে ৩৭০ ; অশোক-লিপি ও পালি-ভাষা বিষয়ে ৩৭০
বার্ণেল—বর্ণমালা বিষয়ে ৪১৯
বার্ণেস (কাপ্তেন) — কান্দাহার ও কনোজ সম্বন্ধে ৩০৮
বাল্‌থ ৩৬, ৩৭,
বালাদিত্য ২৯৩
বাসুদেব ২০৯, ২৪১, ২৪২
বাহের ১৩৮
বার্হদ্রথ (বংশ) ১৬৫
বাহ্লিক (বাহ্লীক) ১৩, ৩৬, ৩৭, ১১১
বিক্রমাদিত্য—অযোধ্যার পুনরুদ্ধারে ৯৩-৯৪ ; শ্রাবস্তীর সিংহাসনে ১০২ ; তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের রাজত্বকাল ১০২ ; কাশ্মীরে তাঁহার প্রভাব ২৯১, ২৯২, ২৯৩ ; তাঁহার জন্মকুল ৩৫৬ ; তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ২৮১, ৩১২ ; ভোজরাজের সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব প্রতিপাদন ৩১৩ ; তাঁহার রাজত্বকালে উজ্জয়িনীর সৌভাগ্য-সম্পদ ২০৬ ; বিক্রমাদিত্য নামে বিভিন্ন নৃপতির পরিচয় ২৮১, ৩১৩ ; শালিবাহনের নিকট পরাজয় ও বিদ্যমানতার প্রসঙ্গ ২৭৭
বিগ্রহপাল ২৪৩, ২৪৪
বিচারপুর ৩০৩
বিচালো ৩০৩
বিজয় ২০১, তদ্বংশীয় নৃপতিগণ ২৯২
বিজয় নগর ২৭৯, তত্রত্য রাজবংশ হইতে মহীশূরের রাজবংশের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা ২৭৪, ২৭৯
বিজয়পাল ২১৮
বিজাপুর ২৭৯
বিজয়সাগর ২১৮
বিঠলদেব ৪৬০
বিতস্তা ১২, ২৮৬

বিদর্ভ ১৮৩
বিদেহ (রাজ্য) ১১৩-১১৭
বিদেহীপুত্র ১৬৯
বিপাশা ১১
বিম্বিসার ১৬৭-১৬৯
বিরাজ ১১৪
বিরাট (রাজ্য) ১৪৪-১৪৯ ; মহাভারতে ১৪৩ - ১৪৫, অবস্থান সম্বন্ধে মতান্তর ১৪৫-১৪৬ ; তদ্বিষয়ে বক্তব্য ১৪৮-১৪৯ ; হুয়েন-সাঙের ও কানিংহামের বর্ণনায় ১৪৭-১৪৮ ; তত্রত্য অশোকের শিলালিপি ১৪৭
বিরোধক ১০২
বিশাখা ৯৩, ৯৫
বিশাল ১১৩
বিশালা ২০৫, ২০৬
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ৪৬২
বিশ্বামিত্র—(আচার্য্য) ৩৬১
বিষ্ণু ১২, ১৩, ১৫, ৪৫৬, ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য।
বিষ্ণুপ্রিয়া ৪৭৯
বিহার (বেহার) ১৮৫-১৮৬
বীরপন্থী ১১
বীরবৈষ্ণব ৩৫৫
বীরসেন ২৪৪
বীরসিংহ ৪৬৭
বুক্কারায় ২৭৯
বুদ্ধগয়া ১৭৩, ১৭৭, ১৭৮
বুদ্ধদেব—তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত ৫০১ ; তাঁহার ধর্ম্মমত ৫০০ ; অনোমা নদী তীরে মস্তক মুণ্ডন ও সন্ন্যাস-গ্রহণ ১৯৮ ; তাঁহার নির্ব্বাণ-স্থান ২০২ ; অন্ত্যেষ্টির বিষয় ২০২ ; কাশীতে প্রথম ধর্ম্ম-মত প্রচার ১২১, ৫০০-৫০১ ; তাঁহার লিপি শিক্ষা ৩৬৫ ; তাঁহার সিদ্ধি লাভ ১০৫ ; অযোধ্যায় ধর্ম্ম প্রচার ৯৩ ; তাঁহার সুহৃৎ প্রসেনজিৎ ১০১ ; তাঁহার ও উদয়ন-বৎসের জন্ম-প্রসঙ্গ ১২৯ ; তাঁহার নিকট বাকুলের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ১৩০ ; প্রাগ্-বোধি বা বোধি বৃক্ষ মূলে তাঁহার অশ্রয় গ্রহণ ১৭৭ ; রাজা বিরোধকের ধ্বংস ১০২ ; তাঁহার মস্তক ভিক্ষা দান ১০৮ ; স্বর্গধামে গমন ও মাতার নিকট ধর্ম্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যা ১১৬ ; নাগ হ্রদে তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার ১৪০-১৪১ ; পাটলিপুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ১৬৯ ; লাম্বিনী উদ্যানে জন্ম গ্রহণ বৃত্তান্ত ১৯৬ ; তাঁহার মূর্ত্তি বিভাগ ১৯৭ ; চব্বিশ জন বুদ্ধের কথা ৫০০ ; বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য।
বুন্দেলখণ্ড ১২
বৃত্র ৩০
বৃন্দা ১৫৭
বৃন্দাবন ১৫৬, ১৫৮
বৃহদ্বল ৯৭
বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ—বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ৩৬৪
বৃহন্নলা ১৪৪
বেঙ্গল গেজেট ৪৪১
বেতোয়া ২১৫
বেত্রবতী ২১৫
বেদ—পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ ১০ ; ঋগ্বেদ দ্রষ্টব্য।
বেদগর্ভ ৩২৮
বেদবতী ২১৫
বেদাগালাই ৪৬৩, ৪৭৩
বেন্‌কি—বর্ণমালা বিষয়ে ৪১৯
বেরেথ্রুম ১৩, ৩০
বেহার ১৮২, ১৮৬, ভাষা ৩১২
বেলাল বা বল্লাল ২৭৮
বেসার ১১৪
বৈজয়ন্ত ১১৩
বৈদিক ব্রাহ্মণ ৩৪৭ ; পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য ৩৪৯, ৩৫০
বৈদেহ ১১৫
বৈরাজাম্ ৩১৭
বৈরাট ১৪৮
বৈশরা ১২৬
বৈশালী ১১৩, ১১৪
বৈষ্ণব—৫৫৭-৪৫৯, সম্প্রদায়ের লক্ষণ ৪৫৭, সম্প্রদায় ৪৫৮-৪৮১, রামানুজ বা শ্রী সম্প্রদায় ৪৫৯, রামানন্দী বা রামাৎ সম্প্রদায় ৪৬৪, কবীরপন্থী ৪৬৬, রামানন্দী সম্প্রদায়ের শাখা-উপশাখা ৪৭০, মধ্বাচারী বা ব্রহ্ম সম্প্রদায় ৪৭১, বল্লভাচারী বা রুদ্র সম্প্রদায় ৪৭৩, সনকাদি বা নিমাবৎ সম্প্রদায় ৪৭৬, চৈতন্য সম্প্রদায় ৪৭৭, চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা-উপশাখা ৪৮১ ; বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব ৪৫৮, একবিংশ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম ৪৫৯
বোধি বৃক্ষ ১৭৪, ১৭৬
বোপ—ভাষা সম্বন্ধে ৩৯৫
বোপদেব ২৭৮
বোর্ণিয়ো ৪৬
বোরো (ভাষা) ৩৭৫
বৌদ্ধ (সম্প্রদায়) ৩৭৫, প্রাচীনত্ব ও গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠা ৫০০, চব্বিশ জন অবতারের কথা, চারিটি প্রধান সত্য ও দুঃখ-নিবৃত্তির অষ্টবিধ উপায় ৫০০, বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি ৫০১, কাশ্মীরে তাঁহাদের নির্য্যাতনের বিবর ২৯২, অশো-

কাদির প্রাধান্যে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ২৯৭, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে বৌদ্ধগণের প্রভাব লোপ (শঙ্করাচার্য্য দ্রষ্টব্য।)
ব্যাক্‌ট্রা ৩৬
বাক্‌ত্রিয়া ৩৬, ৩৭, তত্রত্য মুদ্রায় সংস্কৃত ভাষা প্রচলনের পরিচয় ৩৭, (বর্ণমালা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।)
ব্যাঘ্রপুর ১৯৬
ব্যাসকূট ৪৭৩
ব্রজধাম ১৫৬, ১৫৮
ব্রজমণ্ডল ১৫৬
ব্রহ্মপুর ১৪৪
ব্রহ্মভাষা (বৈদিক) ১৪, ব্রহ্মদেশীয় ভাষা (বর্ণমালা ও ভাষা দ্রষ্টব্য।)
ব্রহ্মগয়া ১৭৭
ব্রহ্মদত্ত ১৮৯
ব্রহ্মর্ষিদেশ ৫৬
ব্রহ্ম সম্প্রদায়—মধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠা ৪৭১, ঐ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ৪৭২, মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের দুইটী বিভাগ ৪৭৩, শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বি-দিগের সহিত বান্ধবতা ৪৭৩, ব্যাসকূট ও দাসকূট শাখার পরিচয় ৪৭৩
ব্রহ্মা ৪৫৬
ব্রহ্মাবর্ত্ত ৫৬
ব্রাতা—শব্দার্থ ৩২২
ব্রাহ্মন ৪৪১
ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ৩২৩, বেদী ও শাখী শব্দে পরিচয় ৩৪২, দেশ-ভেদে নাম ৩৪১-৩৪২, তাঁহাদের পঞ্চ-দ্রাবিড়ী ও পঞ্চ-গৌড়ীয় বিভাগ এবং উপবিভাগ সমূহ ৩৪২-৩৪৩, সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়ীয়, মৈথিল, উৎকলীয় প্রভৃতি পঞ্চ-গৌড়ীয় এবং মহারাষ্ট্রীয়, আন্ধ্র, দ্রাবিড়ী, কার্ণাটিক ও গুর্জ্জরী প্রভৃতি পঞ্চ-দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ ৩৪২, মুখিব্রাহ্মণ ৩৫৩, সারস্বত ৩৪০-৫৫, শাকলদ্বীপী ৩৫৪, সপ্তশতী ৩৪৯, ভূমিহর ৩৪৭, আন্ধ্র ৩৫২, ভেঙ্গীনাড়ু ৩৫২, নাগর ব্রাহ্মণ ৩৫৩, ঔদীচ্য ৩৫৪, সাচোর, উদম্বর প্রভৃতি ৩৫৫, মাল্‌ভী নিমারী প্রভৃতি ৩৫৫, জজহোতীয় ব্রাহ্মণ ২১১-২১৫, শ্রীমালী, ভাট প্রভৃতি রাজপুতনার ব্রাহ্মণগণ ৩৫৫, সারস্বত ব্রাহ্মণ ৪৪৩, কনোজীয় ব্রাহ্মণ ৩৪৫, মৈথিল ও উৎকলীয় ৩৪৭, গৌড়ীয় ও বঙ্গ-দেশীয় ৩৪৯, মহারাষ্ট্রীয় ৩৫০, দ্রাবিড়ী ও কার্ণাটিক ৩৫৩; গুর্জ্জর ৩৫৪; অন্যান্য ৩৫৫
ব্রাহ্মণাবাদ ৩০৪
ব্রিজি ১১৪-১১৫, তথায় সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী ১১৪, বিরাজ ও বৈরাজ্যম দ্রষ্টব্য।

ভ।

ভক্তমাল—রামানন্দ সম্বন্ধে ৪৬৫, কবীর সম্বন্ধে ৪৬৬, রুইদাস প্রসঙ্গে ৪৭০, বল্লভস্বামী সম্বন্ধে ৪৭৩, ৪৭৪
ভগদত্ত ২২৭
ভজ্জিয়ান ১৬৯
ভবভূতি ২৯৪
ভরদ্বাজ আশ্রম ১২৫
ভর্ত্তৃহরি—রাজা ২০৭, গুহা ২০৭, সম্প্রদায় ৪৯২
ভাগীরথী ৬১
ভাগুড় ২০১
ভানুগুপ্ত ৩১৯
ভারতবর্ষ—ভৌগোলিক তত্ত্ব ৪৮-৭০, আকৃতি ৮১-৮৭, মহাভারতের বর্ণনায় ৮১-৮৩, দেবী ভাগবতে, বায়ু-পুরাণে ৮২, এরাটোস্থেন্সের মতে ৮৪, পেট্রোক্লাসের ৮৪-৮৫, ষ্টাথমির ৮৫, হুয়েন-সাঙের ৮৭, ফা-কা-ই-লি-টো গ্রন্থে ৮৭, কানিংহামের মতে ৮১, ৮২, ৮৬; ভিন্ন ভিন্ন ভাগ ৫০-৫৭—গরুড় পুরাণের মতে ৫০, ব্রহ্ম পুরাণের মতে ৫১, ৫৭, মৎস্যপুরাণ ও বায়ুপুরাণের মতে ৫১, বরাহ মিহিরের মতে ৫২-৫৫, কানিংহামের মতে ৫৪-৫৫, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ৫৫-৫৭, মনু মতে ৫৬, বিষ্ণুপুরাণ মতে ৫৬ ৫৭, বিভাগ সম্বন্ধে মতান্তর ৫২-৫৫, চীনাদের সরকারী কাগজ পত্রে ৮৭, হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় ৮৭ ত্রিকোণত্ব প্রমাণ প্রয়াস ৮২-৮৪, নদ নদী ৫৭-৫৯, ৬৬-৬৮, পর্ব্বত ৫৮, বায়ু-পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও রামায়ণ মতে ৫৮-৫৯, নদ-নদীর উৎপত্তি স্থান (পুরাণ মতে) ৫৯-৬২, ভৌগোলিক তত্ত্বে অভি-

জ্ঞতার কথা ৮৯-৯০, এলফিনষ্টোনের মত ৮৮-৮৯, পাশ্চাত্য দেশবাসীর অভিজ্ঞতা ৭১, মেগাস্থিনীসের বিবরণ ৭৩-৭৫, হুয়েন-সাঙের বিবরণ ৭৬ ৭৯, প্রাচীন চীনের ৮৬-৮৭, প্রাচীন ভারতের জনপদ-সমূহ ৬২-৬৫, তীর্থস্থান-সমূহ ৬৫-৬৮, জাতি—মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় ৭৪, বিভিন্ন নাম ৮৬

-ভাষা-সম্বন্ধে 'ভাষা' দ্রষ্টব্য।

-বর্ণমালা সম্বন্ধে 'বর্ণমালা' দ্রষ্টব্য।

-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য।

ভালভাষ্ম ৪৫০

ভাষা—৩৬১ ৪০০, শব্দের বুৎপত্তি ৩৬১, ভাষা কত কাল ৩৬১, বেদে ও পুরাণাদি শাস্ত্রে ৩৬১, মনুষ্যের, পশু-পক্ষীর ও উদ্ভিদাদের ৩৬২ সাধারণ ভাষার অর্থ ৩৬২, আরিষ্টটলের মতে ভাষার উৎপত্তি তত্ত্ব ৩৬৩, উৎপত্তি-বিষয়ে আলোচনা ৩৬৩-৩৬৪, সংখ্যা নির্দ্দেশে ৩৬৪, বিভাগদ্বয় ও ব্রহ্ম-পুরাণোক্ত ষট্ পঞ্চাশ ভাষা ৩৬৪, শাস্ত্রীয় ও সাহিত্য-দর্পণোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভাষা ৩৬৫, দ্রাবিড়ী, কেনারী প্রভৃতি ২৮২-২৮৩, বুদ্ধদেব ও বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের চতুঃষষ্টি প্রকার লিপি-শিক্ষা ৩৬৫, জৈনগ্রন্থোক্ত অষ্টাদশ লিপির উল্লেখ ৩৬৬, নান্দী-সূত্রোক্ত ছত্রিশ লিপি ৩৬৬, পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহে দাক্ষিণাত্যের মূল ছয়টির ও উপভাষা সাতাইশটার পরিচয় ৩৬৬, প্রাকৃত চন্দ্রিকোক্ত ভাষা-সমূহ ৩৬৬, উৎপত্তি বিষয়ে সাদৃশ্য ৩৬৬, সংস্কৃত হইতে অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি ৩৬৭, সংস্কৃত হইতে অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে ম্যাক্সমূলারের মতালোচনা ৩৬৭, দান্তের মতে ৩৬৭, মৌলিকত্ব ভাষার বিভাগদ্বয় ৩৬৮, পালি ও মাগধীর মৌলিকত্ব বিষয়ে বৌদ্ধগণের মত ৩৬৯, তৃতীয় পূর্ব্ব শতাব্দীতে অশোক-প্রচারিত ভাষা ৩৬৯, অশোক-লিপির বিভাগত্রয় ৩৭০, উচ্চারণ পার্থক্যে ভাষার পার্থক্য ৩৬০, পালির মৌলিকত্ব বিষয়ে সিংহলদেশীয় বৌদ্ধমত ৩৬৯, কানিংহাম কর্ত্তৃক অশোক ভাষার বিভাগত্রয় ৩৭০, কানিংহাম বিভাজিত ভাষাত্রয়ের সামঞ্জস্য পরীক্ষা ৩৭০, তৎসম্বন্ধে প্রিন্সেপের মত ৩৭০, পরিবর্ত্তনের যুগ ৩৭০-৩৭২, বররুচির ব্যাকরণ ও প্রাকৃতের বিভাগ চতুষ্টয় ৩৭১, সাদৃশ্য প্রদর্শনে সংস্কৃতাদি ভাষার শব্দের আদর্শ ৩৭১, ধর্ম্ম-পদের শ্লোকোদ্ধার ৩৭২, পঞ্চ-গৌড় ও পঞ্চ-দ্রাবিড়ী ৩৭৩, তাহাদের বিভাগ-সমূহ ও তন্মধ্যে সাদৃশ্য ৩৭৩, দ্রাবিড়ী ভাষার দ্বাদশটী বিভাগ কল্ডওয়েলের মতে ৩৭৪, দ্রাবিড়ী ভাষার শাখা-সমূহের সম্বন্ধ নিরূপণে গ্রিয়ারসনের মানচিত্র প্রকটন ৩৭৪, অসভ্য জাতির ভাষা ৩৭৫, আদম-সুমারী মতে ভারতের ১৪৭ টী ভাষার উল্লেখ ৩৭৫, ভাষা-সমূহের বিভাগসপ্তক, কথিত ভাষার লোকসংখ্যা ও ভাষার সংখ্যা ৩৭৬, বঙ্গ ভাষার চতুর্দ্দশ বিভাগ ৩৮৪ ৩৮৫ হিন্দীর বিভাগ-ত্রয় ও উপবিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৮৫-৮৬, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কথিত ও লিখিত ভাষার পরিচয় ৩৭৬, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রচলিত দেশীয় বিদেশীয় যাটটী ভাষা ও তাহাদের পরিচয় ৩৮৭, সংস্কৃত অস্মদ ও যুস্মদ শব্দের উল্লেখে ভারতের প্রধান প্রধান ভাষার দৃষ্টান্তে সাদৃশ্য নিরূপণ চেষ্টা ৩৮৮, ধাতুরূপের সাদৃশ্য ৩৮৮, বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত একই ভাবের রূপান্তরের আদর্শোল্লেখ ৩৮৯, বঙ্গদেশের প্রাদেশিক ভাষার নমুনা ৩৯১, পাশ্চাত্য মতে পৃথিবীর ভাষাসমূহের উৎপত্তি-তত্ত্ব এবং সে মতে ইন্দো-ইউরোপীয়ান মূল ভাষার সাতটী প্রধান শাখা এবং তদন্তর্গত উপশাখা-সমূহ ৩৯২, মধ্য এসিয়া হইতে বংশ-বিস্তার ৩৯২, ম্যাক্সমূলারের বংশ-লতা ৩৯৩, এসিয়ার ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার সাদৃশ্য

প্রদর্শনে কয়েকটী শব্দের আদর্শ ৩৯৪ ; গ্রাম্য-পশুর নামকরণে সাদৃশ্য ৩৯৪ ৩৯৫, পুরণবাচক শব্দে সাদৃশ্য ৩৯৫ ; ধাতু ও শব্দের সাদৃশ্য ৩৯৫ ; এক জাতি ও এক ভাষা সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত ৩৯৬ ; এক জাতি ও এক ভাষা সম্বন্ধে জর্ম্মণ ও ফরাসী পণ্ডিতগণের এবং টেলারের ও ম্যাক্সমুলারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ৩৯৬ ; হিব্রু ভাষাই পৃথিবীর আদি ভাষা ৩৯৭ ; সাদৃশ্যে মৌলিক ভাষার অনুসন্ধান ৩৯৪ ; টেলারের মতে এরিয়ানা, কোনও পণ্ডিতের মতে কাশ্মীর, আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইউরোপ—ভাষার আদিস্থান ৩৯৭ ; ভারতের বিভিন্নদেশে প্রচলিত ভাষার মূলে ইউরোপীয় প্রভাব ৩৯৭ ; পাশ্চাত্য মতে বর্ণমালার অসম্পূর্ণত্বে ভাষার মৌলিকত্ব ৩৯৮ ; ভাষার কেন্দ্রস্থান ও তথা হইতে দিকে দিকে বিস্তৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ৩৯৮ ; ভারত-বিতাড়িত জাতি-সমূহের ভাষা সংস্কৃত ও নবাগত দেশের ভাষা সমূহের সংমিশ্রণে সেই সেই দেশের ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও উৎপত্তি ৩৯৯ ; সংস্কৃতের সার্ব্বজনীনত্বে ভারতীয় সভ্যতার মৌলিকত্ব ও প্রাচীনত্ব নির্ণয় ৪০৭ ; কোন্ বর্ণমালায় কোন্ ভাষা লিখিত ৪৩৭-৪৩৮

ভাষাকর ১৬৯
ভাস্করবর্ম্মা ২২৮, ২২৯
ভাস্করাচার্য্য ৫৪
ভাস্কো ডি'গামা ২৭২
ভিছবপুর ৩০৩
ভীল ৩৬০
ভীম ১২০
ভুবনেশ্বর ২৩৪, ৪৯৪
ভূমিজীকোল ৩৬০
ভূমিদেবী ৪৬০
ভূমিহর (ব্রাহ্মণ) ৩৪৭
ভেঙ্গী ২৬২
ভেদারি ২১১, ২১২
ভোন্দদাৎ ৫০৪
ভেরেটাট ১৫৯
ভেল্লালরায় ৪৬৭
ভোজ — রাজা ৩০৯ ৩১৩ ; রাজ্য-বিবরণ ও বিবিধ জ্ঞাতব্য ৩১২-৩১৪
ভোজরাজা ৩২২, ৩১৪ ; রাজ্যের নাম লোপ, ৩১১ ; ভোজরাজ ও বিক্রমাদিত্য ৩১৩
ভোজ প্রবন্ধ ৩১৩

ম ।

ম—অক্ষরের বংশলতা (টেলারের মতে) ৪২৫ ; তৎপ্রতিবাদে ৪৭২
মগধ—(উত্তর) ১২
মগধ রাজ্য ১৬১-১৮৭ ; রাজন্যবর্গ ১৬২-১৬৭ ; মৎস্যপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে ১৬৭ ; আদি রাজধানী ১৭৯ ; হুয়েনসাঙের বর্ণনায় ১৭০ ; কানিংহামের মতে ১৭৩ ; তথায় বুদ্ধদেবের সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মপ্রচার ১৭৩ ; ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে মগধের রাজবংশ ১৬৫-১৬৬

মগধ ভাষা সম্বন্ধে মাগধী দ্রষ্টব্য।
মঙ-তাঁ-ওং-মুদ্রাযন্ত্র নির্ম্মাণে ৪৩৯
মঙ্ক (বেনিডিক্টাইন) ৪৫২
মচক্রুক ১৩৯
মটোগণ ৪৫২
মঠ কোর-কা-কোট ২০২
মণ্ডণমিশ্র ৩৪৭, ৪৯০
মৎস্যদেশ ১৪৫
মথুরা — রাজ্য ১৫০-১৬০ ; রামায়ণে ১৫০, মনুসংহিতায় ও বরাহপুরাণে ১৫১, পুরাবৃত্ত ১৫৩ ১৫৪, এরিয়ানের বর্ণনায় ১৫৭, সুলতান মামুদের আক্রমণ ও মথুরা সম্বন্ধে তাঁহার মত ১৫৫-১৫৬; তীর্থাদি ১৫১, মথুরা ও মধুবা ১১২
মদন সাগর ২১৮
মদাবর, ১৪২
মদুরা ১৫৩
মদ্র—রাজ্য ৩০৯, অবস্থিতি সম্বন্ধে নানা মত ৩১৫, মাদ্রাজ ও মিডিয়ার সহিত তাহার অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা ৩১৫
মধীক্র ভট্ট ৪৭১
মধু ১৫০
মধুকান ৩৩৪
মধুপুরী ১৫১
মধুবন ১৫১
মধ্বাচারী—ব্রহ্ম-সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য
মধ্বাচার্য্য (মধ্যাচার্য্য) ৩৫৫, তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত ৪৭১-৪৭৩, তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলী ৪৭২, তাঁহার সম্প্রদায় সম্বন্ধে ব্রহ্ম সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য।
মধ্য-শ্রেণী ৩৫০
মধ্য-সিন্ধু ৩০৪
মনু—হিন্দুর ও জর্ম্মণদিগের আদি পুরুষ বিষয়ক ৪০,

মনু ও জলপ্লাবন ১৭, তাঁহার মতে জাতি-সৃষ্টি ৩২২-৩২৬, তাঁহার মতে ধর্ম্ম-লক্ষণ ৪৪৬, তাঁহার মতে ব্রাহ্মণের নিকট পৃথিবীর সকল মনুষ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসঙ্গ ৪৭, তাঁহার মতে যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির উৎপত্তি ৩৩১, তাঁহার মতে ক্রিয়া-লোপাদি হেতু ক্ষত্রিয়-গণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ২৫, মনুষ্যের আদি বাসস্থান ২৭
মন্দিরমার্গী ৪৯৯
ময়ূরপুর ১৪৩
মরীয় ২০০
মরু ৯২
মরুৎবৃধা ১১
মরুদ্গণ ১৯
মর্কট-ন্যায় ৪৬৪
মলয়কূট ২৭৪
মলয় পর্ব্বত ২৭৩
মলয়ালম ৩৮৬
মহম্মদ ৫০১-৫০৩, তাঁহার জন্ম ৫০২, জীবন বৃত্তান্ত ৫০৩, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ৫০৩-৫০৪
মহাঅন্ধ্র ২৬৬, ২৬৭
মহাকোশল ৯৯
মহাথুপ ১৯৮
মহাপদ্মানন্দ, ১৬১, ১৬৪, ১৬৭, ভারতে তাঁহার একছত্র আধিপত্য ১৬৪
মহাবীর ৪১, তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত ৪৯৯, তীর্থঙ্কর মধ্যে ৪৯৮
মহামোগলানা ১৮৪
মহারাজ ৪৭৫
মহারাষ্ট্র (রাজ্য) ২৭৪-২৭৬, আদিম অধিবাসী ২৭৬
হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় ২৭৫
—ভাষা (মহারাষ্ট্রী বা মারাঠী) ২৮২, ৩৮২, ৩৮৬, আট প্রকার আদর্শ ৩৮৯-৩৯০, ব্রাহ্মণ ৩৪২, পাঁচটী প্রধান ও পঁচিশটী অপ্রধান শাখা ও উপাধি ৩৫০
মহীপাল ২৪৪
মহীবৃদ্ধ ২২৬
মহেশ্বর ৪৫৬
মহোৎসব ২১৪, প্রতিষ্ঠা ২১৬-
মহোবা ২১৪, প্রাচীন ২১৭, ২১৮, আধুনিক অবস্থান বিষয়ে ২১৮
মহোদয় ১৮৮, ১৯০
মাকিদন ৩৯
মাগধ ৩২৩
মাগধী—(ভাষা) ৩৬৮, ৩৮৫, বৌদ্ধমতে মূল ভাষা ৩৬৯, ভাষাভাষী দেশের সীমানা ৩৮৫-৩৮৬, দেশ ১২৯
মাতৃগুপ্ত ২৯২, কালিদাসের সহিত অভিন্নত্ব-মূলক ২৯২, তাঁহার সুশাসন পরিচয় ২৯২, তাঁহার বৈরাগ্য ও সিংহাসন ত্যাগ ২৯৩
মাদলাপঞ্জী ২৩৩
মাতুরা ৭৫, ১১২, ২৭৩
মাদ্রাজ ৩১৫
মাধব বিদ্যারণ্য ২৭৯, ৪৯০
মানরহিত ১০২
মাধ্যন্দিন ব্রাহ্মণ ৩৫০, ৩৫১
মান্যখেত ৩১৩
মামুদ (গজনি) ১৪৭, ২৪৪, ৩১১, ৩১৪
মামুদ-সা ২৪৭
মায়াদেবী ১৯৬
মায়াপুর ১৪২, ১৪৩
মার্কোপোলো—বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অভিমত ২৪৯
মার্গব ৩২৪
মার্টিন (ভিভিয়েন ডি সেণ্ট)—উত্তর কোশলের অবস্থিতি বিষয়ে ৩১৫-৩১৬
মার্দ্দো (এম) ৩০৭
মার্স ১৯
ম্যার্সম্যান ৪৪১
মালব ২০৪, ২০৯—২১২, ৩১২, পুরাবৃত্তে প্রসিদ্ধি ২০৯-২১০, হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট-২১০-২১১, পরিমাণাদি ২১১-২১২
মালবর ২৭৩
মালভী (ব্রাহ্মণ) ৩৫৫
মার্জ্জারন্যায় ১৬১
মালয়-পোলিনিশীয় — ভাষা-সংক্রান্ত ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮৪
মালাকুতা ২১০, ২৭৩
মিকম্যাক ৪১০
মিডিয়া ৩৫, ৩১৫
মিথ্রা ৫০৪
মিথিলা ১১৩
মিন্নাগড় ৩০৬
মিশর ২৭-২৮, সভ্যতার আদি-স্থান বিষয়ে ২৭; তথায় ভারতের প্রাধান্য বিষয়ক আলোচনা ২৮
মিস্‌মি ৩৫৮
মিহিরকুল ২৯০, তাঁহার নৃশংসতার পরিচয় ২৯১, অন্যান্য ৩১৮, ৩১৯
মিহিরপুর ২৯১
মীরাবাই ৪৭৫, তাঁহার ভগবানে লয় ৪৭৬
মুইর—সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি বা মাগধী ভাষার মৌলিকত্ব বিষয়ে ৩৬৯
মুকুন্দদেব ২৩৬
মুক্ত ৪৯৪
মুঙ্গাপত্তন ১৭৪
মুচুকুন্দ ১৫৩

মুঙ্গের ১৮৫
মুঞ্জ ৩১৩ ; তৎকর্ত্তৃক ভোজ-রাজের হত্যা-চেষ্টা ৩১৪ ; তাঁহার বৈরাগ্য ৩১৫
মুণ্ডা (জাতি) ৩৩৬, ৩৬০, ৩৭৫
মুণ্ডাকোল ৩৬০
মুদ্রাযন্ত্র—সৃষ্টির ইতিবৃত্ত ৪৩৮, ৪৩৯ ; চীনে প্রথম সৃষ্টির প্রসঙ্গ ৪৩৯ ; ইউরোপে প্রথম ৪৩৯ ; ভারতে প্রথম ৪৪০ ; বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরে প্রথম ৪৪১
মুসলমান (মহম্মদ ও ইসলাম দ্রষ্টব্য)—ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম ৫০৩ ; কোরাণ ও কোরাণের শিক্ষা ৫০৩ ; বিভিন্ন সম্প্রদায় ৫০৪ ; গণেশ পুত্র যদুর মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ ২৪৬
মুলতান ৩১৯
মুলরাজ—তৎকর্ত্তৃক ঔদীচ্য-ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠা ৩৫৪
মুলার (অটফ্রায়েড)—বর্ণমালা বিষয়ে ৪১৯ ; (ম্যাক্স-মুলার দ্রষ্টব্য।)
মৃগদাব ১২১, ১২২
মৃচ্ছকটিক ২০৯
মেওয়ারী ৩৩৬
মেগাস্থিনীস—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার বিবরণ, ৭৩-৭৫, উত্তর-কুরু সম্বন্ধে ৩১৭ ; বর্ণমালা প্রসঙ্গে ৪২৪
মেঘবাহন ২০২ ; তদ্বংশীয় রাজগণ ও তাঁহাদের রাজ্য-পরিমাণ ২৯২ ; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসঙ্গে ২৯২
মেথ্রাস ১৫৩
মেধা (মেধাই) ৩৫
মেহংয়ু ১১
মৈথিল, (ব্রাহ্মণ) ৩৪২ ; তাঁহাদের পাঁচ ভাগ ও আদি বাসস্থান ৩৪৭ ; আটটী উপাধি ৩৪৭ ;—ভাষা ৩৮৫
মো-উ-লো ১৪২, ১৪৩
মোক্ষ ১৯৬
মোজেস ৫০১, ৫০২
মো-তি-পু-লো ১৪২
মোরি ৩৫৭ (মৌর্য্য দ্রষ্টব্য)
মো লো-পো ২০৭, ২১০
মোহি (নদী) ১৬০
মো-হো ২১১
মো-লো-কিউ-চা ২১০
মৌক্তিক অক্ষর ৪০৮-৪১২ ; ভাব-চিত্র, শব্দ-চিত্র প্রভৃতি ৪০৮ ; মিকম্যাক জাতির মৌক্তিক অক্ষরে ফরাসী ভাষায় ধর্ম্ম পুস্তক ৪১০ ; প্রাচীন ভারতবর্ষে মৌক্তিক অক্ষরের বিদ্যমানতা ৪১২
মৌর্য্য (বংশ) ১৬৭
ম্যাক্সমুলার—ঋগ্বেদের আদিমত্ব সম্বন্ধে ১০ ; বেদোক্ত নদ-নদী সম্বন্ধে ১১ ; আর্য্য-গণের ভৌগোলিক জ্ঞান সম্বন্ধে ১২ ; বৈদিক শব্দ সম্বন্ধে ১৫, ১৯ ; সংস্কৃত ভাষার মৌলিকত্ব বিষয়ে ৩৬৭ ; মধ্য এসিয়া হইতে বিস্তৃত ভাষার বংশ-লতা প্রকটনে ৩৯৩ ; তৎসম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত বিষয়ক যুক্তি ৩৯৪ ; হিন্দী, গ্রীক, ও টিউটন প্রভৃতির এক-বংশত্ব প্রতিপাদনে তাঁহার যুক্তি ৩৯৭ ; বর্ণমালার আদি-সৃষ্টি বিষয়ে ৪২৯-৪৩১ ; ফিনিসীয়দিগের বর্ণ-মালা শিক্ষা-পদ্ধতির বিষয়ে তাঁহার আলোচনা ৪৩১ ; ধর্ম্ম সম্প্রদায় সংগঠনে তাঁহার মত ৪৪৩-৪৪৪
ম্যানরিক—বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ২৪৯

য।

যক্ষগণ ৩৩১
যতি ৫০০
যদু—মুসলমান-ধর্ম্ম-গ্রহণে ২৪৬
যদুকুল ৩৫৬
যবন ২৩২, ২৩৩, ৪৩০
যব্যাবতী ১১
যমকোটী ৮৯
যমুনা ১০-১২
যযাতি ২৪১
যযাতিকেশরী ২৩৩
যযাতিপুর ২৬৭
যশ ২০৫
যশস্কর ২০৬
যশোধর্ম্ম (দেব) ২৮১, ৩১৯
যশোবর্ম্মণ ২৯৪
যশ্ন ৫০৪
যস্থ ৫০৪
যাজপুর (জাজপুর) ২৩৭
যাজপুরী—ব্রাহ্মণ ৩৪৭
যাস্ক ১৫
যাদব রামদেব রায় ২৭৮
যীশুখৃষ্ট ৫০১-৫০২ ; খৃষ্ট-সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য।
যুগ—ভাষা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ৩৭০-৩৭১
যুধিষ্ঠির (কাশ্মীর-রাজ) ২৯১ —পাণ্ডব সংজ্ঞার হেতু ১৩৪
যোজন পরিমাপ ৭৯-৮০
যোবারেস ১৫৩
যোশি মঠ ৪৮৮
যক্ষু ১১, ২০
য়িহুদী ৫০১, ৫০২
য়্যানিমিজম ৪৫১

র।

রক্ষগণ ৩৩১, ৩৩২
রতনযশ ১৩৮
রত্নপীঠ ২৩৭
রত্নাগিরি ১৮০

রসা ১১
রাঘবদেব ১৯৪
রাজগীর ১২২
রাজগৃহ ১০৯-১১১
রাজতরঙ্গিণী ৩১৭
রাজপুত ৭৪, ৩৫৬, ৩৫৭
রাজপুরী ১১১
রাজসাহী ১৪৫, ১৪৬
রাঠোর (কুল) ৩৫৬ ; বংশের প্রতিষ্ঠাতা ১৯০
রাঢ়ী (ব্রাহ্মণ) ২৪৫, ৩২৭, ৩২৮
রাধাবল্লভী ৪৮১
রাবণ (কাশ্মীর-রাজ) ২৯০
রাভী ১১
রামকোট ৯৩
রামগ্রাম ১৯৭, ১৯৮
রামচরণ ৪৭১
রলে (সার ওয়াল্টার)—আদি মনুষ্য বাস সম্বন্ধে ২৭
রামরায় ১৩৯
রামসনেহী ৪৭১
রামহুন্‌ ১৩৯
রামানন্দ—তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত ৪৬৪ ; তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের ইষ্ট-দেবতা ৪৬৫, তাঁহার ধর্ম্মমত ও দ্বাদশ শিষ্যের নাম ৪৬৫ ; তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ৪৬৪-৪৬৫ সম্প্রদায়ের শাখা-উপশাখা ৪৬৫-৪৬৬, ৪৭০
,,— সম্প্রদায় (রামানন্দী, রামাবৎ বা রানাৎ) ৪৬৪
রামানুজ—তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত ৪৬০ ; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠ-চতুষ্টয় ৪৬০ ; তাঁহার ধর্ম্মমত ৪৬২ ; শ্রী-সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য।
রামানন্দ রায় ৪৭৮
রায়দাসী ৪৭০
রিজলে (সার হার্ব্বার্ট)—জাতি সম্বন্ধে ৩৪৩
রিপুঞ্জয় ১৬১, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৭
রিলিজিয়ন—শব্দের অর্থ (সিসিরো, কাণ্ট, ফিসি, শ্লেয়ার মেয়ার, ফিউয়ার বাক্, কোমৎ, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির মতে) ৪৪৩
রুক্মিণী ১৮৯
রুগিলাস ৩১৯
রুদ্র (সম্প্রদায়) — আরাধ্য দেবতা ৪৭৩ ; বল্লভাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠা ৪৭৪ ; আটবার শ্রীকৃষ্ণের পূজা-পদ্ধতি ৪৭৫। (বল্লভাচার্য্য দ্রষ্টব্য)
রুশম ২০
রূপচাঁদ ১৫৭, ২৪৭, ৪৮০
রূপচাঁদ (পক্ষী) ৩৩৪
রৈবত ১০০, ১৫৮
রোম ৩৯, ৪০ ; শব্দতত্ত্ব ৩৯-৪০ তথায় ভারতবর্ষের প্রভাব ৩৯-৪০
রোমকপত্তন ৮৯
রোমান ক্যাথলিক ৫০২
রোহিণালা (রোহিণিলা) ১৮৫
রোহিণী ১৫২, ১৯৬

ল।

লক্ষ্মণ-ভট্ট ৪৭৩
লক্ষ্মণসেন ২৪৬
লক্ষ্মণের ২৪৬
লক্ষ্মী—তাঁহার প্রথম উপাসনা প্রসঙ্গ ৪৮৩
লক্ষ্মী-নারায়ণ ২৮৮
লঙ্কা (দ্বীপ)—মেগাস্থিনীস ও ইলিয়নের বর্ণনায় ৭৫ ; সিংহল নামের হেতু ২৬৩ ;
লবণ ১৫০
ললিতবিস্তর ৩৬৫
ললিতাদিত্য ২৫১, ২৯৪, ৩১৮
লান্-মিং ১৯৬
লান-মো ১৯৭
লা-ফা-নি ১৯৬
লাম্বিনী ১৯৬
লারখাকোল ৩৬০
লাসেন (অধ্যাপক)—উত্তরকুরু সম্বন্ধে ৩১৬, ৩১৭, পালি, সংস্কৃত, মাগধী ও প্রাকৃতের মৌলিকত্ব বিষয়ে ৩৬৯, অশোক-লিপি বিষয়ে ৩৭০
লাহারি ৩০৬
লি—পরিমাণ ৭৯
লিঙ্গ—পূজা ও পূজার তাৎপর্য্য প্রসঙ্গ ৪৭৬
লিঙ্গায়ৎ ৪৯২
লিচ্ছবি ১১৪, ১১৫, ১৬৯, ৩২৪
লিন-ই ২৪৯
লিপি—বর্ণমালা দ্রষ্টব্য ; বুদ্ধদেবের চতুঃষষ্টি লিপি-শিক্ষা ৩৬৫, জৈন গ্রন্থোক্ত লিপি ৩৬৬, নান্দীসূত্রোক্ত লিপি ৩৬৬, পাশ্চাত্য মতে লিপি-সৃষ্টি ৪০৮, অশোক লিপি ৪১৫-৪২০ ; বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত লিপি ৪১৫, অশোক লিপির পাঠোদ্ধারে ৪১৬-৪১৭, ভারতবর্ষে বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত উভয়বিধ লিপির অস্তিত্ব ৪২৩-৪২৫ ; বল্লভী, চৌলুক্য প্রভৃতি রাজগণের মুদ্রার লিপি ৪১৮, হাচিন্সন কর্ত্তৃক ভারত প্রচলিত লিপির সংখ্যা নির্দ্দেশ ৪৩২
লীলাজন ১৭৭
লুশাই ৩৫৯
লেপ্‌চা ৩৫৯
লেপ্‌সিয়স ৩৩৪
লো-ইন-নি-লো ১৮৫
লোক—ভাষা সম্বন্ধে, ৩৬৩

শ।

শক—স্যাক্সনদিগের সহিত সাদৃশ্যে ৪১; শক ও সিদীয় ৪৫; জাতির উৎপত্তি ১৫৪; দেশ ও জাতি ৩২৭; রামায়ণোল্লিখিত জাতি ৩৩০
শকাব্দ ১৫৪, ৩৬৭
শক্তি—মাহাত্ম্য ৪৮২; উপাশক শাক্ত ৪৮২; অন্যান্য বিষয় শাক্ত দ্রষ্টব্য।
শঙ্করবিজয় ৪৮৭, ৪৯৬
শঙ্করাচার্য্য ৩৫৩; নাম্বুরী-কুলে জন্ম ৩৫৫; তাঁহার সহিত বিচারে পরাজিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সমূহ ৩৫৯; একটি শ্রুতি-বাক্যের অর্থে ৩৭৩; তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত ৪৮৭-৪৮৯; তাঁহার জীবন-চরিত মূলক গ্রন্থ সমূহ ৪৮৭; জ্ঞাতিগণের অসদাচরণে গৃহ-ত্যাগ ৪৮৭; জননীর সৎকারে অগ্নি উৎপাদন ৪৮৭; তাঁহার সংসার ত্যাগ ৪৮৮; তাঁহার বেদান্ত ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ ও তৎপ্রতিষ্ঠিত মঠসমূহ ৪৮৮; তৎকর্তৃক শিব, শক্তি, বিষ্ণু, গণপতি, সূর্য্য প্রভৃতির পূজা-প্রবর্ত্তনা প্রসঙ্গে ৪৮৯; তাঁহার শিষ্যগণ ৪৮৩-৪৯০
শচীদেবী ৪৭৭
শতজিৎ ৫৫
শতদ্রু ১১
শতবাহন ৯৯
শত্রুঘ্ন ১৫০, ১৫১
শবর ৩৭৫
শর্ম্মা ২৮১
শর্য্যাণাবৎ ১১, ১৩৮
শশাঙ্ক ২৫১, ২৫৬
শাকদ্বীপ ৬৯
শাকপুণি ১৪, ১৫
শাকলদ্বীপী (ব্রাহ্মণ) ৩৫০
শাকেত ৯৩ ৯৬
শাক্ত ৪৫৭; লক্ষণ ৪৫৭; কৌলাচার ৪৮৩; উপাস্য দেবতা ৪৮৪-৪৮৬; বামাচারী ও দক্ষিণাচারী ৪৮৫, শাক্ত মতে বলিদান ৪৮৫, ৪৮৬; পীঠস্থান ৪৯৩-৪৯৫; (কালী, দুর্গা ও শক্তি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।)
শাক্য ৯৩, ১৬৮, ১৯৫
শাচী ৯৪, ৯৫
শা-ধেরি ১০৯
শাম্পক ২০১
শারদা পীঠ ২৮৫, ৪৯৪
শালিবাহন ২৭৭, ৩৫৭
শাল্মলী দ্বীপ ৬৮, ৬৯
শিগ্রু ১১
শিজ্ঞ ১৩৯
শিণ্টু ১০৮
শিনার ৩৯৭
শিপ্রা ২০৫
শিফা ১১
শিব—তাঁহার উপাসনা ৪৫৫-৪৫৭, ৪৮৬; পীঠস্থানে তাঁহার নাম ৪৮৯, ৪৯৩, ৪৯৫ (শৈব দ্রষ্টব্য)
শিবস্থান ৩০৫
শিলাদিত্য ২১০, ২১৬, ২৯৩
শিলাভদ্র ১৮২
শিশুনাগ—বংশ ১৬৬-১৬৭
শিশোদীয় ৩৫৬
শুদ্ধোদন ১৬৮
শুনঃশেফ ১৫১
শূদ্র—উৎপত্তি ৩২২ ৩২৩, ৩২৯; ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি প্রসঙ্গে ২৫-২৬, ২২২
শূরসেন ১৫১
শৃঙ্গবেরপুর ১১২
শৃঙ্গেরী (মঠ) ৪৭৩, ৪৮০, ৫৯০
শৈব—লক্ষণ ৪৫৭; উপাসনার প্রাচীনত্ব ৪৮৬, পীঠস্থান-সমূহের পরিচয়ে ৪৯৩-৪৯৫; বিবিধ শৈব সম্প্রদায় ৪৯০-৪৯২, সোমনাথ প্রভৃতি দ্বাদশটী শৈবমঠের বিবরণ ৪৯২, কাশ্মীরে শৈব-ধর্ম্মের প্রাধান্য ২৯০
শৈবদর্শন ৪৯১
শৈলূষতনয় ১০৬
শোণ ১৬৮
শোলাঙ্কী ৩৫৬
শ্বেতয়াবরী ১১
শ্বেতাম্বর ৪৭৯
শ্বেতী ১১
শ্রাবক ৫০০
শ্রাবস্তী ৯২-৯৫, বিষ্ণু-পুরাণে ১০০, রামায়ণে, বায়ু-পুরাণে ও মৎস্যপুরাণে ১০০-১০১, বর্ত্তমান অবস্থা ১০৩, অন্যান্য ১৬৮, ২৫০
শ্রী—(সম্প্রদায়) ৪৫৮, রামানুজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠা ৪৬০, তাঁহাদের তীর্থ-সমূহ ও ধর্ম্মগ্রন্থ ৪৬১, ধর্ম্মমত ৪৬২, বেদাগালাই ও তেঙ্গালাই বিভাগ-দ্বয় ৪৬৩, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ৪৬৩; পঞ্চবিধ মূর্ত্তির প্রাধান্য ৪৬২; ব্রাহ্মণগণের উপাধি ৪৬৪; আচারী, শাখা ও তিলক চিহ্ন ৪৬৪
শ্রীকাকোল ২৬২
শ্রীকৃষ্ণ—মথুরা রাজ্যের প্রসঙ্গে ১৫১-১৫৩
শ্রীক্ষেত্র ২৪৮
শ্রীচৈতন্য—জীবনবৃত্তান্ত ৪৭৮-৪৮০; তাঁহার ধর্ম্মমত ৪৭৭-৪৭৮; তাঁহার অন্তর্দ্ধান ৪৮০; তাঁহার ছয় জন প্রধান শিষ্য ৪৮০, নি[illegible], গৌরাঙ্গ, বিশ্বম্ভর মহা[illegible]

প্রভৃতি নাম ৪৮৯, রায় রামানন্দের সহিত্ তাঁহার বাক্যালাপে ধর্ম্মমত প্রকাশ ৪৭৮, তাঁহার সহকারিগণ ৪৮০, তাঁহার উৎকল-গমন ২৩৬
শ্রীনগর ২৯৭
শ্রীনাথদ্বার ৪৭৫, দর্শনের প্রমাণপত্র বিষয়ক ৪৭৫
শ্রীবর ২৯৬
শ্রীবৈষ্ণব ৩৫৫, ৪৬৩
শ্রীরঙ্গপত্তন ২৭৯
শ্রীহর্ষ ৩২৮
শ্রেণিক ১৬৮
শ্রোত্রিয ৩৪৯

ষ।

ষ্টাথ্মি ৮৫
ষ্টার্লিং—লিপি সম্বন্ধে ৪১৭
ষ্টুয়ার্ট (ডুগাল্ড) ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে ৩৬৩
ষ্টেডিয়া ৮০
ষ্ট্রাবো—ভৌগোলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ৮৪, ইউক্রেটাইডস্ সম্বন্ধে ১০৮, উত্তর কুরু সম্বন্ধে তাঁহার মত ৩১৬

স।

সংবৎ ২৭৭
সংস্কৃত (ভাষা)—তাহার মৌলিকত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত ২৩ ২৪ তাহা হইতে অন্যান্য ভাষার, উৎপত্তি তত্ত্ব ৩৬৭, তাহা হইতে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের মত ৩৬৭, অন্যান্য ভাষার সহিত সাদৃশ্য প্রদর্শনে ৩৭১-৩৭২, ৩৮১, অশ্বদ ও যুষ্মদ শব্দের সহিত বিভিন্ন ভাষার সাদৃশ্য ৩৮৮, সাদৃশ্যের আলোচনায় সংস্কৃত ভাষাই অপরাপর ভাষার জনয়িতা ৩৫৮, দেশ জয়ে ভাষা-বিস্তারের প্রসঙ্গ ৩৯৯, সংস্কৃত ভাষার সার্ব্বজনীনত্বে ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ৪০০
সখীভাবক ৪৮১
সত্ত্ব-জাতি ২০৩
সনকাদি সম্প্রদায় ৪৭৬-৪৭৭, বিরক্তি ও গৃহস্থ বিভাগদ্বয় প্রসঙ্গে ৪৭৭
সনাতন ১৫৭, ২৪৭, ৪১৮, ৪৮০
সন্ধিমান ২১২
সপ্ত-কুলাচল ৫৮
সপ্তদ্বীপ ৪৯
সপ্ত বিভাগ (আর্য্য-বংশের) ১৩
সপ্তশতী (ব্রাহ্মণ) ৩৪৯
সপ্ত সমুদ্র ৪৯
সমতট (সামাতাতা) ২২৮, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৭, হুয়েন-সাং দৃষ্ট ২৫৭-২৬৯
সপ্তধাম ১২, ১৩, ১৫ ৩৬৬
সমবায়সূত্র ৩৬৬
সমসুদ্দীন ইলিয়স সা ২৪৬
সমাচার দর্পণ ৪৪১
সমুদ্রপাল ৯৪
সমুদ্র-বন্ধনে রামায়ণে স্থপতি-বিদ্যার পরিচয় ১৪৯
সরনাথ ১২১, ১২৩
সরযূ ১৭
সরস্বতী (নদী) ১০, ১২, ১১৭, ১১৮
„—দেবীর প্রথম উপাসনা ৪৮৩
সলোমন ৪৩৬
সাইলক ৩৩৪
সাঁই ৪৮১
সাঁওতাল ৩৫৯
সকেত (শাকেত) ৯৩-৯৬, অযোধ্যা ও সাকেত ৯৬, গুপ্তরাজগণের রাজত্বে ১০২,
সাঙ্কাশ্যা (সাঙ্কিশা) ১১৫-১১৭, ১৯১, বুদ্ধদেবের অপূর্ব্ব অবতরণ ১১৬, হুয়েন-সাং ও কানিংহামের বর্ণনা অনুসারে ১১৭
সাচোর (ব্রাহ্মণ) ৩৫৫
সা-তা-নি-সি-ফা-লো ১৩৫
সাতুসন ৩০৫
সাতুস্থান ৩০৫
সাধ্যগণ ৩৩১
সান-মো-তা-চা ২২৮
সাম্ভাজী ১১৫
সায়ণ—প্রস্তোক সম্বন্ধে ১৪, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত ২৭৯ (মাধবাচার্য্য দ্রষ্টব্য
সারদা মঠ ৪৮৮
সারস্বত (ব্রাহ্মণ) ৩৪২, তাঁহাদের বাসস্থান, বিভাগ ও উপবিভাগ ৩৪৩, তাঁহাদের উপাধি ৩৪৪, সিন্ধুদেশীয় ৩৪৪, পঞ্জাবের ও কাশ্মীরের ৩৪৫
সাল্‌ভাড়োর (মন্‌সিগনর) ৪৫২
সাহিত্যদর্পণ ৩৬৫
সি-উ-কি ২১০, ২৪৮
সি-ওয়ে ৯৪, ১০১
সিংহপুর ২৬৩
সিংহবাহু ২৬৩
সিংহল ৫২, ২৬৩
সিকিউলাস ডাইডোরাস ১৭২
সিদীয়া—৪৫, ৩১৯, ৩৩৪ (শক দ্রষ্টব্য)
সিদ্ধপুর ৮৯
সিনকেলাস ৩৩৪
সিনটু ৮৬
সিন-টো লো ১৪২
সিন্ধু ১০, ১১, ১২, ২৭, ২৯
সিন্ধুদেশ ৩০০-৩০৩; প্রাচীনত্ব

৩০০ ; বিভাগ-চতুষ্টয় ৩০১ ; আরব আক্রমণ ৩০১ ; সৌবীর ও সোমন-রাজগণের আধিপত্য ৩০২ ; রাজধানী সম্বন্ধে মতান্তর ৩০৩
সিন্ধুরাজ ৩১৩
সিন্ধু-সৌবীর ৩০০
সিরাজ-উদ্দৌলা ২৪৭
সিরীয়া ৪৪, ৪৫
সিলার—ভাষা সম্বন্ধে ৩৯৫
সিলোন ২৬৩
সীতা ১১ ; সীরা ১১
সু-অস্তিন ১৮
সুং-উং ৭৩
সুদর্শন (দ্বীপ:) ৭০
সুদাস ২৫
সুনিধ ১৬৯
সুনৃতা ১১
সুভূতি ১৬৯
সুদম ১৪১
সুমাত্রা ৪৭
সুমিত্র ৫৩
সুয়ারাটারাট ১৫৯; সুরাট ১৬০
সুরান্‌ ২৩
সুরাষ্ট্র (রাজ্য) ১৫৯-১৬০
সুরাষ্ট্রীন ১৫৯
সু-লা-চা ১৫৯, ১৬০
সুলতানপুর ১৩১
সুলেমান কেরাণী ২৪৭
সুলেমান পর্ব্বত ১২
সু লু কিন-না ১৪২
সুসর্ত্ত ১১; সুষমা ১১
সুহ্ম (দেশ) ৩২০
সুর্ণ ৩১১, ৩৩৪
সূর্য্য—দেবতা ১৫ ; তাঁহার উপাসনা ৪৯৫ ৪৯৬, ৪৫৬-৪৫৭ ; ধ্যান ৪৯৬
,,—কাশ্মীর রাজ ২৯৫
সেং-কিয়া-শি ১১৬ ১১৭
সেক্সপিয়র ৩৩৪
সে-টো-টু-লো ১৪৬
সেণ্ট-মার্টিন ১৮৫
সেনরাজগণ ২৪৩
সেনা ৪৭০; সেনাপন্থী ৪৭০
সেবীয়—জাতি, ভারতের সহিত তাহাদের বাণিজ্য ৪২১
,,—বর্ণমালা, ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তির মূল বিষয়ক মত প্রসঙ্গ ৪২০ ৪২১
সেম ৪৫
সেমিটিক ৪৫ ; উৎপত্তি-তত্ত্ব ৪৭
,,—ভাষা ৩৭৬, ৩৮২-৩৮৩
সে-লা-ফা-সি-টি ১০১
সেলিউকাস ৭২, ৮৪ ; বর্ণমালা প্রসঙ্গ ও চন্দ্রগুপ্তের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে ৪১৪
সেস—ভাষা সম্বন্ধে ৩৯৫
সেসোষ্ট্রীস ৩৪
সৈবিন্ধ্রী ১৪৫
সোমনাথ ৩৫৭
সোমাপি ১৬৭
সৌবীর বংশ ৩০২
সৌমার ২৩০
সৌর ৪৫৭ ; লক্ষণ ৪৫৭ ; বেদে সূর্য্যোপাসনা ৪৯৫, শঙ্করাচার্য্যের সম-সময়ে ছয়টী সৌর-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রণালী ৪৯৬
সৌরাজিয়া ২৪৯
সৌরাষ্ট্র-রাজ্য ১৫৯-১৬০
স্কান্দেনেভিয়া ৪১
স্কানকবাসী ৪৯৯
স্থাণুমীর্গ ১৩৫; স্থাণ্বীশ্বর ১৩৫
স্বর্গ ১৫, ১৬
স্বর্ণকোণা ২৩০
স্বাত ১৮
স্বামীনারায়ণ ৪৭৬
স্বামীনারায়ণী সম্প্রদায় ৪৭৫
স্মার্ত্ত—ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণব ৩৫৫
স্মিথ (ভিন্সেণ্ট)—প্রাচীন মুদ্রা প্রসঙ্গে ৪২৮
স্বাক্সন ৪১

হ

হংসপ্রপতন ১২৪
হয় ১২৬ ; হয়মুখ ১২৬
হরিদ্বার ১৪২-১৪৪
হরিয়ূপীয়া ২০, ২১
হরিব্যাস ৪৭৭
হরিহর ২৭৯
হর্ষদেব (কাশ্মীর-রাজ) ২৯৬ ; তাঁহার রাজত্বে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ২৯৬
,,—ভোজরাজ ৩১৩
,,—কনোজাধিপতি ১৩০
হর্ষবর্দ্ধন ৭৮, ৭৯, ১৩০
হল বুধ ৩১৩
হস্তিনাপুর ১৩৩, ১৩৪
হাইপারবোরিয়ান ৪২
হাউদ ৩১২
হাচিন্সন—ভারতীয় লিপির সংখ্যা-নির্দ্দেশে ৪৩২
হাজি-ইলিয়াস ২৪৬
হাম ৪৫, ৩৮৩
হারকিউলিস ৭৪, ৭৫
হায়দার আলি ২৮০
হায়রোগ্লিফিক্স ——৪ ৮—৪১১
হারুণ অল-রহিদ ৩০৮
হিক্‌স ৩৩৪; হিক্‌সো ৩৩৩
হিকি—তাঁহার গেজেট ৪৪১
হিদাংসা ৪৫২
হিন্দী—ভাষা ৩৮২ ; ভাষার বিভাগত্রয় ৩৮৫ ; বিভাগসমূহের শাখা-পরিচয় ৩৮৪-৩৮৬; ভাষার আদর্শ প্রসঙ্গে ৩৮৮, ৩৮৯
হিন্দু—সিন্ধু প্রসঙ্গে শব্দতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা ৩৩৮ ; তাঁহাদের বৃটিশ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন ৪২
হিব্রু—বংশ ৪৫, ৪৬
,,—বর্ণমালা ৪৩৫
,,—আদি ভাষা ৩৯৭
হিরণ্যপর্ব্বত ১৮৫

হিরণ্যপ্রভাত ১৮৫-১৮৬
হুইটাসপেন্স ৩১৫
হুইটনি—মধ্য এসিয়া হইতে ভাষার বিস্তৃতি সম্বন্ধে ৩৯২; ভাষা-সম্বন্ধে ৩৯৫
হুয়েন-সাং—তাঁহার ভারত-ভ্রমণ ১২; তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ১৬-১৯, ২৯১
হুক ২৮৮, ২৯০
হুষ্কপুর ২৯৮, ২৯৯
হু সে-কিয়া-লো ২৯৮
হুসেনচক ২৯১
হূণ—জাতি ও রাজ্য ৩১৮; দিকে দিকে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রসঙ্গ ৩১৮-৩১৯
হেমিটিক ভাষা ৩৭৬, ৩৮২, ৩৮৭, ৩৯২
হেরড (এণ্টিপাস) ৫০১, ৫০২
হেরোডোটাস ৩৩
হেলাস ৩৯, হেলেনিস ৩৯
হৈড়ম্ব ৪৮৫
হৈরণ্যগর্ভ ৩৩১
হো ৩৬০, ৩৭৫

দুই একটী বক্তব্য।

সূচনায়ও বলিয়াছি, উপসংহারেও বলিতেছি, যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, তাহার মত-বিশেষ গ্রন্থ-মধ্যে কোথাও প্রকাশিত হইলে, তৎসম্বন্ধে তাহাই শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না। দৃষ্টান্ত-স্থলে প্রথম খণ্ডের দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি;—একটী লীলাবতী প্রসঙ্গে, দ্বিতীয় মিতাক্ষরা বিষয়ে। লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া (প্রথম খণ্ড, ৪৬৭-৪৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মতান্তরে লীলাবতী, ভাস্করাচার্য্যের পত্নী বলিয়া পরিচিতা আছেন। ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে কোথাও লীলাবতীকে 'বৎসে' কোথাও 'প্রিয়ে' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রধানতঃ সেই কারণেই লীলাবতী সম্বন্ধে দুই মত প্রচলিত। বঙ্গদেশে লীলাবতী, ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া এবং পশ্চিমাঞ্চলে পত্নী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। আমরা প্রোক্ত স্থলে বঙ্গদেশ-প্রচলিত মতেরই উল্লেখ করিয়া ছিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিতর্ক ও মীমাংসা পরবর্ত্তী খণ্ড-বিশেষে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। মিতাক্ষরা শব্দ (প্রথম খণ্ডের ১৫৩ ও ১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মিতাক্ষরাকে একটি মত বা বিধি বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক সেই মত সঙ্কলন করিয়া গিয়াছিলেন মাত্র। দায়ভাগ শব্দে যেমন মত এবং বিষয় উভয় অর্থ সূচিত হয়, মিতাক্ষরা শব্দে কেবল মত বা বিধি মাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। প্রোক্ত স্থলে আমরা মিতাক্ষরা শব্দ মত বা বিধি অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। এইরূপ অপর কোনও বিষয়েও কাহারও সংশয় উপস্থিত হইলে, অন্যত্র তাহার আলোচনা ও মীমাংসা দেখিলেই সে সংশয় দূর হইবে।

সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

'পৃথিবীর ইতিহাস,' দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। প্রায় যথাযথ ইহা পূর্ব্ববৎ প্রচারিত হইল। ইতি

১৯এ ফাল্গুন, ১৩২১ সাল। প্রকাশক।